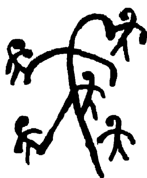
বাঙলার মুখ আমি দেখিয়াছি

বাঙলার মুখ আমি দেখিয়াছি

শঙ্কর সেনগুপ্ত



কলিকাতা
ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশন্‌স্
১৯৭২



ভারতসরকারের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় প্রদত্ত আর্থিক সাহায্যের জন্য এই পুস্তকের সুলভ মূল্য সম্ভব হইয়াছে।

প্রচ্ছদপট চিত্রণে খালেদ চৌধুরী
অলংকরণে বাঙলাদেশের শিল্পী কামরুল হাসান

ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশনস্-এর পক্ষে শ্রীচিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত কর্তৃক ৩, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট, কলিকাতা ১ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক শনিরঞ্জন প্রেস ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা ৩৭ হইতে মুদ্রিত।

প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ ১৩৭৯
১৪ই এপ্রিল ১৯৭২

মূল্য কুড়ি টাকা

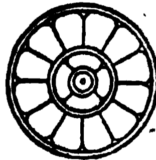
স্বর্গতা মাতৃদেবীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে



প্রাচীনকালে কিল বঙ্গভূমিরনার্য নিগ্রো বটু সেবিতাসীৎ।
ক্রমেণ চাষ্ট্রিক দ্রাবিড়াদিকানাং সম্মেলনং চাত্র হি মাঙ্গলানাম॥
অথক্রমেণৈবহি সেবিতা সা ব্রাত্যৈস্ততো বেদপথানুগৈশ্চ।
যাং ভাবধারাং বহতীহ মিশ্রাং সা সংস্কৃতির্বঙ্গভূমৌ বিশিষ্টা॥
সা ভাবরূপা জননী পবিত্রা ভাষাপি তদ ভাবরূপং বহন্তী।
কালোর্মিঘাতে ন যতো বিপন্না সংরক্ষ্যতাং সা মিলিতৈর্ভবদ্ভিঃ॥

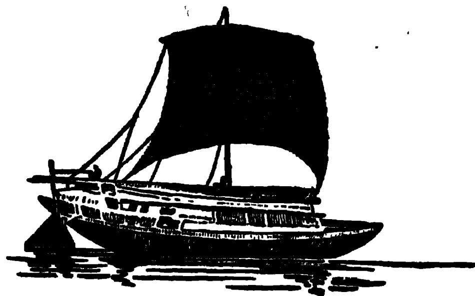


গীতে নাট্যে চ বাদ্যে হরিগুণ কথনে নর্তনে কীর্তনে যা
গ্রামে গ্রামে নরেভ্যো বিতরতি নিতরাং পূতমানন্দ রাশিং
যস্যাঃ প্রাণাস্তু ভাবাশ্রিত ললিতকলা হৃষ্টকুল্যেব মাতুঃ
সা দেবী বঙ্গভূমৌ প্রবহতু সচিরং সংস্কৃতেঃ পুণ্যধারা॥
ঘটে পটে চ ভাস্কর্যে কটে চিত্রাঙ্কণে পুনঃ কর্ষণে নৌ প্রচালনে
সীবনে বাস্তু বিদ্যায়াং যা কলা সা মহীয়তাম্।



"...এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের কিরূপ অবস্থা ছিল। রাজ্য শাসন প্রণালী কিরূপ ছিল, শান্তিরক্ষা কিরূপ হইত? রাজসৈন্য কত ছিল, কি প্রকার ছিল, তাহাদিগের বল কি, বেতন কি, সংখ্যা কি? রাজস্ব কি প্রকারে আদায় করিত, কে আদায় করিত, কি প্রকারে ব্যয়িত হইত, কে হিসাব রাখিত? কতপ্রকার কর্মচারী ছিল, কে কোন কার্য করিত, কি প্রকারে বেতন পাইত,

কোনরূপে কার্য-সমাধা করিত ? কে বিচার করিত, বিচারের নিয়ম কি ছিল, বিচারের সার্থকতা কিরূপ ছিল, দণ্ডের পরিমাণ কিরূপ ছিল, প্রজার সুখ কিরূপ ছিল ? ধাস্য কিরূপ হইত ? রাজা কি লইতেন, মধ্যবর্তীরা কি লইতেন, প্রজারা কি পাইত, তাহাদিগের সুখদুঃখ কিরূপ ছিল ? চৌর্য্য, পূর্ত, স্বাস্থ্য, এ সকল কিরূপ ছিল ? কোন কোন ধর্ম প্রচলিত ছিল,—বৈদিক, বৌদ্ধ, পৌরাণিক, চার্বাক, বৈষ্ণব, শৈব, অনার্য কোন ধর্ম কতদূর প্রচলিত ছিল ? শিক্ষা শাস্ত্রালোচনা কতদূর প্রবল ছিল, কোন কোন কবি, কে কে দার্শনিক, স্মার্ত, নৈয়ায়িক, জ্যোতিষী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ? কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ? কি কি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন ? তাঁহাদিগের জীবন বৃত্তান্ত কি ? তাঁহাদিগের গ্রন্থের দোষ গুণ কি ? তাঁহাদিগের গ্রন্থ হইতে কি শুভাশুভ ফল জন্মিয়াছে ? বাঙ্গালীর চরিত্র কি প্রকারে তদ্দ্বারা পরিবর্তিত হইয়াছে ? তখনকার লোকের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ?



সমাজ ভয় কিরূপ ? ধর্মভয় কিরূপ ? ধনাঢ্যের অশনপ্রথা, বসনপ্রথা, শয়নপ্রথা কিরূপ ? বিবাহ ও জাতিভেদ কিরূপ ? বাণিজ্য কিরূপ, কি কি শিল্প কার্যে পারিপাট্য ছিল ? কোন কোন দেশোৎপন্ন শিল্প কোন কোন দেশে পাঠাইত ? বিদেশ যাত্রার পদ্ধতি ছিল কিরূপ ? সমুদ্রপথে বিদেশে যাইত কি ? যদি যাইত, তবে জাহাজ বা নৌকার আকার প্রকার কিরূপ ছিল ?... লক্ষ্মণাবতী জয়ের পর বাঙ্গালার অবশিষ্টাংশ কি অবস্থায় ছিল ? অবশিষ্ট অংশের কি প্রকারে স্বাধীনতা লুপ্ত হইল ?...যে বাঙ্গালাভাষা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দ দাসের কবিতায় এক ভাস্বতী কিরণমালা বিকীর্ণ করিয়াছিল, এ বাঙ্গালা ভাষা কোথা হইতে আসিল ? ...জমিদারদিগের উৎপত্তি কবে ? কিসে উৎপত্তি হইল ? মোগল সাম্রাজ্যের সময় তাহাদিগের কি প্রকার অবস্থা ছিল ?...তখনকার জমিদারদিগের সঙ্গে ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ের জমিদারদিগের এবং বর্তমান জমিদারদিগের কি প্রভেদ ?...দেশীয় লোকের অর্ধেক অংশ কবে মুসলমান হইল ? কেন স্বধর্ম ত্যাগ করিল ?"

মুখবন্ধ

পরিচিত-অপরিচিত কোন কোন সুধীজনের ধারণা দীর্ঘদিন লোকজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানাভাবে জড়িত থাকার ফলে বর্তমান লেখকের ভাণ্ডারে বাঙলার লোকজীবন ও লোকবৃত্ত সম্পৃক্ত কিছু অভিজ্ঞতা হয়তো সঞ্চিত হয়েছে। অভিজ্ঞ-ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, এবম্বিধ পরিচিতি মানে বেশ কিছু ধারালো প্রশ্নের সামনাসামনি হওয়া। সম্ভবত সেই প্রশ্নগুলো দীর্ঘদিন যথাযথ উত্তরের প্রতীক্ষায় ছিল, এবং কোন একটা সময়ে তা লেখকের আত্মজিজ্ঞাসায় পরিণতি লাভ করে। ফলশ্রুতি, বর্তমান গ্রন্থ। লোকজীবনকে কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে ধরে সমগ্র বাঙালীর কথাই বলা হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। অন্যথায় বোধহয় লোকজীবনের পরিষ্কার ছবি পাওয়া যেতো না। কারণ সাম্প্রতিককালের লোকমানুষ নানাভাবে শহরবাসীর সঙ্গে দেয়ানেয়া করে চলেছে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, সহৃদয় পাঠকের প্রশ্রয় পেতে পারে এমন দুরাশা নিয়ে গ্রন্থের পরিচ্ছেদ ও বিষয়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মূল প্রকাশভঙ্গির পরিবর্তনেরও এক দুঃসাহসিক নিরীক্ষা করা হয়েছে। অর্থাৎ গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের প্রকাশভঙ্গিতে বিভিন্ন মেজাজের ছাপ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। স্মৃতিপটে সঞ্চিত নানান্ বিষয় অতি দ্রুত ভাষায় রূপ দিতে গিয়ে কোনও কোনও স্থানে বিচ্যুতি ঘটে নি, এ দাবী লেখক করেন না। কিন্তু লেখক যে সম্পূর্ণ একটি নতুন ঢঙে ও নতুন রীতিতে লোকজীবনের কথা বলার চেষ্টা করেছেন সে দাবী তিনি করেন। এবং তা করতে গিয়ে বিশুদ্ধ লোকজীবনকে একমাত্র অবলম্বন করা হয়ত অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় নি তাঁর পক্ষে। বরং বলা যেতে পারে, বিরাট জনসমষ্টির অধিকাংশকে লক্ষ্য করে বর্তমান লেখক অগ্রসর হয়েছেন। ফলে লোকধর্মের বাহ্যিক কাঠামো যেখানে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যেখানে পঞ্জিকার শাস্ত্রশাসন ষোলআনা কার্যকরী, কিম্বা মুসলমানের ক্ষেত্রে যেখানে সাধারণ মুসলমান শরিয়তী কৃত্যাকৃত্যের দ্বারা বিনিয়ন্ত্রিত সেখানে লোকধর্মের স্বাতন্ত্র্য চাপা দিয়ে অভিজাত ধর্মের কথায়ও বর্তমান গ্রন্থকে সোচ্চার হতে হয়েছে। বাঙলার লোকজীবনে যে বিশেষভাবে প্রাকৃতিক ঋতু বিভাজন ও পঞ্জিকা শাসনের প্রভাব দিবালোকের মত স্পষ্ট এই পরম সত্যটিকে মেনে নিয়েই বর্তমান গ্রন্থ

পরিকল্পিত। কাজেই সেখানে লোকজীবন ও লোকধর্মের আলোচনায় যে সব শাস্ত্রীয় আচার আচরণ ও ধর্মাদির সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে বর্তমান লেখকের ক্ষুদ্র বিবেচনায় তার প্রয়োজন ছিল অথবা অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে এই সাহায্য ছাড়া লোকজীবনের যথার্থ পরিচয় দেওয়া সম্ভব ছিল না।

গ্রন্থের মূল রচনার সঙ্গে মাঝে মাঝে কিছু অংশ 'ইণ্ডেন্ট' বা পৃথক অনুচ্ছেদে ছাপানো হয়েছে। বাঙলা বইয়ে এ ভঙ্গিমাটি নতুন। তাছাড়া, ষড়-ঋতুর আলোচনায় প্রত্যেকটি ঋতুর সঙ্গে ছোট ছোট অক্ষরে মূল রচনার পাশে কিছু প্রাসঙ্গিক বারোমাসীও ছাপান হয়েছে। লোকজীবনের খণ্ডিতচিত্রের ইঙ্গিত দিয়ে পাঠক মনে মোটামুটি একটা পূর্ণাঙ্গচিত্র জাগিয়ে তোলার বাসনা নিয়েই তা করা হয়েছে। কোন পাঠক 'ইণ্ডেন্ট' বা 'বারোমাসী' অংশ-সমূহ বাদ দিয়ে অন্যবিষয় পাঠ করলে গ্রন্থের মৌল বক্তব্য বুঝতে অসুবিধায় পড়বেন না। এ ছাড়া আরও কিছু নতুন রীতি ও ঢঙের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। যেমন গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের শিরোনামা না রাখা। স্থানে স্থানে রাখা হয়েছে 'স্কেচ' ও নক্সা। এইসব স্কেচ বা দ্রুতছবি হয়ত অনেকস্থলে শিরোনামার অভাব পূর্ণ করবে। 'অডিও ভিস্যুয়াল' পদ্ধতিতে লোকজীবনের সামগ্রিক পরিচয় প্রদানে ও বর্ণনীয়কে স্বচ্ছ করতে রেখাচিত্রের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সহজ ভঙ্গিমায় রচিত এ গ্রন্থ পাঠে বহুজ্ঞাত, অল্পজ্ঞাত, অবজ্ঞাত এবং অজ্ঞাতকে নতুন করে জানার প্রতি ঝোঁক বৃদ্ধি পাবে এহেন উচ্চাশা লেখক অবশ্যই পোষণ করেন। গ্রন্থের সব কয়টি পরিচ্ছেদই মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। একটি পরিচ্ছেদের সঙ্গে অন্য পরিচ্ছেদের মিল ও অমিল সচেতনভাবে রাখা হয়েছে। কিছু আবেগ ও হৃদয়ের উত্তাপ নিয়ে মাধুকরীবৃত্তির সাহায্যে গ্রন্থের যে অবতরণিকার সূত্রপাত ঘটান হয়েছে উপসংহারাংশে আছে তার সার্বিক স্বীকৃতি। অগ্রজ-লেখক এবং মহাজন প্রসাদের স্বাদ গ্রহণের জন্যও একটি নতুন পদ্ধতির উপস্থাপনা করা হয়েছে। ঋণ-স্বীকারের বেলাও পণ্ডিত সুলভ রীতি অর্থাৎ নির্দেশিকা, শব্দার্থ, টিপ্পনী, গ্রন্থপঞ্জী ও পদে পদে টীকা কণ্টকিত করার চিরাচরিত প্রথা লেখক পরিহার করেছেন। 'অ্যাকাডেমিক ওয়ার্ল্ডের' অর্থাৎ বিদ্যায়তনের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রথাসিদ্ধ রীতি অনুসরণের প্রতি লেখক একাধিক কারণে অনীহ। বস্তুত, সাধারণ মানুষের কথা সাধারণের গ্রহণযোগ্য ভাষা ও পদ্ধতিতে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে বলে গ্রন্থের আঙ্গিকে অনেকটা রম্যরচনার ঢঙ এসে গেছে। যে পাঠকদের সম্মুখে রেখে অথবা

প্রধানত যাদের পাঠের উপযোগী করে এ গ্রন্থ রচিত হয়েছে তাদের জন্য এ রীতি ও ঢঙটির প্রয়োজন ছিল মনে করেই এই ভঙ্গিমার অনুসরণ করা হয়েছে।

গ্রন্থের স্থানে স্থানে অগ্রজ-লেখকদের সঙ্গে লেখকের মতদ্বৈধতার কথা স্থান পেয়েছে, এ মতপার্থক্য স্বাভাবিক। বর্তমান লেখকের সমস্ত বক্তব্যের সঙ্গে সমস্ত পাঠক একমত হবেন এমন দুরাশা লেখক করেন না। যদি কোন পাঠক তাঁর সঙ্গে সহমত হন অথবা যদি কোন পাঠকই তাঁর সঙ্গে একমত না হন, তাতেও লেখকের বক্তব্য রাখতে কোন দ্বিধার কারণ আছে বলে তিনি মনে করেন না। এই ধারণাবশত লেখক বর্তমান গ্রন্থ রচনা করেছেন।

আলোচ্য গ্রন্থ সুরু হয়েছে সাতাশ পৃষ্ঠা অবতরণিকা (১৭-৪৩ পৃ.) নিয়ে। অবতরণিকায় বাঙলা ও বাঙালীকে ঘনিষ্ঠভাবে জানার উদ্দেশ্যে লোকবৃত্তকে কষ্টিপাথর করে সুদীর্ঘকাল শ্রুত নানা প্রশ্নের উত্তর পাবার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে (৪৪-১০৭ পৃ.) ঋতু-প্রকৃতি ও পঞ্জিকাশাসিত লোক-জীবনের ব্যাখ্যা, আচরণীয় কৃত্যাদির বিশ্লেষণের চেষ্টা আছে। এই পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে কীভাবে ঋতু-প্রকৃতি-জলবায়ু-মাটি, চন্দ্রসূর্যগ্রহাদি দেবতা বাঙালী জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে, কীভাবে বাঙালীর দিন, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস, ঋতুপর্যায় নির্ধারিত হচ্ছে, কীভাবে ষড়ঋতুর আসা-যাওয়ার মধ্যে বাঙালী মনে আশা-হতাশা, আনন্দ-উৎসব, দুঃখ-বেদনাদি প্রকাশ পায়। ঋতু-প্রকৃতির আলোচনায় প্রত্যেকটি ঋতুকে পৃথক পৃথক আলোচনা করে প্রত্যেকটি ঋতুর চরিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ঋতুভেদে চাষবাসের অবস্থা, কীটপতঙ্গ, পথঘাটের অবস্থা, পশুপক্ষী, তৃণ, লতা, ফুল, ফল, গাছের বিবর্তনাদির কথাও প্রাসঙ্গিক হয়েছে। পরবর্তী অর্থাৎ তৃতীয় পরিচ্ছেদে (১০৮-১৩৯ পৃ.) নদীমাতৃক বাঙলার নদীর শাসনের কথা তুলে ধরা হয়েছে। বাঙালী জীবনে নদীর ভূমিকা, পুরাতাত্ত্বিক খনন ও আবিষ্কারের নিরিখে বাঙালীর অতীত বিশ্লেষণ এবং বাঙলার কীর্তিগাথার আলোচনা করা হয়েছে। উভয় বাঙলার পুরাবৃত্ত আবিষ্কারের মারফত নদী এবং নদী-অনুসারী দেবদেবী ও সভ্যতার বিবরণও দেওয়া হয়েছে এই পরিচ্ছেদে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে (১৪০-১৫৭ পৃ.) লোকবৃত্তের সংজ্ঞা, চরিত্র বিশ্লেষণ ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করা হয়েছে। সরল করে তুলে ধরা হয়েছে লোকবৃত্ত চর্চার সার্থকতার তথা প্রয়োজনীয়তার কথা। পঞ্চম পরিচ্ছেদে (১৫৮-১৬৬ পৃ.) বাঙলার পূজা পার্বণ, উৎসব ও মেলার তাত্ত্বিক আলোচনায় কয়েকটি নক্সায় বাঙলার বিভিন্ন মেলা ও উৎসবাদির চিত্ররূপ প্রকাশিত হয়েছে, যা সম্ভবত বাঙালীর পূজা পার্বণ-মেলা ও উৎসব

সম্পর্কে পাঠককে নতুন করে ভাবিয়ে তুলবে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে (১৬৭-২১৩ পৃ.) বাঙলার ব্রতের পরিচয় এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা স্থান পেয়েছে। নানা তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ এই আলোচনাকে আয়ত্তে রাখতে এখানেও কয়েকটি নক্সার সাহায্যে ব্রতের চারিত্র্য, শ্রেণী ইত্যাদির বিভাজন দেখান হয়েছে। এই পরিচ্ছেদে বাঙলার ব্রত সম্পর্কিত একটি সর্বাঙ্গীণ আলোচনা স্থান পেয়েছে সপ্তম পরিচ্ছেদ (২১৪-২৭০ পৃ.) লোকক্রীড়ার আলোচনায় মুখর। বিভিন্ন লোকক্রীড়ার উৎপত্তি ও ব্যাখ্যা, লোকক্রীড়া সম্পর্কিত ছড়া, গান ইত্যাদি এই পরিচ্ছেদে স্থান পেয়েছে। এখানেও কয়েকটি নক্সার সাহায্য নিয়ে জল, স্থল ও অন্তরীক্ষের খেলা সমূহের শ্রেণী ও চরিত্র বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিশোর ও কিশোরীদের খেলা, ছেলেমেয়েদের খেলা, যুবক-যুবতীদের খেলা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের খেলা, আনুষ্ঠানিক খেলা সব নিয়েই আলোচনা আছে। সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে নৌকাবাইচ, ঘুড়িখেলা, ছোরা-লাঠি-অসিখেলা, সিঁদুর খেলা প্রভৃতির উপর। তাছাড়া, পুতুলখেলা,কপাটি, এলাডিং-বেলাডিং, উপেনটিবাইস্কোপ, বুড়াবুড়িখেলা প্রভৃতির উপরেও আলোচনা আছে। অষ্টম পরিচ্ছেদে (২৭১-৩৫৩ পৃ.) তিনটি গ্রামের বিস্তারিত বিবরণ আছে। মুখ্যত, 'ফিল্ড ওয়ার্কের' ভিত্তিতে গ্রাম-সমীক্ষায় বাঙলার গ্রামের মানুষ, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, গৃহপালিত পশুপক্ষী প্রাণী, গাছপালা, ফুল লতা প্রভৃতি সকলের ভূমিকা ও অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রামের মানুষদের মধ্যে থেকেও কিছু কিছু টাইপ ও জীবন্ত চরিত্র বেছে নিয়ে তাঁদের সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। যেমন নসাঠাকুর, পণ্ডিতমশাই, রাঙ্গাপিসি,নাগগিন্নী, সেনমশাই, মিস্ত্রিরমশাই, পতাকী, সোলেমান, রাজিয়া প্রভৃতি। এই আলোচনায় ভামরুলের হুল, খড়ের গাদায় আগুন, ছাগল গরু ছেড়ে দিয়ে শস্য নষ্ট করবার চেষ্টা, ছিচকে চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। আলোচিত হয়েছে গ্রাম্য শালিশী, মামলা, হিজড়া, উঠতি গুণ্ডা ও মস্তানদের কথাও। নবম পরিচ্ছেদে (৩৫৪-৪৭৪ পৃ.) লোকজীবনের আচার-আচরণ, সংস্কার, কুসংস্কারের আলোচনা, যাদু ও ইন্দ্রজাল, গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা, পীর-গাজী বিবি-সাহেবদের ভূমিকা, কথকতা, নর ও নারীর শিল্পচেতনা, অরন্ধন,জন্ম,সাধ,বিয়ে,শ্রাদ্ধ,মহালয়া-শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কৃত্যাদির বিস্তৃত আলোচনা, স্ত্রীআচার, কবচ-তাবিজাদি ধারণ বিধি, বিবাহ—বাল্যবিবাহ, দ্বিতীয়বিবাহ, বিধবাবিবাহ, বলিপ্রথা, সতীপ্রথা প্রভৃতি স্থান পেয়েছে। এইসব আলোচনা করতে গিয়ে কেন বাঙালী সিদ্ধ চাউলের ভাতখায়,কেন অন্য রাজ্যবাসী আতপ

চাউলের ভক্ত, তার আলোচনাও আছে। এই পরিচ্ছেদে লোকধর্মের এবং গ্রাম্য দেবদেবীর আলোচনাও স্থান পেয়েছ, স্থান পেয়েছে পীর গাজীদের দরগায় মানত, জলপড়ার কথাও। দশম পরিচ্ছেদে (৪৭৫-৪৯১) আলোচিত হয়েছে টোটকা ও প্রাকৃতিক চিকিৎসার উপর গ্রামের মানুষের নির্ভরশীলতার কথা। এখানে বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে গ্রাম-সমীক্ষার মাধ্যমে বাঁকুড়া ও হুগলির গ্রাম্য চিকিৎসকদের সহযোগিতায়। রমন মুখুজ্যে, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাধিকা সর্দারের মত চিকিৎসকের অভাব নেই বাঙলার গাঁয়ে ভূঁয়ে, সেখানে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত চিকিৎসককেও অনেক সময় হাতুড়ে-গিরি করতে হয়, অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদী ও টোটকা সব মিলিয়ে চিকিৎসা না করলে উপায় থাকে না, পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিভিন্ন শিল্পকলার আলোচনা করা হয়েছে। এই বা একাদশ পরিচ্ছেদে (পৃ. ৪৯২-৫৬৮) আহার ও রন্ধন শিল্পের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সাজ-সজ্জার উপরও। পোষাক পরিচ্ছদ আহার-বিহারের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ শিল্প ও বাণিজ্যের দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে, নজর দেওয়া হয়েছে কাঁথা, আলপনা প্রভৃতি গৃহশিল্পের উপর। সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, বাঙালীর রক্ত ও পদবী ব্যবহারের কথা সমাজ বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিকোণ থেকে। এক কথায় লোক জীবনের সামগ্রিক শিল্প-ভাবনার ও লোক সমাজের সার্বিক কাঠামোর একটি তথ্যচিত্র উপহার দেওয়ার প্রয়াস করা হয়েছে এই পরিচ্ছেদে। দ্বাদশ পরিচ্ছেদ (৫৬৯-৬২৬ পৃ.) আছে গ্রন্থকারের অবতরণিকা থেকে উদ্ধৃতি এবং সেই সব উদ্ধৃতি স্পষ্ট করতে মহাজন প্রসাদ। নৃ এবং সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেই সমগ্র পরিচ্ছেদ তথা গ্রন্থালোচনা করা হয়েছে। তা করতে এসে সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সমাজ-ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদানও কাজে লাগান হয়েছে। সুতরাং এ গ্রন্থ সমাজ-বিজ্ঞান, সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজ ইতিহাসের ছাত্রদের এবং উৎসাহী ব্যক্তির বিশেষ কাজে আসবে এরূপ মনে করা বোধহয় অসঙ্গত হবে না। অবতরণিকা থেকে মোট ৩৯টি উদ্ধৃতি তুলে মহাজনদের বিবৃতির সাহায্যে গ্রন্থকর্তার বিনীত বক্তব্য স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই মহাজনদের মধ্যে বাঙলার ভাবৎ পণ্ডিত ও গুণী সমাজের মনীষী আছেন, যাঁদের অনেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে এক একজন দিকপাল।

লোকজীবনের পরিধি সুবিস্তৃত ও অতি ব্যাপক। লোকবৃত্তের পরিধিও সুদূর প্রসারিত। সুতরাং বর্তমান পরিসরে লোকজীবন এবং লোকবৃত্তের

সর্বব্যাপক পরিচয় প্রদান সম্ভব নয়। তথাপি বর্তমান অবস্থায় লোকজীবন এবং লোকবৃত্তের যতটা বিবরণ দেওয়া সম্ভব তা লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছে। সরস আলোচনার মাধ্যমে লেখক বাঙালী জীবন, বাঙলার স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী, বাঙলার গ্রাম, বাঙলার সমাজ-সাহিত্য ও সংস্কৃতির অপেক্ষাকৃত অবহেলিত দিক সমূহের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে যে, বাঙলা ও বাঙালী বলতে লেখক পশ্চিমবঙ্গ এবং নতুন রাষ্ট্র বাঙলাদেশ উভয়ের জনসমষ্টি এবং উভয় রাজ্যের ভৌগোলিক সীমানাকে বোঝাতে চেয়েছেন। সকলেই জানেন যে প্রাচীন ও গৌরবোজ্জ্বল বাঙালী জীবনে নানা কারণে অবক্ষয় নেমে এসেছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার হঠাৎ বাঙালীয়ানার একটি নতুন আলোক বাঙলাকে নতুন করে জনসমক্ষে তুলে ধরেছে।

এই আলো আগমনের তাৎপর্য বুঝতে হলে বাঙলার সমাজ-ইতিহাস-সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারাকে জানতে হবে, জানতে হবে বাঙলার ঋতু-প্রকৃতিগত বৈচিত্র্যকে। বাঙালীর আচার-আচরণ, আহার-বিহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, ধর্মকর্ম, খেলাধূলা, নদীর শাসন, প্রকৃতির প্রভাব প্রভৃতিকেও জানতে হবে জানাতে হবে। জানাবার কাজে জীবনঘনিষ্ঠ তথ্যের দ্বারা বাস্তবচিত্র তুলে ধরতে হবে জনসমক্ষে। বর্তমান গ্রন্থে এই বিষয় সমূহের খণ্ডচিত্র পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। এ গ্রন্থে কিছু তথ্য ও তত্ত্ব বিশ্লেষণ আছে, সে কাজ আরও ব্যাপকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রয়োজনীয়তা আছে। তা একক প্রচেষ্টায় না করে সমষ্টির উদ্যমে করাই উচিত এবং যুক্তিযুক্ত। কারণ বর্তমানে আমরা মানব ইতিহাসের এমন একস্থানে এসে দাঁড়িয়েছি যেখানে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা তত কাজে আসছে না যত আসছে সমষ্টিগত প্রচেষ্টা। সঙ্ঘশক্তি, মুক্তবুদ্ধি এবং বিবেক অনুযায়ী কাজ এ যুগের প্রধান কথা। উনিশ শতকের প্রতিভা বা মনীষায় আজ আর তেমন কাজ হচ্ছে না। সে প্রতিভা আরেক প্রকারের ছিল। এখন প্রজাতন্ত্র, জনতন্ত্র, স্বাধীন চিন্তা ও বিবেকের বা যুক্তিবুদ্ধির দিনে বাঙালী চৈতন্যের প্রধান অঙ্গ সঙ্ঘশক্তি, জাতীয়তা, ধর্ম-নিরপেক্ষতা ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তা। এই কথা মনে রেখেই বর্তমান গ্রন্থের পরিকল্পনা ও সৃষ্টি। যাদের জন্য রচিত হয়েছে এ গ্রন্থ তাদের কাজে লাগলে লেখকের শ্রম সার্থক হবে।

—শঙ্কর সেনগুপ্ত

সূচীপত্র

যাদের গীতি একদা তুষারধবল হিমালয়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, সাগর থেকে সাগরান্তরে যাদের অর্ণবপোত তরঙ্গ লীলাবিভঙ্গে নৃত্যান্বিত ছিল, আজও যাদের জীবনমন্ত্র সুনীল-সায়রের জলোচ্ছ্বাসে স্তূয়মান —সেই ময়ূখমালা প্রাচী গগনোপান্ত সমুদ্ভাসিতকারী বাঙালীর সমাজ-বৃত্তান্ত অনুধাবনে বিস্মৃতির ভগ্নস্তূপে আশার ফুৎকারে স্মৃতির স্ফুলিঙ্গ দীপ্তিমান হবে, স্মরণাতীত আদর্শ-আলেখ্য পরিস্ফুট হবে। প্রতীত হবে জড়প্রকৃতির বলে প্রপীড়িত হয়েই ভীতত্রস্ত বাঙালী দেবভক্ত কি না, যাবতীয় কর্ম দেবানুকম্পায় সাধিত হয় কিনা, যাবতীয় অমঙ্গল দেবতার অপ্রসন্নতায় ঘটে কি না।

পুরাণেতিহাসের দেবসঙ্কীর্তনের মধ্যে মানুষকে বাদ দিয়ে শুধু দেবতার অথবা দেবতার আংশিক অবতার ও দেবানুগৃহীত মানুষের কথাই বা কীর্তিত কেন? কেন সেখানে সামাজিক মানুষের, সাধারণ মানুষের স্থান নেই? কেন মনুষ্যের প্রকৃত কীর্তির বা লোক-জীবনের বার্তা নেই? এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে স্মরণ করতে হবে সেই প্রতিভাদীপ্ত বাঙালী জাতির প্রাচীন জীবন ও সাধনাকে, যারা জীবনকে শ্রীমণ্ডিত করার উপাসনা করত, বিরোধী শক্তিকে পরাজিত করে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হত। কালে এই বিজয়ী বাঙালী এমন সমাজ গঠন করল যেখানে শিশু থেকে যুবক, চণ্ডাল থেকে ব্রাহ্মণ সকলের



সমন্বয় সাধিত হয়েছিল। আকাশ ছিল তাদের ছাদ, তারা ছিল বিস্তারশীল, এবং দিগন্ত ছিল তাদের দেশের সীমানা। স্বাভাবিক পরিপূরক হিসাবে জীবনের নৃত্যে বাঙলার নারী ও পুরুষ সঙ্গীতের সংযোগ করত, পারিবারিক জগতে বিস্তারলাভ করত। সকলের প্রয়োজন মিটত, জীবনভোর তাই উৎসবের আয়োজন। সে উৎসব সম্পূর্ণতালাভ করত সমাজের সকল অঙ্গের

সহযোগিতায়—ধোপা, নাপিত, চামার, ঝাড়ুদার সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উৎসব অনুষ্ঠিত হত। এই জনগণেশের সঙ্গে মেলামেশা করতে হলে চলে যেতে হবে বাঙালীর সমাজ-ব্যবস্থার আঙ্গিনায়, গ্রাম ও শহরের জীবনধারণ প্রণালীর আলোচনায়, বাঙালীর অর্থনৈতিক জীবন, ধর্মীয়-অনুশাসন, আচার-আচরণ ও নির্দেশাদির ব্যাখ্যায়, উৎসব-অনুষ্ঠান, নাচগান, খেলাধূলা অর্থাৎ অঙ্গন ও প্রাঙ্গণের কৃত্যাদি পর্যবেক্ষণে।

বাঙলার আকাশ-বাতাস, মাটি-প্রকৃতি, ঋতু-বৈচিত্র্য, নদ-নদী, বাঙলার স্ত্রী-পুরুষ সকলের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে আন্তরিক হয়ে, সকলের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনায় অংশ নিয়ে জাতীয় চরিত্রের মর্মোদ্ঘাটন করতে না পারলে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য ব্যক্ত হবে না। অপরের চোখ দিয়ে এ জিনিস দেখা যায় না। সচেতন এবং অনুসন্ধানী মন ও মনন নিয়ে অতীতকে প্রত্যক্ষ করতে হবে, সারা দেশ ঘুরে বেড়াতে হবে সঠিক তথ্য ও উপাদান সংগ্রহের আশায়। বর্তমানের পদচারণা অনুধাবনের জন্য তথা আলোকিত ভবিষ্যতের জন্য হবে আমাদের এই আন্তরিক প্রয়াস।

বাঙালীর অন্যতম গর্ব বাঙলার লোক-সমাজ। বর্ণাশ্রমপ্রথাবদ্ধ হিন্দু বা ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চতর বর্ণের এবং অহিন্দু বাঙালীর সমাজ সংবাদ-সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে লোকজীবন এবং আদিবাসী তথা উপজাতি ও খণ্ডজাতি সমূহের বা সমগ্র বাঙালীর চিরচঞ্চল জীবনধারার যথার্থ পরিচয় জানতে হবে। জনসাধারণের, লোকসমাজের নিজস্ব ও খাঁটি বৃত্তান্ত জানতে হবে। বাঙালীর জীবনাচরণে, বাঙালীর বাসভূমিতে, বাঙলার ঋতু-বৈচিত্র্যে, নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীতে, নদ-নদীতে, আকাশ-বাতাসে যে বৃত্তান্ত ছড়িয়ে আছে, বহুধা



ব্যাপ্ত ও সঞ্চরণশীল সেইসব বৃত্তান্ত আমাদের আকর বিশেষ। লোক-জীবনের সঙ্গে একাকার হয়ে যেতে না পারলে সে বৃত্তান্ত বা আকর সংগ্রহ অসম্ভব। এবং একাত্ম হয়ে মিলেমিশে যেতে হলে প্রাচীনের প্রতি, গ্রামীণ জীবনচর্যার প্রতি অকারণ অবজ্ঞা পরিহার, লোক-জীবন ও লোক-সমাজের প্রতি সশ্রদ্ধ হওয়া যে কোন ব্যক্তির পক্ষে প্রাথমিক কর্তব্য। এই শ্রদ্ধা থেকে আসে

ভালবাসা, ভালবাসা থেকে আসে ভূমির প্রতি টান, এই শ্রদ্ধা-ভালবাসা-ভক্তির গুণে জন্মভূমি হয়ে ওঠে জননীর তুল্য গরীয়সী, মাতৃভাষা হয়ে ওঠে গঙ্গার মত পবিত্র। তখন কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

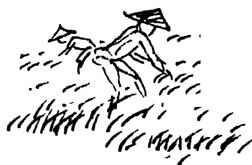
ঘন রসময়ী গভীরা বক্রিম, সুতগোপজীবিতা কবিভিঃ

অবগাঢ়া চ পুণীতে—গঙ্গা, বঙ্গাল বাণী চ

অর্থাৎ ঘন রসময়ী গভীর নদী আঁকাবাকা, যার গতি সুন্দর ও ঐশ্বর্যশালিনী, এবং বহু কবি যাকে আশ্রয় করে আছেন, সেইরূপ ভাষা বাঙলা, এবং নদী গঙ্গা। এই দুই প্রবাহে অবগাহন করলে মানুষ পবিত্র হয়। পবিত্র মনের অধিকারী বাঙালী। কেননা, উভয় প্রবাহে অবগাহন তার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এই কারণেই যে নদী-মাঠ-বন, ধূলো-কাদা-মাটি পিতৃপুরুষদের চরণ-চার হয়েছিল তা আমাদের পূজনীয়। একান্তই আমাদের প্রাণাধিক প্রিয়। তা হল আমাদের স্থিতির সাক্ষী।

আমাদের যা আছে তা ভাল, যা ছিল তাও ভাল, দেশভক্তির এই চেতনাই আমাদের জীবনের সার কথা। এই চেতনা থেকেই আসে দৃঢ় প্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয়। পর-প্রত্যয়ে চলা, ওঠা, বসা, স্তব-স্তুতিতে শান্তি থাকে না, শেষ পর্যন্ত মুক্তি খোঁজে মন।

প্রাচীন বাঙালীর সমাজ ও লোক জীবনকে অন্তরঙ্গভাবে জানতে গিয়ে স্বাভিমান জাগ্রত হতে পারে, অহং স্বপ্রকাশ হতে পারে। কারণ, অহঙ্কার করার মত বা শ্লাঘনীয় জিনিসের অভাব নেই বাঙালীর। আত্মসচেতনতাজনিত অহঙ্কার অনেক স্থলে কল্যাণের কারণ। অহংবোধ, আত্মাভিমান ও জাগৃতি ছাড়া যে বাঙালী তাকে বাঙালীপদবাচ্য বলে গ্রহণ করতে অনেকে দ্বিধাগ্রস্ত।



উদার-অনুদার সকলেরই অভিমানের প্রয়োজন আছে, এ অভিমান দম্ভ নয়, এ অভিমান সপ্রতিভ চেতনা। সকল বাঙালীরই অসঙ্কোচ চেতনা চাই, দুর্যোধনের মত সকলেরই অভিমান চাই। নিজ বীজ-সৃষ্ট কুরুকুল ধ্বংস হয়ে গেলেও যিনি অভিমানে অটল ছিলেন তিনি বাঙালীর আদর্শ।

অভিমান অর্থে অহঙ্কারও। মান-বোধ ঠিক হলে অভিমানীর দর্প বা

দম্ভ আসে না। অভিমানী অকারণ দম্ভ প্রকাশ করে না। আচার আচরণে আত্মসংযম করে সে দেশ ও জাতি সম্পর্কে সপ্রতিভ হয়, সচেতন হয়। প্রয়োজনে মাটির মানুষ সে আবার প্রয়োজনে দম্ভের চূড়ায় গিয়ে বসে। এই দম্ভই আত্ম-প্রত্যয়। এই দম্ভে আস্ফালন নেই। এই দম্ভে বাস্তবিকই যা প্রকাশিত তা হচ্ছে নিজেকে, সমাজকে, জাতিকে ও দেশকে জানার ও চেনার সাধনা। এবং এদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজনে চাই বিদ্রোহ, প্রয়োজনে চাই আপসহীন সংগ্রাম। এই দম্ভ তাই শূন্যগর্ভ নয়।

দেশকালধৃত বাঙালী-সমাজ সম্বন্ধে যথার্থ তথ্য লৌকিক ধর্মানুষ্ঠান, দেবদেবী, আচার-আচরণ, ব্যবহার, জীবনচর্যা ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে নিহিত। বিভিন্ন বর্ণ, শ্রেণী, পরিবার গোষ্ঠী, কুল ও গোত্রে বিভক্ত বাঙালী নানা ধর্মীয় অনুশাসনে শাসিত, এবং স্বভাবতই অগণিত ভাবধারা, উচ্ছ্বাস, আবেগ, বেগ, উদ্বেগ ও বিদ্রোহ-বহ্নির তাপে তাপিত।

রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা লোকসমাজের দৈনন্দিন জীবনাচরণে ওতপ্রোত নয়। তাই রাষ্ট্রকাঠামোর পরিবর্তন বা অদল-বদলে লোক-জীবনে খুব একটা চাঞ্চল্য দৃষ্ট হয় না। এক রাজার বদলে আরেক রাজা, এক সরকারের বদলে আরেক সরকারকে প্রকৃতির রাজ্যের নিয়মাধীন ব্যাপার বলেই তারা মনে করে। যদিও নাগর-সমাজ বা সমাজের উচ্চস্তরের অধিবাসীদের অনেককে রাষ্ট্রযন্ত্র পরিবর্তনে অনেক সময় বিব্রত হতে হয়। আত্মকেন্দ্রিক ও বিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের প্রায়শই অসুবিধা হয় আখের গোছাতে। কিন্তু তবুও তারা ভদ্রতার নামাবলী গায়ে জড়িয়ে



সভ্য সেজে লোক-সমাজকে অসভ্য, বর্বর, গ্রাম্য বলে চিহ্নিত করতে পারে, গ্রাম ও গ্রামীণ মানুষকে করুণার চোখে দেখতে পারে, এবং ভদ্র ও সংস্কৃত সেজে ইনিয়েবিনিয়ে কথা বলে নিজেদের সংসারাভিজ্ঞ শিক্ষা ও সংস্কৃতির দৈন্য লুকিয়ে রাখতে পারে।

প্রাচীন বাংলায় রাজা ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব ছিল সমাজব্যবস্থাকে রক্ষণ

ও পালন করা। সমাজ আছে বলেই রাষ্ট্র এবং রাজা বা মন্ত্রী আছেন। সমাজহীন রাষ্ট্র কল্পনা করা যায় না। পুণ্যকর্ম, দানধর্ম, জলাশয়, আতুরশালা, বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষাদি রোপণ, সবই সমাজের জন্য, সামাজিক মানুষের হিত ও মঙ্গলের জন্য।

রাজতন্ত্র উচ্ছেদ হওয়ায় রাজার কাজ রাষ্ট্র বা রাজপুরুষেরা করে যাচ্ছেন, তাঁরা অবশ্যমান্য। তাঁরাই রাজার স্থানে ন্যায় ও ধর্মের দণ্ড ধারণ করে আছেন। দণ্ডধরদের জাত নেই, কুল নেই, ধর্ম নেই, তাঁদের তুল্য আসন কারুর নেই, তাঁরা সবার উপরে। এই উপরের বা উঁচুতলার লোকেরা কিভাবে রাষ্ট্রযন্ত্র চালাচ্ছেন, কিভাবে তাঁরা লোকসমাজ, আদিবাসী, তপশীলীজাতি, উপজাতি, খণ্ডজাতি, বিমুক্তজাতি ও অপরাপর ক্ষুদ্র জাতির সমাজ-সমস্যা দূরীকরণে চেষ্টিত বা আগ্রহী তা জানতে হবে সত্যের মুকুরে। জানতে হবে রাষ্ট্র, রাজপুরুষ, শাসক, শোষক, শিল্পী, বণিক, ব্যবসায়ী, ভূম্যধিকারী, কৃষক, শ্রমিক, কুলি-কামিন, চাকুরীজীবী, ছাত্র, শিক্ষক, সমাজসেবক, দেশসেবক, অকীর্তিতান আচণ্ডালান সকলকে, সকলের ক্রিয়াকর্ম, ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণী বিন্যাসকে, দৈনন্দিন জীবন, জনপ্রবাহ ও বাস্তবতাকে। জানতে হবে ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, ঋতু-বৈচিত্র্য ও লোক-প্রকৃতিকে। জানতে হবে শিল্পকলা, শিল্পজাত দ্রব্য, আহার-বিহার, সামাজিক-ইঙ্গিত, শারীর-ক্রিয়া, বসন, প্রসাধন, গার্হস্থ্য শিল্পচর্যা, লৌকিক ধ্যান-ধারণা; মিলন-সংঘাত, সংস্কার, আচরণ, আঞ্চলিকতা, সঙ্কীর্ণতা, হৃদয়াবেগ প্রভৃতিকে। এইসব নিয়েই বাঙালীর সমাজ ও সামাজিক পরিবেশ। এই



সমাজের আদর্শ-আলেখ্য পরিস্ফুট হতে পারে সঠিক সংবাদসংগ্রহে, আন্তর মনীষার মুকুরে, গবেষকদের গবেষণায়, ঐতিহাসিকদের চোখে, সমাজ ও দেশনায়কদের দেশাত্মবোধে এবং শিক্ষিত-অশিক্ষিত জানা-না-জানা লোকেদের স্বাজাত্যভিমান ও স্বদেশচিন্তায়।

স্মরণীয়, নিরবচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র সমাজগোষ্ঠী বা বৃহত্তর সমাজ সকলেরই

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। সঙ্ঘবদ্ধতার মাধ্যমে হয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা। যদিও সমাজের গতি ও অর্থনীতির গতি সমান নয়, ঋজুও নয়। উত্থান-পতন, পতন ও উত্থান এরূপ বক্র। যাঁরা নীতিজ্ঞ তাঁরা দেখেন কিসে উদ্‌গমন ও অবনমন, বিচার করেন কিসে সমাজের গতিপ্রকৃতি ঋজু না হয়ে তরঙ্গের ন্যায় বর্তুল হয়।

মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ ও সমাজের নিরাপত্তার জন্য অনুশাসন ও আদর্শবাদের সৃষ্টি। দুর্বিপাক থেকে আত্মরক্ষা করতে, অবাঞ্ছিত উপদ্রবের হাত থেকে উদ্ধার পেতে, নানা আচরণ ও বিশ্বাসের অবতারণায় এবং মানসিক বা আবেগ প্রশমনের জন্য বিধিনিষেধ, ক্রিয়াকাণ্ড ও মিলনের স্বীকৃতিই সমাজ সচেতনতার মৌল রূপ। জীবমাত্রেরই কিছু সহজাত বৃত্তি, যেমন ক্ষুধা, ক্রোধ, ভয়, যৌনতা ইত্যাদি আছে, এই সবের সুসমঞ্জস নিয়ন্ত্রণই সমাজ সংস্কৃতির গতিশীল দিক। এই সবের চরিতার্থে সমাজে গঠন-বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। সমাজগঠন এই বৈচিত্র্যেরই যোগফল।

সমাজসত্তার রজ্জু বেয়ে আসে সংস্কার। সেই সংস্কার ক্রমে রক্তমাংসে জড়িয়ে যায়। বংশানুক্রমে পুত্রপৌত্রাদির মধ্যে তা সঞ্চারিত হয়। সংস্কার যখন বদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ হয় তখন আসে তার অন্ধকার দিক, কুসংস্কার, আসে উচ্চ-নীচের বিরোধ। এই বিরোধে কোন পক্ষেরই শান্তি নেই। সহযোগিতা, যা সমাজ-বন্ধনের প্রাথমিক সর্ত, তা-ই অন্তর্হিত হয়। এই বিরোধ যতটা সামাজিক, যতটা রাজনৈতিক, ততটা আত্মিক বা আন্তরিক নয়। তাই এই বিরোধের মধ্যেও দেখা যায় মিলন, মিলনের মধ্যেও দেখা যায় বিরোধ।

লোকবৃত্ত আলোচনায় দেখা যাবে যে লোকবৃত্তে এই মিলন ও বিরোধ



উভয়েই উভয়ের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলেছে। সেইজন্যই বাঙলার লোকবৃত্ত বাঙলার লোকদর্শন। সেখানে আছে বাঙলার অশ্রান্ত বিরোধধারার সুরে মহামিলনের তান। এই ভবনদীই অথৈ জীবননদী।

ভালভাবে মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরে স্বর্গলাভ বা ভাল থাকা বাঙালীর কাম্য বা জীবনদর্শন নয়। বাঙালীর সাধনার মূল লক্ষ্য—কিসে সে ভালভাবে

বাঁচতে পারে। খেয়েপরে বাঁচা তার জীবনাদর্শ, মৃত্যুর পরের চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই তার। দয়া-মায়া-মমতা ও ক্ষমায় ঘেরা গার্হস্থ্য ধর্মই তার সমাজ-জীবনের অন্যতম ভিত্তি।

বাঙালী তার নিজস্ব জীবনদর্শন ও আদর্শ বজায় রেখেও ভারতীয় চিন্তার সঙ্গে মিলেমিশে যেতে পেরেছে, ভারতীয় চিন্তার মূলধারায় অবগাহন করেও নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পেরেছে। এই জন্যই সে অতি রোমান্টিকতার সুগভীরে পরম-প্রেয়কে পাওয়ার আর্তি জানাতে পারে, অচিনপুরের মনের মানুষের খোঁজে পাগল হতে পারে, মনমাঝিকে বৈঠা ছেড়ে দিয়ে উদাসী হতে পারে, 'কোথায় পাবো তারে' গান গাইতে পারে।

বাঙলার মধ্যে বাঙালীর মধ্যে মানুষের স্বর্গ গড়ে তোলার সাধনা প্রতিফলিত। তাই বাঙলার শুভার্থী নেতৃবৃন্দ গ্রামবাঙলার সঙ্গে যোগাযোগ নিবিড়তর করতে, গার্হস্থ্য-জীবনকে সোনামাখা করতে উপদেশ দিয়েছেন।

যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তার মধ্যে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য আছে বলেই বৈদিক যাগযজ্ঞ সর্বতোভাবে গ্রহণ করে নি সে। বৌদ্ধধর্মমতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েও বাঙালী বৌদ্ধ মহাযানমতকে বজ্রযান, সহজযান ও তন্ত্রসাধনার পথে বিবর্তিত করতে পেরেছে। নাথযোগীদের কায়া-সাধনা এবং হিন্দু শক্তি-সাধনার সঙ্গে বৌদ্ধভাবনা যুক্ত করে হিন্দু বৌদ্ধ ভেদ লুপ্ত করে দিয়েছে, বাঙালীয়ানার জয়গান গেয়েছে। তাই বাঙলার আউল-বাউল-সুফী সম্প্রদায় দেহভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের খোঁজ করে। বাঙলার বৈষ্ণব সর্বজীবে প্রেম বিতরণ করে।

বাঙালীর চোখে ঈশ্বরের নরলীলাই সর্বোত্তম। তাই নরমুণ্ডমালিনী কালী



করালী বাঙালীর স্নেহময়ী জননী, দশভূজা দুর্গা বাঙালীর পরমাদরণীয়া কন্যা। অহিন্দু বাঙালী দরাফ খাঁ রচনা করে গঙ্গাস্তোত্র, জনাব আলী, নজরুল গায় শ্যামা-সঙ্গীত। তাই পীর ফকির গাজীদের কাছে মাথা নোয়ায় শত শত হিন্দু, তারকেশ্বরের শিব মন্দিরে চেরাগ জ্বালায় মুসলমান, যবন হরিদাস বাঙালীর কাছে হয়ে ওঠেন ব্রহ্ম হরিদাস, দেহান্তের পর তাঁর বিগতপ্রাণ দেহ বুকে

জড়িয়ে কাঁদেন প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য, ব্রাহ্মণোত্তম অদ্বৈত আচার্য করেন রীতিসিদ্ধ পিণ্ডদান।

শাস্ত্রীয় কাঠামোর মধ্যে বাঙালী সৃষ্টি করেছে কীর্তন। বাঙালী উপহার দিয়েছে বাউল ও ভাটিয়ালী সুর। যে নব্য-ন্যায় মানব-মহিমার বিস্ময় তা-ও বাঙালীর দান। 'মিতাক্ষরা' মতের প্রতিবাদে বাঙালী দিয়েছে 'দায়ভাগ', দেবীবর ঘটকের 'মেল-বন্ধন', বৈষ্ণবদের 'কণ্ঠি-বদল', বাঙালীসমাজের ব্যভিচার রোধের কালিক প্রচেষ্টা। সমাজের প্রয়োজনে সামাজিক আইনকানুন অনুশাসনের পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছে সে। তাই চারশ' বছর বাঙালী দিল্লীর সুলতানের অধীনতা মেনে না নিয়ে স্বাধীন রাজ্য পরিচালনা করেছে। পরে নবাবী সৈন্যদের কাছে হেরে গিয়েও ভূস্বামীরা তাদের স্বাধীনতা রক্ষায় সংগ্রাম করে গেছে, বারো ভূঁইঞাদের লড়াইয়ের কথা কে না জানে। এই বৈশিষ্ট্য বাঙালীর পরম সম্পদ। বাঙলার লোকবৃত্তের উপকরণও এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিহিত। বাঙলার লোকবৃত্তে আবেগ আছে, জাতীয় চরিত্রের উপাদান আছে। সেইজন্যই লোকবৃত্তকে জানার ও চেনার প্রয়োজন আছে, অধ্যয়নের অবকাশ আছে।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন থেকেই শুনছি, 'এতদিন পরে বাঙালী লোকবৃত্তের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে'। কিন্তু বঙ্গীয় লোকবৃত্তের সাধারণ কর্মী হিসাবে প্রত্যক্ষের দূরবীক্ষণে যতটা বুঝতে সমর্থ হয়েছি তাতে হঠাৎ বাঙালী লোকবৃত্ত সচেতন হয়েছে বললে বোধহয় সত্য বর্ণন হয় না। অন্ততঃ লোকবৃত্ত চর্চার ক্ষেত্রে কবে যে সচেতন বাঙালী ঘুমের অসাড় অঙ্কে অচেতন হয়ে পড়েছিল তা এখনও বুঝতে পারি নি। তবে সবার চোখে সব মানুষ জাগ্রত বলে বোধ হয় না। যেমন প্রভুর ডাকের কিছু পরে পরিচারকের হাজিরায় বাবু বলেন—'কি



হে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিলে নাকি?' পরিচারক নির্বাক। কারণ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার গৃহকর্ম শুরু এবং সেই কর্মসমাপ্তিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়ায় প্রভুর ডাকের সঙ্গে সঙ্গে হাজিরা দিতে পারে নি সে। বিলম্বে আসার অপরাধে মনিব তাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাটিয়ে ছুটি দিলেন। বাড়ী ফিরতে বিলম্ব। বাড়ী ফিরতেই গিন্নীর গর্জন—'অফিস ছুটির পরে দারোয়ানের

খাটিয়ায় পড়ে ঘুমোচ্ছিলে নাকি ?' প্রয়োজনভেদে একের দৃষ্টিতে যা নিদ্রা, অপরের চোখে তা জীবন্ত উদ্যম, একের দৃষ্টিতে সা বাজে কাজ, অপরের চোখে তা অবশ্য কর্তব্য। শিশুর জাগরণ প্রকটিত হয় ক্রীড়ার অঙ্গনে, ছাত্র জাগরিত পাঠাগারে, রন্ধনশালার দিকে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায় গৃহিণী জাগরিত কি না। বাঙলার লোকবৃত্তের বিশালতার মধ্যে প্রবেশ করলে, বাঙলার লোক-জীবনের অন্বেষকদের দেখতে পেলে যে কোন লোক বুঝতে পারবেন, লোকবৃত্তের চর্চা আধুনিক কোন ব্যাপার নয়, যুগ যুগ ধরে এর সংরক্ষণ ও অনুশীলন হয়ে আসছে। যাঁরা বলেন, বাঙালী সম্প্রতি লোকবৃত্তের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, অথবা সাম্প্রতিক কোন কোন পণ্ডিত লোকবৃত্ত 'আবিষ্কার' করেছেন, তাঁরা অতীত ইতিহাসকে উপেক্ষা করছেন, জেগে ঘুমোচ্ছেন। নিঃসন্দেহে কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে লোকবৃত্তের অনুশীলন বা চর্চায় ব্যাপকতা ঘটেছে, স্বচ্ছতা এসেছে এবং সে বিজ্ঞানের রাজ্যে ছুটে চলেছে। এই ছুটে চলার পিছনে আধুনিক পণ্ডিত গবেষকদের দান অনস্বীকার্য। তাই বলে তাঁরা পথিকৃৎ বা 'আবিষ্কারক এ দাবী অসঙ্গত।

জাতীয় জাগরণ ও রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে বিষয় অধ্যয়নেরও রূপান্তর ঘটেছে। সুতরাং লোকবৃত্তের সঙ্গে সঙ্গে লোক-জীবনের সর্বস্তরে সন্ধানীদৃষ্টি ফেলার প্রয়াস চলেছে এখন। লোক-জীবনের যথাযথ ব্যাখ্যায় লোক-সমাজের গঠনমূল এবং গোষ্ঠী-জীবন নিয়ন্ত্রণের শক্তির উৎস প্রকাশিত। প্রকাশিত তাদের ঐক্যবোধ ও সমাজ-অবস্থার অভিযোজন, ভৌগোলিক পরিবেশ, আর্থিক কাঠামো, সামাজিক জীবনযাত্রা ও বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের সংগ্রামে বিক্ষত প্রবৃত্তিসমূহ। এইসব গবেষণায় সৃষ্টি হয়েছে নানা দল ও সঙ্ঘ। সমাজ ও সমাজের বাইরের কাঠামোর সঙ্গে তাল রাখার জন্য তৈরী হয়েছে



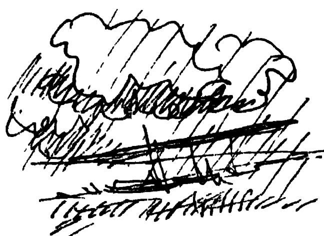
বিধি, সংস্কার, শাসন, অনুশাসন, বিবাহ, আত্মীয়তা, পরিবার, আইন ও সম্পদ। শিক্ষার পত্তন হয়েছে। পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী অনেক সময় ধর্ম ও সমাজ নিয়ন্ত্রণবিধির ইতর বিশেষ হয়। কেননা প্রকৃতির উপর, নৈসর্গিক আবেষ্টনীর উপর, অনুশাসনের তারতম্য হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সমাজের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যেই সর্বার্থ বিকাশ। পরিবর্তনের

সঙ্গে সমন্বয় সামাজিক মানুষের কাজ, পরিবর্তন ও সমন্বয়কে মেনে না নিলে সমাজ গতিবেগ হারায়। বাঙালীর রক্তেমাংসে পরিবর্তন, সমন্বয় ও গতিবেগ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে বলেই সে প্রাণচঞ্চল, সে দুর্বার, সে অপ্রতিরোধ্য, এবং সে সদা সম্প্রসারমান।

সদাসম্প্রসারিত বাঙালী তার বাঙালীয়ানাকে প্রাণের সমস্ত দরদ দিয়ে ভালবাসে। পরের ধনের প্রত্যাশী হবার প্রয়োজন নেই তার। বাঙলার স্থলে অন্ন, জলে মাছ। রসনারঞ্জন মধু তার গাছের লতায় দোলে, শাখায় ফলে, কাণ্ডে গলে। বসনের জন্য বাঙলার মাটি বাঙালীকে কার্পাস দেয়, বঙ্গরমণীর চারু-অঙ্গ সাজাতে কোটি কোটি কীট প্রাণপাত করে কুসুমকোমল রেশম উৎপাদনে। বাঙলার বনের পাতা ও ফুল বাঙালীর গহনার নমুনা গড়ে। বাঙলার লতাগুল্ম বাঙালীর ওষুধ জোগায়।

বাঙালী মস্তকে শিরোপা ধারণ করে না, আত্মনির্ভরতার অভিমানে সে ধুতি উত্তরীয়কে সমাজের মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। যত্রতত্র উপনিবেশ গঠন করেছে। যে ভেতো বাঙালী এত জাত্যাভিমানী সে হঠাৎ নিদ্রোত্থিত হয়ে জাতীয় জীবনের প্রতি আকৃষ্ট ও লোকবৃত্তের চর্চা শুরু করেছে—এমত কথনে সত্যের ব্যভিচার ঘটে বলে আমরা মনে করি।

একদা বাঙলার দামাল ছেলেরা ভারতে ও বহির্ভারতে উপনিবেশ গড়েছে, গৌড়-তাম্রলিপ্তি-সপ্তগ্রামাদি সমৃদ্ধ নগর গড়েছে। পাল-সেনবংশীয় নৃপতিবর্গ ভারতবর্ষের অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশে তাঁদের রাজত্ব প্রসার করেছিলেন এবং সামাজিক বিধি, রাষ্ট্রীয় অনুশাসন ও নয়া আদর্শবাদের



প্রচার ও প্রসার মারফত সর্বত্র শৃঙ্খলা বজায় রেখেছিলেন। সুদীর্ঘকালের প্রাচীন বাঙালী মানবতাবোধ, ধর্মবোধ ও জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে হিমালয়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে, যমুনাতটে, উৎকলের সাগরোপকূলে তদীয় বিজয় পতাকা ওড়াতে পেরেছিলেন। বহুধা বিস্তৃত ও জাতিভেদে কন্টকিত বাঙালী সুদূর অতীত থেকে অদ্যাবধি ভীষণা নদীর মতই প্রবহমানা। নদী থেকে যেমন উপনদী,

শাখানদী, খাল, বিল ইত্যাদির জন্ম, বাঙালীও তেমনি জাতি, উপজাতি, খণ্ডজাতি, বিমুক্ত জাতি. দল, উপদল, দ্বৈতদল ভ্রাতৃদল, বর্ণ গোষ্ঠী, পরিবার, কুল ও গোত্র ইত্যাদির মধ্যে বহুধা বিভক্ত।

আপন মনে আপনার খেয়ালখুশীতে নদী নিজস্ব পথ নিয়ন্ত্রিত করে, বাধাবন্ধ গ্রাহ্য না করে মুক্তধারায় মনের আনন্দে অবারিত গতিতে আপনার খেয়ালে তার গতিপথ ঠিক করে নেয়। কারো শাসন মানে না, কারও অনুরোধে কর্ণপাত করে না। দুর্বার ও তীব্রবেগে অভিমানী নদী কলকলরবে আপন মহিমাকীর্তি ধ্বনিত করে বয়ে যায়, এগিয়ে যায়। নদীর এই বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে যাবার গতি ও অহংবোধ বাঙালীর মধ্যে বর্তমান। সে দাম্ভিক, সে বিদ্রোহী, সে নিজের মনে চলে, নিজের ভাবে ভাবিত হয়। বাঙালীর চিন্তাধারা, সংস্কার, আচার-আচরণ, ধর্মবোধ, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, পাল-পার্বণ, উৎসব-অনুষ্ঠান, ব্রতকথা, শিল্পবোধ, পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার, পরিশ্রম ও বিশ্রামাদিতে সর্বত্রই তার বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য। সে চিরস্বাধীন, সে বাধাবন্ধহীন, সে দুর্বার, সে নদীর মত খরস্রোতা ও প্রকৃতির মত আদিগন্ত। ধর্মেকর্মে, সাহিত্যে, চিত্রে-ভাস্কর্যে, সমাজ-চিন্তনে, অভ্যাসে কোথায় নেই তার স্বাতন্ত্র্য ? নিন্দাস্তুতি উভয়কেই সে সমভাবে গ্রহণ করেছে। ভাবালুতা, হৃদয়ের-উত্তাপ অতিকথন ও অনুকরণের শিকার হয়েছে সে বারে বারে, কিন্তু খাঁটি বাঙালী অপরের মর্জির তাঁবেদারী করে নি কোনদিন।

বাঙালী এক সনাতন বটবৃক্ষ, কত ক্লান্ত পথিক এর ছত্রচ্ছায়ায় শান্তি পাচ্ছে, কত নভোচারী এখানে নীড় বাঁধছে। এখানে জাত-বেজাতের



বজ্জাতি আছে, ছোট বড়র কোন্দল আছে, নাম ও পদবী বদল করে ছোটর উপরে ওঠার প্রবণতা আছে। আছে দারুণ অনুকরণের সহজাত ব্যগ্রতা। উঁচুতে যারা উঠছে তারা ছোট বড় স্বীকার করছে, স্বীকার করছে না নিজেদের পতন, অর্থাৎ তারা বলছে—'তোমরা নীচে থাক, আমরা উপরে উঠি'। পৌরোহিত্যের আধিপত্য ও স্মৃতির শাসনে এই কলহ।

ব্রাহ্মণ-আত্মা ও ব্রাহ্মণ-হৃদয় এবং উপবীত শোভিত বক্ষঃস্থল একই বস্তু তা স্বীকার করা যায় না। বাঙলার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আধিপত্যের তপ্ত মদিরার মোহে অনেক সময় বিকৃত হয়েছেন, কারণ ঐ মদিরায় মস্তিষ্ক যতটা বিকৃত হয় বোতল-গর্ভস্থ সুরার তারল্যে ততটা তীব্রতা নেই। আবার এ বাঙালী ব্রাহ্মণই বন্যা নিয়ে এসেছে প্রেমের। সে বন্যা দুকূল ছাপিয়ে ওঠে, আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ তখন এক হয়ে যায়। অত্যাচারিতের তপ্তচোখের অনলপ্রবাহী স্রোতে অত্যাচার অবিচারের বীজ ধুয়েমুছে যায়, এটাই বাঙালীচরিত্র। এইখানেই বঙ্গসমাজে বাঙালী ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব।

পিতৃপিতামহ ও পুণ্যাত্মাপ্রবর্তিত বাঙালীয়ানার ঘৃতপ্রদীপের মঙ্গলশিখা আমাদের মস্তিষ্কে মোমবাতির কল্পনা জাগ্রত করেছে। মোমবাতি বলে দিয়েছে গ্যাসের সম্ভাবনা, এই গ্যাস সমকালে বিজলী আলোকের জ্যোতিতে বিভাসিত। সেই আলোকের রশ্মি বাঙালী জীবনের বিভিন্ন বিচিত্র বেশ পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য ও স্তর দেখতে দিয়েছে বলে তা দেখতে পাচ্ছি ও পাব যতদিন বাঙালীর প্রাণে ভাব ও রসনায় রব থাকবে, যতদিন বাঙলার লোকবৃত্ত আবহমানকালের চিন্তা ও ঐতিহ্য নিয়ে লোকজীবনের বার্তাদির জোগান দিয়ে যাবে, ততদিন অঙ্গন ও প্রাঙ্গণের কর্মরত বাঙালী, ভীরু, অলস ও কর্মবিমুখ বাঙালী খেয়ে-না-খেয়ে তদীয় আচার আচরণ কৃতকর্মাদির অনুষ্ঠান করে যাবে। লোকবৃত্ত আমাদের চোখে প্রাচীন ঐতিহ্যকে জানার কাজল পরিয়ে দিয়েছে। এই লোকবৃত্তের শক্তি ও মর্যাদাই বাঙালীকে সকলের চোখে বরণীয় করবে। কালপ্রভাবে রুচিভেদে লোকজীবনের পরিবর্তনহেতু



লোকবৃত্তের অঙ্গসজ্জায় বেশভূষায় অলঙ্কারাদিতে নতুন ও সমকালীন সামগ্রীর আমদানী হলেও তা লোকবৃত্তই থাকবে। তাই বাঙলার লোকবৃত্ত বাঙালীর একান্তই আপনার ও নিজস্ব রূপ প্রকাশ করে। নাগর-সভ্যতার তাড়নে লোকবৃত্ত ধ্বংস হবে এ আশঙ্কা অমূলক। প্রয়োজনের তাগিদে সে তার ছাঁচ বা বিন্যাস প্রণালী ও আঙ্গিক পাল্টাতে পারে, এটা তার জীবনীশক্তির পরিচয়।

বাঙালী একটি মূলধর্মমতের প্রশাখা-পল্লব-উপপল্লব কিংবা ছায়া-প্রচ্ছায়ার ধারক ও বাহক। এই মূল ধর্মমত থেকে যে যে প্রশাখা-পল্লব ও উপপল্লব সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী যত বেশী দূরবর্তী হচ্ছিল তত বেশী সে মূল থেকে বর্জিত ও পরিবর্তিত হচ্ছিল। তথাপি বাঙালী অসভ্য, বর্বর, বয়াংশি, বাঙালীর আশীর্বাদ গ্রহণে অনীহা প্রভৃতি সবই সে সহ্য করেছে। সমস্ত প্রকার নিন্দা ব্যঙ্গোক্তিকে উপেক্ষা করে সিদ্ধাচার্যের ঢঙে নিজ কর্ম সম্পাদন করে সে এগিয়ে গেছে। খরস্রোতা নদী যেমন নিজ ইচ্ছানুসারে আপনার গতিপথ নির্ধারিত করে, সে নির্ধারণে কখন একূল ভাঙে কখন ওকূল গড়ে, ভাঙাগড়া খেলার সর্বময়কর্তা সে নিজে। মানুষের প্রভাব প্রতিপত্তি তার কাছে তৃণাদপি তুচ্ছ। স্বইচ্ছায় নগর জনপদাদি তছনছ করে লণ্ডভণ্ড করে নদী এগিয়ে যায়। নির্ধারিত পথ পরিক্রমায় বা আবহমান একই পথে গতায়াত তার স্বভাব বিরুদ্ধ। এবম্বিধ স্বভাবযুক্ত বাঙালী স্থাণুর মত বা কূপোদকের মত জীবন যাপনে অনভ্যস্ত। সে নদীর মত দুরন্ত। তথাপি বাস্তবের অমোঘ নির্দেশে বাঙলা ও বাঙালীকে কখন কখন স্থির নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। এখানেই ফুটে উঠেছে বাঙালীর লোকজীবনের নির্ভেজাল চারিত্র।

তাই বাঙলাদেশ ও বাঙালী জাতি কি উপাদানে গড়া তা বাঙলার লোক-বৃত্তে নিখুঁত চিত্রিত। বাঙালী সমুদ্রে ও নদীপথে নৌকা চালনায় দক্ষ ছিল, বাঙলার কুমারী মেয়েরা ব্রতানুষ্ঠানের দ্বারা সমুদ্র-প্রবাসী স্বজনগণের নিরাপত্তা ও ঐশ্বর্যের জন্য প্রার্থনা করত। প্রার্থনা করত ঝড়বৃষ্টি থামাবার জন্য, হিংস্র ও বন্যপশু জন্তু জানোয়ারদের হাত থেকে পিতাভ্রাতাস্বামীদের রক্ষার



জন্য, নদনদী, বনবাদাড়, বাঘভাল্লুক, হাওয়া-ঢেউয়ের আলপনা এঁকে শতশত বার ঘরোয়া দেবতার কাছে নিবেদন করত তাদর মনের আকুতি। তাছাড়া, গঙ্গাস্নান, কলার-ভেলা জলে ভাসানোর মধ্যে, নানা কথা ও কাহিনীতেও পল্লী-যাত্রীদের জলযাত্রা ও জলযাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনার কথা ঘোষিত। বাংলার লোকবৃত্তের সর্বত্র এই ধরণের চিত্র ও তথ্য বর্তমান। তাই সেখানে

বাঙলামাটির চিত্তাকর্ষক ঘ্রাণ আছে। নদনদী, বনবাদাড়, গাঙচিল, কেয়াবন, নীপ বৃক্ষাদি আছে। আছে তাল ও চালের পিঠে, নারকেল ও ছানার সন্দেশ, মহুয়া খেজুর আখ ও তালের রসের নেশা। আছে কুমুদ পদ্ম কুন্দ কেলী শেফালী মালতী জবা অপরাজিতা মল্লিকাদি ফুল। আছে আম জাম কাঁঠাল হিজল ডুমুর তাল তমাল বেল আমলকী হরিতকী। আছে তুলসীবন, শটিগাছ, ভাঁটফুল, মুথাঘাস। আছে কিশোরীর চালধোয়া ভিজে হাত, শঙ্খচিল, ভোরের কাক, লক্ষ্মীপেঁচা, রূপশালী ধানভানা রূপসী, কাঁচারোদ, শাওড়া বন, বাঁশ ঝাড়, বেত বন, আঁধারের মশা, ফুটফুটে ফেটে-পড়া ছোট কচি লাল পেড়ে বউ, শিশিরের জল, মায়াবী নদীর পাড়, পোড়ো জমি, হিংসুটে বুড়ী, পাগলা নদী, বেপরোয়া পুরুষ, ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘ, চাঁদবদনী ধনির কালো হরিণ চোখ ও মেঘবরণ কেশ, লাল লাল বটফল, হাওয়ার চাবুক, বেতের ডগা, সোনাই দীঘি, তেপান্তরের মাঠ, পোয়াতী-করা ঘাট, গাজী বাউল দরবেশ পীরেদের আখড়া, বেগুনেমাই চটকিয়ে তৃষ্ণার্ত শিশুর তৃষ্ণা নিবারণের চেষ্টা। আছে ময়ূরের পেখম, ডাহুকের ডাক, সবৎসা গাভীর হাম্বা, ঘাটের বক, মাঠের শকুন, বসন্তের কোকিল, নিরামিষ ঘরে বিড়ালের ডাক, শালিখের খেলা, বউ কথাকও আর্তি, পাটগাছ, লজ্জাবতী লতা, গাব কষে রসসিক্ত জাল, জেলের নৌকা, সুপারীর ব্যাপারী, ধানের আড়ৎদার, সুদখোর দোকানী, কাঠকুড়ানো মেয়ে, মাছবেচা বউ, সিউলী, ধানভানা-মুড়িভাজা-চিড়াকোটা নারী, ঘাটে বাসনমাজা ঘরলেপা হাতে হাজা পা-ফাটা মেয়ে, ঘুঁটে-দেওয়া বুড়ী, অনন্ত নক্ষত্রবীথি, সীমাহীন প্রকৃতি ও আপন গরিমামত্ত



জলরাশির স্মৃতিতে বাঙলা চিরসুন্দর। দেবীপূজায় নববস্ত্রাচ্ছাদিত বাঙালীর মণ্ডপাগমন, প্রসাদগ্রহণ, আরতি-আদির স্মৃতিতে মধুর রূপসী বাঙলা। এখানে প্রকৃতিকে জব্দ করার প্রয়াস নেই। সবই অনায়াসে চলে। পরমাত্মীয় পরিবেশে, ঘনিষ্ঠ আন্তরিকতার সঙ্গে যে যার কাজ করে যায়।

প্রকৃতিকে জব্দ করার নামই নাকি সভ্যতা। সভ্যতা কিছু ইন্দ্রিয়কে

কর্মচ্যুত করেছে। গ্রীষ্মে তাই সভ্যসমাজ সজ্জায় সুসজ্জিত। দুপুরের পচা ঘামের স্রোত সে দেহে শুকোচ্ছে। কেবল অসভ্য মুদি, মুটে, রিকশাওয়ালা আদুড় গায়ে। কদাচিৎ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাঁধে উত্তরীয়।

দেশ জলবায়ু সম্বলিত ক্ষেত্র। যে ক্ষেত্রে মানুষ বাস করে তার প্রভাব মনুষ্য-চরিত্রে প্রভাবিত। জঙ্গলদেশের মানুষ তাই দারুণ রুক্ষ, পাহাড়ী মানুষ শ্রমপটু, উষ্ণ আর্দ্র দেশের মানুষ অলস, ভীরু। বাঙালী চরিত্রের সুকুমার ভাব বাঙলা দেশের জলবায়ুরই গুণে।

কিন্তু সভ্য হতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে আমরা এ সত্য অস্বীকার করতে চাইলাম। ইংরেজের দোকানের চশমায় আমরা শ্যামলের কোমল সৌন্দর্যের প্রতি দৃক্‌পাত না করে মর্মরের কঠোর শুভ্রতাকে রূপগুণের পরাকাষ্ঠা বলে গ্রহণ করতে গিয়ে হোঁচট খেলাম। অভ্যাসে অভ্যাসে ঐ চশমা বীক্ষণশক্তি সুস্পষ্ট করে দিলে আবার দেখতে পেলাম আমাদের নিজেদের ঘরে, নিজেদের গাঁয়ে, কত শোভনীয় লোভনীয় সৌন্দর্যমণ্ডিত রত্নরাজি দিকেবিদিকে ছড়িয়ে আছে। তাই বিগত শতক থেকেই আমরা নতুন করে নিজেদের জানতে, নিজেদের বুঝতে নিজেদের লোকবৃত্তের প্রতি আকৃষ্ট হলাম।

তাই এখন দেবতাশূন্য মন্দির দেখে কষ্ট পাই, দেবমন্দিরাদিতে সন্ধ্যারতির বাতি জ্বলতে না দেখলে ব্যথা অনুভব করি, ঢাকের বাজনা, খোলের বোল, কাঁসর ঘন্টা না শুনে যন্ত্রণাকাতর হই। তবুও বর্ষশেষে কৃষক সোনার ফসল ঘরে তোলে অনুষ্ঠানান্তে, কৃষকরমণী শাঁখ বাজিয়ে, প্রদীপ জ্বালিয়ে, নবান্নের



গান গেয়ে মঙ্গলোৎসবের মারফত নতুন ধান দিয়ে শরৎ লক্ষ্মীকে বরণ করে। লোকজীবনের সর্বত্রই বাংলার পুণ্যতীর্থের মাটির সোঁদা গন্ধ। শহরের পাথরের বন্দীশালায় আবদ্ধ বা পিঞ্জরাবদ্ধ পাখি যূথী, বেলী, কুন্দ, করবী, সন্ধ্যামালতী, নবমল্লিকা, চম্পা, জবা, কদম্বের ঘ্রাণ পেতে পারে না। ঘাস ও পল্লবের স্পর্শ, বনের শোভা, ধানসিঁড়ির মনোলোভা রূপ, কোকিলের সুমিষ্ট

কাকলী, ভ্রমরের গুঞ্জন তারা পাবে কোথা থেকে? লোকবৃত্তের মুকুরে বাঙলার পল্লী, বাঙলার লোকসমাজ ও বাঙলার শ্যামলশ্রী দেখা ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই। তাই বাঙলার লোকবৃত্ত শহর ও গ্রামবাসী সকলের কাছে, আমাদের কাছে, এত প্রিয়, এত স্নেহ মাখানো, এত বেগ ও উদ্বেগে ভরা ধন।

বেগ উদ্বেগ ও গতিবিশিষ্ট বাঙালী একই সময় কখনো গঙ্গোদক, কখনো কূপোদক, কখনও সচল, কখনও নিশ্চল, উভয়েরই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যে কোন সত্যানুসন্ধানে এই সত্য প্রতিভাত হয় যে বাঙালী জীবনে লোকাচার আপৎকালে সখ্য সম্পর্ক অবশ্যই বজায় রাখতে পারে। তখন পরস্পর আদানপ্রদান শুরু হয়ে যায়। এই থেকে জাতীয় জীবনে, লোক-জীবনেও গতিবেগ আসে। গতিবেগের উদ্বেগে কখনও লোকমানস ক্লিষ্ট হয়, কখনও তৃপ্ত হয়। যখন তৃপ্ত তখন এই বেগকে আত্মস্থ করে চঞ্চলা নদীর মত এগিয়ে যায় লোকসমাজ, শহুরেসমাজ। যখন উদ্বিগ্ন তখন তারা গাঁয়ে পড়ে থাকে। এইভাবে এগিয়ে যাবার, পড়ে থাকার মধ্যেও বাঙালীর অহংবোধ এবং সপ্রতিভ জীবন-চেতনা দেখতে পাওয়া যায়।

বেগ উদ্বেগ-অস্থির অভিমানী বাঙালীকে তার বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়ে দিতে বারে বারে তাকে ভূমিহীন করা হয়েছে। বারে বারে বাঙলার ভৌগোলিক সীমারেখাকে রদবদল করা হয়েছে। এক এক ভৌগোলিক সীমারেখার এক এক রাষ্ট্রযন্ত্র বাঙালীকে খণ্ডচ্ছিন্ন করে এক এক দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছে। সীমানা পুনর্বণ্টনের নামে স্বাধীনতার শর্ত হিসাবে বাঙালীকে

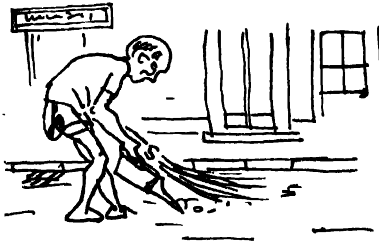


এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে, দেশীয় রাষ্ট্র থেকে বিদেশী রাষ্ট্রে নিক্ষেপ করা হয়েছে। কিন্তু তাতেও বাঙালী কাবু হয় নি, নিষ্প্রভ হয় নি। সে সর্বপ্রকার শোক-তাপ-দুঃখ-বেদনাকে অগস্ত্য মুনির ন্যায় হজম করে এগিয়ে গেছে। এবং এরই মধ্যে সে নিজেকে সম্প্রসারিত করেছে। তাই আজ বাঙালী শুধু পশ্চিমবঙ্গ বা বাঙলাদেশেই সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র

পূর্ব-ভারত তথা ত্রিপুরা, আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, দণ্ডকারণ্য, আন্দামানের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এইসব বাঙালীর জীবন, সংসার, পরিবার, গোষ্ঠী, বিবাহ, ধর্মকর্ম, সংস্কার, আহার-বিহার, বিশ্রাম, পোশাক-পরিচ্ছদ, হাসিঠাট্টা, কথা, কথকতা, ধাঁধা, প্রবাদ, কিংবদন্তী, ক্রীড়া ইত্যাদি নিয়েই বাংলার লোকবৃত্ত। এদের নিয়েই বাঙালীর বিস্তার। বাঙালীর যা কিছু গর্বের তাও লোকবৃত্তের নিয়ন্ত্রণাধীন।

অতীত বাঙালীর জীবনাচরণের ধূসর বৃত্তান্ত লিখিতসাহিত্য ও সমাজেতিহাসের পৃষ্ঠায় কিছু পরিমাণে বিধৃত। এই বৃত্তান্ত ছাড়া মৌখিক সাহিত্য ও ঐতিহ্যপূর্ণ উপাদানসমূহ থেকে জানতে পারি এক প্রাণোচ্ছল জাতির কীর্তিকথা, বাঙালীর সামগ্রিক লোক-জীবনের মৌলতা।

লোকবৃত্তকে কেন্দ্র করে যে সমাজধর্মেতিহাস, তার থেকেও ধ্বনিত হয় বাঙালীর আত্মসচেতনার কথা। তাই দেখি ধর্ম যখন আচারভ্রষ্ট হয়ে পঙ্কিল আবর্ত সৃষ্টি করেছে বাঙালী তখন প্রচার করেছে নতুন ধর্মের কথা, কর্ম যেখানে সঙ্কীর্ণতায় ক্ষুণ্ণ হয়েছে বাঙালী সেখানে দিয়েছে নতুন কর্মপদ্ধতি। সে কোনও একজায়গায় আবদ্ধ হয়ে থাকে নি, যুগে যুগে সে প্রচার করেছে কালোপযোগী মন্ত্রের, নব নব কর্মপদ্ধতির। তাই দেখি সিন্ধু সরযূ কাবেরীর তীর মুখরিত করে যেদিন ছন্দিত হয়েছিল সংস্কৃত কাব্য আর পুরাণ—সেদিন বাঙালী দামোদর গঙ্গা যমুনার তীর ঘেঁষে প্রচার করেছিল প্রাকৃত ভাষার জয়। আবার ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীদের নিয়ে



যখন ভারতের সর্বত্র সংস্কৃতাচার তখনও বাঙালী নৃত্য-মুখর হয়েছে শিবকে নিয়ে অসংস্কৃত আচার আরাধনায়। এ শিব রুদ্র নন। ইনি গৃহিণী গৌরীর সঙ্গে কোন্দল করেন, গোঁসা করে মাঠে লাঙল চাষ করেন, কুঁচুনি পাড়ায় যান। রাজার মেয়ে হয়েও গৌরী গরুর জাব্‌না দেন এবং মেছুনীদের মত জাল নিয়ে মাছ ধরতে যান।

বাঙলার রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা পুরুষের প্রতি নারীর চিরন্তন সম্পর্ক। দশভূজা দুর্গা বাঙালী কন্যা উমা। এবং হর আর গৌরী বাঙালী স্বামী-স্ত্রী। রাম-সীতাও বাঙলার নিজস্ব ভাবধারায় রূপলাভ করেছে। শিব মামা হয়ে লোকসমাজে অন্যায় অবিচারেরও বিচার করেন। সূর্যও এখানে মামা। লক্ষ্মী মা, অলক্ষ্মী মাসীমা, মায়ের বোন। বেহুলা, ফুল্লরা, লহনা, রত্নাবতী, কালকেতু, শ্রীমন্ত, চাঁদসওদাগর বাঙলার চিরকালের নরনারী। মা-মনসা এখানে বিষহরি। সত্যপীর, মানিকপীর, দক্ষিণরায়, ধর্মঠাকুর, ষষ্ঠী, শীতলা, চণ্ডী প্রভৃতি বাঙলার ছেলেমেয়ে। ঠিক সময়ে বর্ষা না হলে বর্ষার জন্য বাঙালী তার এই ছেলেমেয়েদের তথা পাথরচণ্ডী প্রভৃতির মাথায় দুধ ঢালে, নানা কৃত্য ও যাদুক্রিয়া সম্পন্ন করে। লৌকিক দেবদেবীকে বাঙালী নিজের আত্মীয় করে নিয়েছে। সহজ-সাধনা বাঙালীর নিজস্ব। মন্ত্রের মধ্যে সে আবিষ্কার করেছে তন্ত্র। দক্ষিণাচার সাধনার মধ্যে তার অবদান বামাচার সাধনার সন্ধান।

তাছাড়া ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যবাসী যখন নির্মাণ করেছে আকাশচুম্বী অট্টালিকা বাঙালী তখন তৈরী করেছে আপনার খোড়ো কুটীর। অন্যেরা যখন বিচিত্র বাদ্যঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত বাঙালী তখন স্বীয় মনের আনন্দে বাজিয়েছে একতারা



ও জয়ঢাক। প্রাকৃতজনসুলভ ভাব ও ভাষায় তাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখ ব্যথাবেদনা ও সমস্যাদির কথা নিবেদন করেছে সে তারই সৃষ্ট ঘরোয়া দেবতার কাছে, বাঙালীর ছেলেমেয়েদের কাছে।

বাঙলার এই প্রাকৃতজনগণ বর্ধিত হয়েছে বাঙলার নদনদী, পাহাড়-পর্বত ও বনজঙ্গলকে আশ্রয় করে। নিসর্গ ও ঋতুকে কেন্দ্র করে সে বিচরণ

করছে। গঙ্গা-ভাগীরথী-করতোয়া-তিস্তা-বিধৌত হিমালয়ের বাহু-বিধৃত ভূভাগে সে খেলা করে চলেছে, এপারের খেলা, ওপারের খেলা।

ভূমির উর্বরতা, মৎস্যের প্রাচুর্য, পশুপক্ষীর বিস্তার বাঙালীকে মাছ-মাংস-দুধ-ভাতে রেখেছে। বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনচর্যা, আহার-বিহার, আচার-ব্যবহারাদি প্রকৃতি ও ঋতুর উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতি ও ঋতু বাঙলার জীবন ও সমাজবিন্যাসের নিয়ামকের ভূমিকা নিয়েছে।

বাঙলার ধর্মসংস্কার, পূজাপার্বণ ব্রাহ্মণ্য ও লৌকিক দেবদেবী নানাবিধ প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছে। গড়ে উঠেছে লোকধর্ম ও লোকবিশ্বাস। আচার আচরণের পথে এসেছে বারো মাসে তেরো, আরো বেশী পার্বণ। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বিশ্বাস, টোটেম, ট্যাবু, সংস্কার, পূজা, আচার, অনুষ্ঠানাদির উপর উত্তরকালে ক্রমানুযায়ী জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য প্রভৃতি আর্যধর্মের, তান্ত্রিক আচার-পদ্ধতি ও অনুষ্ঠানাদির প্রভাব পড়েছে। এই প্রভাববৃত্তে যে ধর্মবিশ্বাস ও কর্মানুষ্ঠান বিবর্তিত হয়েছে তার সঙ্গে বাঙলার লোকায়ত সমাজের ধর্মাচরণে ও অনুষ্ঠানে পার্থক্য প্রচুর। বাঙালীর সমাজবিন্যাসের উপর লোকবিশ্বাস ও লোকানুষ্ঠানের প্রভাব জ্বলন্ত।

বিশ্বাস, আচার, অনুষ্ঠানাদির সঙ্গে ধর্মকর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িত শিল্পকলা, নৃত্যগীতাদি। এদের কতক অংশ গড়ে উঠেছে দৈনন্দিন জীবনচর্যার ও বৃহত্তর সমাজচর্যার ব্যবহারিক প্রয়োজনে আর কতক অংশ সৃষ্টির প্রেরণায়—বুদ্ধিভাবনাচিন্তাঅভিজ্ঞতাগত মানসের আত্মপ্রকাশের প্রেরণায়। দেশকালধৃত বাঙালীর গতি পরিণতি জানতে, সমাজের প্রবহমান



ধারাস্রোতের বিবরণ জানতে, সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আনন্দরসধারার আস্বাদন করতে চেষ্টা চলেছে সুদীর্ঘকাল ধরে।

সকলেই সুখ ও আনন্দান্বেষণ করে চলেছে। কারণ সর্বত্রই সুখের ছড়াছড়ি, সুখের বিস্তার। সে সুখ অজস্র ধারায় ঝরে পড়ছে জ্যোৎস্নায়, বয়ে চলেছে ঝটিকায়, গর্জন করে চলেছে জীমূতমন্দ্রে, বর্ষিত হচ্ছে জলে, ধ্বনিত

হচ্ছে কোকিলের কণ্ঠে, নিঃশ্বসিত হচ্ছে মলয় সমীরণে। সে সুখ প্রতিফলিত তরুদলে, ফুলে, ফলে, জলে, চন্দ্রালোকে, দিবালোকে। বাঙলার আকাশ বাতাস জল মাটিকে কেন্দ্র করে, গাছ পাথর পশুপক্ষীদের কেন্দ্র করে প্রকৃতির সর্বত্র সুখ। বাঙালীর বারো মাসে তেরো পার্বণ, চব্বিশটি পক্ষে সুখের সমারোহ, সৌন্দর্যের উচ্ছ্বাস। সুখ বনে সুখ গৃহে সুখ সর্বময়।

সুখের চক্র পরিবর্তনে দুঃখ, বাঙালী জীবনে দুঃখও সর্বময়। উষ্ণতা ও শীতলতা কাঁধে কাঁধ দিয়ে এগিয়ে চলেছে। চলেছে সুখ ও দুঃখ। একবার একে অপরকে পিছনে ফেলছে, আরেকবার অপরে একে পিছনে ফেলছে। সুখ দুঃখের এই প্রতিযোগিতায় কখনও নিজের জ্ঞাতসারে কখনও অজ্ঞাতসারে আমরা একাকে হারিয়ে দিয়ে অপরের মধ্যে ডুবে যাই, সুখ বা দুঃখের প্রবল স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে নাকানি-চুবানি খাই। কখনও স্রোতের তরঙ্গ বিক্ষেপে চোরাবালির চড়ায় নিক্ষিপ্ত হয়ে সাময়িক স্বস্তিশ্বাস ফেলি, তখন সুখদুঃখকে পরিমাপ করতেও সচেষ্ট হই। এই পরিমাপে এগিয়ে আসেন রাষ্ট্রনেতাগণ তদীয় বৈষয়িক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তুলাদণ্ড নিয়ে। আসেন সমাজ ও ধর্মনেতাগণ সামাজিক ও ধর্মীয় নিক্তি নিয়ে। তাঁরা চরাচরে অনুষ্ঠিত যে কোন ব্যাপার বা ঘটনার পরিমাপ ও বিচার করতে সদাব্যস্ত। অতীতে এ কাজে অগ্রগামী বা প্রধান অধিকারী ছিলেন ধর্ম ও সমাজনেতৃবৃন্দ। কারণ রাষ্ট্রনেতাগণ হীনবীর্য হয়েছিলেন তখন ধর্ম ও সমাজনেতাদের কাছে।



ফলে এদেশে ধর্মনেতা-শাসন ও রাষ্ট্রনেতা-শাসন এই দ্বৈত-শাসন বিদ্যমান ছিল। এই দ্বৈত-শাসনের সঙ্গে গ্রামের নিজস্ব পঞ্চায়েতী শাসনও ছিল। স্মরণীয়, গ্রামের পঞ্চায়েতের সঙ্গে পঞ্চায়েতী রাজের মূলগত আদর্শের খুব একটা তফাত না থাকলেও পঞ্চায়েত গঠন ও বিন্যাসের এবং শাসন পদ্ধতির মধ্যে প্রভেদ ছিল এবং এখনও আছে।

গুরুপুরোহিত, রাষ্ট্রতন্ত্র এবং দেশীয় ছাঁচানুযায়ী শাসিত জনতা সুখে-দুঃখে চলতে চলতে ভদ্র-ইতরজনের মধ্যে শ্রেণী বিভক্ত হয়ে গেল। দেখা দিল নাগর এবং লোক সমাজ। শহরাঞ্চল ও গ্রামের মধ্যে ব্যবধান রচিত হল। একদিকে গতির তীব্রতা অপরদিকে গতিহীনতা, উভয়ে উভয়কে আশ্রয় করে এগিয়ে চলল। একই ভাষা, একই সাহিত্য, একই ধর্মচর্চা, একই প্রকৃতি, জলবায়ু ও ঋতুবৈচিত্র্যের মধ্যে লালিত-পালিত বাঙালীর মধ্যে তাই দেখা দিল বৈলক্ষণ্য। একে পুরাতনকে, ঐতিহ্যকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরল, অপরে প্রাচীন ঐতিহ্যের কিছু নিয়ে ও বৈদেশিক আমদানীর কিছু মিলিয়েমিশিয়ে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেকে ঢেলে সাজাতে চাইল। এই দ্বিবিধ ভাবধারায় দুটি পথ দেখা দিলেও বাঙালীপনায় আঘাত আসে নি।

ব্যক্তিজীবন স্ফুরণে ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে যে পরিবার তা মাতৃকেন্দ্রিক অথবা পিতৃকেন্দ্রিক যাই হোক না কেন অসংখ্য গ্রন্থির মত ব্যক্তি ও সমষ্টিকে বিভিন্ন সম্পর্ক ও কর্মসূত্রে বেঁধে রেখেছে। বাঙালী সমাজকে একসূত্রে বিধৃত করেছে বাঙলার ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার, লৌকিক আচার এবং ঐতিহ্য-সংশ্লেষ। জাতি, উপজাতি, খণ্ডজাতি, তপশীলী ও অপরাপর ক্ষুদ্র জাতির মধ্যে পরিবর্তন, প্রধানত অর্থনীতিকে কেন্দ্র করেই। অর্থনৈতিক চেতনা থেকে এসেছে নতুন জীবন-জিজ্ঞাসা, এসেছে নতুন সমাজ সম্পর্কে সচেতনতা ও জীবনের মূল্য-বোধ। তাই অনেককে চিরন্তন পরিবেশ, পেশা ও ধর্মবোধকে নতুন করে



গড়তে হচ্ছে। তাই কিছু লোক গ্রাম ছেড়ে, বন ছেড়ে, পাহাড়, নদীর কিনার ছেড়ে শহরে এসেছে, কিছু লোক নগরে ও অন্যান্য লোকালয়ে বসবাস স্থাপন করেছে। আর কিছু লোক পরিবর্তিত অবস্থায়ও পুরাতনকে আশ্রয় করে মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে পিতৃপিতামহদের ভিটেমাটি সামলাতে, তাঁদের ফেলে যাওয়া কৃতকর্মাদি সম্পন্ন করতে।

গ্রাম বন পাহাড় নদীর কিনারা ছাড়া অনেককে নতুন পরিবেশে সনাতন বর্ণপ্রথা, কৌলিক বৃত্তাদি থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। সুতরাং ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বেশ কিছু লোক প্রাচীন বা ট্রাডিশন ধরে রাখতে পারছে না। শিল্পাগ্রসরতা, পেশার পরিবর্তন, শিক্ষার বিবর্তনাদির জন্যও মানুষে মানুষে সম্পর্কের হেরফের হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বস্তু ব্যক্তিসত্তা প্রতিষ্ঠান এবং দেবদেবীতে আরোপিত মূল্যমানেরও পরিবর্তন ঘটছে।

কৃষিকার্যের সুবিধার জন্যই বোধহয় বহু-বিবাহের সৃষ্টি যা বাঙালী কুলীন সমাজের অনেকের মধ্যে ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছিল একদা। বহু-বিবাহ এখন সহসা দৃষ্ট ব্যাপার নয়। বাঙলার উর্বর ও শ্যামল প্রান্তর বাঙলাকে যে কোমলতায় ভরিয়ে দিয়েছিল জীবন-সংগ্রামের কঠোরতায় ক্রমে তা কঠিন হয়ে পড়ে। শাখা-প্রশাখাবেষ্টিত বিশালাকার যৌথ-পরিবার ভেঙে ভেঙে ব্যষ্টিকেন্দ্রিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারের সৃষ্টি হয়। এই পরিবর্তনের মধ্যে, আচার আচরণ পূজানুষ্ঠানের মধ্যে, ব্যবহার উপহার ও কৃত্যাদির মধ্যে লোকবৃত্তের সৃষ্টি। লোক-জীবনের ধ্যানধারণা চিন্তাভাবনা ও অভিব্যক্তি যার মধ্যে স্পষ্ট। অতীতের ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে সে কালের স্রোত অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে। এগোতে গিয়েও সে কিছু দিচ্ছে কিছু নিচ্ছে, সংযোগ ও সংঘাতের দ্বন্দ্বে জীবনকে বিকশিত করে সে এগিয়ে যাচ্ছে।

উৎসব-আনন্দ-সামাজিকতার সঙ্গে গ্রাম-বন্ধনাবদ্ধ এবং গ্রাম-বন্ধনহীন নানা শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। একদল লোকসংস্কৃতানুসারী, অপরদল বঙ্গ-সংস্কৃতির শহুরে শাখাচারী। কিন্তু শেষোক্ত দলের নয়নলোভন চাকচিক্য



অনেককে গিলটি সোনা অপহরণকারীর মত ঠকতে সাহায্য করে।

শহরের বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তাধারা ও সজীব সভ্যতার বেগবান্ প্রবাহ নতুন দিকে ধাবিত হল। এটা যদি আলো জ্বালানো হয়, তবে একদিকে আলো জ্বলল, অন্য-দিকে, প্রকৃতির রাজ্যের নিয়মেই হয়ত, দীপ নিভে গেল। এরই মধ্যে মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি নামক একটি সংস্কৃতি বঙ্গসংস্কৃতির গগনে উদিত হল। এই মধ্যবিত্ত

সংস্কৃতির বিকাশে লোকসংস্কৃতির নিজস্ব গতি রুদ্ধ হয়ে চলেছে বলে অনেকে মনে করেন। আরও একটু স্পষ্ট করে বলা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু-কথিত নবজাগরণ নির্দ্বিধায় নির্বিচারে বাঙলার চিরায়ত লোকসমাজের তাবৎ সাংস্কৃতিক ফসলকে সর্বথা ত্যাজ্য ও হেয় জ্ঞান করেছে। কিন্তু সে অন্তঃসলিলা ধারাপ্রবাহ আজও যে মৃত নয় তা বোধ করি বাঙালীর জীবনাচরণে দিবালোকের মতো প্রকাশিত। অকস্মাৎ সেই রুদ্ধ কলতান যেন মাঝে মাঝেই জাতীয় জীবনে শ্রুত হচ্ছে।

উদার গণতান্ত্রিকতা প্রথম যুগে ব্যক্তির জয়গান উন্মুখর হয়ে উঠবার পরে শুরু মানুষের জয়গান ও মানবতার মহিমাকীর্তন। মানবমহিমার এই অভ্যুদয়ে আছে বাঙালী সমাজের লোকমানুষের অকৃপণ দান। লোকমানুষের মহিমার কীর্তিবিন্যাস ও জীবনচেতনার মূল্যায়ন পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্যে সাধিত হয়েছে বলে লৌকিক তথ্যাদির সংরক্ষণ, ব্যাখ্যান ও অধ্যয়ন কাম্য। পৌরাণিক কাহিনী, বৈদিক উপাখ্যান ও মন্ত্রাদি দেবোপাসক ও যজ্ঞপন্থী ব্রাহ্মণ্য ঋষিদের দ্বারা রচিত। এদের গ্রন্থ বা ধর্মসূত্র তখনই রচিত হয়েছিল যখন ব্রাহ্মণ্য-সমাজ রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারপূর্বক অধিকাংশ মানুষকে নিজেদের আয়ত্বে এনে তাদের অভিলষিত পথে সকলকে পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ্যবাদের বিস্তারে তাদের বিরুদ্ধবাদীরা বাহ্যতঃ



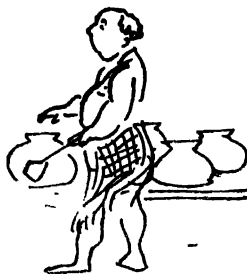
নিশ্চিহ্ন হলেও নানা আকারে ও প্রকারে অব্রাহ্মণ্য মতবাদ ও ধর্মানুষ্ঠানের অবশেষ এখনও বাঙালীর জীবনাচরণে সুস্পষ্ট।

লোকবৃত্তের চর্চা, অধ্যয়ন ও গবেষণায় লৌকিক সংস্কৃতির কতটা বঙ্গ সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে তা স্পষ্ট হবে। এবং জানা যাবে যে তথাকথিত শিক্ষিত ও ভদ্রসম্প্রদায় বা সহরের সংস্কৃতপ্রেমী অথবা বঙ্গ-সংস্কৃতির শহুরে

শাখাচারী সম্প্রদায় অপেক্ষা লোকসম্প্রদায় সত্যকে ধারণ করার ক্ষমতায় অধিক বলবান ও শক্তি সম্পন্ন। যদিও তারা মেঠো, তারা গ্রাম্য, তারা অর্ধ-আচ্ছাদিত কিন্তু তবুও তাজা ও নির্ভেজাল, কর্কশ ও হৃদয়বান।

বাঙালী প্রতিভার বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক গিরিকান্তার নদনদীপ্লাবী প্রেমের বন্যা। বাঙালীর যা কাম্য তার জন্য সে করতে না পারে এমন কাজ নেই। অভীষ্ট কর্ম করতে বাঙালী তার দেহ ও মন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, মাটির পুতুলের মত নিজেকে উৎসর্গ করে কাম্যবস্তুর সন্ধানে। এ উদ্দামগতি, এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কর্মসিদ্ধির এ প্রাণান্ত চেষ্টার শিক্ষা বাঙালী পেয়েছে বাঙলার মাটির কাছে, জলের কাছে, আকাশের কাছে। তাই বাঙালীর কৃত্যে, বাঙালীর ধর্মকর্মপূজার্চনায়, বাঙালীর কথনেচলনে-বলনে, বাঙালীর চিন্তাভাবনায় ও রসনায় সর্বত্রই স্বাতন্ত্র্য।

ওপার বাঙলার পলিমাটি গঠিত বিস্তীর্ণ উর্বরাভূমি, রাঢ়ের মূল্যবান কয়লা-খনি, সুন্দরবন ও তরাই অঞ্চলের অরণ্যানী, ব্রহ্মপুত্রের রুই, বাঁশপাতা মাছ, পদ্মার ইলিশ, সোমেশ্বরীর মহাশোল, মেঘনার গলদা চিংড়ি, পাবনার ঘি, নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও রাঘবসাই, পুঁটিয়ার অম্বিকা, ভবানীপুরের (বগুড়া) ক্ষীরতক্তি, মণ্ডলচকের ক্ষীর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঘোল, টাঙ্গাইলের চন্দ্রনচূড়, পাবনা-বগুড়ার দই, পাংসার (ফরিদপুর) চমচম, ঢাকার পাতক্ষীর, প্রাণহরা, বাখরখানি, পরোটা, অমৃতি, বরিশালের কই, শিং মাগুর ও তপ্‌সে (রামছোড়) মাছ, দুধ, ধোনপিঠা, নারকেলের নাড়ু, সারেঙের



মুরগীভাত, নৌকামাঝির রসুই, সুন্দরবনের কাঁকড়া, কৃষ্ণনগরের সরভাজা, সরপুরিয়া, মুড়াগাছার ছানারজিলাপী, বহরমপুরের ছানাবড়া, বর্ধমানের সীতাভোগ, মিহিদানা, সিমলার কড়াপাক সন্দেশ, বাগবাজারের স্পঞ্জ রসগোল্লা, রাবড়ী, মোল্লাচক ও গুমা-হাবড়ার দই, জয়নগরের মোয়া, আরামবাগের কার্কাণ্ডা, বেলেতোড়ের ম্যাচা, গুপ্তিপাড়ার মাখা

প্রভৃতি বাঙালীর পরমপ্রিয় ও আহ্লাদের সামগ্রী। তাছাড়া বরিশাল, ফরিদপুর, রংপুর, বগুড়া, ময়মনসিংহ ও পাবনার পাট, বাঁশ, বেত, রংপুরের তামাক, বগুড়ার শালিধান, দিনাজপুরের কাটারিভোগ, বরিশালের বালাম-চাল, সুপারী, নারকেল, শটীগাছ, মুর্শিদাবাদ, হুগলী মালদহের আম, বরিশাল, বগুড়া ও রংপুরের কাঁঠাল, রামপালের সবরীকলা, গোয়ালন্দের তরমুজ, দার্জিলিং, ত্রিপুরা, জলপাইগুড়ি ও ডুয়ার্সের চা, দার্জিলিং ও শিলিগুড়ির কমলালেবু, কোচবিহারের তামাক, ঢাকা, টাঙ্গাইল, বাবুরহাট, শান্তিপুর, রাজবলহাট, ধনেখালি ও শ্রীরামপুরের তাঁতশিল্প, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বগুড়া ও রাজসাহীর রেশমশিল্প, বরিশালের নৌশিল্প প্রভৃতি সকল বাঙালীকে বাঙালীয়ানার কথা মনে করিয়ে দেয়। বরিশাল ইত্যাদি স্থানের নৌবাইচ, লাঠিখেলা, ছোরা বা অসিখেলা, এবং পল্লী বাঙলার হাডুডু, কড়ি, ঘুড়ি, ঘুঁটি, ড্যাংগুলি, কিৎকিৎ, জলকুমীর, পুতুল খেলা, পুকুরঘাটের মেয়েদের কথোপকথন, শীতসকালের রোদ পোহান, বিকালের আগুন পোহান সব মিলে যেন ফেলে-আসা দিনের স্মৃতি জেগে ওঠে সকল বাঙালীর মনে।



বাঙালীর প্রেম-ভালবাসার গতি চির দুর্বার। সে অলঙ্কারশাস্ত্র হাতে নিয়ে সেই ছাঁচে প্রেম ভালবাসার আদর্শ গড়ে তোলে নি। যে নারীর মুখের কথা ঠোঁটে আনতে বাধ-বাধ ঠেকে সে সর্বপ্রকার শাস্ত্রীয় বা সামাজিক আব্রু উপেক্ষা করে দেওয়ালীর তুবড়ীর মত ফেটে পড়তে পারে তার মনের মানুষের জন্য। এবং তার মানুষও সর্বপ্রকার প্রতাপ

প্রভাব প্রতিপত্তি বিত্তাদি হেলাভরে প্রত্যাখ্যান করে নিঃস্ব হতে পারে। কোন বাঁধাধরাপথে বাঙালী চলে না, চলতে পারে না, বহুধাবিস্তৃত তার পথ। তাই বহু ব্যাপারে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে বাঙালীর সঙ্গে আপসরফা করে এগোতে হয়েছে এই বাঙলায়। সংস্কৃতের আইন কানুন বা ব্যাকরণের মধ্যে বাঙলা আত্মসমর্পণ করে নি। পথ ও মতের ব্যাপকতা ও তীব্রতায় অথবা কোন বিপদের আশঙ্কায় সে কোন কাজ পরিত্যাগ করে নি। সে নির্ভীক ও চঞ্চল পথিক। তার পথের গণ্ডী নেই। কোন গণ্ডীকে স্বীকৃতি দেবার মত মানসিকতার সে পোষক নয়। তাই গণ্ডীর ধর্ম সে মানে না, পুঁথির বুলি সে বলে না, এবং শেখানো কথা আবৃত্তি করে না। এই খাঁটি ও নির্ভেজাল বাঙালী এখনও সরব বাঙলার গ্রামে, নদনদীর তীরে ও মাঠবনপ্রান্তরে।

বাঙলার প্রাকৃতিক ও এবম্বিধ সামাজিক পরিবেশে লালিত-বর্ধিত বঙ্গজনপদবাসীকে ও তার জীবনচর্যার মূল সুরটিকে কেন আমরা গ্রহণ করার প্রয়াস পাব না? রাজানুগ্রহ, ব্রাহ্মণ্যানুগ্রহ-প্রাপ্ত মানুষ থেকে সমাজের নিম্নতম কোটির মানুষটিকে, তার তাবৎ কর্মকাণ্ডকে বিধৃত করে হয়তো স্বপ্রকাশ কোন রূপ পরিস্ফুট হতে পারে সেই ভরসায় রঙ্গভরা ভঙ্গবঙ্গের ধূসর অতীত, অনাগত ভবিষ্যৎ ও সমকালের ধারাবিবরণী লিপিবদ্ধ করার দুর্বিনীত এই প্রয়াস। অতীত ও সমকালের মুকুরে ভবিষ্যতের প্রতিবিম্ব দেখতে বোধ করি কোন বাধা কোনদিক থেকেই নেই।

লোকবৃত্তের মাধ্যমে বাঙলা দেশকে ও বাঙালীকে জানার প্রচেষ্টা করতে হবে। এদেশ সেইদেশ যে দেশ সর্বদাই আনন্দমুখর হাস্যলহরীপূর্ণ ছিল বলে শুনি। কিন্তু সে দেশ কোথায়? তার আনন্দময় শ্যামলরূপ কোথায় উধাও হল? কোথায় গেল তার উৎসব অনুষ্ঠানগুলো? তার প্রতিমা, মঠ, মসজিদ, মন্দিরাদি নির্মাণোপলক্ষে যে চারুশিল্পকলার চর্চা ছিল তা কোথায় গেল? তার দীঘি, পুষ্করিণী সংস্কার, বৃক্ষরোপণাদি ও নানাবিধ দেশহিতৈষী কার্যকলাপ আজ প্রায় বন্ধ কেন? কোথায় গেল সেই ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী, সেই সোনারকাঠি, রূপারকাঠি, সেই স্ফটিক-স্তম্ভে ভ্রমর ভ্রমরী, সেই শুকপাখী, সেই ফল যা খেলে সন্তানবতী হওয়া যেত, সেই মনপবনের নাও, সেই সাপের মাথার মণি, সেই কাঁদলে মুক্তা হাসলে মানিক, সেই বারো হাত কাঁকুরের তেরো হাত বিচি, সেই গাছে মানুষের প্রাণ, সেই ঢোল-ডগর যার ঘায়ে বাজার বসে বাজার ভাঙে, সেই বুড়ির কাঁথা, সেই রাখালের পুঁটুলী,

সেই রাক্ষসীর ছেঁড়া চুল, সেই মায়ার পোশাক, সেই পুত্র সরোবর, সেই লালিমা দিদিমারা যারা সন্ধ্যার আলো-আঁধারে কিংবদন্তী, রূপকথা, উপকথাদির জোগান দিয়ে সকলকে এক পরম বিস্ময়ে ফেলে দিত? কোথায় গেল কুঁচবরণ-কন্যার মেঘবরণ চুল? তেপান্তরের মাঠ? হাড়গিলা পাখী? রাজপুত্তুরের কাঠের ঘোড়া? কোথায় গেল সেই কারুশিল্পী, সেই মৃৎশিল্পী, সেই সূচীশিল্পী, সেই ভাস্কর, সেই লস্কর যারা বাঙলা ও বাঙালীকে চিরব্যস্ত করে রাখত? এদেশে কি আর বসন্ত ঋতু আসে না? এ দেশের শালিখ, কোকিল, বউ কথা কও কি আর ডালে বসে ডাকে না? এদেশের টিয়া ময়না ময়ূর কি আর গানের তালে তালে নাচে না? কোথায়, কোথায় গেল সেই সন্ধ্যামালতী কেয়া কদম্ব শেফালী-আদি ফুলের সৌরভ? কোথায় গেল শটীবন, ঝাউগাছ? কোথায় সেই সোনাই দীঘি, নেতা ধোপানীর ঘাট? কোথায় সেই মধুকর ডিঙ্গা, খেয়াঘাট, ভাঁটফুল, বট তাল তমালের নীল ছায়া? কেন এদেশে এখন বর্ষা আসে প্লাবন বেশে, শীত আসে কেবলই টান শুষ্কতা নিয়ে? কেন শরতে নেই উল্লাস, গ্রীষ্ম কেন শুধুই রুদ্র ভৈরব, হেমন্তে-বসন্তে কেন নেই চাওয়া-পাওয়ার আশা মেটাবার প্রফুল্লতা ও ঋত্যানুষ্ঠানের শুচিতা? কোন সমন্বয় ও বিবর্তনে বাঙালীর আজ এই হতদশা?

সুদীর্ঘকাল ধরে আমাদের এ জিজ্ঞাসার উত্তর পাই নি। কিন্তু শুনে আসছি, শুনছি যে, রূপসী বাঙলার হৃত ঐশ্বর্য পুনরুদ্ধার করা হবে—এই মর্মে চীৎকৃত ঘোষণা। শুনছি বাঙালীর অতীত কীর্তিগাথা যশ ও মহিমার অনেক কথা অনেক ভাবে।

লোকবৃত্ত চর্চার মারফত অর্থাৎ লোকবৃত্তকে কষ্টিপাথর হিসাবে ধরে নিয়ে বিচার করে দেখতে চেষ্টা করতে হবে এই কথা ও কাহিনীর কতটা সত্য, কতটা বাঙলা ও বাঙালীর পক্ষে প্রযোজ্য।



॥ ২ ॥

পুরাতাত্ত্বিক খনন, নৃতাত্ত্বিক গবেষণা ও লোকবৃত্তিক অনুসন্ধানের নিরিখে পরিচয় পাওয়া গেছে বাঙালীর রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের গতিপ্রকৃতি। এই ক্রম-বিবর্তনের যতটুকু এ যাবৎ জানা গেছে তার অনেকাংশ দেশীবিদেশী পর্যটকের বিবরণ, ভাষাবিদ্‌দের উপকরণ, ইতিহাসাচার্যদের প্রচেষ্টা, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব এবং লোকবৃত্তের অবদান।

বাঙালীর মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি, বাঙালীর সমাজ সচেতনা, বাঙালীর বিদ্রোহ, বাঙালীর অহং, বাঙালীর জীবনচর্যা, বাঙালীর কৃষিশিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক জীবনের অন্তরঙ্গ বিবরণ থেকে লোকবৃত্ত আহরণ করে তার আদর্শ অনুশীলন করতে হবে। যদিও প্রাচীন বাঙালী ও বর্তমান বাঙালী একই অর্থ সূচিত করে না। যে ভূখণ্ড আজ পশ্চিমবঙ্গ এবং যে ভূখণ্ড বাঙলা-দেশ প্রাচীন যুগে তেমন কোন বিশিষ্ট প্রদেশ ছিল না। হিন্দু-যুগের শেষ পর্যন্ত গৌড় ও বঙ্গ দুটি পৃথক দেশ। এই দুই দেশের সীমা ক্রমশ ব্যাপক হতে হতে হিন্দুযুগের অবসানে যুক্ত বাঙলার সৃষ্টি হয়।

হিন্দুযুগে বাঙালী বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত হয় নি। তুরস্করাজাগণ গৌড় ও বাঙলাদেশকে একত্রিত করেন। প্রাচীনকালে প্রাকৃতিক সীমাদ্বারা রাষ্ট্র-সীমা নির্ধারিত হত, কিন্তু বর্তমানে অনেক সময় রাষ্ট্রসীমা প্রাকৃতিক সীমাকে অবজ্ঞা করে চলে। প্রাকৃতিক সীমা সাধারণত নির্ধারিত হয় ভূপ্রকৃতিগত সীমা দ্বারা। প্রাকৃত ও মাগধী-প্রাকৃত থেকে স্বাতন্ত্র্য লাভ করে এবং অপভ্রংশ পর্যায় থেকে মুক্তি লাভ করে বাঙলা ভাষার উন্নতি ও চতুর্দিকের প্রাকৃতিক সীমানার মধ্যে বসবাসকারী সম্প্রদায়কে নিয়ে বাঙলাদেশ মুসলমান যুগেই রূপ নেয়। এবং এজন্যই বলা হয় যে মুসলমান যুগেই বর্তমান বাঙলা ও বাঙালীর উৎপত্তি। যুক্ত বাঙলায় একদিকে সুউচ্চ পর্বত, দুইদিকে কঠিন শৈলভূমি, আর একদিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্র, মাঝখানে জনপদ, ভাগীরথী-করতোয়া-ব্রহ্মপুত্র-পদ্মা-মেঘনা এবং অসংখ্য নদনদী বিধৌত বাঙলার গ্রাম, নগর, প্রান্তর, পর্বত-কন্দরই বাঙালীর কর্মকৃতির উৎস। বাঙালীর বৈশিষ্ট্যের মূলে আছে ভাষার ঐক্য, আছে দীর্ঘকাল একই দেশে, একই শাসনাধীনে, একই প্রাকৃতিক

সীমা ও ঋতু-বৈচিত্র্যে বসবাসের যোগ্যতা। মৎস্য-মাংসাদি ভোজন, শিরোভূষণের অব্যবহার, তন্ত্র ও শক্তির আরাধনা, বৈষ্ণবীয় বিনয়, বাঙালীর লিপি সাধনা, শিল্পকলার বৈশিষ্ট্যাদি দ্বারাও বাঙালীর স্বাতন্ত্র্য সূচিত হয়।

রাষ্ট্রবিধাতাদের ইচ্ছায় ও কূটকৌশলে দেশ খণ্ডিত হলেও এপার বাঙলার সঙ্গে ওপার বাঙলার ও উভয় পারের বাঙালীর নাড়ীর সম্বন্ধ। এপার ও ওপারের বাঙলা ও বাঙালী এক এবং অখণ্ড। একই ভাবনাচিন্তা ধ্যান-ধারণার অংশীদার। একই বাঙালীয়ানায় বিশ্বাসী স্ব স্ব আচার-আচরণ ধর্মানুষ্ঠান ও কৃত্যের অধিকারী উভয় বাঙলার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জনসমাজ। কিভাবে বাঙালী তার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য পেল তা প্রকটিত হবে বাঙালীর জীবনচর্যায়, বাঙলার নদনদীতে আকাশে বাতাসে ও ঋতুবৈচিত্র্যে, এবং সূর্যতাপ ও চন্দ্রালোকের তরঙ্গ বিভঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে তরাইয়ের বনভূমি এবং দক্ষিণে সুন্দরবন ও তৃণাস্তীর্ণ জলাভূমি উষ্ণ জলীয়ভাবের ক্লান্ত অবসাদে ঘিরে ধরেছে।

সকলেই জানেন, প্রথমে সূর্য তারপর পৃথিবী। ফুটন্ত পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে এলে তার উপর প্রাণ সঞ্চার হয়। পঞ্চভূতে প্রাণের প্রতিষ্ঠা। তার পুষ্টি আসে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম হতে। স্ফুলিঙ্গ নির্বাপিত হলে পঞ্চভূত বিশ্লিষ্ট হয়। জীবন এগিয়ে চলে এরই মধ্যে। জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে সর্বদাই সূর্য তেজ ছড়াচ্ছে, উত্তাপ ও আলো দিচ্ছে। সেই তেজ, আলো এবং উত্তাপে প্রাণ গড়ছে, জীবজগৎ গড়ছে। তবুও যে পরিবেশের মধ্যে মানুষ জন্মেছে সে তাকে ধ্রুব বলে মানে না। প্রকৃতির শাসনের মধ্যে, তাণ্ডবের মধ্যে সে নিয়তির শাসনের সন্ধান পায়। তাই পুরুষানুক্রমের অভিজ্ঞতার ফলে সে প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজের কাজে লাগাতে চায়। বস্তুজগতের ব্যবহারিক সূত্র দিয়ে সে চিরন্তন জ্ঞানের ভাণ্ডার বোঝাই করে চলেছে। গাছ থেকে ফল পড়ে, সৌরমণ্ডলে গ্রহেরা নিজের পথে বা কক্ষে চলে ফেরে—মহাকর্ষের একই নিয়মের সূত্রে এরূপ নানাবিধ ঘটনাকে এক সঙ্গে যুক্ত করে ফেলেছে সে।

প্রকৃতিরও পরিবর্তন হচ্ছে, তাই গভীর অরণ্যে হয়েছে লোকবসতি, উচ্ছৃঙ্খল জলরাশি ধরা পড়েছে বাঁধে। মানুষ আর হিংস্র জীবজন্তুকে ভয় করে না, কারণ, শাসনমারণের অনেক অস্ত্র তার হাতেই। বশীকরণেও সে সিদ্ধহস্ত। বশীকরণীকৃত বন্য জীবজন্তুরা আজ মানুষের রথ চালায়, বোঝা বহন করে, কৃষিকার্যে সাহায্য করে। মানুষ বরফঘেরা পাহাড়ের

মাথায় গড়েছে বিশ্রামঘর, সমুদ্রের গ্রাস থেকে কেড়ে নিয়েছে উর্বরা জমি। আজ্ঞাবহ শিষ্যের ন্যায় সমুদ্র জমি ছেড়ে দিয়েছে। বাস্তবদিকে মানব-শক্তি প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে প্রতিকূল ধরে নিয়ে দীর্ঘদিন আগে থেকে তাদের বিজয় অভিযান চালিয়েছে। এই অভিযানে সে অগ্রসর হয়েছে গুহা থেকে খামারে, খামার থেকে অফিসে, সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক জগতে। তথাপি প্রকৃতি যখন কোপিত হয় তখন মনুষ্যসৃষ্ট সমস্ত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে তর্জন গর্জনান্তে তছনছ করে সে জানিয়ে দেয় তার অস্তিত্ব। সূর্যের তেজে সমুদ্রোত্থিত জল বাষ্পাকারে উঠে বর্ষণ করে, নদনদীর মধ্য দিয়ে সেই বিপুল জলরাশি পাতালের দিকে ছুটছে। ছুটছে মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুরা দিকবিদিকে প্রাণশক্তির গতি ও বেগে।

কালপ্রবাহে বিভিন্ন শ্রেণীর অভিব্যক্তি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে জীবদেহে আছে স্নায়ুমণ্ডলীর অভিব্যক্তি। মনে হয় প্রাণশক্তি যেন চাইছে অবচেতনা থেকে চেতনার উচ্চস্তরে বিকশিত হতে। বিবর্তন বৃক্ষের শাখায় মেরুদণ্ডীদের স্নায়ুগ্রন্থি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে হয় মানুষের আবির্ভাব। তারও আগে হয়েছিল শৈবালে-শাদ্বলে, তৃণে-শস্যে, পত্রে-পুষ্পে, বসুধায় প্রাণের আবির্ভাব। তবু আশ্চর্য ঘটনার ও বিভিন্ন স্তরবিন্যাস ও পরিবেশ পরিপ্রেক্ষিতে এককোষবিশিষ্ট প্রাণী অ্যামিবা (Amœba) বহুকোষবিশিষ্ট প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়ে ক্রমবিবর্তনের পথে মনুষ্যের সৃষ্টি করে। কালক্রমে মানুষের জীবনযাত্রায় হেরফের ঘটে। সমাজ-জীবনের আবির্ভাব হয়। সমাজ-জীবনে মানুষ পরস্পর পরস্পরের মঙ্গল ও সহযোগিতা কামনা করে। বংশানুক্রমে লব্ধজ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সংঘবদ্ধভাবে বহন ও বিকাশসাধন করে। অভিজ্ঞতা থেকে প্রেরণা ও পাথেয় সংগ্রহ করে। শুরু করে দলবদ্ধ ভাবে বসবাস করতে। গড়ে ওঠে সভ্যতা। বিবর্তনের পথে উর্ধ্বস্তরে পৌঁছতে প্রাণশক্তি একটি বিশেষ রীতি অবলম্বন করছে। সে রীতি হচ্ছে সহযোগিতা, বহুকোষের জীব হয়ে মানুষ তাই শক্তি সঞ্চয় করল।

একদা সূর্যদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথিবী মহাশূন্যে এক প্রকাণ্ড অগ্নিগোলকের মত ঘূর্ণ্যমান ছিল। সেখানে জীবকণিকার অবস্থান কল্পনা করা যেত না। পরে পৃথিবী শীতল হলে তার দেহে কঠিন শিলাবরণ ও জলরাশির উৎপত্তি ঘটে। শিলাবরণের উপর অবিরাম বর্ষণ ও জলস্রোত প্রবহনের ফলে মৃত্তিকার উৎপত্তি। অবশেষে জল ও মাটির পৃথিবীতে দেখা দিল প্রাণ—শৈবাল, জলজবৃক্ষ, জলচরপ্রাণী। আরো পরে এল

নব নব উদ্ভিদ ও প্রাণী। সরীসৃপের কঠিন ত্বক বিদীর্ণ হয়ে উদ্ভূত হল পেলব পক্ষ, দেখা দিল আকাশচারী প্রাণী। জল স্থল আকাশ প্রাণ-চাঞ্চল্যে পূর্ণ হলে অর্ধ মানব থেকে পূর্ণ মানবের আবির্ভাব হয়। পরিপার্শ্বের প্রভাবহেতু হোমোসেপিয়েন বা প্রকৃত মানবজাতির দৈহিক গড়নে পার্থক্য দেখা দিল। মস্তকের গঠন, দেহের দৈর্ঘ্য, চোখের আয়তন ও বর্ণ, নাসিকার আকার, কেশরাজির প্রকারভেদাদি নিয়ে মানবজাতিকে মোটা-মুটি নিগ্রো, ককেসীয়, অস্ট্রোলয়েড ও মঙ্গোলীয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা হল। এদের মধ্যে অবিরাম মিশ্রণ চলতে থাকে। এই মিশ্রণ ও উদ্‌বর্তনের মধ্য দিয়েই কিন্তু বাঙালীর আবির্ভাব। এই বাঙালীর একজন কতখানি নিগ্রো, কতখানি ককেসীয়, কতখানি অস্ট্রোলয়েড বা কতখানি মঙ্গোলীয় এখনও পর্যন্ত তা বলা শক্ত।

আদিযুগ থেকে মানুষ বাঁচার জন্য, নিরাপদে টিঁকে থাকার জন্য একের পর এক সংগ্রাম করে গেছে। সে সংগ্রামের প্রেরণা জুগিয়েছে তার বুদ্ধি ও মন। কিন্তু তখনও তাদের প্রকৃত পারিবারিক জীবন ছিল না। প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন করতে জানত না, কেবল সংগ্রহ করতে জানত তারা, গৃহ-নির্মাণ করতেও জানত না। বৃক্ষচ্ছায়া ও গিরিগুহায় থাকত রৌদ্র-বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করতে। ক্রমে তারা উন্নততর মস্তিষ্কের অধিকারী হয়। সৃষ্টিশীল মানবমন কৃত্রিম আয়ুধ বা অস্ত্র নির্মাণ করে বলশালী প্রকৃতি ও প্রাণীর উপর প্রভাব বিস্তার করে। ফলমূল সংগ্রহ, মৎস্য ও বন্যজন্তু শিকারের সাহায্যে দিনাতিপাত করতে থাকে। আগুনের ব্যবহার শেখে। হাতিয়ার ও অগ্নি মানুষকে দ্রুত আরো আলোর দিকে আরো শক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

এগোতে গিয়ে মানুষ শুধুমাত্র প্রকৃতির দেওয়া ফলমূল, লতাপাতা, জীবজন্তু, মৎস্য, পশুপক্ষীর অনিশ্চয় আহরণের মধ্যে তাদের আবদ্ধ রাখল না। ক্ষুধা থেকে মুক্তি পেতে আহরণ ত্যাগ করে উৎপাদনে সচেষ্ট হয়। ফলমূলশস্যাদির জন্য শুরু করে কৃষি, মাংসাদি সংগ্রহের জন্য আরম্ভ করে পশুপালন। গড়ে তোলে আবাসস্থান।

কৃষির আবিষ্কার মহিলারাই করেন তাই কৃষিকার্যের শুরুতে সেখানে স্ত্রীলোকেরই প্রাধান্য ছিল। শিকার ও পশুপালন ছিল পুরুষের কাজ। বাহ্যতঃ প্রকৃতির করুণার উপর পূর্বের মত নির্ভর করতে হল না তাদের। তথাপি বজ্রবিদ্যুৎ, ঝড়ঝঞ্ঝা, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি, সর্প, শ্বাপদাদি তাদের

বিব্রত করে চলল। ভয় থেকে যাদু ও ধর্মের বীজ অঙ্কুরিত হল, দেখা দিল চিত্রকলা, নৃত্য-গীতাদি। গড়ে উঠল গ্রাম, জনপদ, সহর, নগর, শিল্প, সাহিত্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতি। ঋতুর সঙ্গে ব্যক্তিমনের যোগাযোগ ঘটল। দেখা দিল রাশি, মাস, পক্ষ ও বার প্রকরণাদি। চিহ্নিত হল বর্ষ। চেষ্টা চলল সৌরজগৎ জানতে, চাঁদ, মঙ্গল গ্রহ-আদি জয় করতে। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা এগিয়ে চলল। কারণ বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরের গভীর মিল।

বারো মাস ও ছয় ঋতুর আবর্তনের ভিতর দিয়ে প্রকৃতি কেবলই রূপ বদলায়। মানুষও। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যোগ সুখদুঃখের অনুভূতিতে। অন্তরের ঘনিষ্ঠতায়। মানুষ তাই প্রকৃতিকে অনেকখানি তার সুখদুঃখের ভাগী করে নিয়েছে। নারী-পুরুষের দেহজ সুখভোগের ইচ্ছাও প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কোন ঘটনা নয়। প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মের অন্ত নেই। নিয়মের পথ ধরেই নর ব্যয়শীল, নারী স্থৈর্য ও ধৈর্যের মূর্তি। নর অস্থির, চঞ্চল ও অধীর, নারী শান্ত কোমল ও স্থির। এবং একই নিয়মে নর জনক, নারী পোষয়িত্রী ; নর বীজ, নারী ক্ষেত্র ; নর ভর্তা, নারী ভার্যা ; নর পতি, নারী পত্নী ; নর স্বামী, নারী স্ত্রী ; নর সহকাররূপ আশ্রয়তরু, নারী নবমালিকারূপ লতাবধূ। প্রয়োজনে বা প্রকৃতির আহ্বানে বঙ্গনারী অশ্বারোহণপূর্বক যুদ্ধ পরিচালনা করে শৌর্য ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। রাজ্যশাসন করে সুখ্যাতি পেয়েছে, পতিপ্রাণতায় স্মরণীয়া হয়েছে।

লোকাচারের বন্ধন স্বীকার করে নিয়েই সে প্রকৃতির রাজ্যে বিচরণ করছে। কুটুম্ববেষ্টিত, ব্রতনিয়মক্লিষ্ট নারীর শীর্ষাবগুণ্ঠন বোধহয় নরের উষ্ণীষস্থানীয় ছিল যা থেকে এসেছে মুখাবগুণ্ঠন। নারীর ভূষণ যে লজ্জা, বঙ্গনারী তার সার্থকতা রক্তে মিশিয়ে নিয়েছে। এই লজ্জা থেকে বাঁচতে সে অন্তঃপুরে ঢুকেছে এবং প্রয়োজন মত বাইরেও এসেছে। কিন্তু হঠাৎ একদিন একশ্রেণীর নারীর বাইরে আসা বন্ধ হয়ে গেল। এই শ্রেণী শ্রমজীবী বা কৃষক সম্প্রদায়ভুক্তা নন, রাজানুগৃহীত সম্প্রদায়ভুক্তাও নন—মাঝামাঝি একশ্রেণী, যারা নারীকে রক্ষিতা করতে গিয়ে অরক্ষিতা অগতিকা করেছিল, দেশাচারের প্রভাবে নারী তখন বাইরের বাতাস গায়ে লাগাতে পারে নি, প্রকৃতির দানকে প্রকৃতির ভালবাসাকে উপভোগ করতে পারে নি।

বিনা কারণে কার্য হয় না, আচারও হয় না। প্রাকৃতিক নিয়মেই লোকাচারের সৃষ্টি। নানাবিধ আচার-ধর্মাচার, শিষ্টাচার, সদাচারাদির

জন্ম। সব আচার সংস্কার নয়, সব আচার সদাচার নয়, যা সদাচার তাই ধর্ম, যা ধর্ম তাই সদাচার। কেবল আচার ও ব্রত-নিয়মে নারীকে বেঁধে রাখলে সে পুরুষের মনের দোসরে পরিণত হতে চেষ্টা করবে কখন? সদাচার নর ও নারী উভয়েরই ধর্ম, প্রকৃতির ধর্ম। সদাচারে উভয়কে সমান হতে হবে, সমান হলেই স্ত্রী সহধর্মিনী, সহমর্মিনী, অর্ধাঙ্গিনী।

আচারে ও গৃহস্থালীকর্মের মূলে আছে বিদ্যা। সে বিদ্যা সম্যক্ অধ্যয়ন করতে দীর্ঘ ধৈর্যের প্রয়োজন। কর্মে আনন্দ ও বৈচিত্র্য না থাকলে মন বসে না। নিমিত্ত থেকে আসে কর্মে আনন্দ, জীবন উৎসবময় হয়ে ওঠে। উৎসবমাত্রেরই কর্ত্রী নারী, যারা রোদন-পরায়ণা কোমলতা ও মাতৃত্বের প্রতিমূর্তিতে নমস্যা। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ঋতুবৈচিত্র্য অনুযায়ী নারী ও পুরুষ শাসিত হয় বলে সকল দেশের উৎসব, ধর্মপ্রচেষ্টা, সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রগতি একই পথে এগিয়ে যায় না, যেতে পারে না।

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং ভৌগোলিক সংস্থানের ফলে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন মানুষ, ভিন্ন ভিন্ন উৎসবাদির সৃষ্টি হয়। তাই মরুবাসী, দ্বীপবাসী, নদীমাতৃক সমভূমির অধিবাসী এবং পাহাড়ী জীবনযাত্রায় পার্থক্য দেখা যায়। প্রাকৃতিক পরিবেশ সমাজ ও সংস্কৃতির ধারাকে প্রভাবিত করে। পর্বতের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর, সমুদ্রের দুস্তর পরিখা আমাদের সমাজ ও সভ্যতাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। ঐক্যভাব গড়েছে। হিমালয় একদিকে দিয়েছে নিরাপত্তা অপরদিকে হিমালয় উৎসারিত নদনদী সুবিস্তীর্ণ এলাকাকে সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা করেছে। দক্ষিণাগত জলকণাবাহী মৌসুমী বায়ু হিমালয়ে প্রতিহত হয়ে ভূমি উর্বরা করে চলেছে। সে বন-অরণ্যানি দিয়েছে, কোথাও শীতল করেছে, কোথাও উষ্ণ, কোথাও নাতিশীতোষ্ণ, কোথাও আর্দ্র, কোথাও বা শুষ্ক করেছে। এই শীতলতা, উষ্ণতা, আর্দ্রতা, শুষ্কতা একই স্থানে ঋতুভেদে বিভিন্ন। প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতার ফলে গাছপালা, লতাগুল্ম এবং জীবজন্তুর মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। পার্থক্য দেখা যায় খাদ্য, বেশভূষা, ঘরবাড়ির গঠন ও উপাদানে। কৃষিপদ্ধতি, পশুপালন, শিল্প ও কারুকর্মেও এসেছে ভিন্নতা। প্রকৃতিশাসিত ও ঋতুচালিত জীবনে ফুটে উঠেছে বৈশিষ্ট্য।

প্রীতির পরিবেশে মানুষ জন্মলাভ করে, শৈশবে সে পুষ্টি পায়। প্রাণধারণের জন্য এই প্রীতি অতীব প্রয়োজনীয়। মানুষ যে পরিমাণ প্রীতি দেবার ক্ষমতা রাখে সে হয় সেইপরিমাণ ঐশ্বর্যবান, যে পরিমাণ প্রীতি গ্রহণ

করতে চায় সে হয় সেইপরিমাণ হীন। সেইজন্য যাঁরা ভালবাসতে জানেন তাঁরা সে ভালবাসার বিনিময়ে কোন মূল্য দাবী করেন না। সুতরাং বাঙলাকে সুখশান্তিতে পূর্ণ করে তুলতে চাই সেই মানুষ যিনি ভালবাসতে জানেন, -যিনি প্রীতি বিলোতে পারেন। এই ভালবাসা ও প্রীতি থেকে আসে ঋতু ও প্রকৃতিকে ভালবাসার প্রবৃত্তি ও নেশা।

ষড় ঋতুর বা বারো মাসের আবর্তন-বিবর্তনে বাঙলার লীলাবৈচিত্র্য যেমন অনবদ্য মনোরম বাঙলার লোকবৃত্তেও তেমনি মনোকুসুমের বিচিত্র বিকাশ। বাস্তবজীবনের ঘাত-প্রতিঘাত এবং আবেদন-নিবেদনে লোকসমাজ রচনা করেছে গানের আসর, বাজিয়েছে প্রাণের বীণা। শুরু করেছে পূজাচারানুষ্ঠান যে আচারানুষ্ঠানে সে উপহার দিয়েছে তদীয় শ্রমোৎপাদিত দ্রব্যসম্ভার, অঞ্জলি দিয়েছে প্রাণাধিক সামগ্রী, অর্ঘ্য দিয়েছে ধান্যদূর্বাদল ও পুষ্প দেবতার শ্রীচরণে। দেবতাকে সুখী করতে, দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে, দেবতার করুণা ভিক্ষা করতে এই কৃত্য। লোক-সমাজাশ্রিত দেবতা বেদ-ব্রাহ্মণ নিয়ন্ত্রিত নন। এ দেবতা লোক-সমাজের নিজস্ব ধ্যানধারণা চিন্তাভাবনার দ্বারা অধিষ্ঠিত, জাগতিক সুযোগ-সুবিধা দ্বারা চালিত, ঋতুর আবর্তন-বিবর্তন এবং প্রাকৃতিক পরিবেশানুযায়ী পরিকল্পিত। বাঙলার জনজীবন ষড়ঋতু বা দ্বাদশ মাসের সৌরাবর্তে নিয়ন্ত্রিত। তাই বাঙলার প্রাকৃত জন তথা লোক-জীবনের ভালমন্দ, সুখদুঃখ, আশাহতাশার সবকিছুই ঋতুকেন্দ্রিক। বাঙলার জনজীবন সম্পর্কিত তথ্য অবগত হতে সর্বাগ্রে তাই জানতে হবে বাঙলার ঋতু-বৈচিত্র্য ও ঋতু-প্রকৃতিকে। জানতে হবে সেই নিয়মকে যে নিয়মে পৃথিবী আপন কক্ষের উপর অনবরত ঘুরছে, সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। এই আবর্তনের ফলে হচ্ছে দিনমান ও রাত্রিমানের হ্রাস বৃদ্ধি।

প্রতি বৎসর ৭ই চৈত্র ও ৭ই আশ্বিন মাত্র দুবার দিন-রাত্রি সমান হয়। এই দুই মুহূর্তে দুটি বিন্দুর দ্বারা চিহ্নিত করে একটি রেখার দ্বারা যুক্ত করলে সেই রেখাটি হবে বিষুবরেখা। এই মিলনস্থানদ্বয় যথাক্রমে বাসন্তিকা ও শারদক্রান্তিপাত বিন্দু। সূর্যের এই বিষুবরেখা অতিক্রমণই ক্রান্তিপাত। সায়নমতে এই ক্রান্তিপাত থেকে বর্ষগণনা সুরু। ক্রান্তিবিন্দু থেকে সুরু করে পুনরায় একই ক্রান্তিবিন্দুতে ঘুরে আসার সময়টাকে বলা হয় ক্রান্তিবর্ষ বা সায়নবর্ষ। একটি সায়নবর্ষ বারোটি সায়নমাসে বিভক্ত। সূর্যের উত্তর দক্ষিণ গতি ও বিষুববৃত্ত লঙ্ঘনের কাল দ্বারা দিন ও রাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি নিয়মিত হয়। সেই জন্য ঋতুগুলো সায়নবর্ষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

আকাশমার্গে সূর্যের বার্ষিক গতিপথকে বারোটি খণ্ডায় বিভক্ত করা হয়েছে। এই খণ্ডাগুলো বারোটি রাশি। এরা চক্রাকারে পৃথিবীকে বেড় দিয়ে রয়েছে। জীবজন্তুর আকৃতির সঙ্গে এদের সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়েছে। যেমন আকাশের যে স্থানে নক্ষত্রপুঞ্জের সম্মিলনে একটি মেষের মত দেখায় সেই স্থানের নাম মেষরাশি। এই ভাবেই বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীনের নামকরণ হয়েছে।

বৈদিক ঋষিগণ নক্ষত্রচক্রকে বলতেন সোমগৃহ বা চন্দ্রগৃহ। এই চন্দ্র একটি উপগ্রহ এবং পৃথিবী গ্রহ। সৌরমণ্ডলের অপর আটটি গ্রহ হচ্ছে—বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো। পৃথিবী যেমন সূর্যের চারদিকে ঘোরে, চন্দ্র তেমনি পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘোরে। এই ভাবে ঘুরে আসতে প্রায় ত্রিশ দিন বা এক মাস সময়ের দরকার হয়। এই থেকেই এসেছে চান্দ্রমাস। এতদ্দেশে নক্ষত্রচক্রের কল্পনা আগে, তারপরে করা হয়েছে রাশি বিভাগ। যে তারা বা নক্ষত্রের সমষ্টি নিয়ে রাশিচক্রের সৃষ্টি তারা হচ্ছে অশ্বিনী—অশ্বমুখ সদৃশ, ভরণী—যোনী-সদৃশ, কৃত্তিকা—কর্তারিকা বা কাটারি সদৃশ, রোহিণী—শকট সদৃশ, মৃগশিরা—মৃগের মস্তকের ন্যায়, আর্দ্রা—ভিজা অর্থে গাঁমলা সদৃশ, পুনর্বসু—গৃহ সদৃশ, পুষ্যা—বাণ সদৃশ, অশ্লেষা—চক্রাকার বা সর্পাকার সদৃশ, মঘা—গৃহ সদৃশ, পূর্বফাল্গুনী—শয্যা সদৃশ, উত্তরফাল্গুনী—মঞ্চ-শয্যা সদৃশ, হস্তা—হস্ত সদৃশ, চিত্রা—মুক্তা সদৃশ, স্বাতী—প্রবাল সদৃশ, বিশাখা—তোরণ সদৃশ (বিশাখার অন্য নাম রাধা), অনুরাধা—বলি সদৃশ (রাধার পরে অনুরাধা সম্ভবত শ্রীকৃষ্ণ), জ্যেষ্ঠা—কুণ্ডল (মতান্তরে জ্যোষ্ঠি) সদৃশ, মূলা—সিংহ পুচ্ছ (মতান্তরে মূল) সদৃশ, পূর্বাষাঢ়া—মঞ্চ-সদৃশ, উত্তরাষাঢ়া—হস্তিদন্ত সদৃশ, শ্রবণা—ত্রিপদ (বিষ্ণুর) মতান্তরে কর্ণ সদৃশ, ধনিষ্ঠা—মৃদঙ্গ সদৃশ, শতভিষা—চক্র সদৃশ, পূর্বভাদ্রপদ—যমল-দ্বয় সদৃশ, উত্তরভাদ্রপদ—ভদ্রাসন সদৃশ এবং রেবতী—মৃদঙ্গ সদৃশ। নিরয়ন মতানুসারে এই সব নক্ষত্র সর্বদা স্থির থাকে, কিন্তু গ্রহ, উপগ্রহ ও ক্রান্তিপথ সমস্তই চলমান। কোন একটি নির্দিষ্ট নক্ষত্র থেকে রবির কল্পনা করে নিরয়ণ বর্ষের সুরু। সায়ন বর্ষ নিরয়ণ বর্ষের চেয়ে কুড়ি মিনিট কম। নিরয়ণ মতানুসারে প্রধান প্রধান নক্ষত্রগুলো সাতাশটি ভাগে বিভক্ত। এই সাতাশটি ভাগ সাতাশটি নক্ষত্র। নিরয়ণ বর্ষই সৌরবর্ষ। সৌরবর্ষ আবার বারোটি মাসে বিভক্ত। সূর্যের বিভিন্ন রাশি পরিভ্রমণানুযায়ী

সৌর মাসের সৃষ্টি। সূর্যের মেষরাশিতে গমনকালে বৈশাখ, বৃষে—জ্যৈষ্ঠ, মিথুনে—আষাঢ়, কর্কটে—শ্রাবণ, সিংহে—ভাদ্র, কন্যায়—আশ্বিন, তুলায়—কার্তিক, বৃশ্চিকে—অগ্রহায়ণ, ধনুতে—পৌষ, মকরে—মাঘ, কুম্ভে—ফাল্গুন ও মীনে—চৈত্র। দীর্ঘদিন থেকে বাঙালীর বর্ষগণনা এইভাবেই চলে আসছে।

মকরক্রান্তি বা মাঘমাসে সূর্যের যে গতি তা উত্তরায়ণ এবং কর্কট-ক্রান্তি বা শ্রাবণমাসে সূর্যের যে গতি তা দক্ষিণায়ন। এই অয়নগতির মান সম্পর্কে জ্যোতিষ সিদ্ধান্তকারদের মধ্যে মতৈক্য না থাকায় সায়ন-বর্ষারম্ভে অনেকসময় অনৈক্য সৃষ্টি হয়। ফলে বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত বা গুপ্তপ্রেস ইত্যাদি পঞ্জিকার মধ্যে মতে অনৈক্য সৃষ্টি হয়।

সৌরবিজ্ঞানের সঙ্গে বর্ষারম্ভ বা বর্ষ গণনার কোন সম্পর্ক নেই। সৌরমাস ছাড়া চান্দ্রমাসও বাঙলায় জনপ্রিয়। সূর্য থেকে চন্দ্রের দূরত্ব এই বিভাগের ভিত্তি। প্রথমে এই দূরত্ব অনুযায়ী তিথি বিভাগ। অমাবস্যার পরে পনেরটি তিথিতে শুক্লপক্ষ এবং পূর্ণিমার পরে পনেরটি তিথিতে কৃষ্ণপক্ষ। হিন্দু ধর্মকৃত্যাদি এই তিথির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বারো মাসের প্রত্যেক মাসেই একই ভাবে তিথিরা আসেন ও যান। এই প্রত্যেকটি তিথির এক একজন করে তিথ্যাধিপতি দেবতা আছেন। যেমন প্রতিপদের—অগ্নি, দ্বিতীয়ার—প্রজাপতি, তৃতীয়ার—গৌরী, চতুর্থীর—গণেশ, পঞ্চমীর—সর্প, ষষ্ঠীর—গুহ, সপ্তমীর—রবি, অষ্টমীর—শিব, নবমীর—দুর্গা, দশমীর—যম, একাদশীর—বিশ্ব, দ্বাদশীর—হরি, ত্রয়োদশীর—মদন, চতুর্দশীর—হর, পূর্ণিমার—চন্দ্র এবং অমাবস্যার—পিতৃগণ।

তিথি নক্ষত্রাদি নিয়ে রাশি। অশ্বিনী ভরণী ও কৃত্তিকা নক্ষত্রের প্রথম একপাদ মেষরাশি, কৃত্তিকার শেষ তিন পাদ রোহিণী ও মৃগশিরা নক্ষত্রের প্রথম দুইপাদ বৃষরাশি, মৃগশিরার শেষ দুইপাদ আর্দ্রা ও পুনর্বসুর প্রথম তিনপাদ মিথুনরাশি, পুনর্বসুর শেষপাদ পুষ্যা ও অশ্লেষা নক্ষত্র কর্কটরাশি, মঘা পূর্বফাল্গুনী ও উত্তরফাল্গুনীর প্রথম একপাদ সিংহরাশি, উত্তরফাল্গুনীর শেষ তিনপাদ হস্তা ও চিত্রার প্রথম দুইপাদ কন্যারাশি, চিত্রার শেষ দুইপাদ স্বাতী ও বিশাখার প্রথম তিন পাদ তুলারাশি, বিশাখার শেষপাদ অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠানক্ষত্র বৃশ্চিকরাশি, মূলা পূর্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়ার প্রথম একপাদ ধনুরাশি, উত্তরাষাঢ়ার শেষ তিনপাদ শ্রবণা ও ধনিষ্ঠার প্রথম দুইপাদ মকররাশি, ধনিষ্ঠার শেষ দুইপাদ শতভিষা ও পূর্বভাদ্রপদের প্রথম দুইপাদ কুম্ভরাশি এবং পূর্বভাদ্রপদের শেষপাদ উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতীনক্ষত্র

মীনরাশি। এই দ্বাদশটি রাশির প্রত্যেকেরই এক একজন করে অধিপতি আছেন। যেমন মেষরাশির অধিপতি মঙ্গল, বৃষ ও তুলার শুক্র, মিথুন ও কন্যার বুধ, কর্কটের চন্দ্র, সিংহের রবি, বৃশ্চিকের মঙ্গল, মীন ও ধনুর বৃহস্পতি, এবং মকর ও কুম্ভের শনি। রাশি ও মাস নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে ঋতুগণ।

ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে মানুষের চিত্তের পরিবর্তন। তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ প্রতিপালন করে ঋতু, মাস, পক্ষ ও তিথি অনুযায়ী নানাবিধ আচার অনুষ্ঠান। প্রত্যেক ঋতুর ফুলফল আকাশবাতাসের সঙ্গে আশ্চর্য-রকম সৌন্দর্যরস ও শিল্পে পরিপূর্ণ। ষড়ঋতুর ব্রতউৎসব আচার-আচরণাদি বাঙালীর খাঁটি ও নির্ভেজাল সম্পদ। ষড়ঋতুর আগমন-নির্গমনের মধ্যে আমরা বাঙালীর এই খাঁটিত্ব উপলব্ধি করতে পারি। এই ঋতুকে উদ্দেশ্য করে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, ঋতুগণ মঙ্গলের জন্যই, তাঁদের আসা-যাওয়া ঋতের নিমিত্ত। ঋত [ঋ + ক্ত, কতৃবা, কর্মধা] মানে পরব্রহ্ম, সত্য। ঋতপরায়ণ ঋতুদেবতাগণ রীত বা গতি পালন করেন। সে গতি প্রথাবদ্ধ ও বেগবান, দেশজ আচার-আচরণ, উপহার-ব্যবহার, পূজা-পদ্ধতির দ্বারা চালিত।

বহু মানুষ মনে করেন গতি জগতের বিকৃত অবস্থা, স্থিরতা স্বাভাবিক অবস্থা—আসলে গতিই স্বাভাবিক, স্থিরতা কেবল গতিরোধ মাত্র। পৃথিবীতে কোন স্থির বস্তুর স্থান নেই। চলমান জগতে খাপ খাওয়াতে পারে না সে।

পৃথিবীর চারিপার্শ্বস্থ বায়ু প্রবহমানা, বৃক্ষপত্রসকল নৃত্যরতা, স্রোতস্বিনী কলতানমুখরা, জীবসকল নিজ নিজ প্রয়োজনে কৃতকর্ম। এমন কি যা তাপ বা উত্তাপ তা-ও পরমাণুগণের আন্দোলনের ফসল। যেখানে সকল বস্তু তাপমুক্ত সেখানে সকল বস্তুর পরমাণু অহরহ পরস্পর কর্তৃক আকৃষ্ট, সন্তাড়িত এবং সঞ্চালিত। অতএব পৃথিবীর সকল বস্তুই কোন না কোন গতিবিশিষ্ট। আলোকও পরমাণুসকলের সঙ্গে নয়নেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে অনুভূত হয়। তাই আলোক আন্দোলনেরও গতি বর্তমান।

পৃথিবী অতি প্রখর বেগবিশিষ্টা; অনন্তকাল আকাশমার্গে ধাবমানা। সূর্যমণ্ডলের তাপ, আলোক আকর্ষণ এবং বৈদ্যুতিকী শক্তি পৃথিবীস্থ গতিরই কারণ। গতিই জাগতিক নিয়ম, গতি চঞ্চল। জগৎ সর্বদা চঞ্চল, ততোধিক চঞ্চল বিশ্বপ্রকৃতি ও নৈসর্গিক রাজ্য। তাই ঋতুগণের অঙ্গরাগ ও সাজবেশ। আকাশে-বাতাসে বিচিত্র বর্ণচ্ছটা। বনানী-অরণ্যানি উদ্যান-কানন পত্রপুষ্প পল্লবসম্ভারে সজ্জিত। নদনদী পাহাড়পর্বত সুখদুঃখ ব্যথাবেদনার উচ্ছ্বাসে আন্দোলিত। সূর্য-চন্দ্রের উদয়-অস্তে যেমন কমলকুমুদের জীবনমরণ বিভিন্ন

ঋতুর ছোঁয়ায় তেমনি চিত্তসিন্ধুর জোয়ার-ভাঁটা খেলে প্রতিনিয়ত।

স্মরণীয়, বৈষ্ণবেরা সূর্যকে শ্রীকৃষ্ণরূপে কল্পনা করেন এবং চন্দ্রকে শ্রীরাধিকা রূপে। তারামণ্ডলী শ্রীরাধিকার সখিবৃন্দ। প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে এদের সাক্ষাৎ ঘটে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক হিসাবেই সূর্যকে বলা হয়েছে বীর্য। সূর্য তেজ ও বীর্যবান। কোন কোন অতিকথায় সূর্য ও চন্দ্রকে স্বামী-স্ত্রী এবং তারকারাজিকে তাদের সন্তানসন্ততি বলা হয়েছে। আবার কোন কোন পৌরাণিক কথায় চন্দ্র ও সূর্য যথাক্রমে ভ্রাতা ও ভগ্নী। নাথসম্প্রদায় মনে করেন যে মনুষ্য জীবনের মৌল অবদান চন্দ্র ও সূর্যের নিকট থেকে গ্রহণ করে। চন্দ্র রস, সূর্য অগ্নি, চন্দ্র নারী, সূর্য পুরুষ। চন্দ্র স্থিতি দেয় ও উৎপাদন করে, সূর্য বদলায় ও ধ্বংস করে। চন্দ্র শক্তি, সূর্য শিব। এই চন্দ্র-সূর্য, শিব-শক্তির দ্বারাই জীবজগতের সৃষ্টি, আদি-অনাদির উৎপত্তি। দেবদেবীগণকে মানবীকরণের এই প্রচেষ্টা বাঙালী জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ধৃতব্রত ঋতুগণ মঙ্গল বহন করেন বলে রচিত হয়েছে ঋতুমঙ্গল। কৃতকর্ম সকলে, গতিতে বিশ্বাসী প্রত্যেকে নিয়ত বিচরণ করেন মঙ্গলের পথে। ঋতুর আবর্তন-বিবর্তনের পথে, যথাক্রমে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত নামধারী ষড়ঋতু বৎসরের ছয়টি কাল-বিভাগ। লোকব্যবহারানুসারে এই কাল বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র। দ্বাদশ মাসে দ্বাদশটি রাশি সূর্যদেবকে ঘিরে থাকেন। সূর্য অতি বৃহৎ রশ্মিময় তেজোদ্দীপ্ত গোলক। এই গোলকের দিকে তাকানো যায় না অন্ধ হবার ভয়ে। কেবল সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যতেজ চন্দ্রান্তরালে লুক্কায়িত হলে কালিমাখা কাঁচ বা পাথরে জল রেখে তৎপ্রতি দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। দূরবীক্ষণে দেখা যায় সূর্যগর্ভ নিক্ষিপ্ত পদার্থরাশির মধ্যে আমাদের পৃথিবীর ন্যায় অনেক পৃথিবী ডুবে থাকতে পারে।

জগতের আদি আছে কিনা আমরা জানি না। শুনেছি সৃষ্টি অনাদি, জগৎ নিত্য। অদ্যাপি বিজ্ঞানের এমন শক্তি হয় নি যে মীমাংসা করবে জগতের আদি আছে কিনা। তবে এটা বলা যেতে পারে যে পৃথিবী সুরুতে আধুনিক সময়ের মত এরূপ তৃণলতাশস্যবৃক্ষময়ী সাগরপর্বতাদিপরিপূর্ণা জীবসঙ্কুলা জীববাসোপযোগী ছিল না। আকাশ একালের মত চন্দ্র-সূর্যনক্ষত্রাদি বিশিষ্ট ছিল না। তখন জল ছিল না, ভূমি ছিল না, বায়ু ছিল না; কিন্তু যার দৌলতে চন্দ্র সূর্য তারার সৃষ্টি হয়েছে, যা থেকে জলাদিভূমি নদনদী সিন্ধুবনবিটপীবৃক্ষ তৃণলতাগুল্মপুষ্প পশুপক্ষী মানবের

সৃষ্টি হয়েছে সেই মৌলপদার্থ অবশ্যই ছিল। জগতের রূপান্তর ঘটেছে, ঋতু প্রকৃতির রূপান্তর ঘটেছে, সমাজের রূপান্তর ঘটেছে, ঘটে চলেছে। কিন্তু মৌলপদার্থের বোধহয় তেমন রূপান্তর হয়নি। সমাজ-সংসারে বক্ষ্যমাণ রূপান্তরের বর্ণনা হয়তো সমাজ বিজ্ঞানীর পক্ষেই দেওয়া সম্ভব যদি তিনি ঋতুবৈচিত্র্যগত তথ্য সম্পর্কে সচেতন থাকেন, অবহিত থাকেন নিসর্গের সঙ্গে মানব মনের প্রেমপ্রীতির সহজাত ও স্বতঃস্ফূর্ত সম্বন্ধ সম্পর্কে।

অনাদিকাল থেকে বিশ্বস্রষ্টা কঠিন বন্ধনে বেঁধে দিয়েছেন এদের দুজনকে। সভ্যতার বিবর্তনে, প্রাণধারণের বিচিত্রপথের আবিষ্কারে, প্রকৃতির খেয়ালী মনকে মানিয়ে নিতে মানুষ পঞ্জিকা সৃষ্টি করেছে। সামাজিক শৃঙ্খলা ও আচার-অনুষ্ঠানাদি প্রতিপালনে এ পঞ্জিকা অনস্বীকার্য। 'ব্রাহ্মং দিব্যং তথা পিত্রং প্রজাপত্যং গুরোস্তথা। সৌরঞ্চ সাবনং চান্দ্রমার্ক্ষং মানানি বৈ নব ॥' সূত্রানুযায়ী পঞ্জিকা নির্ণয়ের নয় প্রকার মান তথা সৌর, চন্দ্র, নক্ষত্র, সাবন, বৃহস্পত্যাদির মধ্যে সৌরমানকেই গ্রহণ করেছে বাঙালী। 'মেষাদয়ো দ্বাদশৈতে মাসাস্তৈরেব বৎসরঃ' অর্থাৎ মেষরাশিতে সূর্যের অবস্থানকালীন সময় থেকে মীন রাশি পর্যন্ত দ্বাদশরাশি অতিক্রমণে পূর্ণ হয় একটি বৎসর, যাকে ষড়ঋতু ও দ্বাদশটি মাসে বিভক্ত করা হয়েছে। এই অতিক্রমণে একটি করে রাশি প্রতিমাসে সূর্যবলয়ে আসেন এবং প্রতি দু মাস অন্তর আসেন একটি একটি করে ছয়টি ঋতু। রাশি ও ঋতু পরিক্রমণান্তে পূর্ণ হয় একটি বৎসর। বৎসরান্তে সুরু হয় নতুন পরিক্রমা। আরম্ভ হয় নতুন বৎসর। অনাদিকাল থেকে এ আবর্তন-বিবর্তন চলছে, চলবে। এ চলার পথে প্রতিনিয়ত ঋতুগণ নতুনের সান্নিধ্যে আসছেন, প্রতি পরিক্রমায়ই প্রত্যক্ষ করছেন পরিবর্তন। প্রতি বৎসর আবর্তন-বিবর্তনের দিনকালাদি তাই পরিবর্তিত হয়। পূজানুষ্ঠানের দিন তারিখ ক্ষণ বদলে যায়। কোনও একস্থানে স্থির হয়ে থাকে না, থাকতে পারে না পৃথিবী। পৃথিবীর গতি জীবন্ত ও বেগবন্ত।

জ্যোতিষশাস্ত্রমতে মেষরাশি প্রদক্ষিণকারী রাশির প্রথম রাশি, এই রাশিতেই বর্ষারম্ভ বাঙলা মতে। কিন্তু মাসের নামকরণ হয়েছে চান্দ্রমাসের নক্ষত্রের নামানুসারে 'নক্ষত্রনাম্না মাসাস্তু জ্ঞেয়াঃ পর্ব্বান্তযোগতঃ' বচনানুসারে।

চন্দ্র আমাদের জীবনে নানাভাবে জড়িত। বর্ণনায়, উপমায়, বিচ্ছেদে, মিলনে, অহঙ্কারে খোসামোদে সর্বত্রই চাঁদের আদর। বর্ষ-মাস-দিন-কাল গণনায়ও চন্দ্রের কাজের অন্ত নেই। পৃথিবী ও চন্দ্র উভয়ে একই পথে একত্রে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। উভয়ে উভয়ের মাধ্যাকর্ষণাকেন্দ্রের বশবর্তী।

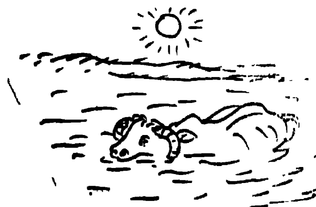
চন্দ্র দেবতা কিন্তু হস্তপদবিশিষ্ট দেবতা নন, জ্যোতির্ময় কোন পদার্থ নন, কেবল পাষাণময়, আগ্নেয়গিরি পরিপূর্ণ জড়পিণ্ড। তার কোথাও আছে অত্যুচ্চ পর্বতমালা, কোথাও গভীর গহ্বররাজি পৃথিবীরই মত। তাই চন্দ্রজয়ে মানুষের এত নেশা, এত আশা। চন্দ্রের কলায় কলায় হ্রাসবৃদ্ধি, একপক্ষকাল সে আপন মেরুদণ্ডের উপর সংবর্তন করে। এই সময় আমাদের কাছে একটি পক্ষ। আমাদের একটি পক্ষ চাঁদের একটি দিন। আমাদের একটি বৎসর সূর্যের একটি দিবস। সূর্যের মেষরাশিতে অবস্থানকালীন বিশাখা নক্ষত্রে পূর্ণিমারূপ চান্দ্রিকদিন বা পক্ষের অন্ত হয় বলে মেষরাশিস্থিত কাল বৈশাখ। সেই থেকে চিত্রা বা তৎসন্নিহিত নক্ষত্রে মীনরাশিস্থিত কাল চৈত্রে একটি সৌর-দিবস। একটি সৌর-দিবসের জন্য প্রয়োজন পৃথিবীর তিন শত পঁয়ষট্টিটি দিনের বা চব্বিশটি চান্দ্রদিনের (পক্ষের)। সূর্যের এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে প্রবেশ মুহূর্ত সংক্রান্তি। আসলে সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীসহ যাবতীয় গ্রহনক্ষত্রাদির প্রদক্ষিণ পথে এক একটি নক্ষত্র, এক একটি পক্ষ, এক একটি মাস, এক একটি ঋতু সূর্যের নিকটে আসে ও যায়। এই আসাযাওয়ার কাল নির্ণয়ের জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নানাবিধ মান বা স্ট্যাণ্ডার্ড নির্দিষ্ট করেছেন। বাঙলার লোকসমাজের পরিচিত, ব্যবহৃত ও স্বীকৃত মান সৌরমাসানুযায়ী। বঙ্গাব্দ, শকাব্দ, যুধিষ্ঠিরাব্দ, মল্লাব্দ, কলাব্দ, বিক্রমসম্বতাব্দ, গুপ্তাব্দ, ফসলী, বিলায়তী প্রভৃতি চলে আসছে বাঙলায়। লোকব্যবহারকে মান্য করতে গিয়ে অনেক সময় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা শাস্ত্রানুসরণ করতে পারেন নি। পঞ্জিকা রচনা করতে গিয়েও তাই অনেকক্ষেত্রে দ্বিবিধ আচরণবিধির বিধান দিতে হয়েছে তাঁদের। কারণ অয়নগতি বা সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন নাকি দ্বিবিধ এবং বার্ষিকগতির মান বহুবিধ। সূর্যসিদ্ধান্ত, সোমসিদ্ধান্ত, সাকল্যসিদ্ধান্ত, পরাশরসিদ্ধান্ত, লঘুবিশিষ্টসিদ্ধান্ত এবং আর্যশতশতিকা মতবাদ সমূহের উপর নির্ভর করে এক পঞ্জিকার সঙ্গে অপর পঞ্জিকার পার্থক্য সৃষ্টি হয়। ফলে বহু পঞ্জিকা ব্যবহারকারী বিভ্রাটে পড়েন। এই অসুবিধা দূর করার জন্য ভারত সরকার সায়নমতে সৌরপঞ্জী প্রবর্তন করেছেন। কিন্তু বাঙলার লোকসমাজের কাছে এখনও এ পঞ্জিকা গ্রহণযোগ্য হয় নি। এবং যতদিন লোকসমাজ সামগ্রিকভাবে সরকার প্রবর্তিত সৌরপঞ্জী গ্রহণ না করছেন ততদিন পঞ্জিকাসমূহের গণৎকারদের মতের অনৈক্যহেতু সাধারণ মানুষ বিভ্রান্তি এড়াতে পারবেন না।

হিন্দু ধর্মকৃত্যাদি তিথি ও ঋতুভিত্তিক। বৌদ্ধ ধর্মানুষ্ঠান এমন কি মুসলমান

অনুষ্ঠানও ঋতু ও পক্ষভিত্তিক। নিরয়ণ মতে গণনায় বর্ষারম্ভে সূর্য একই স্থির তারকার নিকট উপস্থিত থাকবে। বৎসরের প্রথম পূর্ণিমায় একই নক্ষত্রপুঞ্জে চন্দ্রকেও দেখা যাবে। এইরূপে বিশাখানক্ষত্রে বৈশাখীপূর্ণিমা, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমা ইত্যাদি। অসুবিধা শুধু ঋতুর আবির্ভাব নিয়ে। সূর্যের বিষুবক্রান্তি অতিক্রমণের সঙ্গে ঋতুর সম্পর্ক। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে ভারত সরকার প্রবর্তিত সায়নবর্ষের সঙ্গে হিন্দু ধর্মকৃত্যাদির কোন যোগ নেই। কিন্তু তা ঠিক নয়। কারণ সায়নবর্ষ যেমন ঋতুভিত্তিক আমাদের আচার-অনুষ্ঠানসমূহও তেমনি ঋতুকেন্দ্রিক। সত্য বটে, ঋতু-অনুষ্ঠান হিসাবে বাঙলায় শারদীয় দুর্গাপূজা কিংবা বাসন্তী পূজা ছাড়া অন্য উৎসবানুষ্ঠান স্পষ্ট নয়। কিন্তু সায়ন-বিরোধী গণৎকারেরা বাঙলার লোকসমাজের বহুল প্রচলিত ব্রতানুষ্ঠানাদি লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে সেগুলো সবই ঋতু-অনুষ্ঠান। লোক-জীবন অন্বেষণে দেখতে পাবেন যে বাঙলার লোকসমাজ ঋতু নিয়ন্ত্রিত, ঋতু শাসিত এবং ঋতু পালিত।

বাঙালী জীবনে ঋতুর ও প্রকৃতির প্রভাব অতি গভীর ও প্রচণ্ড। তাই বাঙালী ঋতু বরণ করেছে। ঋতুগণকে তারা মঙ্গলের বার্তাবহ হিসাবে গ্রহণ করেছে। ঋতু-বৈচিত্র্যকে জীবন-প্রবাহের ধারা বলে মেনে নিয়েছে। কাজে কাজেই বাঙালীকে জানতে, বাঙালীকে চিনতে প্রকৃতির সমারোহ, ধরিত্রীর খেয়াল, নদনদীর গতি, আকাশবাতাস ও পাতালের কম্পরূপ এবং ঋতু-বৈচিত্র্যকে জানতেই হবে। পান করতে হবে কপোতাক্ষের কাচের মতন জলকে। চলে যেতে হবে সুপারী-তাল-তমাল-খেজুর ও নারকেলের বাগানে। বকুল কিংশুক আম জাম বট কাঁঠাল ও হিজলের নীল ছায়ায়, ক্ষেত ও খামারের তৃণ-ভূমিতে, নদীতীরনীরে, শেফালী-মালতীর কুঞ্জবনে, ফণিমনসা গন্ধরাজ দোলনচাঁপার ঝোপ-ঝাড়-বাগানে এবং মূলোক্ষেতে। শীতের কুয়াশাজলে পা ভেজাতে হবে। পানিঘাস মুখে গাভীদল, জলভর্তি কলসী কাঁখে গ্রামবধূ, সলজ্জ চাষীবউর আনন্দউচ্ছল চোখ, খোকাখুকুর পুতুলখেলা ঘরকন্না দেখে দেখে তৃপ্তি পেতে হবে। কামরাঙা-লাল মেঘ, গ্রীষ্মের অসহ্য উত্তাপ মুনিসম শান্ত দীঘি, নদী-মাঠ নয়ানজুলি, কেশবতীকন্যাসম নীলসন্ধ্যা, লালপেড়ে ডুরে শাড়ী পরা কাজলনয়না, কুন্দ-করবী লাজ-রক্তিম মুখে যে রমণী হাসির ফুলকি ফোটায় অশোক-অধর কোণে নাচিয়ে ঊর্মিবুক তারই মুকুরে দেখতে হবে বাঙলার অপরূপ মুখ। দেখতে হবে সোনালী ধানের ক্ষেতে অন্ধকার ও জ্যোৎস্নার রূপ, সাগরের ঢেউ, হাঁসনাখালির বাঁক, রুক্ষ মাটির শুষ্কতা, গাছের ছায়া, কুয়াশার

আঁধার, মধুমালতীর তলে সখীদের মালাগাঁথা, সহচরীসাথে মানিনীর জলকেলী, প্রাণহরার বংশীবাদন, প্রিয়-পদরেখা বুকে ধরে রাখা রাঙামাটি, শুকতারা, দিগবধূ, লক্ষ্মীপেঁচা, বাদুড়, টুনটুনি ও চামচিকের ডাক, কচুরীপানার দল, শানবাঁধা শ্যাওলা ঘাট, ধবল বক, আইবুড়ো এ'য়োদের সাজ। দেখতে হবে কলার ভেলা, খিড়কির ঘাট, ভাঙা ঢেউ, সাঁঝের প্রদীপ, তুলসীর মঞ্চ। শুনতে হবে ঢাক ঢোল কাঁসি শাঁখ ও ঘুঙুরের ধ্বনি, উদাসী সুর, আউল-বাউলের গান, তরজা, পাঁচালী; কবি, ভাসান, আসান, যাত্রা ও কলকণ্ঠের অট্টহাসি। উপলব্ধি করতে হবে ব্যথিত নীরবতা, পাখীর মধুর স্বর। দেখতে হবে হিমসাদা বক ও সজিনার ফুল, খড়মুখো শালিখ, দলবাঁধা পিপীলিকা। এদের সকলের রূপ রস গন্ধ নিয়েই অপরূপ বাঙলা, বিচিত্র বাঙলা, সোনার বাঙলা, এপার বাঙলা, ওপার বাঙলা, জয় বাঙলা। এই বাঙলাই আমার জননী, আমার ধাত্রী, আমার দেশ, আমার স্বপ্ন, আমার বিলাস।



আশ্বিনে অম্বিকা পূজা
ঘটে-আলিপন।
অবশ্য আসিবেন প্রভু
করিবেন স্থাপন॥

কার্তিকে কালিয়দমন
খেলেন বনমালী।
কালিদহে ঝাঁপ দিয়ে
বর্ণ হ'ল কালি॥

অঘ্রাণে নতুন ধান
কৃষ্ণের সমান।
অবশ্য আসিবেন কৃষ্ণ
করিবেন নবান॥

পৌষে পাষণ্ড শীত
পরে প্রভুর গায়।

জনজীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা এবং ঋতু-বলয়ের বিশেষ বিশেষ তিথি স্মরণ করার জন্য নানা উৎসব আচার ও অনুষ্ঠানের জন্ম। পুরাতন ও বিগতকে বিস্মৃত হয়ে নতুনকে বরণ, উৎসবের আনন্দে ক্ষয়ক্ষতি লাভ লোকসানের হিসাব ভুলে গিয়ে নবীন সিদ্ধির হালখাতা মারফত দেওয়া হয় নতুনের ডাক। বৎসরের যাত্রাশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মনটাকে ক্ষণিক বিশ্রাম দিতেই শুধু পরিকল্পিত নয় নববর্ষ, এতে মনের আরও একটা দিকের পরিপ্রকাশ হয়, সে দিকটি হচ্ছে অতীতের গ্লানি, ব্যর্থতা ও ত্রুটিবিচ্যুতিকে ধুয়ে মুছে ফেলে নতুন করে জীবন শুরু করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা।

উৎসবের সময় বেছে নেবার মধ্যে আছে মস্তিষ্কের ব্যবহার। শস্য-সম্ভারে ফুলফলের প্রাচুর্যে প্রকৃতির রাজ্যে

যখন উৎসবের সমারোহ শুরু হয়ে যায় তখন থেকেই মানুষ একের পর এক উৎসবে মেতে ওঠে। বসন্ত ঋতুর শেষ আমেজ গায়ে মেখে শেষ ফোটা বকুলের গন্ধে বাঙালী আগত বৎসরের বৈচিত্র্য উপভোগ করতে প্রতিবৎসর তৈরী হয় গ্রীষ্মের শুরুতে।

বাঙালী বৎসরের শেষদিনটিকে বলে মহাবিষুব সংক্রান্তি বা চৈত্রসংক্রান্তি। এই দিনে সূর্যের মেষরাশিতে সংক্রমণ হয়। বর্ষ শুরুর সঙ্গে বাঙালীর আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ প্রকাশ পায়। প্রাত্যহিক প্রয়োজনের বাইরে প্রমোদানুষ্ঠানে জাগ্রত হয় মৈত্রীভাবনা। মানুষ মানুষের আত্মার আত্মীয়ে পরিণত হয়ে সকলে সকলের তৃপ্তিবিধান করতে চেষ্টা করে। বৎসরের আরম্ভতেই কৃত্য প্রতিপালিত হয় সম্বৎসর আনন্দানুষ্ঠান, তৃপ্তি, সুখ ও শান্তিতে দিনাতিপাত করার ইচ্ছা নিয়ে।

গ্রীষ্মের আগমনে একদিকে আমরা তাপাহত অন্যদিকে রসাপ্লুত। নতুন বৎসরে নতুন ধ্যানের শুরু। সমস্ত দ্বেষরেষাদি পুরাতন বৎসরের সঙ্গে সঙ্গে বর্জন করে সৌহার্দ্য ও প্রীতিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির উদ্বেলতায় মেতে ওঠে বাঙালী বৈশাখের শুরুতে নববর্ষের প্রথম প্রভাতে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন অব্দ, বৎসর বা সাল প্রচলিত। লোকব্যবহারে বাঙলায় বঙ্গাব্দ সমধিক জনপ্রিয়। এই অব্দ ৯৬৩ হিজরী থেকে ৯৬৩ বঙ্গাব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। সম্রাট আকবর রাজস্ব আদায় ও রাজকার্যের সুবিধার্থে হিজরী নামে সাধারণ মুসলমান চান্দ্রবর্ষের পরিবর্তে একটি সৌরবর্ষের প্রবর্তন করেন প্রায় চারশত বৎসর আগে, ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ ১৪৭৯ শকাব্দের ১লা বৈশাখ থেকে বঙ্গাব্দ চালু হবার পূর্ব পর্যন্ত বাঙলায় হিজরী সালই চালু ছিল। তখন চান্দ্রমাসের হিসাবানুযায়ী হিজরী বছর গোনা হত। মহরম মাসের শুক্লা প্রতিপদে চাঁদ দেখার সময় থেকে বৎসরারম্ভ হত তখন। চান্দ্রমাস অনুযায়ী বছর ধরার ফলে

উঠিতে বসিতে সীতার
অর্ধেক রাত্রি যায়॥

মাঘে মাধব করে
মথুরা গমন।
দশ দিক দশ শূন্য
শূন্য বৃন্দাবন॥

ফাগুনে দোলযাত্রা
ফাগের ছড়াছড়ি।
জলকাদার মধ্যে দেখ
যাই গড়াগড়ি॥

চৈত্রে চাতক পাখী
করে কলরব।
তোমার বাণী শুনে
আমরা ধেয়ে এলাম
সব॥

বৈশাখে বিষম খরা
কৃষ্ণ কদমতলে।
পট্টবস্ত্র পরিধান
বনমালা গলে॥

জ্যৈষ্ঠে যমুনার জলে
খেলেন বনমালী।
শ্যাম অঙ্গে দিতাম জল
অঞ্জলি অঞ্জলি॥

আইল আষাঢ় মাস
বরষা সময়।
পক্ষী আদি দেখে সব
বাসার সঞ্চয়॥

আষাঢ়ে নবীন মেঘ
উঠিল গগন ছাইয়ে।
শ্যামের চরণ কালো
মেঘ রইলো দাঁড়িয়ে॥

রাজকর্মে অসুবিধা দেখা দিয়েছিল বাঙলায়। কারণ, ভারতের প্রায় সর্বত্র সৌরমাস অনুযায়ী বছর ধরা হত।

বর্তমান প্রচলিত বঙ্গাব্দের (বা শকাব্দের) গ্রীষ্মঋতু শুরু হয় সূর্যদেবের মেষরাশিতে অবস্থানের সময় থেকে, বৃষরাশি অবস্থানাবধি চলে তার জের। সূর্যের মেষরাশি অবস্থানকালীন সময় বিশাখা নক্ষত্রের চান্দ্রমাসে। এই সময়টা বৈশাখ। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে বা তার অব্যবহিত পূর্বাপর নক্ষত্রে সূর্যদেব যখন বৃষরাশিতে পৌঁছান তখন শুরু হয়ে যায় জ্যৈষ্ঠ। শাস্ত্রানুসারে বৈশাখমাস বসন্ত ঋতুর শেষ মাস, কিন্তু বাঙলার লোকব্যবহারে বৈশাখ গ্রীষ্মঋতুর প্রথম মাস এবং জ্যৈষ্ঠ দ্বিতীয় মাস।

এ ঋতুর দেবতা রুদ্র, অগ্নিময় তাঁর রূপ। তাঁর সামনে দাঁড়ায় ধরিত্রী আকাশ একেবারে রিক্ত অঞ্জলি পেতে। পিপাসা জানায় তৃষ্ণাতুর প্রাণ। দিকবধূ সকলে রুদ্র দেবতার উপাসিকা। তাঁরা তপস্যা করেন বর্ষামঙ্গলের জন্য। তপস্যায় প্রীত রুদ্রের বরে রৌদ্রদীপ্ত আকাশ ছেয়ে ঝড় নেমে আসে মর্ত্যে। এই ঝড়ের প্রাক-মুহূর্তের রৌদ্রেপোড়া থমথমে দুপুরের কচি সবুজ বৃক্ষপত্রের দিকে তাকালে কষ্ট হয়। গ্রীষ্মের কাঠিন্যে ও ভ্রূকুটিতে মধ্যদিনে বন্ধ হয় পাখীর গান। মধ্যাহ্নে সূর্যতাপে গা পুড়ে যায়, বাতাসের স্পর্শ আতঙ্কের সৃষ্টি করে। খামারের গরু গাছের তলায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে যায়। সকালের কাজের পর তারা তাদের গামলা থেকে দানা চিবোয় আর লেজ নাড়ে, কাছের ছায়ায় বসে চাষী তামাক খায়। গল্প করে ফসলের, খন্দের। সবুজ মাঠ হলদে সোনালী হয়ে যায়। ধানকাটার সময় নিকটে। প্রান্তরপ্রান্তের কোণে উপবিষ্ট রুদ্রের কানে নৈঃশব্দ বাজে, ধরণী পিপাসার্তা হয়ে চাতকে পরিণত হয়। বহে গ্রীষ্মের ঝড়, বাতাসের 'লু'। এরই মধ্যে মাঝে মাঝে ঈশান কোণ থেকে হাওয়া-ঝড় ওঠে। প্রকৃতির খেয়ালখুশীর বালির ঝড় ধুলোর পাগলা ঢেউ মিলিয়ে যায় দিক থেকে

শাওনে শয়নে ছিলেন
শ্যামের মন্দিরে।
কে জানে এহেন পিয়া
যাইরে ছাড়িয়ে॥

ভাদরে ভরিল নদী
দুকূল পাথার।
উঠে যেতে করি মনে
না জানি সাঁতার॥

উড়ে যেতে করি মনে
পক্ষ না দেয় বিধি।
এমন দশা করে গেল
পিয়া গুণনিধি॥

শাওন মাস বিষম মাস
বিয়া নাইসে অয়।
এই মাসে বিয়া অইলে
সর্ব্বনাশ ঘটয়॥

শাওনে অইছিল বিয়া
বিপুলা সুন্দরী।
কালরাইতকুর মাঝে
বেটি অই গেছিল
রাঁড়ী॥

এর লাগি শাওন মাসে
বিয়া অইতে মানা,
এই মানা করিয়া
গেছেন ময়মুরব্বীদানা॥

ভাদো মাসে শাস্ত্রো
মতে বিয়াশাদী মানা।
কিওর লাগি মানা তা
কেউ অই জানে না॥

বিয়াত সামান্যি কথা
দেওাপূজা লইত।
এ মাসে করইয়া কাম
হকৃকোজি অইত॥

দিগন্তরে। তৃষ্ণার্ত রসিক মন তখন ক্লিষ্ট হলেও ক্লান্ত নয়। তাই প্রাঙ্গনে বসে সে গাইতে পারে—'শিব তোর একি প্যাখম, বাজাস্ ভ্যাকম্ ব্যাল্তলাতে।' অথবা অঙ্গনের ললনা বিলাপ জানাতে পারে—'আইলরে দারুণ বৈশাখ ক্ষেতে পাকনা ধান। আমার সাধু নাইরে দ্যাশে কে কাটিবে ধান॥' এবং 'বৈশাখ মাস বড় সুখের সময়। আগুনের সমান রইদের তেজ শইল্লে না সয়॥' এই রুদ্র বৈশাখের চরিত্র চিত্রনান্তে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'ওই চারিধার করে হাহাকার, ধরাভাণ্ডার রিক্ত,...তব তপতাপে হের সব কাঁপে, দেবলোক হল. ক্লান্ত। ইন্দ্রের মেঘ নাহি পায় বেগ, বরুণ করুণ শান্ত।' তপোমগ্ন সন্ন্যাসীর সঙ্গে, রুদ্র ভৈরবসন্ন্যাসীর সঙ্গে তুলনীয় গ্রীষ্ম। পৃথিবী হারায় তার কোমলতা। অবিরত ঘর্মক্ষরণে কর্মে মন বসে না। স্নিগ্ধ ছায়ায় বিশ্রামই তখন একমাত্র কাম্য হয়ে ওঠে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার, সকলের।

এই বাৎসরিক ঘটনায় প্রপীড়িত হলেও ভেঙে পড়ে না লোকসমাজ। তাই নববর্ষের শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে চলে বারো মাসে তেরো পার্বণের কাজ। কিন্তু প্রকৃতি ক্রমেই উদাসী হয়ে পড়ে। প্রকৃতির এই উদাসীনতা তাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। রুক্ষ উদাসী প্রকৃতির তাপ-উত্তাপকে সহজেই উপেক্ষা করে লোকসমাজ তাদের কৃত্য করে চলে। বৃদ্ধ পিতামাতার স্নেহ, রমণীর প্রেম, শিশুর ভালবাসা ও স্ফীত শ্রদ্ধার উপচার নিয়ে এগিয়ে যায় তারা। বৈশাখ ক্লান্ত হয়ে বিদায় নেয়। তখন গ্রীষ্মের আরও তীব্র মূর্তি। আবির্ভাব হয় জ্যৈষ্ঠ মাস। গ্রীষ্মের খররৌদ্রে বাতাসের কিংবা আবর্জনা স্তূপের অদৃশ্য রোগের বীজাণু সমূলে বিনষ্ট হয়। ফলে মানুষ বহু রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।

জ্যৈষ্ঠ মাস এ ঋতুর খরবায়ু আর দমকা হাওয়া ও ঝড়ের মাস। এই জ্যৈষ্ঠ কখনও রক্তচক্ষু ভীমাকার দৈত্য, কখনও সে কামারশালার শত হাপরের আগুন। কখনও মেঘ,

দেশজুড়ি হক্কোলে
মানে তুমি না মানবায়
কিলা।
আচার বিচার চল
আছে যে দেশো
ঘিলা॥

আশ্বিন মাসো দুর্গা-
পূজা বড় ডামাডোল।
এ মাসো মাতেনা
কেউ বিয়াশাদীর বুল॥

বারো মাসো এক
পূজা যে পারে করে।
মনের আন্দেশায় কেউ
অমনে ঝুরিয়া মরে॥

যে পারে পূজা করে
খুশীর নাই শেষ।
ইন্দু পাড়ায় বিয়া নাই
কইলাম বিশেষ॥

কার্তিক মাসে মানা
নাই বিয়ার কাম
অইতে।
বিয়ার নাম লয়না
কেউ টানা আছলি
থাকতে॥

আউশধান হাইলধান
হক্কোলটি ফুরায়।
টানটিক্কুট থাকে না
তারার যারা বকয়া
ফলায়॥

মানা বাধা না থাকলেও
দেশোচল নাই।
এর লাগি কাত্তিত
নাই বিয়ার শানাই॥

আগন মাস সোনার মাসো জমিনে লক্ষ্মীর বাসা।
সয়ারা চিন্তায়
হক্‌কোল বেউশ বিয়ার
নাই ভরষা॥

কার কথা কেবা মাতে
কেবা কারে শুনে।
কেম্‌নে সয়ারত ধান
একথা রে ধুনে॥

ধনী গরীব ভেদ নাই
হক্‌কোলোর ঘরো
ধান।
এ মাসো না কেউ লয়
বিয়ার বাক্যিখান॥

লাড়িতে চাড়িতে ধান
পৌষের আধা যায়।
বিয়ার আলাপ কে
করিত তার দিশাদাড়া
না পায়॥

আট মাস মেনোথ
করি হবে লইছে ঘর।
বিয়াশাদীর নাম
করিতে কে এমন
অক্‌সর॥

পৌষ মাস মেষ করিলে
ধানঘর অয় তুষ।
এর লাগি এ মাসো
নাই বিয়ার সম্ভব॥

মাঘোর কন্যা বাঘ অয়
ডাকোর কথাত আছে।
এর লাগি যায় না
কেউ বিয়ার আউজে
কাজে॥

কখনও মানিনী নায়িকার মত আকাশের মুখ ভার। তবুও এ মাস এ ঋতু রসসিক্ত। লিচু আম জাম কাঁঠালের রসে ভরপুর। বেলা-মল্লিকা-গাঁদা-চাঁপা-ফুলের গন্ধে মাতোয়ারা। মনব্যথী ললনা তখন গান ধরে—'জ্যাট মাসে ডালিম গাছে হয় দ্যাকো কলি। তখন ক্যানে যান তিনি বাণিজ্যেতে চলি॥ গাছে ত অইল অসের ডালিম, কাঁইবেন ধরে তারে। পচিইয়া পইড়বে ডালিম তুমি না থাইকলে ঘরে॥' আবার এও শোনা যায়—'নিদারুণ জ্যৈষ্ঠ মাস প্রচণ্ড তপন। পথ পোড়ে খরতর রবির কিরণ॥ শীতল চন্দন দেব চামরের বায়। বিনোদ মন্দিরে থাক না চলিহ রায়॥ নিদাঘ জ্যৈষ্ঠ মাসে নিদাঘ জ্যৈষ্ঠ মাসে। পূরিল উদরনাথ পাকা আম্ররসে॥ আকাশে গর্জয়ে মেঘ নাচয়ে ময়ূর। নবজলে মদমত্ত ডাকয়ে দাদুর॥' জ্যৈষ্ঠের সঙ্গে রসনা ও প্রেমের যোগ থাকার দরুন আমরা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শুনি—'যেই বা নারীর পতি আছে ঘরে, খায় উদ্দর ভইরে রে। আমার পতি নাই গো দ্যাশে, আমার অঙ্গ তিতা রে॥'

কখনও মেঘ ভেঙে বর্ষা আসে। নদী উত্তাল হয়। বাঁধ, মাঠ, খাল, নালা, বিল, পুকুর, বাড়ীর প্রাঙ্গন, পথ, ঘাট সব একাকার হয়ে সাগরের মত ছড়িয়ে পড়ে। কখনও বর্ষা আসে না। দারুণ গ্রীষ্মের হাত থেকে উদ্ধার পেতে, চাষের জমিতে জল যোগাতে কৃষাণ মেয়ে বউরা মেঘারাণীর কুলো নামায়। কুলো, জলঘট নিয়ে বাড়ি বাড়ি ছোটে তারা। নাচে, গান গায়—'হ্যাদে লো বুইন ম্যাঘারাণী। হাত পাও ধুইয়া ফ্যালাও পানি॥ ছোট ভুঁইতে চিন্‌চিনানি। বড় ভুঁইতে আড়ু পানি॥ ম্যাঘা-রাণীর ঘরখানি পাথরের মাঝে। হেই বৃষ্টি, নামলো ঝাঁকে ঝাঁকে॥ ও ভাই কাইল্যা ম্যাঘা ধইল্যা ম্যাঘা বাড়ি আছ নি? গোলায় আছে বীজ ধান বুনাইতে পার নি?'

কালবৈশাখীর পর জ্যৈষ্ঠ শুকনো থাকলে এবং আষাঢ়ের সঙ্গে সঙ্গে ধারাবৃষ্টি নামলে সে বৎসর ভূরি

পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয় বলে লোকবিশ্বাস। এই বিশ্বাসের প্রকাশ পায় কৃষি প্রবচন আওড়ানোতে—'জ্যেষ্ঠে মারে আষাঢ়ে ভারে, কাটিয়া মাড়িয়া ঘর ভরে'।

কলা, পেঁপে প্রভৃতি যাবতীয় ফলগাছ, করলা, কাঁকড়োল, লাউ, চালকুমড়া, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, ঢেঁরস প্রভৃতি নানাবিধ সবজী, বেল, যুঁইচাঁপা প্রভৃতি নানা জাতীয় ফুল এই ঋতুতেই বপন করা হয়।

এই ঋতুতেই সুরু হয় নববর্ষ। বৎসরের সর্বাধিক ব্রত-পার্বণাদিও অনুষ্ঠিত হয় এই ঋতুতে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান বুদ্ধপূর্ণিমা, মুসলমানদের ফতেহা-দোয়াজদাহাম, বৈষ্ণবদের শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল, জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা, মেয়েদের শিবের ব্রত, তুষ-তষালী ব্রত, হরিষ মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত, অরণ্যষষ্ঠী বা জামাইষষ্ঠী ব্রত, ধর্ম-রাজপূজা, তিস্তাবুড়ীপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠান এই ঋতুর।

নানা গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা হয় এই ঋতুতে প্রচুর। কুমারী মেয়েরা শিবঠাকুরকে স্নান করাবার সময় বলে—'শিল শিলাটন শিলে বাটন শিল অঝ্‌ঝরে ঝরে, স্বর্গ হতে বলেন মহাদেব, গৌরী কি ব্রত করে? নড়ে আশ, নড়ে পাশ নড়ে সিংহাসন, হরগৌরী কোলে ক'রে গৌরী আরাধন।' বলে 'এ পূজলে কি হয়?' উত্তর—'নির্ধনীর ধন হয়, সাবিত্রী সমান স্বামী আদরিণী হয়। পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে, মরণ যেন হয় গঙ্গাজলে। কখনও দশপুতুল ব্রতের ছড়া আবৃত্তি করতে গিয়ে বলে—'এবার মরে মানুষ হবো, রামের মতো পতি পাবো। এবার মরে মানুষ হবো, সীতার মতো সতী হবো। এবার মরে মানুষ হবো, লক্ষ্মণের মতো দেবর পাবো। এবার মরে মানুষ হবো, দশরথের মতো শ্বশুর পাবো। এবার মরে মানুষ হবো, কৌশল্যার মতো শাশুড়ী পাবো। এবার মরে মানুষ হবো, কুন্তীর মতো পুত্রবতী হবো। এবার মরে মানুষ হবো, দ্রৌপদীর মতো রাঁধুনী হবো। এবার মরে মানুষ হবো, দুর্গার মতো সোহাগী হবো। এবার মরে মানুষ হবো,

য়ার কাম না
অইলেও বিয়ার কথা
রচে।
কিয়ানো জামাই
কিয়ানো কন্যা একে
অন্যে পুছে'।।

জিকাবুলা করি
হক্‌কোলে ঠিক করিয়া
থয়।
কালকুনোর রহিত
ফুরাইলে মামলা
যেমনে অয়।

কালকুনো বসন্তের
বাও কুয়িলার ডাক।
বিয়ার ডামাডোলখালি
ঝাইন শানাইয়ের
হাক।।

আকয়া বকায়া কাম
থাকে যত ইতি।
হক্‌কোল তাত মন
দেইন চাইয়া পাঞ্জি
পুথি।।

জায়-জোগাড়ে চাইরো
ভার বমগোলা ফুটে।
জামাই কন্যার যাওয়া
দেখাত পুয়াপুড়ি
ছুটে।।

চত্তি না মাসের দিনে
ঠাটাভাঙ্গা রইদ।
জামাই যাইন শ্বশুর-
বাড়ী ভাই বন্ধুর
সইদ্।।

জামাইয়াখানি
আসলে হয়
বড় ধুমধাম।

পৃথিবীর মতো ভার সবো। এবার মরে মানুষ হবো ষষ্ঠীর মত জে"ওজ হবো।' কুমারী মেয়েদের এই কামনার সঙ্গে এসে যুক্ত হয় জৈষ্ঠের শুক্লাষষ্ঠীর, অরণ্য বা আম-ষষ্ঠীর ব্রত, যা জামাই ষষ্ঠী বলে বহুল জনপ্রিয়। এ দিবসে একে একে ছেলেমেয়ে জামাই ও বাড়িশুদ্ধ সকলের গায়ে দুর্বার আঁটির জল ও পাখার বাতাস দিতে দিতে বলা হয়—'জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠীপূজা, ষাট্, ষাট্, ষাট্।' ষষ্ঠীর ষাটের আমেজ যেতে না যেতেই বর্ষা উঁকি দেয়।

চক্রবৎ পরিবর্তন্তে গ্রীষ্ম যায়, বর্ষা আসে। জ্যৈষ্ঠ অস্তমিত হলে হয় আষাঢ় মাসের উদয়। বর্ষা ঋতুর আগমন। হঠাৎ এর আবির্ভাব। ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তমান এর রূপ। বায়ুতাড়িত মেঘের বর্ষণ, অবিরাম ঘর্ষণের ডাক, বিদ্যুৎ ঝলক। বৈশাখের কালবৈশাখী জ্যৈষ্ঠেও অনুষ্ঠিত হতে পারে। বৈশাখ তখন খাঁ-খাঁ করে। জ্যৈষ্ঠে বিদ্যুৎও চমকায়। এই বিদ্যুৎ চমকানো দেখে কবি বলেছেন, 'ডাকো ডাকো আরও ডাকো, বলো আরও জল, আরও জল—'উপ প্রবদ মণ্ডূকি বর্ষমা বদ তাদুরী'। কিন্তু এ আহ্বানে সর্বদাই কাজ হয় এমন নয়। অনেক সময় কালবৈশাখী শুধুমাত্র লুকোচুরি খেলে আকাশে বিলীন হয়ে যায়। শত আর্তনাদ চীৎকারেও তার সাড়া পাওয়া ভার হয়ে পড়ে। অনেক-সময় হয় অতি বর্ষণ। গ্রীষ্মের গোড়া থেকেই শুরু হয় মৌসুমী বায়ুর প্রকোপ। কখনও বিন্দু বৃষ্টি, কখনও প্রবল বৃষ্টি, আবার কখনও ধারাবৃষ্টি অথবা অনাবৃষ্টি। সবই প্রকৃতির খেয়াল। প্রকৃতির খেয়ালেই ওঠে ধূলোর ঝড়। কিছুতেই ধূলোর হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। ধূলো যখন ঝড়ের বেগে মনুষ্য শরীরে প্রবেশ করে তখন দারুণ অস্বস্তি বোধ হয় সকল মানুষের। ধূলোর ঝড় চোখ অন্ধকার করে দেয়। গ্রীষ্মের শুষ্কতায় আসে ধূলোর ঝড়, বর্ষার বর্ষণে সে মিলিয়ে যায় ধরণীর বুকে। বর্ষার স্নিগ্ধ বারিস্পর্শে ধৌত হয় বৃক্ষপত্রে ধূলোর আস্তরণ। প্রকাশ হয় সজীব সবুজ রঙের। কচি কচি পাতার সমারোহ দেখা যায়।

পবিবাড়ী বিয়া পারে
অইতে খাইতে দেখতে
আরাম।।

হক্‌কোল অক্তে খাওয়া
যায় পুয়াপুড়ি সইতে।
বেশ করি ঢালি দেয়
কইতে না কইতে।।

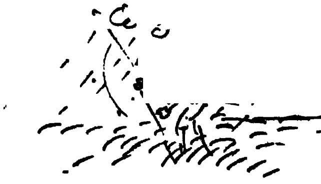
বৈশাগ মাসের দিনো
বছর নবীন।
বিয়ার মামলা ঝামলা
কমে দিন দিন ॥

আখতা ঝুমঝরি কোন
দিন মেঘপানি
পরিয়া।
একোই ঝরিয়ে ভাই
অইয়া যাইবো
বাইরা।।

বাইরা আইলে
আলদল নানান জারি
কাম।
এরি লাগি বৈশাগো
নাই বিয়াশাদীর
নাম।

জ্যৈষ্ঠি না মাসের দিনে
গাছে পাকে আম।
জামাই কন্যার আম
খাওয়াইতে কত
ধুমধাম।।

কেউ আনে নিজের
বাড়ীত্ত কেউ পাঠায়
ভারে।
আম্লিপলি খাইয়া তারা
খুশী আমোদ করে।।



জ্যেষ্ঠানক্ষত্র থেকে সূর্য যখন পূর্বাষাঢ়া বা তৎসন্নিহিত পূর্বাপর নক্ষত্রে (আর্দ্রা নক্ষত্র) তখন পূর্ণিমার অন্ত হয়। এই সময় সূর্য মিথুনরাশিতে অবস্থান করেন। বর্ষাঋতুর আর এক সঙ্গী শ্রাবণ। শ্রবণা বা তৎসন্নিহিত পূর্বাপর নক্ষত্রে যখন পূর্ণিমার অন্ত হয় সূর্য তখন কর্কট রাশিতে। শাস্ত্রানুসারে আষাঢ় ও শ্রাবণ গ্রীষ্মঋতুর অন্তর্বর্তী ; কিন্তু বাঙলার লোকপ্রচলিত নিয়মে এরা এখন বর্ষাঋতুর অংশীদার।

নৈসর্গিক নিয়মে বর্ষাঋতুতে বৃষ্টি হয়। প্লাবনও আসে বর্ষণের দেবতার। নবনীরদশ্যাম শোভার প্লাবন ভাঙে বানে, ভাসায় বন্যায়। বিদ্যুৎ হানে, বজ্র হানে, সকল অপূর্ণতার উপরে নামে বারি পরিপূর্ণ ধারায়। মেঘের গুরু গর্জনে অরণ্য শিহরিত হয়, খালবিল নদীনালা কানায় কানায় ভরে ওঠে। নদীতে নদীতে পণ্যসম্ভার নিয়ে নৌকা ছোটে। ধরিত্রীর বুকে নবতৃণদলে উৎসবের সাড়া পড়ে যায়—কদম কেয়া কাশ কামিনী যূঁই আনন্দে বিকশিত হয়। ময়ূরের কাংস্যক্রেঙ্কারে পল্লী মুখরিত হয়ে উঠে। সর্বত্র প্রাণের চাঞ্চল্য। জেগে ওঠে দিকে দিকে প্রাণ সবুজের উচ্ছ্বাস। কানায় কানায় ভরে ওঠে মাঠ, মরা গাঙ। পত্রশোভিত হয় বৃক্ষ, তৃণাদি। নানাবিধ শাক-সব্জী ফুল ও ফলে শোভিত হয়ে একদিকে প্রকৃতি হাসে অপরদিকে দুঃখ-ক্লিষ্ট প্রপীড়িত জনতা তাদের ফাটাছাদের চোয়ান জলে ভিজে ঢোল হয়ে কাঁদে। কাদা জলের অগম্য স্থলপথ, ফুলে ফেঁপে ওঠা জলে দুর্গম জলপথ তাদের গতি স্তব্ধ করতে চায়, কিন্তু পারে না। প্রকৃতির ভ্রূকুটি-কুটিল চোখ

আম কাঠাল খাইয়া
গায় বেয়াইর
পাঙ্গালী। কন্যার মায়
উশাস ছাড়ে কোর
অইছে খালি ॥

আষাঢ় মাসোর দিনে
মন বরিষণ।
গরীব হউহড়ির ঘর
বিনাই কান্দন ॥

পেটো নাই ভাত
কেউরর পিন্নো নাই
তেনা।
কন্যার বাড়ী দিতো
কিতা নিজেরঅই
জোটে না ॥

দারুণ বেয়াইনে নূ
মনো বুঝ না পায়।
আমকাবলীর
লাগিয়া পুতোর
বউরে খুচায় ॥

কত পাষাণ বাইন্ধ্যাছ
পতি মনেতে—
ফাগুন মাসে অধিক
জ্বালা।
চৈত্রে নারীর বরণ
কালা রে—

বৈশাখ মাস গেল
কইন্যার ভাবিতে
ভাবিতে।
কত পাষাণ বাইন্ধ্যাছ
পতি মনেতে—

জ্যৈষ্ঠ মাসে মিষ্ট
ফল
আষাঢ় মাসে নয়া
জল রে—
শ্রাবণ মাস গেল
কইন্যার শয়নে
স্বপনে।
কত পাষাণ
বাইন্ধ্যাছে পতি
মনেতে—

ভাদ্দর মাসে
আউল্যা ক্যাশ,
আশ্বিন মাসে বর্ষার
শ্যাষ রে—
কার্তিক মাস গেল
কইন্যার উঠিতে
বসিতে।
কত পাষাণ বাইন্ধ্যাছ
পতি মনেতে—

অঘ্রাণ মাসে হেমতি
ধান।
পৌষ মাসে শীতের
বান রে—

মাঘ মাস গেল
কইন্যার দেখিতে
দেখিতে।

দেখামাত্র তারা তাদের কৃত্য ঠিক করে ফেলে। ভাঙনের মধ্যে গড়ন, দুঃখের মধ্যে শান্তি, অ-সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টির বার্তাবহ বর্ষাকে তাই স্বাগত জানান হয়— "এসেছে বরষা এসেছে নবীন বরষা। গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা॥ মল্লার রাগে গর্জিয়া ওঠ গাহি। বক্ষে তোমার অক্ষের মালা কাঁপে॥ আনো মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী মধুরা। বাজাও শঙ্খ হুলুরব কর বধূরা॥ এসেছে বরষা ওগো যত অনুরাগিণী। ওগো প্রিয়সুখভাগিনী॥" এই সময় নানা পালপার্বণও অনুষ্ঠিত হয়, তার মধ্যে রথযাত্রা ঝুলন জন্মাষ্টমী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বর্ষা একদিকে যেমন আনে শান্তির পেলবতা অন্যদিকে তেমনি সে করে লণ্ডভণ্ড। বায়ুতাড়িত বর্ষা সব তছনছ করে দেয়। লণ্ডভণ্ড মহাশ্মশানের মধ্যে পৃথিবীকে শস্যশালিনী করে বর্ষা। মন্দ্রগম্ভীর তার গর্জনে বৃক্ষের পত্র কম্পিত হয়। শিখিকুল নেচে ওঠে। মেঘমন্থর গর্জনে ইন্দ্রের হৃদয়স্থ মন্দারমালা দুলে ওঠে, নন্দসূনু-শীর্ষকে শিখিপুচ্ছ কেঁপে ওঠে, আর পর্বতগুহায় মুখরা প্রতিধ্বনি হেসে ওঠে। বৃক্ষনিপাতকালে বজ্র সহায় বর্ষার গর্জন অতি ভয়ানক, ভয়ানক ভীতিবিহ্বল।

তবুও এই বর্ষার আশায় নবযূথিকাদাম ঊর্ধ্বমুখী হয়ে থাকে। বর্ষাভাবে তটিনীকুলের দেহের পুষ্টি হয় না, তারা বর্ষার জলপূর্ণ হৃদয়ে হেসে-হেসে নেচে-নেচে কলকল শব্দে সাগরাভিমুখে ধাবিত হতে পারে না। তারা বর্ষার অভাবে ক্লিষ্ট হয়।

অবার এই বর্ষার সমাগমে 'পোড়া দেবতা একটু ধারণ কর না' বলে কত লোক গালি দিচ্ছে, কত ছেলেমেয়ে বৃষ্টি থামানোর গান গাইছে। দরিদ্র চাষী কৃষকদের ফুটোঘর থেকে জল পড়ছে, তারাও গালি দিচ্ছে, গ্রামের কাদাপথে কে হাঁটতে পারছে না, সেও গালি দিচ্ছে বর্ষাকে। বর্ষাই যেন এই সব অনাসৃষ্টির মূলে। অন্ধকারে বর্ষার বিদ্যুৎ যখন পলকে পলকে ঝল্‌সাতে থাকে তখন

বর্ষার নিঃশ্বাসে স্থাবরজঙ্গম উড়ে যায়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেঁপে ওঠে। আবার এই বর্ষা যখন পশ্চিম গগনে লোহিত ভাস্করাঙ্কে বিহার করে এবং স্বর্ণতরঙ্গের উপর স্বর্ণতরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করে, জ্যোৎস্না পরিপ্লুত আকাশে মন্দ-মন্দ পবনে আরোহণ করে, তখন সে মনোরম, সে সুন্দর। তাই পৃথিবীর মানুষ বর্ষাকে আহ্বান জানায়। বর্ষা হেসেহেসে নেচেনেচে ভূতলে নামে। বজ্র তোপধ্বনি করে বর্ষার আগমন-বার্তা জানিয়ে দেয়। তৃণ গাছপালা মাথা নাড়ে, নদী দোলে, ধান মাথা নুইয়ে প্রণাম করে। বর্ষায় চাষা জলে ভিজে। বেনে বউ আমসী ও আমসত্ত্ব নিয়ে পালায়। দম্পতির প্রকোষ্ঠে ছাদ ফুটো করে ঢুঁ দেয় বর্ষা। যে পথে সুন্দরী বউ কলসী কাঁখে জল নিয়ে ফিরবে সে পথকে পিচ্ছল করে রাখে। রামী দাসীর শুকোতে দেওয়া কাপড় ভিজিয়ে দিয়ে তার কাজ বাড়িয়ে দেয়। ভরযুবতী হাঁটুর কাপড় তুলে থপথপ করে জলে হাঁটে, তার সর্বাঙ্গ বারিসিঞ্চিত। প্যাচ প্যাচ কাদায় ডুবে গিয়ে হাঁপায় কাজী সাহেব। পশুপক্ষীদেরও নিস্তার নেই দেখে কবি গেয়ে ওঠেন—

"মাঠের পারে দাঁড়িয়েছিল ঈশানে কোণেতে,—
বিশাল-শাখা পাতায় ঢাকা শালের বনেতে;
হঠাৎ হেসে দৌড়ে এসে খেয়ালের ঝোঁকে
ভিজিয়ে দিল ঘরমুখো ঐ পায়রাগুলোকে।

জলকাদার মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয় মনসা ও নানা পূজা। অনুষ্ঠিত হয় বিপত্তারিণী, লোটনষষ্ঠী ইত্যাদি ব্রত উৎসব। অনুষ্ঠিত হয় অনেক গ্রাম্যদেবদেবীর পূজা।

এই ঋতুতে সীম, ঢেঁড়স, ঝিঙা, ডাঁটা প্রভৃতি শাক সবজী, আম, জাম, লিচু, পেয়ারা, কুল, আনারস, পেঁপে প্রভৃতি ফল এবং জিনিয়া, দোপাটী, গিলার্ডিয়া প্রভৃতি মরশুমী ফুল বপন করা হয়।

এই সময়ই পাটগাছ (বা কোষ্টা) জলের তলায় ভিজিয়ে রাখা হয়। চারদিক থেকে আসে পচা পাটের

কত পাষাণ বাইন্ধ্যাছ
পতি মনেতে—

হায় হায় ফতেমা
কান্দে আয়শে
ধরিয়া।

হায় হায় ফতেমা
কান্দে ফতেমারই
গায় পড়িয়া।
ইমাম উছেন অইছে
শহীদ
কারবালাতে গিয়া॥

ফাতেমার বলত
ইমাম উছেন দোনোকে
ছাইড়াছে।
চান্দমুখে জোয়ার
নাই মা বলিব কে?

আল্লা—
পরথম
কার্তিক গো মাসে
যাত্রু যায় গো রণে।
আসিব কি না
আসিব অন্বষিত
মনে॥

সোনার পালং জোড়-
মন্দির খালি রইল
পড়িয়া।
কোথায় গেল ইমাম
উছেন জননী
ছাড়িয়া॥
হায় হায়রে—

দুর্গন্ধ। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, পাট চাষের পর পাট গাছ পচিয়ে পাট বের করা হয়। পাট সাফ বা পরিষ্কার করতে গিয়ে অনেক কৃষাণ হাজা রোগে আক্রান্ত হয়। নানা ভাবে কষ্ট পায়। তবুও তার রসের অন্ত নেই—"হাত পাও খাইয়া করল হারা কোষ্টার জলেতে। কোষ্টা লইয়া হিতোইলা কাম ছিল এই কহালে॥ হারাদিন কোষ্টা লইয়া ভাত খাই বৈহালে॥ আমি বাড়ী গিয়া দিব আগুন লো। (ও) তোর কোষ্টারি কহালে॥ তহন মিঞাসাব্ কন বিনয় করে বিবির কাছেতে। (ও) তুই রাগ করিস না চুপ কইরা থাক খাড়ুগা দিমু পায়। যদি খোদার মর্জি অয় (আর) কোষ্টার দর অয়। তাইলে পান সুপারী গুয়ামউরী খাবি যতই মনে লয়॥ (আবার) কলিকালের কাণ্ড দেইখ্যা বাঁচি না লজ্জায়। (ও) তারা ছলেবলে কলকৌশলে সোয়ামীরে বাপ ডাকায়॥ (ও) তার বাপের বাড়ী নাইওর দিছে নাহের ফুড়ফুড়ি গড়্যায়ে। (আর) হাউরী জিগায় বধুর কাছে 'ও বউ ফুড়ফুড়ি গড়্যাছ ট্যাহা কেডা দিছে ?' বউয়ে কয়, 'ট্যাহা দিছে বাজানে'।" এরূপ রঙ্গরসের গান প্রায়ই শোনা যায়, যার মধ্যে গার্হস্থ্য চিত্রের রূপও ফুটে ওঠে।

অনুষ্ঠিত হয় ঝাঁপান উৎসব। মনসা গান। "থাম বন্দম সভা বন্দম বন্দম বসুমতী। লারু পারু ঘাটে বন্দম দেবী সরস্বতী॥ গুণী ভেয়ের গুণী বন্দম নাটুয়ারই প্রাণ। ছোট বড় গুণীনের চরণে প্রণাম॥ পদ্মবনে থাকেন মাগো পদ্ম নালকুমারী। তোমার লাল পাদপদ্মে লাল জবা দিব আমি॥ দুনিয়ারই অনাথিনী না করিবেন হেলা। আমার আসরে মা-মনসা তুমি কর খেলা॥ আমার আসর সেরে মাগো অন্য আসর যাও। দোহাই আস্তিক মুনির মাথা খাও॥'

জলকাদা হাসিঠাট্টার মধ্য দিয়ে লোকজীবন এগিয়ে যায়। ওদের বিশ্বাস—"আষাঢ়ে নবমী শুকুল পাখা, কি কর শ্বশুর লেখাজোখা, যদি বর্ষে মুষল ধারে, মধ্য সমুদ্রে

আগণ মাসে ফতেমা
গো সবে খায় ন'য়া।
দৈ দুধ সরলনী সবে
খায় মেওয়া।

রান্ধিয়া বাড়িয়া
অনাথ কারবা
পাতে ঢালি।
কে ডাকিব মা বলিয়া
এইনা দুঃখে মরি।

হায় হায় রে—
পোষ মাসে ফাতেমা
গো ইমছ স্থানের
ভাও।
কোল ছাড়িয়া
কোলের যাদু কোন
স্থানে যাও॥

কোল ছাড়িয়া
কোলের যাদু কোলের
লইল মনি।
দেখিলে প্রাণ
জোড়াজুরি
না দেখিলে মরি॥
হায় হায় রে—

মাঘ মাসে ফতেমা
গো জ্বরে কম্পমান।
অন্তরে আগুন গো
জলে তান বড় টান॥

সুতার কাপড় তুলার
বালিশ ভুইলা
লইল কোলে।

বগা চরে, যদি বর্ষে ছিটেফোঁটা, পর্বতে হয় মীনের ঘটা, যদি বর্ষে ঝিমিঝিমি, শস্যের ভার না সহে মেদিনী" অর্থাৎ আষাঢ় মাসের শুক্লানবমীতে মুষলধারে বৃষ্টি হলে সে বৎসর অনাবৃষ্টি হয়, ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হলে অসংখ্য মাছের উৎপত্তি হয়, মন্দ মন্দ বৃষ্টিতে প্রচুর শস্য জন্মায়, ঐদিন সূর্য মেঘাচ্ছন্ন না হলে বেশী শস্যাদি জন্মায় না। এ বিশ্বাস থেকে লোকজীবনে এসেছে নানাবিধ সংস্কার।

স্মরণীয়, মেঘ আপনার নিত্য নতুন চিত্রবিন্যাসে, অন্ধকারে, গর্জনে, বর্ষণে পৃথিবীর উপর একটা প্রকাণ্ড অচেনার আভাষ নিক্ষেপ করে। বর্ষণ করে বলে এ ঋতু বর্ষা। ঋতুর যিনি কর্তা তিনি মেঘ। তাকে নিয়ে হর্ষ-বিষাদ, আনন্দ ও রোমাঞ্চ। বর্ষার মূলে মৌসুমীবায়ু। এই বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে মেঘলোকে বিদ্যুৎ বিলসিত হচ্ছে আর দ্যুলোক থেকে ঝরে পড়ছে বৃষ্টি। এই বৃষ্টির জলে ধরিত্রী হচ্ছে কর্দমাক্ত, বাধা সৃষ্টি হচ্ছে গমনাগমনের।

অনেক সময় নদীতেও বন্যা জাগে, ঘরদোর ভেসে যায়, বহু প্রাণেরও বিনাশ ঘটে। ঝরাপাতা ও মরা গাছপালা পচে মশার সৃষ্টি হয়। ওরা নানা রোগের সৃষ্টি করে মনুষ্য মৃত্যুর পথ সুগম করে। বর্ষা দরিদ্র জনগণের জীর্ণকুটীর বিদীর্ণ করে দুঃখকষ্টের কারণ হয়। আমাদের কবিদের কাব্যরচনারও প্রেরণা জোগায় বর্ষা। বর্ষার দিনে অফিস আদালতের কর্মচারীদের বহু কষ্ট স্বীকার করতে হয়, রাত্রির কর্মক্লান্ত অলস প্রহরে বর্ষা তাদের কাম্য।

বর্ষা ব্যতীত কিছুই বাঁচতে পারে না। মানুষ, পশুপক্ষী, শাক শব্জী বৃক্ষ লতার জীবনদেবতা বর্ষা। এই বর্ষার দিনে বিরহিণী কাঁদে—"আষাঢ় গেল শাওন আইল ম্যাঘের অরিবরি (খেলা), বিলের সাথে খেলা করে কোড়া আর কৌড়ি। শাওনে সংক্রান্তি পূজা দ্যাশের লোকে পূজে, অভাগিনীর দুঃখের কথা কেহ নাহি বুঝে।" অথবা "আষাঢ়-শ্রাবণ দুই মাস আইল আমার না ফুরাইল আশ। ভরা যৌবন লইয়া অভাগিনী করে হা-হুতাশ রে॥"

দারুণ শেমুলের
বালিশ মুখে রাও
না করে॥
হায় হায় রে—

ফাগুন মাসে কুকিল
বলে দুলা মিয়া কই।
চলিলাম গো ফতেমা
সিন্নি লইয়াঅই॥

মদিনা বিছড়াইয়া
মাগো শা মর্তুজা
॥

মালখানা ঘরেতে
দেখি জোরে পালং
খালি।
হায় হায় রে—

চৈতিক মাসে ফতেমা
গো মক্কা অইল
ছাড়া।
সারা দুইন্যাই
খুঁইজ্যা মাগো
অইয়া গেল সারা॥

শা মর্তুজআলী
যুদি অইত আমরার
বাপ্।
তে কেন ওজিদার
পালে দিও এও
তাপ॥

বরকত জননী যুদি
অইত আমার মা।
তে কেন মরণকালে
পানি পাইলান না॥
হায় হায় রে—

বৈশাগ মাসে
ফত্তেমা গো
কি করুইন
বসিয়া।
তোমার যাদু কান্দন
করে কাডা শির
লইয়া॥

ডাইন হস্তে কঙ্কনা
বান্ধ্যা বাম হস্তে
বালারে।
আড়াই দিন
আছলাইন মাগো
ইল্লালার দরবারে॥

কিন্তু তাতে আচার অনুষ্ঠানে বাধা নেই। যার মধ্যে আশা কামনার কথা, সুখদুঃখ তৃপ্তির কথা সোচ্চারে ঘোষিত হয়। শরতের সঙ্গে সঙ্গে বর্ষার অবসান। এই অবসানের প্রাকমুহূর্তে অনেক সময় বর্ষার জন্যে বাসস্থানচ্যুত হয়ে নানাবিধ সর্প ও অন্যান্য প্রাণী গৃহস্থের বিছানায় সাময়িক স্থান করে নেয়। গৃহস্থও এদের তাড়িয়ে দেয় না, স্থান দেয়। আর হয়ত এই সময় বাস্তুচ্যুত মানুষ ও সর্বহারার দল বরুণাহত হয়ে বেদনায় দুঃখে কষ্টে ও ক্ষোভে ফেটে পড়ে। এরই মধ্যে দিন কেটে যায়, কেটে যায় মাসও। নতুন দিনে নতুন মাসে আসে নতুন জগতের নতুন কাজের ডাক। শুরু হয় শরৎ, ভাদ্র-আশ্বিন।



হায় হায় রে—
ফাতেমা যে বলে
জবরীল তুমি
আমার ভাই।
আইজকা অইতে
ইমাম উছেন রইল
কোন ঠাঁই॥

আইন্যা দেও আইন্যা
দেও ভাইরে বলি
যে তোমারে।
নয়নেরই পুতলী
আমার আইন্যা দেও
আমারে॥

বর্ষাঋতুর সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টির সমাপ্তি ঘটে না। ছাড়ি ছাড়ি করেও বর্ষা ছাড়ে না। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে প্রায়ই। ঘন অন্ধকার। দিন না রাত্রি বোঝা যায় না। রাত্রির অন্ধকারের রূপ ভয়ঙ্কর। চন্দ্র নেই, তারা নেই, আকাশের নীলিমা নেই, পৃথিবীর দীপ নেই, প্রস্ফুটিত কুসুমের শোভা পর্যন্ত নেই। রূপ রস গন্ধহীন অন্ধকার। মাঝে মাঝে শব্দায়মান মেঘের বিকট গর্জন। এরই মধ্যে আশার আলো জ্বালে জোনাকিরা। ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে আলো জ্বালিয়ে বাতি দেয় জোনাকি। কামিনীকুসুম জলনিকেষ তরুণায়িত বৃক্ষের পাতায় পাতায় জোনাকি। এই জোনাকিকে আহ্বান জানিয়ে কবি বলেছেন—"আয় জোনাকি বুকটি ভরে

একটু নিয়ে আলো।...থাক না তারা তপন শশী থাক না যত আলো, তাদের মোরা করব-পূজা, বাসৃব তোরেই ভাল"। ঘোর দুর্দিনে ক্ষুদ্র আলোকে আলোকিত করতে সদা সচেষ্ট ক্ষুদ্র কীট জোনাকি। বর্ষারাতের আলো। নক্ষত্রপ্রোজ্জ্বল বসন্তগগনে জোনাকির স্থান নেই। বসন্ত চন্দ্রের জন্য, সুখীর জন্য, নিশ্চিন্তের জন্য। বর্ষা ও শরতের বিদ্‌ঘুটে অন্ধকার জোনাকির জন্য, দুঃখীর জন্য। চক্র পরিবর্তনের পথ ধরে জোনাকির আলো থেকে একে একে তারা চন্দ্র সূর্যেরা আলোকে ঝলসিয়ে দেয় বিশ্ব। বাঙালী আলোর উৎসবে মেতে ওঠে।

এই সময় রবি বা সূর্যের সিংহরাশিতে অবস্থান কাল। এই মাস ভাদ্র। সূর্যের কন্যা রাশিতে অবস্থানের সময় আশ্বিন। ভাদ্রে পূর্বভাদ্রপদ বা তৎসন্নিহিত পূর্বাপর নক্ষত্রে পূর্ণিমার অন্ত এবং অশ্বিনী বা তৎসন্নিহিত পূর্বাপর নক্ষত্রে আশ্বিনের সুরু।

শাস্ত্র মতে ভাদ্র বর্ষাঋতুর শেষ মাস, কিন্তু বাঙলার লোকপ্রচলিত মতে ভাদ্র শরৎঋতুর অন্তর্গত। ভরা নদী বেয়ে ভদ্রা আসেন। দুইকূল উপচে পড়ে তার আশীর্বাদী মালা। তরঙ্গরেখার ছন্দে গাঁথা ফুটন্ত আশীর্বাদ। বর্ষা এ সময়ও চলে। শরৎ মিলনের ঋতু। আনন্দময়ীর আগমন বার্তায় সোচ্চারিত শরৎ। ফুল ফল ধান্য ও শস্যে পূর্ণ শরৎ। শরতে যিনি আবির্ভূতা হন তিনি শারদীয় দুর্গা। জননী জন্মভূমি মৃন্ময়ী মূর্তিরূপিনী, দশদিক প্রসারিত দশায়ুধে শক্তিশোভিত পদতলে শত্রুবিমর্দিত। পদাশ্রিত সিংহরাজ শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। দক্ষিণে লক্ষ্মী, বামে সরস্বতী, ধন ও বিদ্যাদায়িনী। সঙ্গে দেবসেনাপতি কার্তিকেয় ও সর্বসিদ্ধিদাতা গণেশ। পাশে নবপত্রিকা, শাকম্ভরী দুর্গা। কৃষিজীবী মানুষের প্রাণের দেবী। দেবীর আগমনে বাজে ঢাক ঢোল, কাঁসি, করতাল। আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে দেবী আসেন, সংহার করেন দুষ্টের, তাই তিনি আনন্দ ও বেদনায় উদ্বেলিত। প্রতি

হায় হায় রে—
জ্যৈষ্ঠমাসের মিষ্ট
ফল গাছে নাই সে
পাকে।
গাছের ফল দেখো
ভাই রে
ডাইলে পাইক্কা
থাকে॥

গাছের ফল গাছে
রইল না অইল
ভক্ষণ।
মিরক শিকারে গেল
ভাই দুনোজনে॥
হায় হায় রে—

আষাঢ় মাসে
ফাতেমা গো করুইন
বড় আশা।
দুই পুত্র দিয়াছে
আল্লা খেলিতাইন
তারা পাশা॥

দিন ত গেল
অবশেষে বেইল ত
বেশী নাই।
আইজকা অব্দি
ইমাম উছেন কোথায়
রইল দুই ভাই॥
হায় হায় রে—

আয়রে ও আয়রে
উছেন আয় আয়
মায়েরই কোলে।
আইছরে অঙ্গিনায়
মাইঝে ভুইল্যা
লইব কোলে॥

বৎসর নব নব রূপে তাঁর আবির্ভাব। প্রাকৃত জনে জিজ্ঞাসা করেন, 'দেবী এলেন কিসে, গেলেন কিসে?' কারণ এই আসাযাওয়ার সঙ্গে তাদের এই বছরের সুখদুঃখের সব কিছুই যে জড়ানো।

শরৎলক্ষ্মী আলোর আশীর্বাদ ভরে আনেন নীল আঁচলে—অন্নপূর্ণা তিনি। সোনার ধানে ভরা সোনার তরী, দিকে দিকে তাঁর আশীর্বাদের ভারে তরীর মন্থর গতি, সোনার ফসল। তাল পেয়ারার সমারোহ।

শরৎ ক্রীড়া-চঞ্চল দামাল কিশোর। সে আসে, হাসে আর বাঁশী বাজায়, বাধাহীন চঞ্চল বালকের মত। সেই বাঁশীর সুরে সুরে জেগে ওঠে শিউলী ফুল। দোলা লাগে কাশফুলে, দোলা লাগে মনে আগত ছুটির আমেজে। ভরে ওঠে প্রাণ আগমনী গানে—"গিরি-রাণী কহেন বাণী কি হেরিনু স্বপনে, সম্বৎসর হল উমা আমার গেলো, নাই কি তা স্মরণে? যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী কন্যা বিনা শূন্য এ পুরী, বিরহ যাতনা সইতে না পারি ভুলিব তা কেমনে। ভাঙর ভোলা শ্মশানে মশানে থাকেন ভূত প্রেত সনে। মায়ের প্রাণ কি প্রবোধ মানে তিলেক কন্যা বিহনে।" কি ধনী কি দরিদ্র সকলের কাছেই শরৎ আনন্দময়। কিছু দিনের জন্য ছুটি হয়ে যায় স্কুল কলেজ অফিস আদালত। প্রবাসী গৃহে ফেরেন। সব আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের মিলনের কাঙ্ক্ষিত সুখ-সময় এটি। সাঁরা বৎসরের ব্যাকুল প্রতীক্ষার পর এ মিলন ক্ষণস্থায়ী হলে ছলোছলো কান্নাভেজা কণ্ঠে গ্রাম্য ললনা গেয়ে ওঠেন—"আসবে আসবে ভালই ছিল, এসেই যেন চলে গেল, সকল কথা বলাই হল না। যাওয়ার কথা শুনেই দেখ, ভাসছে যে দেশ চোখের জলে, উমার পানে চাইতে পারি না। বুক ফেটে যায় বিদায় দিতে, ছাড়তে কি মন চায় যে বল, যাবেই জানি তবু মন মানে না।"

বাঙালীর শ্রেষ্ঠ পূজার কাল এই শরৎ। এই ঋতুকে

তর মা ফইরাদি
আইল অই আল্লার
দরবারে ॥
হায় হায় রে—

শাউন মাসে ফাতেমা
গো ফজরে
জাগিলাম।
ইলাইদার ইলাইদার
পানি দেও মাগো
অজু করিবাইন ॥

অজু করিয়া মাগো
ডাইনে বাঁয়ে চায়।
আগুনেরই কুঁয়া জ্বলে
ফতেমারই গায় ॥
হায় হায়রে—

ভাদ্দর মাসে সকলে
যে তালের পিঠা
খাইন।
সেই মাসে
ফাতেমা গো
স্বপনে দেখলাইন ॥

ছাউয়াল ছাউয়াল
বইলা মাগো স্বপনে
জাগিল।
কোথায় রইলে
বুকের ছাওয়াল
বুকে দুঃখ দিল ॥
হায় হায়রে—

আশ্বিন মাসে
ফাতেমা গো
স্বপনে দেখিয়া।
কান্দিয়া উঠিলাইন
মাগো দুই পুতের
লাগিয়া ॥

পূজার ঋতুও বলা যেতে পারে। একদিকে দুর্গাপূজা, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা, অপরদিকে নানা আচার, আনন্দে ভরপুর মন। কিন্তু এই আনন্দের মধ্যে বিচ্ছেদ বড়ই কষ্টের তাই—"ভাদ্দর না মাসেতে তুয়ার গাছে পাকা তাল, তুয়ার সাধু নাই রে দ্যাশে খাইত পাকা তাল। তাল খাইত পিঠা খাইত আরও খাইত খৈ, গাছে আছিল শবরীকলা ঘরে পাতা দৈ।" অথবা—"ভাদ্দর গেল আশ্বিন আইল দ্যাশে দুগ্‌গা পূজা, কেউ দেয় আঁস মইষ কেউ দেয় পাঁডা। ঢাক ঢোল বাজে আরও লোকে সাজ করে, দুগ্‌গা দুগ্‌গা বলি মায় মানত দেয় মন্দিরে। আঁডু পানিত লাইম্যা কইন্যা আরও মানত করে, লইক্ষ বলি দিবাম আমি সাধু আইওক ঘরে।"

নির্মল মেঘশূন্য আকাশ দেখে ধরিত্রী হাসে, শরতের সোনালী আলোকে বিহঙ্গের কলকূজনে শরৎলক্ষ্মীর সঙ্গে বঙ্গবাসী আনন্দে ফেটে পড়ে। বাড়ীতে বাড়ীতে বাজনা বাজে, শোনা যায় শাঁখের মঙ্গলধ্বনি। জলে চলে নৌকা বাইচ, আকাশে ওড়ে ঘুড়ি। সারা বাঙলাদেশ জুড়ে আনন্দের আলোড়ন। বাঙালীর প্রাণের উৎসব, সেরা জাতীয় উৎসব শরতে। এটা মাতৃ-পূজার মহাক্ষণ।

অঙ্গনে যখন আচারানুষ্ঠানের ছড়াছড়ি প্রাঙ্গণে তখন ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটছে কৃষকের, তৃষ্ণায় তার ফাটছে ছাতি। তৃষ্ণা নিবারণে জলের বদলে অঞ্জলি ভরে পান করছে মাঠের কাদা-মাটি-জল। ক্ষুধায় প্রাণ যাচ্ছে তবু বাড়ী ফিরতে পারছে না এই চাষের সময়। খাবার সময় নেই তার। সন্ধ্যায় ফিরে গিয়ে মোটা লাল চালের বড় বড় ভাত নুন ও লঙ্কা দিয়ে আধপেটা খাবে। ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে রাত কাটাবে হয়ত গোহাল ঘরের পাশেই। মশা লাগে না তার। পর প্রভাতেই চলে যেতে হবে মাঠে হাঁটু কাদা ভেঙে ফসল ফলাতে। আমাদের সকলের খাবারের জোগান দিতে।

সারা বর্ষাকাল ধার করে খেয়েছে সে। এবার ফসল

শিশুকালে পুত্রশোগ
দিলা যে আমারে।
সেই শোগ বাইট্যা
দিলাম সগল
ঘরে ঘরে ॥

ও আমার আশায়
আশায় জনম গেল
বন্ধু কই রইল।
ফাঁকি দিয়া বন্ধু
আমার কোথায় বা
লুকাইল রে—

আমার সনে কথা
ছিল আইব আইজ
সকালে।
সকাল বিকাল দুই
কাল গেল বন্ধু না
আসিল রে ॥

ফাঁকি দিয়া বন্ধু
আমার কোথায়
লুকাইল রে—

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ
দুই মাস আইল
গাছে পাকনা আম।
কারে বা খাওয়াইব
আমি দেশেতে নাই
শ্যাম রে ॥

ফাঁকি দিয়া বন্ধু
আমার কোথায়
লুকাইল রে—

আষাঢ়-শ্রাবণ দুই
মাস আইল আমার
না ফুরাইল আশ।

ভরা যৈবন লইয়া
অভাগিনী করে
হা হুতাশ রে।

ফাঁকি দিয়া বন্ধু
আমার কোথায়
লুকাইল রে—

ভাদ্র-আশ্বিন দুই
মাস আইল গাছে
গাছে তাল।
পাপিষ্ঠ যৈবন গো
অইল অভাগিনীর
কাল রে ।।

ফাঁকি দিয়া বন্ধু
আমায় কোথায়
লুকাইল রে—

কার্তিক-আঘুন দুই
মাস আইল শীত
দিল দেখা।
অভাগিনী নারী
আমি ক্যামনে থাকি
একা রে ।।

ফাঁকি দিয়া বন্ধু
আমার কোথায়
লুকাইল রে—

পুষে-মাঘে আইত
যুদি না লাগিত
কেঁথা।
বন্ধুয়ারে লইয়া আমি
কইতাম মনের
কথা রে ।।

তুলে খাজনা মেটাতে হবে। কিস্তি শোধ করতে হবে। সব সময় ফসল সমান হয় না। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অকালবৃষ্টি, প্লাবন, পঙ্গপাল, কীটের দৌরাত্ম্য আছে। তখন ভরসার মধ্যে অখাদ্য, ফলমূল। কখনো ভরসা 'রিলিফ', কখনো ভিক্ষা। কখনো ভরসা কেবল জগদীশ্বর। এই ভাবেই সুখেদুঃখে প্রীতি ও শুভেচ্ছায় ভরা শরতের দিন চলে গেলে আসে হেমন্ত। আশ্বিনের অন্ধকারের ঘুম ভাঙলে দেখা যায় পাণ্ডুর চাঁদ বৈতরণী থেকে অর্ধেক ছায়া গুটিয়ে নিয়েছে। দেখা যায় রক্তিম আকাশে নতুন ঋতুর সূর্য জেগে উঠছে। সূর্যের রৌদ্র আক্রান্ত কার্তিকের ধরিত্রীতে ও অপরাপর ঋতুর ন্যায় কোটি কোটি শুয়োরের আর্তনাদ ও উৎসব। অন্ধকারের ভীড়ের ভিতর নিস্তব্ধতার ভিতর ঘটে সে আশ্বিনের অনন্ত মৃত্যু। মৃত্যুর পূর্বে সে আশ্বিন চীৎকার করে বলে হে নর, হে নারী, আমি তোমাদের সহযাত্রী, যেখানে তোমরা আছ, যেখানে স্পন্দন আছে, যেখানে সংঘর্ষ আছে, গতি আছে, উদ্যম আছে, চিন্তা আছে, কাজ আছে, যেখানে চন্দ্র সূর্য, পৃথিবী, তারকামণ্ডল, বৃহস্পতি, কাল-পুরুষ, অনন্ত আকাশের বিস্তার আছে, সেখানে আমিও আছি, আমাকে তোমরা বিদায় দিও না। কিন্তু আশ্বিনের সে আর্তনাদে কাজ হয় না। শরতের দিন চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয়ে যায় হেমন্ত। হৈমন্তিক আচার আচরণ। এগিয়ে আসে হিম পড়ার দিনগুলো। সুরু হয় হিমের হাওয়ার গান। বর্ষণ-রিক্ত বৈরাগী মেঘ শুভ্র উত্তরীয় উড়িয়ে ভেসে চলেছে। নীলাকাশের তলে সুন্দরী ধরণী হরিৎ শোভায় বিকশিতা। এই সময় ধরণীর জলে রূপ, স্থলে মোহ, আকাশে স্বপ্ন, বাতাসে আনন্দ। সর্বত্র উৎসব। সর্বত্র সমারোহ।

কৃষিকার্যের অবসানে ভবিষ্যতের আশায় বিশ্রামের অবসর উৎসবের আনন্দ দিয়ে ভরে তোলার আহ্বান আসে শরতে। প্রাণবন্যার প্রাচুর্যে ভরা ঋতু এটি।

এ ঋতুর নদী শান্ত। নৌকার পাল তুলে জ্যোৎস্না-প্লাবিত রাতে গহীন গাঙের মাঝি গান ধরে—"বিদ্যাশেতে রইলা মোর বন্ধুরে, ও আমার পরাণ বন্ধুরে। তোমার সঙ্গে আমার মনের মিল যেন হয় পরপারে।" অন্যত্র গীত হয়—"বিধি যদি দিত রে পাখা, উইড়্যা যাইয়া দিতাম দেখা। আমি উইড়্যা পড়তাম সোনা বন্ধুর দ্যাশে। আমি ত অবলানারী, তরুতলে বাসা বান্ধি রে। আমার বদন চুয়ায়ে পড়ে ঘাম রে। বন্ধুর বাড়ি গাঙের পার গেলে না আসিবে আর। আমার বন্ধু না জানে সাঁতার রে। বন্ধু যদি আমার হও উইড়্যা আইস্যা দেখা দাও। তুমি দাও দেখা আমার জুড়াক পরাণ রে"। লোকজীবনের সর্বত্র এ বিষাদ-বিচ্ছেদ।

ধান উঠে গেলেও কৃষকের কাজের শেষ নেই। নানাপ্রকার কপি, লঙ্কা, লেটুস, বীন, মটর, স্কোয়াস, পেঁপে, টেপারী প্রভৃতি সবজী, শীতের মরশুমী ফুল, নানাবিধ ফল, পাতাবাহার লাগাবার কাজে ব্যাপৃত থাকে কৃষক। ব্যাপৃত থাকে চাষের উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিক্রী করতে, হাটে মেলায় গিয়ে আমোদ আহ্লাদ ও বেচাকেনা করতে, গো-মহিষাদি কিনতে। আগামী চাষকে আরও ভাল, অধিক ফসল ফলাবার চিন্তায় মগ্ন থাকে সে। মোড়লের কাছে, বিডিও অফিসেও যাতায়াত করতে হয় তাকে চাষ সম্পর্কে নির্দেশ জানতে।

এ ঋতুতে নানা পূজা, নানা উৎসব, নানা ব্রত ও মেলা। ভাদু উৎসবে গান গায়—"ভাদু নামলো দেশে মুছাইব রাঙাচরণ মাথার কেশে। ভাদুমনি মা জননী গো, সলতে ধূমো আলাতে। জ্বলতে জ্বলতে নিভে গেল ভাদুমায়ের বাঙলাতে।" ভাদু উৎসবের কিছুদিনের মধ্যেই সুরু হয়ে যায় উমা সঙ্গীত—"নবমীর নিশি গো তুমি আর যেও না, তুমি গেলে আমার উমা যাবে নয়নজল আর শুকোবে না। সপ্তমী আর অষ্টমীতে আমি সুখে ছিলাম দিনেরাতে, আজি আমার ক্ষণেক্ষণে নয়নজল কেন

ফাঁকি দিয়া বন্ধু
আমার কোথায়
রে—

ফাগুন-চৈত দুই
মাস আইল
কাল বসন্তের জ্বালা।
একে ত দারুন বসন্ত
তাতে আমার শরীর
করলাম কালা রে॥

ফাঁকি দিয়া বন্ধু
আমার কোথায়
লুকাইল রে—

বৈশাখে বিষম ঝড়
এ হিয়া-আকাশে।
কে রাখে এ তরি
পতি-কাণ্ডারী
বিদেশে॥
জ্যৈষ্ঠে রসাল-রস
সবে পান করে।
বিরস আমার হিয়া
পিয়া নাই ঘরে॥

আষাঢ়েতে রথযাত্রা
দেখি লোক ধন্য।
আমার যৌবন-রথ
রহিয়াছে শূন্য॥

শ্রাবণে নূতন বন্যা
জলে ভাসে ধরা।
ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমী
হরি-জন্মমাস।
সবার আনন্দে কিন্তু
মোর হা-হুতাশ॥

আশ্বিনে অম্বিকাপূজা
সুখী সব নারী।

কাঁদিয়া গোঙাই
আমি দিবস শর্বরী ॥

কার্তিকে হিমের জন্ম
হয় হিমপাত।

বাধা মানে না।" কার্তিক অমাবস্যায় দেওয়ালীর সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় অলক্ষ্মী পূজা। ভাঙ্গা আদারে কুলার কনসার্ট বাজিয়ে বলা হয়—'অলক্ষ্মী কেইট্যে আলাম, মালক্ষ্মী মাথায় থাকুন'।



ভয়ে মরে বিষ্ণুপ্রিয়ার
শিরে বজ্রাঘাত ॥

আঘনে নবান্ন করে
নূতন তণ্ডুলে।
অন্নজল ছাড়ি মুক্তি
ভাসি এ অকূলে ॥

পৌষে পিষ্টক আদি
খায় লোকে সাধ।
বিধাতা আমার সঙ্গে
সাধিয়াছে বাদ ॥

মাঘের দারুণ শীতে
কাঁপয়ে বাঘিনী।
একেলা কামিনী
আমি বঞ্চিব যামিনী ॥

ফাগুনে আনন্দ বই
গোবিন্দের দোলে।
কান্ত বিন্দু অভাগী
ছলিবে কোন ছলে ॥

চৈত্রে বিচিত্র সব
বসন্ত উদয়।
লোচন বলে
বিরহিণীর মরণ
নিশ্চয় ॥

হেমন্ত হিমঋতু। হিন্দু শাস্ত্রমতে অগ্রহায়ণ ও পৌষ হিম সময়। প্রচলিত মতানুসারে কার্তিক ও অগ্রহায়ণ হেমন্তঋতু। সূর্যের তুলা রাশিতে অবস্থানকাল কার্তিক মাস, কার্তিক বা তৎসন্নিহিত পূর্বাপর নক্ষত্রে পূর্ণিমার অন্তে কার্তিকের সুরু। রবির বৃশ্চিকরাশি অবস্থান সময় হচ্ছে অগ্রহায়ণ। মৃগশিরা বা তৎসন্নিহিত পূর্বাপর নক্ষত্রে পূর্ণিমার অন্তে অগ্রহায়ণ সুরু হয়ে যায়। প্রাচীনকালে অগ্রহায়ণ মাসকেই বৎসরের প্রথম মাস বলে ধরা হত। তাই এ মাসের নাম অগ্রহায়ণ। নানা বারোমাসী গানে অগ্রহায়ণকে বৎসরের প্রথম মাস ধরে কার্তিককে বৎসরের শেষ মাস বলা হয়েছে। যেমন—"অঘ্রাণ মাসে নবান্নেতে নতুন ধান কোটে, পোষ মাসে বাস্তুপূজো ঘরে ঘরে পিঠে। মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী ছেলের হাতে খড়ি, ফাগুন মাসে দোলপূজো ফাগ ছড়াছড়ি। চোত্তির মাসে দেল পূজো সন্ন্যাসীর মেলা, বোশেখ বাসে জগদ্ধাত্রী পূজো, গরুর গলায় মালা। জষ্টি মাস ষষ্ঠী পূজো, জামাইর হাতে বাটা আষাঢ় মাসে রথযাত্রার ঠাকুর কাটেন ফোঁটা। শ্রাবণ মাসে মনসা পূজো পথে পাতা ঘট। ভাদর মাসে বিশকরম পূজো অপর জাতির হাট। আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসব লোকে কেনে পাঁঠা, কার্তিক মাসের দ্বিতীয়াতে দেখ দাদা ভাই-র কপালে ফোঁটা।"

অগ্র অর্থে কেহ শ্রেষ্ঠ বলেন। এই মাসে শস্যের প্রাচুর্যের জন্য ক্ষেতের সৌন্দর্য বর্ধিত হয়। শ্রীমদ্‌ভাগবত-গীতার 'মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহম' বক্তব্যও এ মাসের শ্রেষ্ঠত্ব সূচক। হেমন্তে শীতের পূর্বাভাস মাত্র, তথাপি এটা শীত ঋতু নয়। শরতের মার্জিত নির্মল দিনেরও ভাল করে পরিসমাপ্তি ঘটে নি। আবার শীতের হিম-জর্জর দিনও আসে নি, এমনই একটি চমৎকার কাল এই হেমন্ত। এসময়ে অনুষ্ঠিত হয় নানা পূজা মেলা আচার অনুষ্ঠান। কার্তিক পূজা, জগদ্ধাত্রী, রাস এই ঋতুর উৎসব। এ ঋতুতে মেলার ছড়াছড়ি, নানা আমোদ-প্রমোদ, নবান্ন, তুষতুষলী ব্রত, কার্তিকে লক্ষ্মী, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া, কুলুইচণ্ডী, নাটাইচণ্ডী সেঁজুতি ব্রত প্রভৃতি।

কৃষিজীবী মানুষও চুপ করে বসে থাকে না। তারা নানাজাতির কপি, বীট, গাজর, শালগম, মূলা, পেঁয়াজ, [illegible]মড়া, সীম, লেটুস, মটর, তরমুজ, শশা, পালংশাক, [illegible]ভৃতি শব্‌জি ও শাক, নানাবিধ ফুল ও ফলের গাছ, [illegible]তাবাহার প্রভৃতি রোপনে ব্যস্ত থাকে। মেয়েরা [illegible]ার্বণী, ধানভানার গান গায়—"আয় লো তরা ভুঁই নিড়াতে যাই। ভুঁই আমাগো মাতাপিতা, ভুঁই আমাগো [illegible]ৃত, ভুঁইয়ের দৌলতে আমাগো আশী কোটা সুখ।"

প্রত্যেক দরজায় 'আগ' তোলার চিহ্ন। আলপনার [illegible]ড়াছড়ি। সর্বত্রই হাসি হাসি ভাব—"আয় রে ভাই [illegible]ায়, আয় সবাই মিলে ধান রুইতে যাই। দুটি দুটি [illegible]ইয়ে চলো বেশী রুইয়ো নাই। চল্ চল্ চল্ রে তোরা [illegible]ান কাটবি চল্। কিষাণেরা বসে খাচ্ছে চিড়ে মুড়ি [illegible]জল।" ধান নিয়ে আসার পর ধান ভানার পালা। সুরু [illegible]য় ধান-ভানার গান—"ধানকুটি পরিপাটি ধান আমাদের [illegible]লক্ষ্মীমাটি। ধান কুটি ধান কুটি ধান কুটি। ধান ঝাড়িলে [illegible]াকে খড়, সেই খড়েতে ছাইব ঘর, গোয়াল ভরে সে [illegible]ড় দিব গ্রহণ। সেই খড়ে মরাই বাঁধব, সে ধান ঢেঁকি [illegible]রে যায়, বোঝাই করে সোনার নায়। ভিন্ গেরামে

আশ্বিনে অম্বিকাপূজা
মেষ মহিষের ঘটা।
কার্তিক মাসে
কালিপূজা ভাই
দ্বিতীয়ার ফোঁটা॥

অগ্রাহণ মাসে
নবান্ন সে সরুধান
কোটে।
পৌষ মাসে বাউরী
বাঁধা ঘরে ঘরে
পিঠে॥

মাঘ মাসে মাকড়ী
সপ্তমী ছেলের
হাতে খড়ি।
ফাগুন মাসে
দোলযাত্রা ফাগের
ছড়াছড়ি॥

চৈত্রমাসে শিবের
পূজা গাজন
হয় ভারি।
বৈশাখ মাসে
ধরম পূজা ঢাকের
ছড়াছড়ি॥

জ্যৈষ্ঠমাসে ষষ্ঠী
পূজা ছেলের
গলায় দড়ি।
শাওন মাসে
শাকপালুনি
পূজা নয় ভারি॥

ভাদ্রমাসে নন্দোৎসব
কাদায় গড়াগড়ি।
ঐ সময় চলে আরও
তাল কাড়াকাড়ি॥

আয় রে ভরা
আয় মোরা ভুঁই
নিরাইতে যাই।
ভুঁই মোগো
মাতাপিতা ভুঁই
মোরগো পুত।
ভুঁইর দৌলতে
মোরগো আশী
কোঠা সুখ॥

(এই) পৌষ মাসে
দেলাম পূজা বাস্তু
দেবতার পায়।
মাঘ মাসে বসুমতীর
চরণ ছোঁয়ায়॥

ফাল্গুন মাসে দেলাম
লাঙল চৈত্র মাসে
বীজ।
বৈশাখেতে চিক
চিহিনী জ্যৈষ্ঠে
ধানের শীষ॥

আষাঢ় মাসে সোনার
ধান সোনার ফসল
ফলে।
ছেরাবনে আউস ধান
গেরহস্তেতে তুলে॥

ভাদ্র গেল আশ্বিন
আইল কার্তিকে দেয়
সাড়া।
অগ্রাণেতে ক্ষ্যাতের
পরে দেখ্ রে আমন
ছড়া॥

আমন ওঠে ঘরে ঘরে
দুঃখ কিছু নাই আর।

যায় রে সে ধান আঁটি। যায় উড়ে যায় ধান নিয়া, চড়াই পাখি বনের টিয়া, রাত জেগে তাই ভাঙিতে আমাদের এই খাটাখাটি। লক্ষ্মী এল লক্ষ্মী এল, লক্ষ্মী চিড়া পিঠা খেল। এমনি যেন সারাকাল দেশেতে না হয় আকাল। লক্ষ্মী তোমায় করি গড়, তোমার প্রসাদে আমার ঘর থাকে যেন এমনি পরিপাটি। ধান কুটি ধান কুটি ধান কুটি"।

এই আনন্দ উদ্বেল দিনে অনুষ্ঠিত হয় ভাইফোঁটা কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ায়। বোন ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়ে বলে—"প্রতিপদে দিয়া ফোঁটা, দ্বিতীয়ায় দিয়া নিতা, আজ হতে ভাই আমার যমের ঘরে নিমের অধিক তিতা। ঢাক বাজে ঢোল বাজে আরও বাজে কাড়া, বোনের ফোঁটা না নিয়ে ভাই যেও না যম পাড়া॥ না যেও যমের ঘর, আজ হতে ভাই আমার রাজরাজেশ্বর। যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা, আমি দেই আমার ভাইকে ফোঁটা। ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যম দুয়ারে পড়ল কাঁটা॥"

শরৎ লক্ষ্মীর কৃপায় ধান আসে ঘরে। ঢেঁকি তৈরী করে চাল, চিড়ে। রমণী পদাঘাত ধপাধপ পিঠে পড়ছে ঢেঁকির, আর সে ঢক্ ঢক্ কচ্ কচ্ শব্দ করে ধান ভেনে চলে। ধানভানার সঙ্গে গ্রাম্য বঙ্গরমণীর অচ্ছেদ্য যোগ সেদিন পর্যন্ত অটুট ছিল। সে ধান ভেনে অতিথি সৎকার করে, ক্ষুধিতের মুখে অন্ন তুলে দিয়ে ধন্যা হত। রান্নাবান্না করে, সেবাযত্ন করে এখনও সে তৃপ্তি পায়, আনন্দ পায়। পরের হাতের ভাত, পরের হাতের সেবা সে নেয় না, সে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন। বিকালে কলসী কাঁখে নদীর ঘাটে জল আনতে যায়, সারাদিন অন্নব্যঞ্জনাদি তৈরী করে, সকলের অক্লান্তসেবা ও আচার অনুষ্ঠানাদি করে চলে সে।

প্রাতে গোবর ছিটা দেয় সে, বাসি কাপড় ছেড়ে রান্না ঘরে ঢোকে, স্নানান্তে আহার করে। ঘর বাহির ধোয়া-মোছা করে, উচ্ছিষ্ট ধুয়ে ফেলে প্রাতে ও সন্ধ্যায়।

দেয় ধূপদীপ, সময়মত দেবপূজা ও ব্রতানুষ্ঠান করে, পুষ্পচন্দন ধান্যদূর্বা নিবেদন করে, আরতি দেয়। এই নারীজাতিই আমাদের শুভাশুভের মূলে।

শাঁখা শাড়ী অলঙ্কারে ঝলমল মেয়েদের মুষ্টিমধ্যে দৃঢ়তর সম্মার্জনী, কপালে কলাবউর মত সিঁদুরের রেখা, নাকে চন্দ্রমণ্ডলের মত নথ, মস্তকে পর্বতশৃঙ্গের মত তুঙ্গ কবরীশিখর, ফাটা পায়ে আলতা, ঠোঁটে শিশির বিন্দু মেখে নিয়ে শীতের আরাধনায় মেতে ওঠে। শীতকে জব্দ করতে শীতবস্ত্রের যোগাড়ে সচেষ্ট হয়, লেপ কাঁথা তোষকের কথা চিন্তা করতে থাকে। শীতের শুষ্কতা থেকে নিজেকে ও অপরকে বাঁচাবার চেষ্টায় সতত কাজ করে চলেছে ক্লান্তিহীন-ভাবে। এই কাজেই তাদের সুখ। এই কাজের মধ্যেই তারা দেখে ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘ। মাঠের শিয়রে চাঁদ, কাস্তের মত বাঁকা তার ভঙ্গি জেগে ওঠে ডুবে যায়। গাছের শাখা নড়ে হাওয়ায়, জোনাকিরা আলো দেয় অন্ধকারে। নিভে যাওয়া অন্ধকারে আলেয়ায় লাল মাঠ, শ্মশানের খেয়াঘাট, কুয়াশার অন্ধকার, বালুকার ঝড়, ধান ক্ষেত, কাশফুল, বুনো হাঁস, দুরন্ত সৈকত, শৈবাল বিছানায় হেমন্তের ঝড়ে ঝরাপাতা পৃথিবীর বুকের উপর বিন্দু বিন্দু শিশিরের ঘাম। কার্তিকের ক্ষেতে আছে মাঠের ঘাসের গন্ধ, আছে শিশিরের ঘ্রাণ, চারদিক নুয়ে পড়ে আছে আসন্নপ্রসবা ধানগাছ, ধানের স্তনের উপর জমেছে শিশিরের ফোঁটা, চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে বিন্দু হয়ে ধরিত্রীর বুকের উপর। পেঁচা আর ইঁদুরের ঘ্রাণভরা আমাদের ভাঁড়ারের দেশ। চারদিকে ছায়া রোদ, খুদকুঁড়ো, রূপশালী ধানভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ। শীত এসে নষ্ট করে দেয় সব। মাছির গানের মত অলস শব্দে সকালের রৌদ্রে আসে কুড়েমির ডাক। শরতেও থাকে গ্রামাপথ কর্দমাক্ত। শরৎ চলে গেলে মাঠঘাটের জল কমতে সুরু করে, কিন্তু পথ-

আইস এবার যাবার
বেলা চরণ বন্দি
তার ॥

(ওগো) সপ্ত ডিঙ্গা
মধুকরে যত ধান্য
ধরে।
এবার যেন সোনার
ধানে আমার গোলা
ভরে ॥

প্রথম অগ্রাণ মাসে
নয়া হেউতি ধান।
কেও কাটে কেও
মাড়ে কেও করে
নবান ॥

যার ঘরে আছে অন্ন
আঁধে বাড়ে খায়।
যার ঘরে নাই অন্ন
পরার মুখে চায় ॥

এই মাস গেল কন্যা
না পুরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি
নামিল পৌষ মাস ॥

পৌষ না মাসেতে
কন্যা লোক খায়
আলোয়া।
ভাল ফুল ফুটিয়াছে
কেকিটী কমলা ॥

কেকিটী কমলা ফুটে
আরো ফুটে মালী।
তরুণ বয়সের বেলা
ছাড়িল সোয়ামী ॥

এই মাস গেল কন্যা
না পুরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি
নামিল মাঘ মাস ॥

মাঘ না মাসেতে কন্যা
করুয়া পড়ে শীত।
তলে পাটী পাড়ে
কন্যা শিওরে
বালিশ ॥

সাধু সাধু বলিয়া
বালিশে দিলাম
কোল ॥
হতভাগা তুলার
বালিশ না বোলে
এক বোল ॥

পোড়া দেঙ্ তোর
তুলার বালিশ
গগনে উঠুক ধুঁয়া।
কতদিনে ফিরিবে
অভাগিণীর চন্দ্রমুয়া ॥

এই মাস গেল কন্যা
না পুরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি
নামিল ফাল্গুন মাস ॥

ফাল্গুন মাসে হে
কন্যা কাগুয়া
খেলায় রাজা।
ডালমুল ভাঙ্গিয়া
যখন কুহলী তোলায়
ভাষা ॥

ঘাট একেবারে শুকোয় না। সব জায়গায় নৌকাও চলাচল করতে পারে না। চারদিকে কাদা আর নোংরা জল। নানাবিধ রোগও দেখা দেয়। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে উদরাময় রোগের দৌরাত্ম্য, কার্তিক মাসে শোনা যায় বসন্তের আগমনবার্তা। দেখা দেয় কলেরার প্রকোপ। তাই হয় শীতলার গান, তার সঙ্গে ঐক্যতান বাজিয়ে ডেকে ওঠে রাতচোরা পাখী, গাছ কাটার শব্দ হয় খট্ খট্ খটাস। কাঠঠোক্‌রার কাজের বিরাম নেই। বুদ্ধভুতুম অশুভ আগমনের সংবাদ দিয়ে বলে বুদ-বুদ-ভু-তুম-বুদ। এই ভীতিজনক পরিস্থিতিতে যুবক ও প্রৌঢ়ের দল পাঁচ-মিশালী গলায় সমবেত কীর্তন গায়। হরির লুট দেয়। পথঘাট শুকিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রহায়ণ এসে হাজির।

এই মাসের শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে চলে ধানকাটা, প্রত্যেক গৃহস্থ কর্মমুখর। কৃষাণ, গৃহস্থ সকলে হয় ক্ষেতে নয় গৃহ প্রাঙ্গনে সদ্য আনা ধানের সদ্ব্যবস্থা করতে, সারাদিন ধান ঝাড়াই ও ধান তোলার ঝামেলায় কর্মব্যস্ত। বিকালে আনন্দলহরী, গান, আড্ডা। এই ঋতুকে উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"ভরেছ হেমন্ত লক্ষ্মী ধরার অঞ্জলি পক্কধানে, দিগঙ্গনে দিগঙ্গনা এসেছিল ভিক্ষার সন্ধানে। শীতরিক্ত অরণ্যের শূন্যপথে, বলেছিল ডাকি—কোথায় গো অন্নপূর্ণা ক্ষুধার্তের অন্ন দেবে নাকি? শান্ত কর ধরার ক্রন্দন, চাও প্রসন্ন নয়ানে ধরার ভাণ্ডার পানে।" পরিপূর্ণতার ভারে কাঁপে হেমন্তের করপুট। শীতল তার চাহনি। সকলকে আশীর্বাদ, শিশিরে ধোয়া নির্মাল্য দিতে হেমন্ত ব্যস্ত—"গৃহস্থ বধু দেয় তুলসীর গোড়ে বাতি, ঘুরি আসি তোমার সাধ কাঁধে লইয়া ছাতি। অঘ্রাণ মাসে নয়া হেউতি ধান, কেউ কাটে কেউ মাড়ে কেউ করে নবান।"

হেমন্তের পূর্ণিমা নিশীথের নীরবতার মাঝে বিশ্ব যখন নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে একটিও পাতা যখন কাঁপে না তখন প্রতিবিম্বিত করে মানুষ যে মাধুরী দিয়ে

মণ্ডিত তার অবিমিশ্ররূপ। সেই নীরবতা ও আঁধার যেন একটি ভঙ্গুর মায়া রচনা করে এবং তা মানুষের কোলাহল-ময় জীবনে একটি সামান্য ঘটনায় রূপান্তরিত হয়।

মানুষ আলোর বন্যার নীচে সমবেত হয়ে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করে। নীরবতার প্রলোভন যে গভীর একাকীত্ব রচনা করে তার হাত হতে নিষ্কৃতির জন্য পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে, এবং প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে এই মানুষেরই জ্ঞাতি পানমুখো বাঙালী দেবভাষায় শাস্ত্র আওড়ায়—'তাম্বূলং তপনং তৈলং তুল্য তন্বী তনুনপাৎ। হেমন্তে য ন সেবন্তে তে নরা বিধি বঞ্চিতা ॥'

তোলাও রে তোলাও
রে কুহুলী পাড়িয়া
মারিম ছাও।
আমার দেশে নাই
সাধু সাধুর দেশে
যাও ॥

গাছে থাইক্যা পঙ্ক
কথা সাধুরে বুঝাও।
রে কুহুলী সাধুর
দেশে যাও ॥

এই মাস গেল কন্যা
না পূরিল আশ।



হেমন্তের পরে আসে শীত। শীত দেবতার শুভ্র শান্ত রূপ। ক্লান্তিহর তিনি। জরা ধরে যায় তার স্পর্শে। অমৃত শীতল নির্মল আশীর্বাদ তার শিউলি ফুলের মত ঝরে হিমের রাতে চুপে চুপে। শীত ঋতুতে সূর্য ধনু ও মকর রাশিতে বিদ্যমান। পুষ্যা বা তৎসন্নিহিত পূর্বাপর নক্ষত্রে পূর্ণিমার অন্তে পৌষ এবং মঘা বা তৎসন্নিহিত পূর্বাপর নক্ষত্রে পূর্ণিমার অন্তে মাঘ। পৌষে ধনুতে এবং মাঘে মকরে থাকেন সূর্যদেব। শীত বসন্তের বার্তাবহ ও হেমন্তের পরিণত রূপ। শীতের প্রতাপ বার্ধক্যের মত তবুও শীত উদাসী। সজীবতাকে, প্রাণ-স্পন্দনকে সে নীরস নির্জীব করে দেয়। এ সময় গাছের পাতা খসে পড়ে। ডালপালা রিক্তপত্র হয়ে যায়। দিন হয় ছোট রাত্রি হয় বড়।

শীতে ধান পাকে। কৃষকসমাজে পড়ে চাঞ্চল্যের

লহরী যৌবন ধরি
নামিল চৈত্র মাস ॥

চৈত্র না মাসেতে
পচিয়া বয় বাও।

কেঁদে তালু শুকায়
কন্যার মুখে না
আসে রাও ॥

মুখে না আসে রাও
হে কন্যা চোক্ষে না
ধরে নিন্দ।

হাতে হাতে চন্দ্র
দিয়া হারাইলাম
গোবিন্দ ॥

এই মাস গেল কন্যা
না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি
নামিল বৈশাখ মাস।

বৈশাখ মাসেতে
হে কন্যা সুশাগ
ললিতা।
সব সখী খায় শাগ
অভাগীর মুখে তিতা॥

আঁধিয়া বাড়িয়া অন্ন
শোদরাইলাম্
পাতে।
আমার ঘরে নাই
সাধু খাইতে দিব
কাকে॥

এই মাস গেল কন্যা
না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি
আসিল জ্যৈষ্ঠ মাস॥

আম খাইলাম
কাঁটাল হে খাইলাম
আরও গাভীর দুধ।
কতদিনে খণ্ডিবে
অভাগীর মনের দুখ॥

এই মাস গেল কন্যা
না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি
নামিল আষাঢ় মাস॥

আষাঢ় মাসেতে
হে কন্যা কিষ্‌ষানে
কাটে ধান।

সাড়া। জনজীবনে আসে প্রাচুর্যের ডাক। কর্মব্যস্ততার ঢেউ দিকে দিকে। ধান কাটা, ধান মাড়াই, বেচা-কেনার আনন্দে লোকজীবন দিশেহারা। বর্ষায় যা রোপন করা হয়েছিল শীতে তা ফলরসসম্ভারে সম্পূর্ণ হয়ে ঘরে তোলে কৃষক। বর্ষায় কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন, শীতে সিদ্ধি।

কর্মক্লান্ত দেহের ক্ষতিপূরণের জন্য, কর্মশ্রান্ত মনের পরিতৃপ্তির জন্য অনুষ্ঠিত হয়ে চলে নানা উৎসব অনুষ্ঠান। এর অবর্তমানে মানুষের মন শুষ্ক হয়ে পড়ে, মানবসমাজ পরিণত হয় এক বিরাট বন্ধ্যা মরুভূমিতে। সব রসকষ তাপিত ফাটা চৌচির মাঠে জলসিঞ্চন ব্যতীত যেমন ফসল ফলান যায় না তেমনি আমোদানুষ্ঠান ব্যতীত মানব মনের পুষ্টি বা বিকাশ সম্ভব হয় না।

শীতে ভোজ্য দ্রব্যাদির ছড়াছড়ি তাই এই সময়ে খেয়ে ও খাইয়ে সুখ। এই ঋতুতে প্রাচুর্যের জন্যই সারা শীতকাল চলে উৎসব, অনুষ্ঠান, মেলা, আমোদ ও প্রমোদ। এসে যায় পৌষ আগলানো। কৃষিনির্ভর মানুষের আচারানুষ্ঠান। মেয়েরা 'এলুনি' বা আলপনা দেয় পৌষ-লক্ষ্মীর, ধনে-জিরে-যবের শীষ, আলুর ফুল, দূর্বাঘাস ইত্যাদি সংগ্রহ করে পৌষবুড়ির পূজায়। পৌষকে বিদায় দিতে চায় না মন, তাই আগলানোর গান—'এসো পৌষ যেও না, জন্ম জন্ম ছেড়ো না।' পৌষ জীবনে শস্যের সম্ভার নিয়ে আসে বলেই শীতের শুষ্কজীবনে উৎসবের ঢেউ জাগে। তবুও পৌষকে ধরে রাখবার প্রচেষ্টায় কাজ হয় না। এক বৎসরের জন্য হয় তার অনিবার্য প্রস্থান। দেখা দেয় মাঘের সূর্য। ঘরের দরজা থেকে পুকুর ঘাট অবধি সারিবদ্ধ আলপনাগুলো একটি সরল রেখায় সংযুক্ত। আলপনার পথ ধরে অনূঢ়া মেয়ে হাঁড়িভর্তি পিঠা এনে সকলকে খেতে দেয়, পিঠের হরির লুঠ দেয়। কাড়াকাড়ির হিড়িক পড়ে যায়। অনুষ্ঠিত হয় সমবেত সংগীত, পিঠের লড়াই। খেজুর গাছে ঝোলে রসের হাঁড়ি।

নলেন গুড়ের সন্দেশ ইত্যাদির ছড়াছড়ি। রসের পায়েস, মিষ্টান্নাদির সময় এটা, এই সময়টা বিয়েরও মরশুম।

হাড় কাঁপানো শীত। বাঁকা চাঁদ, মিটমিটে তারা আর দূর দিগন্তের গায়ে বনের সীমারেখা। বিশ্ব ঘুমিয়ে আছে। সে নীরবতা ভঙ্গ করেও প্রকৃতির সন্তান ধাবমান চঞ্চল বেগে এগিয়ে যায়। শীতের হাত থেকে উদ্ধার পেতে, নানাবিধ শীত-তাড়ানো বস্ত্রাচ্ছাদনে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এ শীতকে উপলক্ষ্য করে গুপ্তকবি বলেছেন—"শীত তুই বেশ, বেশ ; দেখিয়া শীতের বেশ ; জানিলাম বাবুকে ফোতো।" অনাচ্ছাদিত আগুন জ্বেলে হিমের আঘাত থেকে বাঁচতে চায় লোকসমাজ। শীত-সকালের কাঁচারোদে একবার বসলে আর উঠতে ইচ্ছে করে না। স্নানের গরম জলের জন্য চলে হাঁকাডাকি, চীৎকার। গায়ে জল যেন ছ্যাঁৎ করে ওঠে, তাই শীতকে ঠাণ্ডাকে দমন করতে নানা চেষ্টা। কিন্তু ঠাণ্ডা সর্বদা সকলকে আত্মরক্ষার সুযোগ দেয় না। শীতে থর থর করে কাঁপা-বুড়ী শীতকে অভিশাপ দেয়। শীতের কুয়াসা সূর্যকে আড়াল করে রাখে। শিশির মুক্তাবিন্দুর মত তাকিয়ে থাকে সূর্যাতপে দগ্ধ হবার প্রাক্‌মুহূর্ত পর্যন্ত। দেখতে না দেখতে শীতের দিন রাত্রিতে মিশে যায়। অনিন্দ্য ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশ, অবিচ্ছিন্ন মুক্তামালার লজ্জা দেওয়া দন্ত-সকল সহ ফাটা হাত পা নিয়ে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, শীতকে গালি দেয়। শীতের টান বা শুষ্কতার হাত থেকে উদ্ধার পেতে প্রসাধনের সাহায্য নেয়। প্রভাতের বায়ু, পুষ্পের গন্ধ, প্রকৃতির শুষ্কতা ও নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা একই ভাবে আসে ও যায়। দ্বিপ্রাহরিক আহারান্তে পুকুরঘাটে বাসন মাজতে মাজতে ও গালগল্প করতে করতেই সন্ধ্যা-দীপের মহড়া দেয় কুলবধূ। দিন এত ছোট কেন বলে আক্ষেপ করে। অন্যান্য ঋতু অপেক্ষা অনেক বেশী এ ঋতুর উৎসব, অনুষ্ঠান, ক্রীড়া ও রঙ্গ, কিন্তু তবুও দিবস ছোট কেন ? শীত সন্ধ্যার দাখি নির্জন। মনে হয় বৈতরণীর

কোড়া
কান্দনেতে শরীর
কম্পমান ॥

হেঁওয়া পাখীর
কান্দনেতে পাঁজর
কৈল শেষ।
ডাউকির কান্দনেতে
মুই ছাড়িনু
বাপের দেশ ॥

এই মাস গেল কন্যা
না পুরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি
নামিল শ্রাবণ মাস ॥

শ্রাবণ মাসেতে কন্যা
কিষ্‌ষানে রোয় ওয়া
হাড়ি কোণে করিছে
মেঘ গগনে বর্ষে
দেওয়া ॥

বর্ষেক রে বর্ষেক রে
দেওয়া বর্ষেক
পঞ্চধারে।
আমার ঘরে নাই
সাধু ফিরিয়া আসুক
ঘরে ॥

এই মাস গেল কন্যা
না পুরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি
নামিল ভাদ্রমাস ॥

ভাদ্র না মাসেতে
হে কন্যা পাকিয়া
পড়ে তাল।
যুগীর যুগিনী হইয়া
ছন্তে লব থাল ॥

হস্তে লব থাল হে
প্রিয় মাগিয়া যাব
দেশে। দুই কানে দুই
কুণ্ডল পিন্ধিয়া যাব
সাধুর দেশে॥

এই মাস গেল কন্যা
না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি
নামিল আশ্বিন মাস।

আশ্বিন মাসে হে
কন্যা দুর্গা অষ্টমী।
ধানে দুর্ব্বায় করে
পূজা বিধবা
ব্রাহ্মণী॥

পূজুক পূজুক দ্যাবতা
মাগিয়া বর লব।
আমার সাধু ফিরলে
দ্যাশে লক্ষ ছাগল
দিব॥

এই মাস গেল কন্যা
না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি
নামিল কার্তিক
মাস॥

কার্তিক মাসেতে
কন্যা তুলসীর
গোড়ে বাতি।
ঘুরি আসে তোমার
সাথ কান্দে লইয়া
ছাতি॥

পউষ মাসে রিত
পড়এ শিশির।
কৃষ্ণঃবিনে চিত্ত
মোর হইল চৌচির॥

তরঙ্গাভিহত জীবনের শেষ সোপানের দ্বারগত বৃদ্ধ। দীঘির নির্জনতায় কেউ হাসে, কেউ ভীত হয়। মুখ ভার করে দীঘি সব দেখে। কবি বলেন "আজিকে শীতের শেষ, সবুজের নবোন্মেষ জলস্থল, বিকাশ-বিহ্বল। মত্ত হাওয়া হাহা স্বরে কারে যেন খুঁজে মরে, দেহ প্রাণ আকুল চঞ্চল।"

অন্য সময়ে যে দীঘির তীরে জনকল্লোল শোনা যেত দুপুরের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একে একে তা স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে, রৌদ্র-বিশুষ্ক বিকেলের ফুলের মত মন শুকিয়ে যাচ্ছে, কেবল উল্লাস নয়, হৃদয়ও। সে সরল, সে ভাল-বাসাপূর্ণ, সে বিশ্বাসে দৃঢ়, সে সৌহার্দ্যে স্থির, সে অপরাধে প্রসন্ন বন্ধুরা কেন তাকে আজ ছেড়ে গেল? লোকালয়ের সঙ্গে আজ আর বনিবনা হওয়া সম্ভব নয় দীঘির। আগত সন্ধ্যার শীতের প্রকোপে রাতের অন্ধকারে সে একা। একেবারে একা। যে দীঘির তীরে মানুষ ভালবেসে এসে বসত, বেড়াত, এখন সে স্থান নির্জন, সেস্থান ভয়ের উদ্রেক করে।

নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার ফুল ফোটে, হিম সাদা নানা ফুলের কাছে ভিমরুল গুঞ্জরণ করে, ভোরে ও রৌদ্রের দুপুরে। পৌষ সন্ধ্যায় নরম নদীর তীরে কুয়াশার ফুল। যে মাঠে ফসল নেই তার শিয়রে ও অন্যত্র চুপি চুপি এসে দাঁড়ায় চাঁদ, আলোছায়া অন্ধকারে আকন্দ মুকুলে জোনাকিরা আলো দেয়। অপরূপ রূপ এই শীতের। এই সময় অশথের ডালে বক, বুনো হাঁস—শিকারীদের ভীড়ও দেখা যায়। গুলি এড়িয়ে ওরা উড়ে যায় নম্র-নীল জ্যোৎস্নার ভিতর। সন্ধ্যার কাকের মত বাড়ি ফিরে ইঁদুরের দৌরাত্ম্যে চমকাতে হয়। চাল ক্ষুদ জড়ো করে তারা পাহাড় বানায়। ঘরে ম' ম' করে চালের গন্ধ। ইঁদুরের কারসাজী দেখে ঘরে বসে ছোট ছোট ছেলেরা মেয়েরা ইন্দুর খেলা খেলে আর ছড়া কাটে— "ইন্দুর ইন্দুর, তোর বাপ আয়েছে। আসুক বাপ

বসুক খাটে। ধান দেবো পাটে পাটে। ইন্দুর ইন্দুর, তোর মা আয়েছে। আসুক মা বসুক খাটে। ধান দেবো পাটে পাটে। ইন্দুর ইন্দুর তোর বউ আয়েছে। আসুক বউ, বসুক খাটে, ধান দেব পাটে পাটে। বউ খাবে আর আমি খাবো। লাপ দে দে ঘরে যাবো।"

পুকুরের পারে হাঁস নিজ বাসস্থানে ফিরে যেতে যায়, সন্ধ্যার আঁধারে বেতের লতার নীচে চড়াই পাড়ে ডিম। দেখা যায় খড়ের চালের ছায়া গাঢ় জ্যোৎস্নায়। শুপারির সারি বেয়ে সন্ধ্যা নামে। জ্যোৎস্নার সন্ধ্যায় থাকে পুলকের হাসি। আঁধারের সন্ধ্যায় আছে গভীরতা তথা গম্ভীরতা। ছেলের দল হল্লা করে, হাল্কা হাসির ফোয়ারা ছোটায়। যদিও ওদের "কেউ বা শিষ্ট, কেউ বা চপল, কেউ বা উগ্র, কেউ বা মিঠে; ওই আমাদের ছেলেরা সব, ভাবনা যা সে ওদের পিঠে।...ওরাই ভালবাসতে জানে, দরদ দিয়ে সরল প্রাণে, প্রাণের হাসি হাসতে জানে, খুলতে জানে মনের কল,...পুরাতনে শ্রদ্ধা রাখে নুতনেরও আদর জানে...সকল দেশের সকল কালে উৎসাহ তেজ-অচঞ্চল, ওই আমাদের আশার প্রদীপ, ওই আমাদের ছেলের দল"। সাহেবদের শীতের উৎসব চূড়ান্ত হয় বড়দিন উৎসবে। "খৃষ্টের জন্মদিন বড়দিন নাম, মহাসুখে "পরিপূর্ণ-কলিকাতা ধাম," এ শীত ধনী-বাবুদের জন্য, "ধনীর শরীরে শাল, গরীবের পক্ষে শাল, কম্বল সম্বল করি রয়, বেনের পুঁটুলী হয়ে, শুয়ে থাকে শীত হয়ে, উম্ বিনা ঘুম নাহি হয়।"

শীতে থাকে না রৌদ্রের উত্তাপ বা ফসল কাটা অথবা বীজ বপনের তাড়া। থাকে গোলা ভরা ধান, মাঠে মাঠে ফুল ও ফল। প্রাণে আনন্দ। এই আনন্দ থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে চলে একের পর এক মেলা, আনন্দানুষ্ঠান যা লোকজীবনকে কর্ম-ক্লান্তির বিশ্রামের দিনেও ঝিমিয়ে থাকতে দেয় না, তাদের সচল রাখে। পৌষ উৎসব, শ্রীপঞ্চমী উৎসব, ইংরেজী নববর্ষ উৎসব

হেমন্তের রিত বহে
দীঘল যামিনী।
কৃষ্ণ বিনে কিরূপে
বঞ্চিমু অভাগিনী॥

মাঘ মাসেতে রিত
নগুণ পড়ে জার।
ছাড়ি গেল প্রাণ-
কৃষ্ণ কি গতি
আমার॥

চৈত্রে চাতক পাখি
ডাকে পিয়া পিয়া।
বিধাতা বঞ্চিত
কৈল হাতে
নিধি দিয়া॥

পলাশ কাঞ্চন
বিকশিত নানা
ফুল।

আর নি প্রাণের
নাথ রে আসিব
গোকুল॥

বৈশাখ মাসেতে সখি
প্রচণ্ড তপন।
হেন হি সময় কৃষ্ণ
নাহি বৃন্দাবন॥

ভ্রমর উড়িয়া করে
ফুলের মধু পান।
শ্রীনন্দের নন্দন
বিনে রহে না
পরাণ॥

জ্যৈষ্ঠে নিঠুর ভানু
অনলের প্রায়।

নিদাঘে বিরহ হিয়া
সহন না যায়।।

দারুণ মলয়ার বাও
না জুরায় শ্রীরাধায়
গাও।
কৃষ্ণ বিনে শীতল
হয় না দেহ।।

পৌষে প্রবল শীত
বস্ত্র নাহি পাশ।
হিমালয় পর্বতে
আস্যা দারুণ
বাতাস।।

শীতে তনু থরথর
দন্তে দন্তে বাজে।
তিন দিগে তিনজন
অগ্নি কন্যা মাঝে।।

নাকের নথ বেচি
মলুয়া আষাঢ় মাস
খাইল।
গলার যে মতির
হার তাও বেচ্যা
খাইল।।

শায়ণ মাসেতে মলুয়া
পায়ের খাড়ু বেচে।
এত দুঃখ মলুয়ার
কপালেতে আছে।।

হাতের বাজু বাঁধা
দিয়া ভাদ্র মাসে
খায়।
পাটের শাড়ী বেইচ্যা
মলুয়ার আশ্বিন
মাস যায়।।

সবই এই সময় অনুষ্ঠিত হয়। শরতের শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে বাঙালী জীবনে যে আনন্দের ফোয়ারা ছোটে সারা শীত ধরে তা একই খাতে প্রবাহিত। এই সময়ের পূজানুষ্ঠানাদি দেখলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে বাঙালী একদিকে যেমন শক্তির সাধক অন্যদিকে তেমনি সে ললিত-কলার পূজারী।

শীতের রাজ্যে সুখীর বাস। তাই শীতকে ছাড়তে চায় না মন। শীতের রুক্ষতাও কোমল মনে হয়। দারুণ শীতে আহত লোকসমাজ শীতবস্ত্রের অভাবে আগুন জ্বালিয়ে তাওয়া করে শীত ছাড়ায়, শীতে কষ্ট পায় তবু শীতকে ছাড়তে চায় না। শীত চলে যাবার সংবাদে কবিগণও ব্যথিত হয়ে পড়েন। তাই রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছেন—"উদাসীন শীত যেতে চাও বুঝি ফিরে? চিন্তা কি নাই সঁপিতে রাজ্যভার, নবীনের হাতে, চপল চিত্ত যার···। সে যে মুছে দিবে তোমার আঘাত চিহ্ন, কঠোর বাঁধনে করিবে ছিন্ন ভিন্ন···সম্পদ তুমি যার যত নিলে হরি। তার বহু গুণ ও যে দিতে চায় ভরি, পল্লবে যার ক্ষতি ঘটে ছিল বাড়ি—ফুল পাবে সেই লতা"। শীত-বার্ধক্যের প্রবীণতা। বসন্তের শিশু চাপল্যের কাছে যেন ম্যাটম্যাটে, তাই বেদনাপ্রপীড়িত ললনা চাপা ক্ষোভে এবং অভিমানজর্জর কণ্ঠে বলেন—"কি কারণে বিধি মোরে দিলে এত দুঃখ, পৌষ মাইস্যা পোষা আন্ধি, গাও কাঁপে শীতে, একলা ঘরে কাটাই রাত্তি রইলা তুমি বৈদেশেতে। ···পৌষ গেল মাঘ আইল, শীতের বড় জ্বালা, মুর ঘরে নাইরে স্বামী, আরও তো একেলা"। শীতের আনন্দ রসঘন পরিবেশে একলা থাকা কারাবন্দী থাকা অপেক্ষাও অধিক কষ্টের। কিন্তু বাস্তবকে মেনে নিতেই হবে। তাই বঙ্গনারী নিজের কষ্ট নিজের মনের মধ্যে চাপা দিয়ে কাজ করে যায়, হাসে, কাঁদে। এই হাসিকান্নার দোলায় চড়ে উপস্থিত হন বসন্ত। কিশোরের চপলতা, যুবকের তেজবীর্যে ভরপুর বসন্ত মনকে নতুন করে নাড়া

দেয়, রাঙিয়ে তোলে। এই শীতে তরমুজ খরমুজা ফুটি শশা করলা খেড়ো কুলি-বেগুন কুমড়া লাউ চৈতে ঝিঙা নটেশাক প্রভৃতি সব্জি ও শাক এবং যাবতীয় ফুল ফল ও পাতাবাহার বপন করা হয়।

শীত পলায়মান। সূর্য আবার চোখ রাঙাতে সুরু করেছে। বসন্তের দোলা লাগে প্রাণে। চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারকাদি শূন্যে বিচরমান ভ্রষ্ট মায়ামূর্তির মত। অথচ ঠিক শূন্যে নয়।

বিশ্বে অকারণে কিছু ঘটে না। ক্ষুদ্র পরমাণুও তার বক্ষে হারায় না। তারা সাগরে ডুবে বা অন্য কোন প্রকারে আত্মহত্যা করতে পারে না। শীতও পারবে না। আবার ফিরে আসবে। ঘুরে আসবে বসন্ত ইত্যাদি ঋতু পরিবর্তনান্তে। এ পরিবর্তন শৃঙ্খলাবদ্ধ। সূর্য এক নক্ষত্র, সঙ্গে গ্রহ উপগ্রহ তারামণ্ডল। সকলে অর্ধবৃত্তের মধ্যে ঘুরছে। সকলেই সকলের কাজ করে। কেউ কারুর সঙ্গে বিবাদ করে না, শৃঙ্খলার অভাব ঘটায় না। স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে প্রকৃতির এ শৃঙ্খলা লক্ষ্য না করা গেলে, বিশ্ব কৌতুকবোধ করে বিধাতার শ্রেষ্ঠ জীবদের দৃষ্টিশক্তির অস্বচ্ছতার জন্য।

কানের ফুল বেইচ্যা
মলুয়া কার্তিক
গোঁয়াইল।
অঙ্গের যত
সোনাদানা সকলই
বাঁধা দিল।।

আষাঢ় মাস
বাপ-মায়ের আশায়
আশায় যায়।
বিয়া নাই সে হইল
কন্যার কি করে
উপায়॥

শাওণ মাসে বিয়া
দিতে দেশের
মানা আছে।
এই মাসে বিয়া
দিয়া বেউলা
রাঁড়ী হইছে॥

ভাদ্রমাসে শাস্ত্রমতে
শুভ কার্যে মানা।



শীত চলে গেলে আসে বসন্ত ফাল্গুন-চৈত্রে। ফাল্গুন মাসে সূর্য কুম্ভরাশিতে থাকেন, পূর্বফাল্গুনী বা তৎসন্নিহিত পূর্বাপর নক্ষত্রে পূর্ণিমার অন্তে ফাল্গুনের সুরু। চিত্রা বা তৎসন্নিহিত পূর্বাপর নক্ষত্রে পূর্ণিমার অন্তে সূর্য যখন মীনরাশিতে তখন চৈত্র মাস। বসন্ত ঋতুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ,

এই মাসে না হইব
বিয়া কেবল
আনাগুনা॥

আশ্বিন মাসেতে
দেখ দুর্গাপূজা দেশে।

এই মাস গেল বাপের
পূজার আন্দেশে ॥

কার্তিক মাসেতে
আইব কার্তিক
সমান বর।
মন নাই সে ওঠে
বাপের আইল
যত ঘর ॥

আগন মাসে রাঙ্গা
ধান জমিনে ফলে
সোনা।
রাঙ্গা জামাই ঘরে
আনতে বাপের
হইল মানা ॥

পোষ মাসে পৌষা
আন্ধি দেশচারে
দোষ।
এই মাস গেলে
হইব বিয়ায়
সন্তোষ ॥

মাঘ মাসে অতিথ
আইল হীরাধরের
বাড়ী।
একে একে দেখে
বাপে সম্বন্ধ
বিচারি ॥

এই মতে ফাগুন
চৈত্ত বৈহাক
মাস গেল।
জষ্ঠি মাস টইল্যা
যায় কন্যার বর
না জুটিল ॥

সে ঋতুরাজ। রাজার মত তার প্রাচুর্য। সে প্রাচুর্য নবীনতার, সে প্রাচুর্য-সম্পদ পুষ্পের।

কালিদাস বসন্তকে যোদ্ধা বলেছেন। ফুটে-ওঠা আমের মুকুল তার বাণ, ভ্রমরের সার তার ধনুকের ছিলা। কামিনীগণ তার শত্রু, হৃদয় বিদ্ধ করাই তার কাজ। বসন্তে সবই মনোহর, গাছে ফুল, জলে পদ্ম, আমের মুকুল খেয়ে মাতোয়ারা কোকিল কোকিলার মুখচুম্বন করছে, ভ্রমর পদ্মের মধু খেয়ে মাতোয়ারা, গুণগুণ গান গেয়ে ভ্রমরীর মন ভোলাবার চেষ্টা করছে। যুবক-যুবতীর মন উদাস। অনঙ্গের আবির্ভাবে যুবতী-চক্ষু চঞ্চল, বাতাসের ভরে গাছ কাঁপছে, কচিপাতা মৃদু বাতাসে দুলছে, পলাশফুলের লাল পৃথিবী আম-বোলের গন্ধে বিভোর হয়ে পড়েছে। কবির চিত্তে জাগে নব নব ছন্দ, গায়ক-বাদক দোলা দেয় হিন্দোলে ডুম্ ডুমাডুম্ ডুম্, দ্রুদ্রুমদ্রুম্—ক্যান্ক্যানক্যান, ক্রুতাক্ ক্রুতাক্ তাক্, তেরে তা, তা তেরে তা-রবে বাজে ঢোল মৃদঙ্গ কাঁসি। আনন্দে আত্মহারা আবালবৃদ্ধবনিতা, এমন কি পশু পক্ষীরাও বসন্তের প্রভাবে উন্মত্ত। ভ্রমর ভ্রমরীর অঙ্গে উড়ে পড়ছে, একই ফুলের মধু পান করছে উভয়ে। লতা এসে তরুকে আলিঙ্গন করছে। সমস্ত গাছে কচি কচি পাতায় মনে হয় বসন্ত উদ্যান লক্ষ্মীর মুখে অলকা-তিলকা কেটে দিয়েছে। কুরুবকের মধু আহরণের জন্য চারদিকে মধুকরদের গুঞ্জরণ। কুসুমিত বনরাজিতে কোকিলের কু-হু ডাকে রাজবাড়ির দীঘির পদ্মফুল প্রস্ফুটিত হাসি হাসছে। হিমের কাল শেষ, চন্দ্রের কিরণ আর ঝাপসা নয়, পরিষ্কার। নবমল্লিকা মধুর গন্ধে মনকে চঞ্চল করে তুলেছে, এমন সময় কোকিল ডেকে উঠল কুহু কুহু। দক্ষিণ বাতাসের দোলায় জেগে উঠল অনন্ত শোভা। অনন্ত ঐশ্বর্য। বসন্ত দেবতার যৌবনশ্রী তাকে বরণ করে ঋতুমালা হাতে। বিশ্বের যৌবনশ্রী পিককণ্ঠি বীণাবাদিনী বিচিত্ররূপা

বসন্তশ্রী তার আশীর্বাদ সকল বরের শেষ সকল সুরের শেষ, সকল পরিপূর্ণতার শেষ এককোঁটা মধু।

বসন্তের এই আনন্দের মধ্যেই মারাত্মক রাগে বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব হয় বঙ্গে। বসন্তরোগের মর্মান্তিক শোকগভীর মূর্তির কথা চিন্তা করে নানাভাবে বসন্তের অবসান কামনান্তক পূজার্চনা অনুষ্ঠিত হয়। "ফাল্গুনমাসের দিনে বসন্তের বাও, আগডাল ভরষা করি কোকিলায় কাড়ে রাও। হে কালোর হে দিন নাই মনুরা বেপারীর, মহাজনোর চিন্তায় অখোন পারাণী নায় থির। বছর ঘুরিয়া আইল যাইবার পড়িল সারা, হক্কলে চলিয়া যায় সঙ্গী যারা যারা। কেউ উনা কেউ দুনা কেউ খালি নায়, যার অইছে দোনা বেপার দইড়ে দাপড়ে যায়। হক্কলের যাওয়া দেখি মনুরায় কান্দে, হয় ঘড়ি মনোডর কোন খানেনি বান্দে। ... কেউ যায় আস্তে ধীরে কেউ যায় লড়ে। কেউ যায় বাদাম তুইলে, কেউ যায় দাড়ে, কেউরুর বইঠার বাড়িয়ে দরিয়ায় মুর লাড়ে। কেউ কয় আল্লা আল্লা কেউ কয় হরি, ফ্যালফ্যালাইয়া চাই থাহে মনুরা বেপারী। হকল বেপারী গেলা এক এক করিয়া, মনুরা বেপারী কান্দে নদীয়ার কুলে বইয়া।" অন্যদিকে শোনা যায়— "ভাঙল হাসির বাঁধ, অধীর হয়ে মাতাল কেন, পূর্ণিমার ওই চাঁদ। উতল হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে, মুকুল ছাওয়া বকুল বনে, দোল দিয়ে যায় পাতায় পাতায়, ঘটায় পরমাদ। ঘুমের আঁচল আকুল হল কী উল্লাস ভরে, স্বপনহত ছড়িয়ে প'ল দিগ দিগন্তরে"। এই ঋতু যূথিকা, মল্লিকা, ভুঁইচাঁপা, গোলাপ, অশোক কর্ণিকা পুষ্পরাজির অর্ঘ্য নিয়ে আমাদের রিক্ত, নীরস মর্ত্য জীবনের উপর এক বর্ণাঢ্য রসঘন, দিব্যজীবন পেতে দিয়ে যায়। সহসা জীবন নদীতে আসে জোয়ার, যে পূর্ণ ও সুন্দরের উপলব্ধিই জীবনের ধন ও ধ্যান, বসন্তের সমাগমে আকাশে বাতাসে পুষ্পে, পত্রে, পল্লবে সর্বত্রই ভেসে ওঠে সেই পূর্ণ ও সুন্দরের

জষ্ঠি মাসের খর
রোইদ গাঁয়ে ধরে
জ্বালা।
সইন্ধ্যা বেলা ঘাটে
আইল কন্যা
সে একেলা॥

পঞ্চ ভাইয়ের বইন
মলুয়া জল ভরিতে
আসে।
কদম তলায় নাগর
ঘুমায় কেউ নাইক
পাশে॥

কাঙ্কের কলসী
ভূমিত্ থইয়া
মলুয়া সুন্দরী।
নামিল জলের ঘাটে
অতি তড়াতড়ি॥

একবার নামে
কন্যা আরবার চায়।
সুন্দর পুরুষ এক
অঘুরে ঘুমায়॥

আশ্বিন মাসে
দুর্গাপূজা মায়ের
আগমনে।
মলুয়া মানত মানে
মায়ের চরণে॥

কোন বা দেশে
গেল সে যে কোন
বা গহীন বনে।
রক্ষা কর তারে
মাগো ধরি দুই
চরণে॥

কার্তিকেতে বিষাউষ
কালীপূজার রাতি।
মায়ের চরণে মলুয়া
করিল মিন্নতি ॥

কার্তিকের বিষাউষ
না লাগে তার গায়।
এই বর দাও মাগো
ধরি তোমার পায় ॥

আঘনে সাইলের
ধান সুবাসে বাড়ী
ভরা।
কি খায়্যা বিদেশে
থাকে না পায়
দিশারা ॥

পৌষ মাসে পোষা—
আন্ধি রাইতে
না যায় দেখা।
কোন বা বনে কুড়ার
আশে বইস্যা
আছে একা ॥

মাঘ মাসে
পিটাপুলি
ভাইয়ের বউয়ে
করে।
মনের কথা না কয়
কন্যা খাইতে নাই
সে পারে ॥

ফাল্গুন মাসে
ফাগুয়ার রঙ দোলে
করে খেলা।

রূপজ্যোতি। এই ঋতুতে চৈতে ঝিঙা চৈতে শশা, ফুটি তরমুজ কাঁকুর লাউ করলা উচ্ছে ডাটা ঢেঁরস ঝিঙা বরবটি ধুন্দুল চিচিঙ্গা পুঁই শাক কাটোয়ার ডাঁটা আউসে বেগুন আলু পেঁপে প্রভৃতি সব্জি বপন করা হয়। বপন করা হয় নানাবিধ ফুল ও পাতাবাহার। জিনিয়া গিলাডিয়া সানফ্লাওয়ার প্রভৃতি ফুলে ঋতুরাজ হাসেন। ঋতুরাজাগমনে ধরিত্রী অনির্বচনীয় রূপধারণ করে। বৃক্ষোপরে কোকিলেরা পঞ্চম স্বরে কুহু কুহু করে। আমের বোল ধরে, চূতলতা নবমুকুলিত হয়ে চারদিকে সৌগন্ধ বিকীর্ণ করে, ভ্রমরগণ মধুলোভে উন্মত্ত হয়ে ঝঙ্কার করে, তাদের গুণগুণ রবে প্রাণ অস্থির। মৃদু মৃদু মলয় সমীরণে বিরহিণী শিউরে উঠে। মলয় সমীরণ অন্যের পক্ষে শীতল কিন্তু বিরহিণীর পক্ষে অগ্নিতুল্য। সে আহ্বান জানায়—"হে হৃদয়বল্লভ, জীবিতেশ্বর! হে রমণীজনমনোমোহন, হে নিশাশেষোন্মেষোন্মুখকমলে-কোরকোপমোত্তেজিতহৃদয়সূর্য। হে অতলজলধিতলন্যস্তরত্ন-রাজি স্মহামূল্যপুরুষরত্ন। হে কামিনীকণ্ঠবিলম্বিত রত্নহারাধিক প্রাণাধিক! আর প্রাণ বাঁচে না। আমি অবলা, সরলা, চঞ্চলা, বিকলা, দীনা, হীনা, ক্ষীণা, পীনা, নবীনা, শ্রীহীনা,—আর প্রাণ বাঁচে না। আর কতদিন তোমার আশাপথ চাহিয়া থাকিব? যেমন সরোবরে সরোজিনী ভানুর আশা করে, যেমন কুমুদিনী কুমুদবান্ধবের আশা করিয়া থাকে—আমি তেমনি তোমার আশা করিতেছি"। এই পুরুষ যখন রমণী লোভাতুর হয়, মোহিনীশক্তির দীপ্তির কাছে ম্লান হয়, বশীভূত হয়, তখন সে তাতেই সমর্পিত হয়। একবার মোহিনীবশ্যতা স্বীকার করলে সৌরজগতের চন্দ্র, জ্যোতিষ্ক নক্ষত্রাদি, পৃথিবীর পাহাড়পর্বত, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, লতাগুল্ম সকলকে ধরে টান দেয় উপমার জন্য। নারীর মুখমণ্ডল তখন পূর্ণশশী, কণ্ঠহার নিশার তারকামালা, ললাটের সিঁদুরবিন্দু তরুণ তপন, তার শরীর সঞ্চালন

জ্যোৎস্না রজনীর মন্দমন্দ আন্দোলিত বৃক্ষপত্রে নিয়ত কম্পিত সিন্ধু হিল্লোলিত চন্দ্রিকার খেলা, রমণীর নয়ন সরোবরের মলয়মরুতে দোদুল্যমান নীলোৎপল, চোখ খঞ্জন চকোর সফরী পদ্ম পলাশ ইত্যাদি ফুল, বক্ষ দাড়িম্ব কদম্বাদি ফল। চম্পক কমল কুন্দ শিরিষ কদম্ব গোলাপাদি পুষ্প তখন কামিনীকান্তিগ্রথিত কুসুমমণিকার ন্যায় বোধ হয় না। বসন্তের কুসুমবতী বসুমতী অপেক্ষাও তখন সে আপনার হয়, বর্ষার উচ্ছলিত তরঙ্গবিভঙ্গ অপেক্ষাও রসবতী নারীকে ভাল লাগে তখন। যখন ফুলফলে ধরিত্রী ফেটে পড়ে, দখিনা বাতাস বয়, সকলেই সুখের স্পর্শে শিউরে উঠে, তখন কোকিলও আরম্ভ করে রসিকতা, কু—হু ডাক ছাড়ে সে। শ্রাবণ ধারায় কৃষকের চালাঘরে যখন নদী বয়, যখন বর্ষার জলে কাক চিল ভিজে গোময় হয়, তখন কোকিল তার মাজামাজা কাল দুলালী ধরণের শরীরখানি নিয়ে পালিয়ে থাকে, শীত বা বরষায় তার পাত্তা পাওয়া যায় না।

কিন্তু যখন বসন্তের হাওয়া বইতে শুরু হয় তখন অশোকের ডালে, রাঙ্গাফুলের রাশির মধ্যে কালো শরীর জ্বলন্ত আগুনের রঙ নিয়ে লুকিয়ে রেখে পঞ্চম স্বরে কু-হু বলে ডাক দেয়—"মধু আলো মধুর বাতাস বুঝি তারে করেছে বিহ্বল, ভুলে গেছে দ্বন্দ্ব দ্বিধা দুঃখের আভাষ—তাই সে সুধায় অবিরল—'কু'" এই ডাক বড়ই মধুর। মোহিনী-মিলনের ক্ষণে এই ডাক বড়ই প্রীতির।

এই ডাক সুখের সময়ের ডাক। যখন বকুলের অতি ঘন বিন্যস্ত মধুর শ্যামল স্নিগ্ধোজ্জ্বল পত্ররাশির মত শোভা আর গাছ ধরে রাখতে পারে না, পূর্ণ-যৌবনা সুন্দরীর লাবণ্যের ন্যায় হেসেহেসে ভেসেভেসে হেলেদুলে ভেঙে গলে উছলে ওঠে, অসংখ্য স্ফুটন্ত প্রস্ফুটিত ফুলের বা কুসুমের গন্ধে আকাশবাতাস মেতে ওঠে তখন সুখের আশ্রয়ে বসে বকুলকুঞ্জ থেকে কোকিল ডেকে ওঠে কু-হু। যখন ঊর্ধ্বশরীর নবমল্লিকা সন্ধ্যাশিশিরে সিক্ত হয়ে

ঘরত্তয়ে না বাইরায়
কন্যা থাকয়ে
একেলা॥

চৈত মাসে চৈতী
হাওয়া কুকিলায়
ধরে তান।
ঘরে বইস্যা গায়
কন্যা গুন গুনাইয়া
গান॥

বোইহাক মাসে
খর রোইদ গায়ে
আগুন জ্বলে।
সইন্ধ্যাবেলা দাঁড়ায়
কন্যা সেই না কদম
তলে।

জষ্ঠি মাসে বিষ্টি
লামে কুড়ার ডাক
শুইনে।
মেঘের পানে
চাইয়্যা কন্যা ভাবে
মনে মনে॥

এই না সেই
জৈষ্ঠ মাসের দিন
ঐ না ঘাটের পাড়ে।
চাইর চউক্ষের
মিলন হইল পরাণ
দিলাম তারে॥

জ্যৈষ্ঠ মাসের
দীঘল দিন ফুরাইতে
না চায়।
চৌখ আম্‌লাইতে
নিশা পরভাত
হইয়া যায়॥

আম পাকে জাম
পাকে ডালে
কাকা রায়।
কাটিয়া গাছের
ফল মায় পুত্ররে
খাওয়ায় ॥

জৈষ্ঠমাস গেল
মায়ের যাদুর পানে
চাইয়া।
এই মাসে উজ্জ্যাল
সাধুর না হইল
বিয়া ॥

আইল আষাঢ় মাস
লইয়্যা মেঘের রাণী।
নদীনালা ভইরা
আইসে আষাইঢ়্যা
পানি ॥
শুক্‌না নদীতে ঢেউ
তোলপাড় করে।
বাণিজ্যি করিতে
সাধু কত যায়
দেশান্তরে ॥

পীরের সিন্নি
মাইন্যা মায় পীরেরে
সেলাম জানায়।
পীরের কদরে পুত্র
ফিইরা পায় মায় ॥

আষাঢ়িয়া মেঘের
ধারা চোক্ষে ঢালে
পানি।
জমিনে পড়িয়া
কান্দে আভাগী
জননী ॥

আলোর দিকে মুখ তুলে তাকায়, স্তরেস্তরে অকলঙ্ক দলরাজি বিকশিত হবার উপক্রম করে, ভ্রমর তখন এই অবস্থা দেখে মধু ঢেলে দেয়। লতার দোলানী, গন্ধরাজের প্রস্ফুটতা, বকুলের রূপোচ্ছ্বাস, মল্লিকার অমলতা, নক্ষত্র নীলচন্দ্রাতপমণ্ডিত গিরিনদী সাগরকুঞ্জ ইত্যাদি দেখে মানুষ আনন্দে আত্মহারা হয়ে মোহিনী-সান্নিধ্য চায় তখনও কোকিল ডেকে ওঠে কু-হু। কোকিলের ডাক শুনেই দিকেদিকে শুরু হয়ে যায় বসন্তের সমারোহ, মনের ঐকতান। চমৎকার এ ঋতুতে কোন কষ্ট নেই, জলঝড়ের অত্যাচার নেই। তাই এ ঋতুকে বলা হয়েছে ঋতুরাজ। এ ঋতুতে—"আঁখি আকুল অন্বেষণে, ফিরছে যখন বনে বনে, মুহুর্মুহু কুহু স্বরে, তন্ত্রী দুলে উঠছে বুকে; তখন তুমি দিলে দেখা। অমনি ফুলের বনে ফুলের রানী রমণী! অমনি বিপুল সুখের ভরে, আকুল আঁখি উঠল ভরে, পুলক হাসি পাগল বাঁশী, বিদায় দিল মৌন দুখে।"

এ সময় সকলের মনেই তৃপ্তি ও আনন্দ। পাখিরাও কনেকানে কথা কয় তারপর উড়ে চলে যায় আকাশে। তাদের ডানার ঘ্রাণ চারদিকে ভাসে। ঘুমোতে চায় না মন। সোনালী ডানার চিল মেঘের দুপুরে ভিজে উড়ে যায়। মাঠের নিস্তেজ রোদে লোকসমাজ নাচে, গায়, আনন্দ স্ফূর্তি করে।

হেমন্ত দিয়ে গেছে সোনাধান। বসন্তের উল্লাসে পেঁচারা সব কোটরে ঢুকেছে, সবুজ ধানের গোলা ভেদ করে ধান নিয়ে ইঁদুর পালায় পাতালের দিকে। জমির উপরে পড়ে আছে নতুন লাঙ্গল। আকাশের মেঠো পথে ভেসে যায় চাঁদ। আছে অবসর সকলের। ঘরে গেছে চাষী। নেই উত্তেজনা, নেই কাজ। ফসল আছে ঘরে। মাঠেমাঠে এখনও দেখা যায় শিশিরের জল। ধোঁয়াটে কুয়াশা নেই, মেঠো চাঁদ, মেঠো তারাদের সঙ্গে জেগে আছে কালপেঁচা, না জানি কখন সে অমঙ্গলের ডাক দেয়!

প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী। অগ্নি ও

বায়ু আকাশ ওষধি বনস্পতি ঋতুগত বিচিত্র সৌন্দর্য উপলব্ধির মধ্যে জ্যোতির্ময় পুরুষের প্রকাশ। মানুষ ও প্রকৃতি উভয়ের উৎস অভিন্ন বলে মানুষ এমন করে চায় প্রকৃতিকে। প্রকৃতিও এমনি করে চায় মানুষকে। বারোমাসে ছয়ঋতুর পালাক্রমে আবির্ভাবের ফলে মানব মনের অপরূপ রূপ ও বিলাস বিভ্রম দৃষ্ট হয়। এবং তা সর্বকালীন বিশ্বমানব জীবনে মহাসত্য।

পর্যায়ক্রমে ঋতুগণ আসেন আবার চলে যান। মহাসৃষ্টির মহানিয়মে তারা বিধৃত। প্রত্যেকটি ঋতুরই আছে এক একটি বিশিষ্ট রূপ। সেই বৈশিষ্ট্য নিয়েই তাদের আবির্ভাব। ফলে প্রত্যেক ঋতুর আগমনেই ধরিত্রী তার পুরাতন রূপের আবর্তনটি খুলে ফেলে দিয়ে নবীন সৌন্দর্যে হেসে উঠতে পারেন। বাঙলার প্রকৃতির রূপ বৈচিত্র্য ছয়ঋতুর আসা-যাওয়ার ফলেই ঘটে যাচ্ছে, ঘটে চলেছে, ঘটে যাবে। এবং এরই প্রভাবে বাঙালী জীবন পরিবর্তিত হচ্ছে ঋতুতে-ঋতুতে, মাসে মাসে। প্রকৃতির রুক্ষতা, শুষ্কতা, শ্যামলতার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীও রুক্ষ, শুষ্ক, শ্যামল, কোমল হয়ে উঠছে। প্রকৃতির রূপ বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীও বদলাচ্ছে তার গতিপ্রকৃতি, তার বসনভূষণ, তার অন্নব্যঞ্জন। বাঙালীর লোক-জীবনের আলোচনায় তাই ঋতু বৈচিত্র্য ও প্রকৃতি পরিচয় প্রাসঙ্গিক।

গিরাস্তির কামে
উজ্জ্যাল মন
নাই সে দিল।
পৌষ মাসে উজ্জ্যাল
কোটায় জ্বালা
ফালাইল॥

মাঘ মাসে উজ্জ্যাল
মামুদ জালায় সিঙ্কে
পানি।
মাঘ মাইস্যা শীতে

হয় ঘামি॥

মায়ে ত তুইল্যা
রাখছে বিন্নি
ধানের খৈ।
সুয়ামীরে খাওয়ায়
আয়না ঘরুয়া
মইষের দৈ॥

চৈত্র-বৈশাখ দুই
মাস এইমতে যায়।
কামেলা লইয়া
উজ্জ্যাল ক্ষেতের
ধান দায়॥



এই ষড়ঋতুকে নিয়েই বাঙলার জনজীবন। বারোমাসে তেরোপার্বণ। বাঙালী রাশি ঋতু নক্ষত্রের শাসন মেনে নিয়েছে। মেনে নিয়েছে রবি সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই সাতটি বারকে। প্রতিপক্ষে প্রতিমাসে প্রতিঋতুতে এদের আনাগোনা। সোম বুধ বৃহস্পতি ও শুক্র

সমস্ত কাজের পক্ষে শুভ এবং রবি মঙ্গল ও শনি কোন কোন শুভকর্মে প্রশস্ত। যেমন নৃপাভিষেক নৃপতিগমন রাজকার্য রাজদর্শন প্রভৃতি রবিবারে প্রশস্ত। ভেদ ও বিচার কর্ম, রাজ-সেনাপতিত্ব, শস্ত্রশিক্ষা, দ্যূতক্রীড়া ও মৃগয়াব্যসনাদির জন্য মঙ্গল এবং সুবর্ণমূর্তি স্থাপন যজ্ঞার্থ-যূপনির্মাণ হস্তী অশ্ব প্রভৃতি চালন শিক্ষা ও গৃহ-প্রবেশাদির জন্য শনিবার প্রশস্ত।

প্রতিপদ ষষ্ঠী ও একাদশী এই তিন তিথিকে বলা হয়েছে নান্দী, দ্বিতীয়া সপ্তমী ও দ্বাদশী এই তিন তিথি ভদ্রা, তৃতীয়া অষ্টমী ও ত্রয়োদশী এই তিন তিথি জয়া এবং চতুর্থী নবমী ও চতুর্দশী এই তিন তিথি রিক্তা। পঞ্চমী দশমী অমাবস্যা ও পূর্ণিমাকে বলা হয়েছে পূর্ণা।

তরুলতাশোভিত বনরাজির শ্যামল সুষমা, গিরিমালার অপূর্ব গাম্ভীর্য, সুনীলসায়রের উত্তাল তরঙ্গলীলা, নক্ষত্রখচিত নৈশাকাশের অনির্বচনীয় শোভা, কুসুমের সৌরভ, বিহগের সুললিত সঙ্গীত—সমস্তই চিত্ত বিনোদন করে চলেছে। মনে হয় যেন নিত্য আনন্দোৎসব। সঙ্গে সঙ্গে বসুমতীর বক্ষে চলছে দিবারাত্র অবিশ্রান্ত সংগ্রাম। জলেস্থলেঅন্তরীক্ষে সর্বত্র সংগ্রাম, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল জীব অনন্তর সংগ্রামে লিপ্ত। একে অন্যের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবার জন্য দিবারাত্র সংগ্রাম করে যাচ্ছে। এ সংগ্রামে ও শক্তির পরীক্ষায় যে জয়ী হবে সে প্রকৃতির পুরস্কার উপভোগ করবে। বিজয়ী বেঁচে থাকে, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, অকালে বিজিতের জীবনাবসান হয়। যেসব হতভাগ্য জীব পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে বসুন্ধরা তাদের কঙ্কালরাশি বক্ষে ধারণ করে সান্ত্বনা লাভ করছেন।

পুরাতাত্ত্বিক খননে তাদের আবিষ্কার হয়। প্রাচীনযুগে নাকি প্রায় আশী হাত লম্বা ও ত্রিশ হাত উঁচু এক একটা কুমীর ছিল যারা জলে স্থলে আকাশে বিচরণ করতে পারত। কিন্তু কালের গতির সঙ্গে তাল রাখতে না পারার দরুন তাদের প্রস্তরীভূত কঙ্কালরাশি তাদের প্রাচীন অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করছে মাত্র। অথচ একই সঙ্গে উদ্ভূত নিরীহ ভেক বা ব্যাঙ, ক্ষুদ্র টুনটুনি পাখি, পিপীলিকা লক্ষ লক্ষ বৎসর আপনাদের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। একই ভাবে চলেছে লোকসমাজ সভ্যসমাজের অত্যাচার ও বিভেদ থেকে নিজেদের রক্ষা করে, নিজেদের বাঁচিয়ে।

নৈসর্গিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলেছে বলেই তা সম্ভব হয়েছে। এই সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্য বাঙালীর উপর প্রকৃতির প্রথম আদেশ, 'তুমি সংগ্রাম করে জয়ী হও, যোগ্যতা প্রমাণ কর, তবে

তুমি বাঁচবে।' দ্বিতীয় আদেশ, 'তোমাকে যখন যে প্রতিকূল অবস্থায় পড়তে হবে তখন তাকে মানিয়ে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারলে তবেই তুমি বাঁচবে, বসে হা-হুতাশ করলে চলবে না'। প্রকৃতির আদেশ অমান্য করার ফল হয় শোচনীয়। প্রকৃতির রাজ্যে সর্বত্রই আইন, সর্বত্রই নিয়ম, সর্বত্রই শৃঙ্খলা। এই শৃঙ্খলায়িত প্রকৃতির দিন, ক্ষণ, রাশি-নক্ষত্র ও পাদ অনুযায়ীই বাঙলার লোকসমাজ ঋতু-শাসিত, বাঙলার জনজীবন ঋতু-চালিত, বাঙলার পূজাচারণ ঋতু নির্দেশিত এবং দেববিগ্রহ ইত্যাদি অধিষ্ঠিত।

বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব আসলে শারদোৎসব যার মধ্যে বাঙালীর জাতীয় প্রকৃতির অর্থ নিহিত আছে। দুর্গা শক্তির প্রতীক, সকল দেবতার তেজ সংহরণ করে তাঁর সৃষ্টি। বাঙালীও স্বভাবে শাক্ত, তাই শক্তি পূজায় তার অন্যতম আকর্ষণ।

এই শক্তি বাঙালীর কাছে ভীমাভয়ঙ্করীরূপাপেক্ষা কন্যারূপে উমারূপে দেখা দিয়েছে। সূর্যের কন্যারাশি অবস্থানকালীন সময়ে যে দুর্গোৎসব তা কন্যারাশিরই পূজা। দুর্গা সিংহবাহিনী কন্যাও সিংহবাহিনী। দুর্গোৎসবের অঙ্গ বিজয়া। বিজয়ার পশ্চাতে আত্মীয়তা ও মৈত্রীর ভাব বিদ্যমান। দশমী দিবসে প্রতিমা বিসর্জনের পরে কোলাকুলি হয়। শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সকলে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। প্রার্থনা করে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও আত্মীয়তার বন্ধন যেন চিরকাল অটুট থাকে।

বুদ্ধ-পূর্ণিমাও ঋতু উৎসব। বৌদ্ধধর্ম থেকেই অহিংসাবাদ এসেছে হিন্দু-ধর্মে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বলতে প্রধানত বৌদ্ধযুগের ইতিহাস, এবং প্রাচীন শিল্পকলা বলতে বৌদ্ধশিল্পকলাকেই বুঝি। বাঙলার বৈষ্ণব ধর্মে আছে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব—"পাপীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে" চৈতন্য-চরিত্রামৃতের এ কথা ভগবান বুদ্ধের অহিংসা বাণীরই প্রতিধ্বনি।

ঈদ-উল-ফিতর এবং ঈদ-উজ-জোহা প্রভৃতি বিভিন্ন মুসলমানী পর্ব ও অনুষ্ঠান ঋতু উৎসব। ঈদ-উল-ফিৎর চান্দ্রমাস শাউওয়ালের পয়লা ও দ্বিতীয় ঈদ দ্বাদশ চান্দ্রমাস জিলহ্‌জ-এর দশ তারিখ প্রতিপালিত হয়। এই উৎসবদ্বয় মুসলমান সমাজের বৃহৎ এবং পবিত্র উৎসব। এই উৎসবে মিলনের পূর্বে একমাস যাবৎ ধর্মভীরু মুসলমান সমাজ অখণ্ড কৃচ্ছ্র সাধনা ও সংযম অভ্যাসের দ্বারা দৈহিক ও আত্মিক দিক থেকে নিজেদের বিশুদ্ধ ও দৃঢ় করে তোলেন। ঈশ্বরচিন্তায়, ঈশ্বরচর্চায় 'তেলাওয়াৎ' বা কোরাণপাঠ, নামাজ ও অন্যান্য ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মে নিজেদেরকে সতত ব্যাপৃত রাখেন।

সারাদিনের উপবাসী হৃদয় সায়াহ্নে 'ইফতার' করেন বা রোজা ভাঙেন, শেষ রাত্রে 'সেহেরী' খান। অনেকে 'এতেকাফ' পালন করেন রমজান মাসের শেষের কয়েকটি দিনে। এ অনুষ্ঠানে সাংসারিক সমস্ত ক্রিয়াকর্ম বন্ধ রেখে মসজিদের একটি প্রান্ত আব্রু দিয়ে ঘিরে দিবারাত্র উপাসনা করা হয়ে থাকে। মেয়েরা 'এতেকাফ' পালন করেন বাড়ীতে, মসজিদে যাবার অধিকার তাঁদের নেই। এতেকাফ আবশ্যিক নয়, তবে রাত্রে 'জামায়েতে' (ইমামের অধীনে সমবেত হয়ে) 'তারাভীর' নামাজ কর্তব্য। এই নামাজের বৈশিষ্ট্য 'হাফিজ' বা সমগ্র কোরাণ যাঁর কণ্ঠস্থ তাঁর কোরাণ আবৃত্তি। রমজান অন্তে ঈদের আরেকটি করণীয় কাজ সামর্থ্য অনুযায়ী দীনদুঃখীদের 'খেৎরা' দেওয়া বা দান-খয়রাত করা। ঈদ্-উজ্ জোহা উৎসবেরও উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্য হল ত্যাগ ও উৎসর্গের শিক্ষা। ইসলামের বিধান অনুসারে এইদিনে বকর-ঈদের নামাজের পরে প্রত্যেককেই কোন না কোন পশু কোরবানি (উৎসর্গ) করা কর্তব্য। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি ঐদিন কোরবানি করবে না সে ঈদগাহে যেতে পারে না বলে মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস। যে প্রাণীকে কোরবানি করা হয় তা সুস্থ, সবল ও নিখুঁত হওয়া আবশ্যক। মহরমও ঋতু উৎসব। এদিনে ইমাম হোসেনের অমর আত্মদানের স্মৃতিকে পরমশ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়। সিয়া মুসলমানেরা দশদিন ধরে, এবং সুন্নী সম্প্রদায় মাত্র দশম দিনের অনুষ্ঠানে শোকের দিন ও রোজা পালন করেন।

আদিবাসী এবং উপজাতি সমাজের নানাবিধ উৎসব অনুষ্ঠানাদিও ঋতু উৎসব। তারা নিজ নিজ উৎসব-অনুষ্ঠান ছাড়া নানা হিন্দু-উৎসব আচার অনুষ্ঠানও প্রতিপালন করেন। তাঁদের প্রত্যেক পূজাচারানুষ্ঠানের শেষে আছে নাচগান ও পান। বীজ বপন করার সময় বলি দেন মুরগী, ঘটে করে দুধ রাখেন, বীজ থেকে চারা বের হলে দেন মোরগ বলি, ফসল পাকার সময় করম, ফসল কাটার পর সহরায় উৎসব, সহরার পর সাকরত, তারপর মাঘসীম উৎসব, মা-মোরে পূজা একে একে অনুষ্ঠিত হয়ে চলে। এই সব ঋতু উৎসবে একদিকে প্রকাশিত ভয়ভক্তি অপরদিকে আছে প্রাণখুলে আনন্দ প্রকাশের আগ্রহ।

বাঙালী চিরকাল মৈত্রীর বন্ধুত্বের সাধনা করে আসছে। দুর্গোৎসবের সঙ্গে সঙ্গে চলে দীপান্বিতা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, নবান্ন, পৌষউৎসব, শ্রীপঞ্চমী বা সরস্বতীপূজা। বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে পূজিতা দেবী সরস্বতী।

কাব্যে ও সঙ্গীতে তাঁর চরম প্রকাশ, বীণারঞ্জিত হস্তেই শুক্লামূর্তি কল্পিত। এই দেবী শুচিতা ও পবিত্রতার প্রতীক। ইনি মানুষের হৃদয়কে পবিত্র করেন, নির্মল করেন, অবিদ্যার অন্ধকার নাশ করেন। যে শতদলে দেবীর অধিষ্ঠান তা খণ্ড খণ্ড শক্তির সমন্বয়ে সৃষ্ট। দেবীর বাহন হংস। হংস নীর থেকে ক্ষীর বা সারবস্তু গ্রহণ করে, জ্ঞানের সার গ্রহণ করার বাসনা থেকেই হংসের উপস্থাপনা। দোল বা মদনোৎসবও বাঙালীর একান্ত নিজস্ব উৎসব। দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে দোললীলায় মেতেছিলেন। ভক্ত বাঙালী তারই স্মরণে এ উৎসব পালন করে চলেছেন। এ উৎসবে আবির কুমকুম ছড়িয়ে আকাশ বাতাস রাঙিয়ে তোলা হয়। পিচ্‌কারীর তরল রঙে বসন রাঙিয়ে রক্তিম অনুরাগে পরিচিত অপরিচিত সকলের মন রঞ্জিত করে তোলা হয়। দেওয়ালি বা দীপান্বিতা অমানিশা বিদূরিত করার, পিতৃগণকে আলো দেখিয়ে নিয়ে আসার উৎসব। বাঙালীর ঘরে ঘরে সারি সারি প্রদীপ জ্বলে দীপান্বিতা উৎসবে। প্রদীপের আলো জ্ঞানের আলো, এই জ্ঞানের আলোকে আমরা অজ্ঞান ও অবিদ্যাকে বিদূরিত করি, পিতৃগণকে সম্মান জানাই। মানব মনের প্রতিটি রূপ রস ও রহস্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি তার রূপ রস ও রহস্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

এই ষড়ঋতুকে ঘিরে দুই বাঙলার যে জনজীবন সেখানে গ্রীষ্ম-সূর্য তাপিত অনল। সে হোমের মন্ত্র ভুলিয়ে দেয়। শুরু হয় ঝাউ, নারকেল খেজুরের বনে রোদন। গাঙশালিক তর্ক করে, পানকৌড়ি ডুবে যায় অগভীর নীরে। হিজলের শাখায় ডাকে তৃষাতুর পিক, চোখগেল পাখী উড়ে যায়, ডাহুকডাহুকী মরা বিলে ঘোরে জলের আশায়, চাতক পাখী আকাশে তাকিয়ে থাকে বৃষ্টির জন্য, দামালছেলে কচি তাল পেড়ে আনে, পেড়ে আনে কালোজাম, পাকা গাব। খাওয়া-দাওয়া ভুলে করে ঘোলা-জলে হুড়োহুড়ি, কেউ মাছও ধরে। ঘরামিরা ভিজে গামছা মাথায় চালের উপর উঠে চাল সারে আগত বর্ষার উপদ্রব থেকে আত্মরক্ষা করতে। জোয়ানেরা গাছের তলায় বসে ঘাম মোছে, কেউ সুতো কাটে, কেউ জাল সারে, কেউ তামাকু টানে, কেউ দিবানিদ্রা যায়। কাঠ-ফাটারোদে গরু ঘুরে বেড়ায় ছায়া-সবুজ ঘাস ও জলের সন্ধানে। নাতনী নিয়ে ঠাকুর্দা শুয়েছেন গিয়ে বটগাছের ছায়ায়, নাতনী তাঁর পাকাচুল তোলে আর সুড়সুড়ি দেয়। ঠাকুরমা ছেঁচাপান মুখে দিয়ে হাসে আর পিক ছিটকায়। সধবারা অক্ষয়বট ইত্যাদি ব্রতে মাতে, পাড়ার বধূরা ঢেঁকিতে সরষে কুটে কাসন্দ

বানাঁয়, রান্নাঘরের দাওয়ায়, পুকুরের ঘাটে—রমণীর দল গালগল্প করে, একে অপরের কুৎসা রটনা করে, ভালমন্দ সুখদুঃখের কথা বলে।

ধূ-ধূ করে মাঠ। মাথার উপর ঝাঁ-ঝাঁ রোদ, দাবানল, হুতাশন। এরই মধ্যে ধান রোয়ার কাজ চলে। আষাঢ়ে পূবালী মেঘের পরাগ মেখে ছোটছোট ধানচারা হেসে লুটোপুটি খায়। চাষী লাঙলের মুঠি ধরে চাষের জমির উপর ঘুরে চলে জমি তৈরী করতে। কেউ বাঁওই দিচ্ছে, কেউ বীজ ভাঙছে, কেউ ক্ষেত থেকে তুলে গাছ এধার ওধার করছে। এরই মধ্যে ধান নুয়ে পড়ে ফসলের ভারে। যেদিকে তাকান যায় সর্বত্রই সবুজের মেলা। মাঠে সোনাধান, কৃষাণ কাস্তে হাতে নাচে, হাসে। পল্লীবালা, ঝুড়ি কাঁখে নিয়ে কেউ কুড়ায় ঝরা-ধান, কেউ গান গায়, কেউ ধানের গাদি তৈরী করে, কেউ বোঝা নিয়ে ঘরের দিকে ছোটে। এগিয়ে আসে নবান্নের দিন। নতুন ধানের উৎসব। লক্ষ্মীর আরাধনা। খাবার ধূম। পিঠা পায়েসের হাপুস-হুপুস শব্দ। চলে হুল্লোড়, চলে হাসির কলতান। গায়েন-বায়েনেরা গান গায়, ঢাক ঢোল কাঁসি শঙ্খ বাজে বিচিত্র শব্দে। মধুমাসে ভ্রমর আসে দুয়ারে। মধুমালঞ্চে ধরে বকুল। ব্যাকুল বাতাস হু-হু রবে বয়ে যায়, মৌমাছি গুঞ্জরণ করে, ভ্রমর ছোটে কাননে কাননে মধু আহরণে। গম্ভীর নরনারীও চপল হয়ে পড়ে।

পূব গগনে আলোর ফুলঝুরিতে ডাকে ফিঙে, বুলবুলি, পাপিয়া, শ্যামা, টুনটুনি, ঝিঁঝিঁ, দোয়েল। অশোক চাঁপায় রঙ লাগে, পলাশ কলি ঢলে পড়ে, শিমূল ফেটে পড়ে। যূঁই, মালতী চামেলী, পারুল, বকুল, হাসনুহানা সুবাস ছড়ায়। আমের বোল ধরে। জাম পাকে। শাপ্‌লা, শালুক ফোটে, শরৎ ডাক দেয়। পূজার ধূম পড়ে যায়। পূজারী-পাণ্ডা-ঢুলী-ঢালী-মালী কোলাহল করে। মঙ্গলঘটে দোলে আম্রপল্লব, কবি আগমনী গায়। বোধনশঙ্খ বাজে। এয়োরা প্রদীপ জ্বালায় আঁধার ঘরে। উমার বিদায়ে সকলের অশ্রু ছলছল চোখ, তবু মেয়েরা সিঁদুরখেলায় মাতে। জাঁক ও জোকারে এঁয়োতী উৎসব এগিয়ে চলে।

খেয়াঘাটের পাটনীর জন্য শুরু হয় সরব চীৎকার। গাঁয়ের বধূ গা-ধুতে গিয়ে সাঁতার খেলে, মাথায় কাটা ধানের বোঝা নিয়ে কৃষাণ গান গেয়ে বাড়ী ফেরে। রাস্তায় রাস্তায় লাউ, কুমড়ো, বাগানে বাগানে ঝিঙে ফুল, সীম রঙ বেরঙে ভরা। বাঁধাকপি, ফুলকপি, শালগম, তল্ল্যাবাঁশের ঝাড়, বেগুনে লঙ্কা, ছোলা, বরবটি, মেটেআলু, কচু, পেয়ারা, আতা, লেবু,

জামরুল, করমচা প্রভৃতি ফলেফুলে ভরে যায় ভুবন। তার মধ্যে পায়ে হাঁটা পথ, দুধারে দাঁড়িয়ে আছে দন্তাপদ্ম, মান ও গুঁড়ি কচু গাছ। ঘরের বাঁ-দিকে মনসার দোল, তুলসীমঞ্চ। অদূরে কাঁচা-কঞ্চির বেড়া দিয়ে সব্জির বাগান এবং তারই পাশে ছোট সরষের ক্ষেত, মটর, কলাই, ছোলা, মুগ, মুসুর নানাজাতীয় কপি, মূলো ও ধনে গাছ।

চাষ-বাস, ফুল-ফলের ফলন, পাতাবাহার ও গবাদি খাদ্যের বীজ বপন করা হয় প্রতি মাসে, প্রতি ঋতুতে। তবে সবসময়ই সব সব্জি বা সব ফল ও ফুল জন্মে না। সব মাটিতেও ফলন ফলে না। প্রত্যেকেরই আসাযাওয়া হয় মাস ও ঋতুকে কেন্দ্র করে।

স্মরণীয়, চাষ-বাসে প্রথমেই জমির স্থান। নতুন জমি সংগ্রহের সময় তাই চাষী পাথুরে, বালি, উষর, লবণাক্ত ইত্যাদি জমি পরিত্যাগ করার চেষ্টা করে। কারণ ঐ জমি কার্যোপযোগী করতে প্রচুর শ্রম, অর্থ ও সময়ের অপচয় হয়। দোঁয়াস ও উর্বর জমি হলে চাষী লাভবান হয়।

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, শীত ইত্যাদি ঋতুর প্রকোপ অনুযায়ী চাষ-বাস নিয়ন্ত্রিত। শহরের নিকটবর্তী জমিতে সব্জি চাষ ফলে। দূরবর্তী জমিতে নানাবিধ শস্য ও পশুপালন করা হয়। মাঠে ধান, পাট, ডাল প্রভৃতি চাষ স্মরণাতীত কাল থেকে হয়ে আসছে। পর্যায়ক্রমে চাষে জমির স্বাস্থ্য ভাল থাকে ও ফলন আশানুরূপ হয়। একই চাষে দু তিন প্রকারের সব্জি বা শস্যের চাষ সম্ভব। সার ও সেচের পূর্ণ সদ্ব্যবহারে অধিক ফলন ফলে। চাষবাসে পশুপালন সম্পূর্ণতা আনে। দুগ্ধবতী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক গবাদি ছাড়া অন্য গো-মহিষেরা জমি কর্ষণ করে, শস্যাদি মাড়াই করে, বহনকার্য সম্পন্ন করে এবং কোন কোন স্থানে সেচের জল উত্তোলনে সাহায্য করে। গবাদির মল-মূত্রাদি এমন কি পচা আবর্জনাও প্রয়োজনীয়। তা দিয়ে উৎকৃষ্ট সার তৈরী হয়। পতিত ও অনুর্বর জমিতে নিয়মিত গবাদি পশু চরালে সে জমি ক্রমশঃ উর্বর হয়। চাষের জমিকে কীট ও রোগের উপদ্রব হতে রক্ষা করা দরকার। স্যাঁতসেঁতে জমিতে অধিকদিন জল জমতে দিলে, আগাছা জন্মাতে দিলে ও ভালরূপে মাটি কর্ষণ না করলে এবং মাটিতে গাছের খাদ্য যথোপযুক্ত না থাকলে প্রায়শই উদ্ভিদ রোগে ও কীটে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এই রোগাক্রান্ত ও কীটে আহত বৃক্ষের পাতা কখনও হলদে, কখনও ছোট ও বিবর্ণ হয়ে যায়, কখনও পাতার ভিতর ছোট ছোট ছিদ্রের সৃষ্টি হয়। অত্যধিক তাপমাত্রায় বর্ষায় বা ঝড়ের জন্যও নানা

প্রকার উদ্ভিদ-রোগ হয়। জমিতে সারের অভাব এবং অত্যধিক রাসায়নিক সারের ব্যবহারেও গাছপালার নানাবিধ রোগ হতে পারে। এই সব বিপদ থেকে মুক্তি পেতে অভিজ্ঞ কৃষক বীজ শোধন করে তবেই বপন কার্য সম্পন্ন করেন। মোটামুটি সমস্ত বীজই পারা-জাতীয় ঔষধের দ্বারা শোধন করা হয়। বীজতলায় বা চারাগাছকে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য অভিজ্ঞ চাষী তামা-ঘটিত ঔষধের ব্যবহার করেন। বড়গাছকে খারাপ আবহাওয়াজনিত রোগ থেকে রক্ষা করতে স্প্রেয়ার দিয়ে তামাক বা দস্তা-ঘটিত ঔষধ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এইভাবে জমি তৈরী করে তবেই বৈশাখে বপন করেন—কাঁকরোল, করলা, চালকুমড়ো, লাউ, বেগুন, কাঁকড়ি, চিচিঙ্গা, ঢেঁড়স, ঝিঙ্গা, উচ্ছে, শশা, কুমড়া, বরবটি প্রভৃতি সব্জি। জ্যৈষ্ঠে—লাউ, কুমড়া, ঢেঁরস, পালা ঝিঙ্গা, পালা শশা, বর্ষাতি মূলা, নটে শাক, লঙ্কা, বর্ষাতি সীম ইত্যাদি। গ্রীষ্ম ঋতুতে পাওয়া যায় যাবতীয় আম ফল—অনুপম অমৃতভোগ আতাই আমীর-পছন্দ আসমানতারা জনার্দন অঙ্গবাহার ইমামবক্স ইলাইদোনা ইলাইত-পছন্দ উমদা-খস ঋচবাগ কালীপাহাড় কাকাতুয়া কাৎগুনিয়া কালুয়া কাকটিয়া করঞ্চ কর্করিয়া গোমর্দন কালমেঘ কুৎরকখাস কাঞ্চনখাস কার্তিক খাজা গুলবন্দ গুর্জিত গোলাপজাম গোলাপখাস চিনিচম্পা নয়নীহাল বেগম-পসন্দ টেটোমুখি কানুপসন্দ বারমেসে মজলিস চউরস মোলামজান মোহনভোগ মণিয়াখাস মদনমোহন রতনকেয়া রামগতিখাস শ্রাবণীয়া সিঁদুরিয়া হালুয়া বিমলী ভাইয়া মধু মদকুপিয়া তরমুজ তোতামুখী দয়ালসিং লেঙ্‌ড়া প্রভৃতি আমের নাম শুনলেই জিভে জল আসা স্বাভাবিক। গ্রীষ্মের ফুল হচ্ছে—জিনিয়া, দোপাটি, মোরগ, গোলাপ, বেল, যূঁই, চাঁপা, জবা, রঙ্গনা, করবী, স্থলপদ্ম, পান, রজনীগন্ধা, হাসনুহানা, চন্দ্রমল্লিকা, কৃষ্ণচূড়া, ইত্যাদি। বর্ষা বা আষাঢ় শ্রাবণে—বর্ষাতি সীম, ঢেঁড়স, শাক, শাঁকালু, টম্যাটো, শালগম, জলদিফুলকপি, ঝিঙ্গা, পালালাউ, কুমড়া, লঙ্কা, ধুন্দল, বরবটি, শশা, বিলাতী কুমড়া, পুঁই, পালমৃশাক, শালগম, ফুলকপি, পেঁপে, টেপারী, ডাঁটাশাক ইত্যাদি শাকসব্জি; জিনিয়া, দোপাটী, কসমস, সানফ্লাওয়ার, কোরিওপসিস, গমফরেণা, গিলার্ডিয়া, পর্টুলেকা ও কনভলভিউলা প্রভৃতি ফুল পাওয়া যায়। শরৎ বা ভাদ্র-আশ্বিনের সব্জি বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, বীট, গাজর, শালগম, টম্যাটো, লঙ্কা, লেটুস, বীন, মটর, স্কোয়াস, পার্শনিপ, পালম, শাঁকালু, পেঁপে, টেঁপারি, মূলা,

লাউ, কুমড়া প্রভৃতি। এই সময় বর্ষা ঋতুর যাবতীয় ফুল ছাড়া গোলাপ, শীতের মরশুমী ফুল এষ্টার, কারনেশন, প্যান্সি, ফ্লরাস, পপি, এন্টারিনাম, ডালিয়া, ডায়ন্থাস, ন্যাশটারসিয়াম প্রভৃতি ফুলও রোপন করা হয়। কার্তিক-অগ্রহায়ণ বা হেমন্তে যেসব সব্‌জি বপন করা হয় তারা হচ্ছে কপি, বীট, গাজর, শালগম, শীতের লাউ, কুমড়া, ঝিঙা, শশা, টম্যাটো, মটর, সীম, লেটুস, ফ্রেঞ্চবীন, তরমুজ, খরমুজা ইত্যাদি এবং শরতের যাবতীয় ফুল ও ডালিয়া। পৌষ-মাঘে বা হেমন্তে লাউ, কুমড়া, চৈতে ঝিঙা, কুলিবেগুন, তরমুজ, খরমুজা, কাঁকুর, করলা, উচ্ছে, ডাঁটা প্রভৃতি বপন করা হয়। ফাল্গুন-চৈত্র বা বসন্তে একই ফল ও শাক ও সব্‌জি পাওয়া যায়। আলু ও পেঁয়াজ বারোমাসেই পাওয়া যায়। তেমনি সর্বদা পাওয়া যায় কলা বাঙলার সর্বত্র। পেঁপে ও কুমড়া, বেগুন সবঋতুতে মেলে।

চাষ-আবাদে বাঙলার কৃষকসমাজ সর্বদাই ব্যস্ত, ব্যস্ত কৃষকরমণী উৎপাদিত শাক-সব্‌জি সমূহকে সুপক্কে পরিবেশন করতে। এ শাক-সব্‌জি রন্ধনে বঙ্গরমণীর সুখ্যাতির কথা মধ্যযুগের সাহিত্যের সর্বত্র—"শাকেতে ঈশ্বর বড় প্রীত ইহা জানি, নানা শাক দিলেন প্রকার দশখানি। প্রথমে সুক্তার ঝোল দিল ঘন্ট শাক, প্রশংসা করয়ে সবে খুল্লনার পাক।" প্রতিটি বাঙালী কুলবধূই এক একজন খুল্লনা। তারা সকলের প্রশংসা ও সমাদরে ধন্যা। চাঁদ-পত্নী সনকার শাক রন্ধন যে কোন বাঙালী রমণী বা কুলবধূর ঈর্ষণীয়। তিনি রাঁধেন—"পাটায় ছেঁচিয়া নেয় পলতার পাতা। রান্ধেন বেগুন দিয়া ধনিয়া পলতা।...জবানী পুড়িয়া ঘৃতে করিল ঘন পাক। সাজ ঘৃত দিয়া রান্ধে গিমা তিতাশাক। কোমল বেথয়া শাক করিয়া কেচা কেচা। নাড়িয়া চাড়িয়া রান্ধে দিয়া আদা ছেঁচা। নারিকেল দিয়া রান্ধে কুমড়ার শাক। একে একে দশ শাক করিলেন পাক।" কৃষিভিত্তিক সমাজ-পরিবেশ থেকেই এসেছে নানাবিধ শাক সব্‌জি রন্ধনের দক্ষতা বঙ্গরমণী কুলে। বঙ্গরমণীদের কৃচ্ছ্রতার জন্যই বাঙালী ভোজন-রসিক বাঙালী ভোজনপটু বলে পরিচিত। নিশ্চিন্ত আরাম ও প্রশান্তি ব্যতীত এরূপ খাদ্যচর্চা যে সম্ভব ছিল না তা উল্লেখের দাবী রাখে না।

অধিক খাবারের দরুন বা অন্যান্য কারণে নানাবিধ রোগ হওয়াও স্বাভাবিক। দেহ থাকলেই রোগ হয়। সেই রোগমুক্তির জন্যও আছে প্রচেষ্টা। বাঙলার লোকসমাজ আধুনিক চিকিৎসা অপেক্ষা টোটকা-চিকিৎসার উপর বেশী নির্ভরশীল। টোটকা-চিকিৎসকেরা কাছের মানুষ, দেশীয় ভাবধারায় বর্ধিত।

বাঙালী জনজীবনের সঙ্গে কৃষির ঘনিষ্ঠ যোগ। এবং সে কৃষি সম্পূর্ণভাবে বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। বৃষ্টি অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টির জন্য তাই বাঙালী-জীবনে বেগ উদ্বেগ সঞ্চারিত হয়। তাই সে বৃষ্টির আগমন-বার্তা পূর্বাহ্নে জানতে চায়। বৃষ্টি কুয়াশা বন্যা ধান্য ও মৎস্যগণনা, শস্যগণনা, হালচাষের সময় নির্ণয়, শস্যাদি রোপন ও কাটবার সময় নির্ণয়ের জন্য অনেক সময়ই লোক-সমাজ প্রচলিত বচনের উপর আস্থাবান থাকে।

আলি-বন্ধনের প্রণালী সম্পর্কিত জ্ঞানের জন্য এখনও বাঙলার কৃষক বচনের উপর নির্ভরশীল। যেমন—'পূবেতে উঠিল কাঁড় ডাঙ্গাডোবা একাকার'—বর্ষার সময় পূর্বদিকে রামধনু উঠলে মুষলধারে বৃষ্টি হয় বা 'বেঙ ডাকে ঘন ঘন বৃষ্টি হবে শীঘ্র জান'—ঘন ঘন মেঘগর্জন বর্ষার আগমনবার্তা সূচিত করে।



কৃষক তখন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তাছাড়া 'কর্কট ছরকট সিংহের শুখা বন্যা কানে কান, বিনা বায়ে তুলা বর্ষে কোথা রাখবি ধান'—শ্রাবণে অধিক বৃষ্টি হলে ভাদ্র শুকনা গেলে আশ্বিনে আলে পূর্ণ জল থাকলে ও কার্তিকে বায়ুর বদলে মন্দ মন্দ বৃষ্টি হলে, সে বৎসর ভূরি প্রমাণ ধান্য উৎপাদিত হয় বলে লোক বিশ্বাস। আবার এও বিশ্বাস করে ওরা—'যদি বর্ষে আগনে রাজা যান মাগনে। যদি বর্ষে পৌষে কড়ি হয় তুষে। যদি বর্ষে মাঘের শেষ ধন্যরাজার পুণ্যদেশ। যদি বর্ষে ফাগুনে চিনা কাউন দ্বিগুনে' অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে বৃষ্টি হলে ধানে কীট জন্মে, কীট ধান গাছ নষ্ট করে যার ফলে প্রজা রাজস্ব দিতে পারে না; সুতরাং রাজাকে বিপদাপন্ন হতে হয়। পৌষ মাসের বৃষ্টিতে হৈমন্তিক ধানের ক্ষতি হয়, চাল হয় অগ্নিমূল্য। মাঘ মাসের শেষ থেকে ফাল্গুনের বৃষ্টি ধানের পক্ষে শুভ। এইরূপ অবস্থায় উচ্চ জমিতেও ধান জন্মে। চৈত্র মাসে বৃষ্টি জ্যৈষ্ঠে কম বৃষ্টি এবং আষাঢ়ে ধারা বৃষ্টি ভাল। 'যদি হয় চৈত্রে বৃষ্টি তবে হয় ধান্যের সৃষ্টি'; 'জ্যৈষ্ঠে শুখা আষাঢ়ে ধারা শস্যের ভার না সহে ধরা'। শহরের বহু শিষ্টনাগরিকও মনে করেন যে 'শনির সাত মঙ্গলের তিন আর সব দিন দিন' অর্থাৎ শনিবার বৃষ্টি শুরু হলে

সে বৃষ্টি এক সপ্তাহব্যাপী চলবে, মঙ্গলবার বৃষ্টি আরম্ভ হলে তা তিন দিন চলবে এবং অন্যান্য বারে বৃষ্টি শুরু হলে দিনে দিনেই সে বৃষ্টির সমাপ্তি ঘটে।

শুধু বৃষ্টির ব্যাপারেই এ বচন লোকজীবনের নিয়ামক নয়। হল চালনা, শস্য রোপন ও কর্তনের সময় নিরূপণ ইত্যাদি ব্যাপারেও এ বচন গ্রাহ্য। তাই 'শ্রাবণের পূর ভাদ্রের বার, এর মধ্যে যত পার' অর্থাৎ সারা শ্রাবণ ও ভাদ্রের প্রায় অর্ধেক বা ১২ দিন পর্যন্ত ধান্য রোপন বিধেয়। অথবা 'ষোল চাষে মূলা তার অর্ধেক তুলা, তার অর্ধেক ধান বিনা চাষে পান'। মূলার জন্য ১৬ দিন, তুলার জন্য ৮ দিন, ধানের জন্য ৪ দিন হল চালনা দরকার। পানের জন্য হল চালনার দরকার হয় না। চাষের জন্য সতর্কতা অবলম্বনের কথাও বলা হয়—'পূর্ণিমা অমায় যে ধরে হাল তার দুঃখ সর্বকাল। বলদ যদি না বয় হাল তার দুঃখ চিরকাল। ভাদ্রমাসে রুয়ে কলা সবংশে মলো রাবণ শালা' ইত্যাদি। এ ধরণের আরও নানা বচন জনপ্রিয়। যেমন 'ভাদরে চারি আশ্বিনের চারি কলাই রোপ যত পারি। সরিষা বুনে কলাই মুগ বুনে বেড়াও চাপড়ে বুক। আশ্বিনের উনিশ কার্তিকের উনিশ বাদ দিয়ে যত পারিস মটর কলাই বুনিস। বাঁশবনের ধারে বুনলে আলু আলু হয় গাছ বেড়ালু। পটোল বুনলে ফাল্গুনে ফল বাড়ে দ্বিগুণে। নদীর ধারে পুঁতলে কচু কচু হয় সাত হাত উঁচু। ফাল্গুনে না রুলে ওল শেষে হয় গণ্ডগোল। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠেতে হলুদ রো দাবাপাশা খেলা ফেলিয়া থো। আষাঢ়-শ্রাবণে নিড়ায়ে মাটি ভাদ্ররে নিড়ায়ে করহ খাঁটি। অন্য নিয়মে পুঁতলে হলদি পৃথিবী বলেন তাতে কি ফল দি। খনা বলে শোন শোন শরতের শেষে মূলা বুন। তামাক বুনে গুঁড়িয়ে মাটি বীজ পুঁতো গুটি গুটি। ঘনরূপে পুঁতো না পৌষের অধিক রেখো না। বলে গেছে বরাহের বৌ দশটি মাস বেগুন রো। চৈত্র-বৈশাখ দিবে বাদ ইথে নাই কোন বিবাদ। পোকা ধরিলে দিবে ছাই এর চেয়ে উপায় নাই। মাটি শুকালে দিবে জল সকল মাসে পাবে ফল।' এইভাবে সারা বাঙলাদেশের সমস্ত প্রকার শস্য ফল মূলাদির চাষ ও উৎপাদন প্রণালী সম্পর্কিত বচন চাষী ও কৃষক সমাজকে চালিত করে। এইসব বচন বাঙলা দেশের ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু ও ঋতু-বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে বলে তা এত জনপ্রিয়। কোন যাত্রার শুভাশুভ নির্ণয়ে বলা হয়—'মঙ্গলের ঊষা বুধে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা', বা 'রবি গুরু মঙ্গলের ঊষা, আর সব ফাসাফুসা', অথবা 'শূন্য কলসী শুকনা না শুকনাজলে ডাকে কা, যদি

দেখ মাকুন্দধোপা এক পা না যেও বাপা।' প্রসঙ্গতঃ মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে শূন্য কলসী অমঙ্গলের দ্যোতক হিসাবে বহু মহাজনের হাতেই চিত্রিত হয়েছে।

প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে নানাবিধ ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াও সম্পন্ন করা হয়। প্রত্যেকটি ক্রিয়া প্রসঙ্গে ছড়া আবৃত্তি করা হয়ে থাকে এবং আচরণাদি প্রতিপালিত হয়। গাছপালা, ফুলফল, জীবজন্তু ও প্রাণী প্রকৃতিরই অঙ্গীভূত। তাই ওদের নিয়ে নানাভাবে লোক-চিন্তা প্রকটিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দু' একটি ধাঁধা-র উল্লেখ করা যেতে পারে—'আমার ভাই নিতাই যায় একশ একটা জামা গায়' (কলার মোচা), 'খড়িতে জড়াজড়ি ফলে অধিবাস, ফুল নাই ফল নাই ধরে বারো মাস' (পান), 'ওপারেতে বুড়ি মরেছে এ পাড়েতে গন্ধ ছেড়েছে' (পচান পাট)। এই প্রসঙ্গে একটি সূর্য উদয়ের ছড়ার উল্লেখে লোক-জীবনের কর্মদ্যোগের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাবে। "সূর্য ওঠে কোন দিক দিয়া? সূর্য ওঠে পূবদিক দিয়া। ওঠো সূর্য-উদয় দিয়া, ব্রাহ্মণের ঘরের কোণ ছুঁইয়া, ব্রাহ্মণের মাইয়া বড় সেয়ান, পইতা কাটে বেয়ান বেয়ান। ওঠো সূর্য উদয় দিয়া, বৈদ্যের ঘরের কোণ ছুঁইয়া, বৈদ্যের মাইয়া বড় সেয়ান, ব্রত করে বেয়ান বেয়ান। ওঠো সূর্য উদয় দিয়া, ধোপার ঘরের কোণ ছুঁইয়া, ধোপার মাইয়া বড় সেয়ান, কাপড় কাচে বেয়ান বেয়ান। ওঠো সূর্য উদয় দিয়া, ভুঁইমালীর ঘরের কোণ ছুঁইয়া, ভুঁইমালীর মাইয়া বড় সেয়ান, খোলা চাঁছে বেয়ান বেয়ান। ওঠো সূর্য উদয় দিয়া, তেলির ঘরের কোণ ছুঁইয়া, তেলির মাইয়া কমলা রাণী, খাড়ার আগে ঢালে পানি। ঢালে পানি না লো চাল ধোয়ানি, চাল ধোয়ানি না লো মেলে পাতা, ওঠো সূর্য জগন্নাথ, জগন্নাথের হাঁড়ি, সুবর্ণ নবান্নে প্যাট ভরি"।



কৃচ্ছ্রতা আরাম ও বিশ্রাম থেকে বাঙালী রূপরস ও গন্ধের সাধনায় মেতে ওঠে। ঋতুর চক্র-পরিবর্তনে তাই একের বর্ষা বসন্তে অপরের বর্ষা বসন্ত আলোছায়ার মত আবির্ভূত হয় প্রতিনিয়ত।

আমাদের অন্তর্জগত ও বহির্জগতের এই ঋতুবৈচিত্র্যগত সত্য

সম্পর্কে অবহিত না হয়ে লোক-জীবনের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রকৃতির উষ্ণতায় শুষ্কতায় শ্যামলতায় ও প্রাচুর্যে লোক-জীবন বিশেষরূপে সম্পৃক্ত, তাই ষড়-ঋতু মানুষের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নানা পুলকোচ্ছ্বাস ও রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে চলেছে।

সূর্য-চন্দ্রের উদয়-অস্তে প্রকৃতির রাজ্যে গ্রীষ্ম বর্ষা শীত বসন্তাদির ছোঁয়ায় মানবমনের জীবননদে জোয়ার-ভাঁটা খেলে, চিত্তবীণায় তাদের সৃষ্ট রাগরাগিনীর মাতাল-করা সুরে নিত্যকার স্বস্তি, শান্তি ও সন্তোষের ঘর-সংসারেও কখনও জাগে কত-না অশান্তি কত-না অসন্তোষ।

ঋতুর অমোঘ ইঙ্গিতে মানুষ প্রতিদিনের জীবন অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে, জীবনকে ও ভুবনকে দেখে এক নতুন রঙে, নতুন দিব্যে। ঋতুর পরিবর্তনে মানব-জীবনের ভাবান্তরের অবিসংবাদিত সাক্ষ্য মানবজাতির উৎসব অনুষ্ঠান। কিন্তু কালক্রমে যান্ত্রিকসভ্যতার চাপে আমাদের জীবনে কতোভাবে আছে নৈসর্গিক প্রভাবের কথা, ঋতু বৈচিত্র্যের কথা, তা ভুলতে বসেছি। ভুলতে বসেছি লোকজীবনের কথা।

আমাদের বাৎসরিক উৎসবমালার কতকগুলো শৈব, কতকগুলো শাক্ত, কতকগুলো বৈষ্ণব এবং কিছু বৌদ্ধ উৎসব। কোথাও দেবচরিত্রকে কেন্দ্র করে, কোথাও লোকচরিত্রকে মধ্যবিন্দু করে বিচিত্র ভঙ্গিমায় এইসব উৎসবানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে যার মূলে রয়ে গেছে কৃষি-ভাবনা। বিভিন্ন ঋতুতে উৎসব প্রতিপালনের বিধিবিধানের মধ্যে ঋতুপ্রভাবজনিত প্রাণহিল্লোল ও উচ্ছ্বাসই মৌল প্রেরণা, এবং এ উচ্ছ্বাস বাঙালীর আদিপর্বের কৃষিসভ্যতা, আরণ্যক সভ্যতা ও নদীকেন্দ্রিক সভ্যতার অবদান। অর্থাৎ এই সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই, আদিম জীবনপদ্ধতিতে ঋতু বা প্রকৃতির স্থান ছিল একান্ত নিকট। ঋতুর পরিবর্তনে মানবচিত্তের ভাবান্তরের যে রহস্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় তা সর্বকালীন ও সর্বদেশীয় সত্য। সব সভ্যতা, সব পূজাপার্বণ, সর্ব সংস্কৃতিই বস্তুত কৃষিমূল ও অন্নমূলাশ্রিত। প্রাচীন মানুষের সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতি রীতিমত কৃষিনির্ভর, এবং অন্নময় যে প্রাণ তা কৃষিকে কেন্দ্র করে। এই কৃষিকে কেন্দ্র করেই বাঙালীর তাবৎ পূজাচারানুষ্ঠান।

কৃষি এখনও আমাদের জীবনধারণের প্রধানতম বিষয়। তাই আমরা এখনও বর্ষা শীত বসন্তাদি ঋতু নির্ভর। বলা বাহুল্য, সেদিনের মানবজীবনে ঋতুর আগমন-নির্গমন আর বর্তমানের ঋতুর বিবর্তনের উপর আমাদের নির্ভরতা একইভাবে থমকে থাকে নি। প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গতা সেদিনের

চেয়ে শিল্পনির্ভর মানুষের কিছু শিথিল হয়েছে, কিন্তু কৃষিজীবী মানুষের কাছে, ভূমিপ্রাণ মানুষের কাছে নিসর্গজগতের সবকিছুই এখনও পরম তাৎপর্যময়। প্রকৃতিকে নিয়ে, ঋতুর বিচিত্রমূর্তিকে নিয়ে সে এখনও মুখর। এখনও ঋতুতে-ঋতুতে চাষবাসের বিচিত্র অবস্থা। ঋতু উৎসব বা শস্য উৎসবই তাদের উৎসবের মূল। এই উৎসবে দেবদেবী মানেই কৃষির দেব দেবী, ক্ষেত্রের দেব দেবী, প্রজননের দেব দেবী। ঘরে বাইরে সর্বত্র এই প্রজনন, উর্বরতা সৃষ্টিকল্পে আর্তি ও জয়গান। নারীর বন্ধ্যাত্ব ঘুচাবার জন্য, জমিতে অধিক ফসল ফলাবার জন্য নানা অনুষ্ঠান, যাদু ও কর্মযজ্ঞ।

এই কৃষিনির্ভর সমাজ ও সভ্যতা একান্তই মাতৃতান্ত্রিক। বাঙলার বারো মাসে তেরো পার্বণও মাতৃতান্ত্রিক। কৃষিনির্ভর সমাজের প্রজনন শক্তি ও যাদুশক্তির প্রতি প্রীতি আকর্ষণের জন্য লোকসমাজ উদ্‌যাপন করে নানা ব্রত—পুণ্যপুকুর ব্রত, বসুন্ধরা ব্রত, ক্ষেত্র ব্রত, জয়মঙ্গল ব্রত, ক্ষেত্রপালের পূজা, কুলকুলটি ব্রত, মনসা ব্রত, ইতুকুমার ব্রত, নখছুটের ব্রত। এ সবই কৃষিগত জীবনের বিশিষ্ট পরিচায়ক, অর্থাৎ মানুষ নিতান্তই প্রকৃতির আশ্রিত। প্রকৃতিই মানবমনের বিচিত্র ধ্যান, জ্ঞান, ধারণা ও অনুভূতির উৎস। এর থেকেই বস্তুবিশ্ব ও জীববিশ্ব এক-প্রাণ, এক-মন, এক সূত্রে আবদ্ধ। লোক সমাজ একই ধরণের চিন্তা ভাবনায় ভাবিত।



কৃষকদের কৃষিকার্য, রাজরাজড়াদের যুদ্ধবিগ্রহ অথবা মৃগয়া বা শিকার, দেবতাদের সমরাভিযান সবই এই ঋতুকে কেন্দ্র করে চলেছে। বৈদিক যুগেও তাই ছিল তাদের। চাতুর্মাস্য বা ঋতুযজ্ঞ ছিল। বসন্ত সূচনায় বৈশ্বদেব যাগ, বর্ষার প্রারম্ভে বরুণ প্রবাস, শরতের শুরুতে শাকমেধযজ্ঞ—এ সবেরই মৌলিক প্রেরণা কৃষি, শস্যসম্পদ বা পশুসম্পদ লাভ। ঋতুযজ্ঞে বিশেষ বিশেষ ঋতুর ফসল দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়। শরতের ধান্য, বসন্তের যব, বর্ষার তৃণধান্য ব্রত-পূজায় ব্যবহারাদির মধ্যে কৃষিকর্মের প্রাধান্য স্বীকৃত। বৈদিকযুগ থেকে পৌরাণিকযুগ, পৌরাণিকযুগ থেকে মধ্যযুগ এবং মধ্যযুগ থেকে বর্তমানযুগেও এ সবের আকর্ষণ ও গতিবেগ সমান। কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে ঋতু উৎসবের সেই প্রাচীন তীব্রতা কিছুমাত্রই হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নি। তা আগেও যেমন ছিল, এখনও প্রায় তেমনি আছে। তুলনামূলকভাবে এগিয়ে গেছে শিল্পাগ্রসর সমাজ। বর্ষার মেঘ, শরতের সূর্য, হেমন্তের হিম, বসন্তের মলয় বাতাসের মধ্যে কৃষিজীবী সম্প্রদায় আত্মীয়তা অনুভব করে। বৃক্ষলতা-

পুষ্পপল্লবের বিকাশ স্ফূর্তির সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও মানসিক স্ফূর্তি ও উচ্ছ্বাসের প্রকাশ পায়। বৃক্ষলতাদির পুষ্পফলাদি প্রসবে তারা বিজয়-উৎসব অনুষ্ঠান করে, নৃত্যগীতে মেতে ওঠে। বিভিন্ন ঋতুর বিভিন্ন ফলমূলশস্যাদি বিভিন্ন কৃষি দেবতার পায়ে নৈবেদ্য দিয়ে কৃষি-সমাজ আনন্দযজ্ঞে মাতে। সুপ্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি কৃষিজীবী বাঙালীর এই আচরণ প্রায় একই ভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। প্রায় একই গতিতে প্রবাহিত আছে। অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে প্রবহমানা এই গতির সঙ্গে তাল রেখে আমাদের নানা আচারানুষ্ঠান পরিবর্তিত হয়েছে, বিস্তার লাভ করেছে, কালোপযোগী হয়েছে। কালোপ-যোগী উৎসব, অনুষ্ঠান ও জীবনের গতি নির্ধারণের জন্য তাই আমাদের আরও একটু পিছনের দিকে নজর দিতে হবে। অর্থাৎ সেই কাল-না-জানা দিন থেকে সৌর-ঋতুর এবম্বিধ আসা-যাওয়ার মধ্যে আমরা কি ভাবে পরিবর্তিত হয়ে এগিয়ে চলেছি বাঙলার নদনদীর গতিপ্রবাহের রূপরেখা উপলব্ধি এবং প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনা ছাড়া তা স্বচ্ছ করা অসম্ভব। কারণ, বাঙালী জীবন ও সংস্কৃতি এবং বাঙলা ভাষা নদীকে নিয়েই গড়ে উঠেছে। নদীই তার ভাঙাগড়ার খেলায় বাঙালীর জীবন ও সংস্কৃতির উপাদান লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে, এই নদনদীর কিনারে, গভীর বনজঙ্গলে অনুসন্ধান, খনন ও উৎখনন চালিয়ে পুরাবিদ প্রকাশ করছেন অতীত বাঙালীর জীবন ও সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত।



॥ ৩ ॥

ছোট বড় অসংখ্য নদনদী বাঙলার ইতিহাস রচনা করেছে, বাঙলার আকৃতি-প্রকৃতি নির্ণয় করেছে। পশ্চিমে গঙ্গা এবং পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও তাদের শাখানদী উপনদীসমূহ বাঙলার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছে, বিভিন্ন অংশের সীমানানির্দেশ করেছে।

রাজমহল পর্বতের পাদদেশ ধৌত করেই গঙ্গা বাঙলায় প্রবেশ করেছে। হিমালয়াঞ্চলিক নদীগুলো হিমালয়ের পাদশৈল থেকে বেরিয়ে উত্তর-পূর্বে ছুটে চলেছে, মহানন্দা ও মেচি এর ব্যতিক্রম। মহানন্দা, রায়দক, মেচি প্রভৃতি নদীসমূহ পার্বত্যঅংশে ও গঙ্গা সমতলভূমিতে অবিরাম একতীর ভেঙে অপরতীর ভরাট করে এগিয়ে চলেছে।

ঘরবাড়ী, বাগান, শস্যক্ষেত্রাদি নদীগর্ভে বিলীন করে দিয়ে, কখনও কখনও উর্বরভূমিতে বালি ও লবণ ছড়িয়ে দামোদর, তিস্তা প্রভৃতি নদী আপন খেয়ালে আপনাদের কাজ করে চলেছে।

বর্তমানে গঙ্গার অধিকাংশ জলরাশি পদ্মা হয়ে দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত এবং ভাগীরথী দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে কলকাতার ধার ঘেঁষে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। প্রাচীন গঙ্গা ত্রিবেণীর কাছে, ভাগীরথী, সরস্বতী ও যমুনায় বিভক্ত হয়ে সাগরে পড়ত। ভাগীরথী অপেক্ষা সরস্বতী নদী তখন বড় ছিল। সরস্বতী ক্ষীণ হওয়ায় তাম্রলিপ্ত ও সপ্তগ্রামের অবনতি হয়। ক্রমে ভাগীরথী সরস্বতীর স্থান অধিকার করায় হুগলীর ও কলকাতার সমৃদ্ধি ঘটে, কলকাতা বাঙলার প্রাণকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। উনিশ'শ সাতচল্লিশের বাঙলা বিভাগের পর পূর্ববাঙলার প্রাণকেন্দ্র হয় ঢাকা। গঙ্গা, যমুনা, পদ্মা, মেঘনা, ইছামতী ও করতোয়ায় পরিবেষ্টিত পূর্ববাঙলা, অধুনা বাঙলাদেশ।

সিকিমের হিমপ্রবাহ থেকে তিস্তা বেরিয়ে এসে কখনও স্ফীত হয়, কখনও মনোরম রূপ নেয়। দার্জিলিঙে তিস্তা-রঙ্গিতের মিলনস্থল, এ স্থান মনোমুগ্ধকর। তিস্তার জল কালো ও ঘোলাটে, রঙ্গিতের জল সবুজ ও নির্মল, উভয়ের মিলনে হয় রঙিন জলের ঢেউ খেলান শতরঞ্জি।

সিঞ্চল পাহাড়ের রাংনুও তিস্তার সংগে এসে মিশেছে। রাংনু উত্তর-

পশ্চিম কোণে জলপাইগুড়িতে প্রবেশের পর জলপাইগুড়িকে দক্ষিণে রেখে কোচবিহারের ছিটমহল, রংপুর পার হয়ে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রে পড়েছে। তিস্তা জলপাইগুড়িবাসী তথা উত্তরবঙ্গের ত্রাস। পশ্চিমবঙ্গের সমতলভূমির অধিবাসীদের ত্রাস দামোদর।

ছোটবড় আরও বহু নদনদী হিমালয় থেকে নেমে গেছে। দার্জিলিঙ পাহাড়ের মহানদী বা মহানন্দা পূর্ণিয়া ঘুরে মালদহের উত্তর-পশ্চিমে প্রবেশ করেছে। টাংগন জলপাইগুড়ি থেকে দিনাজপুরের মধ্য দিয়ে মহানন্দার সঙ্গে গিয়ে মিশেছে।

দামোদর এসেছে ছোটনাগপুরের পাহাড় থেকে। উৎস-মুখ থেকে দক্ষিণপূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে বর্ধমানে মোড় ঘুরে দামোদর হুগলী-হাওড়ার মধ্য দিয়ে হুগলী নদীতে জলরাশি ও কাদা ঢেলে দিচ্ছে। চোদ্দটি নদীর জল বহনকারী দামোদর মানুষের শাসন মানতে এখনও রাজী হয় নি। দামোদর ভ্যালি প্রোজেক্ট দামোদর-নির্ভর মানুষের জলস্ফীতিজনিত সমস্যার সমাধান করতে এখনও পারে নি।

দামোদরের মত অজয়ও এসেছে ছোটনাগপুর থেকে। অন্যান্য পাহাড়ী নদীর মতই এ-নদী বর্ষায় স্ফীত হয়, অন্যঋতুতে থাকে শীর্ণ। বর্ধমান ও বীরভূমের মধ্য দিয়ে এ-নদী কাটোয়ার উত্তরে ভাগীরথীতে পড়েছে। ময়ূরাক্ষী সাঁওতাল-পরগণা থেকে এসে বীরভূম হয়ে মুর্শিদাবাদে ঢুকেছে। বক্রেশ্বর ও কোপাই অজয় ও ময়ূরাক্ষীর জলনিকাশ করে। মুর্শিদাবাদে বক্রেশ্বর ময়ূরাক্ষীর সঙ্গে মিশেছে। দ্বারকা ও সাঁওতাল-পরগণা থেকে এসে মুর্শিদাবাদে পড়েছে। সকলেরই গন্তব্যস্থল ভাগীরথী। দ্বারকেশ্বর বাঁকুড়া থেকে হুগলীর আরামবাগে এসে শিলাবতী বা শিলাইর সঙ্গে মিশে রূপনারায়ণ হয়েছে। ছোটনাগপুর পাহাড় উত্থিত অপর নদী কংসাবতী বা কাঁসাই মেদিনীপুরে চলে এসেছে অত্যন্ত সর্পিল ও কুটিল গতিতে। এখান থেকে এ-নদী দুটি শাখায় ভাগ হয়ে একটি শাখা কেলেঘাই-এর সঙ্গে মিলে হলদি নাম নেয়। ছোটনাগপুরের অপর নদী সুবর্ণরেখা মেদিনীপুরের দক্ষিণ দিয়ে উড়িষ্যা হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগীরথী একসময় গঙ্গার সমুদ্রে যাবার পথ হিসাবে ব্যবহৃত হত। ক্রমে পলি ভরাট হয়ে গেলে গঙ্গার মূল প্রবাহ পূর্ব-দক্ষিণে বয়ে যায়। এখন গঙ্গার অল্পজলই ভাগীরথীতে প্রবেশ করে।

ছোটনাগপুরের নদীর জলে হুগলী পরিপুষ্ট। এই হুগলী নদীর তীরেই পশ্চিমবঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল।

গঙ্গা বা পদ্মা থেকে উৎপন্ন জলঙ্গী, ভৈরব ও মাথাভাঙ্গা মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ায় প্রবাহিত। জলঙ্গী কৃষ্ণনগরের নিকট পশ্চিম বাহিনী হয়ে ভাগীরথীতে পড়েছে। জলঙ্গী ও ভাগীরথীর সংযোগস্থল থেকে ভাগীরথীর সমুদ্র পর্যন্ত অংশেরই নাম হুগলী নদী। এ নদী চব্বিশপরগণার পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। এর পূর্ব সীমান্তে ইছামতী। মাথাভাঙার শাখা ইছামতীর দক্ষিণাভিমুখী অংশ কালিন্দী রায়মঙ্গল হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে

বর্ধমান জেলার ব্রাহ্মণী, বাবলা, খাড়ি ও বাঁকা; হুগলী জেলার বেহুলা, কুন্তী, মুক্তেশ্বরী ও সরস্বতী; বীরভূমের বাঁশলই; মেদিনীপুরের শিলাই ও রসুলপুর; চব্বিশপরগণার বিদ্যাধরী ও মাতলা; মালদহের পুনর্ভবা, পশ্চিম দিনাজপুরের আত্রাই এবং জলপাইগুড়ির করতোয়া পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য নদনদী। গঙ্গা, মেঘনা, পদ্মা, আড়ইয়ালখাঁ, ইছামতী প্রভৃতি বাঙলাদেশের নদনদী। কলকাতার নীচে গঙ্গা ও সরস্বতীর মধ্যে যে খাল কাটা হয় তাই এখন প্রধান গঙ্গা, কালীঘাটের নিকট আদি গঙ্গা এখন শুষ্ক, সেখান থেকে চিতাগ্নি নিভাবার জল পেতেও কষ্ট হয়।

এই গঙ্গা নাকি হিমালয় ও মেনকার প্রথম কন্যা। দেবগণের চেষ্টায় মহাদেবের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। গঙ্গাকে দেখতে না পেয়ে মেনকা তাকে জলে রূপান্তরিত হতে অভিশাপ দেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে গিয়ে ঢুকে পড়েন। কঠোর তপশ্চরণে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে ভগীরথ গঙ্গাকে ব্রহ্মার কমণ্ডলু থেকে নিয়ে আসেন পৃথিবীতে। মহাদেব গঙ্গার বেগ মস্তকে ধারণ করেন। মহাদেবের জটা থেকে বের হয়ে গঙ্গা তখন বিন্দুসাগরে গিয়ে পড়েন। সেখান থেকে সপ্তধারা—হ্লাদিনী, পাবনী, নলিনী, সীতা, সিন্ধু, কুচক্ষু ও ভাগীরথী প্রবাহিত হয়। যাবার পথে জহ্নু মুনির যজ্ঞভূমি প্লাবিত করলে জহ্নু মুনি গঙ্গাকে উদরস্থ করেন এবং পরে জানু বিদীর্ণ করে দিলে তিনি জাহ্নবী হয়ে বেরিয়ে আসেন। হিমালয় গাড়োয়ালের আট মাইল প্রবাহিত হবার পর ভাগীরথী গঙ্গোত্রীতে এসে মেশেন, সেখান থেকে জাহ্নবী ও অলকনন্দায় গিয়ে পড়েন। এই মিলনস্থান দেবপ্রয়াগ। এখান থেকে উঁচু হয়ে গঙ্গা হরিদ্বারে আসেন, হরিদ্বার থেকে বেঁকে দেরাদুন, সাহারাণপুর হয়ে রামগঙ্গার সঙ্গে মিশে আবার সেখান থেকে প্রয়াগে যমুনা ও সরস্বতীকে গ্রহণ করে বারানসী হয়ে রাজমহল ও গৌড়ে গিয়ে উপনীত হয়েছেন।

গত তিনচারশত বৎসরে পদ্মার প্রবাহপথের বহু পরিবর্তন হয়েছে। ফলে বহু সমৃদ্ধ জনপদ ও প্রাচীন কীর্তিকাহিনী বিনষ্ট হয়েছে। সম্ভবতঃ পূর্বে পদ্মা চলনবিলের মধ্য দিয়ে ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গায় প্রবাহিত হত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পদ্মার নিম্নভাগ ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার মধ্য দিয়ে চাঁদপুরের দক্ষিণে মেঘনায় গিয়ে মিশত।

পদ্মা থেকে মেঘনার অংশ কালিগঙ্গা। উনিশ শতকের মধ্যভাগে পদ্মার জলস্রোত কালিগঙ্গার খাত দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় রাজা রাজবল্লভের রাজধানী রাজনগর এবং চাঁদ-কেদার রায়ের প্রতিষ্ঠিত বহু নগরী ও মন্দির ধ্বংস করে। এই কারণে এই নদীর নাম কীর্তিনাশা।

রূপনারায়ণ তীরের তমলুকই প্রাচীন দমোলিপ্ত বা তাম্রলিপ্তি। রূপনারায়ণ তমলুকের দক্ষিণে হুগলীর সঙ্গে মিশেছে। দামোদর, রূপনারায়ণ ও হুগলী উৎপত্তি থেকে অদ্যাবধি তাদের গতিপথ নানাভাবে পরিবর্তিত করেছে। অনেকে মনে করেন, তাম্রলিপ্তি একদা সরস্বতী, রূপনারায়ণ ও দামোদরের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল। দামোদরের সঙ্গে লিপ্ত থাকার দরুণই নাকি বন্দরের নাম ছিল দমোলিপ্ত। দশকুমারচরিতে বলা হয়েছে যে মগধরাজের মন্ত্রিপুত্র কুমার মিত্রগুপ্ত সুহ্মদেশ অন্তর্গত দমোলিপ্তের রাজকুমারী কুন্দকবতীকে বিয়ে করতে উৎসাহ প্রকাশ করেন। এ বিবাহে রাজী হন না রাজকুমার ভীমধণ্বা। তিনি চক্রান্ত করে মিত্রগুপ্তকে বন্দী করেন এবং হাত-পা বেঁধে সমুদ্রে ফেলে দেন। মিত্রগুপ্তকে যবন বাণিজ্য-জাহাজ উদ্ধার করে। একদল জলদস্যু ঐ জাহাজ আক্রমণ করে এবং মিত্রগুপ্তকে উদ্ধার করে। উদ্ধারকর্তা রামেসুরের পক্ষে যুদ্ধ করে জলদস্যুগণকে হারিয়ে দিলে দস্যুদলপতি ভীমধণ্বার সাক্ষাৎ পান, এবং মিত্রগুপ্তের বীরত্বের পুরস্কার হিসাবে অবশেষে তিনি কুন্দকবতীকে বিবাহ করতে সমর্থ হন।

দামোদর বর্ধমানের দক্ষিণে দক্ষিণবাহী হয়ে নানাদিকে প্রবাহ পথের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বর্ধমানের দক্ষিণে দক্ষিণবাহী দামোদরের সঙ্গে সরস্বতীর সংযোগ, উত্তর-পূর্ববাহী আম্বানা কালনার কাছে ভাগীরথীতে পড়েছে। ক্ষেমানন্দ (কেতক দাস) তাঁর মনসামঙ্গলে এই নদীকে বাঁকা দামোদর বলেছেন। সপ্তগ্রামের নিকটেই সরস্বতীর উৎপত্তি। কিন্তু সপ্তগ্রাম থেকে সরস্বতী পশ্চিমবাহিনী হয়ে দামোদর প্রবাহের সঙ্গে মিশেছে বাঁকা দামোদরের সংগমের নিকটে। ব্রাহ্মণাভিশাপে দামোদরের একটি শাখা মজে গিয়ে কানানদী বা কানাদামোদর নামে ভূষিত

হয়। কানাদামোদরের তীরস্থ হাওড়া জগৎবল্লভপুরের তেলহাটীর মাটি খুঁড়ে সম্প্রতি অনেক পুরা-সামগ্রী পাওয়া গেছে।

গঙ্গার বর্তমান প্রবাহ থেকে প্রায় কুড়ি মাইল পূর্বে চব্বিশ পরগণার দেগঙ্গার (দেবগঙ্গা), পার্শ্ববর্তী গ্রামের নাম দেবালয়, বর্তমান বেড়াচাঁপা। বিদ্যাধরী নদীর শাখা এখান দিয়ে প্রবাহিত। এখানে চন্দ্রকেতুগড় খনন করার ফলে বহু মূল্যবান্ প্রত্ন-সামগ্রী পাওয়া গেছে। কেউ কেউ দেবগঙ্গাকে গঙ্গাবন্দর ও চন্দ্রকেতুগড়কে রাজবাড়ীর অবস্থান বলে মনে করেন।

পশ্চিম মেদিনীপুরের হিজলী থেকে চব্বিশ পরগণার রায়মঙ্গল নদীর শাখা হাঁড়িভাঙ্গার মোহনা পর্যন্ত সাগরদ্বীপসহ অসংখ্য খাড়ি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। মেদিনীপুরের সমুদ্রতীরে দীঘায় স্বাস্থ্যনিবাস ও হলদিয়া আধুনিক বন্দরে পরিণত করার চেষ্টা হচ্ছে। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা দ্বারা বীরভূমের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র সিউড়ীর নিকট তিলপাড়ার ব্যারেজ নির্মিত হয়েছে। দামোদর পরিকল্পনা অনুযায়ী তিলাইয়া, কোনার, মাইথন ও পাঞ্চেতে চারটি জলাধার নির্মিত হয়েছে। কোনার ছাড়া আর তিনটিতে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং বোকারো, দুর্গাপুর, চন্দ্রপুর ও ব্যাণ্ডেল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র। ভাগীরথীর গতিপথে পলি জমে জলরাশি পূবদিকে বয়ে পদ্মায় গিয়ে মিশেছে। এখানে হয়েছে পদ্মা প্রবল। এই পদ্মাকে অনেকে বড়গঙ্গা বলে। বড়গঙ্গা বা পদ্মা উপকূলে মালদহ, রাজশাহী ও পাবনা, দক্ষিণকূলে মুর্শিদাবাদ নদীয়া ও ফরিদপুরের উত্তর-পূর্বকোণে গোয়ালন্দের নিকট যমুনার সঙ্গে মিশেছে। সেখানে থেকে মিলিত নদী ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার সীমা নির্ধারণ করে এগিয়ে গিয়ে ঢাকা জেলার দক্ষিণ-পূর্ব থেকে নাগাল্যাণ্ড ও মণিপুরের পর্বতাগত সূর্মা ও বরাক নদীর মিলনে গঠিত মেঘনায় পড়েছে। মেঘনা বরিশাল জেলার পূর্বে ও নোয়াখালি জেলার পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এ নদী বাঙলা দেশের উল্লেখযোগ্য নদীসমূহের একটি।

ব্রহ্মপুত্র পূর্বে গারোপাহাড়ের পাশ দিয়ে ময়মনসিংহ হয়ে ঢাকার ধলেশ্বরীতে নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী নাঙ্গলবন্দে পড়েছে। এখানের প্রাচীন ব্রহ্মপুত্রের শুষ্কপ্রায় খাতে অষ্টমীস্নানের জন্য বহু ধর্মার্থী সমবেত হয় প্রতি বৎসর। ব্রহ্মপুত্রের যে জলপ্রবাহ গোয়ালন্দের নিকট পদ্মায় মিশেছে তা যমুনা। যমুনা পূর্বে প্রবলানদী ছিল। ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী লাক্ষ্যা ময়মনসিংহের বানা নদীকে গ্রহণ করে ঢাকাকে পশ্চিমে রেখে মুন্সীগঞ্জের নিকট যমুনাগত ধলেশ্বরীর সঙ্গে মিলে মেঘনায় পড়ে দক্ষিণে এগিয়ে গিয়ে পদ্মায় পড়েছে,

এই ধলেশ্বরী ও পদ্মার তীরে বিক্রমপুর (রামপাল) অবস্থিত। ঢাকা শহর বুড়ীগঙ্গার বামে অবস্থিত, এখানেই সুবর্ণগ্রামের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান। বানা ও সোমেশ্বরী ময়মনসিংহের উল্লেখযোগ্য নদী। সুর্মি ও কুশিয়ারা নদী দুটি শ্রীহট্ট জেলার। ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য নদী ডাকাতিয়া, গোমতী ও খোয়াই। চট্টগ্রামের নদী কর্ণফুলী, সঙ্গু ও মাতামুহরি প্রভৃতি।

তিস্তা তিনটি স্রোতে প্রবাহিত হয়ে যথাক্রমে নাম নেয় করতোয়া, পুনর্ভবা ও আত্রেয়ী। পূর্বে আত্রেয়ী চলনবিলের মধ্য দিয়ে করতোয়ায় গিয়ে পড়ত। করতোয়া এখন শুষ্কপ্রায়। এককালে এটা খুব বড় নদী ছিল। করতোয়ার জল পবিত্র বলে গণ্য হয়। অমরকোষে করতোয়ার অপর নাম উল্লিখিত হয়েছে সদানীরা বলে। পর্বতবাহী এ নদী জলপাইগুড়ি, রংপুর, দিনাজপুর হয়ে বগুড়ার হলদিয়া নদীতে মিলে ফুলজোড় নাম নিয়েছে। ফুলজোড় চাঁদাইকোনার নিকট পাবনায় প্রবেশ করে, এবং সেখান থেকে আত্রাই নদীর সঙ্গে মিশে গোয়ালন্দের নিকট পদ্মায় পড়েছে। ১৭৮৭ সনের জলপ্লাবনে ত্রিস্রোতার মূলনদীর পূর্বখাত পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান তিস্তার সৃষ্টি হয়েছে এবং করতোয়া, পুনর্ভবা ও আত্রেয়ী প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। কুশীনদী এককালে সমস্ত উত্তরবঙ্গের মধ্যে প্রবাহিত হত, এখন পূর্ণিয়ার মধ্য দিয়ে রাজমহলের উপরে গঙ্গায় গিয়ে মিশেছে। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নদীসমূহ মহানন্দা, কালিন্দী, বলভী, গড়ই, কুমারী ও পদ্মা। তাছাড়া জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের জলঢাকা-শিঙিমারী, ধরলা, তোর্শানদী, ঘর্ঘরিয়া, রায়দক, কালজানি ও গদাধর উল্লেখযোগ্য।

এই নরম ও নমনীয় ভূমি নিয়ে বাঙলার নদনদীগুলো ঐতিহাসিক কালে কত খেলাই না খেলেছে। নদীর উদ্দামপ্রাণলীলায় কতবার যে সে পুরাতনখাত ছেড়ে নতুনখাতে, আবার নতুনখাত ছেড়ে নতুনতর খাতে বয়েছে, কতবার যে বর্ষা ও বন্যার বিপুল জলধারাকে দুরন্তঅশ্বের মত, মত্তঐরাবতের মত ছুটিয়েছে, তার পরিমাণ করা দুঃসাধ্য। নদীর সহসা খাত পরিবর্তনে কত সুরম্যনগর, কত বাজারবন্দর, কত বৃক্ষশ্যামল গ্রাম, শস্যশ্যামল প্রান্তর, কত মঠ ও মন্দির ধ্বংস হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ধ্বংস করার পরেই নদী আবার নতুন করে সৃষ্টি করেছে। একই সঙ্গে সে করছে সংহার ও সৃষ্টি। কত দেশখণ্ডের চেহারা ও সুখসমৃদ্ধি সে একেবারে বদলে দিয়েছে তার পূর্ণ হিসাব এতদিনেও ইতিহাস করে উঠতে পারে নি, কবে করে উঠতে পারবে তা-ও জানি না। তবুও নদী তার কাজ

করে চলেছে। ভেঙেগড়ে সে এগিয়ে যাচ্ছে। কে তার ভাঙাগড়ার হিসাব নিচ্ছে, কে নিচ্ছে না, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তার।



বাঙলার নদনদীর তীরে তীরে মানুষ-সৃষ্ট সভ্যতার জয়যাত্রা। মানুষের বসতি। কৃষির পত্তন, গ্রাম, নগর, বাজার, বন্দর, সম্পদ, সমৃদ্ধি, শিল্প, বাণিজ্য, মেলা, সাহিত্য, ধর্মকর্ম সবকিছুরই বিকাশ হয়েছে নদনদীকে ঘিরে। বাঙলার শস্যসম্পদ একান্তই বাঙলার নদীর দান। উচ্ছলিত বন্যার তাণ্ডবে মানুষের ঘরবাড়ী ভেঙে যায়, মানুষ গৃহহীন, সম্পদহীন, পশুহীন, বৃক্ষহীন হয়ে পড়ে। আবার এই বন্যার জন্যই তার মাঠে সোনার ফসল ফলে, গাছে ফুল ও ফল ধরে, ধরিত্রী শ্যামল ও কোমল হয়। বাঙালী তাই নদীকে ভয় করে, ভক্তি করে, পূজা করে, ভালবাসে। রাক্ষসী কীর্তিনাশা বলে সে যেমন নদীকে গাল দেয়, তেমনি ভালবেসে ইচ্ছামতী, ময়ূরাক্ষী, কপোতাক্ষ, চূর্ণী, রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বর, সুবর্ণরেখা, কংসাবতী, মধুমতী, কৌশিকী, দামোদর, অজয়, করতোয়া, ত্রিস্রোতা, মহানন্দা, মেঘনা, যমুনা, পদ্মা, ধলেশ্বরী প্রভৃতি সুন্দর ও ব্যঞ্জনাময় নাম রাখে নদীর। বাঙলার এই নদনদী বাঙলাকে শাসন করছে। বাঙলার নদনদীর গতি অনুযায়ী ভূমিখণ্ড বিভক্ত হয়েছে। মেঘনা ঢাকাবিভাগকে চট্টগ্রামবিভাগ থেকে এবং পূর্বে দাওকোবা বা যমুনা, দক্ষিণে পদ্মা ও পশ্চিমে গঙ্গা বা ভাগীরথী ও মহানন্দা রাজশাহীবিভাগকে একদিকে ঢাকাবিভাগ অন্যদিকে প্রেসিডেন্সীবিভাগ থেকে পৃথক করেছিল। তেমনি পূর্ব দিকে গঙ্গা, পদ্মা ও পদ্মার শাখা-নদী মধুমতী প্রেসিডেন্সীবিভাগকে ঢাকা থেকে এবং ভাগীরথী বর্ধমান বিভাগকে প্রেসিডেন্সীবিভাগ থেকে পৃথক করেছিল। এই নদনদীকে ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে বাঙলার উৎসব, অনুষ্ঠান ও মেলা। বাঙালীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বাঙলার ব্রত-পার্বণ, বাঙালীর ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় কৃত্যাদি। জলই হচ্ছে আমাদের আসল সম্পদ। জল-সঞ্চারী বাঙালীর প্রধান খাদ্য জলে হয়, জলে বাঁচে। বাঙলার যে অঞ্চল বর্ষারম্ভে ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, পদ্মার প্লাবনে নিমজ্জিত হয়, সেখানে কয়েকমাস পরেই দিগন্তবিস্তৃত আমনধান

কৃষক বণিকের মন হরণ করে। নদীর জল সীমানা মানে না, এই জলই কৃষি সম্পদের কারণ। বাঙালীর রক্ত ও মাংস, কৃষি ও সম্পদ জলের দান। বাঙালী পারদর্শিতা দেখিয়েছে জলে, শস্যরোপণে, নৌ-বাণিজ্যে ও জলযুদ্ধে। জলেই বাঙালী সেনাপতি মানসিংহ মিরজুমলাকে আক্রমণ করেছিল। ইংরেজ শাসনেরও গোড়াপত্তন হয়েছিল রণতরী সাহায্যে সাগরদ্বীপ থেকে ব্যাণ্ডেল অবধি হুগলীনদীর অধিকারে, পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে নয়। বাঙলার নানা বন্দর যুগেযুগে সাতসাগরের ধনে ও কৃষ্টিতে বাঙালীর সম্পদবৃদ্ধি করেছে। বহু বন্দর ভঙ্গুর হলেও নদী ও সমুদ্র বাঙলাকে শতাব্দীর পর শতাব্দী বিভিন্ন জাতির কৃষ্টি ও রক্তের সংমিশ্রণের সুযোগ করে দিয়েছে।

বাঙলার ভাগ্যলক্ষ্মী নদীপথবাহিনী। তিনি কখনও রূপনারায়ণ, ভৈরব ও সরস্বতী, কখনও ভাগীরথী, আত্রেয়ী ও করতোয়ার বিশাল বক্ষে ভাসমান বিপণী সজ্জিত করে বিদেশী বণিকের উপঢৌকন গ্রহণ করেছেন। কখনও বা হুগলী, পদ্মা ও মেঘনার বক্ষে রণতরী সাজিয়ে রক্তাক্তিত নদীজলে তাণ্ডবনৃত্যের অভিনয় করেছেন। বাঙলার ভাগ্যলক্ষ্মী চিরকাল গাঙ্গেয়সমাজের কৃত্রিম বিধি-নিষেধ অবজ্ঞা করেছেন, কখনও আদিমধর্ম থেকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম, কখনও ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরিবর্তে জৈন, বৌদ্ধধর্ম, কখনও বীরাচার বা সহজিয়া সাধনের দীক্ষা দিয়েছেন শিক্ষা দিয়েছেন অপূর্ব সমদর্শী পতিতপাবন নীতির। বাঙলার সমাজ ও কৃষ্টির মৃত্যু সেদিন যেদিন তার নদনদীতে কৃষ্ণলহরী আর খেলবে না, শস্য ও বনভূমিতে আষাঢ়ের কৃষ্ণ মেঘের ছায়া আর পড়বে না, যখন বাঙলার একই আকাশেবাতাসে পালিত কৃষ্ণবর্ণ জাতি ও সম্প্রদায় দেশ ও ধর্ম ভুলে পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা ও অবমাননা করবে, সামাজিক আচার-ব্যবহারে পরস্পরকে হিংসা ও আঘাত করবে। প্রথমে ষোড়শ শতাব্দীতে কুশীনদীর পশ্চিমপ্রবাহ ও পদ্মার পূর্ব অভিযান আরম্ভ হয়। তারপর ১৭৭০ সালে উপর্যুপরি কয়েকবার বন্যার পর হয় দামোদরের দক্ষিণ প্রবাহ। তখন থেকে শুরু হয় ভাগীরথী ভৈরব ও নবগঙ্গার অধোগতি। এক শতাব্দীর মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ ও মধ্যবঙ্গ ভাগীরথীর শাখাপ্রশাখা ও নদীয়ার নদীগুলোর অধোগতির জন্য ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। নানাস্থান জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে যায়। ১৯০৭ সনের পূর্ব পর্যন্ত এ রকম আশঙ্কা করা হচ্ছিল যে জলা জঙ্গল ও মশক প্রতাপাদিত্য ও ঈশা খাঁ, সীতারাম ও ভারতচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্ন একেবারে বিলুপ্ত করে দেবে। বঙ্গবিভাগজনিত জনপ্রবাহে ম্যালেরিয়া পশ্চিমবাঙলা থেকে নির্বাসিত হয়েছে। পূর্ববঙ্গেও এখন ম্যালেরিয়া নেই। নদীর জলরাশিকেও

আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবহার করার জন্যও চলছে নানাবিধ প্রকল্প বাঁধ প্রভৃতি প্রচেষ্টা। দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে জলবিভাগ নিয়েও দেখা দিল সমস্যা। গঙ্গানদী এখন যমুনার প্রবাহ বৃদ্ধির সঙ্গে পূর্ব অঞ্চলে আপনাকে দ্রুত পরিবর্তন করে চলেছে। পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের নদীপ্রবাহের অধোগতি -হেতু পদ্মা নতুন করে পূর্ববঙ্গকে ভেঙে গড়ে তুলতে চাইছে। যেমন অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে কীর্তিনাশা ও নয়া-ভাঙ্গিনীর উদ্ভব হয়েছিল তেমনি আবার নতুন খাত ও প্রবাহ এই শতাব্দীতে কত গ্রাম ও শহর গ্রাস করে চলেছে। গত কয়েক বছরের প্রবল বন্যায় মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা আমরা জানি। পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের জলপথগুলোর বিরোধ পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙলাদেশে বন্যাপ্লাবনের আশঙ্কা বাড়িয়ে দিয়েছে। সারা বাঙলায় বড় নদী তার শাখা প্রশাখা ও জলনিকাশের পথসমূহ যদি সাম্য রক্ষা করতে না পারে এবং কেন্দ্রচ্যুত হয় তবে তার ফলস্বরূপই কোথাও জমির উর্বরতা-হানি হবে, কোথাও হবে কৃষির অবনতি, কোথাও দুর্ভিক্ষ ও স্বাস্থ্যনাশ, আর কোথাও কৃষি-সমৃদ্ধি, নদীপ্লাবন বা ভাঙন। মরানদীর অঞ্চলে কৃষি, লোকসংখ্যা ও স্বাস্থ্যের দ্রুত অধোগতি, এবং ভরানদী অঞ্চলে সম্পদবৃদ্ধি। বাঙলার নদী দিয়েছে কৃষিক্ষেত্রে অপরিসীম শস্যদায়িনী শক্তি ; সে শক্তি প্রতিবর্ষার নতুন প্লাবনে নতুন করে ধরিত্রীর সন্তানদের পালনে ব্রতী হয়। বাঙলার এই নদীই বাঙলাকে বাণিজ্যের সম্পদ দিয়েছে, বাঙালীকে দিয়েছে সাহস ও গতিশীলতা। বাঙলার সমাজ-বিন্যাসে ধীবর, কৃষক, শিল্পী ও বণিকের মধ্যে তেমন ব্যবধান নেই যেমন আছে উত্তর-ভারতের গ্রামে, বাঙলার জলস্থলের নিত্যরূপ পরিবর্তন ও অধিবাসীগণের নদীপথে নিরন্তর প্রসারণকে আশ্রয় করে বাঙলায় চিরকাল জেগেছে গোষ্ঠীভাব অপেক্ষা ব্যক্তিসর্বস্বতা, নিয়মানুবর্তিতা অপেক্ষা নিত্যনতুন আচার আচরণের প্রবর্তন। এই নদীর ভাঙন ও গতিপরিবর্তন বাঙালীর স্থান পরিবর্তন ও আচার অনুষ্ঠানের সম্মিলনের কারণ হয়েছে এবং ছোট ও বড় নদী, খাল বিল পুকুর ও দিগন্তবিস্তৃত প্লাবন বাঙলার রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এই নদীর বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেছে বাঙালীর পরাজয়। বিপর্যয়ের হাত থেকে উদ্ধার পেতে বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমান তাই নদীকে ভালবাসে, ভয় করে। নদীর তুষ্টির জন্য পূজা ও আরাধনা করে।

এই নদনদীকে কেন্দ্র করে কিভাবে বাঙালী নদীপূজা, উৎসব ও মেলায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখে তার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া যেতে পারে নীচের নক্সাটিতে। বলাবাহুল্য, এই তালিকা অসম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করার কোন সার্থকতাও নেই এখানে।

নদীমেলা ও উৎসব সম্পর্কিত নক্সা—১

ক্রমিক নং	পূজা উৎসব ও মেলা	অঞ্চল: জেলা	অঞ্চল: থানা	অঞ্চল: গ্রাম/স্থান	মাস	নদী	
১	গঙ্গাপূজা	২৪ পরগণা	মগরাহাট	বানবেড়ি	বৈশাখ	গঙ্গা	মেলা
২	গঙ্গাপূজা	২৪ পরগণা	মগরাহাট	বনসুন্দরিয়া	,,	গঙ্গা	,,
৩	গন্ধেশ্বরী	কলকাতা	কলকাতা	কলকাতা	,,	গঙ্গা	*গন্ধবণিক সমাজের সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান
৪	গন্ধেশ্বরী*	হুগলী	বংশবাটি	বংশবাটি	,,	,,	
৫	দশহরা	মুর্শিদাবাদ	বেলডাঙ্গা	কুমারপুর	জ্যৈষ্ঠ	ভাগীরথী	
৬	দশহরা	নদীয়া	কৃষ্ণনগর	আনন্দবাস	,,	খরোনদী	মেলা
৭	দশহরা	মালদহ	ইংরেজবাজার	সাতুল্ল পুর	,,	মহানন্দা	
৮	গঙ্গাপূজা	মুর্শিদাবাদ	ভগবানগোলা	গোপীরামপুর	,,	ভাগীরথী	
৯	,,	মুর্শিদাবাদ	জিয়াগঞ্জ	আজিমগঞ্জ	,,	বাঁশসাই	মেলা
১০	,,	মুর্শিদাবাদ	বেলডাঙ্গা	রামনগর	,,	ব্রাহ্মণী	
১১	,,	মুর্শিদাবাদ	বহরমপুর	বহরমপুর	,,	জলঙ্গী	
১২	,, পূজা	হাওড়া	শ্যামপুর	শিবগঞ্জ	,,	হুগলী	†মধ্যযুগের বণিক সম্প্রদায়ের উৎসব বলে অনুমিত।
১৩	স্নানযাত্রা	মুর্শিদাবাদ	কালিগঞ্জ	পলাশী	,,	,,	
১৪	স্নানযাত্রা	চব্বিশপরগণা	ফলতা	জগন্নাথপুর	,,	ইছামতী	
১৫	স্নানযাত্রা	নদীয়া	চাকদহ	চাকদহ	,,	চুর্ণীনদী	ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের উদ্যোক্তা মুসলমান সম্প্রদায়।
১৬	স্নানযাত্রা	হাওড়া	উলুবেড়িয়া	উলুবেড়িয়া	,,	হুগলী	
১৭	স্নানযাত্রা	হুগলী	ধনেখালি	ধনেখালি	,,	গঙ্গা	
১৮	গঙ্গাপূজা	মুর্শিদাবাদ	ভগবানগোলা	গিরিধারীপুর	আষাঢ়	ভৈরব	‡মহালয়ার পিতৃ-তর্পণ
১৯	গঙ্গাদিত্যপূজা	মুর্শিদাবাদ	নবগ্রাম	অমরকুণ্ডু	শ্রাবণ	জলঙ্গী	
২০	বেরা উৎসব†	মুর্শিদাবাদ	শহর	শহর	ভাদ্র	ভাগীরথী	
২১	ধর্ম সংক্রান্তি	মেদিনীপুর	দাসপুর	দাসপুর	,,	রূপনারায়ণ	
২২	ধারাস্নান‡	সারাবাংলা	সারাবাংলা	সারাবাংলা	আশ্বিন	যে কোন নদী	
২৩	চৈতন্য আগামস্নান	২৪ পরগণা	খড়দহ	খড়দহ	কার্তিক	গঙ্গা	
২৪	তিস্তামাই পূজা	দার্জিলিং	শহর	শহর	পৌষ	ত্রিস্রোতা	মেলা

স্মরণীয়, অগ্রহায়ণ মাসে কোন স্নানমেলা বা নদীপূজার সন্ধান পাওয়া যায় নি। ওপার বাঙলার নদীপূজা উৎসব ও মেলা ইত্যাদির কথাও এই নকশায় নেই। স্মৃতিনির্ভর পূজা উৎসব ও মেলা ইত্যাদিকে এই তালিকায় স্থান দেওয়া হয় নি দুটি কারণে। প্রথম, শৈশবের স্মৃতি প্রবঞ্চনা করে এই।

ক্রমিক নং	পূজা উৎসব ও মেলা	অঞ্চল: জেলা	অঞ্চল: থানা	অঞ্চল: গ্রাম/স্থান	মাস	নদী	
২৫	গঙ্গাপূজা	২৪ পরগণা	বজবজ	রায়পুর	পৌষ	ভাগীরথী	
২৬	,,	,,	কাকদ্বীপ	মণিপুর	,,	সাগরসঙ্গম	
২৭	,,	,,	সাগর	ঈশ্বরীপুর	,,	গঙ্গা	মেলা
২৮	,,	মুর্শিদাবাদ	বেলডাঙ্গা	বেলডাঙ্গা	,,	ভাগীরথী	
২৯	গঙ্গাসাগর	২৪ পরগণা	কাকদ্বীপ	গঙ্গাসাগর	,,	ত্রিবেণীসংগম	সাগরমেলা
৩০	মকরমেলা	,,	নামখানা	অমরাবতী	,,	বিদ্যাধরী	
৩১	মাঘী স্নান	দার্জিলিং	ফাঁসিদেওয়া	ফাঁসিদেওয়া	মাঘ	মেচি	
৩২	,,	২৪ পরগণা	বনগাঁ	কেউটিপাড়া	,,	ইছামতী	
৩৩	মাঘী পূর্ণিমা	,,	স্বরূপনগর	কপিলেশ্বরপুর	,,	যমুনা	১৫ দিন মেলা
৩৪	,,	মালদহ	বাতুয়া	জঙ্গালীটোলা	,,	মহানন্দা	
৩৫	,,	মেদিনীপুর	চন্দ্রকোণা	চন্দ্রকোণা	,,	হলদি	
৩৬	,,	,,	দাসপুর	দাসপুর	,,	,,	
৩৭	গঙ্গাপূজা	হাওড়া	শ্যামপুর	সীতাপুর	,,	ইছামতী	প্রাচীন মেলা
৩৮	আশ্বিণ স্নান	২৪ পরগণা	বনগাঁ	মড়িঘাটা		,,	
৩৯	বারুণী স্নান	,,	গাইঘাটা	ঠাকুরনগর	ফাল্গুন	গঙ্গা	
৪০	কমলেকামিনী	মুর্শিদাবাদ	সাগরদীঘি	মোড়গ্রাম	,,	ভাগীরথী	
৪১	স্নানযাত্রা	প. দিনাজপুর	কুশমণ্ডি	সরলা	চৈত্র	আত্রাই	
৪২	বারুণী স্নান	কুচবিহার	সিতাই	দেওঘাটা	,,	জলঢাকা	
৪৩	,,	হুগলী	খানাকুল	শ্যামমাসিবজার	,,	হুগলী	মেলা
৪৪	,,	নদীয়া	করিমপুর	ফুলখালি	,,	চুর্ণী	
৪৫	,,	২৪ পরগণা	বসিরহাট	ধোকড়া	,,	গঙ্গা	
৪৬	,,	,,	হাসনাবাদ	বেলতলা	,,	,,	
৪৭	বারুণী স্নান	প. দিনাজপুর	বালুরঘাট	ডাঙ্গী	,,	আত্রাই	মেলা
৪৮	,,	জলপাইগুড়ি	ঢোলকগ্রাম	ঢোলকগ্রাম	,,	জলঢাকা	
৪৯	অশোকাষ্টমী স্নান	কুচবিহার	মাথাভাঙ্গা	বোচাগাড়ি	,,	তিস্তা	
৫০	অশোকাষ্টমী	জলপাইগুড়ি	আলিপুরদুয়ার	আলিপুরদুয়ার	,,	তিস্তা, তোর্সা	
[illegible]	[illegible] মেলা	কুচবিহার	দিনহাটা	দিনহাটা	,,	তিস্তা ,,	মেলা

ভয়ে। এবং দ্বিতীয়, গত বাইশ-তেইশ বছরের মধ্যে ওপার বাঙলার উৎসব মেলা ও পার্বণ উদযাপনকারী হিন্দুদের অনেকেই রাষ্ট্রীয় কারণে এপার বাঙলা এবং ভারতের অন্যত্র চলে এসেছেন ছিন্নমূল হয়ে। তাদের চলে আসার পর আচরণীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদির কি হাল হয়েছে সে সম্পর্কে আমাদের বাস্তব বা প্রত্যক্ষ কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় অনুমান-নির্ভর তথ্য পরিহার করাটাকে যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে।

নদনদীকে বাঙালী ধনজনকল্যাণদায়িনীরূপে কল্পনা করেছে এবং যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে তার পূজা ও উৎসব করে আসছে। আদিম বঙ্গ সমাজে নদী প্রাথমিক দেবতাদের মধ্যে অন্যতম ছিল। আর্যীকরণের যুগেও বিশেষ বিশেষ নদনদীকে বিশেষ বিশেষ মহিমার আধার বলা হয়েছে। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, করতোয়া, মহানন্দা প্রভৃতি নদনদী যুগযুগ ধরে বঙ্গ জনপদে পূজিত হয়ে আসছেন। কৃষি এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রথম দেবতারূপে যিনি সামনে আসেন তিনি চিরহিমের আলয়াগত গতিবেগ ও পরিবর্তনের মূর্ত প্রতীক দুর্বার জলধারা। বাঙলার লোকজীবনে আনন্দ ও অশ্রুর ফোয়ারা ছোটাতে যাঁর জুড়ি নেই।

বৈদিক যুগের দেবতাদের মধ্যে বরুণ প্রাকৃতিক শক্তির দেবতারূপে মর্যাদা সম্পন্ন। তাঁর শক্তিতে সূর্য ও পৃথিবী স্থির আছে। তাঁরই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে চন্দ্রতারকাদি আপন-আপন কক্ষপথে আবর্তন করে। ঋত্বিক নদনদী প্রবাহিত করা-বা-না-করা তাঁরই ইচ্ছাধীন। বেদাদি গ্রন্থে বরুণদেবকে বড় করে দেখান হলেও আমাদের কর্মকাণ্ডে ও শিল্পাচরণে তাঁর সহচরীদ্বয় গঙ্গা-যমুনাই নদী হিসাবে বন্দিত হয়েছেন। অম্বুপতির হংসরথ গঙ্গা-যমুনা ও তাঁদের বাহন মকরকুম্ভ শিল্প সৃষ্টির অপূর্ব নিদর্শন। কালক্রমে দেব হিসাবে তাঁর মর্যাদাহানি ঘটে, বরুণদেব তখন মূল মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে দিক্‌পাল হন। সহচরী গঙ্গা-যমুনা হন দ্বারপালিকা। গঙ্গা-যমুনার অম্বুপতির সহচরীত্ব থেকে দ্বারপালিকায় রূপান্তরিত হবার মধ্যে প্রাকৃতিক শক্তির উপর মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বরুণাদিদেবের প্রতি শ্রদ্ধার অসদ্ভাব সুস্পষ্ট। ক্রমে বরুণদেব ওখান থেকেও চলে গেলেন। তখন দ্বারপালিকার কাজ করে চললেন গঙ্গা ও যমুনা। তাঁদের হাতের চামর বরুণদেবের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, অপদেবতার অপসারণ, প্রবেশ-পথের শোভাবর্ধন, বাসগৃহ বা রাজপ্রাসাদ থেকে দেবায়তনের পার্থক্য বোঝানোর

জন্য দ্বারপাল বা দ্বারপালিকা আজও আমাদের শিল্পচিন্তায় প্রশ্রয় পায়। আজও অনেক মন্দিরে তাদের অবস্থান দৃষ্ট হয়।

গুপ্তযুগের দেবায়তনগুলো শিল্পশ্রীতে অতুলনীয়। বিকৃতবদন, খর্বট, স্ফীতোদর, হাস্যলাস্যময়ী, নৃত্যরতা, সঙ্গীতমুখরা, বিদ্যাধরী ও অপ্সরা মূর্তির কাছাকাছি গর্ভগৃহের প্রবেশ দ্বারের দুই পাশের দ্বারপালিকাবেশে দ্বিভঙ্গিম-ঠামে গঙ্গা মকর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—এ দৃশ্য আজও বিরল নয়। এর প্রাচীন নিদর্শন উদ্ধার করা হয়েছে রাজশাহী থেকে বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি কর্তৃক। এরূপ একটি মূর্তি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ-সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে।

দ্বারদেবতাদের মূর্তি দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক এই তিন দিক থেকে দেখা যেতে পারে। আধ্যাত্মিক দ্বারপালিকা জলধারার প্রতীক। গঙ্গা-যমুনার মূর্তির সুসমঞ্জস দেহভঙ্গি যুগ যুগ ধরে শিল্পরসিককে আন্দোলিত করে আসছে। শিবমন্দিরের নন্দীমহাকাল হলেন আসল দ্বারপাল। তবু গঙ্গা-যমুনাকে সেইখানেই স্থান করে নিতে হয়েছে, কারণ বিষ্ণু-মন্দিরের জয়া-বিজয়া ওঁদের ঠাঁই দেন নি।

গঙ্গা-যমুনার মূর্তিতে আছে মানব-দেবী ছাপ এবং গুপ্তযুগ থেকেই তাদের অবস্থান দেখা যায়। অলঙ্করণে ওঁদের বাহনদ্বয় মকর ও কূর্মকে যথেচ্ছ-ভাবে কাজে লাগানো হয়েছে। শিল্পী শাস্ত্রগ্রন্থের সীমা নির্দেশের বাইরে আসতে পারাতে মকরের সাহায্যে সমুদ্রের সঙ্গে গঙ্গার আত্মীয়তার কথা ঘোষণা করতে পেরেছেন এখানে। মূর্তি তৈরীর ক্ষেত্রে শিল্পীর স্বাধীনতা রক্ষিত হতে দেখা যায়। কিন্তু এ স্বাধীনতা তাঁর ছিল না মন্দির-স্থাপত্যে। সেখানে তিনি কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করেছেন, নগদ বিদায় নিয়ে পৃষ্ঠপোষকদের চাহিদা মিটিয়েছেন মাত্র। কিন্তু এই শিল্পীই যখন প্রাণের আনন্দে ও সহজলভ্য উপাদানে পোড়ামাটির শিল্পসৃষ্টি করেছেন সেখানে তিনি মনের মাধুরী মিশায়ে শিল্প সৃষ্টি করতে, শিল্পীর স্বাধীনতা রক্ষা করতে, সর্বাংশে সক্ষম হয়েছেন। যাই হোক, বাঙালী-চিন্তা ও চেতনায় শুধু গঙ্গাই দেবী হন নি, সওদাগর এবং কৃষিজীবী সমাজের দৃষ্টিতে বহু জলধারাও দেবদেবীতে পরিণত হয়েছেন।

সরস্বতীকেও আমরা দেবীর আসনে বসিয়েছি। যাস্ক তাঁর নিরুক্তে (১.২৩) বলেছেন—'সরস্বতী ইতি এতস্য নদীবদ্দেবতাবচ্চ নিগমা ভবন্তে' অর্থাৎ নদীরূপা ও দেবীরূপা সরস্বতী। সায়ণ তাঁর ভাষ্যে (১. ৩. ১২) বলেছেন—'দ্বিবিধা হি সরস্বতী বিগ্রহদ্দেবতা নদীরূপা চ'। একক সরস্বতী

একদা গাঙ্গেয়ভূমিতে প্রবাহিত হত। এইনদী পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে প্রভাসে সমুদ্রের সঙ্গে মিশত। তখনও বাঙলা আদিম সমুদ্র-অঙ্ক থেকে জেগে ওঠে নি, এবং বর্তমানের বঙ্গোপসাগর মাত্র আসাম অবধি বিস্তৃত ছিল। তারপর একই সঙ্গে মানুষের উদ্ভব ও হিমালয়ের অভ্যুত্থান। ধীরে ধীরে হিমালয় যখন মাথা তুলছিল তখন আদিকালের নদ-নদী ও তাদের শাখা-প্রশাখার মধ্যে বিপুল বিপর্যয় দেখা যায়। বহু নদী মরুপথে হারিয়ে যায়। প্রাগৈতিহাসিক সরস্বতীনদী পশ্চিমবাহী যমুনার খাতকে আপনার বিপুল স্রোতের উজান বইয়ে দেয় পূর্বদিকে। দ্বিখণ্ডিত সরস্বতীর উজানপ্রবাহ থেকে গঙ্গা ত্রিবেণীতে মুক্ত হয়। যুগ যুগ ধরে হিমালয়ের উপত্যকাভূমি ধৌত করে এ নদী গাঙ্গেয় সমতলভূমির উপনিবেশের ধারা সৃষ্টি করে এগিয়ে যায়।

মহাভারতের সুহ্ম ভাগীরথীর পশ্চিমাংশেই অবস্থিত ছিল যা পরে কর্ণসুবর্ণ আখ্যা পেয়েছে। মধ্যযুগে কঙ্কগ্রামভুক্তি অথবা উত্তররাঢ় এবং বর্ধমানভুক্তি অথবা দক্ষিণরাঢ় বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। দুইয়ের ব্যবধান অজয় বা দামোদর নদ। এই অঞ্চলই বাঙলার সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান। বাঙলার সংস্কৃতির আরেকটি প্রাচীন কেন্দ্র পৌণ্ড্রবর্ধন, করতোয়া-লালিত। মধ্যযুগে গঙ্গা প্রভৃতি নদী স্বতন্ত্র মূর্তিতে নিজ নিজ বাহনসহ দেবীরূপে পূজিতা। প্রাচীন পুরাণ যমুনার চারিত্রিক স্খলনের কথা প্রচার করে তাকে 'দেবী' মাহাত্ম্য দান করে নি। কিন্তু লোকবিশ্বাসে যমুনা গঙ্গার মতই পবিত্র। গঙ্গা ও যমুনাকে সমান শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে থাকে বাঙলার লোকসমাজ। গন্ধেশ্বরী প্রভৃতির দেবীরূপ মধ্যযুগেরও পরবর্তীকালের ঘটনা।

বারিদেবী গঙ্গার বাহন মকরকে নিয়ে অনেক আলোড়ন হয়েছে। অবশ্য মকরবাহন যে শুধু গঙ্গাদেবীর সঙ্গে আছেন এমন নয়, বরুণ-মূর্তির সঙ্গেও তাঁকে দেখা গেছে। দেখা গেছে ঠাকুর মকরধ্বজের সঙ্গে ও জৈন তীর্থঙ্কর পুষ্পদন্তের সঙ্গে।

চণ্ডীমঙ্গলের কমলেকামিনীকে নিয়ে, মঙ্গল উৎসবকে নিয়ে, নবাবী নৌকো ভাসান ও বাইচ নিয়ে এবং মৎস্যজীবীদের আষাঢ়ে উৎসব, গঙ্গাদিত্য উৎসব, স্নানযাত্রা প্রভৃতিকে নিয়ে হয়ে আসছে নদী উৎসব। বাঙালীর প্রাণের উৎসব। বাঙলার নদী উৎসব অধ্যাত্মচিন্তার ফসল নয়, এর সঙ্গে অর্থনৈতিক চিন্তাসঞ্জাত মূল্যবোধ বিদ্যমান। নদী উৎসবে কর্মকাণ্ডই প্রাধান্য পায়। নদীকেন্দ্রিক মেলার চরিত্র-আলোচনায় তা সুস্পষ্ট তুলে ধরার চেষ্টা কাঙ্ক্ষিত।

বাঙালীর জীবনে নদনদীর প্রাধান্য নানাভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। যদিও পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে গগনস্পর্শী হিমালয় ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, তবুও এখানকার কোন নদীই হিমালয়ে উত্থিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়ে নি। রাজ্যের প্রধানপ্রধান নদীগুলো গঙ্গার শাখা প্রশাখা, এবং এই শাখা-প্রশাখা বিচিত্র কলতানে মুখর।

এখানকার অধিকাংশ নদী বর্ষাকালে জলপূর্ণ, অন্য সময়ে অতি শীর্ণ, অগভীর জলধারা। কোন কোন নদী একেবারে শুকিয়ে যায়। সারা বৎসর জল থাকে না। আবার বর্ষায় অধিকাংশ নদীই খরস্রোতা হওয়ায় বাণিজ্যোপযোগী নৌবহনযোগ্য নয়। প্রাচীনকালে এই নদনদীর গতি ও অবস্থিতি বিভিন্ন ছিল। নদীর প্রবাহ পরিবর্তন, বন্যা ও প্লাবনে বহু প্রাচীন এবং এককালের সুসমৃদ্ধ ও লোকালয়পূর্ণ জনপদ নদীর গহ্বরে আশ্রয় নিয়েছে। নদীর ভাঙন ও স্রোত জীবন-গতিকে দ্রুত করেছে।

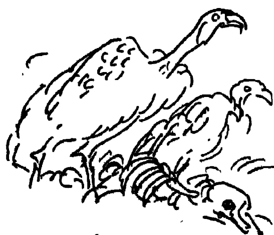
নূতন নূতন ভূমি ও জনপদের সৃষ্টিতে প্রাচীন জনপদ ও কর্মকাণ্ডের বহুস্থান জনবিরল, বহুস্থান বনজঙ্গলে পরিণত হয়েছে। অথচ বাঙালীর সামগ্রিক পরিচয় পেতে হলে পরিত্যক্ত জনপদের মনুষ্য ব্যবহৃত ও সৃষ্ট উপাদান, নদীগর্ভে বিলীন উপাদান সমূহের সঙ্গে পরিচিত হওয়া একান্তই কাম্য। পুরাতাত্ত্বিকরা এ সম্পর্কে সচেতন, তাই দীর্ঘদিন ধরে পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়েছেন এবং সে অনুসন্ধানের আলোকে অর্থাৎ অজয়, কুনুর ও কোপাই, শিলাবতী এবং কংসাবতী-ময়ূরাক্ষীর তীরে তীরে ভূগর্ভ খননের ফলে যে সব প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে আর্য আগমনের পূর্বে এদেশে বসবাসকারী আদিম বাঙালীর কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্পর্কিত উপাদান বর্তমান। এই উপাদানের ভিত্তিতে বাঙালী সভ্যতার প্রাচীনত্ব প্রায় দেড় হাজার বছর পিছিয়ে দেওয়া যেতে পারে বলে বহু পণ্ডিত অভিমত প্রকাশ করেছেন। এরই ফলে প্রত্নতত্ত্বের প্রসার ও খননের পর উৎখনন চলেছে প্রাচীন নিদর্শন জানতে, জানাতে।

প্রত্নতাত্ত্বিক জরীপের জন্য বহুদিন থেকেই বহু মনীষী বহু প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন। প্রত্নরত্নের জন্য আন্তরিক উদাত্ত আহ্বান ধ্বনিত হয়েছিল—"একবার শুন, একবার দেখো—বাঙালী যেমন ভাবে শুনিলে সব শুনিতে পায়, যে নয়নে দেখিলে সব দেখিতে পায়, তেমনি শ্রবণময় ও নয়নময় হইয়া আমার ভাববিহ্বল অস্ফুটভাষা ও আলেখ্য শুন ও দেখ। মন্দির-মসজিদে দেখ, জলা-জঙ্গল, শিলালেখতে, তাম্রপট্টলাতে দেখ, আমার বঙ্গমৃত্তিকা জনম

সার্থক হউক।" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই আবেদনের পর থেকে এযাবৎ দেখার কাজে, জরীপের কাজে, খননের কাজে, সংরক্ষণের কাজে আমরা কতদূর এগিয়েছি? তাছাড়া পুরাতাত্ত্বিক গবেষকদের সংগৃহীত ও আবিষ্কৃত উপাদানসমূহ লোকবৃত্তের অধ্যয়ন ও চর্চায় কতটা কার্যকর, তা একবার দেখার চেষ্টা করতে অসুবিধা কোথায়?

কোনসময় বাঙলায় প্রথম বসতি আরম্ভ হয় তা এখনও জানা যায় নি। আদিম মানুষ প্রস্তর নির্মিত যে অস্ত্র ব্যবহার করত তাই তাদের অস্তিত্বের প্রধান প্রমাণ ও পরিচয়। নব্যপ্রস্তরযুগের মানুষ আগুনের ব্যবহারে, পোড়ামাটির বাসনের ব্যবহারে, রন্ধন প্রণালীতে অভ্যস্ত ছিল। আরও পরবর্তী-যুগের মানুষ ধাতুর আবিষ্কার করে এবং প্রস্তর-নির্মিত অস্ত্রের বদলে তাম্র নির্মিত অস্ত্র ব্যবহার করে। তৃতীয়যুগে এবং আরও পরবর্তী যুগে আরম্ভ করে লৌহের ব্যবহার। লৌহ মানুষকে ক্রম উন্নততর সভ্যতার অধিকারী করে।

বাঙলাতেও আদিম মানব-সভ্যতার বিবর্তন হয়েছিল। এখানকার মাটি খুঁড়ে প্রত্ন, নব্যপ্রস্তর ও তাম্রযুগের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে। এই পাওয়ার কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমাদের বদ্ধমূল ধারণা প্রায় সংস্কারে দাঁড়িয়েছিল যে বাঙলাদেশ ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অর্বাচীন। বড়জোর পাল যুগের কিছু নিদর্শন এ ভূমিখণ্ডে মিলতে পারে, তার ওপাশে নয়ই। ধীরে ধীরে জলা জঙ্গল ঢাকাজায়গা, ছোটবড় ঢিবি, মন্দির টুকরোটুকরো খোলামকুচি বা মৃৎপাত্র, কিছু পোড়ামাটির মূর্তি, দুচারটে মুদ্রা—সব মিলিয়ে আমাদের যত্নলালিত সংস্কারকে ঝাঁকানি দিতে লাগল। অতীতকে জানার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে উঠল। তখন বিশেষজ্ঞ ও রসিকমানুষ বেরিয়ে পড়লেন বনে জঙ্গলে, নদীর কিনারে, কিছু পেতে, কিছু সংগ্রহ করতে।



বারিবহুল নদীবহুল সমতল এই ভূখণ্ডের অধিবাসীরা কৃষিকেই প্রধান ধনসম্বল বলে জেনেছিল। অস্ট্রিকভাষী লোকেদের সহায়তায় এখানের অধিবাসীবৃন্দ কৃষিকে সমৃদ্ধ করে। ধানচাষ আরম্ভ করে। গমের চাষ শুরু হয় দ্রাবিড়বাসী দীর্ঘমুণ্ড লোকেদের দ্বারা। যব ও গম ধানের মত বর্ষা-নির্ভর নয়। তাই উত্তর ভারতে এইসব চাষের বিস্তৃতি ঘটে। আর ধানের চাষ প্রসার-লাভ করে বাঙলা-আসাম-উড়িষ্যা ও দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রাশ্রয়ী সমতল

ভূমিখণ্ডে। ধান ছাড়া অস্ট্রিকভাষী লোকেরা কলা লেবু লাউ পান নারকেল জাম্বুরা (বাতাবী) কামরাঙ্গা ডুমুর সুপারী হলুদ ডালিম প্রভৃতি বাঙালীর বহু প্রিয় খাদ্যবস্তু চাষ আরম্ভ করে। তুলার কাপড়ের ব্যবহারও ওদের দান। পট, কর্পট, মেড়া বা ভেড়ার সঙ্গে ওদের পরিচয় ছিল। কম্বল ওরাই উপহার দেয়। এই কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের সঙ্গে অরণ্যচারী শাখাও ছিল যারা পশু শিকারকে জীবিকা করেছিল। শিকারের জন্য তীর ধনুক ব্যবহার করত, ব্যবহার করত অন্যান্য আয়ুধ। শিকার করত হাতী ভেড়া কাক এবং কর্কট (কাঁকড়া) কবুতর ইত্যাদি বিভিন্ন পক্ষী। জলপথে যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য তৈরী করল ডোঙ্গা নৌকা, ডিঙ্গি নৌকা, ভেলা।

নব্যপ্রস্তরযুগের দ্রাবিড় ভাষাভাষী লোকেরা ভারতবর্ষের নগর-সভ্যতার সৃষ্টিকর্তা। নগর-নির্ভর সভ্যতা জটিল। এই সভ্যতার উপাদান-উপকরণও জটিল। এই গোষ্ঠীর লোকেরা সোনা রূপা সীসা ব্রোঞ্জ টিন প্রভৃতির ব্যবহার জানত, শিলাজাত নানাপ্রকার পাথর, জান্তব হাড়, পোড়ামাটি ও খনিজ এবং সামুদ্রিক দ্রব্যাদি নিজেদের প্রয়োজনে অলংকরণে ও বিচিত্র রূপে ব্যবহার করত। বর্শা ছুরি খড়গ কুঠার তীর ধনুক মুষল বাঁটুল তরবারী তীরের ফলা ইত্যাদি ছিল তাদের অস্ত্রোপকরণ। পাথরের হলমুখ, চকমকি পাথরের ছুরি ও কুঠার নানাবিধ ধাতু ও মাটির নিত্য ব্যবহার্য গৃহোপকরণ মাটির তৈরী খেলনা তামা ও ব্রোঞ্জের দেহসজ্জোপকরণ খেলার জন্য গুটি গুলি পাশা, স্থলপথে গমনাগমনের জন্য গরুরগাড়ী, সুতাকাটার ও বোনার যন্ত্র সবই ওদের সময় থেকে প্রসার লাভ করতে থাকে। বৃষ গাভী মহিষ মেষ হাতি উট শূকর ছাগল মুরগী কুকুর ইত্যাদি ছিল ওদের গৃহপালিত জন্তু। যদিও ওরা গরু চরাত না, দুধ পান করত না, কিন্তু মুরগী পালত এবং হাতিকে পোষ মানাত। তাছাড়া কুড়ি হিসাবে গণনা করা, চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে দিন ও রাত্রির মাপও ওরাই এদেশে চালু করে।

বিলাস-দ্রব্যের উপকরণের মধ্যে হস্ত ও কারুশিল্পের নানা সামগ্রী—তাম্র-প্রস্তর যুগের চিত্রকলার জ্যামিতিক রেখা এবং অলংকরণ, মাটির পুতুল ও খেলনায় ওদের পরিচয় স্পষ্ট। ছোটবড় রাস্তা, জলনিঃসরণের প্রণালী, ছোটবড় একাধিক তলাবিশিষ্ট ইঁটকাঠের বাড়ি দুর্গ সিঁড়ি খিলানযুক্ত দরজা জানলা স্নানাগার কূপ জলকুণ্ড পূজামন্দির সংকার-স্থান প্রভৃতি তাদের জীবন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির দলিল। কিন্তু বাঙলার মানুষ কতটা এই জীবন-সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক? বাঙালী কতটা অস্ট্রিক-দ্রাবিড় ভাষাভাষিক

লোকেদের দ্বারা প্রভাবিত? নৃ-প্রত্ন-লোক-ঐতিহাসিক জ্ঞান ও অধ্যয়ন ব্যতীত তা অস্পষ্ট থাকতে বাধ্য।

বাঙলাদেশের আর্যীকরণের আগে আর্যভাষী অ্যালপো-দীনারীয় ও আদিনর্ডিক লোকেরা তাদের পূর্বতন প্রভাবকে আত্মসাৎ করে ও আত্মিক সংস্কার আমাদের মধ্যে চালিয়ে দেয়।

ভূখননের ফলে মৌর্য হরফের কিছু ব্রাহ্মীলিপি ছাড়াও কিছু কিছু শিলালেখ পাওয়া গেল যাতে অনুমান করা যেতে লাগল সেই আলো-আঁধারি যুগে বর্হিবিশ্বের সঙ্গে এই ভূমিখণ্ডের বাণিজ্যিক ও অন্যান্য সম্পর্ক ছিল। এই অনুমানভিত্তিক চিন্তা থেকে খননের কাজ এগিয়ে চলল। বেরিয়ে পড়ল প্রাক-মৌর্য যুগের কয়েকটি নমুনা। প্রাচীন জনপদ ও অধিবাসীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন। তখন গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের তত্ত্ব দিয়ে বঙ্গভূমিকে আর অর্বাচীন প্রমাণ করা সম্ভব হল না। অর্থাৎ বিগত কয়েক দশকের পুরা-অনুসন্ধানে বাঙলার লোক-ইতিহাসের অন্ধকারতম দিনগুলো যেন জোনাকির আলোকে আলোকিত হয়ে উঠল।

ভারতীয় যাদুঘর, আশুতোষ সংগ্রহশালা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ, ওপার বাঙলার পুরাতাত্ত্বিক অন্বেষকেরা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ভারত সরকারের পূর্বাঞ্চলীয় পুরাবৃত্ত বিভাগ ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে কয়েকজন পুরারসিকের প্রচেষ্টায় বাঙলার আদিতম পর্বের ইতিহাস ক্রমে ক্রমে স্বচ্ছ ও দৃশ্যমান হয়ে উঠতে লাগল। এবং এই পুরারসিক অন্বেষক ও গবেষকদের চোখ দিয়ে, আমাদের নিজেদের ক্রিয়াকর্মের অভিজ্ঞতা দিয়ে, আমরা বাঙলার লোকবৃত্তের বহু অনধীত তথ্য ও তত্ত্বকে প্রত্যক্ষ করতে লাগলাম।

যুক্ত বাঙলার পুরাতত্ত্ব গবেষণার অন্যতম পীঠস্থান বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির উৎসাহে ও ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ের খননে উদ্ধারিত যাবতীয় পুরাবস্তু পুণ্ড্রবর্ধনের স্মৃতিবাহক হিসাবে চিহ্নিত হল। মৌর্য-ব্রাহ্মী শিলালেখ এই ভূমির প্রাচীনত্বের পাথুরে প্রমাণ। ওদিকে সোমপুর বিহারের আবিষ্কারে আবার নতুন দিক উন্মোচিত হল। এই বিহারের গঠন সৌকর্য সকলকে বিমোহিত করল। সমালোচকেরা প্রশ্ন তুললেন—তবে কি ব্রহ্মদেশ ও জাভার মন্দির-গুলো সোমপুর বিহারের অনুকরণে বা একই শিল্পীদের সৃষ্টি? সেদেশের নগরে-নগরে, বন্দরে-অঞ্চলে, ক্রেতনে, মন্দিরে, বিহারে সর্বত্রই যে ভারতীয়

সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভিষেক তা কি এই ভূমিখণ্ডের প্রাচীন অধিবাসী-দেরই কীর্তি? বার্মা, মালয়, যবদ্বীপ, শ্যামদেশ (থাইল্যাণ্ড), ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশে সর্বত্রই ভারতীয় সভ্যতার চিহ্ন বর্তমান। যদিও এই সভ্যতা যখন নগর থেকে গ্রামে অনুপ্রবেশ করতে লাগল তখন তার প্রভাব ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে চলল। স্ব স্ব দেশের উত্তপ্ত স্বাদেশিকতায় ভারতীয় প্রভাব সাম্প্রতিক কালে ভাঁটা পড়লেও শিল্পে, সাহিত্যে, জীবনাচরণে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে এ দেশীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির জারক-রস সেখানে পরিব্যাপ্ত যা প্রত্যক্ষ করা যায় ওয়েয়াঙ নাট্যে, আর্টে, লোকসাহিত্যে, সামাজিক উৎসবে এবং নানাবিধ ক্রিয়াকর্মে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই সদ্য গঠিত কলকাতার আশুতোষ সংগ্রহ-শালা সুরু করে বানগড়ে পুরাতাত্ত্বিক খনন প্রাচীন কোটিবর্ষের ইতিকথা শোনাবার সদিচ্ছা নিয়ে। বিদেশী পুরারসিক আলেকজাণ্ডার কানিংহাম এবং বেগলার যে চোখ দিয়ে ভারতভূমির অতীত প্রত্যক্ষ করেছিলেন তারই উত্তরাধিকার হিসাবে যেন মার্টিমার হুইলার এসে হাজির হলেন মাটি খুঁড়তে, এ দেশের মুখর অতীতকে জানতে। হাতে-কলমে এখানকার অনেক পুরারসিককে খননকার্যের আধুনিক পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন তিনি। অনেক দেশী-বিদেশী অন্বেষক ও গবেষক অন্তরের তাড়নায় দিকবিদিকে পুরাসামগ্রীর সন্ধানে মেতে উঠলেন।

স্বাধীনোত্তরকালে নতুন উদ্যমে প্রাচীন বাঙলার পুরাসামগ্রী সন্ধান সুরু হয়। তমলুক, বেড়াচাঁপা এবং চেরোটির মাটি তুলে অতীতকে খুঁজে বার করার চেষ্টা চলে। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ গড়ে ওঠে। আনন্দের কথা যে জন্মলগ্ন থেকে এ বিভাগ নানাবিধ অনুসন্ধানের কাজে আত্মনিয়োগ করে।

জাতীয়তা ও আঞ্চলিক চেতনা দুর্বার হয়ে দেখা দেয় জনমনে। এরই পথ ধরে সুরু হয় নানাবিধ আঞ্চলিক ইতিহাসের চর্চা। পুরাসামগ্রীর চর্চা। সুরু হয় নৃতত্ত্বের গভীর গবেষণা। ভারত সরকারের ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গ সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্র, লোকবৃত্তিক সংগঠন, বহু ব্যক্তিগত অন্বেষক ও সংগ্রাহক অতীতকে জানার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। চারদিকে দেখা যায় একটা উৎসাহের ভাব। ও-পার বাঙলায়ও একই উন্মাদনা নিয়ে কাজ এগিয়ে চলল। লোকবৃত্ত এই সুযোগে নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্বের সঙ্গে, ভাষাতত্ত্ব ও ইতিহাসের সঙ্গে, সমাজবিজ্ঞান ও অপর

বিজ্ঞানের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে বোঝাসন্ধি করে নিজের গতিপথ স্পষ্ট করে নেবার সুযোগ পেল স্বাধীনোত্তর কালে।

প্রস্তরযুগের অন্ধকার দিনগুলোকে আলোকিত করতে যেন এক এক করে বেরিয়ে এল প্রাগৈতিহাসিক আয়ুধ সম্ভার। বগড়ির পর সুবর্ণরেখা, ময়ূরাক্ষী, দামোদর, শিলাবতীর তীরে তীরে, বন আসুরিয়া, অজয় তীর—সর্বত্রই দেখা মিলল নব্যপ্রস্তর আয়ুধ, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সর্বত্রই প্রাগৈতিহাসিক ও প্রায়-ঐতিহাসিক পুরাবস্তুর সন্ধান চলল। শুশুনিয়া, প্রাচীন উত্তররাঢ় এবং দক্ষিণবঙ্গের নানাস্থানে বাঞ্ছিত বস্তুর দেখাও পাওয়া গেল। প্রাগৈতিহাসিক ও প্রায়-ঐতিহাসিক সামগ্রী সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গের পুরাতত্ত্ব বিভাগ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলেন খ্রীষ্টজন্মের দেড় হাজার বছর আগেকার এক সভ্যতার কথা শুনিয়ে। পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে স্টীটাইট (Steatite) পাথরে নির্মিত গোলাকার সীল পাওয়া গেছে যার উপরে খোদিত আছে কতকগুলো চিহ্ন। অনেকে মনে করেন এগুলো চিত্রাক্ষর (hieroglyphs ও pictographs)। সীলটি ভূমধ্যসাগরস্থিত ক্রীট দ্বীপে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে নির্মিত বলে অনুমিত। ঐ সময় প্রাচীন সভ্যতার আবাসস্থল ক্রীট দ্বীপের সঙ্গে বাঙলার বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল যা 'দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে' বিশদভাবে আলোচিত। অনেকের ধারণা সীলের খোদিত চিহ্ন প্রাচীন বাঙলার প্রচলিত অক্ষর। তাছাড়াও পাওয়া গেছে পোড়ামাটির তৈরী নারীমূর্তি ও অন্যান্য সামগ্রী। বর্ধমান জেলার অজয় কুনুর নদীর তীরে ভূগর্ভ খননে যে পুরাসামগ্রী আবিষ্কৃত হয়েছে তা পরীক্ষা করে কোন কোন পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করেছেন যে খ্রীষ্ট-জন্মের প্রায় দেড়হাজার বছর আগে সিন্ধুনদের উপত্যকায় মধ্যভারতে এবং রাজস্থানের অনেক জায়গায় যেমন তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা ছিল বাঙলাদেশেও সেরূপ সভ্যতাসম্পন্ন মানবগোষ্ঠী বসবাস করত। যারা ধানচাষ জানত, নানা নকশা শোভিত মৃৎপাত্র ব্যবহার করত, সম্বর নীলগাই প্রভৃতি পশুশিকার ও শূকর প্রভৃতি পশুপালন করতো। উত্তরে ও



দক্ষিণে কোপাই নদীর তীর এবং পশ্চিমে তুবরাজপুর থেকে বর্ধমানের কাটোয়া পর্যন্ত উত্তর রাঢ়ের বিস্তীর্ণ ভূভাগে নানা স্থানে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন

পাওয়া গেছে। সুতরাং প্রাচীন যুগে অন্ততঃ তিন হাজার বছর বা তারও আগে এই ভূমিখণ্ডে এক সুসভ্য জাতি বসবাস করত তাতে সন্দেহ নেই।

বেড়াচাঁপায় আশুতোষ সংগ্রহশালার উৎসাহে যে খনন কার্য সুরু হয়েছিল সেখান থেকে শুঙ্গ যুগের অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের শিল্প নমুনা পাওয়া গেছে। একই জেলারই অর্থাৎ চব্বিশ পরগণার ডায়মণ্ডহারবার তীরবর্তী হরিনারায়ণপুর থেকে প্রায়-ঐতিহাসিক ও শুঙ্গযুগের বিবিধ পুরাবস্তু সংগৃহীত হয়। নিকটবর্তী দেউলপাড়া থেকে সংগৃহীত হয় প্রায়-ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক আয়ুধ প্রত্নসম্ভার। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মানচিত্র ধরে এগুলেও আমরা প্রতিটি জেলায় কোন-না-কোন গ্রাম বা গঞ্জ-শহরে, অথবা প্রাচীন জনপদে আমাদের আগেকার অধিবাসীদের অস্তিত্ব ও কীর্তিকথা জানতে পারছি।

ও-পার বাঙলার আবিষ্কৃত তাম্রশাসনের সাহায্যে 'চন্দ্র' উপাধিধারী রাজাদের সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য জানা গেছে যার ফলে চন্দ্রবংশের এবং অন্যান্য রাজবংশের সম্বন্ধে পূর্বেকার বহু ধারণা ও অনুমানভিত্তিক ইতিহাস আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। ওপার বাঙলার পুরাবৃত্ত জরীপে যে সব তাম্রশাসন আবিষ্কৃত ও লেখ পাঠোদ্ধার হয়েছে তাতে পূর্ববঙ্গের এক নতুন রাজবংশের পরিচয় পাওয়া গেছে। তাম্রশাসনে বীরদেব তৎপুত্র আনন্দদেব এবং আনন্দদেবের পুত্র ভবদেবের উল্লেখ আছে। পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ ভবদেব দেবপর্বতজয়স্কন্ধাবার থেকে এই শাসন দান করেছিলেন, দেবপর্বতন কুমিল্লার নিকটবর্তী ময়নামতী পাহাড়ের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। সম্ভবতঃ এটাই দেব বংশের রাজধানী। এই রাজবংশ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং শক্তিশালী ছিলেন। কিন্তু এঁদের সম্পর্কে আর কোন বিবরণ জানা যায় নি। সম্ভবতঃ দেবপালের পরবর্তী পালরাজাগণের সময়ে দেববংশীয় রাজগণ পূর্ববঙ্গে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই রাজবংশের কান্তিদেব হরিকেলের রাজা ছিলেন। তাঁর রাজধানীর নাম ছিল বর্ধমানপুর।

কান্তিদেবের পরে প্রবল পরাক্রান্ত চন্দ্রবংশ পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে রাজত্ব করেন। মহারাজাধিরাজ ত্রৈলোক্যচন্দ্রই এই বংশের প্রথম শক্তিশালী রাজা যিনি গৌড়রাজের সঙ্গে বিবাদে সাফল্য লাভ করেছিলেন। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পর রাজা হন শ্রীচন্দ্র। শ্রীচন্দ্র থেকে গোবিন্দচন্দ্র পর্যন্ত চারজন রাজার রাজত্বকালের যে ঊর্ধ্বতন সংখ্যা তাম্রশাসনে খোদিত তাঁরা

প্রায় একশ কুড়ি বছর রাজত্ব করেন। ১০১৭ খ্রীঃ বা তার অল্প পূর্বে গোবিন্দচন্দ্র চোল সৈন্য দ্বারা পরাজিত হন। মহীপাল চন্দ্রবংশের রাজাদের নিকট থেকে বঙ্গাল রাজ্য পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। লামা তারানাথের মতেও পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল বঙ্গালদেশেই প্রথম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। নারায়ণ পালের রাজত্বের শেষ ভাগে পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে পালেদের পরিবর্তে চন্দ্র বংশীয়েরা রাজত্ব করেন। বাঙলার এই শক্তিশালী চন্দ্র রাজ বংশের কথা কিছুদিন পূর্বেও বিশেষ জানা ছিল না। এই চন্দ্রবংশে ত্রৈলোক্যচন্দ্র, শ্রীচন্দ্র, কল্যাণচন্দ্র, লডহচন্দ্র ও গোবিন্দ-চন্দ্র ৮৭৫ খ্রীঃ থেকে ১০৩৫ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এবং পাল বংশ রাজত্ব করেন ৮৫৪ খ্রীঃ থেকে ১০৩৮ খ্রীঃ পর্যন্ত যথাক্রমে নারায়ণ পাল, রাজ্যপাল, (দ্বিতীয়) গোপাল, (দ্বিতীয়) বিগ্রহপাল ও মহীপাল। এই দুই রাজবংশ, অর্থাৎ চন্দ্র ও পাল বংশ, প্রায় পাশাপাশি থেকে রাজত্ব করে যাচ্ছিলেন। এবং হয়ত বৌদ্ধদের সর্ব চিহ্ন বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী রাজা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী দেববংশের সমস্ত প্রকার চিহ্নাদি বিলুপ্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের কুটিল গতি সত্যকে আজ প্রকাশিত করেছে পুরারসিক-অন্বেষকদের সহায়তায়। ওপার বাঙলার পুরাবৃত্ত আবিষ্কারে প্রাচীন বাঙলা সম্পর্কে আরও বহু তথ্য জানা গেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে আমরা সদ্যোত্থিত উপাদান-উপকরণের সঠিক বিবরণ দানের নিমিত্তে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজন তা করতে না পারায় এ সম্পর্কে অহেতুক অতিকথন বা আবেগের শিকার হতে চাই না।

অজয় উপত্যকার সভ্যতাকে বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ, উইলকক্স প্রভৃতি থেকে অত্যাধুনিক পুরাতত্ত্ববিদ পর্যন্ত অতি প্রাচীন বলে আখ্যাত করেছেন। লোকবৃত্ত নিয়ে পড়ে থাকি জেনেও পুরারসিক এক বন্ধু অজয়তীরের মঙ্গলকোট থানা অঞ্চল ও সন্নিহিত কয়েকটি স্থানে নিয়ে যান পুরানুসন্ধানে। পুরানুসন্ধানের উপাদান-উপকরণকে লোকবৃত্তের চর্চায় লাগাতে পারা যায় কি না তা বিবেচনা করার পরামর্শও তিনি দেন। স্বভাবতই এ-যাওয়া আমার পক্ষে বাঞ্ছিত ও কাঙ্ক্ষিত ছিল। কারণ লোকবৃত্তের মধ্যে যতই প্রবেশ করতে চেয়েছি ততই যেন মনে হয়েছে নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান না থাকলে ঠিক ঠিক লোকবৃত্তের অনুধাবন একেবারে অসম্ভব। সে কারণেই যখন মাঠে-ঘাটে

ঘোরার ডাক আসে, সুযোগ আসে, সে সুযোগের সুবিধা নিতে ছাড়ি না। অজয়-উপত্যকায় ঘোরার এ সুযোগও ছাড়া গেল না।

মঙ্গলকোট পৌঁছে যখন মাথা ঘামাচ্ছি যোগাযোগ করার সমস্যা নিয়ে অর্থাৎ কি ভাবে কার সঙ্গে যোগাযোগ করে কাজে নামা যায়, যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং লোকবসতির খামতিতে যখন অস্থির-চিত্ত আমরা, তখন বর্ষীয়ান এক ভদ্রলোক আমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এলেন। তিনি বললেন রাজা বিক্রমজিতের রাজত্ব যাওয়ার পর থেকে অভিশপ্ত এই মাটিতে কেউ আর টিঁকে থাকতে পারে নি, তাই এই হতদশা। লোকশ্রুতি, এই যে বক্তিয়ার খিলজি যখন আউলেদের নিয়ে মঙ্গলকোটে প্রবেশ করেন তখন সেখানকার সামন্তনৃপতি ছিলেন বিক্রমজিৎ। কিন্তু কে এই বিক্রমজিৎ? ইনি কি তিনি যিনি বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত হয়েছেন, যাঁর রাজ্যের নাম ছিল উজ্জয়িনী বা উজানী? পালিতপুরের কাছেই বাসাপাড়ায় তার বেতালসিদ্ধ হওয়ার কাহিনীও চালু রয়েছে।

এই ধরনের লোকশ্রুতির প্রতি অন্য গুরুত্ব না দিলেও একটা সত্য স্পষ্ট হয়, এই স্থানগুলো (বাঙলার প্রায় সমস্ত ভূমি) নিঃসন্দেহে প্রাচীন বলে প্রমাণিত হয়েছে। ভাগীরথীর পশ্চিমে সুবেবাঙলার যে অংশ তা রাঢ় বা রাঢ়া। অজয় এই অঞ্চলকে উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ়ে বিভক্ত করেছে। ১০২৬ খ্রীঃ খোদিত রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয় লিপিতে এদের উল্লেখ আছে। নৈহাটি তাম্রশাসনে জানা যায়, বল্লালসেন উত্তররাঢ়ে ভূমিদান করে-ছিলেন। এই অঞ্চলেরই মঙ্গলকোট পুরারসিকদের প্রিয় স্থান। এখানে এন. বি. পি., রোমান রুলেট থেকে মৌর্য-সুঙ্গ-কুষাণের নমুনা যত্রতত্র ছড়ানো। এই থানার বিভিন্ন মাউণ্ড বা ঢিবি নিয়ে কিছুদিন কাজ করলে স্বতঃই মনে হবে মৌর্য শাসন থেকে মুঘল শাসন পর্যন্ত বিভিন্ন প্রত্নসম্ভার মঙ্গলকোটের ভূগর্ভে প্রোথিত রয়েছে। হয়ত অভিশপ্ত এই বিশ্বাস থেকেই এই থানার কোনও কোনও অঞ্চলে এখনও জনবসতি নেই। ফাঁকা জায়গা, মাঝে মাঝে ২৫।৩০ ফুট মাথা উঁচু অতীতের বোবা সাক্ষী ঢিবিগুলো দাঁড়িয়ে আছে। জৈন বৌদ্ধ ও পৌরাণিক মূর্তি, প্রাচীন প্রায় সব কটি যুগের মুদ্রা, গুপ্ত-ভাস্কর্যের নমুনা, পোড়ামাটির প্রত্নসম্ভার, ইন্দোসারাসনিক স্থাপত্য—সব নিয়ে মঙ্গলকোট আজও যেন অপেক্ষা করছে তার ইতিবৃত্ত শোনানোর জন্য, তার অতীতকে প্রকাশ করার জন্য।

প্রাচীন রাঢ়ের আরও পূর্বে সুহ্ম। মহাভারতের সভাপর্বে (৩৩ অ.) সুহ্ম নামের উল্লেখ আছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ 'সুহ্মা : রাঢ়া' কে রাঢ় দেশ বলেছেন এবং মেদিনীকোষ 'রাঢ়া' অর্থ রাঢ়া স্ত্রী চ সুহ্ম শোভায়াঃ সুহ্মদেশ ও শোভা। খ্রীষ্টীয় পঞ্চমশতকে রচিত কালিদাসের রঘুবংশে সুহ্মগণকে রঘুর নিকট 'বৈতসীবৃত্তি' ধারণকারী বলা হয়েছে। সুহ্ম বা রাঢ়দেশ অতি প্রাচীনকালে সুহ্ম ও বজ্রভূমি এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ইংরেজও প্রায় দুশো বছর আগে রাঢ়ের বর্ধমান জেলাকে দু-ভাগে ভাগ করে। উত্তরদিকের নাম বর্ধমানই থেকে যায়, দক্ষিণাংশ হুগলীতে গিয়ে মেশে। তৎকালীন সুহ্মভূমিতে বর্তমান হাওড়া জেলাও বিযুক্ত ছিল না। সাতগাঁ শাসনে ভুরশুট পরগণার গুরুত্বে হুগলীর ভূমিকা প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যেতে পারে। বিদেশী শাসনের ঊষালগ্ন থেকে হুগলী শাসকবর্গের কাছে এক অতি প্রিয় স্থানের নাম। ভাগীরথী তীরের এই জনপদে হোগলার প্রাচুর্য থেকেই নাকি হুগলী নামের জন্ম। অন্য মতও চালু আছে এ-নাম সম্পর্কে।

সুহ্মভূমির অন্তর্ভূত এই ভূখণ্ড মধ্য ও পরমধ্যযুগের বেশ কিছু কীর্তি সাক্ষ্য বুকে নিয়ে জেগে আছে। নাথযোগী সম্প্রদায়ের মহাতীর্থ মহানাদ থেকে খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর একপাদ ভৈরব মূর্তি, কয়েকটি বিষ্ণু মূর্তি এবং প্রাগৈতিহাসিক আয়ুধের সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়াও পরমধ্যযুগের স্থাপত্যনমুনা হুগলীর মন্দির, মসজিদগুলো থেকে আজও সর্বাংশে নিশ্চিহ্ন হয় নি। হুগলীর প্রত্নদ্রব্য দেখার পর আমাদের ইচ্ছা হয় সুন্দরবনের দিকে ঘুরে আসতে, যে সুন্দরবনে সাম্প্রতিককালে ঘটেছে বিস্ময়কর পরিবর্তন।

চব্বিশপরগণার নিম্নভূমি সুন্দরবন অঞ্চলে মধ্যযুগে নানা পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। এই অঞ্চলের পশ্চিমে পঞ্চম ষষ্ঠ শতক থেকে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক অবধি ঘন বসতিপূর্ণ জনপদের চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। পুরাপ্রেমিক স্বর্গীয় কালিদাস দত্ত উইলকক্স সাহেবের অভিমত অনুসরণ করে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিম শেষপ্রান্তের ভূতাত্ত্বিক বয়ঃসীমা অনুসন্ধানের প্রয়াস পেয়েছিলেন। বায়ুপুরাণে বলা হয়েছে, নরপতি ভগীরথ এই প্রদেশে গঙ্গা এনেছিলেন। ভাগীরথীর উৎপত্তির কাহিনী ইতিপূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। বাল্মীকি রামায়ণে বলা হয়েছে যে গঙ্গা আসার আগেও বঙ্গোপসাগরের তীরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় জনপদের অস্তিত্ব ছিল এবং মহর্ষি কপিল এখানে এসেই তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। যখন

গুর্ডহাম এখানে ভূতাত্ত্বিক সন্ধান চালান তখন তিনি অনুমান করেছিলেন যে, অতীতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ভূমিখণ্ডের বারবার অবনমন ঘটেছে। তিনি বলেছেন, সম্ভবত প্রাচীনকালে এখানে ছোট-ছোট পাহাড় ছিল, অবনমনে সেই পাহাড় মজ্জিত হয়েছে এবং তার উপর পলির পর পলি পড়ে ভূখণ্ডের বর্তমান চেহারা ফুটে বের হয়েছে।

এই স্থানের বিভিন্ন জায়গায় বনের ভিতরে পুকুর খুঁড়তে গিয়ে পাল-সেন যুগের অজস্র পুরাদ্রব্য পাওয়া গেছে। পোড়ামাটির অগণিত মূর্তি ও অন্যান্য সামগ্রী যথা চব্বিশ পরগণাস্থ জয়নগর থানার কাশীপুর গ্রামের সূর্য মূর্তি (আনুমানিক ষষ্ঠ শতক), বকুলতলা গ্রামের লক্ষ্মণ সেনের পাট্টালি (দ্বাদশ শতক), মলয়ের জয়নাগের তাম্রপট্টলী (সপ্তম শতক), ডোম্মণ পালের পাট্টালী (দ্বাদশ শতক) ও মাটির শীলমোহর, খাড়ি পরগণার পাথরের মূর্তি, ভাঙামন্দির, গুপ্তমুদ্রা সমস্তই সমৃদ্ধ জনপদের ইঙ্গিত করে। এই জেলার বোড়ালে পাওয়া গেছে নানা পুরাবস্তু। হরিনারায়ণপুর ও দেউলপোতায় পাওয়া নিদর্শনগুলো এই অঞ্চলের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ করেছে। স্বর্গীয় দত্ত মহাশয় হরিনারায়ণপুর ও দেউলপোতার নানাস্থান থেকে শতাধিক প্রস্তর আয়ুধ ও আদিম সমাজের ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলক ও হাড়ের প্রত্নদ্রব্য পেয়েছেন। খ্রীষ্টজন্মের পূর্ববর্তীকালের পুরাসামগ্রীতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা আজ একটি উল্লেখযোগ্য স্থান নিয়ে আছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজ বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া অঞ্চলের খনন কাজ। এখানে যে সব জিনিস পাওয়া গেছে তা অনেককে বিস্মিত করেছে। বিভাগীয় অধিকারিক শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত এই সম্পর্কে বলেছেন যে, শুশুনিয়া অঞ্চলে যে ধরণের প্রত্নাশ্মর আয়ুধ পাওয়া গেছে তাতে প্রমাণিত হয় যে অন্ততঃ এক লক্ষ বছর আগে শুশুনিয়া পাহাড়ের চারপাশের নদনদীর তীরে বসবাসকারী মানুষের সংস্কৃতি এশিয়া-ইউরোপ এবং আফ্রিকার প্লিস্টোসীন অথবা কোয়াটেরনারী যুগের বিভিন্ন সুপরিচিত প্রত্নাশ্মীয় জীবনধারার সঙ্গে তুলনীয়। অর্থাৎ আগামী দিনে প্রাচীন গোলার্ধের আদি প্রত্নাশ্মীয় আয়ুধ নির্মাণক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনাসূত্রে শুশুনিয়া হয়ত বিশেষ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

শুশুনিয়া খনন ও তার আশেপাশের পুরাবৃত্তের নিদর্শনাদি দেখার পর আমরা চলে আসব কর্ণসুবর্ণ। হিউয়েনসাঙ তাঁর বৃত্তান্তে বলেছেন যে, এই খানে অনেক বৌদ্ধবিহার ও স্তূপ এবং দেবমন্দিরের অস্তিত্ব ছিল। তাদের

মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য হল মহাবিহার রক্তমৃত্তিকা (লো-তো-উই-চি বা কি-তো-মু-চি)। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে বুদ্ধদেব স্বয়ং এখানে সাতদিন অবস্থান করে ধর্মপ্রচার করে ছিলেন।

হিউয়েনসাঙের এই বিবরণীর উপর ভরসা করে কর্ণসুবর্ণের অবস্থান যথাযথ নির্দেশ করার জন্য বহুদিন থেকে চেষ্টা চলছে। প্রায় বছর দশেক আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর সুধীররঞ্জন দাসের পরিচালনায় রাজবাড়ী ডাঙ্গা অঞ্চলে এক অনুসন্ধান কাজ অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুসন্ধানের ফলে তিনটি সাংস্কৃতিক যুগের নানা উপকরণ পাওয়া গেছে। এখানে প্রাপ্ত ছয়টি বিভিন্ন ধরণের ও পর্যায়ের বাড়িঘরের ধ্বংসাবশেষ থেকে বৌদ্ধবিহারের স্তূপভিত্তি স্পষ্ট হয়েছে। লিপিযুক্ত অসংখ্য পোড়ামাটির শীলমোহরে (৬ষ্ঠ-৯ম শতাব্দী) বৌদ্ধধর্মের নানামন্ত্র লিখিত আছে। ডিম্বাকৃতি একটি শীলমোহরের ওপরদিকে মাঝখানে ধর্মচক্র এবং দুপাশে দুটি হরিণের মূর্তি, নীচে লেখা এ মূর্তির 'শ্রীরক্তমৃত্তিকা মহাটবহা, রিকা আর্যভিক্ষু সঙ্ঘস্য।' হাতে এবং ছাঁচেগড়া পোড়ামাটির মূর্তি, স্টাকোর তৈরী মানুষের মাথা, চিত্রিত মৃৎপাত্র, তামা এবং ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তি প্রভৃতিও পাওয়া গেছে এই ভূখণ্ডে। অধ্যাপক দাস বলেছেন যে কর্ণসুবর্ণ মহানগরীর অধিকাংশ ভাগীরথী গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নসমীক্ষাকে পশ্চাতে রেখে আবার আমরা রাজ্য সরকারের প্রত্নসমীক্ষার খোঁজ নিতে পারি। এবার যাব উত্তরবঙ্গে।

এই ভূমিখণ্ডের করতোয়া পুনর্ভবা, আত্রেয়ী, মহানন্দা, কালিন্দী, বলভী, গড়ই, কুমারী, পদ্মা, ত্রিস্রোতা, জলঢাকা-শিঙ্গিমারী, ধরলা, তোর্শা, ঘর্ঘরিয়া, কালজানি, রায়দক গদাধর প্রভৃতি নদনদীসমূহ নানা উত্থানপতনের সাক্ষী, নানা ভাঙাগড়ার অংশীদার। প্রাচীন বরেন্দ্রী তথা বগুড়া-দিনাজপুর রাজসাহী ও পাবনা এই সব নদনদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, এই সব স্থান পুরাবৃত্তের উপকরণে সমৃদ্ধ। মধ্যযুগীয় ইতিহাস, এবং কুলজীগ্রন্থে বরেন্দ্রী ও বরেন্দ্রর উল্লেখ আছে। লোকস্মৃতিতে বরেন্দ্রী এবং বরেন্দ্রর ঐতিহ্য বরাবর জাগরূক ছিল। উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি নামকরণ এই লোকস্মৃতিরই শিক্ষিত প্রকাশ। পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি, দার্জিলিঙ, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর ও কুচবিহার উত্তরবঙ্গে অবস্থিত। প্রাচীন গৌড় এই ভূখণ্ডের অনেকটা জায়গা জুড়ে ছিল। ১৮৩৫ সনে লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলে একটি বার্ষিক চুক্তির বিনিময়ে সিকিমরাজের নিকট থেকে দার্জিলিঙ,

এবং ১৮৬৪ খ্রীঃ ভূটানযুদ্ধের ফলে দুয়ারের কালিম্পং এই দুই স্থান মিলে বর্তমান দার্জিলিঙ, উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়। দুয়ারের দক্ষিণাংশ এবং রংপুর জেলার কতকাংশ নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলার সৃষ্টি হয়েছে ১৮৬৯ সনে। এই জেলাও পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে অবস্থিত এই ভূখণ্ডের মহাস্থানগড়ের ব্রাহ্মীলিপি বাঙলার প্রাচীন ইতিহাসের অনেক জট খুলতে সাহায্য করেছে। চতুর্থ শতকের এই লিপিতে জানা গেছে যে পুণ্ড্র বা বরেন্দ্রী পর্যন্ত মৌর্যাধিকার বিস্তৃত হয়েছিল। ষড়বর্গীয় ভিক্ষুসঙ্ঘকে তেল ও ঘি রাজকোষ থেকে দেবার ব্যবস্থা ছিল। জলপ্লাবন, গৃহদাহ এবং শুকপক্ষীর উপদ্রবজনিত শস্যহানির জন্য প্রজাসাধারণকে রক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। পুণ্ড্রনগরে ভিক্ষুসঙ্ঘ চতুর্থ শতকে সঙ্ঘারাম স্থাপন করেছিলেন বলে জানা গেছে। পুরাতত্ত্ব খননের পক্ষে এই ভূমিখণ্ড আদর্শ স্থানীয়।

পশ্চিমবঙ্গের পুরাতত্ত্বের অধিকার এই অনুমানকে ভিত্তি করেই খনন কাজে লিপ্ত হন, এবং অনুসন্ধানান্তে জঙ্গলের মধ্য থেকে গুপ্তযুগের স্থাপত্যের সন্ধান বের করেন। শ্বাপদসঙ্কুল বনের মধ্যে ভূটান পাহাড়ের কোলঘেঁষা এই প্রাচীন স্থাপত্যটি একটি কেল্লা বলে চিহ্নিত হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলার আধ বর্গ মাইল জায়গা জুড়ে যে স্থাপত্য এতকাল চিলাপাটার জঙ্গলে লুকান ছিল রাজ্যের পুরাতত্ত্বের অধিকারিক তাকে নলরাজারগড় বলে অভিহিত করেছেন তাঁর প্রতিবেদনে।

এইসব অনুসন্ধান, খনন, ও উৎখননের ফলে পশ্চিম বাঙলায় বেণ্টবার মুদ্রার দেখা না মিললেও পরবর্তী পাঞ্চমার্ক মুদ্রা বেশ কিছুপরিমাণে পাওয়া গেছে। মঙ্গলকোট, চন্দ্রকেতুগড়, হরিনারায়ণপুর এবং আটঘরা প্রভৃতি স্থান থেকে যে সব মুদ্রা পাওয়া গেছে. তার চিত্রনে জলযান অঙ্কন একটি লক্ষণীয় ব্যাপার। এর পরবর্তী স্তরের কপারকাস্ট (সুঙ্গ ও কুষাণ আমল) মুদ্রারও নিদর্শন মিলেছে। খাঁটি কুষাণ মুদ্রা পাওয়া গেছে মহাস্থানগড়ে। গুপ্তযুগের পুরীকুষাণ মুদ্রা পাওয়া. গেছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কোন কোন অঞ্চল থেকে। প্রাপ্ত মুদ্রার সবচাইতে উল্লেখ-যোগ্য মুদ্রা গুপ্ত যুগের। চব্বিশ পরগণা এবং বর্ধমানের কয়েকটি স্থান থেকে এই বিশেষ বিশেষ মুদ্রা পাওয়া গেছে। সোনা এবং রূপার তৈরী এই গুপ্ত মুদ্রার অধিকাংশই কুমারগুপ্তের রাজত্বের। এ ছাড়া শৈব সম্রাট শশাঙ্কের শিবমূর্তি মুদ্রাও পাওয়া গেছে। বাইরের কোন কোন রাজার কিছু কিছু মুদ্রাও বাঙলাদেশে পাওয়া গেছে। অনুমিত হয় বিদেশীদের

সঙ্গে এই ভূখণ্ডের অধিবাসীদের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক লেনদেন ছিল। ছিল বলেই বাঙলার বাইরের কিছু মুদ্রার সন্ধান মিলেছে।

পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে মুদ্রা ছাড়া আরও যেসব উপাদান পাওয়া গেছে তার মধ্যে পোড়ামাটির কাজ বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। পাথর কুঁদে কাজ করতে যে পয়সা, পরিশ্রম এবং সময়ের প্রয়োজন, বলাই বাহুল্য, সাধারণ মানুষের সীমার মধ্যে তা কোনদিনই ছিল না, আজও নেই। তাই এখানে সহজলভ্য মাটি নিয়ে তাকে পুড়িয়ে পাথরের মত পাকাপোক্ত করে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে সেই আদিম যুগ থেকে। তাছাড়া শিল্পকাজের সুবিধার দিক থেকেও অনেকক্ষেত্রে পোড়ামাটি প্রাধান্য পেয়েছে। বাঙলাদেশের নানা খনন উৎখননে যে পরিমাণ পোড়ামাটির পুরাদ্রব্য আবিষ্কৃত হয়েছে তাকে মোটামুটি কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বা অন্যান্য উপায়ে প্রাপ্ত মূর্তি বা অন্য সামগ্রীকে একমাত্র সৌসাদৃশ্যতত্ত্বের ভিত্তিতে এই পর্যায়-বিভাগের মধ্যে আনা যেতে পারে। এ পর্যন্ত যত পোড়ামাটির প্রত্নসম্ভার পাওয়া গেছে তার মধ্যে (১) গহনা (২) কোমরবন্ধ জাতীয় অলংকরণ (৩) নানাধরণের মৃৎপাত্র (৪) পোড়ামাটির ফলক (৫) পোড়োমাটির খেলনা গাড়ী (৬) শীলমোহর (৭) দুঅংশ জোড়া ফাঁপা মূর্তি (৮) ইট এবং টালি এবং (৯) এক ঢালাইয়ের নিরেট মূর্তি উল্লেখযোগ্য।

অন্ততঃ খ্রীঃ পূর্ব ৭ম থেকে সুরু করে ১৫শতক পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে এবং আরও পরের পোড়ামাটির বিভিন্ন নিদর্শন নমুনা এ পর্যন্ত সংগৃহীত হয়েছে বাঙলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। প্রসঙ্গত পুরাপ্রেমিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি উদ্ধারের লোভ সংবরণ করা গেল না। "বহুদিন পরে, প্রায় সহস্র সহস্র বৎসর পরে, সে আবার দেখে নয়নময় হইয়া বাঙলার অতীতকীর্তির চিতাচুল্লী হইতে সমাহৃত অর্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড পরিদর্শনের ন্যায় সে আবার দেখে"। অনুসন্ধানী গবেষকদের এইরূপ দেখার ফলে শুধু পোড়ামাটি নয় বাঙলাদেশে পাল-সেন যুগের দক্ষ ভাস্কর্যের প্রচুর মূর্তিও আবিষ্কৃত হয়েছে।

বাঙলায় যে পরিমাণ পাল-সেন মূর্তি পাওয়া গেছে তা বিস্ময়কর। পোড়া মাটির দেশে পাথরের অভাব তাই ঐ মাধ্যমটি স্বভাবতঃই ব্যয়সাধ্য। তৎসত্ত্বেও যত সংখ্যক ভাস্কর্যের সন্ধান মিলেছে শুধু সংখ্যার কথা বিবেচনা করলে বিস্মিত হতে হয়। এত বিপুল অর্থব্যয়ে যে ভাস্কর্য তৈরী হয়েছিল

সেযুগের সমাজব্যবস্থা না-জানি ছিল কতই সমৃদ্ধ। অবশ্য তৎকালীন সমাজ-চিত্র আমাদের কাছে নিতান্তই অস্পষ্ট বলে আমাদের বিস্ময়ের এমন উগ্র ভূমিকা। একএকটি মূর্তি গড়তে যে বিপুল অর্থ ব্যয়িত হয়েছে, সেকথা চিন্তা করলে বিস্মিত না হয়ে পারাই যায় না। পাথর বাছাই থেকে শিল্পীর দক্ষতা পর্যন্ত—বিস্ময় আগাগোড়া।

বাঙলাদেশে বিষ্ণু মূর্তি (পাল-সেন) সব চাইতে বেশী সংখ্যায় পাওয়া গেছে বলে প্রচলিত ধারণা। এ ধারণার যাঁরা পোষক তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা অটুট রেখে যদি বিনীত অনুরোধ করি আসুন বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া ঘুরে আসি, দেখে আসি আপনাদের ধারণা ঠিক কিনা। তবে কি তাঁরা খুব অসন্তুষ্ট হবেন? এই অনুরোধ এ জন্য—উল্লিখিত ভূখণ্ডে যে ব্যাপক জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি ছড়িয়ে আছে তার সংখ্যা নির্ণীত এখনও হয় নি। এইসব তীর্থঙ্কর মূর্তি অবশ্যই দশম-দ্বাদশ শতকের। আশঙ্কা করি যে এই মূর্তির সংখ্যা নিরূপিত হলে, প্রাপ্ত মূর্তির সংখ্যা গণনায় হয়ত বা বিষ্ণু মূর্তিকে ছাড়িয়ে যাবে। এবং তা হলে অনেকের প্রচলিত ধারণাও পালটাতে হবে।

এই প্রসঙ্গে আমরা যেন ভুলে না যাই যে বাঙলার লোকশিল্পের ধারার সঙ্গে দশম-দ্বাদশ শতকের ভাস্কর্যধারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। মঠ এবং রাজতন্ত্রের অনুশাসনে এই ভাস্কর্যের সৃষ্টি এবং তা লোকসমাজের সাধসাধ্যের বাইরের সামগ্রী। এখানে শিল্পীরও স্বাধীনতা রক্ষিত হয় নি। অর্ডার মাফিক কাজ করে নগদ বিদায় পেয়েছেন শিল্পী। কিন্তু পোড়ামাটির কাজে শিল্পীর সচেতনা, স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত। তাই পোড়ামাটির জন্য খাঁটি বাঙালী জনমানসের মন ও প্রাণের অভিব্যক্তি হিসাবে গ্রহণীয়। বাঙলার লোকসমাজের জীবনযাত্রা থেকে সুরু করে মহাকাব্য পুরাণের নানান মনোহর দৃশ্য দগ্ধমৃত্তিকার ফলকে অঙ্কিত করে আমাদের সূত্রধর সমাজ পর-মধ্যযুগের যে বিচিত্র শিল্প-নমুনা রেখে গেছেন তা যে কোন নান্দনিক নয়নকে তৃপ্তি দেয় বলেই বর্তমান আলোচনায় তার কথা এসে পড়ে। জেলায়-জেলায় গ্রামে-মাঠে-পথে অবহেলার মধ্যে বট-অশ্বত্থ-বৃক্ষাদির সঙ্গে লড়াই করে আজও কয়েকটি দেবায়তন অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। দশম শতাব্দী থেকে সুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের তৈরী মন্দিরে পোড়ামাটির যে কারু কাজ, সুখের কথা, সাম্প্রতিককালে সেদিকে অনেকেরই নজর পড়ছে। নজর পড়েছে এর গঠনিক সৌকর্যের দিকে। লোকশিল্পের নিদর্শন হিসাবে গুগুলোর প্রতি অনেকেই বিশেষ শ্রদ্ধাবান। পুরাতত্ত্বের সঙ্গে লোকবৃত্তের

সংযোগের অন্যতম একটি সেতুবন্ধ এই পোড়ামাটি-শিল্প। মন্দির-গঠন সম্পর্কিত নানাবিধ লোককথা ও বিশ্বাস, লোক-মানসের চিন্তাভাবনা দিন-লিপির নানা তথ্যাদি পুরাসামগ্রীর বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে লুকিয়ে আছে। সমাজ ইতিহাসের মালাগাঁথার জন্য এইসব আহৃত, উদ্ধারিত ও সংরক্ষিত পুরাসামগ্রী লোকবৃত্তবিদদের কাছে পুরাতাত্ত্বিকদের কাজে লাগা উপাদানের মতই প্রয়োজনীয় এবং এইখানেই পুরাবৃত্তের সঙ্গে লোকবৃত্তের সদ্ভাব। তাছাড়া স্থানমাহাত্ম্য বা প্রাচীন ভূমির সঙ্গে জনমানবের যোগা-যোগের কথা ও কাহিনীও পুরাতত্ত্বের অন্বেষণে যতটা না স্পষ্ট লোকবৃত্ত তথা লোকশ্রুতি, লোককাহিনী ও কিংবদন্তী, ছড়া, প্রবাদ, প্রবচনে ততোধিক সংরক্ষ। ভূমির সঙ্গে মানুষের যোগ, ভূমির উর্বরতার অনুর্বরতার প্রতি মানুষের চিন্তা প্রভৃতিও এই অনুসন্ধানে জ্ঞাতই হওয়া যায়। উর্বর ও সচল মানুষের সজাগ দৃষ্টি এই ভূমির উপর। তাই অন্যধর্মের বিজয়ী বিজেতা-দের ধর্মীয় স্থানগুলোকে নিজধর্মের পীঠস্থানে পরিণত করেছেন। ভিন্নধর্মের পীঠস্থানকে ঘৃণা করে দূরে ঠেলে না দিয়ে ভূমির উর্বরতা ও সচলতার দরুণ ঐসব পীঠস্থানকেই আপনাদের মত করে ঢেলে সাজিয়ে নিয়েছেন। তা করার দরুনও অনেক লোকবৃত্তের সৃষ্টি হয়েছে। এই সব লোকবৃত্তের সংগ্রহ ও আবিষ্কারে পুরাতত্ত্বের অন্বেষকদের সাহায্য নেওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়। লোকবৃত্ত ও পুরাবৃত্তের আত্মীয়তা এইভাবেই গড়ে উঠেছে।

এখানে একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়েরও উল্লেখ প্রয়োজন। তা বাঙলার মন্দিরের শিল্পরীতি। বাঙলার মন্দির সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সাম্প্রতিককালের কিছু কিছু মন্দির-গবেষক বলতে সুরু করেছেন যে ষোড়শ শতকের পরবর্তী হিন্দু মন্দিরগুলোর অধিকাংশ নাকি মসজিদ স্থাপত্যের দ্বারা প্রভাবিত। গৌড় বা উত্তরবঙ্গের কিছু কিছু মসজিদের গঠনরীতি পর্যালোচনা করে এই পণ্ডিতবর্গ এ সিদ্ধান্তে এসেছেন। অনেকের কাছেই তাঁদের এ সিদ্ধান্ত মর্মান্তিক। বাঙলার মন্দির যদি মসজিদের অনুকরণেই স্থাপিত হয়ে থাকে তবে ধরে নিতে হবে যে ভারতের অপরাপর রাজ্যের মসজিদ ও বাঙলার মসজিদের টাইপ বা রীতি একই হবে। অর্থাৎ সব জায়গার মসজিদ স্থাপত্যে একই রীতি অনুসৃত হবে। কিন্তু এ কথা কি অস্বীকার করা যায় যে বাঙলার মসজিদের সঙ্গে অপরাপর রাজ্যের মসজিদের মিল নেই। কেন নেই? মন্দির মসজিদ স্থাপত্যানুকরণে গঠিত এই চিন্তাভাবনার পণ্ডিত গবেষকদের কাছে এই প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া যাবে কি?

তাছাড়া, এই মন্দির-গবেষকেরা তাঁদের মন্দির আলোচনায় কেন কয়েক শতাব্দীর পিছনের মন্দির, অর্থাৎ দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর মন্দিরের কথা বলছেন না? এইসব মন্দিরও কি মসজিদ স্থাপত্যের অনুসারী? যদি না হয় তবে এইযুগের মন্দিরের সঙ্গে উত্তরবঙ্গে ষোড়শ শতকের মন্দিরের তফাৎ কোথায়?

আমাদের জ্ঞান মতো আমরা জানি যে বাঙলার মন্দির বাঙালীর ঘরবাড়ীর প্যাটার্ণে বা অনুকরণে তৈরী। যেহেতু মন্দির দেবায়তন, সেজন্য দেবগৃহ বা মন্দিরকে যতদূর সম্ভব শোভিত ও সুদৃশ্য করা হয়ে থাকে। গৃহস্থ ঘর থেকে মন্দিরকে একটু পৃথক করে দেখাবার প্রচেষ্টা সেখানে স্পষ্ট। বাঙলার আদি এবং অকৃত্রিম চালামন্দিরের সৃষ্টি এভাবেই। এবং এখানেই বাঙালীর বৈশিষ্ট্য। সুলতান আগমনের বহুপূর্ব থেকেই এ ধরণের মন্দির বাঙলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যার পাথুরে প্রমাণ পুরারসিকদের অজানা নয়। এবং যার অবশেষ এখনও অস্তিত্ব রক্ষা করছে বাঙলার জনপদে। এই মন্দিরের যাঁরা স্রষ্টা তাঁরা বা তাঁদের বংশধরেরাই মসজিদ সৃষ্টি করেছেন। এবং স্বভাবতঃই তাঁদের সৃষ্টিতে হিন্দু মন্দিরের গঠনশৈলী ও নির্মাণরীতির ছাপ পড়েছে। মসজিদ থেকে মন্দিরের সৃষ্টি—এ ভাবনায় ভাবিত গবেষকদের কেউই নিশ্চয় দাবী করতে পারেন না যে তুর্কী বিজেতারা এদেশে আসার সময় মসজিদ তৈরী করার জন্য তাঁদের সঙ্গে রাজমিস্ত্রী নিয়ে এসেছিলেন। যদি তা না হয় তবে স্থানীয় মিস্ত্রীদের দিয়েই, যাঁরা যে কাজে পারদর্শী ছিলেন বা যাঁরা ছিলেন মন্দিরের স্থপতি তাঁদের দিয়েই মসজিদ সৃষ্টি হয়েছে। স্বভাবতঃই তৎকালীন হিন্দুমিস্ত্রী মসজিদ তৈয়ারী করতে ঐতিহ্যানুগত মন্দির স্থাপত্য শিল্পের সাহায্য গ্রহণ করেছেন, মন্দিরের ঢঙে মসজিদ গড়েছেন। পরে এই সূত্রধর, মিস্ত্রী এবং রাজমিস্ত্রীদের অনেকে অন্যান্য বহু হিন্দু অধিবাসীদের মতই ধর্মান্তরিত হয়েছেন। অনেককে লোভ দেখিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করান হয়েছে। কারণ কাফের-সৃষ্ট মসজিদে নামাজ পড়তে সাচ্চা মুসলমান মৌলানা মৌলবীদের অনীহার কারণ ছিল। লোভে পড়ে ধর্মান্তরিত হলেও তাঁদের অনেকেই জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার ও সাধনাকে একেবারে ধুয়েমুছে ফেলতে পারেন নি। পারেন নি বলেই মসজিদ স্থাপত্যে মন্দিরের গন্ধ বর্তমান। পারেন নি বলেই বাঙলার মসজিদ ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মসজিদ অপেক্ষা স্বতন্ত্র। এতৎসত্ত্বেও স্বীকার করতে বাধা নেই যে মসজিদ শিল্পকরণে যেমন কিছু ইসলামী 'মটিফ' বা লতাপাতা ইত্যাদি নকশা ঢুকেছে, হিন্দু

মন্দিরেও তেমনি লতাপাতা ফুলের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এবং তা ঘটেছে শিল্পী বা রাজমিস্ত্রীর সহজাত শিল্পসৃষ্টির প্রেরণায়। তেমনি রাজমিস্ত্রীদের ইসলামধর্ম গ্রহণের পরে সৃষ্ট মন্দিরে ঢুকেছে ইসলামী 'মটিফ'। এখানেও সে 'গিভ অ্যাণ্ড টেক' অর্থাৎ হিন্দুর কিছু মসজিদে দাও, মুসলমানের কিছু মন্দিরে দাও,—সেই প্রাচীন থিওরী। মন্দিরকে মসজিদে, মন্দিরকে কবরে রূপান্তরিত করার কাহিনী কোন নতুন ঘটনা নয়। সম্প্রতিকালে এ দাবী করা হয়েছে যে তাজমহল' পূর্বে হিন্দুরই মন্দির ছিল। সম্রাট শাহজাহান সে হিন্দুমন্দিরকেই কবরে পরিণত করেছেন এবং এই কবরকে বাঙলার কবি 'কবর যে বলে বলুক তোমায় আমি জানি তুমি মন্দির' বলে বন্দনা করেছেন। যাইহোক, লর্ড কানিংহাম হাতে-কলমে যে কাজে নেমেছিলেন মুষ্টিমেয় সমর্থক নিয়ে তা আজ পরিব্যাপ্ত হয়েছে। পুরাবৃত্তের কাজ ক্রম-জনপ্রিয়তা অর্জন করে চলেছে। সরকারও সচেতনভাবে পুরাসামগ্রীর উদ্ধার, রক্ষণের কাজে চেষ্টিত হয়েছেন। কাজ চলছে, চলবে ততদিন যতদিন মানব সভ্যতা একেবারে বিলীন হয়ে না যায়। প্রতিনিয়তই কোন না-কোন সভ্যতার দান পুরাবৃত্তের রাজ্যে চলে যাচ্ছে, চলে যাবে। তাই সময়ে অসময়ে অন্ধকার অতীতের টুকরো টুকরো খবর আমাদের চমকিত করে তোলে। এই সব খুচরো সংবাদফুলকে নিয়ে যাঁরা ইতিহাসের মালা গাঁথেন তাঁরা ঐতিহাসিক, তাঁরা পুরাতাত্ত্বিক, তাঁরা নৃ-তাত্ত্বিক ও লোকবৃত্তের গবেষক। আগামী দিনের প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে প্রাপ্ত প্রত্নসম্ভার দিয়ে, লোকবৃত্তের গবেষণার উপাদান দিয়ে, নৃ-তত্ত্ববিদের সমাজ ব্যাখা দিয়ে অন্ধকার ইতিহাসের পাতাকে আকাশ প্রদীপের আলোকে আলোকিত করেন তাঁরা। সে প্রদীপের সলতে ও তেল জোগান দেয় বিভিন্ন গ্রন্থ ও সংগ্রহশালা, জোগান দেন গবেষক ও অন্বেষক সম্প্রদায়। তাই গ্রন্থশালার ও সংগ্রহশালার ভূমিকা শ্রদ্ধেয় এবং স্মরণীয়।

॥ ৪ ॥

লোক-জীবনের সার্বিক পরিচয় পাওয়া যায় লোক-সমাজের জীবনাচরণে, তাদের উৎসব অনুষ্ঠান ব্রত পান ভোজন ও ক্রীড়ানুষ্ঠানে। দেশ ও কালভেদে আচারানুষ্ঠানের চরিত্র ও রূপ বদলায়।

স্বভাবতই, লোক উৎসবের জগৎ ছোট, চরিত্র স্থানীয় এবং আঞ্চলিক। তাই লোক উৎসবের বহু উৎসব বৃহত্তর জন উৎসবে পরিণত হয় নি বা হতে পারে নি। অথচ এক এক অঞ্চলে বংশানুক্রমে প্রচলিত উৎসব আপনার জীবনীশক্তির সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। পরিবর্তন ও রূপান্তরের মধ্য দিয়ে লোক উৎসবের বহু উৎসব ব্রাহ্মণ্য উৎসবের সঙ্গেও গিয়ে মিলিত হয়েছে, ব্রাহ্মণ্য উৎসবেরও কিছুকিছু যে বাঙলার লোক উৎসবে মিলেমিশে যায় নি, এমন নয়। এ দু'য়ের মধ্যে কার অনুপ্রবেশ কি ভাবে ঘটেছে, কোন উৎসবে কার কতটা অংশ, কোন উৎসব খাঁটি লৌকিক, কোন উৎসব খাঁটি ব্রাহ্মণ্য, কোন উৎসব অব্রাহ্মণ্য, কোন উৎসব অন-আর্য, কোন উৎসব বৈদিক তা পণ্ডিত গবেষকদের বিচার্য বিষয়।

উন্নতসমাজ ও লোকসমাজের মধ্যে একই উৎসব একই ঢঙে অনুষ্ঠিত হলেও উভয়ের চরিত্র ও পরিবেশনার মধ্যে তফাৎ লক্ষণীয়। লোক উৎসবে স্থানীয় লোকসমাজের ধ্যান, ধারণা, চিন্তা, ভাবনা, অভ্যাসাদির প্রতিফলন দেখা যায়। এ উৎসবের উৎসমুখ লোকসমাজ-ভিত্তিক না হলেও লোকচরিত্র বজায় থাকবেই। কিন্তু উন্নতসমাজের উৎসবানুষ্ঠান যে কোন স্থানেই অনুষ্ঠিত হোক না কেন তা শাস্ত্রীয় নিয়মকানুনের বন্ধনাধীন বলে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে আঞ্চলিকতা অপেক্ষা ব্রাহ্মণ্যশাসনের কথাই বেশী স্পষ্ট। শাস্ত্রের অনুশাসন প্রায়ই মানে না লোকসমাজ, তাই তারা নিজস্ব ধ্যান-ধারণামত তাদের উৎসব পরিকল্পনা করে। মনের গ্লানি ও সমস্ত প্রকার সঙ্কীর্ণতা বিসর্জন দিয়ে লোকসমাজ উৎসবে জমায়েত হয়। "আমার আনন্দে সকলের আনন্দ, আমার শুভে সকলের শুভ" এ-জাতীয় চেতনা তাদের চালিত করে উৎসব কেন্দ্রে। উৎসবের এই 'আমি' একক কোন ব্যক্তি নয়। আমার সংসার, আমার মা-বাপ-ভাই-বোন-শ্বশুর-শাশুড়ী-স্ত্রী-কন্যাদিকে নিয়ে এই 'আমি'। আমার কল্পনার ছোট্ট জগতের

আমি। এই লোক উৎসব লোক সংস্কৃতিরই একটি অঙ্গ। উভয়েই লোকবৃত্তের ছত্রছায়ায় লালিতপালিত এবং বর্ধিত।

লোক উৎসবের সঙ্গে লোকসংস্কৃতি তথা লোকবৃত্তের সম্পর্ক ঘোষণার শুরুতেই কৌতূহলী পাঠক জানতে চাইবেন লোকবৃত্ত কি? এ প্রশ্নের উত্তরে স্বভাবতই লোকবৃত্তের কোন ছাত্র লোকবৃত্তের আভিধানিক সংজ্ঞার দ্বারস্থ হবেন। কিন্তু বিপদ এখানেই। কারণ, লোকবৃত্ত বা Folk-Lore এর সংজ্ঞা নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিস্তর মতান্তর, এই মতান্তর শুধুমাত্র এক দেশের লোকবৃত্তবিদ্‌দের সঙ্গে অপর দেশের লোকবৃত্তবিদ্‌দেরই এমন নয়, পরন্তু, একই দেশের বিভিন্ন পণ্ডিত লোকবৃত্ত বা Folklore-এর ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্য উপস্থাপিত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ একখানি অতি পরিচিত গ্রন্থের নামোল্লেখ করা যেতে পারে: Standard Dictionary of Folklore: Mythology and Legend (1949)। এই গ্রন্থে Folklore বা লোকবৃত্তের ২১ প্রকার সংজ্ঞা আছে। সংজ্ঞা-রচয়িতা ২১ জন বিশেষজ্ঞের সকলেই মার্কিন পণ্ডিত। উল্লিখিত গ্রন্থ প্রকাশের পর প্রায় ২২ বৎসর অতিবাহিত হয়েছে এবং এতদিন ধরে ঐসব সংজ্ঞাকে আরও তীক্ষ্ণ এবং শাণিত করতে বিশ্বের পণ্ডিতমহল বিশেষ করে জার্মান, আমেরিকান ও ইউরোপের লোকবৃত্তের অধ্যাপক, গবেষক ও ছাত্রসমাজ নানা আলাপ আলোচনান্তে কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের প্রস্তাব রেখেছেন লোকবৃত্ত বিষয়ক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থের মাধ্যমে। তথাপি বোধহয় এখনও লোকবৃত্তের সর্ববাদীসম্মত কোন সংজ্ঞা গৃহীত হয়নি।

এ প্রসঙ্গে এ কথা মনে রাখা দরকার যে Folklore বলতে আমরা 'লোকবৃত্ত' শব্দটিকে ব্যবহার করেছি। লোককে বৃত্ত করে যে জ্ঞান তা-ই লোকবৃত্ত। এ-জ্ঞান ঐতিহ্যানুসারী সৃষ্টি বা কালের প্রবাহকে অতিক্রম করে জীবিত, এবং বস্তুতে, শিল্পে ও সাহিত্যে প্রতিরূপিত। বসতিপ্রথা, বিধি-নিষেধ, গার্হস্থ্য চিত্র-শিল্পকলা-বয়নরীতি, জীবন-ঘনিষ্ঠ নৃত্য-গীতাদি, সচেতন বা অবচেতনভাবে সংরক্ষিত লোকবিশ্বাস, অদ্বৈত প্রাকৃতিক বেষ্টনী ও ভাবাবেগে সংহত সমজাতীয় সহজ সরল মানুষের জীবনবোধ, অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান, সামাজিক রীতিনীতি, বসন-ভূষণের আকার-আকৃতি ও ব্যবহার প্রণালী, গ্রাম ও গৃহপ্রকল্পের আদর্শ, আচার-ব্যবহার, সাহিত্য এবং জীবনযাপনের জন্য উদ্ভাবিত যাবতীয় বস্তু, অর্থাৎ যেখানে সৃষ্টির স্পর্শ আছে এবং কালকে অতিক্রম করে সর্বকালে সাধারণ

মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার শক্তি আছে, সেই জ্ঞানই লোকবৃত্ত। লোকজীবনের অন্তর্গত সবকিছুর, লোকজীবনের সামগ্রিক পরিচয় পাই লোকবৃত্তে। জাতীয় মানুষের স্বরূপ-সন্ধানে লোকবৃত্তের তাৎপর্য অনুধাবনে, জাতিতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান লোকবৃত্তবিদের অন্যতম অবলম্বন।

লোকবৃত্তের গোটারূপ, চরিত্র বা Basic Conception নিয়ে বোধহয় বিভিন্ন পণ্ডিত, লোকবৃত্তবিদ বা উৎসাহী ছাত্র ও গবেষকদের মধ্যে দারুণ কোন মতভেদ নেই। লোকবৃত্তের কক্ষপথ তথা পরিধি ও বিস্তৃতি সম্পর্কে সমস্ত দেশের লোকবৃত্তবিদ্‌দেরই স্পষ্ট ধারণা আছে। কিন্তু মতান্তর হচ্ছে লোকবৃত্তকে আরও নির্দিষ্ট কোন বৈজ্ঞানিক গণ্ডীর মধ্যে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা নিয়ে। লোকবৃত্তকে জ্ঞানের রাজ্যের এমন এক কোঠায় স্থাপন করার জন্য যেখানে দেখামাত্রই চট করে চেনা যায় যে এটা লোকবৃত্ত ব্যতীত আর কিছুই নয়। এইভাবে সংজ্ঞায়িত ব্যবস্থা নিয়েই তাত্ত্বিক মতান্তর।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, Folklore তথা লোকবৃত্তের সংজ্ঞা রচয়িতাদের প্রায় সকলেই 'Folk' বা 'লোক'কে কেন্দ্র করে তারই পরিপ্রেক্ষিতে 'Folklore' বা 'লোকবৃত্তে'র ব্যাখ্যা রেখেছেন, এবং এঁদের প্রায় সকলেই 'Lore' বা 'জ্ঞান'কে রেখেছেন দূরে সরিয়ে। ফলে 'Folk' বা 'লোক' বলতে তাঁরা কি বোঝেন, কি কি বিশেষ গুণ বা যোগ্যতার অধিকারী মানব সমাজ 'লোক সমাজ' বলে বিবেচিত হবে তারই পরিপ্রেক্ষিতে 'Folklore'এর সংজ্ঞা রচনা করেছেন। সংজ্ঞা-রচকেরা প্রায়শই, 'Folk' বা লোক বলতে Unsophisticated people, Peasant group of rural society-র বেশী ভাবতে পারেন নি। কিন্তু ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যদি 'Folk' বা 'লোক' বলতে আরও বিস্তৃত পরিধির লোককে গ্রহণ করতে না পারি তবে ভারতের লোকসমাজের গোটা চরিত্র আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত হবে কিভাবে?



কারণ, এটা তো মানতেই হবে যে অদ্যাবধি আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকের হার শতকরা ৩৩ জনের অধিক নয়। শতকরা যে ৬৭ জন নিরক্ষর তাদের মধ্যে যারা ঐতিহ্য, প্রাচীনতা, মৌখিক আচার-আচরণে বিশ্বাসী, এবং এই জনসমষ্টির তথা সংখ্যাগরিষ্ঠের যারা জীবিকার জন্যে শহর ও নগরবাসী, তারা লোকসমাজভুক্ত হবে না কেন? পাশ্চাত্ত্যের সমাজ ব্যবস্থায় নিরক্ষরতা প্রায় নেই-ই। তাই তাদের দেখা 'লোক'-সমাজের সঙ্গে আমাদের সমাজের 'লোক'-এর তফাৎ হবেই, হতে বাধ্য। আমাদের শহরে নগরে যে অগুনতি মুটে, মজুর, শ্রমিক, হকার, কুলি-কামিন, ধোপা, নাপিত, মেথর, দাস-দাসী, মুচি, চণ্ডাল, দোকানদার, বিড়িওয়ালা, রিক্সাওয়ালা, পানওয়ালা, মাছওয়ালা, দুধওয়ালা, সব্‌জিওয়ালা, দধিবিক্রেতা, কাপড়বিক্রেতা, ড্রাইভার, কণ্ডাক্টর প্রভৃতি আছেন, যাঁদের অধিকাংশই অক্ষরজ্ঞানহীন, যাঁরা পিতৃ-পিতামহদের আচার-আচরণে আস্থাবান্, যাঁরা নগরসমাজের ভাষায় অশিক্ষিত, অসভ্য, অভদ্র ও গ্রাম্যতাদুষ্ট, যাঁরা নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা, আচার-বিচার, চিন্তা-ভাবনা ঐতিহ্য, সংস্কার, পূজা-পার্বণাদি নিয়ে দলবদ্ধভাবে দিনাতিপাত করছে, যাঁরা ছড়া, ধাঁধা, নানাবিধ মৌখিককথা, প্রবাদ-প্রবচন, গল্প-কাহিনীর চর্চা করছেন, লৌকিক মেজাজে হাসি-ঠাট্টা, রসিকতা নাচ গান বাজনা প্রভৃতিতে নিজস্ব ঢঙ ও বংশপরম্পরাগত চিন্তা-ভাবনায় নিজেদেরকে বিভোর করে মাতিয়ে রেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই 'লোক'সমাজের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, লোকবৃত্তের আওতায় লোক-সমাজকে আসতে গেলে মৌখিক ও ঐতিহ্যযুক্ত আচার-আচরণের দাবীদার হবার প্রাথমিক যোগ্যতা তো তাঁদের আছেই।

লোকবৃত্তের পণ্ডিতদের মতে Folklore বা লোকবৃত্ত চিহ্নিত করার কষ্টি-পাথর তথা মৌল দাবী—'মৌখিক' (Oral) এবং 'ঐতিহ্যসম্পন্ন' (Traditional) উপাদান, এই উপাদান কি শহরের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও উপরে বর্ণিত লোকসমাজের মধ্যে নেই? এবং এই উপাদানের পৃষ্ঠপোষকেরাই যদি লোকসমাজভুক্ত হবার দাবীদার হয়ে দাঁড়ান তবে ভারতবর্ষের এই অগুনতি নগরবাসীকে লোকসমাজের অন্তর্ভুক্ত করতে বাধা কোথায়?

আমাদের দেশে শুধুমাত্র কৃষিজীবী বা গ্রামীণ সম্প্রদায়কেই 'লোক' সমাজভুক্ত বলে চিহ্নিত করলে এক বৃহৎ জনগোষ্ঠিকে কি উপেক্ষা করা হয় না? উপেক্ষা করা হয় না তাদের সমৃদ্ধ লোকবৃত্তকে? তাছাড়া Peasant Society বা কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা শিক্ষিত এবং Rural Group বা গ্রামীণ সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন 'Folk' বা 'লোক'-এর বদলে তাঁদের

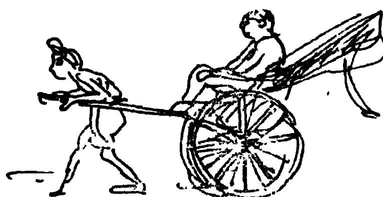
স্থান সভ্যসমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিদের সঙ্গে কেন একসঙ্গে উল্লিখিত হবে না? নিরক্ষরতা, অশিক্ষা, ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সরলতার নাম যখন 'Folk' বা 'লোক' তখন এইসব গুণসম্পন্ন শহরের মানুষেরা অর্থাৎ, শহরের নিরক্ষর ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান সম্প্রদায় লোকসমাজ-এর অংশীদার কেন হবেন না? জ্ঞানের আলো বা শিক্ষা যদি মানুষকে Sophisticated করে তোলে, এবং শহরের সেই Sophisticated লোকেদের বিপরীত নাম যদি Unsophisticated বা 'লোক' হয়, তবে সে Sophistication বা আলোর রশ্মি কৃষিজীবীর গৃহে প্রবেশ করলে সেই আলোকপ্রাপ্ত কৃষিজীবী-গ্রামবাসীদের লোক-সমাজভুক্ত মনে না করে শহরের সভ্য নাগরিকদের সঙ্গে ব্রাকেটান্বিত করতে বাধা কোথায়?

লোকবৃত্তকে আমরা যদি এবম্বিধ কাঠামোর মধ্যে ফেলতে পারি তবে দেখবো যাঁরা বলছেন, 'এখনই যতটা পার, যেরূপে পার উপাদান সংগ্রহ করে ফেল, নইলে আর তা পাওয়া যাবে না' তাঁরাও তাঁদের ভুল বুঝতে পারবেন। অবশ্য এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে উপাদান সংগ্রহের প্রয়োজন নেই। উপাদান সংগ্রহের প্রয়োজন সর্বদাই আছে এবং থাকবে। কিন্তু তাই বলে যেন-তেন-প্রকারেন যা হাতের কাছে পাওয়া যায় তাকেই বুঝে-না-বুঝে Folklore বা লোকবৃত্ত বলে চালাবার মধ্যে সার্থকতা দেখি না। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে লোকবৃত্তের উপাদান সংগ্রহ করা প্রয়োজন এবং সেজন্য উপযুক্ত শিক্ষারও প্রয়োজন আছে। তাড়াহুড়া করার মধ্যে বাহাদুরী যতটা দেখান যায় কাজ ততটা হয় না বলেই মনে করি। ভেজালের শিকার হবার মধ্যে কৃতিত্ব নেই। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে লোকবৃত্তের উপাদানও যে পরিবর্তিত হয় সে তো জানা কথাই। নতুন পরিবেশে নতুন লোকবৃত্তের জন্ম হয়ে থাকে। কাজেই 'এখনই সংগ্রহ করে না রাখলে আর লোকবৃত্ত আর পাওয়া যাবে না' এ আশঙ্কা ত অমূলক। ভ্রান্ত। যাইহোক, এতৎসম্পর্কিত যুক্তিতর্কের মধ্যে অনুপ্রবেশ না করেও শুধুমাত্র 'Folk' বা 'লোক' বলতে আমরা কি বুঝি, তার একটা সরল ভাষ্য এখানে নিবেদন করা যেতে পারে। এই ভাষ্য 'লোক' সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞানের সহায়ক হতে পারে এবং লোক-উৎসবের রসাস্বাদনেও তা সাহায্য করতে পারে।

"The term 'folk' can refer to any group of people whatsoever who share at least one common factor. It does not matter what linking factor is—it could be a common

occupation, language, religion—but what is important is that a group formed for whatever reason will have some tradition which it calls its own" (Alan Dundes). লোক সম্পর্কিত এই ভাষ্য আমাদের কাছে যুক্তিবহ বলেই মনে হয়।

ভারতবর্ষ গ্রামভিত্তিক দেশ। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, "India has a tradition of urban living and town planning which goes back 5000 years. The cities of Indus valley civilization, Mohenjo-Daro and Harappa flourished about 5000 years ago where large, well planned cities...Pataliputra of Chandragupta Maurya, Ujjain of the Guptas, Kanuj, Baneras, Mathura were some great cities. In the south great cities were built by mediaeval period by the Chalukyas, the Rastrakutas, the Chaulas, the Hoysalas and others" (M. S. Thacker) এইসব বা অন্যসব শহর এবং নগরে উপরে বর্ণিত সমাজের লোকও বসবাস করতেন বা করছেন যাঁরা নিরক্ষর কিন্তু লোকবৃত্তে সমৃদ্ধ। যাঁরা পিতৃপিতামহদের ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। এঁদেরই বংশধরেরা আজও নিজ নিজ ঐতিহ্য ও সংস্কার নিয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন পরিবেশে নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছেন। লোকবৃত্তের অধ্যয়নের মারফত এইসব সমাজের লোকদিগকে আমরা জানতে চেষ্টা করি, বুঝতে চেষ্টা করি। বোঝার জন্য যে উপাদান তা লোকবৃত্ত। লোকবৃত্ত নিয়ে তাই গবেষক গবেষণা করেন। লোকবৃত্তের উপাদান সেজন্য নির্ভেজাল হতেই হবে। নইলে গবেষণার ফল নির্ভুল হতে পারে না। এ



ধরণের প্রচুর উপাদান এখন সংগৃহীত হয়েছে। তাই এ কাজে এখন যা প্রাথমিক দরকার তা হচ্ছে সংগৃহীত উপাদানের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও পুনর্মূল্যায়ন...

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কোন একটি নিরীক্ষায় জানা গেছে ভারতবাসীদের মধ্যে গ্রাম ছেড়ে শহরে আসার বাসনা জাগ্রত হয় ১৯৩০ সনের কাছাকাছি সময় থেকে। তার আগে পর্যন্ত ভারতের নাগরিক লোকসংখ্যা ছিল শতকরা ১০ জন, ৯০ জন ছিল গ্রামবাসী। আধুনিক ভারতবর্ষের প্রায় পঞ্চাশকোটি মানুষের শতকরা মাত্র ১৮ জন শহরবাসী (৭৯ মিলিয়ান) এবং শিক্ষিতের হার ন্যূনাধিক শতকরা ৩৩ জন। শহরে বসবাসকারীদের মধ্যে শতকরা ৪৮ জন বাস করেন কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ, আমেদাবাদ, বাঙ্গালোর, পুণা, লক্ষ্ণৌ, কানপুর ও নাগপুরে। বাকী সব অন্যান্য শহর ও নগরে। বর্তমানে শহরে বসবাসকারী শিক্ষিত লোকের সংখ্যা শতকরা ২১ থেকে ৩৯ জনে উঠেছে। এখনও শতকরা ৬৭ জন অক্ষরজ্ঞানহীন। বিগত প্রায় চল্লিশ বৎসরের মধ্যে শতকরা যে ৮ জন নগরবাসী বাড়লো তারা এসেছে শহরের নবজাতক হিসাবে শতকরা ৩ জন, আর গ্রাম থেকে এসেছে শতকরা ৫ জন।

শহরের এই অধিবাসীদের একটা মোটা অংশ অশিক্ষিত এবং ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। এদের সঙ্গে বিগত প্রায় চল্লিশ বৎসরের আদান-প্রদান ও নতুন গ্রাম্য সমাজের যোগসাজসে যে নতুন শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজ গড়ে উঠেছে তাদের অনেকেই নাগরিক শিক্ষা, সভ্যতা ও জ্ঞানাহরণ সত্ত্বেও প্রাচীন ঐতিহ্যকে ভুলতে পারছে না। অনেকেই পুরাতন জগত, বংশপরম্পরার সংস্কার, আচার, বিচারকে অবজ্ঞা করতে ভয় পায়। অমঙ্গলের হাত থেকে উদ্ধার পেতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণাদিতে পূর্বপুরুষদের চলে-যাওয়া বা নির্দেশিত কক্ষপথের মধ্যে বিচরণ করতে অভিলাষী। যে কোন চক্ষুষ্মানব্যক্তি গঙ্গা, যমুনা, ভাগীরথী, করতোয়া, ত্রিস্রোতা, মহানন্দা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদী-পথের প্রতি কয়েকদিন সজাগদৃষ্টি রাখলে অথবা শহরে অধিষ্ঠিত কোন দেবমন্দির বা দেবস্থানের আনাচে-কানাচে কিছুদিন যাতায়াত করলেই দেখতে পাবেন যে এই নতুন নাগরিক সমাজ লৌকিক আচার-আচণের প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল, এবং লোকবৃত্ত এদের জীবনের কতটা অংশ জুড়ে আছে। কিছু শিক্ষা বা পশ্চিমীআলো এদের অনেককেই ঐতিহ্যবিমুখ করতে পারে নি, এদেরই অনেকে করে ষট্‌পূজা, গঙ্গা প্রভৃতি নদীস্নান করে উদযাপন করে বিভিন্ন ব্রত, অনুষ্ঠান। সশ্রদ্ধভাবে প্রতিপালন করে বিবাহ, সাধ, জন্মদিন, মুখেভাত প্রভৃতি জীবন-পরিক্রমার নানা ঐতিহ্যগত আচার-অনুষ্ঠান।

ব্যাপারটাকে আরও একটু পরিষ্কার করতে পুনরায় স্মরণ রাখা দরকার

যে লোকবৃত্তের তাত্ত্বিকব্যাখ্যায় বা মৌলচিন্তায় তফাত ছোটোখাটো। এবং এই তফাতও অনায়াসে এড়িয়ে চলা যেতে পারে যদি আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে আমরা 'Folk' বা 'লোক' সম্পর্কে অধ্যাপক ডাণ্ডেসের সঙ্গে সহমত প্রদর্শন করি। এই দৃষ্টিতে মতান্তর কিছু ফিকে হয়ে আসতে অবশ্যই পারে। 'লোক' বলতে এবং 'লোকসমাজ' ও 'লোকবৃত্ত' বলতে আমাদের জ্ঞানের গণ্ডী বিস্তৃত করে বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে লোকসমাজকে দেখে লোকজীবনকে উপলব্ধি করে অনায়াসেই বলতে পারি যে ঐতিহ্যযুক্ত দলবদ্ধ 'লোক' সম্পর্কিত যে-কোন জ্ঞানই লোকবৃত্ত। সেই জ্ঞান অন্বেষণ করার জন্য লোকবৃত্তের ছাত্র লোক-সমাজের কথা, কাহিনী, হাসি, ঠাট্টা, তামাসা, রসিকতা, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, প্রবাদ, প্রবচন, হেঁয়ালী, ধাঁধা, ছড়া, মন্ত্র, যাদু, তুকতাক্, কবিতা, গাথা, আশীর্বাদ, অভিশাপ, কুকথা, প্রতিজ্ঞা, মান, অপমান, সাজ-পোষাক আসবাব, বাসন, গৃহস্থালীর সামগ্রী, খাদ্য, পানীয়, ঔষধ, শিল্প-কলা, পূজা-অর্চনা, বিচার, আচার, বিশ্বাস, সংস্কার, নাচ, গান, উৎসব, অনুষ্ঠান ও নানাবিধ ক্রিয়াকর্মাদি অধ্যয়ন করেন। গবেষণা করেন শিষ্ট সমাজের সমাজ্ চিত্র, সামাজিক ইতিহাস, সামাজিক শাসন, অনুশাসন, শৃঙ্খলা, নিয়মকানুন, প্রাচীন ঐতিহ্য, দিনলিপি, নন্দনতত্ত্ব, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি যা নির্ভেজালভাবে লুক্কায়িত আছে স্ব স্ব সমাজের লোকবৃত্তের আঙ্গিনায়, নানাভাবে, নানারূপে ও বিচিত্রভঙ্গিতে। লোকবৃত্তের উপকরণসমূহ তাই লোক সম্পর্কিত, লোকজীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে। লোকবৃত্তের চর্চার মাধ্যমে লোকসমাজ সম্পর্কে সঠিক ও নির্ভেজাল তথ্য সর্বসাধারণ্যে উপহার দেন লোকবৃত্তবিদ্, এই উপহার দেবার প্রক্রিয়াকে বলা যেতে পারে লোকবৃত্তচর্চা।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে ইংরেজীতে 'Folklore' বলতে লোকবৃত্তের উপকরণ ও লোকবৃত্তচর্চা উভয়কেই বোঝায়। এ দুয়ের মধ্যে তফাৎ চিহ্নিতকরণের উদ্দেশ্যে অধ্যাপক ডাণ্ডেস বলেছেন—it might be better to use the term 'folklore' for materials and the term 'folkloristics' for the study of materials. অধ্যাপক ডাণ্ডেসের মতামতকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে আমরা উপাদানকে 'ফোকলোর' তথা লোকবৃত্ত এবং লোকবৃত্তেরচর্চাকে 'ফোকলোরিস্টিকস্'-এর বদলে 'ফোকলোরোলজি' বলতে চাই। বাংলায় 'folklore'-কে বলা যেতে পারে 'লোকবৃত্ত' এবং folkloristics বা folklorology-কে বলা যেতে পারে লোকবৃত্তচর্চা। বর্তমান গ্রন্থে এতৎ-

সম্পর্কিত নানা যুক্তিতর্ক ও ধ্যানধারণাদির বিচার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। তবুও সাধারণভাবে উপরোক্ত বক্তব্য রাখা গেল মাত্র। অবশ্য একথাও মানতে হবে যে লোকবৃত্তের উপরোক্ত তালিকা সম্পূর্ণ নয়, উপকরণের চরিত্র বা মোদ্দাকথায় লোকবৃত্তের অবয়ব বোঝাবার জন্য কিছু নামের তালিকা মাত্র, যা দেখে লোকবৃত্ত সম্পর্কে চট করে একটা ধারণা তাঁরাও করতে পারেন যাঁরা লোকবৃত্তের তাত্ত্বিক দিক সম্পর্কে সম্যক অবহিত নন, অথচ তাঁরা উপরোক্ত তালিকার বহু জিনিসের সঙ্গে সমধিক পরিচিত ও আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা। এই লোকবৃত্তকে আধুনিক পণ্ডিতসমাজ প্রধানত চারভাগে বিভক্ত করে অধ্যয়ন ও গবেষণাকে সহজতর করার চেষ্টা করছেন। এই চারভাগ হচ্ছে যথাক্রমে Action, Science, Linguistics ও Literature। এই চার বিভাগের কোন বিভাগে কোন উপকরণের স্থান তা দেখা যেতে পারে।

অ্যাকশন বা ভঙ্গিপ্রধান লোকবৃত্তে আছে অনুকরণ, অঙ্গভঙ্গি, যাত্রা, নাচ-গান, আকার-ইঙ্গিত, বিরক্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কৃত পরিহাস বা তামাসা খেলাধূলা, মূকাভিনয়, ধর্মীয়অনুষ্ঠান, শিল্পকলা, ছড়া ইত্যাদির অবস্থান; সায়েন্স বা বৈজ্ঞানিক লোকবৃত্তে আছে বিশ্বাস, ধারণা, লোকদর্শন, অতি-কথা, বোধশক্তি, কুসংস্কার, ক্ষুদ্র উপাখ্যান বা কোন মহৎ ব্যক্তির জীবনের কোন বিশেষ ঘটনা, যাদুবিদ্যা, ইন্দ্রজাল, ভৌতিক-কাহিনী, ভবিষ্যদ্বাণী আরোগ্যবিধান ও প্রতিকারাদি বিষয় সমূহ; লিঙ্গুয়িস্টিক বা ভাষাসম্বন্ধীয় লোকবৃত্তে আছে বাচনভঙ্গির অধ্যয়ন, লোক-শব্দের উৎপত্তি-বিন্যাস ও বিশ্লেষণ, স্বরানুযায়ী ভাষা, উপভাষা ও বি-ভাষার পর্যালোচনা, বাক-রীতির সর্বাঙ্গীণ পরিচয়, ধ্বনি-ধর্ম, বাক্য ভঙ্গি, রসিকতা, যাদুমন্ত্র, আশীর্বাদ প্রবাদ, ধাঁধা বচন, সংক্ষিপ্ত বা বিদ্রূপাত্মক উক্তি, উপদেশপূর্ণ ছোটগল্প, ব্যাকরণ প্রভৃতি এবং লিটারারী বা সাহিত্যিক লোকবৃত্তে রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা, গাথাকাব্য, গান, মেলাবিবরণী প্রভৃতি যা কিছু লোকসাহিত্য পদবাচ্য তা সবই এই অংশে আসে। লোকবৃত্তের এইসব উপাদানসমূহকে পুনরায় ফরমালাইজড বা আকৃতিপ্রধান এবং মেটিরিয়ালাইজ্‌ড বা বস্তুপ্রধান লোকবৃত্তে বিভক্ত করা যেতে পারে। এখানেই শেষ নয়, লোকবৃত্তের বিভিন্ন উপাদান আরও নানাভাবে ভাগ করা যায়। যেমন ক্রিয়েশন মিথ বা সৃষ্টিমূলক কাহিনীকে আমরা (ক) বিশ্বব্রহ্মাণ্ড (খ) প্রাণী ও জীবজন্তু (গ) ভূ-প্রকৃতি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি এবং লোককথাকে (১) সংস্কৃতি ও সভ্যতা (২) আচার-সংস্কার-বিশ্বাস (৩) বীর (৪) দেবত্বপ্রাপ্ত বা অতিমানব (৫) সৌরজগৎ

বা চন্দ্র-সূর্য-তারকা (৬) পরলোক বা প্রেতাত্মামূলক (৭) রাক্ষসখোক্কস (৮) বিহঙ্গ-বিহঙ্গী ও (৯) কামনা-বাসনা ইত্যাদি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। দেশ ও বিদেশের বিদ্বৎ ও গবেষক সমাজ এইভাবেই লোকবৃত্তকে বিভিন্ন খণ্ড ও অংশে ভাগ করে লোকবৃত্তেরচর্চা ও অধ্যয়ন করে আসছেন সুদীর্ঘ দিন থেকে লোকসমাজ ও লোকজীবনকে জানতে।

'লোকবৃত্ত'-কে সম্যকরূপে বুঝতে লোকবৃত্তের এই বিভাগ সম্পূর্ণ নয়। এবং লোকবৃত্তের কোন বিভাগের কোন অংশেরই স্বাধীনভাবে বিচরণ করার ক্ষমতা নেই। একে অপরের উপর নির্ভরশীল। যেমন ধরা যাক বৈজ্ঞানিক লোকবৃত্ত। ভাষা বা সাহিত্যের সাহায্য ব্যতীত সে অগ্রসর হতে পারে না, তেমনি ভঙ্গিপ্রধান লোকবৃত্ত সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। সেই কারণেই লোকবৃত্তের আলোচনায় লোকজীবন বা লোক-সংস্কৃতির আলোচনা প্রাসঙ্গিক। অথবা বলা যেতে পারে, "like the apex of a pyramid, they arc based on each other. None could exist without linguistics, without belief they would be hollow and valueless and songs and specially plays could not exist without action also" (Fundamental of Folk Literature, Reaver and Boswell)। লোকবৃত্তকে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার জন্য মার্কিন পণ্ডিত ডঃ রিচার্ড এম. ডরসন বলেছেন যে, লোকবৃত্তের অধ্যয়ন হওয়া উচিত (1) Comparative বা তুলনামূলক (2) Anthropological বা নৃতাত্ত্বিক (3) National বা জাতীয় ও অঞ্চল ভিত্তিক (4) Psycho-analytical mirror বা মনোসমীক্ষাগত এবং (5) Structural বা আঙ্গিকগঠনরূপ দর্পণে। এই পদ্ধতিগুলো নিয়ে বৈজ্ঞানিক বা থিওরিটিক্যাল তেমন কোন আলোচনা এপার বাঙলার লোকবৃত্তের গবেষকেরা করে উঠতে পারেন নি। ওপার বাঙলায় এসম্পর্কে কিছু আলোচনা হয়েছে। তথাপি বলতে বাধা নেই যে বিজ্ঞানের আলোকে বাঙলার লোকবৃত্ত অধ্যয়নের প্রচেষ্টা এখন পর্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। এখানে যা হয়েছে বা হচ্ছে তা হচ্ছে সাহিত্যের আলোকে লোকবৃত্তের অধ্যয়ন, পঠনপাঠন ও বিশ্লেষণ। পৌরাণিক তত্ত্বকথার আলোকে, ক্রিয়াকর্ম, আচার, জ্ঞান, অনুষ্ঠানের আলোকে, ব্যবহারিক বা উপযোগিতার ভিত্তিতে, লোকবৃত্তের ঐতিহাসিক উপাদান বা সংগৃহীত তথ্যের আশ্রয়ে সম্ভাব্য সত্যে উপনীত হবার প্রচেষ্টাকে যদিও স্বাগত জানিয়েছেন বহু বিশিষ্ট গবেষক নানাদেশে; তথাপি, স্বীকার করতেই

হবে, এ বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত কোন কাজ এখানে এখনও চোখে পড়ে নি।

সমাজের উত্থানপতনের বহু ঘটনা লোককবির রচনায় ধরা পড়তেই পারে যা থেকে ঐতিহাসিক উপাদান বা তথ্য সংগৃহীতও হতে পারে। সংগৃহীত হতে পারে মানুষের রূপ ও স্বরূপ উপলব্ধি করার মেজাজকে, কুল ও গোষ্ঠীগত ঐতিহ্যকে, সম্পর্ক ও বিভেদকে, আচার-বিচার এবং চাল-চলনকেও জানা যেতে পারে তা থেকে। পুরুষানুক্রমে লোকবৃত্ত লোকজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে, লোকজীবনে আনন্দবিধান করেছে, হতাশার সৃষ্টি করেছে। অক্ষরজ্ঞান-হীনতার দরুণ লোককবি সাধারণভাবে মুখে মুখে লোকবৃত্তের সৃষ্টি করেছেন। মুখে মুখে ঘুরে ঘুরে তা স্থিতি পেয়েছে। শুধু মুখে নয় দেখেও লোকবৃত্ত অধ্যয়ন সম্ভব। যেমন—লাঙ্গল, জোয়াল, ঘরতৈরী, বেড়াদেওয়া ইত্যাদি। লোকবৃত্তের এই সব উপাদানের বহুকিছু লোক-সংস্কৃতির উপাদানও বটে। লোকসংস্কৃতির মধ্যে লোকজীবনের সংস্কৃতিগত দিকের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় আছে। সংস্কৃতি বা কালচারের সঙ্গে 'ফোক' বা 'লোক' যুক্ত হয়ে অর্থাৎ লোক-জীবনের সংস্কৃতি চর্চাকল্পেই লোক-সংস্কৃতির সৃষ্টি। চলমানকালের প্রতিফলনে ও ব্যবহারিক প্রয়োগে লোকবৃত্তের কার্যকর মূল্য। তাই এটা এখন পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র। এই শাস্ত্রের বিজ্ঞাননিষ্ঠ অনুশীলনের জন্য এর সঙ্গিক (allied) শাস্ত্রাদির চর্চার প্রয়োজন এ শাস্ত্রকে ঠিকমত বুঝতে।

ইংরেজী 'Culture'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে মোটামুটি আমরা 'সংস্কৃতি'কেই গ্রহণ করেছি। সংস্কৃতি জীবনের সঙ্গে জড়িত তাই সংস্কৃতির কোন চরম রূপ কোন এক সময়ে চিরকালের জন্য বলে দেওয়া যায় না। জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি ও সভ্যতা এগিয়ে চলে। সংস্কৃতির পরিচিত অর্থ বোধহয় পরিচ্ছন্ন জীবনকৃতি। কিন্তু নৃ-বিজ্ঞানীরা শুধু এই অর্থেই সংস্কৃতি বা 'Culture' এর ব্যবহার অথবা চর্চা করেন না। তাঁদের কাছে এর অর্থ আরও ব্যাপক যথা—"that complex which include knowledge, belief, art, law, customs and any other capabilities and habits—acquired by man as a member of society" অথবা সামাজিক মানুষের সাহিত্য, শিল্প, বিশ্বাস, রীতিনীতি, অনুশাসন, আচার, আচরণ এবং অনুরূপ বিষয়াদির এক জটিল সংমিশ্রণ হচ্ছে সংস্কৃতি। বিদগ্ধসমাজ বহুদিন থেকেই প্রকৃতি, মানুষ ও মানুষের জীবনকৃতি তথা সংস্কৃতি বিষয়ে গভীর উৎসাহ ও অনুরাগ দেখিয়ে আসছেন। এই অনুরাগ ও উৎসাহ থেকেই 'সংস্কৃতি'র নানা ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা বিভিন্ন পণ্ডিত উপস্থাপিত করেছেন। সংস্কৃতিকে গঙ্গা প্রবাহের সঙ্গে তুলনা করা যেতে

পারে। তা স্থির নয়, সর্বক্ষণ সামঞ্জস্য বিধানে নিযুক্ত। প্রাণশক্তি, গভীরতা এবং শৃঙ্খলামুক্ত না হলে সংস্কৃতি এগুতে পারে না। পেছনের জ্ঞান এবং মানসিক শক্তির সঞ্চয় ব্যতীত সে প্রাণহীন। শিখর যত উচ্চ হবে তুষাররেখা যত নীচে বিস্তৃত হবে তলভূমিতে সংস্কৃতি তত সতেজ এবং প্রাণবান হবে। লোকসংস্কৃতির সঙ্গে নাগরসংস্কৃতির যোগসন্ধি এখানেই।

বলাবাহুল্য, সংস্কৃতির প্রচলিত ধারণা তথা সাহিত্যরসিকদের জ্ঞান প্রসারিত করতে ও নৃ-বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্র বিস্তারিত করতে গিয়ে সংস্কৃতির নতুন সংজ্ঞা নিয়ে এগিয়ে এলেন নানাদেশের সমাজবিজ্ঞানীরা নতুন উদ্দীপনায়। অল্পবিস্তর মতানৈক্য সত্ত্বেও সমাজ-বিজ্ঞানীদের 'সংস্কৃতি'র ধারণাই বিদগ্ধ ও সুধীসমাজের চিত্তের স্থায়ী মেজাজে পরিণত হয়েছে বললে বোধহয় বেশী বলা হয় না। এই মেজাজ কাকতালীয়ও নয়। সুতরাং সংস্কৃতির চর্চায় তা অন্তর্গূঢ় সত্য, যা প্রাণধারণের ব্যস্ততার স্বরূপটিকে বিশিষ্ট দর্পণে প্রতিবিম্বিত করে। মানুষের দুঃখ, দুর্দশা, স্বার্থপরতা, পরস্পর বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিষয়ে অনবহিত না থেকে সকলকে ভালবেসে সংস্কৃতির বিস্তার ও প্রসার। শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, চরিত্র, সকলের মূলে কোন ঐশী প্রেরণা কাজ করছে না, স্থূল. অর্থনৈতিক স্বার্থ ও তজ্জনিত শ্রেণীসংঘর্ষ মানুষকে প্রতিনিয়ত বিপর্যস্ত করে চলেছে। মানবসমাজের এই বিপর্যয়ের, এই সংঘর্ষের মর্মস্পর্শী চিত্র আঁকলেন কার্ল মার্ক্স। বলাবাহুল্য, মার্ক্সীয় দর্শনে স্বভাবতই মানুষের দিব্যজ্ঞানাবলী অপেক্ষা বাস্তব বৃত্তিগুলো অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল মার্ক্সবাদী জনচেতনায়। এ চেতনা থেকেই নাকি সংস্কৃতির রূপান্তরের সূচনা।

মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বিজ্ঞানসম্মত একটি সংজ্ঞায় সংস্কৃতি বা Culture-এর চারিত্রিকরূপ ব্যাখ্যা করে উৎসাহী মনকে নিবিষ্ট করতে চেষ্টিত হলেন নৃ-বিজ্ঞানী সংস্কৃতির চর্চায়, সামাজিক ইতিবৃত্ত রচনায়, জীবনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায়। এবং দুঃস্থ, অবহেলিত জাতি, খণ্ডজাতি ও উপজাতিদের বৃত্তান্ত সংরক্ষণে বহু গবেষক, অধ্যাপক, ভাষাতাত্ত্বিক এবং সাহিত্যসেবকেরাও এগিয়ে এলেন সংস্কৃতির চরিত্রচিত্রণ, সংজ্ঞা রূপায়ণ ও বিশ্লেষণে। ভিন্ন ভিন্ন নিয়মানুবর্তিতায় ও স্ব স্ব শিক্ষার প্রভাবে এবং পণ্ডিতসুলভ কাঠিন্যে প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গেই প্রত্যেকের সংজ্ঞার অল্পবিস্তর পার্থক্য দেখা দিল, কিন্তু এ পার্থক্য সাংঘাতিক কিছু নয়।

একথা সকলেরই জানা যে, 'Culture' বা 'সংস্কৃতি'র উৎপত্তি গত

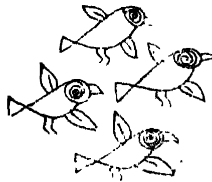
শতকের রেনেসাঁস বা পুনরুজ্জীবনের যুগে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যখন উচ্ছ্বাস বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ঈশ্বরচিন্তা ও ধর্মশাস্ত্রব্যাখ্যায় দিনাতিপাত না করে জগতের অশেষ রূপবৈচিত্র্যের আস্বাদনে মানুষ তার সভ্যতাকে নতুন করে দেখতে চাইল তখনই 'Culture' তথা 'সংস্কৃতি'র জন্ম। জন্মলগ্নের শুভমুহূর্তে আবির্ভূত হলেন অধ্যাপক টাইলর যিনি তাঁর "Early History of Mankind and the Development of the Civilisation" রচনায় সর্বপ্রথম 'Culture' শব্দটি ব্যবহার করেন ১৮৬৫ সনে। কিন্তু তখন তিনি শব্দটির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন নি। অথচ এই শব্দ নিয়ে পণ্ডিতমহলে নানা আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। উৎসাহী পণ্ডিত-সমাজ ও ছাত্রমহলকে তৃপ্তি দিয়ে টাইলর সাহেব তাঁর সুবিখ্যাত "Primitive Culture" গ্রন্থে (1871) Culture বা সংস্কৃতির এমন একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন যা সুধীমহল লুফে নেন। অবশ্য এ কাজে তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের নিকট যে প্রভূত সাহায্য লাভ করেছেন তা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন। টাইলর প্রদত্ত 'সংস্কৃতি'র ব্যাখ্যা শুধুমাত্র নগর-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, এমন নয়। পরন্তু, লোক-সংস্কৃতির বেলাতেও খাটে। যদিও লোক-সংস্কৃতির ব্যাপ্তি নগর-সংস্কৃতি অপেক্ষা দীর্ঘ এবং আঞ্চলিক। তা স্থানীয়, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবের উপর নির্ভরশীল এবং লোকসমাজাশ্রয়ী ; লোকসংস্কৃতি বিবর্তন ও পরিবর্তনের মধ্যে পুষ্ট, লালিতপালিত এবং বর্ধিত। সমাজ ও আঞ্চলিক সকলের জন্য এ সংস্কৃতি উদার, অসাম্প্রদায়িক ও সীমাবদ্ধ, বাইরের জগৎ সম্বন্ধে ইতিবাচক। সামাজিক শৃঙ্খলা জীবনোন্মাদনার দ্যোতক, এই জীবন-চেতনার মধ্যে সামগ্রিকতার স্থান নেই। বিরাট জগৎ, বিশাল জনসমুদ্রের কথা নেই, যা আছে তা খণ্ডিত সমাজচিত্র, টুকরো জীবনাদর্শ। তাই লোকসমাজের দেখা জগতের সঙ্গে বিজ্ঞানীর মাপজোখ করা জগতের, বৈদ্যুতিক জগতের, স্পুটনিকের জগতের অনেক তফাত, অনেক ফারাক, দুস্তর ব্যবধান। সাজানোগোছানো ব্যাপার, মাপাজোখা কথা, ও সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে



সঙ্গে সমাজজীবনের নানা জটিলতার চিত্রকল্প লোকবৃত্তের মধ্যে না থাকতে পারে, তাতে সমাজ বিজ্ঞানীর কিছু এসে যায় না। কারণ, সমাজবিজ্ঞানী পোষাকী আদবকায়দা ও কেতাদুরস্ত হাবভাব নিয়ে চর্চা করা অপেক্ষা আদি ও অকৃত্রিম মানব সমাজের জীবনধারণপ্রণালী, জীবনের সমস্যা সঙ্কটাদির অধ্যয়ন ও গবেষণায় অধিক আগ্রহী বলেই মনে হয়।

বাঙলার লোকবৃত্তে বাঙলার মাটির মানুষের হৃদয়বৃত্তি অকুণ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সে বৈদগ্ধ্যের ঔজ্জ্বল্যের স্বাভাবিক কমনীয়তাকেও ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। নিপুণতাবিহীন সরল স্বচ্ছন্দ তানে বাঙালার দৈনন্দিন ব্যথারঞ্জিত চিত্রের মধ্যে বাঙলার পল্লীপ্রকৃতি ও পল্লীসমাজ একান্তভাবে ধরা দিয়েছে এবং এরাই লোকসমাজকে লোকপরম্পরাগত সঞ্চারিত সংস্কৃতি ও জীবনে প্রলুব্ধ করেছে। স্মরণীয়, লিখিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি ধারার সঙ্গে মৌখিক সাহিত্য এবং লোক-সংস্কৃতির তির্যক যোগ থাকলেও উভয়ে এক নয়। উভয়ের মনন ও চিৎ-প্রকর্ষ দ্বিধা খণ্ডিত। লোকসংস্কৃতি অস্থিতি-স্থাপক, নমনীয় এবং সমন্বয়ধর্মী। উপকরণ ও মিশ্রণের ফলে উর্বর সংস্কৃতির জন্ম। লোকবৃত্ত তাই লোকজীবনের যে সৃজন ক্ষমতা বর্ণন করে তা কোনদিন শেষ হবার নয়। বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী থেকে বিভিন্ন প্রকার উদ্যম গ্রহণ করে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে চলে সে। নানাভাবে সেই জ্ঞান আহরণ করা যেতে পারে, নানা আঙ্গিকে লোকবৃত্তকে বিচার করা যেতে পারে। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে লোকবৃত্তের ব্যাপকতা চিহ্নিত করার জন্য আমরা সাধারণভাবে একটি নকশার সাহায্য নিতে পারি। বলা বাহুল্য, এই নকশাটি পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও পরিমার্জন সাপেক্ষ।

নিম্নের নকশায় বর্ণিত লোকবৃত্তের সমস্ত উপাদানই একে অপরের উপর



নির্ভরশীল। এদের যে কোন একটির আলোচনায়ই তাই প্রায় সকলেরই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এদের অধ্যয়ন এবং চর্চাকে বিভিন্ন নিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। বায়ুরোধী প্রকোষ্ঠবন্দী করে কোন বিষয়ের অধ্যয়ন যে সম্ভব নয় এ কথা আজ আর কেউ অস্বীকার করেন না, লোকবৃত্তের অধ্যয়নেও এ কথা সত্য।

নক্সায় 'ফোকলোর' বা লোকবৃত্তের শ্রেণী-বিভাগ—২

লোকবৃত্ত

- ফরমালাইজ্‌ড্‌ বা আকৃতিগত
  - শিল্পগত: পটশিল্প, পোড়া মাটির ফলক, বাঁশ ও বেতের কাজ ইত্যাদি
  - ব্যবহারিক: লাঙ্গল, জোয়াল, ঘরবাড়ী গড়া ইত্যাদি
  - গতিযুক্ত: যাত্রা, নাচ, মূকাভিনয় ইত্যাদি
- মেটিরিয়ালাইজ্‌ড্‌ বা বস্তুগত
  - ট্রাডিশন্যাল বা ঐতিহ্যগত
    - সংস্কারগত
    - বিশ্বাসগত
  - সাংস্কৃতিক
    - ধর্মীয়
    - সমাজগত

পারলৌকিক বিষয় স্ত্রী আচার স্বপ্ন বিষয়ক | রূপকথা ব্রতকথা ইত্যাদি | গাথা কবিতা গান | ঝাড়ফুক, মন্ত্র প্রবাদ, বচন ধাঁধা ইত্যাদি | ভাষা উপভাষা বি-ভাষা ইত্যাদি | পূজা-পার্বণ ইত্যাদি | বিশ্বাস সংস্কার আচার আচরণ | প্রতীক পূজা আচরণীয় কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি | স্নান মেলা সামাজিক উৎসব ইত্যাদি | নাচ-গান অনুষ্ঠান ইত্যাদি

সৌরমণ্ডলন্ত প্রকৃতি সম্বন্ধীয় | ঋতু বিষয়ক — বারোমাসী ইত্যাদি | বৃক্ষপূজা পীঠস্থান বিষয়ক তুলসী, বেল ইত্যাদি | আবহাওয়া বিষয়ক প্রচলিত ধারণা, বচন ইত্যাদি | নদী বিষয়ক গঙ্গা, যমুনা পীরস্থান মন্দির | জীব বিষয়ক সর্প বিষয়ক মনসা ইত্যাদি | সংখ্যা বিষয়ক শুভঙ্কর গণনা ইত্যাদি

পুরুষ ও নারীর দৈনন্দিন জীবন | বর্ণবিন্যাস ও জনতত্ত্ব | জনপ্রবাহ মানস-সংস্কৃতি ও ভূমিবিন্যাস | লোক-প্রকৃতি ধন সম্বল ইত্যাদি | কৃষি, মৎস্য শিকার ইত্যাদি | বিভিন্ন শিল্প ও শিল্পী ইত্যাদি | ক্রয় বিক্রয়ের রীতি ইত্যাদি | খাদ্য পানীয় ইত্যাদি | বসনভূষণ অলঙ্কার ইত্যাদি | ক্রীড়ানুষ্ঠান ব্যায়াম ইত্যাদি | উৎসব মেলা ইত্যাদি | তুলনামূলক

ইতিহাসের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে Culture শব্দটি ইংরেজী Folklore শব্দের অনুজ। এদের মধ্যে অন্তত বিশ বছরের ব্যবধান। ডবলু. জে. থমস্ সর্বপ্রথম লোকবৃত্তের সমার্থক ইংরেজী শব্দ Folklore-কে ব্যবহার করেন ১৮৪৬ সনে। এবং ই. বি. টাইলর Culture শব্দ ব্যবহার করেন ১৮৬৫ সনে। এই অনুজ শব্দ অগ্রজ শব্দ অপেক্ষা বহুল জনপ্রিয়। জনপ্রিয়তার কারণ একদিকে সমাজ বিজ্ঞান ও নৃ-বিজ্ঞানের প্রসার, অপরদিকে বোধহয় Folklore তথা লোকবৃত্তের ছাত্র ও গবেষকদের অবৈজ্ঞানিক বা সাহিত্য ঘেঁষা কার্যক্রম।

'Culture' তথা 'সংস্কৃতি' সমাজ ও নৃ-বিজ্ঞানী এবং অপরাপর বিদগ্ধজনের অধ্যয়নের ও গবেষণার অন্যতম বিষয়। অথচ Folklore বা লোকবৃত্ত এখনও অধ্যয়নের অন্যতম শাখা হিসাবে স্বীকৃতি পায় নি। অর্থাৎ Folklore বা লোকবৃত্ত সাহিত্যের পোস্টগ্রাজুয়েট ছাত্রদের বড় জোর সাহিত্যের ঐচ্ছিক বিষয়ের মধ্যে গণ্য, যেখানে ছাত্র সংখ্যা নগণ্য। এবং এ বিষয়ের বহু শিক্ষকের লোকবৃত্ত সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাবও পীড়াদায়ক। যোগ্য পরিচালনার অভাবেই উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক উৎসাহী ছাত্র এবং গবেষক লোকবৃত্ত সম্পর্কে গবেষণা করে ডিগ্রী পেয়েও আসল ব্যাপারটা ধরতে পারছেন না। তাঁদের অনেকেই লোকবৃত্তের জগৎ সম্পর্কে অবহিত নন। এটা পরিতাপের ব্যাপার। সাধারণ ছাত্রদের কাছে লোকবৃত্ত চর্চার কোন দাম নেই।

প্রসঙ্গটি এ জন্য উত্থাপিত হল, আমাদের লোকবৃত্তবিদ্ পণ্ডিতগণের যাঁরা আংশিক সময়ের সুযোগসুবিধা-মাফিক Folklore তথা লোকবৃত্তের চর্চা করে খ্যাতিলাভ করেছেন বা করছেন তাঁরা লোকবৃত্ত সম্পর্কে যতই রোমাঞ্চ, উচ্ছ্বাস বা ভাবালুতা প্রকাশ করুন না কেন, প্রায়শই তাঁদের কার্যক্রম আন্তরিকতাশূন্য এবং নগদ লাভের উপলক্ষ্য বলে মনে হয়। ওঁদের অনেকেরই উদ্বেলতা বাইরের চটকদারী। তাঁদের কার্যপ্রণালীই তার প্রমাণ। জ্ঞানী বা বিজ্ঞানীর নিষ্ঠা, সাধনা ও ধ্যান দিয়ে লোকবৃত্তের চর্চা না করার জন্য লোকবৃত্তকে ওঁরা বিজ্ঞানের রাজ্যে নিয়ে যেতে পারছেন না; পারছেন না একে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম এক শ্রেষ্ঠ বিষয়ে পরিণত করতে। অথবা তা করছেন না হয়ত বা নিজেদের মুরুব্বীয়ানা বজায় রাখতে, নিজেদের অজ্ঞানতাকে ঢেকে রাখতে।

শিক্ষাজগতে যাঁরা এ-বিষয় অধ্যয়নে ব্যাপৃত আছেন তাঁদের অনেকেরই

আছে ভাষার জোর, আছে বিষয় অধ্যয়নের নানাবিধ সুযোগ সুবিধা। অতীত স্বর্ণ যুগের স্মৃতিচারণের চিরায়ত অভ্যাস বা সদিচ্ছাও নানাভাবে প্রকাশ করেন। স্মরণীয় যে লোকবৃত্ত অধ্যয়নের আধার শুধু হৃদয় নয়, তার জন্য মস্তিষ্ক বলে একটা জিনিষেরও একটু চর্চার দরকার। মস্তিষ্কের কথা ভুলে গিয়ে যাঁরা লোকবৃত্তের 'রিভাইভাল' ও 'রিজুভিনেট' করার স্বপ্ন দেখেন তাঁরা বিষয়ের উপকার করছেন না। তাঁদের স্মৃতিচারণের মধ্যেও মস্তিষ্কের ব্যবহারের বা আসল ব্যাপার বোঝার মত চিন্তার অভাব দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে আবার অভাব দেখা যায় সততার ও নিষ্ঠার।

নিত্য নতুন আবিষ্কারের আলোকে জ্ঞানশিক্ষাকে দীপ্ত ও উজ্জ্বল করার প্রচেষ্টা অপেক্ষা নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির মধ্যেই যেন আবদ্ধ তাঁদের অনেকে। অনেক সময় ওঁদের কার্যকলাপ দেখে মনে হয় ওঁরা জেগে ঘুমাচ্ছেন, অথবা পার্থিব কোন দ্রব্যগুণে অভিভূত হয়ে বিজ্ঞান, সভ্যতা ও গতির দিকে চোখ মেলে তাকাতে চাইছেন না, মনকে একান্তভাবে নিবিষ্ট রেখেছেন ব্যবসার প্রসারে। এইসব অধ্যাপক-গবেষকদের অনেকেই অনেক খ্যাতিমান, অনেকেই হয়তো প্রতিভাদীপ্ত, কিন্তু তাতেও তাঁরা লোকবৃত্তের চর্চায় বিষয়ের প্রতি নিষ্ঠা ও সততার প্রমাণ দিতে পারছেন না। পারছেন না সত্যিকারের জ্ঞানাহরণ বা জ্ঞান বিতরন করতে, বৃহৎ ছাত্র সমাজকে এই জ্ঞানভাণ্ডারের দিকে উৎসাহিত করতে। ফলে বিষয়ের গভীরতা ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে অনবহিত মানববিমুখ চেতনায় নিজ নিজ ছাত্রদের আচ্ছন্ন করে রেখেছেন। লোকবৃত্তও তার প্রাপ্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কারণ, এঁদের হাতেই বর্তিয়েছে শিক্ষার ভার। এই বঞ্চনার বোঝা ছাত্রসমাজের মধ্যেই নয়, প্রকৃত ও সৎ গবেষক, উৎসাহী কর্মীবৃন্দের মধ্যেও ভাগাভাগি হচ্ছে। তাই তাঁরাও নানাভাবে তাঁদের সৎকর্মের প্রেরণা ও উদ্যম থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, পাচ্ছেন না উৎসাহ, পাচ্ছেন না নির্দেশ। এলোমেলো করা মাঠে যে যেভাবে পারছে লুটেপুটে খাচ্ছে। এ অরাজকতার মধ্যে তৃপ্ত তাঁরাই যাঁরা স্বার্থপর ও কর্তাভজা বৃত্তির স্বপক্ষে, যাঁরা অতিমাত্রায় সংসারী ও আখেরগোছাতে পারদর্শী। আরও কিছু কর্মী আছেন বাঙলায় যাঁরা কবে আমসত্ত্ব খেয়েছিলেন, অর্থাৎ কবে কীভাবে আখের গোছাবার কাজে মত্ত ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ অবসর গ্রহণান্তে ছলচাতুরীর ও প্রচারের মাধ্যমে গবেষক হয়ে বসে পুরাতন আমসত্ত্বর ঢেকুর তুলছেন। নিষ্ঠাহীন, সততাহীন কাজের দ্বারা আত্মম্ভরী ব্যক্তি পণ্ডিত রূপে বিজ্ঞাপিত হচ্ছেন। এবং এঁরাই হঠাৎ নিদ্রোত্থিত হয়ে আধাসরকারী

চাকুরী থেকে অবসর নেবার পর অথবা সেখানকার সব রস শোষণ করার পর দেখলেন এদিকের কাজে অনেক দেরী হয়ে গেছে। যা পাও তাই অবিলম্বে লুটে নাও, বেসাতির আশ্রয় নাও। নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার চেয়ে ফাঁকি ও মেকীর সঙ্গে আপোষরফায় প্রমত্ত এই সব গবেষকবৃন্দ লোকবৃত্তকে বিজ্ঞানের রাজ্যে নিয়ে যাবার বাধাস্বরূপ। তাঁরা বিষয়ের বাসনায় লোকবৃত্ত বিষয়ের ক্ষতি করছেন। এঁরাই ঢাকঢোল প্রচারযন্ত্র মারফত সরব চীৎকার তুলে চলেছেন, অথচ যাঁরা সমস্তপ্রকার বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে, সমস্তপ্রকার লাভ ও লোভ উপেক্ষা করে সিদ্ধাচার্যদের ন্যায় স্ব স্ব সামর্থ্য অনুযায়ী বিষয়ের সর্বক্ষণের কর্মীরূপে বিষয়কে সেবা করে যাচ্ছেন, বিষয়ের অধ্যয়ন ও গবেষণার সুযোগ করে দিচ্ছেন, তাঁরা প্রায়শই স্বীকৃতি পাচ্ছেন না ; উপরন্তু নিরুৎসাহিত হচ্ছেন হঠাৎ-গবেষকদের আত্মম্ভরিতাপূর্ণ মুখর নিন্দাপ্রচারে, এই ধরণের মানুষদের অভদ্র আচরণে ও অশালীন ব্যবহারে। এটা কম পরিতাপের কথা নয়।

লোকবৃত্তের আলোচনায় বা লোকায়ত সমাজচর্চার সময় লোকবৃত্ত-বিদদের এ সম্পর্কে সচেতন হবার সময় এসেছে। কারণ, আমরা বর্তমানে দারুণ এক অদল-বদলের মধ্য দিয়ে চলেছি। এই দ্রুত ভাঙাগড়ার মধ্যে লোকবৃত্তের একটি স্থান আছে। বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, পুরাতাত্ত্বিক ও নৃবিজ্ঞানীদের ন্যায় বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা অথবা বিচক্ষণ অনুসন্ধানীর আচরণের দ্বারা নানাভাবে, নানাদিকে গবেষণা ও অনুসন্ধান চালিয়ে লোকবৃত্তের নিষ্ঠাবান গবেষক ও উৎসাহী ছাত্রসমাজ বিষয়কে উচ্চগ্রামে নিয়ে যেতে পারবেন। অন্যথায় চীৎকারই সার হবে। এরই মধ্যে কিছু কিছু কাজী তাঁদের আখের গুছিয়ে নেবে, কিন্তু আসল কাজের কাজ কিছুই হবে না।

॥ ৫ ॥

সভ্যতা ও জ্ঞানের উন্মেষকালে মানুষের সীমিত শক্তি যখন প্রকৃতি-পুঞ্জের তীব্র প্রতিকূলতায় প্রতিনিয়ত ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে থাকতো, তখন সে দেবতার আশীর্বাদ লাভের আশায় প্রার্থনা করেছে, পূজা-অর্চনা করেছে। মানবের অসহায় নির্ভরতা থেকে উত্তরণের তাগিদেই পূজা, অর্চনা ও উৎসবের আয়োজন; উৎসবের মধ্যে ঘটে প্রাণের প্রতিষ্ঠা। প্রতিদিন স্বার্থের বিক্ষিপ্ততায় মানুষ যে সত্যকে উপেক্ষা করে উৎসবের দিনে সেই অখণ্ড সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে মানুষ ধন্য হয়। মিলনের মধ্যে উৎসবের সৃষ্টি ও তৃপ্তি। তাই উৎসবের প্রধান কথা মিলন। মিলনের মধ্যে সত্যের প্রকাশ। উৎসবের দিনে আমরা উদার—সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা পরিহার করে দীপ্ত। উৎসবের এই মাধুর্যমণ্ডিত দিনের কথা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"মানুষের উৎসব কবে? মানুষ যেদিন আপনার মনুষ্যত্বের শক্তি বিশেষভাবে স্মরণ করে, বিশেষভাবে উপলব্ধি করে, সেইদিন; যেদিন আমরা আপনাদিগকে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের দ্বারা চালিত করি, সেদিন না—যেদিন আমরা আপনাদিগকে সাংসারিক সুখদুঃখের দ্বারা ক্ষুব্ধ করি, সেদিন না—যেদিন প্রাকৃতিক নিয়ম পরম্পরার হস্তে আমাদিগকে ক্রীড়াপুত্তলীর মত ক্ষুদ্র ও জড় ভাবে অনুভব করি, সেদিন আমাদের উৎসবের দিন নহে।...

প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র, দীন, একাকী। কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ, সে-সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যতার শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।" উৎসব যে কোন চেহারা নিয়েই আসুক না কেন, তার উদ্দেশ্য এক। উৎসবের দিনের এক অপূর্ব চিত্র অঙ্কন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। "সকালবেলা অন্ধকার ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া আলোক যেমনি ফুটিয়া বাহির হয়, অমনি বনে উপবনে পাখিদের উৎসব পড়িয়া যায়। সে উৎসব কিসের উৎসব? কেন এই সমস্ত বিহঙ্গের দল নাচিয়া কুঁদিয়া গান গাহিয়া এমন অস্থির হইয়া উঠিতেছে? তাহার কারণ এই প্রতিদিন প্রভাতে আলোকের স্পর্শে পাখীরা নূতন করিয়া আপনার প্রাণশক্তি অনুভব করে। দেখিবার শক্তি, উড়িবার শক্তি, খাদ্য সন্ধান করিবার শক্তি তাহার মধ্যে জাগ্রত হইয়া

তাহাকে গৌরবান্বিত করিয়া তোলে।" উৎসবের মধ্যে আমরা প্রেরণা লাভ করি। ঈশ্বরের কাছে বৃহৎ মনুষ্যত্ব পাবার জন্য প্রার্থনা জানাই। উৎসবের দিন তাই শুধুমাত্র ভাবরসসম্ভোগের দিন নয়। শুধুমাত্র মাধুর্যের মধ্যে নিমগ্ন হবার দিন নয়। উৎসবের এই চরিত্রের কথা স্মরণ রেখে রবীন্দ্রনাথ দেবতার কাছে আহ্বান জানিয়েছেন—"আজ আমরা এতগুলি মানুষ একত্র হইয়াছি। আজ যদি, যুগে যুগে তোমার মনুষ্য সমাজের মধ্যে যে সত্যের গৌরব—যে প্রেমের গৌরব—যে কঠিন নির্ভীক মহত্ত্বের গৌরব উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা দেখিতে না পাই—দেখি কেবল ক্ষুদ্র দীপের আলোক—তুচ্ছ ধনের আড়ম্বর, তবে সবই ব্যর্থ হইয়া গেল। মহাপুরুষের কণ্ঠ হইতে যে সকল অভয়বাণী, অমৃতবাণী উৎসারিত হইয়াছে তাহা যদি মহাকালের মঙ্গলশঙ্খ ধ্বনি নির্ঘোষের মত আজ শুনিতে না পাই—শুনি কেবল লৌকিকতার কলাকলা এবং সাম্প্রদায়িকতার বাগবিন্যাস তবে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। এই সমস্ত ধনাড়ম্বরের নিবিড় কুজ্ঝটিকা রশ্মি ভেদ করিয়া একবার সেই সমস্ত পবিত্র দৃশ্যের মধ্যে লইয়া যাও সেখানে ধূলি শয্যায় নগ্নদেহে তোমার সাধক বসিয়া আছেন, যেখানে তোমার সর্ব্বত্যাগী সেবক কর্ত্তব্যের কঠিন পথে রিক্তহস্তে ধাবমান হইয়াছেন, যেখানে তোমার বরপুত্রগণ দারিদ্র্যের দ্বারা নিষ্পিষ্ট, বিরোধীদের দ্বারা পরিত্যক্ত, মদান্ধদের দ্বারা অপমানিত—সেইখানে তেজ, সেইখানে শক্তি, সেখানে দৈব্যৈশর্য্য; সেইখানে তুমি।"

ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান ও পূজা-পার্বণাদি উপলক্ষে স্মরণাতীত কাল থেকে বাঙালী করে আসছে নানা উৎসব। বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনে অভাব আছে, অনটন আছে, দুঃখ আছে, দারিদ্র্য আছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আছে উৎসব, আনন্দ, বারো মাসে তেরো পার্বণ। অর্থাৎ সম্বৎসর উৎসব, অনুষ্ঠান। বিভিন্ন তিথি, পক্ষ, মাস ও ঋতুতে উৎসবের সমারোহ করে বাঙালী তার দৈনন্দিন দুঃখবেদনা শোকতাপকে লঘু করে নিয়েছে, প্রাত্যহিক জীবনের গ্লানি, কালিমা ও ব্যর্থতাকে অস্বীকার করে নতুন কর্মপ্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হয়ে হাসিমুখে সর্বপ্রকার বিরোধীশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছে। এই উৎসব, অনুষ্ঠান ও পার্বণাদি বাঙালীর জীবনীশক্তিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে ও প্রাণশক্তির উৎসমুখে প্রেরণা জুগিয়ে চলেছে বলেই তা বাঙালীর জাতীয় জীবনের অঙ্গ হয়ে গেছে। বাঙালীকে বুঝতে হলে তাই সর্বপ্রথম তার উৎসব, অনুষ্ঠান, পূজা, পার্বণ, মেলা প্রভৃতির মূল চরিত্র জানতে হবে।

উৎসবের মারফত দেশ ও মানব উভয়ে উভয়ের নিকটে আসে বলে বাঙালীর বিশ্বাস। এ উৎসবে বৈরি ভাব দূরীভূত হয়, সখ্যতার, একতার ভাব সৃষ্টি হয় মানুষে মানুষে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে। উৎসব অন্ধকারকে বিধ্বস্ত করে ফেলে আলোর বর্তিকা জ্বেলে দেয়। বাঙালী জীবনের সমস্ত কৃত্যেই কোন না কোন উৎসব। ১৯৬০-৬১ সনে বৎসরাধিক কাল সারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান ঘুরে আমরা আড়াই সহস্রাধিক উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান করেছি অগ্রহায়ণ থেকে কার্তিক মাস অবধি। যে সব জেলায় যতগুলো করে উৎসব অনুষ্ঠানাদি প্রত্যক্ষ করেছি তার একটি তালিকা দেওয়া যেতে পারে। বলাবাহুল্য, এ তালিকা পশ্চিম বাঙলার উৎসব সমুদ্র থেকে তুলে আনা কয়েক কলসী জল মাত্র।

সমুদ্র মন্থনের কাজে হাত দিয়েছেন জনগণনা দপ্তর। তাঁরা নাকি পশ্চিমবঙ্গের তাবৎ পূজা পার্বণ মেলাদি জনসমক্ষে তুলে ধরবেন। এবং ১৯৫৭ সনের মাঝামাঝি সময় থেকে অদ্যাবধি বারো বৎসরের কিছু অধিক সময়ে তিন খণ্ড বইয়ে পশ্চিমবঙ্গের পনেরটি জেলার মধ্যে মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিঙ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হাওড়া, হুগলী, ২৪-পরগণা ও মেদিনীপুর এই এগারটি জেলার বিবরণ উপহার দিয়েছেন। আর যে চারটি জেলা বাকী আছে তাও প্রকাশিতব্য দু'টি খণ্ডে বিধৃত হবে বলে প্রকাশ। এত দীর্ঘ সময় ধরে বিরাট ধন ও জনবল নিয়ে জনগণনা বিভাগের মত একটি দায়িত্বশীল সরকারী বিভাগের কাজের মধ্যে উৎসবাদি চর্চার আবশ্যকতা প্রতিফলিত। কিন্তু সুদীর্ঘ সময়, অগুনতি অর্থ, ও পরিশ্রমের ফলশ্রুতি হিসেবে যে কয়েকখণ্ড গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তাতে বহু তথ্য, বহু উৎসব অনুষ্ঠান ও মেলার উল্লেখ নেই। এবং উল্লিখিত বহু উৎসব অনুষ্ঠান ইত্যাদির বিবরণের মধ্যেও ঢুকেছে প্রমাদ। তথ্য সংগ্রহ করতে না পারার কারণ এবং প্রমাদ ইত্যাদির কারণ জানাতে গিয়ে সংকলকদের বক্তব্যে যা উল্লিখিত হয়েছে, অর্থাৎ 'সর্বত্র অন্বেষক পাঠাতে না পারা' ও এমন সব জায়গা বা সংবাদ-সাময়িকপত্রাদি থেকে তথ্যাদি আহরণ করা হয়েছে যা যাচাই করা যায় নি, কারণ, "পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করা সম্ভব নহে।" কেন 'নহে'? পশ্চিমবঙ্গের মত একটি ছোট রাজ্যে সর্বপ্রকার সরকারী যন্ত্র বারো বৎসরাধিককাল ব্যবহার করার পরেও এই শ্রেণীর কৈফিয়তে অনেকেই তৃপ্ত হবেন না। ঘোষিত অপর দুই খণ্ড প্রকাশিত হতে আরও

কতদিন লাগবে কে জানে। ব্যক্তিগত কাজের যে যে অসুবিধা, ধন, জন ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা, তার কোনটারই তো অভাব হয় নি এ ক্ষেত্রে। তবে কেন এই ত্রুটি, কেন এই বিচ্যুতি? সঙ্গতভাবেই এ প্রশ্ন রাখা যেতে পারে বিভাগীয় কর্তাদের কাছে। সরকারের জনগণনা দপ্তর ব্যতীত অন্য কোন স্থান থেকে এ গ্রন্থ প্রকাশিত হলে আমাদের এত বেশী উদ্বিগ্ন হতে হত না। কারণ, এ ধরণের কাজে ভুল তো থাকতেই পারে। যেমন বর্ষাকালে মুসলমান সমাজের লতাপূজা বা মা-মনসার পূজা। এ পূজা একান্ত গোপনীয়তার সঙ্গে উদযাপিত হয় প্রবীন মুসলমান মেয়েদের দ্বারা মুর্শিদাবাদের নানাজায়গায়। গঙ্গাস্নান করে বদনাভর্তি জল সহ ভিজে কাপড়ে সিজগাছের পাতা সমেত ডাল উঠোনে পুঁতে দেয় বাড়ীর সব মেয়েরা, পুঁতে দেওয়া ডাল গোলাকারে ঘিরে দাঁড়ায় আর বলে—'জির দ্যাথায়ু ন্যাজ ছাপায়ু, লতাদেবী মা', বলতে বলতে সিজগাছের মাথায় গঙ্গাজল, সিঁদুর, বেলপাতা উপহার দেওয়া হয়। পুজারিণী মেয়েরা এদিন ভাত খায় না, ফলমূল আলুনি তরিতরকারী সিদ্ধ খায়। এ ধরণের বহু উৎসবের সংবাদ নেই, সংবাদ নেই চব্বিশ পরগণার টাকি অঞ্চলে অনুষ্ঠিত উৎসব ও মেলার কথার। আরও বহু মেলা উৎসবের কথাও 'পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা'য় অনুপস্থিত।

যাই হোক, আমরা আমাদের নিজস্ব অন্বেষণের বিবরণ দিতে গিয়ে



সরকারী প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করলাম। কারণ, অন্তরের তাগিদে খেয়ে না-খেয়ে, হেঁটে, সাইকেল, গরুর গাড়ী, নৌকায় চেপে আমরা যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছি, পরিতাপের বিষয়, 'পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও ও মেলা'র প্রণেতাগণ যুগাধিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তার অনেক তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেন নি। আমাদের সমীক্ষার তালিকা পরপৃষ্ঠায় দিলাম—

এক বৎসরের সমীক্ষিত মেলার তালিকা ১৯৬০—১৯৬১ নক্সা ৩

জেলা	গ্রীষ্ম		বর্ষা		শরৎ		হেমন্ত		শীত		বসন্ত		
	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র	মোট
বর্ধমান	১৬	২	৪	৯	২৩	২৩	১৯	৩২	৩৯	২৪	২৯	৪১	২৬১
বীরভূম	১৪	৭	৯	৬	২৪	২১	১৭	১৯	২৩	১৬	২১	৪০	২১৭
মেদিনীপুর	৯	৪	১০	৭	২৭	৪৩	৩০	৪৩	৪৭	২৮	৩৬	৫৮	৩৪২
হাওড়া	১০	৪	৪	৪	১৮	২৫	১৮	২৬	৩৩	২৭	১৯	৩৯	২২৭
হুগলী	১০	৬	১৯	১৩	২৫	২০	২৭	২১	৩০	৩১	৩৬	৩৮	২৭৬
পুরুলিয়া	১৩	৪	৩	৬	২৮	২১	১৯	২১	১৪	১৬	২৯	২৯	২০৩
২৪ পরগণা	১৭	১১	৮	১৩	২৮	৪১	২৪	২৭	৩৮	২৯	৩৮	৫৩	৩২৭
কলিকাতা	৩	—	৪	—	—	৫	২	—	২	১	—	—	১৭
নদীয়া	৯	৭	১১	৬	১৩	২১	২৮	২৫	৩২	২৭	১৮	৩৩	২৩০
মুর্শিদাবাদ	১০	১১	১৫	১৮	২৬	২৪	২৭	৩৪	৩৮	২১	৩০	৪৩	২৯৫
পঃ দিনাজপুর	১৪	৭	৩	৫	২১	৩১	২৮	৩৭	৩৯	৩১	৩০	১৭	২৬৩
মালদহ	১২	৪	৩	৬	৭	২৩	২৮	৩৩	৩৮	৩৯	৪১	৪৭	২৭৭
জলপাইগুড়ি	৩	২	৪	১৩	১৯	২৭	২১	১৭	১৯	১৯	৩১	৩০	২০৫
দার্জিলিং	১০	৪	৪	৮	৩	১৪	১১	১৮	১৯	১৫	১৯	১৩	১৫৮
কুচবিহার	৪	২	৭	৮	১০	২৪	২৩	৩১	৩২	৩০	১৯	৩০	২২০
মোট	১৫৪	৭৫	১০৮	১২০	২৭২	৩৬৩	৩২০	৩৮৪	৪৪৩	৩৫৪	৩৯৬	৫০৯	৩৪৯৮

এই তালিকায় হিন্দু, মুসলমান, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, আদিবাসী, রবিদাস, খৃষ্টান, রজক, নমঃশূদ্র, বারুজীবী, মাহিষ্য, সদ্‌গোপ, বৈষ্ণব, ধাঙর, মেথর ও নাথ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উৎসব অনুষ্ঠানাদি গ্রথিত করা হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে বর্ষাকালে উৎসবাদি কম, যদিও একদম কোন উৎসব

অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় না এমন নয়। গ্রীষ্মকালের উৎসব অনুষ্ঠানের সংখ্যাও আনুপাতিক হারে কম। শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্তে উৎসব অনুষ্ঠানাদি অপেক্ষাকৃত বেশী। প্রকৃতপক্ষে ভাদ্রসংক্রান্তির বিশ্বকর্মা পূজা ও অরন্ধন থেকে চৈত্রসংক্রান্তির গাজন পর্যন্ত অনুষ্ঠানের শেষ থাকে না। তারপরেই ১লা বৈশাখ বা নববর্ষের উৎসব। এই অনুষ্ঠানের পরেই যেন একটু বিশ্রাম বা ভাঁটার টান। তারপর ফতেহা-দোয়াজ-দাহান, বুদ্ধপূর্ণিমা, জামাইষষ্ঠী, গঙ্গা ও মনসাপূজা, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ স্নান, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ছাড়া গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুর ব্রতপার্বণ, সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি উদযাপিত হয়ে থাকে। শরৎলক্ষ্মীকে কেন্দ্র করে উৎসবের জোয়ার আসে শরৎকালে। একটানা জোয়ারের বেগ বসন্ত অবধি। এই জোয়ার-ভাঁটার টানাপোড়েনে মানুষের সঙ্গে দেবতার, নিসর্গের সঙ্গে মানবমনের সহজ, সরল, প্রেম ও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ সম্পর্ক পাতানো বা মানানো নয়, এর ধারা অনাদি ও অনন্ত, রূপ অবিমিশ্র ও অকৃত্রিম, চরিত্র স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ, এবং উৎস সহজাত ও স্বতঃস্ফূর্ত। তাই প্রকৃতির জড়তায়, উষ্ণতায়, শুষ্কতায়, শ্যামলতায়, প্রাচুর্যে ও স্বল্পতায় মানবমনে ঘটে ভাবান্তর ও সুরবৈচিত্র্য।

সাধারণভাবে বাঙলার এইসব উৎসব-অনুষ্ঠানকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন, ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্মীয় অনুষ্ঠানকেও আবার হিন্দু, মুসলমান, জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক বিভাগে ভাগ করা যায়। ধর্মনিরপেক্ষ অনুষ্ঠানকেও বিভক্ত করা যায়—কৃষি, শিল্প, আঞ্চলিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যে। সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানের বহু উৎসব মহিলাদের এক্তিয়ারে। পুরুষদেরও কিছু কিছু নিজস্ব উৎসব আছে। পুরুষদের উৎসব অনুষ্ঠান ছাড়াও আছে মিশ্রউৎসব। বহু মেয়েলী উৎসবে পুরুষদের প্রবেশাধিকার নেই। তেমনি পুরুষদের বহু উৎসবেও যোগদান করার অধিকার থাকে না মেয়েদের। আবার কিছু কিছু উৎসব-অনুষ্ঠান আছে যার উদ্যোক্তা হয় কোন মহিলা না হয় কোন পুরুষ। সেই সব অনুষ্ঠানের কৃত্যে অনুমতি না থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে আনন্দ উৎসবে উদ্যোক্তা বিপরীত সম্প্রদায়ের লোকেদের যোগদানে বাধা থাকে না। এইসব উৎসব-অনুষ্ঠান-মেলা-পার্বণকে চরিত্র অনুযায়ী কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে।

মেলার চরিত্র বিভাগ নক্সা ঃ

ধর্মীয়	ধর্মনিরপেক্ষ	সাম্প্রদায়িক		
হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, আদিবাসী, মুসলমানী ইত্যাদি।	আঞ্চলিক সরকারী শিল্প, কৃষি মেলা ও উৎসব ইত্যাদি।	কেবল মাত্র পুরুষ	কেবল মাত্র স্ত্রীলোক	স্ত্রী-পুরুষ উভয় সম্প্রদায়
চৈত্রসংক্রান্তি রথযাত্রা ঝুলনযাত্রা গাজন, চড়ক মকর, ধর্মরাজ পৌষ, দোল মহালয়া দীপান্বিতা, করম মা-মোড়ে, বুদ্ধ-পূর্ণিমা, রুক্মিণী, বিষহরি, চণ্ডী, কালী, পার্শ্বনাথ উৎসব ইত্যাদি। মহরম, সবেবরাৎ ইদুজ্জোহা, ফতেহা-দোয়াজ দাহান, পীরের উৎসব, গাজীর উৎসব, ইছালে ছাওয়ার উরুস, ইত্যাদি।	বেরা উৎসব মেথরের মেলা কৃষি মেলা শিল্প মেলা পৌষ মেলা ধূতুল উৎসব ইত্যাদি।	কামদেব বা মদনোৎসব নৌকা বাইচ ঘুড়ি খেলা গাজন, চড়ক কালী, মহাকাল বাঁধনা, ইদ-মেলা ইত্যাদি।	সখীর মেলা বা সয়েলা, দই উৎসব বা ষষ্ঠীর মেলা, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া মেলা, বারুণী স্নান, টুসু, ভাদু, ষষ্ঠী, অম্বুবাচী, সিঁদুর খেলা ইত্যাদি।	দশহরা, তুলসী উৎসব, ঝুলন, রথযাত্রা, সাধুসন্তের আবির্ভাব উৎসব, গঙ্গাদিত্য পূজা ও মেলা, আশ্বিণ মেলা ইত্যাদি।

সাধারণভাবে এইরূপ বিভাগের উদ্দেশ্য মেলা উৎসব ও অনুষ্ঠান ইত্যাদির টাইপগুলো বোঝানো। ধর্মীয় উৎসবে প্রধানত উদ্যোক্তাগণ যে ধর্ম ও মতবাদে বিশ্বাসী তাদের একাধিপত্য। ধর্মনিরপেক্ষ উৎসবে সকল সম্প্রদায়ের সমানাধিকার। সাধারণতঃ ধর্মনিরপেক্ষ উৎসব-অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা সরকার অথবা তজ্জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠান। ধর্মীয়মেলার উদ্যোক্তা ধর্মে বিশ্বাসী সাধারণ লোক। সাধুসন্ত, পীর, বাবাজীদের আবির্ভাব, তিরোভাবে

যেসব অনুষ্ঠান হয় সেখানেও সরকারী সাহায্য থাকতে পারে। ধনী-সম্প্রদায়, ভক্তসম্প্রদায়ের সাহায্য তো থাকেই। সাম্প্রদায়িক উৎসব-অনুষ্ঠানকে স্ত্রী ও পুরুষ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভক্ত করা হয়েছে। ধর্মীয় সম্প্রদায়কে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী লোকেদের মধ্যে ফেলে দেখানো যেতে পারে—

উৎসব ও মেলার টাইপ নক্সা ৫

সর্প বা মনসা	সূর্য বা আদিত্য	নদী, পর্বত পাহাড়, বৃক্ষ	শাক্ত	শৈব	বৈষ্ণব	আনুষ্ঠানিক	লৌকিক	মিশ্র	সরকারী বা প্রতিষ্ঠানগত
মনসা ঝাপান বা বিসর্জন উৎসব ও মেলা (বীরভূম-মুর্শিদাবাদের সীমান্ত) ইত্যাদি	গঙ্গাদিত্য মেলা ও উৎসব (ভগীরথ-পুর, মুর্শিদাবাদ) ইত্যাদি	ঘাঘর বুড়ীর মেলা ও উৎসব (উষাগ্রাম, বর্দ্ধমান) করম উৎসব (মেদিনীপুর, পুরুলিয়া) আক্ষিণ স্নান (হাওড়া) মঙ্গর মেলা ইত্যাদি	দক্ষিণা কালী (রুদ্রপুর, কান্দী) শ্যামা পূজা ইত্যাদি	শিবরাত্রি মেলা ও উৎসব (নবদ্বীপ, তারকেশ্বর) গাজন গম্ভীরা নীল, চড়ক ইত্যাদি	কেন্দুলী জয়দেবের মেলা (বীরভূম) ঘোষপাড়া মেলা ও উৎসব সতীমার মেলা (নদীয়া) শ্রীপাঠ মেলা (চাকদহ) রাস, ঝুল্তি মেলা ইত্যাদি	মঙ্গলচণ্ডীর পূজা উৎসব (মঙ্গলকোট) টুসু, ভাদু মকর, পৌষ অরন্ধন ষষ্ঠী সয়েলা বা সখীর মেলা দই মেলা অম্বুবাচী ইত্যাদি	ধর্মরাজ পূজা (ছাতনা) দক্ষিণরায় (২৪ পরগণা) শীতলা ওলাউঠা ক্ষেত্রপূজা নবান্ন ইত্যাদি	সাহেবধনী উৎসব ও মেলা (বীরভূম) খেদরীতলার নিরঞ্জন ঠাকুরের মাড়ুমনী মেলা (মুর্শিদাবাদ) নববর্ষ উৎসব দেওয়ালী উৎসব বৈশাখী বা বুদ্ধ পূর্ণিমা ইতাদি	কৃষি মেলা শিল্প মেলা বঙ্গ সংস্কৃতি মেলা ও উৎসব রামকৃষ্ণ মেলা, ইত্যাদি

বাঙলার পূজাপার্বণ, মেলা ও উৎসবের রূপ ব্যাপক এবং বিচিত্র, গতি দুর্বার ও তীব্র। বিভিন্ন টাইপ ও বিভক্তিকরণের মধ্য দিয়ে এদের সর্বব্যাপকতা বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। কিন্তু সাধারণভাবে এখানে কোন উৎসব অনুষ্ঠানের বিবরণ উপস্থাপিত করা হয় নি। ছয়ঋতু, বারোমাস পর্যায়ক্রমে এসে উপস্থিত হয়, আবার সময় ফুরিয়ে গেলে একে একে চলে যায়। ঋতু, মাস, পক্ষ, শুভ-অশুভ দিনের আসা-যাওয়ার মধ্যে পৃথিবী বাঙলাদেশকে উপহার দেয় বিচিত্র সব উৎসব অনুষ্ঠান। প্রত্যেক ঋতুর যে বিশিষ্ট রূপ সেই রূপ-উদ্ভাসিত উৎসবের আগমনে ধরণী পুরাতন রূপের আবরণ খসিয়ে ফেলে নবীন সৌন্দর্যের কলহাসি হাসেন। লোক-উৎসব বাঙালীকে এক করে, আত্মীয় করে, অন্তরঙ্গ করে ও আনন্দে আপ্লুত করে দেয়। এ উৎসব শুধু একটা প্রথা নয়, এ উৎসব মানুষের আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ। প্রসঙ্গত, গ্রামবাঙলার মেলা-উৎসবের অধিকাংশের বর্তমান চেহারা দেখলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় এই মেলা-উৎসব হয়ে-ওঠা জাতের, গড়ে-তোলা জাতের নয়। অর্থাৎ গড়ে-তোলা জাতের মেলা-চরিত্র থেকে এর মূল পার্থক্য সন্ধানী দৃষ্টির কাছে নিতান্তই স্বচ্ছ।



॥ ৬ ॥

বাঙলার লোকজীবনের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন, উৎসব আচার অনুষ্ঠান ব্রত ও পার্বণ বাঙালীর নিত্যসঙ্গী। জননীর গর্ভে আশ্রয় নেবার সময় থেকে মৃত্যু অবধি অর্থাৎ, বিবাহ, সাধ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, নবান্ন, স্নান, সীমন্তোন্নয়ন, নামকরণ, হাতেখড়ি ইত্যাদির সম্পর্ক-যুক্ত পূজাচার ব্রতপার্বণ প্রভৃতি বাঙালীর জন্মমৃত্যুকে গ্রথিত করে রেখেছে। কি কৃষিজীবনে তথা হলচালনা ও বীজবপন, ধান্যরোপন, ধান্যচ্ছেদন ও ধান্যস্থাপন; কি শিল্পজীবনে তথা কর্মকারের হাপর, কুম্ভকারের চাকা, তাঁতীর তাঁত, চাষীর লাঙ্গল, মিস্ত্রির কারুযন্ত্র; কি ক্রয়বিক্রয় বাণিজ্য; কি দীক্ষা, গ্রহপূজা, শান্তিস্বস্ত্যয়ন, বৃক্ষাদিরোপণ, ঔষধকরণ ও সেবন, দ্বিরা-গমন, চূড়াকরণ, কর্ণভেদ, বিদ্যারম্ভ, গৃহপ্রবেশ প্রভৃতি জীবনবৃত্তের প্রত্যেকটি কাজেই, প্রত্যেকটি আচার অনুষ্ঠানেই জাতিধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে সকলে স্ব স্ব আচারানুষ্ঠানের অধিকারী। কৃষি ও কারুজীবনের পূজা, ব্রত ও আচারকে কেন্দ্র করে বাঙালীর ধর্মকর্মময় জীবনের অনেক সৃষ্টির আনন্দ ও উদ্যোগ, তার শিল্পময় জীবনের অনেক মাধুর্য ও সৌন্দর্য। বাঙালীর বারো-মাসে অনেক পার্বণ, অনেক ব্রত, অনেক পূজা, অনেক আচার।

মানুষ একই নিয়মে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম করতে পারে না। কাজ করতে করতেই সে মাঝে মাঝে নিয়মিত কর্ম থেকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও বিরাম চায়, কর্মের মধ্যে বৈচিত্র্য চায়। এই বৈচিত্র্যের অভাবে তার চিত্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। বিশ্রামের অভাবে কর্মে শৈথিল্য আসে। তাছাড়া মানুষের মন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি নিরন্তর ধাবিত হচ্ছে, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ নিরন্তর উপভোগ করেও যেন সে তৃপ্তি পাচ্ছে না। যত ভোগ, তত তৃষ্ণা, তার সন্তোষ নেই। যার সন্তোষ নেই তার শান্তিও নেই। অথচ এই শান্তির উৎস তার অন্তরেই আছে। প্রত্যহ না হোক, মাঝে মাঝে আত্মারামের ধ্যান করতে পারলে অশান্তচিত্তেও শান্তি আসে। তাই যে যে দিন আমাদের জানতে হয়, স্মরণ রাখতে হয়, বেছে বেছে সেইসব দিনেই পূজাচরণ ও ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। মেলা ও উৎসবের মধ্যে আনন্দ-সুখ অনুভূত হয়।

এই অনুভূতি থেকে উন্মুক্ত আকাশের নীচে বা গাছের ছায়ায় 'থান' নির্দিষ্ট হয়েছে, কোনও কোনও থানে মূর্তিরূপী কোন দেবতার অধিষ্ঠানও হয়েছে। সেখানে 'মানৎ' করা হয়। দেবতাকে তুষ্ট রাখার সর্বপ্রকার চেষ্টাও করা হয়। এখানকার পূজারী আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃত সমাজের দ্বারা পতিত হয়েছেন, পূজানুষ্ঠানকারীসমাজ বারে বারে তিরস্কৃত হয়েছেন সমাজাধিপতি লোকেদের কাছে, তবু লোকাচরণীয় পূজা, ব্রত, উৎসবের ধারা অব্যাহত আছে। এবং ধীরে ধীরে লোকাচরণীয় বহু ব্রত-উৎসব-পূজা-অনুষ্ঠান ইত্যাদি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-কর্মে ঢুকে পড়েছে।

তাই শীতলা, মনসা, বনদুর্গা, ষষ্ঠী, চণ্ডী, শিব, কালী, জাঙ্গুলী, ত্রিনাথ, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মকর্মে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ধ্বজপূজা বা গরুড়-ধ্বজ, মীনধ্বজ, ইন্দ্রধ্বজ, হংসধ্বজ, ময়ূরধ্বজ, কপিধ্বজ, তাম্রধ্বজ প্রভৃতি কোম বা গোষ্ঠীর ধ্বজা সমূহের প্রতীক পশুপক্ষীগণকে পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক দেবদেবীর রূপকল্পনায় বিভিন্ন দেবদেবীর বাহনে পরিণত করতে হয়েছে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে। তাই বেদী বা মন্দিরের সম্মুখে স্তম্ভের উপর বা মন্দিরের চূড়ায় উড্ডীয়মান ধ্বজা বা কেতনের পূজা থেকে চড়কপূজা, ধর্মপূজা, বৃক্ষ-লতা-পাতা-ফুল-ফলাদি পূজা বাঙালীর পূজা-ব্রত-আচারের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঙালীর আদিবাসীগোষ্ঠী-সমূহের অন্যতম উৎসব যাত্রাও এইভাবে আর্যীকৃত হয়ে স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, দোলযাত্রা, রাস-যাত্রায় পরিণত হয়েছে। যাত্রা শব্দের অর্থ গমন, দেবতার উৎসব। যে দেবতা গমন করেন, বহু লোক যাঁর অনুগমন করেন, তা যাত্রা। দুর্গাপূজার সময় দুর্গা গমন করেন না তাই দুর্গাযাত্রা বলা যায় না, বলা হয় দুর্গাপূজা। ঋজুপথে কিম্বা বৃত্তপথে এদিক সেদিক দোলনও যাত্রা। সূর্যের উত্তর থেকে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ থেকে উত্তরাগমনও যাত্রা। উত্তরায়ণের পরদিন মকরস্নান। সূর্যের উত্তরায়ণ থেকে দক্ষিণায়ণে বর্ষা ঋতু আসে। ইন্দ্র বর্ষণ করেন তাই শস্য জন্মায়। ইন্দ্র কুপিত হলে হয় সর্বনাশ।

এই সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা পেতে যাত্রা, ধ্বজপূজা ইত্যাদির মত ব্রতোৎসবও ছিল প্রাচীন বাঙালীর অন্যতম প্রধান অবলম্বন। এখনও ব্রতোৎসব বাঙালী মহিলাদের ধর্মজীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। অবশ্য তার জন্য আদি বা প্রাচীন চরিত্র থেকে তাদের অনেকটা দূরে সরে আসতে হয়েছে আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির লেনদেনের ধাক্কায়। এই ধাক্কায় বিধ্বস্ত হয়েও যেসব ব্রত আদিতম চরিত্র রক্ষা করতে সচেষ্ট তা

যোষিৎপ্রচলিত বা মেয়েলী ব্রত। আমাদের সদর যতটা বদলেছে অন্তঃপুর ততটা বদলায় নি বলেই মেয়েলীব্রতে আদিমতার সন্ধান মেলে।

মেয়েরা এমনিতেই রক্ষণশীলা, তাই অঙ্গনের ঠাকুরমার সঙ্গে নাতনির, নাতনির সঙ্গে ঠাকুরমার চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণা ও কাজকর্মের মধ্যে খুব একটা তফাৎ দেখা যায় না। ফলতঃ অধিকাংশ মেয়েলীব্রতই অবৈদিক, অস্মার্ত, অপৌরাণিক ও অব্রাহ্মণ্য, এবং মূলত যাদু ও প্রজনন শক্তির পূজা। বাঙলার ব্রত বাঙলার কৃষিজীবী সমাজের সঙ্গে একান্ত সম্পৃক্ত। দৃঢ়বদ্ধ আদিম সমাজের সমষ্টিপ্রবণতা থেকেই লোকায়ত ব্রতানুষ্ঠানের বিকাশ ও বিবর্ধন। আত্মম্ভর আশায় উদ্দীপিত মানুষের ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানসমূহ প্রকৃতিকে বশীভূত করার মায়াবী কৌশল মাত্র। বাস্তবকে বশ করার জন্য, রুষ্ট প্রকৃতিকে তুষ্ট করার জন্য বিশেষ বিশেষ গাছ, পাথর, পাহাড়, ফল, মূল, পশু, পক্ষী, বিশেষ বিশেষ স্থান, নদনদী প্রভৃতির উপর দেবত্ব বা ঐ রকম একটা কিছু আরোপ করার প্রবণতা বাঙালী আদিম অধিবাসীদের কাছেই পেয়েছে। তুলসী, শেওড়া, অশ্বত্থ, বট, পাকুর, ডুমুর, সিজ, বেল, মহুয়া, কলা, ধান প্রভৃতি গাছ পুজোও আদিবাসী সমাজের কাছেই পাওয়া।

বিভিন্ন গাছ বিভিন্ন দেবতার প্রতীক। যেমন বিষ্ণুর তুলসী, কৃষ্ণের কদম, শিবের বেল, মনসার সিজ, শীতলার নিম, লক্ষ্মীর কলাগাছ প্রভৃতি। গাছের সঙ্গে গাছের, গাছের সঙ্গে মানুষেরও বিয়ে হয়। নবমল্লিকার সঙ্গে আম গাছের বিয়ে দিয়েছেন কালিদাস। কল্পবৃক্ষ যক্ষিণীদের প্রসাধন যোগাত বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন। কল্পতরু নাকি মানুষের সর্বপ্রকার কামনা বাসনা পূর্ণ করতে সক্ষম। সোমরসও বৃক্ষজাত। বটগাছ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের আবাসস্থান, তাই এ গাছকে জ্বালানি কাঠ হিসাবে ব্যবহার করে না হিন্দু। পরন্তু নানাভাবে এ গাছের পূজা করে তারা। প্রেম, ভালবাসা, সমন্বয় ও একীকরণের প্রতীক হিসেবেও বটগাছের কদর। বট অক্ষয় ও চিরকালের সাক্ষী, অক্ষয় জীবনের প্রতীক। কৃষ্ণকেও আশ্রয় দেয় বটবৃক্ষ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে কোন কোন রাজাকে এই বৃক্ষের দুধ খেতে বলা হয়েছে সোমরসের বদলে। প্রাচীনকালে এরূপ বিশ্বাস ছিল যে এই গাছের ডাল থেকে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করলে নির্বাণ পাওয়া যায়। এ বিশ্বাস থেকে অনেক ধর্মার্থী ওভাবে প্রাণত্যাগ করেছেন। প্রতি রবিবার অশ্বত্থ গাছে লক্ষ্মীদেবীর অধিষ্ঠান হয়, তাই রবিবারে নির্দিষ্ট হয়েছে অশ্বত্থ পূজা। বিভিন্ন সময়ে এই

গাছের ডালে ঘট বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। পিতৃশ্রাদ্ধের সময় এই ঘটে দুধ, দই, জল, তিল প্রভৃতি প্রদান করা হয়। গাছ প্রদক্ষিণ করা হয় তিন, পাঁচ কি সাত বার। বহু গ্রামদেবতা এ গাছের ছায়ায় বসবাস করেন। বুদ্ধদেবও এগাছের নীচে ধ্যান করেই বোধি পেয়েছিলেন। অনেকে কলেরা বসন্তের হাত থেকে উদ্ধার পেতে নিম-সিজ প্রভৃতি গাছের কবচ ধারণ করেন। নিমগাছের পাতা দিয়ে বসন্ত, হাম প্রভৃতি রোগীদের বাতাস দেওয়া হয়। নিম খুবই প্রয়োজনীয় ওষধি। কোন রোগীর তাপমাত্রা কমে গেলে নিমতেল মাথায় ও পায়ের নীচের দিকে ঘষলে নাকি রোগী উত্তাপ ফিরে পায়। নিম রক্ত পরিষ্কারকও বটে। নিমের রস ও ফুল রক্ত পরিষ্কার করে। বাঙালী নিমবেগুন খায়। নিমের পাতা, ফল, ফুল, ছাল দিয়ে নানাবিধ সিরাপ, সাবান, মাজন ইত্যাদি তৈরী করা হয়। লোকবিশ্বাস, নিমকাঠ দিয়ে যারা রান্না করে খায় তাদের সাপে কামড়াতে পারে না। সাপে কাটা লোককে যখন নিম পাতা চিবোতে দেওয়া হয় তখন যদি রোগী নিমের তিতা বুঝতে পারে তবে তাকে বাঁচান যায়। অপদেবতা বিতাড়নেও নিমের স্থান। কোন মানুষকে অপদেবতায় ধরলে তাকে পোড়া নিমপাতার গন্ধ শোঁকানো হয়। নিমের ফল মাটির পাত্রে পোড়ান হয়। প্রসূতির ঘরে যাতে অপদেবতা ঢুকতে না পারে তার জন্য ঘরের চারদিকে নিমের ধোঁয়া দেওয়া হয়। কোন কোন স্থানে আঁতুড়ঘরের দরজায় মাটির পাত্রে গোমূত্র ও নিমপাতা রাখা হয় অপদেবতা বা দুষ্টদেবতা বিতাড়নে। মহারাষ্ট্রের চিৎপাবন ব্রাহ্মণ প্রসূতির ঘরে ঢোকবার পূর্বে গোমূত্র দিয়ে হাত ধুয়ে নেন। হাত ধোবার জল বা গোমূত্র নিমের পাতা দিয়ে নিতে হয়। অনেকে ঘরের কোণে নিমের ডাল পুঁতে রাখেন নবজাতকের জন্মের পর। কানফাটা যোগীরা কানের ছিদ্রে নিমের ডাল গুঁজে রাখেন। বেলগাছ আরেকটি উল্লেখযোগ্য গাছ। এর ফল শ্রীফল, দেবীকুচের প্রতীক। যূপকাষ্ঠ বেলকাষ্ঠেই তৈরী হয়। এ গাছকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। নীলের পাটগোঁসাই এ গাছের কাণ্ড দিয়েই তৈরী। এ গাছেরও অনেক ওষধি গুণ বর্তমান। রাতকানা-দোষ সারাবার জন্য বেলপাতার রস সেব্য। বিহার ও উত্তরপ্রদেশের মেয়েরা এ গাছের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হন শিব বা মহাদেবের সঙ্গে আলিঙ্গনে মিলিত হবার বাসনা নিয়ে, তাঁদের সর্বাধিক মনস্কামনা সিদ্ধ করার আশা নিয়ে। বাঁশ আরেকটি উল্লেখযোগ্য গাছ। কৃষ্ণের হাতের বাঁশী এই গাছেরই দান। বিয়ের মণ্ডপে বাঁশ দরকার। মড়ার খাটিয়ার জন্যও বাঁশ। পৈতার সময়

দ্বিজকে বাঁশের লাঠি উপহার দেওয়া হয়। শ্রাদ্ধেও ব্রাহ্মণকে বাঁশের মশারী দেবার বিধান আছে। কাঁচাবাঁশ পবিত্র। শুকনাবাঁশের দেবত্ব নেই। বাঁশ অপদেবতাদের তাড়াতেও পটু। তাই অনেকে প্রসবাগারের দুই দিকে দু'খানি বাঁশখণ্ড রাখেন। অনেক জায়গায় নবদম্পতি প্রথম ঘরে ঢোকার সময় বাঁশের পোলে পা দিয়ে তবে ঘরে ঢোকেন। ঢোকার সময় বাঁশের তৈরী খাড়ুই ভর্তি কই মাছ হাতে নেন নববধূ। বাঁশের পোল যৌথ সংসারের প্রতীক। খাড়ুই ও কই মাছ দীর্ঘজীবন ও অধিক সন্তানের প্রতীক। অনেকে দম্পতির মাথায় বাঁশের মুকুট পড়ান, অনেকে তাদের বাঁশক্ষেত পরিভ্রমণ করান। গারো সম্প্রদায়ের লোকেরা কৃষি কর্ম অন্তে বাঁশগাছ পূজা করেন। অনেকে মনে করেন বাঁশঝাড়ে ভূত পেত্নী বসবাস করে। এ গাছ বাঙালী জীবনের একটি অপরিহার্য সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। আমগাছ আরেকটি উল্লেখযোগ্য গাছ। হিন্দু শবদেহ দাহনে আম্রকাষ্ঠ বিশেষ প্রয়োজনীয়। বিয়ে ও পৈতায় আম-কাঠের পিঁড়ির দরকার। জন্ম ও মৃত্যুর সর্বপ্রকার অনুষ্ঠানেই আছে আম গাছের স্থান। শনি ও মঙ্গলবার আমগাছ কাটা বা ভাঙা নিষেধ। কখনই আমগাছ কাটা উচিত নয়, কাটলে সংসারের অমঙ্গল হয়। আমগাছের ফল পুরুষ বংশধরদের প্রতীক। এই গাছের পল্লব ব্যতীত হিন্দুর কোন শুভকাজ বা আচার অনুষ্ঠান হতে পারে না। আরেকটি উল্লেখযোগ্য গাছ পলাশ। পলাশপত্র ত্রিদেবের প্রতীক। পলাশকাঠে মৃতের সৎকারে পুণ্য অর্জিত হয়। বৃষকাঠের কাঠেও পলাশ। ব্রহ্মচারী ডান হাতে যখন পলাশের লাঠি নেন তখন তাঁর পৈতা হয়। পলাশের ডাল দিয়ে গরুকে আঘাত করা হয় গরুর কাছ থেকে বাছুরকে সরিয়ে নিতে। নারকেলকে বলা হয় মানুষের মাথা। সুতরাং নরবলির রেওয়াজ কমে এসে নরমুণ্ডের বদলে নারকেল উপহার দেওয়া হত পূজায়। পূজার নারকেলের ব্যবহারের মধ্যে নরবলির প্রথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গুজরাটের অনেক জায়গায় বিয়ের পরে পাত্রপাত্রীকে নারকেল উপহার দেওয়া হয়। এই নারকেল সারা জীবন রক্ষা করার নিয়ম। মহীশূরের অধিবাসীগণ নারকেলকে পারিবারিক দেবতারূপে মনে করেন। অনেক লোক নারকেলকে পিতৃঋণের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেন। তুলসী আরেকটি উল্লেখযোগ্য গাছ। তুলসী বিষ্ণুর প্রতীক এবং হরিপ্রিয়া, ভূতাঙ্গিনী প্রভৃতি নানা নাম তার। তুলসীতলায় প্রদীপ হিন্দুর অবশ্য কৃত্যের একটি। রবি ও মঙ্গলবার তুলসীপাতা চয়ন নিষিদ্ধ। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশীতে তুলসীর সঙ্গে বিষ্ণুর বিয়ে দেওয়া হয়। তুলসীর সঙ্গে গঙ্গাজল মৃত ব্যক্তির মুখে দেওয়া হয়। বৈষ্ণবেরা তুলসীর

মালা পরিধান করেন। কার্তিক মাসের শুক্লা নবমীতে অনেক জায়গায় মেয়েরা আমলকী গাছের পূজা করে। অনেকে ব্রাহ্মণকে চালকুমড়া উপহার দেয়। সঙ্গে সোনা রূপা বা পিতলের মুদ্রা, কুমড়ার গর্তে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণ গুপ্তধন হিসাবে তা গ্রহণ করেন। পুত্রপ্রাপ্তির জন্য এই গুপ্তধন ব্রত। ব্রত-পূজা-অর্চনায় নানাভাবেই আছে নানাগাছের সমাদর বাঙালী সমাজে। এই সমাদর থেকেই বিভিন্ন দেবতার প্রতীক হিসাবে অনুষ্ঠিত হয় গাছের পূজা।

অনেক ব্রতে গাছের ডাল দরকার হয়। আমাদের সমস্ত অনুষ্ঠানে আম্রপল্লবের প্রয়োজন। কলাবউ, ধানেরছড়া, খাগেরকলম, পাতা, আখ, দুর্বা, কুশ প্রভৃতি আদিবাসীদের ধ্যানধারণার স্মৃতি বহন করে। চাল-কুমড়া, কলার থোড়, কলার মোচা, ধানের গুচ্ছ, ধানদুর্বার আশীর্বাদ, হলুদ, সুপারী, পান, নারকেল, সিঁদুর, মঙ্গলঘট, ঘটের উপর আঁকা বিভিন্ন প্রতীক চিহ্ন, নানাপ্রকার লতাপাতাযুক্ত আলপনা, গোবর, কড়ি প্রভৃতি ব্রতের উপাদানসমূহ আদিম অধিবাসীদের সংস্কার ও সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত বলেই ঋগ্বেদ থেকে সুরু করে কোন প্রাচীন সূত্রগ্রন্থে এইসব উপাদানের দ্বারা অনুষ্ঠিত পূজা বা লোকসমাজে প্রচলিত ব্রত ইত্যাদির কোন উল্লেখ নেই।

আদি ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম এবম্বিধ অনুষ্ঠানকে স্বীকার করত না। ফলে বাঙলার ব্রতের বয়স নির্ধারণ দুরূহ হয়ে পড়েছে। এক বছরে মাসের সংখ্যা মাত্র বারো, আর ব্রত কিছু না হলেও শ দুয়েক। অর্থাৎ গড়পরতা একদিন অন্তর কোন-না-কোন ব্রত আছেই। এই গড়পরতা হিসাবে আছে কোনদিন একাধিক ব্রত, কোনদিন ব্রতহীন। যেমন এদের বিষয় বৈচিত্র্য তেমনি সামগ্রিকভাবে এগুলি শিল্পিত। ব্রতপালনে কথকতার ভূমিকাও স্মরণীয়। রূপকথা ও উপকথার মত বাঙালীর নিজস্ব লোককথা বাঙলার ব্রতকথা।

স্মরণীয়, আদিম মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে নানাবিধ আচার-আচরণ প্রতিপালন করেছে। প্রকৃতির রূপ পরিবর্তন, ঋতু পরিবর্তন, দিনরাত্রির পরিবর্তন, চন্দ্র-সূর্যের উদয়-অস্ত, জীব-জন্তু-বৃক্ষ-লতাদির জন্মমৃত্যু তাকে জীবন সম্পর্কে সপ্রতিভ করে আচারানুষ্ঠানের পত্তন করতে সাহায্য করেছে। মানুষ দেখতে পেল জীবজন্তু গাছপালা প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছে, অন্তর্হিত হচ্ছে। জলবায়ু ও ঋতু দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে মানবজীবনে নানা সমস্যার সৃষ্টি করছে। ধরিত্রীর সন্তান মানুষ প্রকৃতির বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও বিবর্তিত হচ্ছে। জীব-জন্তু-বৃক্ষ-লতাপাতাদিরও বিবর্তন হচ্ছে। হঠাৎ

জীবনের উদয়, হঠাৎ সে জীবনের বিনাশ রোধ করতে, ধরিত্রীকে সুজলা-সুফলাশস্যশ্যামলা করতে, ধরিত্রীর উর্বরতাবৃদ্ধি করতে সে বিভিন্ন উপায় আবিষ্কার করেছে বা পথ বেছে নিয়েছে।

ঋতুকেন্দ্রিক আচারানুষ্ঠান এই পথধারার একটি। সে লক্ষ্য করল গ্রীষ্মের শুষ্ক পৃথিবী রৌদ্রতাপ থেকে মুক্তি পেতে চায় বর্ষণ, কিন্তু বর্ষণ-দেবতার মালিক কে তা সে জানে না। তাই সে যাদু বা ম্যাজিকের আশ্রয় নিল। নানা আচার-আচরণে ধরিত্রীকে তুষ্ট করে প্রকৃতির কৃপা চাইল। আচার আচরণের বা অনুষ্ঠানের সঙ্গেই সে তৃপ্তি পেল না। কথায়, লেখায়, আচরণে ও ভঙ্গিতে তাই মনের কথা প্রকাশ করল সে। রচিত হল মন্ত্র, ছড়া, গান ; সৃষ্টি করল আলপনা। আদিম সমাজের চাওয়া-পাওয়ার রূপ প্রতিফলিত হল লোকবৃত্তে, লোকাচরণে, পূজা-পার্বণে ও মেলায়।

গ্রীষ্মের দাবানলের হাত থেকে উদ্ধার পেতে আদিম মানুষের বহু কৃত্য বাঙালীর ব্রতে রূপান্তরিত হল। বাঙলার কুমারী মেয়ে তাই বৃষ্টির কামনায় পুকুর কেটে, তার মধ্যে বেলের ডাল পুঁতে, কাটা পুকুরে জল ঢেলে, বেলের ডালে ফুলের মালা ও পুকুরের চারধারে ফুল সাজিয়ে ছড়া কাটে—'পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা কে পূজেরে দুপুর বেলা? আমি সতী লীলাবতী, ভাইয়ের বোন পুত্রবতী, হয়ে পুত্র মরবে না, পৃথিবীতে ধরবে না, হয়ে পুত্র মরবে না, চোখের জল পড়বে না, পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে, মরণ যেন হয় গঙ্গাজলে'। বসুধারাব্রত করার সময়ে মাটির ঘট ফুটো করে বৃষ্টির অনুকরণে, গাছের মাথায় জল ঢালে আর গান গায়—'গঙ্গা গঙ্গা ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ বাসুকি, তিনকুল ভরে দাও ধনে জনে সুখী'। বর্ষার জন্য কামনা এ ভাবে জানান হয় ধরিত্রীকে উর্বর করার জন্যই।

বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জমির চাষ হয়। বীজবপন করা হয়। গবাদি পশুর সুস্থতা সেখানে একান্তই কাম্য। গবাদি পশুর সুস্থতার জন্য করা হয় গোকাল ব্রত। স্নানের পর গরুর শিঙে সরষের তেল, হলুদবাটা মাখিয়ে মাথায় আর শিঙে গঙ্গাজল ঢালা হয়। গরুর ক্ষুর তেল হলুদ ও জল দিয়ে ধৌত করে দিয়ে আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে হয়। তারপর চিরুণী দিয়ে গরুর মাথা আঁচড়ে দিয়ে দর্পণে মুখ দেখাতে দেখাতে বলতে হয়—'তোমার ঘুরিয়ে পাখা, আমি পরবো সোনার শাঁখা, তোমারে বাতাস করে, ঘর করবো সতীন মেরে, রোগশোক দূরে যাবে, কীটপতঙ্গ দূর হবে,' বলতে বলতে বাতাস দেওয়া হয় গরুকে। তারপর তাকে খাওয়ান হয়। তখন

বলা হয় 'গোকাল গোকুলে বাস গরুর মুখে দিলাম ঘাস। আমার যেন হয় বৈকুণ্ঠে বাস'। এই ব্রত অতি প্রাচীনকাল থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় গরুর উপকারিতা দেশবাসী উপলব্ধি করতেন এবং গরুর সঙ্গে পরিবারের একজনের মতই ব্যবহার করতেন। তাই তাদের মনে গরুর প্রতি একটি একাত্মবোধ—মধুরভাব গড়ে উঠেছিল। প্রতিগৃহে গরুকে যথাযথ সেবা ও যত্ন করা হত, গরুকে বাঞ্ছিত হিতৈষী বন্ধুর মত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা হত। গোপালনে সকলে দরদীমন নিয়ে আগ্রহ দেখাতেন। গরুর কাছে আমরা যে কত ঋণী তার স্বীকৃতি দিতেন, সেবা দ্বারা সেই ঋণের পরিশোধ করতে চেষ্টিত থাকতেন। প্রতি ঘরেই পূর্বে গরু রাখা হত।

চৈত্রমাসের চড়ক সংক্রান্তি হতে করতে হয় এ ব্রত। পাঁচ বৎসরের কুমারী এ ব্রত করতে পারে। ব্রতে দূর্বাঘাস তিন আঁটি, একখানি পাখা, একঘটি জল, ছোটবাটিতে সরিষার তেল, একটু হলুদ বাঁটা, একটু সিঁদুরগোলা, চন্দন, তিনটি পাকা কলা, আরশি ও চিরুণীর প্রয়োজন। গরুর (গাই গরু) শিঙে তেল মাখানো হয়, মাথায় একটু জল দিতে হয়, কপালে হলুদ, সিঁদুর ও চন্দনের ফোঁটা দিতে হয়। গরুর চারপায়ে তেল-হলুদ জল দিয়ে গরুর পা ধুইয়ে দেবার সময় এক আঁটি দূর্বাঘাসে একটি আস্ত কলা দিয়ে বলতে হবে— "গো-কুল গোকুলে বাস গরুর মুখে দিয়ে ঘাস আমার যেন হয় স্বর্গে বাস"। তিন তিনবার তিন তিনটি আঁটি দিতে হয়। তারপর পাখা দিয়ে বাতাস করতে করতে বলতে হয় "রোগ শোক দূর হোক, কীট পতঙ্গ দূর হোক, মশা মাছি দূর হোক। তোমায় ঘুরায়ে পাখা, আমার হোক সোনার শাঁখা, তোমাকে বাতাস করি, সতীন ছাড়া ঘর করি॥"

এ ব্রতে রূপার খুর চারটি, সোনার শিঙ দুটি, কাপড় একখানা, এক-গাছা লাঠি ও একটি ছাতা দরকার হয়। কাপড়, লাঠি ও ছাতা রাখাল পেয়ে থাকে। খুর ও শিঙ ব্রাহ্মণে পেয়ে থাকে। আবার কোথাও কোথাও রাখালই তা পায়। কোথাও আবার ধুতি, চাদর, খড়ম, পাখা, আরশি, চিরুণী, পাঁচনী দেয়া হয়। অনেক জায়গায় পূজা ও হোম করা হয়। এই গো-পূজার মধ্যে বাঙালীর আদিম সমাজ-জীবনের চিত্রটি ফুটে উঠেছে, ফুটে উঠেছে প্রাচীন ক্রিয়াকর্মের পদ্ধতি। পশুকেও দেবতার আসনে বসাবার আকূতি এখানে লক্ষণীয়।

এরপরেই হয় পৃথিবীব্রত। প্রত্যহ সকালে স্নানান্তে পিটুলি বা চন্দন দিয়ে মাটিতে প্রথমে পদ্মের আলপনা আঁকা হয়, পরে সেই পদ্মের উপর গোলাকার

পৃথিবী আঁকা হয়। পৃথিবীর উপর ফুল, তুলসী, দূর্বা ও চন্দন দিয়ে বলা হয়—"এস পৃথিবী পদ্মাসনে, পূজি তোমায় ভক্তি মনে। খাওয়াব চিনি, মাখাব ননী, আরজন্মে হব রাজরাণী। এজন্মে বিলাব ঘি, আরজন্মে হব রাজার ঝি। এজন্মে বিলাব মৌ, আর জন্মে হব রাজার বউ। এজন্মে বিলাব মধু, আরজন্মে হব রাজার বধূ।" এ ব্রতের কামনাও অধিক ফসলের জন্য, উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য, অধিক সম্পদের জন্য।

শুধু কৃষি ও বপনের জন্য নয়, বিবাহের জন্যও গ্রীষ্মঋতু তাৎপর্যপূর্ণ। সুপাত্রস্থ হবার আশায় এ সময় কুমারী মেয়েরা করে শিবপূজা ব্রত। গঙ্গামাটি বা শুদ্ধমাটি, আকন্দ ও ধুতুরাফুল, বেলপাতা, দূর্বা, শ্বেতচন্দন, বেলেরখোলা, তামার টাট, আতপচাল, কাঁঠালীকলা এ ব্রতের উপাদান। অঞ্জলি-মন্ত্র পাঠ করে বলে, 'কালা পুষ্প তুলতে গেলাম যেখানে সেখানে অনেক লতাপাতা। শিবচরণে দেখা হল শিবের মাথায় অনেক জটা। আকন্দ, বিল্বপত্র তোলা গঙ্গাজল, এই পেয়ে তুষ্ট হলেন ভোলা মহেশ্বর'। শিবকে তুষ্ট করার উদ্দেশ্য শীঘ্র বিবাহের ব্যবস্থার জন্য আবেদন। এসব ব্রতের আচরণ ও কৃত্যের মধ্যে যাদু, উর্বরতা বৃদ্ধি ও প্রজননজনিত চিন্তা বিদ্যমান। এবং এ চিন্তা আদিম মানুষের চিন্তাভাবনা থেকে আজও পর্যন্ত স্বতন্ত্র নয়, অগ্রগামী নয়।

বর্ষা আসে ধারা হয়ে। চারদিকে সর্প ও অন্যান্য প্রাণীদের ভয়ে ভীত মানব আরম্ভ করে মনসাব্রত। মনসা বা সিজ গাছকে মনসার প্রতীক রূপে কল্পনা করে তাকে দুধকলা, চিড়ামুড়কি ও ফলের নৈবেদ্য দেওয়া হয়। ব্রতিণী দুবেলা ফলার করেন। অপরে অরন্ধন হেতু পান্তাভাত খান।

সসাপাতাব্রত উর্বরতা বৃদ্ধির ব্রত। ভাদুলীব্রত বাণিজ্য সম্পর্কিত ব্রত। কৃষিজীবী সম্প্রদায় যখন কৃষিকাজ থেকে বিশ্রাম পায় তখন অনেকে বাণিজ্যে যায়। অনেকে কেনাকাটা করতে দূরদেশে যায় নৌকায় চড়ে। ভাদ্র মাসের ভরানদী, কলসীকাঁখে জল তুলতে যাচ্ছে ছোট্ট মেয়ে, যাচ্ছে ঘোমটা দেওয়া নতুনবউ, সঙ্গে সখী। ছোটমেয়ে নদীর জলে ফুল ফেলে আর বলে—'নদী নদী কোথায় যাও? বাপ-ভায়ের বার্তা দাও'। নতুন বউ বলে—'নদী, নদী কোথায় যাও? সোয়ামী-শ্বশুরের বার্তা দাও।' এই সময় বৃষ্টি হয়। সকলে জলে-স্থলে ফুল ছিটিয়ে দিতে দিতে বলে, 'নদীর জল বৃষ্টির জল যে জল হও। আমার বাপ-ভায়ের সম্বাদ কও'। বৃষ্টির শেষে সাদা বক উড়ে যায়, কাক কা কা করে। তখন ওদের লক্ষ্য করে বলা হয়—'কাগারে, বগারে কার কপালে খাও? আমার বাপভাই

গেছেন বাণিজ্যে, কোথায় দেখলে নাও?' নদীর চরকে উদ্দেশ্য করে বলে—'চড়া চড়া চেয়ে থেকো, আমার বাপ-ভাইকে দেখে হেসো', স্রোতের টানে ভেলা ভেসে আসছে দেখে বলে—'ভেলা ভেলা সমুদ্রে থেকো, আমার বাপ-ভাইকে মনে রেখো'। বনে বাঘের গর্জন শুনতে পেয়ে বলে—'বনের বাঘ বনের বাঘ, তোমরা দিওনা আমার বাপ-ভায়ের দোষ'। বলে—'বাপ-ভাই গেছেন কোন ব্রজে? সোয়ামী-শ্বশুর গেছেন কোন ব্রজে? তারা গেছেন এক পথে, ফিরে আসবেন আর পথে'। উদয়গিরিকে পূজা করে বলে—'কাঁটার পর্বত, সোনার চূড়া, উদয়গিরি, তোমারে যে পূজিলাম সুমঙ্গলে, আসুন তাঁরা আপন বাড়ী'। সাগরের প্রতি—'সাগর! সাগর! বন্দি, তোমার সঙ্গে সন্ধি, ভাই গেছেন বাণিজ্যে, বাপ গেছেন বাণিজ্যে, সোয়ামি গেছেন বাণিজ্যে, ফিরে আসবেন আজ। ফিরে আসবেন আজ। ফিরে আসবেন আজ'। এরই মধ্যে বাবুই পাখি ডাকে। তখন বলে—'পুঁটি! পুঁটি উঠে চা। ভাদুলিমায়ে বর দিল, ঘাটে এল সপ্ত না'। নৌকা-বরণে ডালা হাতে নিয়ে মেয়ে-বউ বলে 'পড়শি লো পড়শি! তালতাল পরমায়ু, তালের আগে চোক। ঘাটে এসে ডঙ্কা দেয়, কোন বাড়ীর লোক?'—'আমার বাপের বাড়ীর লোক, আমার বাপের বাড়ীর লোক, আমার বাপের বাড়ীর লোক'। মেয়ে-বউরা নৌকাবরণ করে—'এ-গলুয়ে ও গলুয়ে চন্দন দিলাম। বাপ পেলাম, বাপের নন্দন পেলাম। এ-গলুয়ে ও-গলুয়ে সিঁদুর দিলাম। বাপ ভায়ের দর্শন পেলাম। কলার কাঁদি, কলার কাঁদি, তোমাকে দিয়া গঙ্গায় আমরা গিয়া রাঁধি।' শুদ্ধাচারে ব্রত শেষ হয়। বাণিজ্য ফেরত বাপ-ভাই ফিরে এসেই কৃষিকার্যে ব্যাপৃত হয়।

পুরুষ বিদেশে থাকার দরুণ নারীমনের যন্ত্রণা চমৎকারভাবে প্রকাশ পেয়েছে এইসব ব্রতে। প্রকাশ পেয়েছে নাবিক ও যাত্রীদের কর্ম ব্যস্ততার কথা। 'একূল ওকূল উজানভাটি নামলাম এসে আপন মাটি। এক নৌকা চড়ায় লাগালাম, এক নৌকা ছাড়লাম। ব্রজে যাই, বাণিজ্যে যাই, সকল নৌকা পেলাম।' চাওয়া-পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় সমগ্র ব্রত কল্পিত।

ভাদুলীব্রতের পরে দুর্গাষষ্ঠী, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা, দীপান্বিতা উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়ে চলে একে একে। লক্ষ্মীর সঙ্গে ধান্য ও শস্যের সম্পর্ক কল্পনা করা হয়েছে। নবান্নে হয় নতুন ধানের উৎসব। নতুন ফলমূলাদিও দেব ও পিতৃগণকে উৎসর্গ না করে খাওয়া হয় না। যাঁদের কৃপায় অধিক ফসল ফলেছে তাঁদের তুষ্ট না করলে পরবর্তী কৃষিতে সুফল পাওয়া যাবে

না। পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয় আকাশপ্রদীপ। আকাশপ্রদীপের আলোর আলোকে পথ দেখতে পেয়ে চলে আসেন তাঁরা উৎসর্গীকৃত সামগ্রী গ্রহণ করতে। কুলকুলতী ব্রত, যমপুকুর ব্রত এই উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হয়। এই ব্রতেরই ব্রাহ্মণ্যস্বীকৃত রূপ দীপাবলী, কার্তিক অমাবস্যার আলোর উৎসব। শুধু বাইরের নয় মনের অন্ধকারও বিদূরিত করে আলো।

অগ্রহায়ণ মাসে ইতুপূজা ও সেঁজুতিব্রত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অগ্রহায়ণ মাসে ক্ষেত্র ও বউঠাকুরাণী ব্রতের পরদিন বা রবিবার হয় ইতুব্রত। সকলে মিলে এ ব্রত অনুষ্ঠান করার বিধি। পিটুলীর আলপনা দিয়ে অঙ্কিত হয় সেঁজুতির ৫২টি ঘর। প্রতি ঘরে দূর্বা দিয়ে ছড়া বলতে হয়। এই ব্রতে প্রায় চল্লিশরকম আলপনার প্রয়োজন। প্রত্যেক ঘরে এক একটি ফুল ধরে এক একটি ছড়া আবৃত্তি করতে হয়। যেমন—'সাঁজন পূজন সেঁজুতি, ষোল ঘরে ষোল ব্রতী। তার এক ঘরে আমি ব্রতী। ব্রতী হয়ে মাগি বর। ধনেপুত্রে বাড়ুক মাবাপের ঘর। হে শঙ্কর ভোলানাথ, কখনো না পড়ি যেন মূর্খের হাত। দোলায় যাই দোলায় আসি, মুখ দেখতে হীরের আরশী, বাপের বাড়ীর দোলাখানি শ্বশুরবাড়ী যায়, আসতে যেতে দোলাখানি ঘি মধু খায়' ইত্যাদি কথা আর তার সঙ্গে আছে নানা আচরণ।

কৃষিজমির উর্বরতাশক্তিবৃদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত হয় তুষতুষলিব্রত, মাঘমণ্ডল ব্রত, তারাব্রত প্রভৃতি। মাঘমণ্ডলব্রতে সূর্যের বিবাহের বর্ণনা আছে। তারাব্রতে আছে নক্ষত্রের কথা। বসন্তঋতুতেও নানাব্রত। প্রেমভালবাসার ঠাকুর ইতুকুমারের ব্রত এই সময়ের। সৌন্দর্য কামনায় নখছুঁটের ব্রতও এই সময়ের। নিমন্ত্রণ করে সধবাদের খাওয়ান হয় একে একে চার বছর।



ছড়ায় বলা হয়—'প্রথমবারে ফুট কড়াই মুড়কি। দ্বিতীয়বারে খইদই। তৃতীয়বারে চিঁড়ে মুড়কি। চতুর্থবারে লুচি, মাছ, তরকারী'। সারা বৎসরব্যাপী ব্রত অনুষ্ঠান। সব ব্রতের তালিকা এখানে দেওয়া সম্ভব নয়, বারোমাসে আমাদের ঘরে ঘরে যে সব ব্রত আজও সমাদৃত এবং যা অহরহ আমাদের দৃষ্টিতে আসে পরপৃষ্ঠায় তার একটি তালিকা দেওয়া যেতে পারে—

প্রাকৃতিক ঋতু অনুসারী ব্রতের নক্সা ৬

গ্রীষ্ম		বর্ষা		শরৎ	
বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন
পুণিপুকুর ব্রত	জয়মঙ্গল ব্রত	বিপত্তারিণী ব্রত	লোটনষষ্ঠী বা	ভাদুরি ব্রত	জিতাষ্টমী ব্রত
অক্ষয় তৃতীয়া	জ্যৈষ্ঠচাঁপা	মনোরথ	লুণ্ঠনষষ্ঠী ব্রত	তিলকুজারী	দুর্গাষষ্ঠী
শিবপূজা	অরণ্যষষ্ঠী	দ্বিতীয়া	কার্দমীষষ্ঠী	চাপড়াষষ্ঠী	গাড়শী
পৃথিবীপূজা	চম্পাচন্দন	বিবস্বৎ সপ্তমী	জন্মাষ্টমী	মনসা	সৌভাগ্য
গোকাল	সাবিত্রী চতুর্দশী	অম্বুবাচী	নাগপঞ্চমী	রাধাষ্টমী	চতুর্থী
অশ্বত্থপাতা		কদলীষষ্ঠী	ইত্যাদি	দুর্গাষ্টমী	কোজাগরী
মধুসংক্রান্তি	ত্রিলোচন-	ইত্যাদি		তালনবমী	লক্ষ্মী
গুপ্তধন	ষষ্ঠী			অনন্ত চতুর্দশী	ইত্যাদি
ধন গোছান	উমাচতুর্দশী			অঘোর চতুর্দশী	
যাচাপান	ষটপঞ্চমী			হরিতালিকা	
থোয়াথয়ি	বসুধারা			সিদ্ধিবিনায়ক	
রণেত্রয়ো	ইত্যাদি			কৃষ্ণকলঙ্কিনী	
দশপুতুল				সৌভাগ্য	
ক্ষেত্র ব্রত				চতুর্দশী	
ফলগোছান				মন্থানষষ্ঠী	
নিৎসিঁদুর				কুক্কুটি	
বসুন্ধরা				দুর্বাষ্টমী	
আদাহলুদ				লক্ষ্মীপেঁচা	
রূপহলুদ				পেচী	
আদর সিংহাসন				ইত্যাদি।	
জলসংক্রান্তি					
বৈশাখচম্পক					
সীতানবমী					
চান্দনীষষ্ঠী					
পিপীতকী দ্বাদশী					
বটরুক্মিণী দ্বাদশী					
নৃসিংহ চতুর্দশী					
পৃথিবী					
কেশব					
হরিষমঙ্গল					
সঙ্কটামঙ্গল					
অক্ষয়ফল					
অক্ষয়ঘট					
অক্ষয়সিঁদুর					
তেজোদর্পণ					
মিষ্টিপূর্ণিমা					
পদ্মপূর্ণিমা					
ষোলকলা					

চলছে

হেমন্ত		শীত		বসন্ত	
কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
র্তিকে লক্ষ্মী ব্রত	মূলোষষ্ঠী ব্রত	তারাব্রত	শেতল ষষ্ঠী	ইতুকুমার ব্রত	নীলষষ্ঠী
পুকুর	কুলুইচণ্ডী	পৌষলক্ষ্মী	মাঘমণ্ডল	বসন্তরায় ও	চৈতে লক্ষ্মী
াষ্ঠ ষষ্ঠী	সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডী	পাটাই ষষ্ঠী	সঙ্কট-	উত্তমঠাকুর	এয়োসংক্রান্তি
দকুলতি	নাটাইচণ্ডী	সুয়োদুয়ো	মঙ্গলচণ্ডী	সসাপাতা	মধুসংক্রান্তি
় ব্রত	বউঠাকুবাণী	অন্নষষ্ঠী	ভৈমা	পাপনাশিনী	ছাতু
তৃদ্বিতীয়া	সেঁজুতি	সোদর	একাদশী	স্কন্দষষ্ঠী	ঘি
ানবমী বা	ইতু	ইত্যাদি	বিনায়ক	গৌরপূর্ণিমা	দর্পণ
ারী	রালদুর্গা		সূর্য	গো-ষষ্ঠী	নখছুঁট
কুণ্ঠ চতুর্দশী	তুষতুষলি		অষ্ট-	শিবরাত্রি	ধর্মঘট
র্তিক	কাঁচাঘট পূজা		লোকপাল	অশোকষষ্ঠী	কৃষ্ণষষ্ঠী
াবর্ধনার্চন বা	ও হরিষষ্ঠী		ইত্যাদি	ইত্যাদি	সুন্দষষ্ঠী
ন্নকূট	অখণ্ড দ্বাদশী				কলাগাছ
াত্রী	পাষাণ চতুর্দশী				মিষ্টসংক্রান্তি
খরাত্রি	চুণ্ডী				ফলদান
্যতি প্রতিপদ	কাত্যায়নী				ইত্যাদি
াকাশপ্রদীপ	সাবিত্রী				
াড়ীষষ্ঠী	ইত্যাদি				
ক্ষ্যামাণ					
ত্যাদি					

।তিমাসের বারব্রত

; সুবচনী ব্রত, ষটপঞ্চমী ব্রত, সত্যনারায়ণ ব্রত, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার ব্রত এবং উপবাস বারোমেসে লচণ্ডী, মঙ্গল সংক্রান্তি, শনির পাঁচালী, লক্ষ্মী ব্রত ইত্যাদি। সারা বছর লক্ষ্মীব্রত করার বিধান তবে ান প্রধান লক্ষ্মীব্রত হয় ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও চৈত্র মাসে। তেমনি বারোমাসেই । পূজার বিধান আছে। কিন্তু আমাদের দেশে বৈশাখ, আষাঢ়, কার্তিক আর ফাল্গুন মাসে াবণত ষষ্ঠী পূজা হয় না। তবে সাট দেবার সময় বারোমাসেরই নাম করা হয়। যেমন বৈশাখে । ষষ্ঠী সাট, আষাঢ়ে কোঁড় ষষ্ঠী সাট, কার্তিকে গোট ষষ্ঠী সাট ও ফাল্গুনে অশোক ষষ্ঠী সাট ্যাদি।

ব্রত হচ্ছে পুণ্যলাভ, ইষ্টলাভ, পাপক্ষয় প্রভৃতির জন্য অনুষ্ঠিত ধর্মকর্ম, ধর্মানুষ্ঠান, তপস্যা ইত্যাদি। বৎসরের বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন ব্রত অনুষ্ঠান করার বিধান আছে। এ বিধান লোকস্বীকৃতিও পেয়েছে' প্রথমেই এই ব্রতকে দু ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—(১) শাস্ত্রীয় (২) অশাস্ত্রীয় বা লৌকিক। লৌকিকব্রতকে পুরুষব্রত, নারীব্রত ; নারীব্রতকে আবার কুমারী ব্রত, সধবাব্রত, বিধবাব্রত ইত্যাদি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। শাস্ত্রীয় ব্রতে আচমন, স্বস্তিবাচন, কর্মারম্ভ, সংকল্প, ঘটস্থাপন, পঞ্চগব্যশোধন, শান্তি মন্ত্র, সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাসাদি এবং বিশেষার্ঘ্য স্থাপনের পর নৈবেদ্য-উৎসর্গ দিতে হয়। পরে ব্রাহ্মণকে দানদক্ষিণা দিয়ে কথা শ্রবণ ও শুদ্ধাচারে কৃত্যাদিপালন করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীব্রতকে ধরা যাক। এই ব্রত অনুষ্ঠানের পূর্ব দিবস ব্রতী সংযমী থেকে পরদিন প্রাতঃকালে স্নান শেষ করে আচমন ও স্বস্তিবাচন করবেন। স্বস্তিসূক্ত পাঠ করে সূর্য, সোম ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে সঙ্কল্প করবেন। যথা—'বিষ্ণুরোম তৎসদদ্য (স্ত্রীলোকের বেলায় বিষ্ণুর্ণমোহদ্য) ভাদ্রেমাসি কৃষ্ণেপক্ষে অষ্টম্যাংতিথৌ ––গোত্রঃ শ্রী— দেবশর্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তিকামো (স্ত্রী– কামা) শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীব্রতমহং করিষ্যে।' পরে প্রার্থনা করবেন। অর্ধরাত্র-সময়ে ঘটে, প্রতিমায় বা শালগ্রামে পূজা করবেন। পঞ্চোপচারে গণেশাদি দেবতার পূজা করে ধ্যান করবেন। ধ্যানান্তে মানসোপচার পূজা, তারপরে বিশেষ অর্ঘ্য স্থাপন করবেন। তারপর পুনরায় ধ্যান করে ষোড়শোপচার নৈবেদ্য দিয়ে 'ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ' বলে পূজা করবেন। শ্রী পূজা করবেন। তারপর গুড়মিশ্রিত ঘৃত-দ্বারা দেওয়ালে পাঁচ বা সাতবার বসুধারা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের নাড়ীচ্ছেদ ভাবনা করবেন। গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ও নৈবেদ্য দিয়ে ষষ্ঠী পূজার পর জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, গোদান ও বিবাহ সংস্কার মনে মনে চিন্তা করবেন। পরে আবরণ দেবতার পূজা এবং সম্ভব হলে বৈদিক হোম অন্তে চন্দ্রোদয়ে চন্দ্রকে অর্ঘ্য দিবেন। এবং পরে প্রণামান্তে প্রার্থনা জানাবেন—'ত্রাহি মাং সর্ব্বলোকেশ হরে সংসারসাগরাৎ। ত্রাহিমাং সর্বপাপঘ্ন দুঃখশোকার্ণবাৎ প্রভো। দুর্গতাং-স্ত্রায়সে বিষ্ণো যো স্মরন্তি সকৃৎ সকৃৎ। সোঽহং দেবাতিদুর্বৃত্তস্ত্রাহিমাং শোক সাগরাৎ। পুসুরাক্ষ নিমগ্নোঽহং মায়াবিজ্ঞানসাগরে। ত্রাহিমাং দেবদেবেশ ত্বত্তো নানোঽন্তি রক্ষিতা। যদ্‌বাল্যে যচ্চকৌমারে যৌবনে যচ্চবার্দ্ধক্যে তৎ

পুণ্যং বৃদ্ধিমাপ্নোতু পাপং হর হলায়ুধ।' এইরূপ প্রার্থনার পরে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করবেন। তারপর গীতবাদ্য দ্বারা আমোদ-প্রমোদে রাত্রি যাপন করতে বাধা নেই। পরদিবসে যথাবিধি শ্রীকৃষ্ণ পূজার পরে যোগমায়ার পূজা। কথাশ্রবণ, পারণ ও সমাপন মন্ত্র পাঠ।

ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী বা অমাবস্যার অষ্টমী তিথিতে ফুল, তুলসী, দূর্বা, ধূপ, দীপ, ফলের নৈবেদ্য, আতপচালের নৈবেদ্য, পঞ্চগুড়, পঞ্চগব্য, তিল, আসনাঙ্গুরী, মধুপর্কের বাটি, ঘৃত, বালি, কাষ্ঠ, পূর্ণপাত্র, দধি, চিনি, তৈল ও হরিদ্রা সংগ্রহ করে ব্রাহ্মণকে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করাতে হয়। পূজান্তে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা, পূজার পূর্বদিন হবিষ্য ও পূজার দিন নির্জলা উপবাস থাকার নিয়ম। ব্রতকথায় আছে—দ্বাপর যুগে মথুরায় কংস নামে এক অত্যাচারী রাজা ছিল। শিব বরে একমাত্র ভাগিনেয় ভিন্ন অপর কেহ তাকে বধ করতে পারবে না। ভগ্নীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান (বহু সন্তান প্রসবের উদ্দেশ্যেই অষ্টম গর্ভজাত বলা হয়েছে) কংসের যম। তজ্জন্য সে তার ভগ্নী দেবকীর সবগুলি সন্তান একে একে মেরে ফেলল। ভগ্নী ও ভগ্নীপতিকে কারারুদ্ধ করে রাখল। কংসের অত্যাচারে প্রপীড়িত দেব ও মানব শ্রীনারায়ণের সাহায্য চাইলেন। নারায়ণ প্রতিকারে রাজী হয়ে মহামায়াকে যশোদার গর্ভে জন্ম নিতে নির্দেশ দিলেন। তিনি নিজে দেবকীর গর্ভে গিয়ে প্রসবের অপেক্ষায় রইলেন। অষ্টমবারে দেবকী গর্ভবতী হলেন। কারাগারে বন্দী বসুদেব ও দেবকী দর্পহারী মধুসূদন শ্রীনারায়ণকে আকুল স্বরে ডাকতে লাগলেন। কড়া পাহারায় দেবকী কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে অপূর্ব রূপলাবণ্যসম্পন্ন চতুর্ভুজ এক মূর্তি প্রসব করলেন দুর্যোগময় এক রাত্রে। আকাশে তখন রোহিণী নক্ষত্র। ভগবানের মায়ায় প্রহরীগণ ছিল ঘুমে অচেতন। দৈববাণী হল—'বসুদেব অবিলম্বে তোমার পুত্রকে ব্রজে যশোদার ঘরে রেখে যশোদার সদ্যোজাত কন্যাকে আনয়ন করে দেবকীকে দাও'। দৈববাণী অনুসারে বসুদেব নন্দালয়ে গিয়ে মা যশোদার কোলে পুত্রকে রেখে এলেন। পরিবর্তে তাঁর সদ্যোজাত কন্যা মহামায়াকে নিয়ে এলেন। পরদিন ভোরে দেবকীর সন্তান হবার বার্তা কানে যেতেই কংস এসে সেই মহামায়াকে তুলে যেমনি পাষাণে আছাড় দিতে যাবে অমনি তার হাত পিছলে পড়ে যাওয়ায় মহামায়া শূন্যে বিলীন হয়ে গেলেন। অবশ্য দেবকী কন্যার জীবন রক্ষার্থে কংসের নিকট অনেক কাকুতি মিনতি করলেন কিন্তু তাতে ফল হল না। আদ্যাশক্তি মহামায়া শূন্যে উঠে যেতে যেতে বললেন—'রে দুর্বৃত্ত। তুই মনে করেছিস

আমাকে বধ করেই নিস্তার পাবি, কিন্তু না, তোর নিস্তার নেই। তোকে যিনি বধ করবেন তিনি গোকুলে নিরাপদে আছেন। তাঁর হাতে যথাকালে তোর মৃত্যু হঁবে।' এই ঘটনায় বারো বৎসর পরে বারো বৎসরের বালক শ্রীকৃষ্ণ মল্লযুদ্ধে কংসকে বধ করেন।

শাস্ত্রীয়ব্রতের অনেকখানি এবং খাঁটি মেয়েলী ব্রতেরও অনেকটা মিলিয়ে নারীব্রত। একে শাস্ত্রীয় এবং অশাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের যুগলমূর্তি বলে কল্পনা করেছেন অবনীন্দ্রনাথ। বৈদিক অনুষ্ঠানের গভীরতা ও সজীবতা অনেকখানি চলে গিয়ে লৌকিক ব্রতের সরলতার অনেকটা নিয়ে সামান্যকাণ্ডের জটিল অনুষ্ঠান ন্যাসমুদ্রাতন্ত্রমন্ত্রই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। এই ব্রতগুলোর সব ব্রতই সব নারী করতে পারেন না। কুমারী, সধবা ও বিধবা নারী জীবনের এই তিন অবস্থার তিন প্রকার সমস্যা। এবং তাঁদের তিন ধরণের জীবনের ত্রিবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য তাই অন্ততঃ তিন প্রকার ব্রতের উদ্ভাবন হয়েছে।

সুতরাং, কিছু ব্রত আছে যেগুলো শুধুমাত্র কুমারী মেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যারা পাঁচ বছর বয়স থেকেই সে ব্রতের অধিকারী। আর কিছু ব্রত আছে যা একেবারে সধবাদের জন্য নির্দিষ্ট। কিছু ব্রত নির্দিষ্ট হয়েছে বিধবাদের জন্য। কোন কোন ব্রত আবার কুমারী ও সধবারা একযোগে করেন, সেখানে বিধবাদের স্থান নেই। কোন কোন ব্রতে কুমারীদের অধিকার নেই, কোন কোন ব্রত কুমারী, সধবা ও বিধবা একত্রিত হয়ে করতে পারেন। এবং কোন



কোন ব্রত পুরুষ ও নারী উভয়েরই সমান অধিকার আছে। যদিও ব্রতের অনুষ্ঠান এবং আনুসঙ্গিক নিয়মপালন মহিলাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ধর্মনিষ্ঠ ও কঠোর আচারপ্রবণ পুরুষ ছাড়া অন্য পুরুষ বড় একটা ব্রতপার্বণ উদ্‌যাপনে উৎসাহী নন। প্রসঙ্গক্রমে একটি নকশায় বিভিন্ন মেয়েলী ব্রতের অধিকারীদের একটি তালিকা দেওয়া যেতে পারে—

ব্রতের অধিকারীদের নক্সা—৭

পুরুষ ও স্ত্রী	কুমারী	সধবা	কুমারী ও সধবা	বিধবা	সধবা-বিধবা	কুমারী-সধবা-বিধবা
দধিসংক্রান্তি	পুণ্যিপুকুর ব্রত	জয়মঙ্গলচণ্ডী	শ্রীশ্রীলক্ষ্মী ব্রত	অম্বুবাচীব্রত	হরিষমঙ্গলচণ্ডী	রালদুর্গা ব্রত
ফলদান	শিবব্রত	সঙ্কটমঙ্গলচণ্ডী	কুলকুলতি	একাদশী	হরিচরণ	মৌন-অমাবস্যা
হরিষমঙ্গল	পৃথিবীপূজা	অরণ্যষষ্ঠী	ধূপসংক্রান্তি	প্রভৃতি	অরণ্যষষ্ঠী	জিতাষ্টমী
চণ্ডীব্রত	দশপুতুল	মূলাষষ্ঠী বা	আদরসিংহাসন		নাগপঞ্চমী	মনসা
অক্ষয়তৃতীয়া	চাপাচন্দন	আমষষ্ঠী	অক্ষয়কুমারী		গাড়শীব্রত	বিপত্তারিণী
জন্মাষ্টমী	যমপুকুর	বউঠাকুরাণী	দূর্বাষ্টমী		মঙ্গলচণ্ডী	জন্মাষ্টমী
রাধাষ্টমী	অশ্বত্থপাতা	ক্ষেত্র	ইত্যাদি		সঙ্কটতারিণী	ভৈমীএকাদশী
জীতাষ্টমী	মনোরথ	ইতুরাল			তালনবমী	রামনবমী
কলাগাছত	দ্বিতীয়া	কুলই			ইত্যাদি	ষোলকলা
শিবরাত্রি	সেঁজুতি	বৈশাখ-চম্পক				ইত্যাদি
সুবচনী	তুষতুষলি	জ্যৈষ্ঠচম্পক				
সত্যনারায়ণ	দশপুকুল	মধুসংক্রান্তি				
অন্নসংক্রান্তি	গোকাল	নিত্যসিঁদুর				
বারোমেসে	মাঘমণ্ডল	নিৎসিঁদুর				
অমাবস্যা	বসুধারা	নখছুট				
বিপত্তারিণী	সন্ধ্যামণি	কলাছড়া				
ইতু ব্রত	ইত্যাদি	ষোলকলা				
মিষ্টিসংক্রান্তি		আদাহলুদ				
ইত্যাদি		রূপহলুদ				
		সৌভাগ্য চতুর্থী				
		অক্ষয়ফল				
		জলসংক্রান্তি				
		বিবস্বৎ সপ্তমী				

কুমারীব্রত অনেকখানি খাঁটি অবস্থায় পাওয়া যায়। এদের গঠন এইরূপ : আহরণ বা ব্রতের সামগ্রী—সিদ্ধি, সিঁদুর, ঘট, তিল, হরিতকী, পঞ্চশস্য, পঞ্চগব্য, পঞ্চপল্লব বা আম্রশাখা, সশীষডাব, পাকাকলা, দধি, মধু, চিনি, নৈবেদ্য গঙ্গাজল বা ঐ রকম বিশুদ্ধ জল, পুষ্প, বিল্বপত্র তুলসী, দুর্বা, ধূপ, ধূনা, ধুতি (স্ত্রী দেবতা হলে শাড়ী) ঘটের গামছা (স্ত্রী দেবতার জন্য লোহা ও শাঁখা, নথ, সিঁদুর-চুবড়ী), পান, পানের মসলা, থালা, ঘটি, বাটি, পুষ্পমালা, চাঁদমালা, আসনাঙ্গুরী, মধুপর্ক ইত্যাদি। এ ব্রতের আচরণ—যেমন আলপনা, পুকুরকাটা ইত্যাদি। এবং উদ্দেশ্য—কামনা জানিয়ে আলপনায় আঁকা কামনার প্রতিচ্ছবি বা প্রকৃতিতে ফুলধরা, ব্রতকথা শোনা, ইত্যাদি। পূজারী বা তন্ত্রমন্ত্রের স্থান নেই এখানে।

অনেক মেয়েলী ব্রতের সঙ্গে স্নানযাত্রায় একটা যোগ আছে। সূর্য-চন্দ্র-গ্রহণস্নান, গঙ্গাপদ্মাদিস্নান, গোসহস্রীযোগস্নান, করতোয়াস্নান, ব্রহ্মপুত্রস্নান, অক্ষয়তৃতীয়াস্নান, জহ্নুসপ্তমীস্নান, রটন্তীচতুর্দশীস্নান, মাকরীস্নান, রাধাকুণ্ডে-স্নান, গঙ্গাসাগরস্নান, পূর্ণিমাস্নান, সংক্রান্তিস্নান, দশহরারগঙ্গাস্নান, গোবিন্দ-দ্বাদশীস্নান, ভূতচতুর্দশীস্নান ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে স্নান করলে পাপীর সমস্ত পাপও বিধৌত হয়ে যায় স্রোতের জলে এই স্নান কাম্য স্নান। শাস্ত্রানুসারে বিভিন্ন স্নানের বিভিন্ন নিয়ম ও মন্ত্র আছে। কিন্তু অশুদ্ধ মন পরিধৌত করার জন্য, স্নানে-শুদ্ধ মনে ব্রত ইত্যাদি অনুষ্ঠানের জন্য যে স্নান সে স্নানে কোনরূপ মন্ত্র বা নিয়ম মানার প্রয়োজন হয় না বাঙালীকে।

বাঙলার ব্রতোৎসবের ইতিহাস অতি প্রাচীন ও জটিল। প্রাক-বৈদিক অধিবাসীদের মধ্যে ব্রত সুপ্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ ব্রত উদযাপন করত বলেই ওদেরকে আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি 'ব্রাত্য' বলে অবজ্ঞা করেছেন। যদিও ব্রতের সঙ্গে ব্রাত্যদের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা সহজ ব্যাপার নয়।

ঋগ্বেদীয় আর্যেরা ছিলেন যজ্ঞধর্মী। যজ্ঞধর্মী আর্যদের বাইরে যারা ছিল তারা ব্রাত্য। তীক্ষ্ণধী মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে সাবিত্রী অর্থাৎ গায়ত্রী থেকে পতিত হলে ব্রাত্য হয়। এই ব্রাত্যদের কেউ ব্রাহ্মণব্রাত্য, কেউ ক্ষত্রিয়ব্রাত্য, কেউ বৈশ্যব্রাত্য। গায়ত্রী থেকে পতিত এই অর্থে ব্রাত্য। ব্রত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বৃ ধাতু+ক্ত, আবৃত করা, সীমানা পৃথক করা, নির্বাচন করা। বরণ শব্দটিরও একই ব্যঞ্জনা। ব্রতের আলপনায় বৃত্তাকারে সীমারেখা টেনে ব্রতস্থান চিহ্নিতকরণ, বা স্থান নির্বাচনের মধ্যে যাদুশক্তি বা ম্যাজিকের

বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন। ম্যাজিকে বিশ্বাসী ব্রতচারী লোকেরাই আর্যদের চোখে ছিল ব্রাত্য। আর্য ধর্মকর্মে ছিল তাদের অনীহা।

ঋগ্বেদে 'ব্রাত্য' শব্দ নেই, আছে 'ব্রাত' শব্দ। ব্রাত শব্দের অর্থ প্রকাণ্ড দল। ব্রাত্য শব্দের সঙ্গে যে 'গণ' শব্দের ব্যবহার আছে সে 'গণ' বলতে বোঝায় ছোটদল। ব্রাত বা প্রকাণ্ডদলের সংখ্যা গণনা কষ্টকর। যেমন মধুকরব্রাত বা মৌমাছির ঝাঁক। কিন্তু 'গণ' বা ছোটদলকে গননা করা যায়। যেমন রুদ্রগণ, মরুদগণ ইত্যাদি। আরেকটি শব্দ আছে ঋগ্বেদে সেটি হচ্ছে 'শর্দ্ধ'। শর্দ্ধ শব্দের অর্থ বড়দল বা herd, এই শর্দ্ধে বা দলে ঋষিগণ বিচরণ করতেন। এই দলই হচ্ছে ঋষিমণ্ডল। ঋষিমণ্ডল মানে ব্রাত। ঋষিমণ্ডলের বাইরের লোকব্রত্য। যজুর্বেদে ব্রাত্য শব্দ আছে। সেখানে বলা হয়েছে যে ব্রাত্যকে বলি দিতে হবে কারণ তারা খুব চীৎকার করে। ব্রাত্যেরা যাযাবর দল। বৈদিক যুগের মাঝামাঝি সময়ে আর্য ঋষিরা ব্রাত্যদের কিছু কিছু লোককে বা দলকে মেনে নিয়ে তাদেরও ঋষি করলেন। এই নতুন ঋষিদের আর্য ঋষিরা এক এক গ্রামে স্থাপনা করলেন এবং সেই গ্রামে ব্রাত্যদের ঋষিপূর্বব্রাত্য জীবনের কোন চিহ্ন নিয়ে যেতে দিতেন না। এই ঋষি হওয়া ব্রাত্যদের ঋষিত্ব প্রাপ্তির পর তাঁদের সঙ্গে আর্য ঋষিদের খুব একটা তফাৎ রইল না। আর্যসংখ্যা এইভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে চলল। বহিরাগত আর্য সম্প্রদায়ও আদিম বা 'অন্যব্রত'দের জয় করতে পারলেন না। আদিমসমাজ তাদের ছেলে-মেয়ে, যুবকযুবতী, বুড়োবুড়ি, দলপতি, গোষ্ঠীপতি, যোদ্ধা, কৃষাণ, শ্রমিক নিজ নিজ আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মকর্ম, দেবতা-অপদেবতা, কলাকৌশল, ভয়ভরসা, হাসিকান্না নিয়ে নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলল। যদিও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ, ভোজ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে আদানপ্রদান সে সময় থেকেই চলতে থাকে। এরইমধ্যে বৈদিক ভাষা বর্তমান সংস্কৃতে রূপান্তরিত হয়। ক্রমে ঋষিদের অনেক অনুশাসনও শিথিল হয়ে পড়ে, উভয়ে উভয়ের নিকটে আসে। ফলে হয় পুরাণের দেবদেবীর সৃষ্টি। আবার পুরাণ দেবতারাও অন্তর্হিত হন কালের প্রবাহে। এইভাবে নানা পরিবর্তনের মধ্যে খাঁটি আদিম ধর্মাচরণের প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া দুষ্কর। তথাপি মেয়েলী ব্রতের মধ্যে অনেক প্রাচীন আচার অনুষ্ঠানের চিহ্ন বিদ্যমান।

বাঙালীর অগণিত ব্রতের মধ্যে শাস্ত্রীয় ব্রত ও লৌকিক ব্রত পাশাপাশি চলছে। বহু ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের তুলনায় লৌকিক অনুষ্ঠান

জনপ্রিয়। লৌকিক ব্রতের আড়ম্বরহীনতাই এর জনপ্রিয়তার কারণ। ব্রত কথা ব্রতিণীরা নিজেরাই বলতে পারেন। 'পালনী' বা পালনীয় নিয়ম বংশপরম্পরাক্রমে চলে আসছে। নিয়মিত আহার সংযম, উপবাস, একাহার, নিরামিষাহার, হবিষ্যান্ন, আংশিক আহার গ্রহণ ব্রতের অপরিহার্য অঙ্গ। ব্রত-করতে যেসব সামগ্রীর দরকার তাও সহজপ্রাপ্য। কিন্তু তথাপি তাদের অর্চনা করতে হয়। যেমন তুলসী। নারায়ণ এবং কৃষ্ণপূজা ও ব্রতে তুলসী চাই-ই। দৈনিক তুলসী অর্চনায় রোগশোক দূর হয়। তুলসী অর্চনা করার সময় তাই বলা হয়,—"তুলসী তুলসী নারায়ণ তুমি তুলসী বৃন্দাবন, তোমার শিরে ঢালি জল, অন্তিমকালে দিও স্থল। তুলসী তুলসী মাধবীলতা, কও তুলসী কৃষ্ণ কথা, কৃষ্ণ কথা শুনি শ্রবণে, কোটি কোটি দণ্ডবৎ তুলসী চরণে।" ইত্যাদি।

ব্রতের দেবদেবীদের অনেকেই পুরাণোক্ত দেবদেবী নন। যেমন লক্ষ্মী ব্রতের লক্ষ্মী বিষ্ণুর সমুদ্রমন্থনোদ্ভবা পত্নী নন, বা শিবব্রতের শিব রুদ্র নন। ব্রতের দেবদেবীদের অনেকেই আবার অনিষ্টকারী দেবতা। অনিষ্টকারী দেবদেবীকে তুষ্ট করতে না পারলে দেবতা ক্রুদ্ধ হয়ে সব লণ্ডভণ্ড করে দেন। তাঁদের প্রসন্নতায় শান্তি, শ্রীও সমৃদ্ধি আসে; অপ্রসন্নতায় সব ধ্বংস হয়ে যায়। এই দেবতাগণ আরাধনায় তৃপ্ত হন, অবহেলায় রুষ্ট হন। যখন তৃপ্ত হন তখন হাতিশালের হাতি, ঘোড়াশালের ঘোড়া, গোয়ালের গরু, বাণিজ্যের সপ্ততরী, সংসারের সকলে মরেও আবার বেঁচে ওঠে, আবার যখন রুষ্ট হন তখন বাণিজ্য ফেরৎ সদাগরের সপ্তডিঙ্গা নিজের ঘাটে এসেও ডুবে



যায়। হাতী, ঘোড়া, বিড়াল, আত্মীয়স্বজন সব মরে পড়ে থাকে। এই দেবদেবীরা সাধারণ মানুষের মূর্তি ধারণ করে আবির্ভূত হন, মানুষেরই মত আচরণ করেন, সুখে হাসেন, দুঃখে কাঁদেন, প্রতিহিংসায় হিংস্র জর্জর হন, সহানুভূতিতে হন কান্ত কোমল। ব্রতকথার রাজত্বে মানুষ ও দেবতা একাকার হয়ে আছেন। অগণিতব্রতের দেবদেবীদের কয়েকজনের নাম ব্রতের নামসহ পাশে দেওয়া হল—

ব্রতের দেবদেবী বিষয়ক নক্সা—৮

ষষ্ঠী	চণ্ডী-দুর্গা-মনসা	ইন্দ্র-বরুণ	সূর্য	শিব	বিষ্ণু	কৃষ্ণ-রাধা
চান্দনী ষষ্ঠী	হরিষমঙ্গলচণ্ডী	বসুধারাব্রত	সূর্যব্রত	ক্ষেত্রপালব্রত	দূর্বাষ্টমীব্রত	জন্মাষ্টমী ব্রত
অরণ্যষষ্ঠী বা	নাটাই মঙ্গলচণ্ডী	পুণ্যিপুকুরব্রত	চুঙ্গীর ব্রত	শিবপূজাব্রত	তালনবমী	রাধাষ্টমীব্রত
জামাইষষ্ঠী	সঙ্কটমঙ্গলচণ্ডী	ভাঁজো	ইতুব্রত	শিবরাত্রিব্রত	অনন্তচতুর্দশী ব্রত	তুলসী ব্রত
কার্দমীষষ্ঠী	নিকটমঙ্গলচণ্ডী	ইত্যাদি	জীতাষ্টমী	ইত্যাদি	হরিচরণব্রত	ইত্যাদি
লুণ্ঠন ষষ্ঠী	কুলুইমঙ্গলচণ্ডী		মাঘমণ্ডল		ইত্যাদি	
চাপষ্ঠী, চাপড়া	ভাউতামঙ্গলচণ্ডী		ইত্যাদি			
বা মন্থানষষ্ঠী	ভাদাইমঙ্গলচণ্ডী					
দুর্গাষষ্ঠী	মনসাব্রত					
নাড়ী ষষ্ঠী	নাগপঞ্চমী					
মূলা বা গুহ ষষ্ঠী	বিপত্তারিণী					
অন্নষষ্ঠী	সুবচনী					
শীতলা ষষ্ঠী	ললিতাসপ্তমী					
গো-ষষ্ঠী	বা কুক্কুটী ব্রত					
কৃষ্ণষষ্ঠী	নিস্তারিণী					
স্কন্দষষ্ঠী	মঙ্গল সংক্রান্তি					
অশোকষষ্ঠী	ইত্যাদি					
হরিষষ্ঠী						
নীলষষ্ঠী						
সূতিকাষষ্ঠী						
ষেটেরাষষ্ঠী ইত্যাদি						

বলাবাহুল্য, আলোচিত গ্রন্থের কোন নকশাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সুনির্দিষ্ট কিছু পথের ইঙ্গিতমাত্র। পূর্ব পৃষ্ঠার নকশাটিকেও তাই একটি ইঙ্গিত বা নির্দেশিকা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। আর তার বেশী আশা করলে পাঠক হতাশ হবেন। যাই হোক, ব্রতকথার চরিত্র পরিকল্পনায় দেখা যায় যে সৌভাগ্যের চরিত্রে রাজা অথবা সওদাগর এবং দুর্ভাগ্যের চরিত্রে বামুন, বুড়ী অথবা সওদাগরের দুঃখী মেয়ে। বিশেষ দেবদেবীর অনুগ্রহে ওরা সৌভাগ্য ফিরে পায়। তা দেখে ব্রতিনীদের সঙ্গে আমরাও তৃপ্ত হই।

দেবানুগ্রহলাভের জন্য সারাবছর ধরে বাঙলায় লক্ষ্মীব্রতের বিধান আছে। প্রতি লক্ষ্মীবার বা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই ব্রত অনুষ্ঠিত হতে পারে। তবে প্রধান লক্ষ্মীপূজা বা লক্ষ্মীব্রত ছয়টি। যেমন ভাদ্রমাসের ভাদ্রলক্ষ্মী, আশ্বিনের কোজাগরীলক্ষ্মী, কার্তিকের কার্তিকেলক্ষ্মী, অগ্রহায়ণ মাসে ক্ষেত্র-লক্ষ্মী, পৌষের পৌষলক্ষ্মী এবং চৈত্রমাসের চৈতেলক্ষ্মী। এই ছয় লক্ষ্মীর মধ্যে আবার আশ্বিন-পূর্ণিমার কোজাগরীলক্ষ্মী, কার্তিক-অমাবস্যার দেওয়ালী বা কার্তিক-লক্ষ্মী এবং চৈত্র-পূর্ণিমার চৈতেলক্ষ্মী বা খন্দপূজা বাঙলায় সমধিক প্রসিদ্ধ। বঙ্গ মহিলারা ঘরে লক্ষ্মীর আসন পেতে দেবীর স্থাপনা করেন। আসনে ঘট, কড়ি, সিঁদুরের কৌটো, লক্ষ্মীর ছবি এবং লক্ষ্মীর বাহন পেঁচার মূর্তি রাখা হয়। প্রতি সন্ধ্যায় লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে কিছু নিবেদন করা হয়। সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালানো, লক্ষ্মীদেবীকে নমস্কার করা তাদের অবশ্য করণীয় কাজ। প্রতি বৃহস্পতিবার ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়া হয়। বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা হলে ঐদিনে ধার্মিক মহিলা উপবাসী থাকেন, রাত্রে পাঁচালী পাঠ করে ও লক্ষ্মী-দেবীকে নমস্কার করে খাদ্য গ্রহণ করেন। আশ্বিন সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হয় গাড়শী ব্রত। গাড়শীব্রত লক্ষ্মীব্রতেরই একটি রূপ। লক্ষ্মীর সন্তোষ বিধান এই ব্রতের লক্ষ্য। ব্রত উপলক্ষে ঘরদুয়ার পরিষ্কার করা হয়। রাত্রির চতুর্থপ্রহরে কাক ডাকার আগে গাত্রোত্থান করে বালক বালিকা সধবা বিধবা সকলে অন্তঃপুর প্রাঙ্গণে জ্বলন্ত প্রদীপসহ সমবেত হন। পূর্বেই একঘটি জল, কয়েকটি বাটা মশলা যথা সরিষা, মেথী, হলুদ, কুলগাছের নতুন পাতা রেকাবে রাখা থাকবে। প্রদীপের শিখার উপর কাঁচা তেঁতুল পোড়াবার নিয়ম এই ব্রতে। এই সময় ঘুমন্ত সকলে ঘুম থেকে উঠবেন। যাঁরা ধূমপায়ী তাঁরা তামাক খাবেন। যাঁরা তামাক খান না তাঁরা প্যাকাটি ভেঙ্গে সিগারেটের মত করে ধূমপান করবেন। এইভাবে ধূমপান করার সময় একজন জিজ্ঞেস করবেন—'এত ধূমপান কেন?' ধূমপায়ীরা উত্তরে বলবেন—'মানবজাতির যাবতীয় কাশির পীড়া আরোগ্যের

জন্য।' তারপর দেওয়া হয় জয়জোকার বা উলুধ্বনি। পূর্বাহ্নে হয় লক্ষ্মীপূজা। নৈবেদ্যের প্রধান উপকরণ—ভেজান কাঁচা মুগ, মাসকলাই ও বুটের ডাল, নারকেল, কলা ইত্যাদি। সধবাগণও এদিনে আমিষ ভোজন করেন না। ব্রতকথায় বলা হয়, এক সদাগরের লক্ষ্মীরূপিণী স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুত্রবধূদের অলক্ষ্মীজনচিত অশোভন আচরণে উৎসাহিত হয়ে অলক্ষ্মীদেবী সদাগরের দ্বিতীয়া পত্নীরূপে গৃহে প্রবেশ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্রবধূর সদাচরণে তার সে আশা ব্যর্থ হয়। এই ব্রতে 'হালের অর্জন ও জালের মাছ' খেতে নেই। ব্রতিনীরা অরন্ধন পালন করেন—'আশ্বিনে রাধিয়া কার্তিকে খায়, যে বর মাগে সেই বর পায়'। এ ব্রত যে করে তার ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা থাকে, তার ঘরে অলক্ষ্মী ঢুকতে পারে না।

এই গাড়শী ব্রত সম্পর্কে কলকাতার বিজয়গড় কলোনী থেকে শ্রীমতী মালতী কর্মকার জানিয়েছেন –'পূর্ববঙ্গে বিশেষ করে ঢাকা বিক্রমপুরের গৃহস্থ বধূদের কাছে আশ্বিনের শেষ দিনটি 'গাড়ু সংক্রান্তি'। এইদিনে কাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই- ঘুম থেকে উঠে গোবর ছড়া দিয়ে উঠোন নিকোনো পোছানো হয়। স্নান করে ধূপধুনো ও প্রদীপ জ্বালিয়ে মহিলারা পথেঘাট দীপমালায় সজ্জিত করেন ও হুলুধ্বনি দিয়ে লক্ষ্মীকে বরণ এবং অলক্ষ্মীকে বিদায় দেন।

এদিন.'হালের এবং জালের' যাবতীয় তরিতরকারী ও মাছ হেঁসেলে ঢুকবে না। ভাত রান্না হবে বোরো ধানের চাল দিয়ে, আর খেসারীর ডাল রান্না হবে। এই ডালে যাবতীয় শেকড়, মোচা, ডাঁটা, লাউ, কুমড়ো, চালকুমড়ো, মানকচু, গাটিকচু, ওল, মেটেআলু, কলমীশাক, শালু, শাপলা ইত্যাদি যেসব তরিতরকারী ফলাতে চাষ করতে হয় না তাই দেওয়া হয়। এই ডালে তেল সম্বরাও দেওয়া হয় না। বিনাচাষে যে লঙ্কা জন্মায় তাই এ ডালে দেওয়া হয়। শুকনো হলুদের পরিবর্তে কাঁচা হলুদ ব্যবহার করার বিধি। তরকারী কাটার সময় প্রত্যেকটি আনাজের কিছু অংশ কেটে ভিন্ন করে রাখা হয়। তা এবং ভেজানো খেসারীডাল, কাঁচাহলুদ, কলা, কাঁচাতেতুল, পানসুপারী, সিঁদুর, ধূপধুনো এইসব হচ্ছে ব্রতের উপাচার। এয়োতিদের দিয়ে ব্রতকথা। এই ব্রতকথা পুরুষের শোনা নিষিদ্ধ। কথাটি সংক্ষেপে এইরকম : পুত্রবধূ সংসারে আসার পরেই মায়েরমতো স্নেহে শাশুড়ী তাঁকে যাবতীয় গৃহস্থালীর ক্রিয়াকর্ম আচারনিষ্ঠা পালনের তালিম দিয়ে স্বর্গারোহণ করলেন। বধূও শাশুড়ীর কথামতই সব মেনে চলেন। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই শ্বশুর এক মোহিনীর জালে জড়িয়ে পড়েন। সংসারে

বলাবাহুল্য, আলোচিত গ্রন্থের কোন নকশাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সুনির্দিষ্ট কিছু পথের ইঙ্গিতমাত্র। পূর্ব পৃষ্ঠার নকশাটিকেও তাই একটি ইঙ্গিত বা নির্দেশিকা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। আর তার বেশী আশা করলে পাঠক হতাশ হবেন। যাই হোক, ব্রতকথার চরিত্র পরিকল্পনায় দেখা যায় যে সৌভাগ্যের চরিত্রে রাজা অথবা সওদাগর এবং দুর্ভাগ্যের চরিত্রে বামুন, বুড়ী অথবা সওদাগরের দুঃখী মেয়ে। বিশেষ দেবদেবীর অনুগ্রহে ওরা সৌভাগ্য ফিরে পায়। তা দেখে ব্রতিনীদের সঙ্গে আমরাও তৃপ্ত হই।

দেবানুগ্রহলাভের জন্য সারাবছর ধরে বাঙলায় লক্ষ্মীব্রতের বিধান আছে। প্রতি লক্ষ্মীবার বা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই ব্রত অনুষ্ঠিত হতে পারে। তবে প্রধান লক্ষ্মীপূজা বা লক্ষ্মীব্রত ছয়টি। যেমন ভাদ্রমাসের ভাদ্রলক্ষ্মী, আশ্বিনের কোজাগরীলক্ষ্মী, কার্তিকের কার্তিকেলক্ষ্মী, অগ্রহায়ণ মাসে ক্ষেত্র-লক্ষ্মী, পৌষের পৌষলক্ষ্মী এবং চৈত্রমাসের চৈতেলক্ষ্মী। এই ছয় লক্ষ্মীর মধ্যে আবার আশ্বিন-পূর্ণিমার কোজাগরীলক্ষ্মী, কার্তিক-অমাবস্যার দেওয়ালী বা কার্তিক-লক্ষ্মী এবং চৈত্র-পূর্ণিমার চৈতেলক্ষ্মী বা খন্দপূজা বাঙলায় সমধিক প্রসিদ্ধ। বঙ্গ মহিলারা ঘরে লক্ষ্মীর আসন পেতে দেবীর স্থাপনা করেন। আসনে ঘট, কড়ি, সিঁদুরের কৌটো, লক্ষ্মীর ছবি এবং লক্ষ্মীর বাহন পেঁচার মূর্তি রাখা হয়। প্রতি সন্ধ্যায় লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে কিছু নিবেদন করা হয়। সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালানো, লক্ষ্মীদেবীকে নমস্কার করা তাদের অবশ্য করণীয় কাজ। প্রতি বৃহস্পতিবার ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়া হয়। বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা হলে ঐদিনে ধার্মিক মহিলা উপবাসী থাকেন, রাত্রে পাঁচালী পাঠ করে ও লক্ষ্মী-দেবীকে নমস্কার করে খাদ্য গ্রহণ করেন। আশ্বিন সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হয় গাড়শী ব্রত। গাড়শীব্রত লক্ষ্মীব্রতেরই একটি রূপ। লক্ষ্মীর সন্তোষ বিধান এই ব্রতের লক্ষ্য। ব্রত উপলক্ষে ঘরদুয়ার পরিষ্কার করা হয়। রাত্রির চতুর্থপ্রহরে কাক ডাকার আগে গাত্রোত্থান করে বালক বালিকা সধবা বিধবা সকলে অন্তঃপুর প্রাঙ্গণে জ্বলন্ত প্রদীপসহ সমবেত হন। পূর্বেই একঘটি জল, কয়েকটি বাটা মশলা যথা সরিষা, মেথী, হলুদ, কুলগাছের নতুন পাতা রেকাবে রাখা থাকবে। প্রদীপের শিখার উপর কাঁচা তেঁতুল পোড়াবার নিয়ম এই ব্রতে। এই সময় ঘুমন্ত সকলে ঘুম থেকে উঠবেন। যাঁরা ধূমপায়ী তাঁরা তামাক খাবেন। যাঁরা তামাক খান না তাঁরা প্যাকাটি ভেঙে সিগারেটের মত করে ধূমপান করবেন। এইভাবে ধূমপান করার সময় একজন জিজ্ঞেস করবেন—'এত ধূমপান কেন?' ধূমপায়ীরা উত্তরে বলবেন—'মানবজাতির যাবতীয় কাশির পীড়া আরোগ্যের

জন্য।' তারপর দেওয়া হয় জয়জোকার বা উলুধ্বনি। পূর্বাহ্নে হয় লক্ষ্মীপূজা। নৈবেদ্যের প্রধান উপকরণ—ভেজান কাঁচা মুগ, মাসকলাই ও বুটের ডাল, নারকেল, কলা ইত্যাদি। সধবাগণও এদিনে আমিষ ভোজন করেন না। ব্রতকথায় বলা হয়, এক সদাগরের লক্ষ্মীরূপিণী স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুত্রবধূদের অলক্ষ্মীজনচিত অশোভন আচরণে উৎসাহিত হয়ে অলক্ষ্মীদেবী সদাগরের দ্বিতীয়া পত্নীরূপে গৃহে প্রবেশ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্রবধূর সদাচরণে তার সে আশা ব্যর্থ হয়। এই ব্রতে 'হালের অর্জন ও জালের মাছ' খেতে নেই। ব্রতিনীরা অরন্ধন পালন করেন—'আশ্বিনে রাধিয়া কার্তিকে খায়, যে বর মাগে সেই বর পায়'। এ ব্রত যে করে তার ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা থাকে, তার ঘরে অলক্ষ্মী ঢুকতে পারে না।

এই গাড়শী ব্রত সম্পর্কে কলকাতার বিজয়গড় কলোনী থেকে শ্রীমতী মালতী কর্মকার জানিয়েছেন—'পূর্ববঙ্গে বিশেষ করে ঢাকা বিক্রমপুরের গৃহস্থ বধূদের কাছে আশ্বিনের শেষ দিনটি 'গাড়ু সংক্রান্তি'। এইদিনে কাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম থেকে উঠে গোবর ছড়া দিয়ে উঠোন নিকোনো পোছানো হয়। স্নান করে ধূপধুনো ও প্রদীপ জ্বালিয়ে মহিলারা পথেঘাট দীপমালায় সজ্জিত করেন ও হুলুধ্বনি দিয়ে লক্ষ্মীকে বরণ এবং অলক্ষ্মীকে বিদায় দেন।

এদিন 'হালের এবং জালের' যাবতীয় তরিতরকারী ও মাছ হেঁসেলে ঢুকবে না। ভাত রান্না হবে বোরো ধানের চাল দিয়ে, আর খেসারীর ডাল রান্না হবে। এই ডালে যাবতীয় শেকড়, মোচা, ডাঁটা, লাউ, কুমড়ো, চালকুমড়ো, মানকচু, গাটিকচু, ওল, মেটেআলু, কলমীশাক, শালু, শাপলা ইত্যাদি যেসব তরিতরকারী ফলাতে চাষ করতে হয় না তাই দেওয়া হয়। এই ডালে তেল সম্বরাও দেওয়া হয় না। বিনাচাষে যে লঙ্কা জন্মায় তাই এ ডালে দেওয়া হয়। শুকনো হলুদের পরিবর্তে কাঁচা হলুদ ব্যবহার করার বিধি। তরকারী কাটার সময় প্রত্যেকটি আনাজের কিছু অংশ কেটে ভিন্ন করে রাখা হয়। তা এবং ভেজানো খেসারীডাল, কাঁচাহলুদ, কলা, কাঁচাতেতুল, পানসুপারী, সিঁদুর, ধূপধুনো এইসব হচ্ছে ব্রতের উপাচার। এয়োতিদের দিয়ে ব্রতকথা। এই ব্রতকথা পুরুষের শোনা নিষিদ্ধ। কথাটি সংক্ষেপে এইরকম: পুত্রবধূ সংসারে আসার পরেই মায়েরমতো স্নেহে শাশুড়ী তাঁকে যাবতীয় গৃহস্থালীর ক্রিয়াকর্ম আচারনিষ্ঠা পালনের তালিম দিয়ে স্বর্গারোহণ করলেন। বধূও শাশুড়ীর কথামতই সব মেনে চলেন। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই শ্বশুর এক মোহিনীর জালে জড়িয়ে পড়েন। সংসারে

সুরু হয় অনাচার। ঘরে অলক্ষ্মীর প্রভাবে লক্ষ্মীমাতা দূরে সরে যান। মোহিনীর পরামর্শমত শ্বশুর বধূমাতার আচারনিষ্ঠা ব্রতপার্বণে বাধা দেন। কিন্তু বধূমাতা গোপনে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সবই করে যান। এইভাবে আশ্বিনের সংক্রান্তি আসে। গাড়ুব্রতে মাছ নিষিদ্ধ, কিন্তু শ্বশুর বাজার থেকে মাছ নিয়ে আসেন। 'রান্নাকরে দাও বৌমা' বলে তাকে আদেশ দেন। পিতার মত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন বধূ তাঁর শ্বশুরকে। তাই তিনি রান্না করে দেন। এবং গোপনে গোপনে গাড়ুব্রত করতেও ভোলেন না। পরের দিন শ্বশুরঠাকুর ঘুম থেকে উঠেই দেখেন সেই ডাইনীটা কাকের মত বিকট চেহারা নিয়ে পথে মরে আছে। আবার ঘরে লক্ষ্মীমাতা ফিরে আসেন। আশ্বিনসংক্রান্তির রান্নাকরা বোরো চালের ভাত এবং তরিতরকারী সহযোগে খেসারী ডালের খাবার পয়লা কার্তিক পরিবারের সকলে স্নানাদি করে ভোজন করেন। এদিনে উনুন জ্বলে না।

আশ্বিন সংক্রান্তির পূর্বেই যদি কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীব্রত হয়ে যায় তবে গাড়শিব্রতে অলক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে পূজা করার বিধি। লক্ষ্মীর পূজা না হয়ে গেলে অলক্ষ্মীর পূজা হতে পারে না। অলক্ষ্মীর ধ্যানটি নিম্নরূপ—'ওঁ অলক্ষ্মীং কৃষ্ণবর্ণাঞ্চ ক্রোধনাং কলহপ্রিয়াং। কৃষ্ণবস্ত্র পরিধানাং লৌহাভরণভূষিতাং ॥ ভগ্নাসনস্থাং দ্বিভুজাং শর্করাঘৃষ্টচন্দনাং। সম্মার্জনী সব্যহস্তাং দক্ষহস্ত সূর্পকাং ॥ তৈলাভ্যঙ্গিত গোত্রাঞ্চ গর্দ্দভারোহণাং ভজে।'

অলক্ষ্মী গোবরের তৈরী পুতুল। তাকে কলার খোলে বসিয়ে তার পূজা ও ধ্যান করা হয়। ধ্যানে অলক্ষ্মী কৃষ্ণবর্ণা, ক্রোধী, এলোকেশী তার একহাতে কুলা, অন্যহাতে ঝাঁটা। পূজার পরে ছেলেমেয়েরা কুলাকে কাসির মত বাজাতে বাজাতে অলক্ষ্মীকে কোন রাস্তার তেমাথায় নিয়ে ফেলে দিয়ে আসে এবং ফেলে দিতে দিতে বলে—'লক্ষ্মী ঘরে আয়, অলক্ষ্মী দূর হ'। অনেকে আবার অলক্ষ্মী নাম উচ্চারণ করে না, বলে মাসীমা, মা লক্ষ্মীর বোন। অলক্ষ্মীর পুতুলের গোবর সংগ্রহ করতে হয় বাসি কাপড়ে। বাঁ-হাত দিয়ে পুতুল তৈরী করার বিধি। চোখ বানান হয় কড়ি দিয়ে। মেয়েদের ওঠা চুল দিয়ে দেওয়া হয় তার চুল। সর্বাঙ্গে ফুটিয়ে দেওয়া হয় তুলোর বিচি। তার আসন হচ্ছে ঘরের বাইরে রাখা ভাঙা তক্তা বা পিঁড়ি।

স্মরণীয়, বৈদিক শাস্ত্রে আমাদের এই লক্ষ্মীর উল্লেখ নেই যিনি সৌভাগ্য ও সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী। বেদ-পরবর্তী নানাগ্রন্থে লক্ষ্মীদেবীর উল্লেখ আছে। অথর্ববেদের একটি সূক্তে (৭.১১৫) লক্ষ্মীর চরিত্র চিত্রণ করে তাকে দুর্ভাগ্যের দেবী বলা হয়েছে। ফলে মনে করা যেতে পারে যে সৌভাগ্যের দেবী

লক্ষ্মী এবং দুর্ভাগ্যের দেবী (অ-)লক্ষ্মী একই দেবী নন। স্মরণীয়, লক্ষ্মী পূজায় যে সব উপাদানের প্রয়োজন, যেমন শূকর দন্ত, কুবের মস্তক, কলাবউ, নারকেল, ধান্য ইত্যাদি তা আর্য চিন্তার ফসল নয়, অনার্য পূজায় ব্যবহৃত উপাদান। অনার্যদের কাছ থেকেই ব্রাহ্মণ্য পূজায় এসবের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তাই শূকর অবতারের মাধ্যমে শূকরকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নরমুণ্ড তন্ত্র এবং পুরাণের দৌলতে জনপ্রিয় হয়েছে। ধান্যকে স্বয়ং লক্ষ্মী বলা হয়েছে। এই ভাবেই আদিম সমাজের কৃষি উৎসবকে লক্ষ্মী পূজার আবরণে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি মেনে নিয়েছে। আদিমসমাজের বহু আচারানুষ্ঠানে নরবলি প্রথা বিদ্যমান। বলি দেবার পরে বলি-হওয়া মানুষের অন্তঃকরণ উপরে ফেলে তা দেবতা বা উপদেবতার কাছে উপহার দেবার প্রথা সর্বজন বিদিত। আমাদের লক্ষ্মীপূজায় যে নারকেলের অর্ধাংশ উপহার দেবার রীতি আছে তা কুবেরের মাথার খুলির প্রতীক। এবং বলি-দেওয়া মানুষের অন্তঃকরণের প্রতীক লক্ষ্মী পূজার কলাবউ। কলাবউকে বলি দেয়া মানুষের প্রতীকরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। এ সবই প্রাচীন যাদু বা ভোজবিদ্যার চিন্তা প্রসূত। তাছাড়া কলার খোলে বিভিন্ন শস্য, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদির উপহারের মধ্যে যাদুর প্রভাব স্পষ্ট। কলার খোলের নৌকায় এই সব উপাদানের উপহারের মারফৎ মহিলাগণ নৌকাভর্তি ধান ও সম্পদ কামনা করে থাকেন। দুর্গাপূজার সময় গণেশের বউ হিসাবে যে কলাবউর পূজা হয়ে থাকে সে বনদুর্গা ছাড়া আর কেউ নয়। এই বনদুর্গাও আদিম সমাজের দেবী। জনপ্রিয়তাহেতু একে ব্রাহ্মণ্য-স্বীকৃতি দিতে হয়েছে। ক্রমে সে দুর্গা মণ্ডপেও স্থান পায় কলাবউ রূপে। বনদুর্গাও শস্য, সম্পদ ও প্রজনন শক্তির দেবী।

বাঙ্গালীর দুর্গা বাঙালীর কন্যা উমা সিংহবাহিনী, কাশ্মীরে ইনি অম্বা বা অম্বিকা, দক্ষিণ ভারতে আম্মা ও কন্যাকুমারী, গুজরাটে তিনি হিঙ্গলা, মহারাষ্ট্রে তিনি রুদ্রাণী প্রভৃতি। বাঙলা, উড়িষ্যা, বিহার ও আসামে শারদীয় দুর্গার পূজায় বিশেষ ধুমধাম। বাঙলায় দশভূজা মহিষমর্দিনী দুর্গার প্রথম প্রবর্তন হয় ষোড়শ শতকে রাজা কংসনারায়ণ কর্তৃক। বাঙলায় এই পূজা যখন আরম্ভ হয় তখন সম্রাট আকবর দিল্লীর নবাব। উত্তরবঙ্গের রাজসাহী জেলার তাহেরপুরে ছিল কংসনারায়ণের রাজপাট। দুর্গাপূজার শাস্ত্রসম্মত রীতিবিধি প্রণয়ণ করেন কংসনারায়ণের পৌত্র উদয়নারায়ণের সভাপণ্ডিত আচার্য রমেশ শাস্ত্রী। রমেশ শাস্ত্রীর আগেও রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্তপণ্ডিতগণ দুর্গাপূজার রীতিবিধি সম্পর্কে আলোচনা

করেছেন। দুর্গাপূজার ব্যাপকতা লাভ করে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে। তিনি রমেশ শাস্ত্রীর দুর্গাপূজাবিধিকে আরও সরল ও সহজসাধ্য করিয়ে নেন পণ্ডিত সমাজের সহায়তায়। বলাবাহুল্য, ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিক (আনুমানিক ১৫৮০ খ্রীঃ) থেকে দুর্গাপূজার চলন হলেও প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে দুর্গার ভাবকল্পনা বর্তমান। কাজেই এ পূজা প্রাচীন ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী বললে বোধহয় খুব বেশী বলা হয় না।

অনেকে দেবী দুর্গাকে বৌদ্ধদের বজ্রতারার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। দুর্গার ভাবকল্পনা ও প্রতিমালক্ষণের সঙ্গে বজ্রতারার খুবই মিল আছে। ঋগ্বেদে দুর্গা নামের উল্লেখ নেই, কিন্তু দেবীসূক্তে আদ্যাদেবীর যে রূপবর্ণনা আছে তা দুর্গাদেবীরই বর্ণনা বলে অনুমিত। ঋগ্বেদের রাত্রিদেবী, যজুর্বেদের হব্যবাহিণী অগ্নি, অথর্ববেদের সপ্তাগ্নিজিহ্বা প্রভৃতি বৈদিকসূক্ত দুর্গামন্ত্রে উচ্চারিত হয়ে থাকে। তাছাড়া বোধন, অরণি, হোম ইত্যাদি বৈদিক অনুষ্ঠান দুর্গাপূজার ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে আচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। এই সব ক্রিয়াকাণ্ডের মাধ্যমেই দুর্গাদেবী বৈদিক দেবতাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। বৈদিক যজ্ঞবেদী দক্ষণার পাশে যে চারজন দেবতার উপস্থিতি তাঁরা একজন বেদমাতা বা জ্ঞানের দেবী সরস্বতী, একজন শ্রী বা সম্পদের দেবী লক্ষ্মী, ও অপর দু'জন কার্তিকেয় এবং গণপতি। পৌরাণিক কল্পনায় হিমালয় কন্যা উমা, মহাদেবের স্ত্রী। তাঁদের চারছেলে মেয়ে—লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ। বাঙালীর দুর্গা প্রতিমার গঠন উপরোক্ত বৈদিক দক্ষণার চিন্তা থেকেই এসেছে দুর্গা উমা, সঙ্গীয় দেবদেবীরা তাঁর সন্তান। ভোলামহেশ্বর দুর্গার চালচিত্রের উপরে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে তার স্ত্রী-পুত্রকন্যাদের প্রত্যক্ষ করছেন। বাঙালীর দুর্গামণ্ডপে দুর্গার এ চিত্রটিই ফুটে ওঠে। ফুটে ওঠে বাঙালীর ঘরোয়া সামাজিক চিত্রের একটি ছবি। রামচন্দ্র দুর্গার অকালবোধন করেছিলেন। এই দুর্গা একদিকে হিমালয় নন্দিনী অপরদিকে বিন্ধ্যবাসিনী বা বিন্দুবাসিনী। মহাভারতের অর্জুনও এই বিন্ধ্যা-বাসিনীর পূজা করেছিলেন। বিন্ধ্যবাসিনী বিন্ধ্যপর্বতমালার আদিবাসী শবর ও গোপদের রক্ষাকর্তী দেবী 'শবরী'। 'শবরোৎসব' এই দেবীরই পূজা। শবর পূজাই দেবীর আদিমতম পূজা। অনৃ-আর্যদের পূজা এটি। দুর্গোৎসবের অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে শস্য উৎসব; তাই নবপত্রিকা বা কলাবউর অধিষ্ঠান হয়েছে দুর্গামণ্ডপে। শস্য উৎসবের দেবার

অধিষ্ঠানের অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। হরপ্পায় আবিষ্কৃত অসম একটি চতুষ্কোণ পোড়ামাটির শিলের উপরিভাগে প্রসারিত পদদ্বয় এক নগ্ন স্ত্রীমূর্তি উল্টোভাবে মাথা নীচু পা উপরে দেখান আছে। এর যোনিদেশ থেকে শস্য পল্লব নির্গমনশীল। মহেঞ্জোদারো আদিশিবের বাহুবলয়-ভূষিত হস্তদ্বয়ের ন্যায় এর ভুজদ্বয় সুদূর প্রসারিত। অন্য একটি শিলে দেখা গেছে যে শস্যপল্লব তার অধোদেশ থেকে বের না হয়ে সনল একটি পদ্ম স্কন্ধদেশ থেকে বের হয়েছে। উভয় শিলেরই অন্তর্নিহিত ভাব এক, দেবী খাদ্যশস্যের ধারিকা ও বাহিকা। খাদ্যশস্য ও উদ্ভিদের জনয়িত্রী রূপে দেবীর কল্পনা বাঙলায় শারদীয় দুর্গোৎসবের শাকম্ভরী রূপের বর্ণনায় মেলে—"ততোঽহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ। ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ। শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যামহং ভুবি।" অর্থাৎ হে দেবগণ অতিবৃষ্টির সময় আমি আমার নিজ দেহ হতে বিনির্গত প্রাণসঞ্জীবনী শস্যসমূহের দ্বারা সমস্ত জগতবাসীর ভরণপোষণ করি। তাই আমি বিশ্ববাসীগণের কাছে শাকম্ভরী নামে বিখ্যাত। কলাবউর সৃষ্টিতে কলা, কচু, হরিদ্রা, যব, বিল্ব, দাড়িম্ব, অশোক, মানকচু ও ধান এই নয়প্রকার সামগ্রী প্রয়োজন। তাই দুর্গামণ্ডপে কলাবউর উপস্থিতিতে দেবীকে আদিম শস্যদেবী বলে মনে করা হয়। দুর্গাপূজায় পাঁঠা ও মহিষ বলির মধ্যে আছে সমস্ত গ্লানিকে সমস্ত অকল্যাণকে ধ্বংস করার কামনা। এ প্রথাও আমরা আদিম সমাজের নিকট থেকেই পেয়েছি।

কলাবউকে অনেকে বলেন বনদুর্গার সঙ্গে দুর্গার যোগসন্ধি, অর্থাৎ সে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে অব্রাহ্মণ্য বা আদিম ধর্মের মিলনসন্ধির প্রতীক অথবা একটা আপোষরফার চিহ্ন হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন।

এই প্রসঙ্গে পুনরায় গাড়শী ব্রত স্মরণীয়। গাড়শী ব্রত হচ্ছে গার্হস্থ্য বা গুরুব্রত। এ ব্রতে কলার খোলের নৌকায় হলুদ, লাল ও সবুজ তিন রঙের তিনটি পিটুলীমূর্তি স্থাপন করা হয়। এই ত্রিমূর্তি যথাক্রমে লক্ষ্মী, কুবের এবং নারায়ণ। এঁরা সকলেই আদিম সমাজের দেবদেবী। লক্ষ্মী প্রথমে ব্রাহ্মণ্য স্বীকৃতি পান নি। লোক-চাহিদা বা জনমতের চাপে পড়েই আদিম সমাজের দেবী লক্ষ্মী ব্রাহ্মণ্য স্বীকৃতি লাভ করেন। ক্রমে আদিম সমাজের লক্ষ্মী অলক্ষ্মীতে পরিণত হন। এবং যেহেতু লক্ষ্মীর চেয়ে অলক্ষ্মী জ্যেষ্ঠ, সেহেতু কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার পূর্বে গৃহপ্রাঙ্গণে অলক্ষ্মীর পূজানুষ্ঠান হয়ে থাকে বাঙলার নানা স্থানে। কার্তিক অমাবস্যায় কালীপূজার পূর্বেও অলক্ষ্মীর পূজা হয়ে থাকে

বাঙলায়। মার্কণ্ডেয়পুরাণে কালীর ত্রিমূর্তি—লক্ষ্মী, মহাকালী এবং সরস্বতী। লক্ষ্মী, সুখ, সম্পদ বৃদ্ধি করেন, অলক্ষ্মী সম্পদ, সম্পত্তি প্রভৃতি ধ্বংস করেন, তাই তিনি ধ্বংসের দেবী, সংহারিকা ; আর সরস্বতী দান করেন বিদ্যা ও মেধা।

গৃহপালিত পশু থেকে সুরু করে ঘরের সকলের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য এই ব্রত উদযাপন করেন বঙ্গ ললনা। বাঙলার বিভিন্ন জাত ও বর্ণের লোক বিভিন্ন ভাবে এই ব্রত উদযাপন করেন আশ্বিন সংক্রান্তি দিবসে। এই ব্রত উদযাপিত হয় ব্রাহ্ম মুহূর্তে অর্থাৎ সূর্য ওঠার প্রাক-মুহূর্তে। আমরা জানি যে এই ব্রতের সঙ্গে প্যাকাটির বিশেষ একটি সম্পর্ক আছে। কোন কোন জায়গায় ছোট ছোট ছেলে ও মেয়েরা গোল হয়ে বসে প্যাকাটির আগুনে গা গরম করে। কোন কোন জায়গায় ওরা প্যাকাটিতে আগুন জ্বালিয়ে ছড়া আওড়ায় আর গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। কোথাও কোথাও ওরা কুলো উল্টো করে ধরে প্যাকাটি দিয়ে কুলো বাজায় কাঁসির মত করে। এই মিছিলের ভয়ে মশা, মাছি, কীট, পতঙ্গাদি পালিয়ে যায় আগুনের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে। শীত ঋতুতে কীটপতঙ্গ নানা অসুবিধার সৃষ্টি করে। মিছিল করে কুলা-বাদন ও আগুনের এই মশাল যাত্রাকে কীটপতঙ্গ মারার অভিযান বললে বোধহয় খুব একটা ভুল করা হয় না। কোনও কোনও স্থানে লক্ষ্মীর সরা ভেঙে ফেলে অলক্ষ্মীকে বরণ করা হয়। কোনও কোনও স্থানে লক্ষ্মীর ব্রতকথা পাঠ করা হয়। এ পাঠের সময় ঘরের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পাঠ্য বিষয় পড়তে বলা হয়। কারণ ঐ সময়ে পাঠ করলে ছেলেমেয়েরা নাকি তীক্ষ্ণধী হয়ে ওঠে। গাড়শী ব্রতের প্রসাদ ছেলেদের খেতে দেওয়া হয় না, কারণ লোক-বিশ্বাস, ঐ প্রসাদ খেলে তারা অনুভূতিহীন হয়ে যায়। কোনও কোনও জায়গায় গাড়শীব্রতের সঙ্গে মৃত শাশুড়ীর পূজাও করা হয়ে থাকে। গাড়শীব্রত এবং লক্ষ্মীপূজার মূলে অলক্ষ্মী বিতাড়নের প্রচেষ্টা স্পষ্ট। লক্ষ্মীপূজা শস্যদেবীরই পূজা। সম্পদ-অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হিসাবে লক্ষ্মীর সৃষ্টি ব্রাহ্মণ সমাজের প্রাপ্য। তাদের এই দেবী সৃষ্টির প্রেরণা জুগিয়েছে আদিম সমাজের শস্যদেবী যাকে আমরা দুর্গামণ্ডপে কলাবউ, কোথাও বনদুর্গা, কোথাও অলক্ষ্মী বলে জানি।

লক্ষ্মীদেবী ব্যতীত অরণ্যষষ্ঠী, নাগপঞ্চমী, সুবচনী, কুলাই প্রভৃতিও আদিম সমাজের দেবী ছিলেন। পরে আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ওঁদের স্বীকৃতি দেয়। সুবচনী ব্রত প্রধানত সধবা নারীর অধিকারে। এ ব্রতে সাধারণতঃ বিধবাদের স্থান নেই। এই ব্রত রবিবার অথবা বৃহস্পতিবার ভোরবেলায় অনুষ্ঠিত হয়। ব্রতের পূর্বদিন ব্রতিণীরা সুপারী, পান, সরষের তেল, সিঁদুর, শিলনোড়া ও চালুনী

সংগ্রহ করে রাখে। ব্রত আচার অনুষ্ঠানের দিন ব্রতিণী তার সখিবৃন্দ সমভিব্যাহারে তেরাস্তার মোড় অর্থাৎ যেখানে তিনটি রাস্তার সংযোগ ঘটেছে সেখানে আসে পূর্ব-সংগৃহীত উপাদানসহ। প্রথমে এসেই তারা রাস্তার মোড়ের এককোণে শিলনোড়া স্থাপন করে। তার উপরে ও নীচে রাখে পান ও সুপারী। তারপর শিলের উপরে তেল, সিঁদুর দিয়ে আঁকা হয় লক্ষ্মী মূর্তি। এই পান ও সুপারী অশুভশক্তির দেবতা থুনটোথুনটি বা থুনটোপীরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তারপর সুবচনীর ব্রতকথা। অনেকে এ ব্রত সোম ও বুধবার পালন করেন। বাড়ীর আঙ্গিনায় আলপনা দিয়ে চারকোণ ঘর, ঘরের মধ্যে থাকবে জোড়া হাঁস, একটি গর্তে থাকবে দুধ, তার উপর আম্রপল্লব। পুত্র ও পুত্র-বধূদের মঙ্গলকামনায় অনেক সময় বিধবারাও এ ব্রত করতে পারেন। ব্রতের কথায় আছে যে কলিঙ্গদেশে এক গরীব ব্রাহ্মণী ছেলেকে শাকভাত খাওয়াতে হিমসিম খেতেন। ছেলে একদিন বায়না ধরলে সে মাংস খাবে। ব্রাহ্মণী ছেলেকে বোঝালেন আমরা যে গরীব বাবা, কোথা থেকে মাংস জোগাড় করব। ছেলে বলল, আমি নিয়ে আসব, তুমি কিছু ভেবো না মা। ছেলে সত্যি সত্যি একদিন একটা খোঁড়া হাঁস নিয়ে এল। ব্রাহ্মণী ছেলেকে সে হাঁসের মাংস রান্না করে খাওয়ালেন। পরের দিন জানা গেল ঐ হাঁসটি রাজার হাঁস। ফলে ব্রাহ্মণীর ছেলে হাঁস চুরি ও হাঁস হত্যার দায়ে পড়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হল। শাস্তিস্বরূপ তার বুকে পাথর চাপা দিয়ে রাখা হল। ব্রাহ্মণী কেঁদে আকুল। প্রতিবেশীনীরা বললেন, কেঁদে কি হবে, সুবচনীকে ডাক, তবেই দেখবে তোমার ছেলে মুক্তি পেয়ে ফিরে আসবে। ব্রাহ্মণী কায়মনপ্রাণে মা সুবচনীকে ডাকলেন। ব্রাহ্মণীর ডাকে সন্তুষ্ট হয়ে সুবচনী রাজাকে স্বপ্ন দেখালেন, হে রাজা, ব্রাহ্মণ বালককে তুমি মুক্তি দাও এবং অর্ধেক সম্পত্তি সহ রাজকন্যার সঙ্গে ওর বিয়ে দাও। এ সব করে গিয়ে দেখ তোমার হাঁসশালে হাঁসটিকে। অন্যথায় হবে তোমার দারুন অমঙ্গল।

ঘুম ভেঙে রাজা হাঁসশালে গিয়ে হাঁস দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্রাহ্মণীর ছেলেকে মুক্তি দিলেন। ছেলেটির সঙ্গে রাজকন্যার বিয়েও দিলেন, আর দিলেন অর্ধেক সম্পত্তি। এ কাহিনীতে ব্রাহ্মণ্য রূপকল্প লক্ষণীয়। লোক-কাহিনী থেকে এ চরিত্রও কিছু অন্যরকম। সুবচনীর দয়ায় ব্রাহ্মণীর সংসার সোনার সংসারে পরিণত হল। তখন "চারকোণা করি ঘর, কাটিলা আঙ্গিনা পর, আলিপনা দিলেন ব্রাহ্মণী। চিত্রবিচিত্র করি, জোড়াহাঁস সারি সারি, লিখি তায় আরোপিল তাতে। আম্রশাখাপূর্ণ করি, দুগ্ধেতে গহ্বর পূরি, দিব্য শোভা

পদ্মিনী পাতাতে। সুবচনী পূজা সব, সঙ্গে কর শঙ্খরব, শুন সবে দণ্ডবৎ হয়ে। এয়োরে করবে দান, লাড়ু, রম্ভা, তৈল, পান, সিন্দুরাদি সবে দিয়ে। সীমন্তিনী সারি সারি, দাঁড়াইল শোভাকরি, ব্রাহ্মণী চরণে দিয়ে জল। অঞ্চল লোটায়ে তাতে, দিলা পুত্রবধূ মাথে, মনোবাঞ্ছা হইল সফল। প্রসাদীর দ্রব্য যাহা, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তাহা, ব্রাহ্মণী আপনি বাটি দিল"। সম্পূর্ণ ইন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান এটি। ইন্দ্রজালের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যবাদের সমন্বয়ী-ব্রত সুবচনীব্রত।

এ ব্রতও আদিম সমাজের স্ত্রী-শক্তিকে তুষ্ট করার প্রচেষ্টা থেকে উদ্ভূত। সুবচনী, সুভচনী, শুভচণ্ডী, সুবচনীদুর্গা প্রভৃতি নানা নামে দেবীকে আরাধনা করা হয়। এই দেবী হংসবাহনা। ইনি চণ্ডিকাদেবীরই একটি বিশেষ রূপ। পূজা আচরণ-বিধি ও কথায় স্পষ্ট বোঝা যায় যে দেবী আদিম লোকসমাজের চিন্তাভাবনার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য-ভাবনা যুক্ত হয়ে গড়ে উঠেছেন। পূজা-আচরণ-বিধির সঙ্গে মোটেই আর্য-ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির সংস্রব নেই। নানা ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে বাঙলার ব্রত বর্তমান রূপ নিয়েছে। দেবীপূজায় বলিপ্রথা চালু হয়েছে নরবলির আদিম আচরণের রজ্জু বেয়ে। গোমাংস হিন্দুসমাজে যখন চরম অপবিত্র তখন গো-মাংসেরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে বাঙলার বিভিন্ন ব্রতে। এবং জাত বাঁচাতে গিয়ে প্যাঁচ কষে রান্নাকরা গোমাংস ভক্ষণ থেকে বিরত থাকতে হয়েছে ব্রাহ্মণকে। উর্বরতাবৃদ্ধি, প্রজননশক্তিবৃদ্ধি, ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়াজনিত আরেকটি উল্লেখযোগ্য ব্রত ষষ্ঠীব্রত। শিশুপরিপালনকারিণী ধাত্রী স্বরূপিণী ষষ্ঠীদেবী সুপ্রাচীনকাল থেকে মাতৃজাতির আরাধ্যা। সন্তানের মঙ্গল কামনায় সবসময় ষষ্ঠীরপূজা করা হয়। হিন্দুগৃহে পুত্র জন্মের ছয়দিনের দিন সূতিকা বা ষেটেরা ষষ্ঠী পূজা, সাধারণত মেয়ে জন্মালে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয় না। অনেক জায়গায় একুশ কি বিশ দিনের দিন অশৌচান্তে ষষ্ঠী পূজা হয়ে থাকে। অন্নপ্রাশন প্রভৃতি শুভকার্যের পূর্বেও হয় ষষ্ঠীপূজা। প্রতি মাসে শুক্লা ষষ্ঠীতে নিত্য ষষ্ঠীব্রত করণীয়। বিভিন্ন মাসের ষষ্ঠীর বিভিন্ন নাম। জ্যৈষ্ঠের ষষ্ঠী অরণ্য বা আম ষষ্ঠীব্রত। ষষ্ঠীব্রত ও ছড়ায় ষষ্ঠীর অনেক নামের উল্লেখ আছে। যেমন—"অগ্রহায়ণে মূলোষষ্ঠী, ষাট ষাট ষাট। পৌষে লোটনষষ্ঠী, ষাট ষাট ষাট। মাঘে শীতলষষ্ঠী, ষাট ষাট ষাট। ফাল্গুনে গুণোষষ্ঠী, ষাট ষাট ষাট। চৈত্রে অশোকষষ্ঠী, ষাট ষাট ষাট। বৈশাখে দইষষ্ঠী, ষাট ষাট ষাট। জ্যৈষ্ঠে অরণ্যষষ্ঠী, ষাট, ষাট, ষাট। অরণ্যে গেলেও ঝি পুত ফিরে আসে। আষাঢ়ে চাপড়ষষ্ঠী, ষাট ষাট ষাট। শ্রাবণে লুণ্ঠনষষ্ঠী, ষাট ষাট ষাট। আশ্বিনে বোধনষষ্ঠী, ষাট ষাট ষাট। কার্তিকে

শ্মশান ষষ্ঠী, শ্মশানে গেলেও ঝি, পুত ফেরৎ আসে, ষাট ষাট ষাট।" এ ছাড়া অগ্রহায়ণের শুক্লপ্রতিপদ হচ্ছে হরিষষ্ঠী। চৈত্র সংক্রান্তির পূর্ব দিন হয় নীল-ষষ্ঠী পূজা। নীলষষ্ঠীতে অনেক জায়গায় কাঁচাঘট পূজা হয়। এ অনুষ্ঠানে মায়েরা সন্তানের কল্যাণ কামনায় উপবাস করেন, সন্ধ্যায় শিবের পূজা দিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করেন। সমস্ত ষষ্ঠীপূজাই সন্তান কামনা ও প্রজননশক্তিবৃদ্ধির পূজা।

চণ্ডীকে অবলম্বন করেও নানা ব্রত উদ্‌ভাবিত হয়েছে। যেমন হরিষ মঙ্গল চণ্ডী, সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডী, নাটাই মঙ্গলচণ্ডী, জয় মঙ্গলচণ্ডী, সুবচনীচণ্ডী প্রভৃতি। যোষিৎপ্রচলিত বার-ব্রতের মধ্যে মঙ্গলচণ্ডী সর্বপ্রধান। পারিবারিক মঙ্গল কামনা করে চণ্ডীর মাহাত্ম্য বর্ণন এই ব্রতের উদ্দেশ্য। এই ব্রত পালনে রোগ, শোক, দুঃখ, অশান্তি প্রভৃতি নাশ হয়, পরিবারের সকলে সুখে বসবাস করতে প্যারেন। কুমারী সধবা বিধবা (কচিৎ পুরুষ) এ ব্রত করতে পারেন। এ ব্রতে অর্ঘ্য বা 'শেখর' আবশ্যক। ধান থেকে নখ দিয়ে খুঁটে আটটি অখণ্ড আতপ চাউল বের করতে হবে। তার সঙ্গে আটগাছ দুর্বা কলাপাতা দিয়ে জড়িয়ে 'শেখর' নির্মাণ করতে হয়। যতজন ব্রত করবেন ততটা শেখর দরকার। পূজা অন্তে ব্রতিণীরা শেখর যত্নপূর্বক তুলে রাখবেন। স্বামীপুত্রকন্যাগণের বিদেশ যাত্রা কালে এই মঙ্গল শেখর মস্তকে স্পর্শ বা তার কোন অংশসহ যাত্রা শুভ হয়।

বর্ষীয়সী কোন মহিলা ব্রতকথা বলবেন। বাড়ীর মেয়েরা সমবেত হয়ে সে কথা শুনবেন। কোন কারণে কাউকে কথা না শুনে উঠতে হলে তার প্রতিনিধি হিসাবে ভূমিতলে একটি আঁচড় কেটে রেখে যেতে হবে। 'শেখর' বা 'ফুল' হাতে কথা শুনতে হবে—"এক ছিলেন বামুন ঠাকরুণ, আর ছিলেন গয়লার মেয়ে। তারা দু'জনে সই। ব্রাহ্মণী বৈশাখ মাসের মঙ্গলবার হরিষমঙ্গলচণ্ডী ব্রত করতেন। গয়লার মেয়ে বল্লেন, সই এ ব্রত করলে কি হয়? উত্তর—এ ব্রত করলে চিরকাল সুখে শান্তিতে থাকা যায়। গয়লার মেয়ে বলল, তবে আমিও এ ব্রত করব। ব্রতের নিয়ম বলে দাও। বামুন ঠাকরুণ বল্লেন, তুমি গয়লার মেয়ে, ব্রতের নিয়ম পালন করতে পারবে না। তোমার এ ব্রত করে কাজ নেই। গয়লার মেয়ে বললে, তা হবে না, আমি এ ব্রত করবই। যেমনি ব্রত আরম্ভ করলেন অমনি মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় তাঁর সংসার ধনজনে ভরে গেল। তাঁর সুখের সীমা রইল না। এত সুখ তাঁর সহ্য হল না। তিনি কাঁদবার জন্য আকুল হলেন। তখন বামুন ঠাকরুণের কাছে গিয়ে বললেন, (সে-জনের অর্থাৎ আমার) বড় কাঁদতে ইচ্ছা করছে। ব্রাহ্মণী বললেন, তোমায় তখন বলেছি এ ব্রত করলে কখনও চোখের জল পড়ে না। গয়লার মেয়ে

কান্নার জন্য গোঁ-ধরলেন। তখন ব্রাহ্মণী বললেন, তোমার যদি কাঁদতে এতই সাধ হয়ে থাকে তবে গেরস্তের ক্ষেত থেকে লাউ কুমড়া লুকিয়ে নাও গে; তারা তোমায় গালাগাল দেবে, যা-না-বলার তাই বলবে, তোমার মনে কষ্ট হবে, তুমি কাঁদতে পারবে। কিন্তু ব্রতের পুণ্যে তাঁর শরীর শুদ্ধ হয়ে গেছে। তাঁর হাত লাগাতেই ক্ষেত লাউ কুমড়াতে ভরে গেল। গৃহস্থ অবাক হয়ে ভাবতে লাগল ইনি সামান্যা মেয়ে নন, স্বয়ং লক্ষ্মীঠাকরুণ। তারা নিজেরাই বয়ে গয়লার মেয়ের বাড়ীতে লাউ কুমড়া দিয়ে যেতে লাগল।

তাঁর কান্না হল না। তিনি পুনরায় সইর কাছে এলেন। গিয়ে বলেন, সই, সেজন কাঁদতে পাল্লে না। ব্রাহ্মণী বললেন, তোমার যদি কাঁদতে এত সাধ হয় তবে আর এক কাজ কর। রাজবাড়ীর হাতী মরে পড়ে আছে। তুমি ঐ হাতীর শোকে হাতীর জন্য মায়াকান্না করো গে। গয়লার মেয়ে তাই করলেন। কিন্তু ব্রতের পুণ্যে তাঁর শরীর শুদ্ধ হয়ে গেছে। তাঁর হাত লাগতেই বারো বছরের মরা হাতী বেঁচে উঠল। সকলে তাজ্জব। রাজা খুশী হয়ে হাতী ঘোড়া সোনারূপা দিয়ে গয়লার মেয়ের বাড়ীঘর ভরে দিলেন।

এবারেও গয়লার মেয়ের কান্না হল না। তিনি আবার সইর কাছে গেলেন। সব বললেন। বললেন, সই সুখ আরো বেড়ে যাচ্ছে, একটু কাঁদতে না পারলে আর বাঁচি না। ব্রাহ্মণী বল্লেন, তোমার যদি কাঁদতে এতই সাধ হয় তবে আর এক কাজ কর। সাপের বিষ মেখে লাড়ু তৈরী করে বিদেশে তোমার বড়ছেলের কাছে পাঠাও। গয়লার মেয়ে তাই কল্লেন। বৈশাখ মাস, দারুণ রোদ। যে লোকটি লাড়ু নিয়ে যাচ্ছিল সে পথে একটি পুকুর-পাড়ে হাঁড়ি রেখে স্নান করছিল। তখন মা মঙ্গলচণ্ডী ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ভাবলেন, আমার ভক্তের দুর্মতি হয়েছে, তবে যদ্দিন আমার ব্রত করবে তদ্দিন ওকে চোখের জল ফেলতে দেব না। এই ভেবে মা চণ্ডী মুখের অমৃত দিয়ে বিষের লাড়ুকে অমৃতের লাড়ুতে পরিণত করলেন। চাকর সে সন্দেশের হাঁড়ি নিয়ে গয়লার ছেলের কাছে পৌঁছালে ছেলে তা খেয়ে বল্লে, মা এমন খাবার তৈরী করতে পারেন তা তো আগে জানতুম না। মাকে বলিস তিনি যেন মাঝেমাঝেই এমন লাড়ু পাঠান। ছেলে লোকটিকে বকশীষ দিয়ে বিদায় দিল। সে খুশী হয়ে ফিরে এল। এদিকে বাড়ীতে গয়লার মেয়ে এলোচুলে উঁচুনীচু স্থানে দাঁড়িয়ে প্রস্তুত হয়ে আছেন কাঁদার জন্য। এমন সময় চাকর ফিরে এসে গিন্নিকে অমন ব্যস্ত হতে দেখে বল্লে, মা ঠাকরুণ তুমি এত উতলা হয়েছ কেনে, খোকাবাবু ভাল আছেন, তিনি এবার লাড়ু

খেয়ে খুব সুখ্যাতি করেছেন। আমাকে বকশীষ দিয়েছেন। আরও লাড়ু পাঠাতে বলেছেন। খুব খুশী হয়েছেন খোকাবাবু।

গয়লার মেয়ের এবারেও কাঁদা হল না। তিনি ছুটে গিয়ে সইর কাছে বল্লেন, সই এবারও আমার কাঁদা হল না। ব্রাহ্মণী বললেন, তবে আর এক কাজ কর। এবার তোমার মেয়ের বাড়ী তত্ত্ব পাঠিয়ে দাও। সন্দেশ-হাঁড়িতে সন্দেশ না দিয়ে দুটো কেউটে সাপ দাও। তোমার ছোটছেলে মাথায় করে তত্ত্ব নিয়ে যাক। হয় রাস্তায় তোমার ছেলের নয়, তোমার মেয়ের শ্বশুরবাড়ীর কারুর না-কারুর একটা ভাল-মন্দ অবশ্যি ঘটবে। তখন তুমি কেঁদো। গয়লার মেয়ে তাই করলেন। এবারও মা মঙ্গলচণ্ডী ভাবলেন, যতদিন গয়লার মেয়ে আমার ব্রত করছে ততদিন ওকে কাঁদতে দেব না। এই ভেবে তিনি সাপের হাঁড়ির সাপ তুলে নিয়ে, সোনা দিয়ে সে হাঁড়ি পূর্ণ করে দিলেন। আত্মীয়কুটুম্বেরা তত্ত্ব পেয়ে ভারী খুশী। এদিকে গয়লার মেয়ে এলোচুলে উঁচুনীচু স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন দুঃসংবাদের জন্য। এমন সময় ছেলে এসে উপস্থিত। মাকে ব্যস্তসমস্ত দেখে সে বল্লে, মা তুমি এত উতলা কেন, দিদিদের শ্বশুরবাড়ীর সকলেই ভাল, তারা তোমার সোনাদানা পেয়ে খুব সুখ্যাতি করেছে। আমিও বাজার থেকে দই সন্দেশ মাছ দুধ কিনে নিয়ে গেছিলাম।

গয়লার মেয়ের কাঁদা হল না। তিনি আবার সইর কাছে ছুটলেন। সই বিরক্ত হয়ে বল্লেন, হাঁ এবার ঠিক হয়েছে, আর ভাবনা নেই। এক কাজ কর, আসছে কাল মঙ্গলবার। এবার তুমি আর ব্রত কর না। গয়লার মেয়ে তাই করলেন। মঙ্গলবার ব্রত উপবাস বন্ধ রেখে সকাল সকাল পঞ্চাশ রকম ব্যঞ্জনসহ ভাত আহার করলেন। এবার সত্যি তার দুর্মতি হল। মঙ্গলচণ্ডী বিরূপ হলেন। সেইদণ্ডে তাঁর হাতীশালে হাতী মরল, ঘোড়াশালে ঘোড়া মরল, ছেলেমেয়ে জামাই যে যেখানে ছিল সব মরে গেল। তখন তিনি হাহাকার করে দিবারাত্রি কাঁদতে লাগলেন, তাঁর মরাকান্নার করুণ রোল শুনে পাড়াপড়শীরা আর তিষ্ঠাতে পারে না। এভাবে দু'চারদিন কেটে গেল। কেঁদে কেঁদে হয়রান হয়ে তিনি আবার সইর কাছে গিয়ে বল্লেন, সই সেজন আর কাঁদতে পারে না। ব্রাহ্মণী তখন বল্লেন, তা আমি কি করব, তোমার এতদিনের সাধ এবার প্রাণ ভরে কাঁদ। শোকে দুঃখে গয়লার মেয়ের বুক ফেটে যেতে চাইল। তিনি ব্রাহ্মণীর পা জড়িয়ে ধরে বল্লেন, সই রক্ষা কর, সেজন আর কাঁদতে পারে না। ব্রাহ্মণীর তখন দয়ার উদ্রেক হল। তিনি বল্লেন, তোমাকে আসছে মঙ্গলবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তিনি সব

জায়গায় খবর পাঠিয়ে দিলেন কেউ যেন মড়া না পোড়ায়। তারপর ব্রাহ্মণীর উপদেশ মত গয়লার মেয়ে ষোড়শোপচারে ভক্তিভরে মহাধূমধামে পুনরায় মা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করলেন মঙ্গলবার সকলে। পূজার ফুলজল মড়ার উপর ছিটিয়ে দিতেই ছেলেমেয়ে, জামাই, হাতী, ঘোড়া সব যে যেখানে মরে ছিল বেঁচে উঠল। গয়লার মেয়ের আর আনন্দের সীমা রইল না। হাতে হাতে ব্রতের ফল পেলেন। গয়লার মেয়ের অবস্থা দেখে পাড়াপড়শী সকলের মা মঙ্গলচণ্ডীর উপর ভক্তি বেড়ে গেল। সকলে মঙ্গলচণ্ডীব্রত করে যেতে লাগলেন।

অনেকের বাড়ীতে ব্রত ছাড়াও নিয়মিত মঙ্গলচণ্ডীর পূজা হয়। পটে, প্রতিমায় বা ঘটে এই পূজা করার নিয়ম। অষ্টমী, নবমী ও মঙ্গলবারে দেবী পূজার বিধান দিয়েছেন রঘুনন্দন। তিনি দ্বিভূজা, তাঁর এক হাতে বর অপর হস্তে অভয়। দেবী গৌরবর্ণা, রক্তকুণ্ডলিমণ্ডিতা, কৌষেয় বস্ত্রে শোভিতা, রক্ত পদ্মাসনে অবস্থিতা ও বরাভয়া।

বিপত্তারিণী নামে দেবী দুর্গার এক কল্পিত বিশেষ রূপকে অবলম্বন করে তাঁর ব্রত অনুষ্ঠিত হয় আষাঢ় মাসের শুক্লাঅষ্টমী তিথিতে। ফলের নয় প্রকার নৈবেদ্য—খণ্ড খণ্ড আনারস, লবঙ্গ, এলাচি, দধি, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন প্রভৃতি ছাড়া তুলসী, দুর্বা, বেল ও হরিৎবর্ণ সুতোর ডোর বামহস্তে ধারণ করে এ ব্রত উদযাপন করতে হয়। ব্রতকথায় আছে—এক রাণীর গো-মাংস দেখার ইচ্ছা হলে স্বীয় সখী চর্মকারপত্নীর নিকট থেকে তা সংগ্রহ করেন। স্মরণীয়, মূলাষষ্ঠীর ব্রতকথায়ও ব্রাহ্মণ-রমণীর গো-মাংস রন্ধনের বিবরণ আছে। এই ব্রতকথায় জানা যায় যে এক ব্রাহ্মণের মাংস খেতে সাধ গেল। কোত্থেকে এক হাঁস নিয়ে এসে সে ব্রাহ্মণীকে বল্লে আমার মাংস খেতে ইচ্ছে করছে, আমায় রেঁধে দাও। আর তুমি না পার বড়বৌমাকে বল সে রেঁধে দেবে। বড়বৌমা মাংস রান্না করলেন। ঝিকে ডেকে বল্লেন, ঝি, ঠাকুর এত সাধ করে মাংস খেতে চান তুই একটু চেখে দ্যাখ তো, কেমন হয়েছে। ঝি কোনদিন মাংস খায় নি। সে খানিকটা খেয়ে বল্লে, বড্ড গরম দিয়েছ একটুও সোয়াদ পেলাম না, আর একটু দাও। এমনি করে চাখতে চাখতে সে সব মাংস খেয়ে ফেল্লে। বউমা বল্লে, ঝি, তুই কি করলি, সব মাংস খেয়ে ফেল্লি! কি হবে এখন! তাহলে তুই শীঘ্র যা আর একটি হাঁস যদি পাস চট করে নিয়ে আয়, আমি দাম দেব, তোকেও পুরস্কার দেব। ঝি ভয়ে ও পুরস্কারের লোভে হাঁস না পেয়ে পাড়ার গেরস্তদের একটা আধমরা রোগা বাছুর লুকিয়ে কেটে সেই মাংস বউমাকে এনে দিল। সে মাংস কিছুতেই সিদ্ধ হয় না। বৌমা তখন বুঝল যে কোথাও যেন কি

একটা গোলমাল হয়েছে। তখন সে ঝিকে বলল, তোর বুকের পাটা তো কম নয়, কি মাংস এনেছিস ? ঝি থতমত খেয়ে বল্লে, কি যে কথা গো, হাঁসের মাংস চিনতে পার না! তোমরা রাঁধতে জান বটে কিন্তু মাংস চেন না। এই বলে সে লুকিয়ে কতগুলো পেঁয়াজ বেটে হাঁড়িতে ফেলে দিল। পেঁয়াজের গন্ধে বউমা তিষ্ঠাতে পারে না। কিন্তু কাকে কি বলবে, অনেক ভেবে ঠিক করলে খাবার জায়গা পিচ্ছিল করে রাখি, পরিবেশন করার সময় আছাড় খেয়ে পড়ব, আমার যেন দাঁতকপাটি লেগেছে এমনি ভাবে পড়ে থাকব, কথা কইব না। যা ভাবল তাই করল। খাবার দিতে গিয়ে থালা হাতে বউমা পড়ে গেল। পাড়ার লোকে রান্নাঘর ভরে গেল। ব্রাহ্মণের মাংস খাওয়া হল না। তার জাত রক্ষা হল। তখন ঝিকে ডাকা হল। ব্রাহ্মণ বলল, কোত্থেকে মাংস এনেছিস দেখাবি চল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঝিকে যেতে হল। অনুসন্ধানে বাছুরের মাংসের কথা জানতে পেরে বামুন একেবারে থ। কিছু দিনের মধ্যেই বউমা সুস্থ হয়ে উঠল। সেদিন অগ্রাণমাসের শুক্লাষষ্ঠী। মূলা ষষ্ঠীব্রত এদিনেই অনুষ্ঠিত হয়। বউমা ছোট বেলা থেকে মূলাষষ্ঠীব্রত করত। সে পূজা পুনরায় সে আরম্ভ করল। ষষ্ঠী-ব্রতের দিন মাংস দূরে থাক, কেউ মাছও যেন না খায় এই পরামর্শ দিল ব্রাহ্মণ।

আরও নানাভাবে গোমাংসের অনুপ্রবেশ হয়েছে বাঙলার ব্রতে। যেমন একদা এক রাণীর গো মাংস দেখার ইচ্ছার কথা রাজা জানতে পেরে ভয়ানক চটে যান। রাণী এক মুচিনীর মারফৎ চুপড়িভর্তি গোমাংস ঘরে আনেন। জানতে পেরে রাজা বললেন, ঘরে কি লুকিয়ে রেখেছ শীগগীর আন, যদি সত্যিকথা না বল তা হলে তোমায় কেটে ফেলব। রাণী বললেন, আমার ঘরে ফলফুল ছাড়া কিছুই নেই। এই বলে তিনি বিপত্তারিণী দুর্গাস্তব করতে লাগলেন। দেবীর প্রসাদে লুকানো গো-মাংস ফলপুষ্পে পরিণত হলে রাজা সন্তুষ্ট হলেন। এই ব্রত আষাঢ় মাসের রথদ্বিতীয়ার পর দশমীর মধ্যে যে কোন শনি বা মঙ্গলবার করা হয়। ব্রতে চালের তৈরী তেরোটি পিঠা, তেরোটি পান, তেরোটি সুপারী ও তেরো প্রকার ফলের দরকার হয়। ডান হাতে লাল সুতার তেরোটি গ্রন্থিযুক্ত ডোর ধারণ করারও রীতি আছে।

মাঘমাস আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয় বনদুর্গার পূজা। পূজার দশ বারোদিন আগে থেকেই সুরু হয় পূজার কাজ। নানারকম ফুল বনদুর্গা পূজায় লাগবেই। যে কোন ফুল দিয়েই তার পূজা হতে পারে। পূজায় খই চিড়া প্রভৃতির দরকার হয়। এ পূজায় পুরোহিতের দরকার হয় না, কোন মন্ত্রও নেই, আছে কতগুলো ছড়া। সে ছড়ারও নির্দিষ্ট কোন রীতি নেই। খুব

ভোরে যতক্ষণ সূর্য না উদিত হচ্ছে ততক্ষণ চলে ছড়ার আবৃত্তি, তারপর যে যার ঘরে চলে যায়। আবার সন্ধ্যায় এসে সব একত্রিত হয়। এবার ধূপদীপ জ্বালিয়ে দেয় বেদীর উপরে। ঐ বেদীর উপরে সংগৃহীত ফুল ছিটাতে ছিটাতে বলে—'সাঁজে এসরে সাজনা গীতি, কানরে সবে এক রাতি। বাড়ির কাছে ভাঙাবন, তাই ভাঙতে এতক্ষণ। এক কড়ায় ঘুটি মুচি, দুই কড়ায় ঘি। সাজ পরদীপ লাগাল বাওনগোর ঝি। বাওন-ঝি বাওন-ঝি বলে আলাম তোরে। তোর গৌরাঙ্গের বিয়া শনি মঙ্গল বারে।' এ পূজা করলে নাকি ফোড়া, পাঁচড়া প্রভৃতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। পূজা সমাপ্ত হলে বলা হয়—'এবার যাওরে ঠাকুর ফোঁট পাঁচড়া নিয়ে। আবার এস হে ঠাকুর শঙ্খ শাড়ি নিয়ে।' ঘেঁটু পূজারও একই উদ্দেশ্য। ঘেঁটু দেবতার সর্বাঙ্গে খোস, চুলকানী আর দগদগে ঘা। 'ঘেঁটুর রূপ দেখবি যদি আয় সজনি যমুনারি ঘাটে। ও ঘেঁটুর গায়েতে ঘা, চোখে ছানী, পেটটা বুঝি এখুনি ফাটে। এমন জামাই আনল রাজা লাজে মোরা মরে যাই। চল, সখী চল দেখে আসি ঘেঁও ঘেটুর মূর্তিটাই। এবছরে যাও গো ঘেঁটু খোস পাঁচড়া নিয়ে। ফি বছর এসো ঘেঁটু সাজ পোষাক নিয়ে।' পাঁচড়া পূজা হয় হিজল গাছের তলায়। ভাঙাকুলায় থাকে পাঁচড়া দেবীর পূজার উপকরণ—বন্যফুল, কুমড়া ও ধুতুরা ফুল, ইঁদুরের মাটি, বাসিউনুনের ছাই ইত্যাদি। এ পূজার ছড়া—'হ্যাচরা মাগীর প্যাঁচড়া চুল। তাইতে লাগে বাইন্যার ফুল। বাইন্যার ফুল না লো ধুতুরার ফুল। ধুতুরার ফুল না লো কুমড়ার ফুল। কুমড়ার ফুল না লো লাউয়ের ফুল। লাউয়ের ফুল না লো বাসি আঁখার ছাই। বাসি আঁখার ছাই না লো ইন্দুরের মাটি। ইন্দুরের মাটি না লো ভাঙা চাড়া। হিজল গাছে দিয়া সাড়া। পাঁচড়া মাগীরে করো গেরাম ছাড়া।' এই ছড়া ও ব্রত-অন্তে সকলে নিম, হলুদ গায়ে মেখে স্নান করে। যারা ব্রতে যোগ দেয় না তারা ব্রতের নিম, হলুদ কপালে ছোঁয়ায় পাঁচড়া, চুলকানীর হাত থেকে মুক্ত থাকতে।

শিব বা শিবসদৃশ দেবতা অবলম্বনে নানা ব্রতের উদ্ভব হয়েছে। অগ্রহায়ণ মাসের ক্ষেত্রব্রত উপলক্ষে পূজিত দেবতা ক্ষেত্রপাল বা ক্ষেত্র দেবী। এই ব্রতে খই ও তিলের ছাতুর প্রয়োজন। কোন কোন জায়গায় ক্ষেত্রপালকে দই ও হলুদ মেশান মাষকলাই উপহার দেওয়া হয়। কৃষিজীবী সমাজের কল্যাণ কামনায় এ ব্রত। নতুন ধানের মুড়ি, মুড়কি, চালভাজা, চালের গুঁড়ো ইত্যাদির নৈবেদ্য দরকার হয়। ব্রতিণী অন্নাহার না করে দই দুধ ফল মূলাদি ভোজন করেন পূজান্তে। ক্ষেত্রপালের পূজায় অনেক

জায়গায় মাটির কুমিরেরও পূজা হয়। পৌষ সংক্রান্তি মকর পূজায়ও কুমির বলিদান হয় অনেক জায়গায়। ক্ষেত্রব্রত কথায় আছে—এক গরীব চাষীর ছেলে। তার মা বাপ নেই। সে মামাবাড়ী থাকে। মামা মামী তাকে ভালবাসত না। ছেলেটি সর্বক্ষণ খাটত। সর্বদাই দা-কোদাল নিয়ে কাজ করত। পাড়াপড়শীরা তাকে 'দাকোদাল' বলে ডাকে। সে ক্ষেত্র-দেবতার বিশেষ ভক্ত। তারই পুণ্যে দা-কোদালের মামার ক্ষেত ভরা ফসল। কিন্তু তাকে আধপেটা খেতে দেয় মামী। যে খাবার পায় তা থেকেই সে কিছু ক্ষেত্রদেবতাকে নিবেদন করে তবেই আহার করে। মামার গোয়ালভরা গরু, পালভরা মোষ, ঘরে দই, দুধ, ক্ষীর অনেক। ছেলেমানুষ বিশেষ বুদ্ধি নেই। সে একদিন মামীর কাছে দুধের সর খেতে চাইল। মামী বল্লে, হতভাগা ছেলে কোথাকার, তোর জন্যে কি আর ঘরে দুধের সর রাখতে পারব না। রয়-রোজগার নেই সর খেতে চাওয়া, কি আমার কেষ্টঠাকুর গো, পালা পালা এখান থেকে।

দা-কোদালের দুঃখ হল। ক্ষেত্রদেবতা তার দুঃখে কাতর হয়ে ব্রাহ্মণের বেশে তার কাছে এলেন। কারণ এই ছেলেটি ছাড়া আর কেউ তাঁকে ভক্তি করে না। ব্রাহ্মণ বল্লেন, আমার কথা শোন, আর পরের গোলামী করা কেন, যা এখনই মামার বাড়ী ত্যাগ করে ওই যে দূরে একটা প্রকাণ্ড মাঠ দেখতে পাচ্ছিস, সেখানে একখানা কুঁড়ে ঘর তৈরী করে নিজে নিজের চাষবাস কর গে। তোর দুঃখ দূর হবে। মনে শান্তি পাবি।

দা-কোদাল তাই করলে। তারপর অগ্রহায়ণ মাস শনিবারের এক সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলে তার ক্ষেতে ধান তো নয় যেন সোনা ফলে আছে। ক্ষেত্র দেবতার কৃপায় তার কুঁড়েঘর রাজঅট্টালিকা হয়ে গেল। এদিকে ভাগ্নে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীদেবী মামাদের ঘর পরিত্যাগ করলেন। তারা ভাতের কাঙাল হয়ে পড়ল। ক্ষেত্রদেবতার কোপে দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ ও জলকষ্ট দেখা দিল। দা-কোদাল এখন বড়লোক হলেও গরীবদের প্রতি তার বড় দয়া। সে জলকষ্ট লাঘব করতে অনেক পুকুর কাটল। যারা মজুরী করতে আসত তাদের অন্নদান করত। খেতে না পেয়ে তার মামা-মামীও একদিন অন্নছত্রে এসেছিল। তাঁদের চিনতে পেরে দুটি মজুরকে বল্লে, শীগ্‌গীর ঐ পুরুষ আর স্ত্রীলোক দু'জনকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পড়িয়ে বাড়ীর ভিতর নিয়ে আয়। মামা-মামী ভয়ে অস্থির। ঘরে তিনজনের একই জায়গায় আহারের ব্যবস্থা হল। পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ও ভাত দেখে মামা-মামীর চক্ষুস্থির। ওইভাবে দা-কোদালকে দেখে মামা-মামী আরও স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিন্তু দা-

কোদালের কথা শুনে ও তার চমৎকার ব্যবহারে ঘাম দিয়ে তাঁদের গায়ের জ্বর ছাড়ল। ওঁরা আহ্লাদিত হলেন।

দা-কোদাল মামা-মামীকে তার সংসারের কর্তা করল। দা-কোদালের এখন ভীষণ আদর যত্ন। এটা খাও, ওটা খাও। মামী ভাগ্নেকে কেবল দুবেলা দই দুধ সন্দেশ ক্ষীর ও দুধের সর খাওয়াতে চান। একদিন রহস্য করে দা-কোদাল বলেই ফেললে—'সেই মামা, সেই মামী পুকুর পাড়ে ঘর। এখন কেন মামা-মামী দুধে এত সর।' এ কথা তখন প্রবাদে পরিণত হয়েছে। মামী লজ্জা পেলেন। তারপর দা-কোদালের বিয়ে হল রাজকন্যার সঙ্গে। তাঁরা ক্ষেত্রদেবতার ব্রত প্রচার করলেন দিকে দিকে।

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারাদের নিয়েও নানা ব্রত। নানা ছড়া। অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার হয় চুণ্ডীরব্রত। তাছাড়া ইতুব্রত, মাঘমণ্ডলব্রত, সূর্যব্রত, তারাব্রত ইত্যাদির সঙ্গেও আছে সৌর দেবতাদের বিশেষ যোগ। ইতুব্রতে কার্তিক সংক্রান্তিতে ইতুর ঘট পাতা হয়। মাটির সরায় পাঁচ কড়াই—ছোলা, মটর, কলাই, মুগ ও যব ছড়িয়ে অনুষ্ঠিত হয় এ ব্রত। এই ব্রতের কথার সঙ্গে চুণ্ডী ব্রতের কথার অনেক মিল। ব্রতে রূপনা-ঝুপনা বা রুমনা-ঝুমনা বা জয়া-বিজয়ার করুণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সূর্যের অনুগ্রহে নির্বাসিতা ভগ্নীদ্বয় সুপ্রচুর সুখসম্পদের অধিকারিণী হন।

মাঘমণ্ডল ব্রত পাঁচ বৎসর পালনীয়। এই ব্রতে কোট বা বৃত্ত আঁকার নিয়ম। সে বৃত্তের পূর্বে ও পশ্চিমে একটি ছোট বৃত্ত ও একটি অর্ধ বৃত্ত থাকে। এই বৃত্তদ্বয় যথাক্রমে সূর্য ও চন্দ্রের প্রতীক। প্রতি বৎসর এক একটি বৃত্ত বাড়াতে হয়। মাঘমাসের প্রথম দিন থেকে মাঘমাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত এক মাসব্যাপী এ ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। সূর্যোদয়ের পূর্বে ঘুম থেকে উঠে মেয়েরা শুচিশুদ্ধ অন্তরে দল বেঁধে এগিয়ে যায় পুকুর ঘাটে। সূর্যের উদ্দেশ্যে মন্ত্র উচ্চারণ করে আর দূর্বাগুচ্ছ মুখে বুলাতে বুলাতে বলে 'যে জল ছোঁয়নাকো কাগে আর বগে সেই জল ছুঁইলাম মোরা দূর্বার আগে।' তারপর বলে—'চোখে মুখে জল দিতে কি কি ফুল লাগে, শর্রুয়া মরুয়া দুটি ফুল লাগে। ভাই এনে দিল সরষের ডালি, তাই দিয়া আমরা মুখ প্রক্ষালি।' পরে বলে 'ওঠ রে সূর্য উদয় দিয়া। বাওনের বাড়ীর পিছন দিয়া। বাওনের মাইয়া বড় সেয়ান, পৈতা জোগায় বেয়ান বেয়ান' ইত্যাদি। সূর্যের বিয়ের বর্ণনা ব্রত কথারই অঙ্গ বলা হয়। সূর্যের বিয়ের বর্ণনার মারফৎ নিজ বিয়ের বাসনা জানায় ব্রতী। বলে—'চন্দ্রকলা মাধবকন্যা মেইল্যা দিছেন ক্যাশ। তারে দেইখ্যা সূর্যই

ঠাকুর ফেরেন দ্যাশবিদ্দাশ। চন্দ্রকলা মাধবকন্যা মেইল্যা দিছেন ক্যাশ। তারে দেইখ্যা সূর্যাইঠাকুর ফেরেন বাড়ীবাড়ী। চন্দ্রকলা মাধবকইন্যা খেলে খাড়ুয়া পায়। তারে দেইখ্যা সূর্যাইঠাকুর বিয়া করতে চায়।' চন্দ্রকঁলা—'তোমার দ্যাশে যাব সূর্যাই মা বলিব কারে?' সূর্য—'আমার মা তোমার শাশুড়ী মা বলিও তারে।' চন্দ্রকলা—'তোমার দ্যাশে যাব সূর্যাই বাপ বলিব কারে?' সূর্য—আমার বাপ তোমার শ্বশুর বাপ বলিও তারে।' চন্দ্রকলা—'তোমার দ্যাশে যাব সূর্যাই ভাই বলিব কারে?' সূর্য—'আমার ভাই তোমার দেওর ভাই বলিও তারে।' চন্দ্রকলা—'তোমার দ্যাশে যাব সূর্যাই বইন বলিব কারে?' সূর্য—'আমার বইন তোমার ননদ বইন বলিও তারে।' তারপর ব্রতীরা এক একটি করে ফুল ছিটিয়ে দিতে দিতে বলে—'মাঘমণ্ডল সোনারকুণ্ডল, সোনার কুণ্ডলে ঢালিয়া ঘি, আইজ হইতে আমরা বড়মানুষের পুতেরঝি। সোনার-কুণ্ডলে ঢালিয়া মধু, আইজ হইতে আমরা বড়মানুষের পুত্র বধূ। সোনারকুণ্ডলে ঢালিয়া লাড়ু, আইজ হইতে আমাগো শাঁখার আগে সোন্যার খাড়ু। চন্দ্র সূর্যে দিয়া ফুল ভরইয়া উঠুক দুই কুল।' এ ব্রতে আছে প্রচণ্ড উন্মাদনা।

এই সব ব্রত পুরাণ-সঙ্কলিত হবার অনেক আগে থেকেই বঙ্গসমাজে চালু ছিল এবং পুরাণ সঙ্কলনের কিছু আগেই হয়ত আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে তাই, লৌকিক অনুষ্ঠানের অনেক কিছু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুমোদন লাভ করে। এবং পূর্বে যে সব ব্রতে ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হত



না, এখন অনেক ক্ষেত্রে সেই সব ব্রতেও ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কিন্তু এই ব্রতের বহু অংশই যে আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাইরে থেকে এসে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ব্রতানুষ্ঠান, ও ব্রতকথার মধ্যে পাওয়া যায়। এই সব ব্রতকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন—

ব্রতের শ্রেণী বিভাগ নক্সা—৯

প্রজনন, মাতৃশক্তি উর্বরতাবৃদ্ধি এবং কৃষি বিষয়ক	বাণিজ্য	পিতৃপূজা, সাংসারিক সুখ, ইহ-জীবনের সুখশান্তি	সৌরজগৎ, তিথি নক্ষত্র ও পৃথিবী বিষয়ক	বার ও পিঠা বিষয়ক	হিংস্রপ্রাণী, বৃক্ষবন্দনা, পশু বশ মানানো বিষয়ক
পুণ্যিপুকুর	ভাদুরি	নগছুট	তাবাব্রত	বৃহস্পতিবার	কুলাই ঠাকুর
শিবপূজা	সেঁজুতি	কুলকুলতী	কোঠাকর	লক্ষ্মী ব্রত	কার্তিক
চম্পাচন্দন	সুয়োদুয়ো	জয়মঙ্গল	মাঘমণ্ডল	মঙ্গলবার	গাড়শী
পৃথিবী	নৌকাপূজা	জন্মাষ্টমী	অমাবস্যা	মঙ্গলচণ্ডীব্রত	করমপূজা
গোকাল	প্রভৃতি	হরিবচরণ	মহানবমী	কুক্কুটি ব্রত	তিলকুমারী
অশ্বত্থবট		মধুসংক্রান্তি	পূর্ণিমা	দূর্বাষ্টমী	সসাপাতা
গুপ্তধন		শ্রীপঞ্চমী	একাদশী	তালনবমী	তুলসী
ধানগোছান		সৌভাগ্য-	চান্দ্রায়ণ	অনন্তচতুর্দশী	বট
তেজোদর্পণ		শয়ন	দধিসংক্রান্তি	তোষলা	পাকুর
থোয়াথুবি		সন্ধ্যামণি	ঘৃতসংক্রান্তি	পৌষপার্বণ	কলাগাছ
রণে-এয়ো		তাবা	দাড়িম্বসংক্রান্তি	ইত্যাদি	সিজ
দশপুতুল		আদর সিংহাসন	অঘোরচতুর্দশী		নল
ক্ষেত্র		ইত্যাদি	নৃসিংহচতুর্দশী		নিম
বসুধারা			নক্ষত্র		ইত্যাদি
ভাদুরি			অখণ্ডদ্বাদশী		
ইতুলক্ষ্মী			ঋতুব্রত		
যমপুকুর			ত্রয়োদশী		
তুষতুষলী			সুখরাত্রি		
তারণ			পাষাণচতুর্দশী		
মাঘমণ্ডল			প্রভৃতি		
ইতুকুমার					
বসন্তরায়, উত্তম ঠাকুর ইত্যাদি					

কার্তিক সংক্রান্তি থেকে আরম্ভ করে সারা অগ্রহায়ণ মাস সন্ধ্যামণি ব্রত হয় অনুষ্ঠিত। রোজ সন্ধ্যায় একঘটি জল নিয়ে ব্রতিনী ঘরের ছাদে বা অনুরূপ স্থানে ওঠে। সেখানে থেকে আকাশের দিক তাকিয়ে থাকবে সে। একটি তারা আকাশে দেখামাত্র জলের গণ্ডী কেটে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে যতক্ষণ না সাতটি তারা আকাশে দেখা যায়। সাতটি তারা উঠলে সেই গণ্ডীর মধ্যে সিঁদুর দিয়ে দুটি পুতুল এঁকে সাতটি সন্ধ্যামণি ফুল ও দূর্বাসহ পুতুলের পূজা করার সময় বলতে হয়—'সন্ধ্যামণি-কনকতারা, সন্ধ্যামণি জলেরঝারা। এই ব্রত যে নারী করে, সাতভাইর বোন বলি তারে। সন্ধ্যামণি যাচে বর, সুখশান্তি আর কৈলাসে ঘর। ধনধান্য সুখও নাতিপুতে, জনম যায় যেন চির আনন্দেতে'।

অষ্টলোকপালব্রতে কাঁঠাল পাতায় করে অষ্টদূর্বা ও তণ্ডুল উপহার দিতে হয় সূর্যকে। চাকরিব্রতে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি দাঁড়িয়ে থেকে সূর্যের আরাধনা করতে হয়। কেউ কেউ নির্দিষ্ট বৃত্তরেখার মধ্যে দাঁড়িয়ে সূর্যের গতি অনুসারে দিক পরিবর্তন করেন। নির্দিষ্ট কোঠের মধ্যে আচরণ বিধি প্রতিপালিত হওয়ার দরুণ এ ব্রতের নাম কোঠচাকরীব্রত। সূর্যের পুত্র জীমূতবাহনকে অবলম্বন করে হয় জীতাষ্টমী ব্রত। এ ব্রতের আচরণে ব্রতিণীকে উপবাসী থাকতে বলা হয়েছে। একটি ক্ষুদ্র জলাশয় তৈরী করে তার পাশে বটের ডাল, বেলপাতা, হলুদ, কলা ও ধানের চারা পুঁতে দিতে হবে কুমারী মেয়েদের যমপুকুর এবং সধবাদের সুবচনী ব্রতের পুকুরের মত করে। এই ব্রতে পাঁচ প্রকার ফল ও ভিজা কলাই ডালের নৈবেদ্য দরকার। পুকুরের সামনে ঘট বসাতে হবে। সারা-রাত পূজা করতে হবে। ব্রতের পর-দিন প্রাতঃকালে ব্রতিণী স্নান সেরে শশা খান। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এ ব্রত করতে পারেন। কোথাও কোথাও মাটির মূর্তি স্থাপনের প্রথাও আছে। মূর্তি অশ্বারূঢ়। হাতে নানা আয়ুধ। যেমন খড়্গ, ছুরি, ধনুক ও বাণ, অঙ্গদ ও বলয়। মাথায় মুকুট। কোথাও কোথাও শকুনি ও শৃগালের মূর্তি স্থাপন করা হয় আরাধ্য দেবতার মূর্তির পাশে। ব্রত অন্তে স্নানের সময় ওই মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয়। ব্রতকথায় আছে—পুরাকালে দক্ষিণদেশে শালিবাহন নামে এক নরপতি ছিলেন। তাঁর ছেলেপুলে না থাকায় তিনি খুবই মনকষ্টে দিন কাটাতেন। একদিন স্বপ্নে দেখলেন কে যেন তাঁকে জীতাষ্টমী ব্রত করতে নির্দেশ দিলেন। সকালে নৃপতি রাণীকে স্বপ্নের কথা বললেন। তা শুনে রাণী যথাকালে বা আশ্বিনমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে জীমূতবাহনের পূজা করলেন। এক বছরের মধ্যে তাঁর এক ছেলে, পরে এক মেয়ের জন্ম হয়। ছেলের নাম রাখলেন জীমূতবাহন। মেয়ের নাম সুশীলা। ছেলেমেয়ে নিয়ে মনের সুখে বহু দিন তিনি রাজত্ব করেন তাঁরা। যথাসময়ে ছেলেমেয়ের বিয়ে হয়, কিন্তু ছেলের বউর যত ছেলেমেয়ে হয়, অল্প বড় হতে না হতেই তারা সব মারা যায়।

শাশুড়ী উঠোনে পুকুর কেটে জীতাষ্টমী ব্রত করতেন তা দেখে বউমা টিটকারী দিতেন আর সমানে ঠাট্টা করতেন, সেই পাপেই বউর এই দশা। একবছর আশ্বিন মাসে শাশুড়ী পূজা করছেন দেখে বউ বলে উঠল—মা এখনও কি আপনার ছেলে-খেলা গেল না? শাশুড়ী বললেন—এসো বৌমা, তুমিও এ ব্রত করো, একবার করেই দেখ না, দেখবে তোমার ছেলেপুলে হয়ে আর মরবে না। অবিশ্বাসী বউমা শাশুড়ীর কথায়

হেসেই খুন। তারপর বললে—না মা ওসব ছেলেখেলা আমার দ্বারা হবে না। ওই ভোজবাজীতে আমি বিশ্বাস করি না।

শাশুড়ী তখন তাঁর শ্বশুরের স্বপ্নের কাহিনী শোনালেন বউমাকে। শুনে বউ-এর মনে একটু ভয়ের ভাব উদ্রেক হয়। সে তখন জীতাষ্টমী ব্রত আরম্ভ করে। ব্রত করার পরে তার যে সব সন্তান জন্মাল তারা আর অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হল না। বউ ব্রতানুরাগী হয়ে পড়ে। ব্রতের মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়ে। এই ভাবেই ক্রমেক্রমে নানাবিধ ব্রত বাঙালীর অন্তঃপুরে অনুপ্রবেশ করে। এ ধরণের আরও অনেক ব্রত আছে যা মূলত গুহ্য যাদুশক্তি এবং উর্বরতা বৃদ্ধি বা প্রজনন শক্তির পূজারূপে আদিবাসী গোষ্ঠীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কতকগুলো ব্রত একান্তই আদিম কৌম সমাজের, কতকগুলো আর্যব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির চাপে পরিবর্তিত হয়ে বা পরিমার্জিত রূপে বঙ্গসমাজে প্রবেশ করে।

সৌর-তিথি-নক্ষত্র আশ্রয় করে যে সব ব্রত উৎসব তার মূলে বহিরাগত শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের প্রভাব বিদ্যমান। গুপ্তযুগে (৪র্থ—৭ম) ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রসার হয়। এই সময়ই পৌরাণিক হিন্দুধর্ম তার পাকাপাকি রূপ নেয় এবং আদিম উৎসব অনুষ্ঠানের অনেক কিছু আত্মসাৎ করে। প্রায় প্রত্যেক দিনই কোন না কোন ব্রতের বিধান আছে এই যুগেব আচারানুষ্ঠানে। নর ব্রতের প্রায় সব গ্রাস করে নিয়েছে পুরাণ। নারী ব্রতের মধ্যেও সধবা এবং বিধবা ব্রতকে আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি মণ্ডিত করেছে। কিন্তু পারে নি কুমারী ব্রতকে খুব একটা গ্রাস করতে। যদিও এই ব্রত তার আদিম রূপেই বর্তমান সে কথা বলা হচ্ছে না, কালের গতির সঙ্গে কুমারী ব্রতেও কিছু অদলবদল কিছু পরিবর্তন হয়েছে। তথাপি এ কথা সত্য, কুমারী ব্রতের মৌল চরিত্রে খুব একটা হেরফের লক্ষ্য করা যায় না।

আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম স্বীকৃত ব্রতকে আমরা শাস্ত্রীয় ব্রত বলেছি। এই ব্রতের পরিচয় পুরাণাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই তে আচরণীয় কৃত্য এবং ব্রতকথা একই সঙ্গে সম্পৃক্ত। আচমন, স্বস্তিবাচন, কার্যারম্ভ, সঙ্কল্প, ঘট স্থাপন, পঞ্চগব্যশোধন, শান্তিমন্ত্র, সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি ইত্যাদি সব শাস্ত্রীয় ব্রতে একই ভাবে এগিয়েছে। অশাস্ত্রীয় ব্রত শাস্ত্র স্বীকৃত নয়। স্মরণাতীত কালের আচরণ, নরনারীর সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধির কামনা, প্রকৃতির বৈষম্য থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টা ও আকৃতি দেখতে পাওয়া যায় এই ব্রতে। নারী ব্রতের মধ্যে অবশেষে সধবা ব্রতে ব্রাহ্মণ অনুপ্রবেশ করায় সেই ব্রতের চরিত্রে আদিম ও

ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির একটা সমন্বয় দেখা যায়। এখনকার বিধবা ব্রতের অনেকাংশই বর্তমানে পুরাণ শাসিত বলে মনে করা হয়। তাদের ব্রতের মূল বক্তব্য মুক্তি, পরপারের চিন্তা। আদিম সমাজের পার্থিব চিন্তা নয়। আদিম সমাজ এ পৃথিবীতে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধিতে থাকতে চেয়েছে, পরকালের চিন্তায় চিন্তিত হয় নি। কুমারী ব্রতে আদিম মানব সমাজের এই চরিত্র বিদ্যমান বলেই কুমারী ব্রতকে খাঁটি বলে ধরতে বাধা নেই। এই ব্রত যাদুবিদ্যায় পরিপূর্ণ। ব্রতের উপাদান আহরণের মধ্যে, আলপনা, ছড়া ইত্যাদির মধ্যে, তাদের যে কামনা ব্যক্ত তা থেকেই এ সিদ্ধান্তে আসা যায়। কুমারী ব্রতে পুরোহিতের স্থান নেই, ব্রতিনীরা নিজেরাই পুরোহিত। বাপ-ভাই, স্বামী-পুত্রের মঙ্গল কামনায়, পুত্রবতী হবার বাসনায়, সম্পদশালী, সমৃদ্ধ হবার সরল অনুভূতির কথায় কুমারী ব্রতকথা সমৃদ্ধ। এই ব্রতে আদিম মানুষ ধান ও অন্যান্য শস্য উৎপাদন ও বৃদ্ধি করতে যেসব আচার-আচরণাদি উদযাপন করত তার বহু জিনিস বিদ্যমান। যখন অধিক ধান্য কামনা করে তখন সে একটা সরায় কিছু ধান ও শস্য রাখে, তার সঙ্গে থাকে মাটি, সেখানে জলের ছিটা দেওয়া হয় যাতে বীজ ও অঙ্কুর ওঠে। যখন সে ধান রক্ষা করতে চায়, তখন তুষ ও গোবর দিয়ে নানা আচার প্রতিপালন করে যার দ্বারা পোকা মাকড়ের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। আদিম সমাজের পুরুষদের মত মেয়েরাও শুধু আচরণের মধ্যেই শান্তি পেত না, তাই তারা আচরণের সঙ্গে আমদানী করেছে কথার, রেখার, ছড়ার ও আলপনার। সন্ধ্যামণি, তুষ-তুষলী, ভাদুলী, সেঁজুতি, তারা ব্রত তারই সাক্ষ্য বহন করে। শুধুমাত্র সামাজিক মানুষের কামনা ও তা চরিতার্থ করা ছাড়াও ব্রতের উদ্দেশ্য আছে। একের কামনা দশের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে সে অনুষ্ঠানের রূপ নিয়েছে। একের সঙ্গে অন্য দশ জন কেন মিলেছে, কেন যে একের অনুকরণ দশজনে করছে সেটা বোঝা না গেলে ব্রতের উদ্দেশ্য বোঝান যাবে না।

বেশ বোঝা যায় যে হিন্দুধর্মের জটিল অনুষ্ঠান ও দেবদেবীদের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে তন্ত্র ও পুরাণকে ব্রতের ছাঁচে ফেলে সাজা হয়েছে শাস্ত্রীয় ব্রতে। কিন্তু বৈদিকমন্ত্র এদের মধ্যে থাকলেও বৈদিক ক্রিয়া-গুলোর মধ্যে এগুলোর কলের পুতুল আর জীবন্ত মানুষের মত প্রভেদ বর্তমান। শাস্ত্রীয় ব্রতগুলোর মধ্যে আর্যধর্মের চরম এক নিয়ন্তার নিষ্কাম উপাসনার দর্শন মেলে। সকলে হিন্দুধর্মের মধ্যে, ব্রাহ্মণ্য পুরোহিতদের কবলে আসুক এই বাসনা নিয়ে বহু আদিম ব্রতকে আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম গ্রহণ করেছে। সঙ্গে

সঙ্গে আচার আচরণের খুব একটা তফাৎ করতে না পেরে দেবদেবীদের নাম-ধাম পালটে দিয়েছে। অশাস্ত্রীয় ব্রতকে শাস্ত্রের বেড়াজাল দিয়ে শাস্ত্রীয় করা হয়েছে। শাস্ত্র ও শাস্ত্রকারেরাই এর সাক্ষ্য দিচ্ছেন। যেমন ব্যাসদেব বলেছেন—দেশানুশিষ্টং কুলধর্মমগ্রং সগোত্রধর্মং নহি সংত্যজেচ্চ অর্থাৎ ধর্ম-শাস্ত্র অবিরোধী। দেশ-ব্যবহার্য শাস্ত্র পালনীয়। স্মার্ত রঘুনন্দন শুদ্ধিতত্ত্বে হিন্দু-স্ত্রীলোকদের অনুষ্ঠেয় যে সব কার্যে সম্মতি দিয়েছেন মুনিঋষিরা সে সব কার্যে উৎসাহ ত দিতেনই না বরং বাধা তাঁরা দিয়েছেন।

ব্রতের অনুষ্ঠান কেবল ধর্মানুষ্ঠান নয়। ধর্ম ও শিল্প দুইই এখানে স্বাধীন। তাই কুলাই ঠাকুরের ব্রতে মানুষকে বাঘ সাজান হয়েছে। সেই বাঘ নিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরে ভিক্ষা চাওয়া হয়—'ঠাকুর কুলাই ভোঁ, হাট্যা চল রে। হাট্যা চল পাঁচিল পার। ঝপাৎ গিরি রে। ঝপাৎ গিরি সজাগ হয়। সজাগ হয়্যা না করে রব। সুইন্দরবনে রে। সুইন্দরবনে বাঘের ছাও। হাম্বুর হুম্বুর করে রব। য়্যাক বাঘ রে, ঠাকুর কুলাই ভোঁ।' মানুষকে এই ব্রতে বাঘ হতে হবে। তারপর বাঘরূপী মানুষের জোরে জোরে হাঁটা, ঝপাৎ করে পড়া, সজাগ হয়ে এদিক ওদিক দেখা, হাম্বুর-হুম্বুর রব ইত্যাদির এবং গানের কোরাস ইত্যাদির মধ্যে শিল্প-চেতনা বিদ্যমান। মেয়েদের এই ধরণের শিল্প সচেতনার পরিচয় মেলে আলপনায়, ঘর লেপায়, পুতুল তৈরী করার মধ্যে ও এই জাতীয় কাজে। ফুলের মালা গাঁথা, ঘর গোছান, নিজেকে সাজিয়ে রাখার মধ্যে আছে আনন্দ এবং তা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। এদের অতৃপ্তিতে মন দোলে। কামনার আবেগ ও তার চরিতার্থতার মধ্যে আছে নানা কল্পনা। ক্রিয়াকর্ম, ভাব, আবেগ ও রসের প্রকাশ পায় এবম্বিধ কৃত্যে। মনের এই উন্মুখ অথচ উৎক্ষিপ্ত নয় এই অবস্থাই হয় শিল্পের জন্ম। সুন্দর-অসুন্দর বেছে নেবার সুযোগ পায় বাঙলার মেয়ে, বাঙলার ছেলে ব্রত ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে। 'গঙ্গা গুকু গুকু আকাশে ছাই'—বর্ষার জলধারা কল্পনা করে হয় বসুধারা ব্রত। জ্যৈষ্ঠের সারামাস আষাঢ়ের ছবি জাগিয়ে মানুষ প্রতীক্ষা করে। এবং যেমনি জল ধারা হয়ে আসে তখন অর্থাৎ আষাঢ়-শ্রাবণ এই দুই মাসে কুমারী ব্রত নেই। ভাদ্র মাস পড়তেই আবার সুরু হয় তাদের ব্রত। ভাদুলী ব্রতে যার বহিঃপ্রকাশ। এই ব্রতের কামনা—যারা বাণিজ্যে গেছে তারা ফিরবে—অনেকদিন পর্যন্ত এই কামনা স্থায়ী। মনের আবেগ নানা কল্পনায় ভরে ওঠে। ব্রতের আলপনায় তার প্রকাশ পায়। পথ, লতাপাতা, গাছ, ফুল, নদনদী, পল্লীজীবন, পশুপাখী, মাছ, জীবজন্তু, বায়ু, সূর্য, গ্রহ,নক্ষত্র,আভরণ,আসবাব, পিঁড়ি সবই আলপনার রেখায়

ধরা পরে। ধরা পড়ে পুকুর কাটা, ধান গোছানো, রান্নাবান্না করা প্রভৃতি গৃহস্থালীর কাজকর্ম, বিবাহের আচার ইত্যাদি কর্মকাণ্ড আলপনার রেখায়।

ব্রত সাধারণ মানুষের সম্পত্তি। কোন ধর্মবিশেষ বা দলের মধ্যে তাকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হৃদয় ও পারিপার্শ্বিকতার যে পরিবর্তন ঘটে তা ঠেকাবার ইচ্ছা ও প্রক্রিয়া থেকে ব্রত ক্রিয়ার উৎপত্তি। বিচিত্র অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মানুষ বিচিত্র কামনা সফল করে তুলতে চায় এই হচ্ছে ব্রতের চরিত্র। এই ব্রত নিশ্চয়ই পুরাণ বা বেদের সমসাময়িক অথবা তারও পূর্বেকার মানুষদের অনুষ্ঠান। আর্যীকরণের সময় প্রয়োজনানুসারে আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি কিছু কিছু পুরাতন ব্রতকে তাদের সংস্কৃতিতে স্থান দিয়েছে। এবং তা দিতে গিয়ে অনেক স্থলেই তাদের সমন্বয়ের কথা ভাবতে হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে পুরাণ ও তন্ত্রকে পর্যন্ত অস্বীকার করেছে প্রাকৃতজন। তারই ফলে গুপ্তযুগের নয়া ব্রাহ্মণ্য শাসনের যুগে অনেক আদিম ব্রত, ব্রতের দেবদেবীকেও গ্রহণ করতে হয়েছে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে। এবং এই গ্রহণ করতে গিয়ে দিয়ে-আর-নিয়ে মিলাতে হয়েছে আর্য-অন্‌-আর্য ধর্মকর্মের অনেক কিছু যা ব্রতাচরণ ও ব্রতকথার মধ্যে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে। হিন্দুধর্মের ঔদার্য এবং সমন্বয়ের বিস্তৃতি সত্ত্বেও বাঙলার যে সব ব্রত এখনও আদিম চরিত্র নিয়ে বেঁচে রয়েছে তাতেই বাঙালীর স্বাতন্ত্র্য ঘোষিত। সেই স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান কুমারীব্রতে এখনও মিলতে পারে।

আমাদের ব্রত ভূপ্রকৃতি, জীবজন্তু, বৃক্ষলতাপাতা, ফলমূল ও ঋতুবৈচিত্র্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তা আদিম মানুষের সেই প্রাচীন চিন্তা থেকে খুব একটা অগ্রসর হতে পারে নি। আদিম মানুষের ইন্দ্রজাল, উর্বরতা বৃদ্ধিজনিত চিন্তা ইত্যাদির মধ্যে যে প্রক্রিয়া বিদ্যমান ছিল বাঙালীর ব্রতে বিশেষ করে কুমারী ব্রতে তা অত্যন্ত স্পষ্ট। এই ব্রত অধ্যয়নের মধ্যে ধর্মীয় উত্থান পতনের চিহ্নও প্রতীয়মান। বহু যাদুক্রীড়া ও ইন্দ্রজাল অদ্যাবধি আদিম সমাজে জীবন পরিচালনা করে চলেছে। এইসব ইন্দ্রজালে গাছগাছড়া, শিকড়-বাকড়দের বিশেষ ভূমিকা আছে। গাছগাছড়া আমাদের বহু আচার-অনুষ্ঠানের উপাদানে, এমন কি দুর্গামণ্ডপের নবপত্রিকা বা কলাবউর উপস্থিতি সেই আদিম সমাজের বৃক্ষবন্দনার সঙ্গে একটা আপোষরফা ছাড়া আর কিছুই যে নয় তা নতুন করে বলার দাবী রাখে না। বনদুর্গাপূজা, অলক্ষ্মীপূজা, শনির পূজা, সমস্তই আদিম সমাজের দান। বৃক্ষপূজা, ধ্বজপূজা, নদনদী, শিলা-পাথর পূজা প্রভৃতি আদিম মানুষের কাছ থেকেই নেওয়া। ব্রতের উপকরণে যে

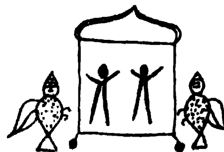
সব উপাদান, উর্বরতা বৃদ্ধির যে সব প্রক্রিয়া, যাদুক্রীড়া ও ইন্দ্রজালের সাহায্যে প্রকৃতিকে বশ করার চেষ্টা এখনও চলছে তা আদিম কৃষিজীবী সমাজের কর্মকাণ্ড ছাড়া কিছুই নয়। নীচের নকশাটিতে এই বক্তব্য আরও স্পষ্ট হবে :

ব্রতের উদ্দেশ্য বর্ণিত নক্সা নং—১০

ক্রমিক নং	ব্রতের নাম	সময়	অনুষ্ঠানকাল	ব্রতের উদ্দেশ্য
১.	পুণ্যিপুকুরব্রত	চৈত্রসংক্রান্তি এবং বৈশাখ সংক্রান্তি	৪ বৎসর	বৃষ্টির জন্য ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান
২.	শিবপূজাব্রত	,,	,,	উর্বরতাবৃদ্ধি ও প্রজননশক্তি বৃদ্ধির আদিম যাদু বিশ্বাসের অনুষ্ঠান
৩.	পৃথিবীপূজাব্রত	,,	,,	আদিম সমাজের ধরিত্রী পূজার অবশেষ
৪.	গোকালব্রত	,,	,,	গবাদি পশু রক্ষাকল্পে আদিম সমাজের ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানের অবশেষ
৫.	হরিরচরণব্রত	,,	,,	ব্রাহ্মণ শাসিত শাস্ত্রীয়ব্রত দেবানুগ্রহের কামনা আদিম সমাজের অনুকরণে
৬.	অশ্বত্থ নারায়ণ বা পাতা ব্রত	,,	,,	আদিম সমাজের বৃক্ষপূজা জনিত আচরণ
৭.	অলক্ষ্মীপূজা	কার্তিক-অমাবস্যা	প্রতি বৎসর	লক্ষ্মীপূজার বিকৃতরূপ, অনার্য সংস্কৃতির ভগ্নাবশেষ
৮.	গো-ক্ষুরব্রত	পৌষ শুক্লাতৃতীয়া অথবা অন্য দিন	প্রতি বৎসর	মাতৃজ্ঞানে গাভীপূজা, পশুকে শ্রদ্ধা জানাবার প্রক্রিয়া
৯.	বনদুর্গারপূজা	মাঘ মাসের ১লা থেকে মাঘসংক্রান্তি	প্রতি বৎসর	খোস-পাঁচড়ারোগ বিনাশের জন্য আদিম যাদুক্রিয়ার ভগ্নাবশেষ
১০.	ভাইফোঁটাব্রত	কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া	প্রতি বৎসর	ভাই-বোনের আদিম মিলন উৎসব
১১.	পাঁচড়াপূজা	ফাল্গুন সংক্রান্তি চৈত্র সংক্রান্তি	প্রতি বৎসর	খোঁস-পাঁচড়ারোগ বিনাশের আদিম সমাজের জন্য যাদু প্রক্রিয়া
১২.	মধুসংক্রান্তিব্রত	চৈত্রসংক্রান্তি বৈশাখসংক্রান্তি	৪ বৎসর	ব্রাহ্মণ্য ব্রত, ব্রাহ্মণদের দানধ্যানের নিমিত্তে উদ্ভাবিত আদিম চিন্তার ফসল
১৩.	গুপ্তধনব্রত	,,	,,	আদিমসমাজের ধন, পুত্র ইত্যাদি কামনার অনুকরণে ব্রাহ্মণ্য আচরণ
১৪.	ধনগোছানব্রত	,,	,,	আদিম সমাজের ধন ও ধান্যের উৎসবের পরিবর্তে ব্রাহ্মণ্য আচরণ
১৫.	ষাচাধনব্রত বা পান সাজানব্রত	,,	,,	ব্রাহ্মণদের পান দান। আদিম সমাজের যাদু প্রক্রিয়ার অনুসরণে ব্রাহ্মণ্য অনুষ্ঠান

চলছে

ক্রমিক নং	ব্রতের নাম	সময়	অনুষ্ঠানকাল	ব্রতের উদ্দেশ্য
১৬.	তেজোদর্পণব্রত	চৈত্র-সংক্রান্তি বৈশাখ-সংক্রান্তি	৪ বৎসর	ব্রাহ্মণদের তেজপাতা দান। আদিম সমাজের যাদু প্রক্রিয়ার ব্রাহ্মণ্য রূপ
১৭.	ধোয়াধুয়িব্রত	,,		যাদু প্রক্রিয়া
১৮.	সাবিত্রীব্রত	জ্যৈষ্ঠ শুক্লা চতুর্দশী	১৪ বৎসর	সৌভাগ্য কামনায় আদিম চিন্তার ফলশ্রুতি
১৯.	তালনবমীব্রত	ভাদ্র শুক্লানবমী	৯ বৎসর	সৌভাগ্য কামনায় আদিম চিন্তারফলশ্রুতি
২০.	মাঘমণ্ডলব্রত	মাঘমাসের ১লা থেকে সংক্রান্তি		উর্বরতা বৃদ্ধিকল্পে যাদুপ্রক্রিয়া এবং বিবাহের জন্য সৌর পূজা
২১.	তারাব্রত	চৈত্র সংক্রান্তি বৈশাখ সংক্রান্তি		সৌরজগৎ বন্দনায় আদিম অনুষ্ঠান
২২.	কুলকুলতীব্রত	কার্তিক মাসের প্রথম ও শেষ দিন	প্রতি বৎসর	পিতৃগণের উদ্দেশ্যে আলো এবং জল ও খাদ্যদানের আদিম প্রক্রিয়া
২৩.	যমপুকুর	কার্তিক মাসের প্রথম ও শেষ দিন	প্রতি বৎসর	আদিম সমাজের যাদু প্রক্রিয়া
২৪.	জয়মঙ্গলব্রত	জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম ও শেষ দিন	প্রতি বৎসর	পিতৃগণকে শ্রদ্ধা ও উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধির জন্য আদিম সমাজের ধরিত্রী পূজা
২৫.	সেঁজুতিব্রত	কার্তিক সংক্রান্তি সারা অগ্রহায়ণ মাস	৪ বৎসব	বাণিজ্যব্রত আদিম চিন্তার ফসল
২৬.	নখা	ফাল্গুন সংক্রান্তি সারা চৈত্র মাস	৪ বৎসর	রূপচর্চারব্রত আদিম চিন্তার ফসল
২৭.	দশপুতুলব্রত	চৈত্র সংক্রান্তি সারা বৈশাখ মাস	৪ বৎসর	প্রজনন শক্তিবৃদ্ধির জন্য যাদু প্রক্রিয়া
২৮.	অরণ্যষষ্ঠীব্রত	শুক্লা জ্যৈষ্ঠ	প্রতি বৎসর	উর্বরতা এবং প্রজনন শক্তিবৃদ্ধির আদিম আচরণ
২৯.	অক্ষয়তৃতীয়া	বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া	প্রতি বৎসর	ব্রাহ্মণ্যব্রত আদিম চিন্তার ফসল
৩০.	জীতাষ্টমীব্রত	আশ্বিন শুক্লাষ্টমী	প্রতি বৎসর	প্রজননশক্তিবৃদ্ধির প্রচেষ্টা



তালিকা আরও দীর্ঘ করার প্রয়োজন নেই। বাংলার পুরনারীদের এই অনুষ্ঠানের মারফৎ সামাজিক খবরাখবর ছাড়া তাদের শিল্প ও কাব্য-প্রতিভার পরিচয় মেলে। কুমারী ব্রত অনুষ্ঠান করে সাধারণত পাঁচ থেকে আট বছরের মেয়েরা। অত অল্প বয়সে এমন জীবনবোধ, সচেতনা ও পরিণত চিন্তা আছে বলেই মাতৃরূপে তারা পরবর্তীকালে জীবন-তরীর হাল ধরতে পারে।

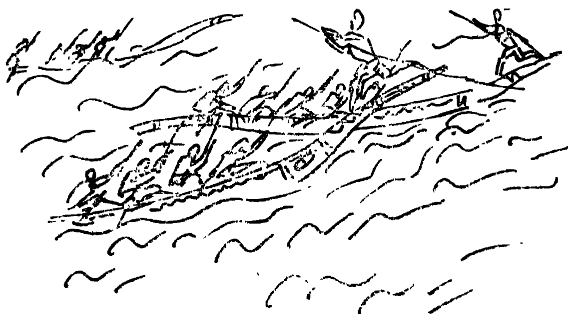
॥ ৭ ॥

নদীর স্রোতের সঙ্গে মানুষ ছুটে চলেছে সীমাহীন পাথারে। উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ মেঘনা, যমুনার অকূল সায়রে নৌকায় পাল তুলে "আমায় ভাসাইলি রে আমায় ডুবাইলি রে, অকূল দরিয়ায় বুঝি কূল নাই রে" গাইতে গাইতে তীব্র গতিতে ছুটে চলছে মাঝি নৌকা বাইচে অংশ নেবার জন্য। দারুণ উত্তেজনা তার। বাইচের আগে হাটে হাটে খোঁজ নেয় কবে কোথায় নৌকা বাইচ হবে। নির্দিষ্ট দিনে বা'চেলদেরকে নিয়ে আল্লা আল্লা রবে ছুটে চলে পবনকাঠের নৌকা। মাস্তুলের উপরে পত্‌পত্‌ করে ওড়ে নিজ নিজ পতাকা। বা'চেলদের বৈঠার তালে তালে বাজে একতালা টেকারা। সেই তালে তাল দিয়ে মাস্তুলের পাশে খঞ্জরী বাজায় বাদক, বাবরী চুল ঝাঁকিয়ে নেচে গেয়ে যায় সারিদার—"দমদমাদম রসুলপুর করমমতির কাছে, তিন শ ষাট ঘ্যাগ সেই গেরামে আছে। ঘ্যাগের জ্বালা মন্দ না, তিরিং তিরিং তাল বাজে না।" যেতে যেতে যখন মনে পড়ছে তার যুবতী বউর কথা তখন গেয়ে উঠছে—"যুবতী ক্যান বা কর মন ভারী, পাবনা থ্যাহে আন্যা দেব ট্যাহা দামের মটরী।" পথে দেখতে পায় নদীঘাটে গ্রাম্য বধূদের জটলা। ওদেরই কেউ অবাক নেত্রে তাকিয়ে আছে নৌকার দিকে। কেউ কলসী ভরছে। সারিদার তা দেখে গেয়ে উঠছে—"জলে ঢেউ দিয়ো না সখী, জলের মধ্যে কালোরূপ নয়ন ভরে দেখি, জলে ঢেউ দিয়ো না সখি।" ক্লান্ত বা'চেলরা বৈঠা ও দাঁড় টানতে টানতে আরও ক্লান্ত হয়ে পড়লে তাদের উৎসাহিত করতে সারিদার গায়—"ব্যাছাল টান দিও রে জবাই করবো খাসি, বল্লালপুরের হাটে যাইয়া কিনবো দাঁতের মিশি।" উৎসাহিত হয় বা'চেলরা। একটানে চলে আসে নৌকা বাইচের ঘাটিতে। তখন পিছিয়ে থাকা নৌকার প্রতি কটাক্ষ করে সারিদার গায়—"শিয়াল তুই বাঘ চিনিস না, বাঘের হাতে পড়লে পরে কইরা দিমু লৈটানা, শিয়াল তুই বাঘ চিনিস না।" এমনিভাবেই বাইচ সুরু ও শেষ হয়। বিজয়ী নৌকার আনন্দোল্লাসে জলে ঢেউ খেলে। আকাশে বিজলী ছোটে। বিজিত পরাজিত নৌকাকে লক্ষ্য করে তখন গেয়ে ওঠে—"ইন্দুর পর্‍্যাছে ফাটকে, বিলাই ডাক দে। কালভোমরা আমার নাম, শূল বসায়ে খাবো মধু, ছাড়বো না তোরে আইজ কামরাবাম। কালভোমরা আমার নাম।"

বাঙালীর উৎসব ব্রত পার্বণ ইত্যাদি কেন্দ্র করে বাঙলার নদনদীও যেন বিচিত্র উন্মাদনায় মেতে ওঠে। এ রূপ আরও মনোগ্রাহী হয় জলের খেলায়। নৌকা দৌড়ের পাল্লাপাল্লিতে, বাইচে। নদীতীরের এই মনোগ্রাহী নৌকাবাইচ উপভোগ করতে আমাদের যেতে হবে পল্লী বাঙলার আনাচে-কানাচে, বাঙলাদেশ ও উত্তরবঙ্গের নদাতীরে।

রূপসী বাঙলার স্বাবলম্বী, অক্লান্ত পরিশ্রমী, নিরক্ষর, নিরহঙ্কার, সরল, স্বল্পেতুষ্ট, আমোদপ্রিয়, বিশ্বাস-সংস্কার-আচারপ্রিয়, ধর্মভীরু বাঙালী তার কর্মজীবন, বাস্তবজীবনের ঘাতপ্রতিঘাত, আবেদননিবেদনের নিত্যকালের সাধিত সুরে গাইতে পারে—'ও মাঝি বেহুশ হইও না, তুমি চোরার সঙ্গে নৌকা বাইও না। চোরার সঙ্গে নৌকা বাইলে, মাঝি নৌকা ডোবা ছাড়া ভাসে না।' একদিকে যেমন অসৎ প্রকৃতির লোকেদের নিকট থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিচ্ছে, তেমনি অপরদিকে সাবলীল অনাড়ম্বর ভাষায় নিজ নিজ অভিজ্ঞতার সীমার মধ্যে মনের যাবতীয় কথা বর্ণনা করছে। দীর্ঘদিন এ নদী সে নদী ঘুরতে ঘুরতে যখন তার প্রেয়সীর কথা মনে পড়ে তখন সে বলে ওঠে—'চান্দের সমান মুখ করে ঝলমল। সিন্দুর রাঙিয়া ঠোঁটে তেলাকুচা ফল॥ জিনিয়া অপরাজিতা শোভে দুই আঁখি। ভ্রমরা উড়িয়া আসে সেইরূপ দেখি॥ আষাঢ় মাইস্যা বাঁশের কেরুল মাটি ফাইট্যা ওঠে। সেইমত পাওদুখানি গজন্দমে হাটে॥ শ্রাবণ মাসেতে যেন কালমেঘ সাজে। দাগল দীঘল কেশ মাথাতে বিরাজে॥ হীরামতি জ্বলে কন্যা যখন হাসে। সুজাতি বর্ষার জলেতে যেমন পদ্মফুল ভাসে॥ পদ্মের সমান কন্যার যেমন মুখখানি। চক্ষু দুইটি দেখি ভাল নাচয় খঞ্জনী॥' এই কন্যা প্রিয়তমকে পেয়ে বলে ওঠে—'গ্রহণ ছাড়িলে যেমন চান্দের প্রকাশ। কুমারে দেখিয়া কন্যা পাইল আশ্বাস॥ তুমি আমার চন্দ্রসূর্য তুমি নয়নতারা। তুমি আমার মণিমুক্তা তুমি গলার মালা॥ পিরথিমীর সুখ মোর তোমার পায়ের ধুলা।' অভিমানী কন্যা বাপের বাড়ী যেতে চাইলে সে বলে 'বাপের বাড়ী না যাইওরে আমিত একেলা। তুমি যদি ছাড় কন্যা আমি ছাড়িব, পায়ের গুঞ্জরী হইয়া পায়েতে থাকিব।' নৌকায় নৌকায় ঘুরে বেদে-বেদেনী এ ধরণের গান গেয়ে নিজেরা আনন্দ পায়, অপরকে আনন্দ দেয়। নৌকার চরণদারদের এ ধরণের কত গান যে কানে ভেসে আসে তা নৌকায় যারা ঘোরেন নি তাঁরা জানবেন কোত্থেকে? অথচ, বাঙালী আদিমতম কাল থেকে নৌকাচালনায় পারদর্শী। বাঙালী যে সমুদ্রেও বড় বড় নদনদীতে নৌকা

পরিচালনায় দক্ষ ছিল তার অজস্র প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে। সাধারণ মানুষের যাতায়াত, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যুদ্ধ ইত্যাদির জন্যও সুপ্রাচীনকাল থেকে নৌকা ব্যবহৃত হয়ে আসছে এই নদীমাতৃক, খাড়িপ্রধান, বারিবহুল ও বহুলাংশে নিম্নভূমির দেশে। ভেলা, ডিঙ্গা, ডিঙ্গী, ডোঙ্গা—প্রভৃতি অস্ট্রিক শব্দ প্রমাণ করে যে বাঙালী আদিম যুগ থেকেই নৌ-শিল্পে পারদর্শী ছিল। নৌকার ব্যবহার, নৌবন্দর, নৌঘাট, নৌবাণিজ্য, নৌদণ্ডক প্রভৃতির সঙ্গে আদিতমকাল থেকেই বাঙালীর পরিচয় ছিল। নানা ধরণের নৌকা তৈরী হত বাঙলায়। দৈর্ঘ্য হিসাবে নাম রাখা হত নৌকার—বিশহাথী, বাইশা পঁচিশা, আঠাইশা প্রভৃতি। গলুয়ের বিভিন্ন জন্তুর মুখ খোদাই অনুযায়ী নৌকার নাম হত—সিংহমুখী, ব্যাঘ্রমুখী, ঘোড়ামুখী, হংসমুখী ময়ূরকণ্ঠী, নাগফণী, শঙ্খচূড় ইত্যাদি। যুদ্ধের জন্য তৈরী নৌকার নাম রাখা হত—দুর্গাবর, রণজয়, নরভীমা ইত্যাদি। বিলাসতরণীর নাম ছিল—চন্দ্রপান, হীরামুখী, চন্দ্রকলা, নাটশালা ইত্যাদি। সদাগরী নৌকার নাম—মধুকর, সমুদ্রগামী নৌকা—বুহিত, গগনবেত্তা পবনবেত্তা, ইত্যাদি। খেয়া নৌকার নাম—পারাপার, ডিঙ্গি প্রভৃতি। বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন নৌকার বিভিন্ন নাম বাঙালী জীবনের ঘনিষ্ঠ আত্মিকযোগের কথা ধরা পড়েছে নৌকার সঙ্গে। রূপকচ্ছলে নৌকা, নৌকার হাল, গুণ, কেরুয়াল, পাল, খুঁটি,



কাছি, সেঁউতি প্রভৃতির ব্যবহার আছে চর্যাগীতিতে। শুধু পুরুষ নয় মেয়েরাও এই শিল্পে পারদর্শী ছিল। ডোম মেয়েরা যে পাটনীর কাজও করত তা জানা যায় চর্যাগীতির একটি গীতে—'গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাই। তাহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গি পোইআ লীলে পার করেই॥ বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা। সদগুরু পঅিপত্র জাইব পুনু জিন উরা॥'

অর্থাৎ গঙ্গা-যমুনায় নৌকা বয়ে যাচ্ছে, মাতঙ্গকন্যা ডোম্বী তাতে জলে ডুবে ডুবে লীলায় (নৌকার নাম) পার করছে। জোড়ে জোড়ে নৌকা চালাও, পথেই দেরী হয়ে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি করো, সদগুরু দর্শনে জিনপুর যাব।

নদনদী খালবিলের বাঙলায় নৌকা ও নদীকে কেন্দ্র করে অধ্যাত্ম জীবনের রূপকও গড়ে উঠেছে। যেমন—'ভবনই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী। দুআন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী॥' অর্থাৎ, ভবনদী গভীর, গম্ভীর বেগে বেয়ে চলে; দুই তীরে কাদা, মাঝে ঠাঁই নেই।

এ ছবি রূপসী বাঙলার নদনদীর। দুই তীরে কাদা, জলে গভীর গম্ভীর বেগ। নৌসাধনোদ্যত বাঙালীকে জয় করতে কালিদাসের কাব্যের রঘুকেও বেগ পেতে হয়েছিল। সম্ভবত নৌবাহিনীর অভাবেই সুহ্মেরা এবং কামরূপের রাজা সহজে রঘুর বশ্যতা স্বীকার করেছিল।

পাল-সেন রাজাদের চতুরঙ্গ বলের প্রধান অঙ্গ ছিল নৌবাহিনী। পালবংশের তৃতীয় বিগ্রহপালদেব, রামপালদেব এবং কুমারপালদেবের মন্ত্রী ছিলেন যথাক্রমে যোগদেব, তৎপুত্র বোধিদেব ও তৎপুত্র বৈদ্যদেব। বৈদ্যদেব সেনাপতি ও একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন। দক্ষিণবঙ্গে একটি নৌযুদ্ধে ইনি বিরাট সাফল্য লাভ করেছিলেন। নিম্নের শ্লোকে সেকালের নৌযুদ্ধের বর্ণনা মেলে—

যস্যানুত্তরবঙ্গসঙ্গরজয়ে নৌবাট হীহীরব-
ত্রস্তৈর্দিক্করিভিশ্চ যন্ন চলিতং চেন্নাস্তি তদ্‌গম্যভূঃ।
কিঞ্চোৎপাতুককেনিপাতপতনপ্রোৎসর্পিতৈঃ শীকরৈ-
রাকাশে স্থিরতাকৃতা যদি ভবেৎ স্যান্নিস্কলঙ্কঃশশী॥

অর্থাৎ যাঁর দক্ষিণবঙ্গ সংগ্রামজয়ে নৌবাহিনীর হীহীরবে ত্রস্ত হয়ে দিগ্‌-গজেরা যে পলায়ন করে নি, তার একমাত্র কারণ তাদের যাবার স্থান ছিল না, উপরন্তু, দাঁড়গুলির উৎক্ষেপে উৎক্ষিপ্ত জলকণা যদি আকাশে স্থিরতা পেত—তবে শশীর কলঙ্ক মুছে যেত। ডঃ সুকুমার সেন কবি মনোরথের বৈদ্যদেবের কামরূপবিজয় অনুশাসনের অনুবাদ এ ভাবেই করেছেন। প্রাচীন বাঙলার নৌকাবিলাসের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের অনূদিত শান্তিপাদের গীতও স্মরণ করি—

কুলে কুলে মা হোইরে মূঢ়া উজুবাট সংসারা।
বাল ভিণ এ কুবাকু ণ ভুলহ রাজপথ কন্ধারা॥
মাআ মোহ সমুদারে অন্ত ন বুঝসি থাহা।
আগে নাব ন ভেলা দীসই ভন্তি ন পুচ্ছসি নাহা॥

সুনাপান্তর উহ ন দীসই ভান্তি ন বাসসি জান্তে।
এস অট মহাসিদ্ধি সিঝই উজুবাট জাঅন্তে ॥
বামদাহিণ দো বাটা চ্ছাড়ী শান্তি বুলথেউ সংকেলিউ।
ঘাট ণ গুমা খড়তড়ি ণ হোই আখি বুঝিঅ বাট জাইউ ॥

অর্থাৎ, হে মূঢ়, কূলে কূলে ঘুরিয়া ফিরিও না; সংসারের (মাঝখানে রহিয়াছে) সহজপথ। সম্মুখে পড়িয়া আছে যে সমুদ্র, তাহার অন্ত যদি না বুঝা যায়, থই যদি না পাওয়া যায়, সম্মুখে যদি কোন নৌকা বা ভেলা দেখা না যায়, তবে অভিজ্ঞ পথিক যাঁহারা তাঁহাদের নিকট হইতে পথের দিশা জানিয়া লও। শূন্য প্রান্তরে যদি পথের ঠিকানা না মেলে, তবু ভ্রান্তির পথে আগাইয়া যাওয়া উচিত নয়। সোজা সহজ পথ ধরিয়া গেলেই মিলিবে অষ্টমহাসিদ্ধি। খেলা করিতে করিতে বাম ও দক্ষিণ পথ ছাড়িয়া (মাঝ পথে) চলিতে হইবে। এই সহজ পথে ঘাট-ঝোপ কিছু নাই; বাধা, বিঘ্ন কিছু নাই; চোখ তুলিয়া এই পথে চলা যায়। নদীকে নিয়ে বাঙলার যে অধ্যাত্ম জীবন সে অধ্যাত্ম-জীবনের রূপ রূপকের আরেক চিত্র আমরা পাই বাঙলার ব্রতকথা ও ব্রতানুষ্ঠানে। বাঙলার ছোট ছোট মেয়েদের ব্রতে তাদের সমুদ্র-প্রবাসী স্বজনগণের বিদেশে নিরাপদে যাত্রার জন্য তারা প্রার্থনা করে। ভাদুলী প্রভৃতি ব্রতে প্রার্থনা জানায়—ঝড়-বৃষ্টি, হিংস্রপশু প্রভৃতির আক্রমণ প্রতিহত করে যেন সকলে নিরাপদে বাড়ী ফিরে আসতে পারে। প্রাকৃতিক নদনদী, জীবজন্তু, হাওয়াঢেউ প্রভৃতি এই ছোট ছোট মেয়েদের দেবতা। এই দেবতাদের কৃপা না হলে পথেপ্রবাসে প্রাণপ্রিয় স্বজনগণের অনিষ্ট হতে পারে, এই ভাবনায় ভাবিত হয়ে আলপনায় প্রাকৃতিক দেবতাদের ছবি আঁকে তারা। শত শতবার দেবতার চরণে প্রণাম নিবেদন করে,কামনা বাসনার কথা জানায়। সেঁজুতি, সুয়োদুয়ো ব্রতে, নৌকাপূজা ব্রতে, বংশীদাসের মনসাদেবীর ভাসানে, বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে, বিভিন্ন চণ্ডীমঙ্গল ও অন্যান্য স্থানে নানাভাবে সমুদ্র-যাত্রার কথা, পল্লীযাত্রীদের সমুদ্র ও নদনদীতে যাত্রার কথা জানতে পারা যায়।

নৌকার এই জনপ্রিয়তা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে জলের খেলা, নৌকাবাইচ। আকাশে যেমন ঘুড়ি, স্থলে যেমন ছুরি-লাঠি-অসিখেলা, জলে তেমনি বাইচ অদ্ভুত উন্মাদনা সৃষ্টি করে। নৌকাবাইচ কখনও হয় কোন উৎসবকে কেন্দ্র করে আবার কখনও অনুষ্ঠিত হয় শুধুমাত্র খেলার জন্য। আমোদ-স্ফূর্তির জন্য।

আনুষ্ঠানিক নৌকা-বাইচের একটি দিন পয়লা ভাদ্র। বরিশাল প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় সারা শ্রাবণমাস মনসার গান গাওয়ার নিয়ম।

শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন হয় মনসার পূজা। পদ্মাপুরাণের লখিন্দরের পুনর্জীবন দান পর্যন্ত গীত হয়। ছ মাসের মরা লখিন্দর বেঁচে ওঠে। চাঁদের ধনেজনে পূর্ণ চোদ্দ ডিঙ্গার প্রতীক হিসাবে কলার খোলের ছোট ছোট ডিঙ্গা পুকুরে ভাসিয়ে ভাসা অবস্থা থেকে ঘরে নিয়ে আসা হয় মনসাপূজার অঙ্গীয়রূপে। দুপুরে প্রতিমা বিসর্জন। চাঁদ সদাগরের মনসার কৃপালাভ এবং বাণিজ্য ফেরৎ ডিঙ্গাসমূহের ঘাটে আসার কাহিনী স্মরণীয় করে রাখতে অনুষ্ঠিত হয় নৌকা-বাইচ। বাইচ হয়ে যাবার পরদিন থেকে আবার পদ্মাপুরাণ পাঠ হতে থাকে। একটু একটু করে সারা ভাদ্র মাসব্যাপী পাঠ চলে। তারপরই হয় সিজপূজা। ভাদ্র সংক্রান্তির বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষেও অনুষ্ঠিত হয় বাইচ। অবশ্য পশ্চিম-বঙ্গের নানাস্থানে এ দিন হয় ঘুড়ি খেলা। স্থানীয় সমস্ত ছেলে-মেয়ে-জোয়ান-বুড়ো-বুড়ি বাইচ দেখার জন্য সুসজ্জিত হয়ে নদীর ঘাটে এসে জড়ো হয়। এই সময় নদনদী থাকে জলে পরিপূর্ণ। খালবিল ডাঙ্গা হাওর এক হয়ে যায়। বিকেল হতে না হতেই কেউ ছাতা কেউ বস্তা (যাকে ওরা বলে ছালা) ভাঁজ করে ছাতা বানিয়ে ছাতার বদলে ব্যবহার করে, কেউ মানকচুর পাতাকে ছাতা করে, আবার কেউ সুপারীর খোল দিয়ে ছাতা বানিয়ে বা তালপাতার টোকা নিয়ে নদীর দু'ধার জনাকীর্ণ করে তোলে।

নৌকা দৌড়ের নির্দিষ্ট আড়ং-এ দৌড়ের নৌকাগুলো নানারঙে সুসজ্জিত হয়ে এদিক ওদিক থেকে সারিগান গাইতে গাইতে এগিয়ে আসে। দেখতে দেখতে দর্শকভর্তি নৌকাও আড়ং-এর দুই পার্শ্বে লম্বভাবে সমবেত হয়ে কোলাহল ধ্বনিতে দিগদিগন্ত মুখরিত করে তোলে। কোন এক দৌড়ের নৌকার বাহকগণ সারি ধরে—'গৌর যায় রে নবীন সন্ন্যাসে··', অন্যদিকে শুনতে পাওয়া যায়, 'কোন অপরাধে রাজা দশমুণ্ড মইল রে, কোন মুনির শাপে লঙ্কা শূন্য হৈল রে···'। কেউ গাইছে—'রাম কাইন্দ্যা বলছে হায়রে হায়। কিবা দোষে হারা হৈলাম লক্ষ্মণ গুণের ভাই···', অপরে গাইছে—'আজ মনের আনন্দে রে নাগর পাশা খেলাইয়া যা', আবার কানে বাজে—'জল ভরিতে যাইস না লো সই কদমতলা দিয়া, কানাইয়ায়ে পাইত্যাছে ফান পিরীতের লাগিয়া···' সঙ্গে সঙ্গে অন্য নৌকার বাহক গায়—'জলের ছায়ায় কদমতলে শ্যামরূপ নিরখি। জলে ঢেউ দিও না গো সখি···'। জনকোলাহল, সারিগান ও বৈঠার সপাৎ সপাৎ শব্দ একত্রিত হয়ে দর্শকগণের কানে তালা লাগাবার যোগাড় হয়। এই আনন্দ কোলাহলকে উৎসাহিত করতে মাঝে মাঝে একখানা দু'খানা 'জলঘাটুর' নৌকা এসে সে ধ্বনিকে বজ্রনাদে পরিণত করে। বাইচ

হয়ে গেলে দর্শক ও দৌড়ের নৌকা বিচ্ছিন্ন হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে যায়। সকলে নিজ নিজ আলয়ে প্রত্যাবর্তন করে।

শ্রাবণসংক্রান্তি, ভাদ্রসংক্রান্তির বিশ্বকর্মা পূজার দিনের নৌকা-বাইচ ছাড়া দশহরা উৎসব, পৌষ-সংক্রান্তি প্রভৃতি উপলক্ষেও নানা জায়গায় বাইচ খেলা হয়। এই ধরণের অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাইচ খেলাকে আনুষ্ঠানিক বাইচ বলা যেতে পারে। আনুষ্ঠানিক খেলা ছাড়াও আমোদপ্রমোদের জন্য বাইচ-খেলা অনুষ্ঠিত হয়। তা আমোদপ্রমোদের বাইচ।

পোষ সংক্রান্তির বাইচ উপলক্ষে প্রথমে গ্রামের পুরনারীগণ কুলোর উপরে বরণডালা সাজিয়ে তার উপর মঙ্গলঘট বসায়। পরে সেই কুলো ও ঘট মাথায় করে দলে দলে মোড়লের বাসায় এসে হাজির হয়। দলে দলে আসে আর জাঁক জোকার, হুলুধ্বনি, শাঁখ বাজিয়ে মোড়লের ঘরের উঠোনে একে একে কুলো নামিয়ে রাখে সকলে। তারপর তারা গান গায়। গান গাইতে গাইতে দল বেঁধে সকলে এগিয়ে যায় নদীর ঘাটে। বিভিন্ন গাঁয়ের 'দৌড়বাইছা নাও' বা বাইচের নৌকা নানা রঙের পতাকা ওড়াতে ওড়াতে নদীর কিনার ঘেঁষে এসে দাঁড়ায়। সকলে সারিগান গায়। বাইচ সুরু হবার একটু আগে সকলেই ছাড়-ঘাটে চলে আসে। দর্শকবৃন্দ ইতরভদ্র নির্বিশেষে সোৎসাহে স্ব স্ব গ্রামের নৌকার মালিকের নাম ধরে 'সাবাস সাবাস রাম' বা 'সাবাস রহিমআলী' বলে চীৎকার করে থাকে। তাদের উৎসাহ জোগায়।

রহিমআলী তখন গান ধরে। মাল্লারা নৌকার দুই পাশে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে বসে কেউ দাঁড় টানে, কেউ টিকারা, কাঁসর বাজায়। তালে তালে এগিয়ে যায় নৌকা। মোড়লেরা যে যার গাঁয়ের নৌকার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাঝি মাল্লাদের ছড়াকেটে ও নানাভাবে উৎসাহিত করে। "গুরু পথ চেন তবু কেন বেড়াও ঘুরে, হাট করতে এসেছে বান্দা ভবের হাটুরে। ভবের হাটে এসে বান্দা বেচ কেন খাও। আলস্যি করনা বান্দা পীরের নাম লও"। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচপীরের নাম নিয়ে সকলে 'বদর বদর হো' বলে চীৎকার করে ওঠে। এক গাঁয়ের মোড়ল যখন এভাবে তার দলের লোকেদের উৎসাহ দেয় তখন অপর গাঁয়ের মোড়লও বসে থাকে না। সে বলে—'কয় নীলমণি ও মা জননী। সাজাইয়া দাও গোষ্ঠে যাব আমি। যাব গোচারণে রাখাল সনে। বলাই দাদা শিঙে দিচ্ছে ধ্বনি', 'চলো জলদি চলো-হো' বলে দ্বিতীয় দলও এগিয়ে যায়। এগিয়ে যায় একে একে নাগফণী, উদয়গিরি, মহলগিরি, উদয়তারা, শঙ্খচূড়, সিংহমুখী, চন্দ্রপাল, ব্যাঘ্রমুখী, পদ্মমুখী সমূহ নৌকা। ছলাৎ

ছলাৎ শব্দ, পীরবদরের নাম, এক হয়ে যায় শব্দে। এরই মধ্যে গান হয়—"
'এই পাড় ওই পাড়—দুই পাড় ভর্তি। লোকজন গিসগিস করছে সত্যি। হর্ষের ঝরঝর হেথাহোথা বইছে। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে বউ কথা কইছে। কঙ্কন-কিঙ্কিন ঝঙ্কার তুলছে। মন্থর বায়ে নীল অঞ্চল দুলছে। বৈঠায় টান দাও শান দাও অস্ত্রে। ভরবাইচ নৌকায় চোখ চোখ শস্ত্রে। ইজ্জৎ রাখবার এই এক পন্থা। শক্তির চর্চায় কেউ নয় মস্তা। আপনার ইচ্ছায় আপনি লড়বি। বৈরীর উচ্ছেদ বুক দিয়ে করবি। শুধিয়ার ডিঙ্গি জয়ী আজ বাইচে। হুলু দিয়ে জাঁক দিয়ে বিজয়ীরা নাচে। মঙ্গল ঘট কুলো মাথায় নিয়ে তারা। ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে ঘুরে পাড়া পাড়া। জয় জয় করে সবে শুধিয়া সাহা। কার জিতে এত রব বাহাবা বাহা।'

স্মরণীয়, এই সব খেলা নিয়ে এক গ্রামের সঙ্গে আরেক গ্রামের নানা রেষারেষিও সৃষ্টি হয়। আনুষ্ঠানিক বাইচ ছাড়া মনের আনন্দ বহিঃপ্রকাশেও চমৎকার উন্মাদনাময় খেলা হিসাবে বাইচ বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। আনুষ্ঠানিক বা উৎসবীয় বাইচ খেলার হারজিতের ফলাফল অপেক্ষা আয়োজিত বা প্রতিযোগী বাইচের হারজিতের ফলাফলে অনেক সময় অখেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির প্রকাশ ঘটে। যখন বাইচ খেলার কথা মনে হয় তখনই শিশুবয়সের প্রত্যক্ষীকৃত বরিশাল জেলার বাইচ সম্পর্কিত কিছু সংবাদ স্মৃতিচারণের দ্বারা উপহার দিতে ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা হয় আবার বাইচ-দর্শকবৃন্দের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে। চলে যেতে ইচ্ছা করে জলের বীর খেলোয়াড়দের মধ্যে যেখানে একে একে ঘটে ছোট বড় ডিঙ্গি ও ছিপ বা বাচারীর সমাবেশ। এইসব নৌকার কয়েকটি গলুই থেকে আশী নব্বুই হাত লম্বা আর কয়েকটি তদপেক্ষা ছোট। প্রাচীন ছিপনৌকার মত আকৃতি বাইচের নৌকার। নৌকার উপরে কোন আচ্ছাদন থাকে না। মাছধরার ডিঙ্গি নৌকার মত উপরিভাগ সম্পূর্ণ খোলা। সকলে এ নৌকা তৈরী করতে পারে না। একদল নির্দিষ্ট ব্যক্তি যারা প্রধানত এসেছে নমঃশূদ্র ও জেলে সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে তারা ও মুসলমান সমাজের মাল্লারা এ কাজে বিশেষ দক্ষ। নৌশিল্পীদের অনেকে তাদের বিশ্বকর্মার বংশধর বলে মনে করে। যারা তা মনে করে না তারাও শিল্পগুরু বিশ্বকর্মাকে তাদেরও গুরু বলে মনে মনে গ্রহণ করে। নৌশিল্পীদের মধ্যে অনেকে মাঝি-মাল্লার কাজও করে। আবার কেউ কেউ শুধুমাত্র নৌকাই তৈরী করে স্থলে বসে, জলের খেলা বা কাজে উৎসাহ বোধ করে না।

বাইচ-খেলায় এক সঙ্গে এক এক নৌকায় কুড়ি পঁচিশ থেকে চল্লিশ

পঁয়তাল্লিশজন লোক থাকতে পারে। সকলের হাতে বৈঠা, খালি গা বা ঘামেভেজা গেঞ্জী গায়ে খেলোয়াড়। গেঞ্জী কিছুক্ষণের মধ্যেই খুলে ফেলতে হয়। খাটো করে কাপড় পরা, শক্ত করে কোমরে বাঁধা কোঁচা ওদের। বেল্টের মত প্রায় সকলেরই মাথায় বা কোমরে বাঁধা গামছা। পেশীবহুল দিব্য জোয়ানদের বীরদর্পের নিদর্শনস্বরূপ নৌকা তীব্র গতিতে ছুটে চলে একে একে ঘোড়দৌড়ের মত রেসে, বাইচে, প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে। রেসে জিততে।

এই রেসে হিন্দু মুসলমান বা অপর সম্প্রদায়ের লোকেদের সমানাধিকার। এ খেলায় জাতের বিচার অপেক্ষা কৃতী মাল্লার খোঁজ করা হয় বেশী করে। খেলার নিয়মে রেফারী চাই, দর্শক চাই, খেলোয়াড় চাই। রেফারী ও দর্শক থাকে স্থলে এবং খেলোয়াড়বৃন্দ জলের কুমীর, হাঙ্গর, সর্পাদির সঙ্গে খেলা করে চলে প্রতিযোগিতায় জিততে।

প্রতিযোগিতার রেশস্বরূপ কখনও কখনও খুনোখুনী হয়ে যায়। খেলোয়াড়ী মনোভাব তখন মারপিটে পরিণত হয়। অবশ্য সর্বদাই এরূপ হয় এমন নয়। সাধারণতঃ কোন প্রতিযোগীর যদি মনে হয় যে প্রতিপক্ষ অন্যায়ভাবে প্রতিযোগিতায় জয়ী হচ্ছে তখন পরাজিত পক্ষ প্রতিবাদ জানায়। এ প্রতিবাদে ফললাভ হলে পরিণতি বিষময় হয়ে ওঠে না। কিন্তু প্রতিপক্ষ যদি অন্যায়কে অন্যায় বলে না মানে, তখন সুরু হয় রেষারেষি, সংঘর্ষ, হাঙ্গামা ও গণ্ডগোল। এই গণ্ডগোলের রেশ ধরে দীর্ঘ দিন আগে মারা গেছে মানিক মিঞা, মারা গেছে কাসেম শেখ আর সারদাচরণ ও শশ্ইয়া। অবশ্য এ মৃত্যুর জন্য নৌকাবাইচ সর্বতোভাবে দায়ী নয়। রেষারেষি সুরু হয় নৌকাবাইচকে কেন্দ্র করে, তার পরিণতি গ্রাম্য দাঙ্গা ও দলাদলিতে। ফললাভ চার ব্যক্তির ধরাধাম ত্যাগ। এ ঘটনার পরে দু' বছর বন্ধ ছিল নৌকাবাইচ বরিশালের ঝালকাঠিতে। তারপরে জোয়ানেরা ঠিক করে এ ধরণের অপ্রীতিকর ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেওয়া হবে না। রেষারেষি বন্ধ করতে তখন কমিটি বসে, মিটিং হয়। তারপর থেকে নৌকাবাইচের প্রতিযোগিতা আবার সুরু হয়। সেই সুরু থেকে খেলা অনেকবার হয়েছে কিন্তু উনিশ শ পঞ্চাশ্ সনের পরে সেখানকার বাইচের কি অবস্থা তা জানি না। তবে আশা করা যায় যে নৌকাবাইচ এখনও বন্ধ হয় নি। সমান উৎসাহ, উদ্দীপনা ও শৈলী নিয়ে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে বরিশালে, ফরিদপুরে, ময়মনসিংহে, পাবনায়, বগুড়ায়, চাঁদপুরে ও অন্যত্র। যেখানেই

জলাশয় আছে বাইচ খেলার মত মানসিক অবস্থা সেখানেই দৃষ্ট হয়। আনুষ্ঠানিক নৌকা বাইচের প্রধান খরচা বহন করেন গ্রামের জমিদার বা মোড়লশ্রেণীর লোকেরা। কিছু চাঁদাও তোলা হয়। কিন্তু চাঁদার জন্য পীড়াপীড়ি করা হয় না। বাইচ অনুষ্ঠানের তিন চার দিন আগে থেকেই নৌকা সাজান হয় বাইচে অংশ গ্রহণ করতে। নৌকার গলুই বা সম্মুখে-পিছনে সিঁদুর দিয়ে নৌকার গলুই বা গলায় মালা পরিয়ে দেওয়া হয়। লীডার বা মাতব্বর ব্যক্তি ছাড়া সকলের হাতে বৈঠা। বৈষ্ণব গোঁসাঞি বা ঠাকুরের মত পরা নতুন কাপড় ও গলায় মালা নিয়ে এই মাতব্বর নেচে নেচে গান গায়, মাল্লা সকলে সে গানের ধূয়া ধরে। এরই মধ্যে শোনা যায় প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দেবার জন্য বৈঠার সপাসপ শব্দ, জলের ছলছলানি। একখানি নৌকা আর একখানি নৌকাকে অতিক্রম করে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ওঠে চীৎকার, পিছিয়ে যাওয়া নৌকা আবার যখন অগ্রগামীকে হারিয়ে দিয়ে এগিয়ে যায় তখনও চীৎকার, হল্লোড়। এই চীৎকার ও 'হুল্লোড়ের মধ্যেই গীত হয়—'ও মা জননী কে দিয়াছে রঙ্গো ফুলের মালা, ও মা জননী কে দিয়াছে রঙ্গো ফুলের মালা। হারে···ও···রে আইজ দেখি তোর বদন কালা ও মা জননী কে দিয়াছে রঙ্গো ফুলের মালা। হায় হায় হায় হায়রে হায়, হায়রে, হায়রে ওরে মায়ে দিল চাউল ডাইল বাপে দিল হাড়ি, রসুই কইরা খাইও তুমি হলকা জাইল্যার বাড়ী। ও মা জননী কে দিয়াছে রঙ্গো ফুলের মালা। হারে···ওরে হাল ও চষে হাউলা ভাইরে, হাতে সোনার নড়ি, কোন পথ দিয়া যামু আমি হলকা জাইল্যার বাড়ী, ও মা জননী কে দিয়াছে রঙ্গো ফুলের মালা। হায় হায় হায় হায়রে হায়, হায়রে হারে·· ওরে জাইল্যার মাথায় জাল ও দড়ি, আমার মাথায় ডুরি, ক্যামনে বেচমু মাছ গেরস্তের বাড়ী ও মা জননী কে দিয়াছে রঙ্গো ফুলের মালা। ওরে ও, সাত ভাইয়ার বুইন আমি, নয় মামুর ভাইগ্নী আমি কিন্তু ভাইবউ দিছে গাইল আমারে জালিকা ভাতারি। ও মা জননী কে দিয়াছে রঙ্গো ফুলের মালা। হারে হায় আমার কপাল, সব জাইল্যায় মারে মাছ নালে আর খালে, আমার জাইল্যায় মাছ মারে আড়ইয়ালখাঁর জলে। ও মা জননী কে দিয়াছে রঙ্গো ফুলের মালা। হারে ওরে কাতলা মাছের পাতলা কাটা শিঙিমাছের ঝোল। হেইয়াখিয়াও অনেক ভাল তাজা যুবতীর কোল। মরি হায় হায় হায়।' এইভাবে নানা রঙ্গরসের গানে প্রাণের আকুতি নিবেদিত হয়। দশহরার নৌকা বাইচের গানেরও এই একই সুর। দেবী নিরঞ্জনান্তে উপস্থিত সকলের

গায়ে জল ছিটিয়ে দেবার রীতি। তারপর কোলাকুলি। আলিঙ্গন। সৌহার্দ্য ও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শত্রু মিত্র ভেদাভেদ থাকে না আলিঙ্গনে বা কোলাকুলিতে। একে অপরের নিকটে আসে।

চমৎকার এ মিলনের উৎসবকে স্মরণীয় করে রাখতেও নৌকা বাইচ। দশহরার নৌকা বাইচ, আমরা বলি কোলাকুলির বাইচ। এ বাইচের সুরুতে বদর বদর হেঁইয়ো বলো বদর বদর ইত্যাদি শব্দে একের পর এক নৌকা বাইচে অংশ নিতে ছুটে আসে, চারদিকে দাঁড়িয়ে দর্শকবৃন্দ এ দৃশ্য দেখে। সকলের সঙ্গে আলিঙ্গন করে। খেলোয়াড় প্রথমে করে ভূমিকে নমস্কার, তারপর করে ইষ্টদেবতাকে নমস্কার, তারও পরে নৌকার গলুই ও শরীর ছুঁয়ে নমস্কার করে একের পর এক প্রতিযোগী বাইচের নৌকায় গিয়ে ওঠে। পূর্ব নির্ধারিত রেফারীর ষ্টার্ট দেওয়ার আওয়াজ বা বংশীবাদনের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলে বাইচের সজ্জিত নৌকা একে একে মালা হয়ে। নানাভাবে এই নৌকাকে সাজান হয়, ফুল ও সিঁদুর দিয়ে। বাইচে নামার আগে বারে বারে পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া হয় নৌকায় কোন দোষ বা ত্রুটি আছে কিনা পাক্কা মাল্লা দিয়ে। গান চলে—'কোন বনে লুকালি আইজ ও শ্যাম বন্ধুরে। ওরে তরল্যা বাঁশের বাঁশী হাইল্যা পড়ে আগা॥ রাইত দুপুরের কালে বাঁশী করে রাধা রাধা। ও শ্যাম বন্ধুরে কোন বনে লুকাইলি আইজ॥ বাজাইয়া বুজাইয়া বাঁশী তুইল্যা থুইলাম চালে। কোন চোরা বাজাইল বাঁশী রাইত দুফর্যাকালে॥ ও শ্যাম বন্ধুরে কোন বনে লুকাইল্যা তুমিরে। বাঁশীর সুর শুইন্যা আমার পরাণ রয় না ঘরে॥ ও শ্যাম বন্ধুরে কোন বনে লুকাইল্যা তুমিরে।' এই ভাবে চলে মিলনের আহ্বান। বৈঠার তালে তালে ভাটিয়ালি সুরে কীর্তন গানের সুরে উদাসী মন কোথায় চলে যায়। মন পাগল করা তীব্র বেদনাহত পরিবেশ। সেই সঙ্গে অনুরূপ গানও চলে, যেমন—(ওই) চলে চলে চলে নাও হেইও। হেইও হেইও হেইও। চল্ চল্ চল্ ভড়াল দিয়া চল॥ বদর বদর রবে চল্, হেইও চল্ চল্॥ হো হো দ্যাখ দেহি কেডা যায় আগে। বদর বদর রবে ধইর‍্যা ফ্যাল্ তারে॥ আরে ও চল্ চল্ চল্ বদর বদর রবে চল্। হেই হো হেই হো হেইও হেইও চল্ ওরে চল্ চল্॥

এইরূপ নানা ভাব ও ভঙ্গীতে নৌকা ছুটে চলে। একে অপরকে হারাতে চেষ্টার ত্রুটি করে না। নৌকা বাইচে যারা জয়ী হয় তাদেরকে ধানদুর্বা,

বরণডালা, বাতাসা, নারকেলের নাড়ু বা সন্দেশ, দুধ, ক্ষীর ইত্যাদি দিয়ে আপ্যায়িত করা হয়। দামামা, কাঁসি, খোল ও করতাল সহযোগে সম্ভাষণে গান গাওয়া হয়। এরূপ একটি গানের নমুনা—

"জয় দাওলো রামের মা তোমার গোপাল আইছে ঘরে। ধান্য-দূর্বা, বরণকুলা দাওলো ঐ গলুয়ার কপালে। উলু দাও ও রামের মা, বাজনা বাজা ওরে নাইড়্যা চাইড়্যা গোপালেরে নিতে হব ঘরে। জয় দাওলো রামের মা, তোমার গোপাল আইছে ঘরে। সাত সাগরের পার থিকা সে আনছে বরণডালা। দুধের বাটি ক্ষীরের লাড়ু আনো থালা থালা। (আবার) যেই দেবতার দয়ায় আসে তোমার গোপাল ঘরে। সেই দেবতা পবনঠাকুর পেন্নাম জানাই তাঁরে। জয় দেওলো রামের মা তোমার গোপাল আইছে ঘরে। তোরা উলু দে সকলে, তোরা বাজনা বাজা দলে।"

নৌকাকেও বরণ করা হয়। বরণডালা বিজয়ীদের মাথায়, নৌকার গলুইয়ে ছোঁয়ান হয়। যে জলতরী নিজ গুণে প্রতিযোগী দলকে বিজয়ী করেছে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানান হয়। পবন দেবতার উদ্দেশ্যেও পূজা দেওয়া হয়। চমৎকার এ আনুষ্ঠানিক উৎসবে দোমাল্লাই, আটমাল্লাই, ষোলমাল্লাই, চল্লিশমাল্লাই সব নৌকায় চলে বাইচ দিনে ও রাতে। পূর্ণিমার রাত, নির্মল আকাশ, শান্ত জলরাশি এ ক্রীড়ার পক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে।

ছোট ছোট খাল বিল থেকে কীর্তিনাশা, আড়িয়াল খাঁ, মধুমতী, পদ্মায় চলে এ অনুষ্ঠান। শান্ত পরিবেশের মধ্যে হঠাৎ ঝড় তুফান ওঠে না এমন নয়। কিন্তু এই ঝড় তুফান থেকে আত্মরক্ষা করতে জানে এই সব জলের খেলোয়াড়-বৃন্দ। নদী সম্পূর্ণ তাদের বশে। ঝড় তুফানের মধ্যেও দিব্যি আনন্দে নৌকা বেয়ে এগিয়ে যায় ওরা বৈঠার ত্রপাসপ্‌ শব্দে। প্রকৃতির গর্জনে, বৈঠার ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ও জলের কলকলানীতে উৎফুল্ল দর্শকবৃন্দ আহ্লাদে আটখানা হয়ে নদীর কিনারে কিনারে ভেঙে পড়ে নৌকাবাইচ দেখতে। বরিশালবাসীদের কাছে মহা আমুদেখেলা এই নৌকাবাইচ। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের সর্বত্র অনুষ্ঠিত হয় এ খেলা। পশ্চিমবঙ্গে নৌকাবাইচ এত জনপ্রিয় নয়। কেরলের 'ওনাম' উৎসবের চেয়ে বরিশালের নৌকাবাইচ কোন অংশে কম উন্মাদক নয়।

আনুষ্ঠানিক বাইচ অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক এবং তা বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষেই অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু নিছক খেলার জন্য আয়োজিত বাইচ যে কোন সময় অনুষ্ঠিত হতে পারে। যখন নদী থাকে শান্ত, প্রাণে থাকে শান্তি, চাঁদ যখন জ্যোৎস্না নিয়ে হাসে, সূর্য যখন শীতলতা থেকে মুক্তি দেয়, তখনই বাইচ

প্রতিযোগিতার আয়োজন চলতে থাকে। প্রতিযোগী বাইচ সবসময়ে সেকুলার। আনুষ্ঠানিক বাইচ ধর্মীয় বা কোন ধর্মানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হলেও বাইচখেলায় ধর্মের কোন্দলের স্থান নেই। সর্ব ধর্মের.সমন্বয় এখানে।

ঐতিহ্য বলে যে বরিশালে এ খেলার সুরু হয় সুদূর অতীতে। জেলে, নমঃশূদ্র ও মুসলমান মাঝি-মাল্লারা এ খেলায় বিশেষ পারদর্শী। বর্ণহিন্দু শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থরাও এ খেলায় কম পারদর্শী নন। যাদের সঙ্গে জলের যোগ আছে তারাই অল্পবিস্তর এ খেলায় পারদর্শী।

অনেকে বলেন বাইচখেলা আদিমতম খেলা সমূহের একটি হলেও এ খেলার বর্তমান ঢঙ এসেছে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রাকে কেন্দ্র করে। জনশ্রুতি, জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার সময় রাশি রাশি নৌকা ভাসান হয় নদীতে, যাত্রীদের নৌকায় করে স্নানঘাটে নিয়ে যেতে, খেয়া পারাপার করতে। অনেক নৌকা, সকলেই আগে আগে যেতে চায়। 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান— এর জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। নিজেদের অজান্তেই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে চলে। এই প্রতিযোগিতায় আনন্দ পায় মাল্লারা, মাঝিরা, যাত্রীরা। তারপর থেকেই নৌকাবাইচের সুরু, ক্রমে তা বর্তমান চেহারা নিয়েছে। যদিও



স্নানযাত্রা উপলক্ষে বাইচ বড় একটা অনুষ্ঠিত হয় না। ঐ সময় নৌকা যাত্রী বহনে, খেয়া পারাপারেই সদা ব্যস্ত থাকে।

আরেকটি জনশ্রুতি, জনৈক গাজী নদীর ওপারে বসে এপারের ভক্তকে তাঁর কাছে ডাকছেন। গাজীর আদেশ প্রতিপালন করতে পারছে না ভক্ত, নদীর ভীষণা মূর্তি তাকে নদী পার হতে দিচ্ছে না। তবুও গাজীর আহ্বানে সাড়া

দিয়ে ভক্ত ছোটে, কিন্তু কোন নৌকা নেই। কে তাকে নদীর ওপারে নিয়ে যাবে! অনেক খোঁজ করে একখানা ডিঙ্গি যোগাড় করল ভক্ত, সে নৌকা যতই ওপারের দিকে যেতে চেষ্টা করে ততই স্ফীত হয়ে ওঠে নদী, নৌকা ডুবে যায় যায়। নৌকার দুর্দশা দেখে তার উদ্ধারে একে একে অনেক নৌকা ছুটে এল। ছুটে এল বিপদগ্রস্ত ডিঙ্গির মাঝি, যাত্রী ও নৌকাকে সাহায্য করতে। সকলে গাজীর চরণে প্রণাম করে, গাজীর নাম নিতে নিতে এগিয়ে চলল। নদী ক্রমেই শান্ত হয়ে এল। ভক্ত নদীর ওপারে গিয়ে পৌঁছাল। শান্ত নদীতে নৌকার সারি। মনের প্রশান্তিতে তখন একে অপরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলল। এই পাল্লার নেশা থেকেই নাকি নৌকা রেসের বা বাইচের উৎপত্তি।

বরিশালের সর্বত্র অহরহই নৌকাবাইচ অনুষ্ঠিত হয়। বাইচখেলায় সাধারণতঃ খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি থাকেই, তথাপি অনেক সময় বেদনাদায়ক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, রেষারেষি চলে। এমন কি ফাটকাও চলে—কে জিতবে তা নিয়ে বাজীও ধরা হয়। রেফারীর দোষে বা খেলোয়াড়দের অন্যায় জুলুমের কাছে কোন প্রতিযোগী হেরে গেলে সে মরিয়া হয়ে ওঠে। পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে।

স্মরণীয়, সর্বদা বাইচের সঙ্গে গান গীত হয় না। অনেক বাইচে শুধুমাত্র শ্রমধ্বনিই শ্রুত হয়। শোনা যায়—হেইও হেইও শব্দ, বদর বদর রব। চল্ চল্, ছল্ ছল্ ধ্বনি। বাইচখেলা শেষ হলে বাইচে অংশগ্রহণকারীর আত্মীয় স্বজন বাইচের ঘাটে গিয়ে গান করে। এ গানে জয়ী ও পরাজিত সকলের আত্মীয় স্বজনের সমান অধিকার। কিন্তু বিজয়ী বরণানুষ্ঠানে সাধারণতঃ পরাজিত অংশ গ্রহণ করে না। এবং বিজয়ী-বরণ অনুষ্ঠান বাইচের ঘাটে অনুষ্ঠিত হয় না। অনুষ্ঠিত হয় বিজয়ীদলের মাতব্বর বা লীডার অথবা ওদেরই কারুর বাড়ীতে। অনেক সময় বাইচ অনুষ্ঠানে কিছু সখের লোকও থাকে। নিয়মিত মাঝি বা মাল্লারা তাদের সাহায্য করে। নৌকা নির্বাচন ও মাল্লা নির্বাচনের জন্যই সখের বাবুরা বিজয়ীর সম্মান পায়। আসলে তারা মাতব্বরী করে অর্থের জোরে। মাল্লারা বকশিস ও পুরস্কার পায়। বিজয়ীরা সব মাঝি ও মাল্লাদের নানাভাবে পুরস্কৃত করে। সখের খেলোয়াড়দের নিয়ে মাঝি-মাল্লারা যখন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে যায় তখন সমস্বরে ওরা চীৎকার করে গেয়ে ওঠে—

'আল্লা আল্লা বলিয়া নাও খোলোরে ভাই সগলি। আল্লা বলিয়া নাও খোলো ॥ (ওরে) আল্লা বল, নাও খোলো, শয়তান যাবে দূরে। ওরে যে কল্‌মা পইড়া দেছে মোহাম্মদ রাসূল রে ॥ ভাই সগল। আল্লা আল্লা বলে নাও খোলো

সগলে। (আরে) নাও যখন খুইল্যা দিলাম সবে গ্যালো না। হাসেন হোসেন ডাকন্দ্যা বলে, আমরা যাবো নারে ভাই সগল, আমরা যাব না। আল্লা বলে নাও খোলো ॥...ওরে মশার কামড়ে বউ চললো বাপের বাড়ী। হ্যামোন যে অজাইত্যা মশা চললো সাইরিসারি রে ॥ লালজা তোরে দেইখ্যা মনছুরা পাগল।"

অনেক সময় আবার নিমাইয়ের জন্যও শোক প্রকাশ করা হয় বাইচের গানে। যেমন—

'পেরভাতে গাথুলিয়া কোথায় গেলিরে নিমাইচাঁদ। পেরভাতে গাথুলিয়া কোথায় গেলিরে নিমাইচাঁদ ॥ মন্দিরার খোপ রইল খালি, এই পেরভাতে কোথায় গেলি। সোনার খাট পালঙ্ক রইল খালি, এই পেরভাতে কোথায় গেলি ॥ কোহানত্যা আইল ঠাকুর বইতে দিলাম পিড়া। জলপান কইরতে দিলাম শাইল ধানের চিড়া ॥ পেরভাতে গাথুলিয়া কোথায় গেলিরে নিমাই-চাঁদ। কিবা মন্তোর দিয়া গ্যালো নিমাইচাঁদের কানে ॥ দ্যাখোরে পাড়ার নোকে দেখোরে চাইয়া। নিমাইচাঁদ সন্ন্যাসী চললে জননীরে ছাইড়া ॥ ওরে ও নিমাই—ওরে আগে যদি জানতাম ও তুই যাইবি ছাড়িয়া। (তা হইলে) না খাওয়াইতাম বুকের দুধ রক্ত মাংস দিয়া ॥ (আর) লইতামও না কোলে (হায়) পেরভাতে গাথুলিয়া নিমাই কোথায় গেলিরে। ওরে ও নিমাই বৈরাগী হইও না তুমি, সন্ন্যাসী না হইও। ভিক্ষা কইরা আইন্যা দিব ঘরে বইস্যা খাইও।

প্রসঙ্গতঃ, পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের মধ্যেই বাইচ খেলা সীমাবদ্ধ। তবে পশ্চিম বঙ্গেও মাঝে মাঝে বাইচ খেলার আয়োজন করা হয়। এরূপ আয়োজিত পশ্চিমবঙ্গের বাইচ খেলার একটি বর্ণনা দিয়েছেন 'পল্লী-পাঁচালী'তে শান্তি পাল। বাইচটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল উত্তরপাড়া লাইব্রেরী ঘাটের গঙ্গায়। শুক্লা পূর্ণিমার দুপুরে। বালি, উত্তরপাড়া, আড়িয়াদহ, কোন্নগর, শ্রীরামপুর প্রভৃতি বাইচ-সঙ্ঘের ছেলেরা নানারঙের 'জারসী' পরে স্ব স্ব পানসীতে বসে আছে দর্শকদের ভীড় জমাতে। বাইচ চলছে বেনেটোলা ও চাতরার সঙ্গে—

'মার দিয়া ভাই—মার দিয়া। মার দিয়া ভাই—মার দিয়া। এক নৌকা তফাত করে বেনিয়াটোলা আ-গিয়া, চাতরা দেখো গড় না ঢুকে, গোড়েন দিয়ে ভাগ গিয়া। মার দিয়া ভাই—মার দিয়া।'

বিজয়ী নৌকার মাঝি বুধিয়ার সঙ্গে, বিজিত বাহার আলীর সঙ্গে, হাফিজ মিঞা, কানাইর নৌকায়, রহমৎ আলীর গরুর গাড়ীতে, পরিতোষের মোষের গাড়ীতে, কেরামৎউল্লার জীপে, রত্নেশ্বরের রিকসায়, অন্যবিধ যানে, বা পদচারণায় চলুন গ্রামে। গ্রামের মানুষকে আন্তরিক হয়ে দেখে আসি,

তাঁদের প্রাকৃত মনের, প্রাকৃত স্বভাবের সরলতা ও উত্তাপে তাপিত হই। তাদের নানাপ্রকার লোকক্রীড়া দর্শনে একদিকে আহ্লাদিত হই অপরদিকে ফেলে আসা দিনের স্মৃতিময় অতীতকে মুখর করে তুলি।

দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে প্রতিভাত হয় আমাদের মানস-সংস্কৃতি, আমাদের মনন্-কল্পনা, আমাদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা ও শিল্পকর্ম। আমাদের ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক দৈনন্দিন জীবনের মূল অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়-ভাষাভাষী লোকসমাজের মধ্যে নিহিত। আমাদের আহারবিহার, কর্মকাণ্ড, উৎসব-আমোদ-প্রমোদ, খেলানুষ্ঠান সর্বত্রই আদিম মানুষের চিন্তাভাবনার, জ্ঞানঅভিজ্ঞতার ছাপ। তাই আমাদের রাজা-মহারাজা-সামন্ত-মহাসামন্ত-দের প্রধান বিহারই ছিল শিকার বা মৃগয়া, এবং অরণ্যচারী আদিম সমাজের কাছে শিকার উপজীবিকা ও বিহার দুইই। এই সব আদিম অধিবাসীদের যারা অবশেষে কৃষি প্রভৃতিকে উপজীব্য করল তারাও আদিম অভ্যাসকে জিইয়ে রাখতে নানাবিধ কৃত্রিম উৎসব অনুষ্ঠান প্রতিপালন করে চলল।

দেহ ও মনের দ্বৈতধারায় মানবজীবন প্রবাহিত। উভয়েই কর্মমুখী, ক্লান্তদেহের ক্ষতিপূরণের জন্য যেমন প্রয়োজন খাদ্য, শ্রান্তমনের পরিতৃপ্তির জন্য তেমন প্রয়োজন আমোদপ্রমোদ, ক্রীড়ানুষ্ঠান। এই আমোদ-প্রমোদ-খেলানুষ্ঠানে যোগদানকারী সকলেই শ্রমের অংশীদার, কারুর কায়িক শ্রম খেলোয়াড় বা খেলার অংশীদার হিসাবে। কারুর দর্শক হিসাবে উপস্থিত হেতু শ্রম। উভয়ের শ্রমের উল্লাসে ক্রীড়াঙ্গন মুখরিত না হলে কোন খেলা জমে না।

মানুষ যত বুদ্ধিমান হয়েছে সে তত তাকিয়েছে প্রাকৃতিক জগতের দিকে। মাকড়সার অনুকরণে বয়ন, বাবুই, মৌমাছির অনুকরণে বাসা তৈরী, চিলের অনুকরণে চাহনি, সারমেয়র অনুকরণে অল্পে তুষ্টি ও হালকা নিদ্রা ইত্যাদি চিন্তাশীল ও সার্থক অনুকরণের দৃষ্টান্ত। ব্যাঙ ও হরিণের লাফ, ডলফিন মাছের সাঁতার, হাঁস ও মাছের জলকাটা দেখে দেখে মানুষ দৌড়, লাফ, সাঁতার ইত্যাদিতে মেতেছে। মানুষের খেলা শৃঙ্খলার অধীন। এ খেলা শুধু দেহেরই নয় মনেরও উন্নতি ঘটাবার জন্য প্রয়োজন। দেহ ও মনের উন্নতি ঘটাবার জন্য দৈহিক ক্রীড়ার নিয়মিত সুশৃঙ্খল অনুশীলনের দরকার। এই অনুশীলনে আনুগত্যবোধ, শক্তি, উদ্যম ও সিদ্ধান্ত নিরূপণের ক্ষমতা উৎসাহ পায়। খেলা এমন একটা কাজ যা থেকে কাজ করার কথা মনেই আসে না। যদিও দেহ ও মনকে সে কাজে সক্রিয়-ভাবে ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু সাপখেলা, দারা, পাশা বা কড়িখেলা

অথবা চড়ুইভাতি প্রভৃতি খেলার সঙ্গে ক্রিকেট, ফুটবল, সাঁতার, দৌড়, হকি প্রভৃতি খেলার চরিত্রগত পার্থক্য আছে। খেলার দ্বারা দেহগঠন সুন্দর হয়। খেলার গতিভঙ্গির মধ্য দিয়ে এই সৌন্দর্য প্রদর্শন করা হয়। মস্তিষ্কের চর্চায়ও আছে খেলার স্থান। আধুনিক খেলার চাহিদা নাকি এসেছে প্রধানতঃ শিল্পবিপ্লবের চাহিদা থেকে। হাতে অবসর না থাকলে খেলা নিয়ে মাতা যায় না। খেলার অনুশীলনে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন। পূর্বে যখন সূর্যের অবস্থান ও ঋতুর পরিবর্তন থেকে সময়ের হিসাব করা হত তখন মানুষ এত সময় সচেতন ছিল না। খেলার অনুশীলন ও স্থায়িত্ব তখন খেলোয়াড়দের ইচ্ছাধীন ছিল। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পর আভ্যন্তরীণ পরিবেশে ও প্রতিটি কাজে কর্মে মানুষ ঘড়ি ধরে দিন যাপন সুরু করে। খেলার অনুশীলন ও স্থায়িত্বও ঘড়ি অনুযায়ীই হতে আরম্ভ করে। এর ফলে বহু প্রাচীন ও আদিম খেলার রূপান্তর হয়। খেলার ক্লান্তি থেকে আসে প্রসন্নতা। পূর্বে চাষ করে, কাঠ কেটে, নৌকা বেয়ে এই ক্লান্তির আমেজ উপভোগ করত মানব। এখন এই সব কাজের ক্লান্তির মধ্যে প্রসন্নতার বদলে আসে অবসাদ। নানাবিধ খেলা এখন দৈহিক আনন্দের সুযোগ করে দেয়। এককে বহু লোকের সংস্পর্শে



আসার সুযোগও করে দেয় খেলা। এ খেলাকে অনেকে বলেন 'অবসর সভ্যতা'। অবসর ছাড়া খেলা জমে না। অবসর মানে দৈনন্দিন বা নিত্যনৈমিত্তিক কাজ থেকে অবসর। অবসর উপভোগকারী সকলেই খেলেন না। কয়েকজন খেলেন। অধিকাংশই দর্শক। খেলা দেখতে এসে দর্শকেরা কোন পক্ষ নিয়ে ঝগড়া মারপিটও করতে পারেন। খেলার

পর দাঙ্গাও হতে শোনা গেছে। আবার অত্যন্ত হৃদ্য এবং আন্তরিক পরিবেশেও খেলা সমাপ্ত হয়। হারজিতকে সকলে খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির সঙ্গে গ্রহণ করেন, মেনে নেন। শান্তি বজায় থাকে।

পূর্বে বাঙালী খেলা ও আমোদানুষ্ঠানে বিশেষ পারদর্শী ছিল। লাঠি, ছোরা, অসি, হাডুডু বা কবাটি, বলরামব্যায়াম, সমষ্টিব্যায়াম, সাঁতার, বাইচ প্রভৃতি যে সব খেলা প্রচলিত ও জনপ্রিয় ছিল তাতে বিলক্ষণ অঙ্গচালনা হত। তখন প্রত্যেক গ্রামে এক একটি কুস্তির আড্ডা ছিল। ছেলে বুড়ো সকলে কুস্তি করত। সঙ্গীতের ঘরানার মত কুস্তিরও ঘরানা আছে। এবং আছে প্যাঁচ পায়জারের রকমফের। লুকানোর ধোকা, টিব্বি, গাধা লেট, ঢাক, টাং, কুল্লা প্রভৃতি প্যাঁচের রকমফেরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় কুস্তি ও নানাপ্রকার ব্যায়াম। একদা কুস্তির তাল ঠোকার শব্দে বহু লোকের ঘুম ভেঙে যেত এই বাঙলায়।

বাঙালী ক্রমশই অঙ্গচালনা করতে বিমুখ হয়ে পড়ে। ফলে বাঙালী ভীতু ও দুর্বল বলে পরিচিত হয়। যে কোন বাঙালীকে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে তার পিতা এবং পিতামহ বড় বলবান্ ছিলেন। লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বাঘ মারার মত বলশালী বাঙালী এই সেদিনও ছিলেন। সেদিনও পি. মিত্র, পুলিন দাসেরা বন্দুকধারী বিদেশী শাসকের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন। মাত্র কয়েকদিন আগে বেপরোয়া জঙ্গীশাহী পাকফৌজ শোচনীয়ভাবে মার খেয়েছে বাঙলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে, মিত্রশক্তির জোয়ানদের কাছে।

নানাবিধ শিকারচিত্র তথা পাহাড়পুর, ময়নামতী প্রভৃতি অঞ্চলের বিভিন্ন পোড়ামাটির ফলকে, পবনদূত প্রভৃতি কাব্যে ও প্রাচীন বাঙলার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উপকরণাদিতে কুস্তি, মল্লযুদ্ধ, নানাপ্রকার শারীর ক্রিয়া, জলক্রীড়া, উদ্যানরচনা, পাশাখেলা, দাবাখেলা প্রভৃতির বর্ণনা সমাজৈতিহাসিক-পুরাবিদ্ ও নৃতত্ত্ববিদ্‌দের গবেষণার ফলে সকলেরই জানা।

দাবাখেলা যে বাঙালীর সুপ্রাচীন খেলা তার প্রমাণ চর্যাগীতিতে এর উল্লেখ 'করুণা পিহাড়ি খেলহু নঅবল। সদ্‌গুরু বোহেঁ জিতেল ভববল ॥ ফীটউ দুআ মাদেসি রে ঠাকুর। উআরি উএসেঁ কাহ্ন নিঅড় জিনউর ॥ পহিলেঁ তোড়িয়া বড়িআ মারিউ। গঅবরেঁ তোরিআ পাঞ্চজনা ঘালিউ ॥ মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিতা। অবশ করিয়া ভববল জিতা ॥ ভণই কাহ্নু অম্হে ভাল দান দেহুঁ। চউষটঠি কোঠা গুনিয়া লেহুঁ', অর্থাৎ করুণার পিড়িতে নববল (দাবা) খেলি, সদগুরুবোধে ভববল জিতলাম, দুই (ঘুটি) নষ্ট হল, ঠাকুরকে (রাজাকে) দিও না ; উপকারীর উপদেশে কাহ্নর নিকটে জিন-

পুর। প্রথমে বড়িয়া বুড়িয়া মারলাম, তারপর গজবর তুলে পাঁচজনকে ঘায়েল করলাম, তারপর মন্ত্রীকে দিয়ে ঠাকুরকে নিবৃত্ত করলাম। পরে অবশ করে ভববল জিতলাম। কাহ্নু বলে, দান আমি ভালই দিই, চৌষট্টী কোঠা গুণে লই। ডঃ নীহাররঞ্জন জানিয়েছেন যে পাশাখেলা বিবাহ উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ বলেই বিবেচিত হত। এবং দাবাখেলাও দশম-একাদশ শতকের আগেই বাঙলাদেশে প্রচলিত ছিল। চর্যাগীতিতে আরও যে সব খেলার উল্লেখ আছে তার মধ্যে জুয়াখেলা অন্যতম। মল্লযুদ্ধ শক্তির খেলা। গায়ে প্রচণ্ড বল ও প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দেবার জন্য নানাপ্রকার প্যাঁচ এখেলায় বিজয়ী হতে অবশ্য প্রয়োজনীয়। মধ্যযুগের সাহিত্যের সর্বত্র আছে মল্লযুদ্ধের বর্ণনা। যেমন—দোসর যমের দূত, বৈসে যত রাজপুত, মল্লবিদ্যা শেখে অবিরত'। অথবা 'তুলিয়া আখড়াঘরে, মল্লযুদ্ধ কেহ করে, মালবিদ্যাগুলি চাপাগাড়ি। লইয়া ঢাল খাঁড়া, কেহ করে তোলাপাড়া, পশুবধে কেহ বা শিকারী'। আরও নানা চিত্তাকর্ষক ভাব ও ভঙ্গিতে এখেলার বিবরণ মেলে প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্য ও সাহিত্যে। মল্লযুদ্ধ এখনও জনপ্রিয়। তবে গোবরবাবুর পরে বাঙালী মল্লবীরদের আর তেমন আকর্ষণ নাকি নেই। কলকাতায় বিভিন্ন সময়ে যে সব মল্লযুদ্ধ ও কুস্তির আয়োজন হয়ে চলেছে সম্প্রতিকালে সেখানে মল্লবীরদের নামের তালিকায় বাঙালী নাম প্রায় চোখেই পড়ে না এ সত্যটা মেনে নিতে বা স্বীকার করতে বোধহয় অনেকেরই আপত্তি থাকবে না। তথাপি দেহসৌষ্ঠবে, সাঁতারে এখনও অনেক বাঙালী 'রেকর্ড' করছেন। রেকর্ড সৃষ্টিকারী বাঙালীদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা উভয়শ্রেণীর বাঙালীই আছেন। শুনেছি, বাঙলাদেশে অনেক খ্যাতিমান মল্লবীর ও দেহী আছেন। দেহচর্চার আখড়া উভয় বাঙলাতেই নতুন করে গড়ে উঠছে। কিছুদিন নিরুত্তাপিত থাকলেও বাঙালী নতুন করে আবার দেহ ও শক্তি সচেতন হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। উভয় বাঙলার গাঁয়েভূয়ে ঘুরে দেখলে এই চিত্রটি সুস্পষ্ট হবে। নানাবিধ খেলা, দেহ ও শরীর চর্চায় বাঙালী উৎসাহিত হলেও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে অপুষ্টির হাত থেকে অনেকেই আত্মরক্ষা করতে অপারক হচ্ছেন। দাবা, পাশা বা তাস প্রভৃতি খেলায় বাঙালী পূর্বের মতই উৎসাহী। এ সব খেলায় অধিক বলেরও প্রয়োজন হয় না। পাশাখেলা যে সুপ্রাচীন কাল থেকেই বঙ্গসমাজে চলে আসছে তার ইঙ্গিত বহু জায়গায়ই দেওয়া হয়েছে। কাশীরাম দাস পাশাখেলাকে কেন্দ্রবিন্দু করে এমন একখানি গ্রন্থরচনা করলেন যাকে উপলক্ষ করে বলা হয় 'যা নেই

ভারতে তা নেই ভারতে'। তিনি লিখেছেন 'হেনকালে শকুনি লইয়া পাশা সারি, যুধিষ্ঠিরে বলে তবে প্রবঞ্চনা করি। পুরুষের মনোরম দ্যূতক্রীড়া জানি, দ্যূতক্রীড়া কর আজি ধর্ম নৃপমণি।" শুধু মহাভারতেই নয় মঙ্গলকাব্যের সর্বত্রও আছে এ খেলার বিবরণ। মুকুন্দরাম জানিয়েছেন 'মন্ত্র বলে সদাগর পাশা কৈল বশ, ডাকদিয়া ধনপতি পাশাফেলে দশ'। লোককথায় তো পাশাখেলার ছড়াছড়ি। পাশাখেলায় জিতে বন্দী রাজকন্যাকে উদ্ধার, বহু ধনরত্নের অধিকারী হাওয়ার নানাকাহিনী লোককথায় বর্ণিত হয়েছে। পাশা ছাড়া তাসখেলাও বাঙালীর প্রাচীন খেলা সমূহের মধ্যে অন্যতম। দশাবতার তাস বা গোলতাস সারা বাঙলায় প্রচলিত থাকলেও বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে এ খেলা সেদিনও বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন ছিল। সম্ভবত পর্তুগীজেরা বাঙলায় তাস খেলা আমদানী করেন। আলাওল তাঁর পদ্মাবতে যে চৌগা খেলার কথা বলেছেন সম্ভবত তা বর্তমানের পোলো খেলা। গেণ্ডুয়া বা কাঠের বল লোফালুফির খেলাও প্রাচীন খেলা সমূহের একটি। জলকেলী বা জলের খেলার বিবরণে বাঙলার আকাশ বাতাস সুপ্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি মুখরিত। জলক্রীড়া সম্পর্কে মুকুন্দরাম বলেছেন—'শঙ্খপড়া বাজে সানি, চৌদিকে মঙ্গলধ্বনি, জলখেলা করে বামাগণ। হরিদ্রা কুঙ্কুম আনি, মিশায়ে কলসে পানি, কুলবধূ সবে করে রণ। এইসব প্রাচীন খেলার সঙ্গে বাবুযুগের বুলবুলি, কবুতর, ইত্যাদির লড়াই জাতীয় খেলার সঙ্গে কোন মিল নেই এমন নয়। মুরগীর লড়াই সেই আদিম যুগ থেকে অদ্যাবধি জনপ্রিয়। বুলবুলি, কবুতর ইত্যাদির লড়াই আদিম সমাজের মুরগীর লড়াই-এরই সংস্কৃত বা বাবুরূপ। উনিশশতকে এ ধরণের বহু খেলা বাঙালী জীবনে প্রবেশ করে। সেকালের ধনী বাঙালী বাবুদের নানা শখ ও আচরণের মধ্যে ঘুড়ি খেলাও অনুপ্রবেশ করে। বুলবুলির লড়াই নাকি নবাবী আমদানী। এই লড়াইকে কটাক্ষ করে কবি বলেছেন—'দুর্গাপূজা ঘন্টা নেড়ে, খোকা হলে বাজে ঢাক। কাকাতুয়া ছেড়ে দিয়ে, খাঁচায় পুল্লে কিনা কাক॥ বিষয়কর্ম গোল্লায় গেল, লড়িয়ে কেবল বুলবুলি, প্রকৃতি বিকৃতি হায় হায়, মারা গেল লোকগুলি॥' ইংরেজ যুগে আমরা ক্রিকেট আক্রান্ত হয়ে পড়ি। বিশশতকের গোড়া থেকেই বাঙালী ক্রিকেটে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু ১৯৩২ সনের লর্ডস মাঠের প্রথম সরকারী ক্রিকেট টেষ্ট খেলার অনেক আগেই বাঙালী ক্রিকেট ভক্ত হলেও ১৯২৬-২৭ সনে আর্থার গ্যালিগানের টিম যখন ভারত সফরে আসেন তখন কলকাতায় তাঁদের আপ্যায়িত করতে যে নৈশ ভোজের

আয়োজন করা হয়েছিল সেখানে কলকাতায় খেলোয়াড়দের নিমন্ত্রণ করা হয় না। যদিও ইতিমধ্যে তাঁরা যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। ভারতের ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ ভয়ানক রুষ্ট হয়ে তাই গঠন করেন ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। এ ঘটনায় প্রমাণ যে ১৯২৬-২৭ সনের পূর্ব থেকেই এদেশে ক্রিকেট খেলা চালু ছিল। ক্রমে ক্রিকেট খেলার দাপটে আমাদের প্রাচীন অনেক খেলাকে আমরা ভুলতে বসেছি। ভুলতে বসেছি ড্যাংগুটি খেলা। ড্যাংগুটিকে আমরা ক্রিকেট খেলার আদিমতম রূপ বলে মনে করতে চাই। যেমন মনে করি, মারবেল খেলাকে গুলি ছোঁড়ার জনক বলে। টিপ সই না হলে মারবেলের সঙ্গে মারবেলের ঠোক্কর বা গুলতি দিয়ে পশুপাখী শিকার করাও যায় না। অর্জুনের লক্ষ্যভেদ গোছের খেলাও টিপ সইর খেলা। এই টিপ সই ঠিক হলে বন্দুক, রিভলবারের গুলিও ঠিক ঠিক ভাবে ছোঁড়া যায়। ছোঁড়া যায় ধনুকের তীর, বর্শার ফলা। এজন্য সঠিক দৃষ্টির দরকার, যা তাক করে মারা যাবে তাকে বিদ্ধ করতে শ্যেন দৃষ্টি, চিলের ছোঁর অনুকরণীয় ভঙ্গির চর্চা সুদীর্ঘ দিন থেকেই যে বাঙালী করে আসছে লড়াই, পশু ও মৎস্য শিকারে তার প্রমাণ মেলে। নিম্নশ্রেণীর লোকেদের ডালা-চাঙ্গারী বোনা, মদ-চোয়ানো, হাতি পোষা, শিকার করা, তুলো-ধোনা, বৃত্তির মধ্যে শারীর ক্রীড়ার চর্চা প্রাচীন যুগ থেকেই হয়ে আসছে। নারীসমাজের মধ্যে বিদ্যমান গুটি বা ঘুন্টিখেলা, কড়িখেলা, দশপাঁচখেলা, গোলোকধামখেলা, তেঁতুলবিচি, কোটবিন্তি, বাঘবন্দী, ষোলঘর, দশপঁচিশ, আড়াইঘর প্রভৃতি খেলা। ছোট শিশুদের মধ্যে পুতুলখেলা, রান্নাবাড়ি, হাঁটুখেলা প্রভৃতি। প্রাচীন খেলার কিছু কিছু এখনও বাঙলার লোকসমাজে প্রচলিত আছে। লোকক্রীড়ার বহু খেলা যেমন তাস, পাশা, দাবা, কড়ি, আংটি, কুমিরকুমির, গোল্লাছুট, কানামাছি, তালকাটি, ড্যাংগুলি প্রভৃতি সুপ্রাচীন কাল থেকে অদ্যাবধি চলে আসছে। সমাজ-ইতিহাস-বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে প্রাচীন বাঙলার বহু খেলাই সারা ভারত ও দ্বীপময় ভারতের আদিম সমাজের মৌল গৃহক্রীড়া ছিল। এবং তার যে সব অবশেষ এখনও বঙ্গসমাজে প্রচলিত তার চারিত্র আদিম সমাজচিন্তা থেকে খুব একটা বেশি দূর মার্জিত হতে পারেনি।

বাঙালী গৃহ বা অঙ্গনের ক্রীড়া এবং বাহির বা প্রাঙ্গণের ক্রীড়া উভয়বিধ ক্রীড়ায়ই পারদর্শী ছিল। সে জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষের খেলার চর্চা করত, করে। জল, স্থল ও অন্তরীক্ষের খেলা বলতে যে সব খেলা বোঝায় একটি ছক কেটে তার চরিত্র চিত্রণ করা যেতে পারে—

খেলার শ্রেণী বা চরিত্র বিভাগ নক্সা—১১

জলের খেলা	স্থলের খেলা	অন্তরীক্ষের খেলা
সাঁতার, জলপুলিশ বা কয়া মাছধরা, নৌকা ভাসান, পোলো, নৌকাবাইচ প্রভৃতি	দাবা, পাশা, তাস, হাডুডু, বাজীপোড়ান বাঘবন্দী, কানামাছি, লাঠিখেলা, ছোয়াখেলা গাছপাতাচেনাখেলা, লাফ, দৌড় মোরগের লড়াই, প্রভৃতি	ঘুড়িখেলা, কবুতর উড়ানো, বুলবুলির লড়াই প্রভৃতি

এই সব খেলার মধ্যে কিছু অঙ্গনের খেলা, কিছু প্রাঙ্গণের খেলা। অঙ্গন ও প্রাঙ্গণের খেলার মধ্যে কিছু খেলা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলা, কিছু খেলা শুধুমাত্র মেয়েদের, এবং কিছু খেলা শুধুমাত্র ছেলেদের। খেলার খেলোয়াড় যারাই হোক না কেন দর্শক হিসাবে ছেলেদের বহু খেলায় মেয়েদের এবং মেয়েদের কিছু খেলায় ছেলেদের উপস্থিত থাকতে বাধা নেই। শিশু ও কিশোরদের খেলায় তো অহরহই বয়স্ক স্ত্রীপুরুষদের দর্শক হিসাবে দেখতে পাওয়া যায়। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট প্রভৃতি প্রাঙ্গণের খেলায় কিছুদিন পূর্বেও মহিলা দর্শকের সংখ্যা ছিল খুবই কম, এখন সেখানেও তাঁদের ভীড়। দৌড় সাঁতার, পিংপং প্রভৃতি খেলায় তো অনেক মহিলাই বিশেষ পারদর্শী।

সহরের অনেক খেলা এখন গ্রামদেশে বিস্তার লাভ করেছে। ফুটবল,



ক্রিকেট, হকিখেলা গ্রাম বাঙলার সর্বত্রই অনুষ্ঠিত হয়। রেস, দৌড়ঝাঁপ, লাফ, কৃত্রিম শিকার দীর্ঘদিন থেকে বাঙলার প্রাকৃতজনের ক্রীড়ানুষ্ঠান। নৌকাবাইচ, ঘুড়ি, নষ্টচন্দ্র, মাঙ্গন, হোলবোল, বাঁশখেলা, নানারকম লাঠি-খেলা, তাইতাই, বগলবাজানো, দমনেওয়া, কিলদেওয়া, কনুইমারা, আঙুল খেলা বলরামব্যায়াম, সমষ্টিব্যায়াম প্রভৃতি এখনও বাঙলার লোকসমাজকে কম আনন্দ দেয় না। বাঙলার লোকসমাজে প্রচলিত নানাবিধ খেলাকে আমরা

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণের খেলা হিসাবে বিভক্ত করে নিম্নলিখিত ছকে বিধৃত করতে পারি—

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণের খেলার নক্সা—১২

অঙ্গনের খেলা			প্রাঙ্গণের খেলা		
শিশুকিশোর	যুবকযুবতী	বৃদ্ধবৃদ্ধা	শিশুকিশোর	যুবকযুবতী	বৃদ্ধবৃদ্ধা
পুতুলখেলা	ছোয়াখেলা	গোলকধাম	বুড়াবুড়ি	হাডুডুখেলা	তাসখেলা
ইকিরমিকির	অসিখেলা	ষোলঘুঁটি	চোরধরা	চোরডাকাত	পেসেন্স
রান্নাবাড়ি	ছুরিখেলা	আড়াইঘর	কিৎকিৎ	লাঠিখেলা	দাবাখেলা
আগডুমবাগডুম	বাঘবন্দী	ঘরবন্দী	এক্কাদেক্কা	বুলবুলি লড়াই	প্রভৃতি
বউবউ	আংটিখেলা	প্রভৃতি	কুমিরকুমির	মুরগী লড়াই	
গাড়ীগাড়ী	কাদাখেলা		কানামাছি	অসিখেলা	
উবুদশ	সমস্যাপূরণ		টোকাটুক্কি	ঘুড়িখেলা	
বাড়ীতৈরী	বাস্তুখেলা		গোল্লাছুট	নৌকাবাইচ	
এলাডিং-	চাউলখেলা		তালকাটি	মাছধরা	
বেলাডিং	প্রভৃতি		চোরপলান্তি	বলরামব্যায়াম	
ঠাকুর চেনা			বুড়ি বসান্তি	নষ্টচন্দ্র	
গাছপাতাচেনা			গুলি	হোলবোল	
বলছোঁড়া			ডাংগুলি	ঘোড়দৌড়	
তেঁতুলবিচি			গা-ছোঁওয়া	নানাজাতীয় বল	
কাটাকাটি খেলা			কুকুর ও শকুনী	কয়া	
নির্দোষ বাজীপোড়ান			বনভোজন	লক্ষঝক্ষ	
আঙ্গুলখেলা			লাইখেলা	দারিয়াবান্ধা	
প্রভৃতি			রুমালচোর	প্রভৃতি	
			নৌকাভাসান	সমষ্টিব্যায়াম	
			দেবাভিনয়	নানাবিধ আতস বাজীর খেলা	
			প্রভৃতি	পাল্লা দেওয়া, সাপ, বানর খেলা	

এই সব খেলায় সৌন্দর্যবোধ, কর্তব্যাকর্তব্য, দায়িত্ববোধ, ঐক্যশৃঙ্খলা, সহনশীলতা, বুদ্ধিকৌশল, স্বাস্থ্যচর্চা, সাহসবিক্রম, গার্হস্থ্য-ধর্ম প্রভৃতির প্রকাশ পায়। কতগুলো খেলায় আছে শুধুই কায়িক শ্রম। কতগুলো খেলায় ছড়া ও গানের অবকাশ আছে। সাধারণতঃ আট দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেরা মেয়েরা একই সঙ্গে খেলা করে। দশ থেকে বারো-তেরো বৎসর বয়স থেকে ছেলেমেয়েদের বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগরিত হলে সাধারণতঃ পৃথক পৃথক ভাবেই খেলাধূলা করে।

লোকসমাজে প্রচলিত খেলাগুলোকে আমরা নিছক আমোদপ্রমোদ, দেহচর্চামূলক, শিক্ষাবিষয়ক, বিশ্বাস ও আচরণমূলক কিছু খেলায়ও ভাগ

করতে পারি। ছেলেমেয়েদের বয়স অনুযায়ী কোন খেলার বিভাগ বোধ হয় ঠিক হবে না। কারণ, বিভিন্ন বয়সী লোককে একই খেলায় অংশ নিতে প্রায়ই দেখা যায়। খেলাধূলার প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ থেকেই বিভিন্ন বয়সী মানুষ বিভিন্ন খেলায় অংশ নিয়ে থাকে। বাস্তবে মানব-মনের পূর্ণবিকাশ সাধনোপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় নানাপ্রকার খেলা। তবে খেলাধূলোর ক্ষেত্রে এই বয়ঃক্রম কোন বাঁধানিয়মের মধ্যে আটকে নেই। বড়রা অনেক সময় মনের দিক থেকে ছোট হয়ে অথবা ছোটরা মনের দিক থেকে বড়দের কাছাকাছি সর্বদাই চলে যেতে পারে।

নিছক আমোদপ্রমোদ	দেহচর্চামূলক	শিক্ষাবিষয়ক	বিশ্বাস আচরণমূলক
ঘুড়ি খেলা	বল	গোলকধাম	নষ্টচন্দ্র
হাঁটু খেলা	নৌকাবাইচ	সমস্যাপূরণ	হোলবোল
কানামাছি	ক্রিকেট	বাস্তুখেলা	আংটিখেলা
ড্যাংগুটি	হাডুডু বা কবাটি	ঠাকুরচেনাখেলা	কাদাখেলা
জলকুমির	নানাবিধ দৌড়	পুতুলখেলা	সইপাতানখেলা
গুলি	সাঁতার (কথা)	রান্নাখেলা	দেবাভিনয়
চাকাখেলা	গুলতি	আঙ্গুলখেলা	আঙ্গিক ও
যাদুখেলা	লাঠিখেলা	প্রভৃতি	বাচিকভিনয়
(তেলেছমাত্)	অসিখেলা		অঙ্গসজ্জা
প্রভৃতি	ছোরাখেলা		প্রভৃতি
	জলপুলিশ		
	বলরামব্যায়াম		
	সমষ্টিব্যায়াম		
	ইত্যাদি		

সময় ও সমাজ পরিবর্তনহেতু খেলাধূলারও রূপ পালটিয়ে যাচ্ছে। যোগা-যোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা যতই সহজ হচ্ছে ততই বহু বিদেশীখেলা স্বদেশে, সহরের বহু খেলা গাঁয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু গাঁয়ের খেলা খুব একটা সহরে চলে আসছে না। না আসার কারণ বোধ হয় সহরবাসী গতি ও সময়ের আইন-কানুনে বাঁধা। গ্রামবাসী জীবনধারণের জন্য যতটুকু গতির দরকার তার বেশী গতিতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ঘড়ির কাঁটা ধরে নিয়মমাফিক কাজ করতে প্রায়শই রাজী হয় না তারা। সহরে সমস্ত কাজই ঘড়ি ধরে চলে। আমোদ-প্রমোদ-ক্রীড়াদির জন্যও ঘন্টা মিনিট বাঁধা। সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রা, ছড়া, নাচ, গান, প্রতিযোগিতা সবই ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী চলে।

খেলা ও আমোদ-প্রমোদ সম্পর্কে এই কথা মনে রেখে আমরা লোক সমাজের কয়েকটি খেলার প্রতি নজর দিতে পারি। প্রথমেই ধরা যাক, মেয়েদের ছোরাখেলা। মেয়েদের ছোরাখেলার কথা স্মরণ হলেই মনে পড়ে বারো ভূঁঞাদের কথা। বারো ভূঁঞাদের পৃষ্ঠপোষকতায় একদা সারা বঙ্গে স্থাপিত হয়েছিল মহিলা সমিতি। মহিলা সমিতির সদস্যেরা প্রাসাদের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে ঢাক-ঢোল-তুরী-নাগরা-কাঁসর-করতাল সহযোগে ছুরিখেলা করতেন। বিপ্লবীআন্দোলনের যুগে ইংরেজ তাড়াবার অগ্নিময় দিনগুলোতেও ছেলেরা-মেয়েরা লাঠি-গুলি-ছুরি-ছোরা খেলা খেলতেন শিখতেন। সাহস, অধ্যবসায়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও শ্রমশীলতায় যত্নবান ছিলেন তাঁরা। মেয়েদের ছুরি খেলার শিক্ষক ছিলেন ছেলেরা। চকমক্ ছুরি, আটসাঁট পোষাকে ঢোলের তালে তালে নাচতে নাচতে লাফিয়ে পড়তেন দু দিক থেকে দু দল মেয়ে একে অপরকে হারিয়ে দিতে। এ খেলা দুজনেও হতে পারে, আবার সমষ্টিগত ভাবেও হতে পারে। দুজনে খেলা অনুষ্ঠিত হউক, বা সমষ্টিগত ভাবেই অনুষ্ঠিত হউক, দর্শক ও গায়ক-বাদকদের সংখ্যা প্রায় একই থাকে। মহিলা সমিতি পরিচালিত ছোরাখেলা আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত। ব্যায়াম ও শরীর রক্ষার এই খেলায় মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে কম পটুত্ব দেখান নি সেদিন, এখনও দেখাচ্ছেন না।

রণসাজে সজ্জিত মেয়েরা ক্রীড়াঙ্গনে এসে দু'দলে বিভক্ত হয়ে যান। এক দল অপর দলকে হারিয়ে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কেউই হারতে চান না। খেলা জমে ওঠে। একদল ঘাতক, অপরদল আত্মরক্ষক, ঘাতক-সংহারক। চারদিকে দর্শক। শোনা যায় যুদ্ধের বাজনা, গান। এরই মধ্যে ঘাতক-



দলকে উপযুক্ত শিক্ষা ও কোতল করার ইচ্ছায় শক্তি, সাহস ও সামর্থ্য নিয়ে একদল ছুরি হাতে লাফিয়ে পড়ে অপর দলকে জব্দ করতে। রণহুঙ্কার ছাড়ে—'বাঙলামায়ের শ্যামলা মেয়ের ছোঁবে আঁচলটা। এমন বীরতো ভুভারতে একটি দেখি না'। আত্মরক্ষাকল্পে ছেলেদের সাহায্যের প্রয়োজন নেই তাদের। কারণ—তাঁদের 'অট্টহাস, ছিন্নপাশ, রুদ্ধশ্বাস—বক্ষে। অগ্রে চল্, দস্যু দল্, লক্ষ্য

বল্—সাধ্বী। বর্ম বাঁধ্, কর্ম সাধ্, রুদ্র বাদ—বাদ্যি। উল্কাপাত, বজ্রাঘাত, রক্ষ জাত—বঙ্গে। ভয়ঙ্কর,মূর্তিধর,বিঘ্নহর—সঙ্গে'। এইসঙ্গে চলে বাজনা—খৃতাক্ তাক্ খৃতাক্ তাক্ খৃতাক্ তাক্ ঝাঁ। গান চলে—'তোরা রক্ত দেখে যা। তোরা রক্ত মেখে যা। বাঙলা মায়ের, দামলা-মেয়ের, ছোঁবে আঁচলটা। এমন বীর তো ভুভারতে একটা দেখি না'। তখনও বাজনা বাজে— তেটে তেটে খেটে তা. উর দাড়ি নাকি তারি। চলে হৈ হৈ। চলে গান। 'তোরা রক্ত দেখে যা, তোরা রক্ত মেখে যা। তোরা অস্থি দিয়ে খট্-খটাখট্ খঞ্জনি বাজা। তোরা লাল শাড়ি আর শশ্মান ছাইয়ে আপনারে সাজা'। খেলা এগিয়ে চলে। নানা ভঙ্গিতে চলে মার-প্যাঁচ—'ভাণ্ডার ঘাত লাগ-ঝিনা-ঝিন্। দক্ষীআনি লাগ্ ঝিনা ঝিন্। জনার্দন লাগ্ ঝিনা ঝিন। উত্তর আনি লাগ্ ঝিনা-ঝিন্। লাগ ঝিনা-ঝিন-ঝেনা ঝিন্-ঝেঁ। লাগ্ ঝিনা-ঝিন্-তেনা-তিন্ তে। খৃতাক তাক্, খৃতাক তাক্, খৃতাক তাক্ ঝাঁ। তোরা রক্ত দেখে যা, তোরা রক্ত মেখে যা।'

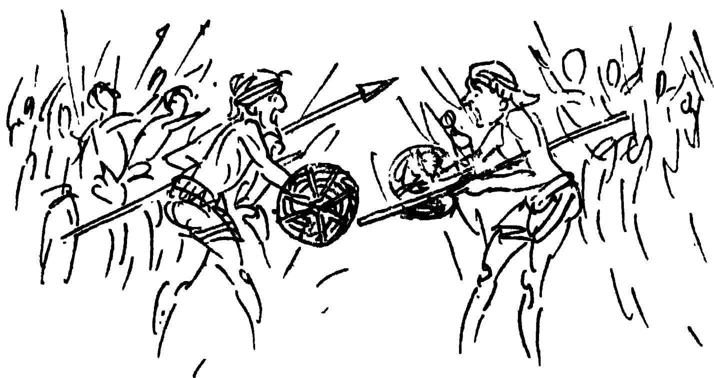
তালে তালে এগিয়ে যায় খেলা। দর্শক, খেলোয়াড়, বাদক, সকলেরই শিরায় শিরায় রক্ত চড়ে। রক্ত ছোটাতে আহ্বান জানানো হয়—'বাহেরা ও তামেচা মার মার শঙ্খ। শির কাটি পয়লা ঢাক তোর বক্ষ। কটিঘাত ভাণ্ডার মার মার কক্ষে। উত্তর আনি দে বিদ্যুৎ চক্ষে। গ্রীবান ঘটিকায় মার মার হস্তে। হীনায়নে মন দে অন্তর ত্রাস্তে। আধপা'র দাপটে পড়্ পড়্ ঝম্পে। আপনার মান রাখ ত্রিভুবন কম্পে।' সঙ্গে সঙ্গে রক্তের ফিনকি ছোটে, আর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে হিঃ—হিঃ—হিঃ—হাঃ— হাঃ—হাঃ শব্দ।

এরই মধ্যে বাজনা বাজে খৃতাক তাক্ খৃতাক্ তাক্। গীত হয়—'মোরা সাঁজ সেঁজুতি পুণ্যিপুকুর শিবপূজায় মাতি। মোরা আলপনা দিই উঠোন জুড়ে শিউলি মালা গাঁথি। মোরা চরকা চালাই গরু দোয়াই ঢেঁকিতে দেই লাথি। মোরা ফুলের মত ফুটি, কেউ রঙ্গ করে হাসলে কালীর খাঁড়া হাতে ছুটি। ননীর পুতুল নই গো মোরা, ননীর পুতুল নই। ননী চোরার মা-জননী হই। মোরা রক্ত দেখে করি না হৈ চৈ'। খেলোয়াড়ের সমস্ত শত্রু সমস্ত পাপ নিধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। রণোন্মত্ত, কারণ 'বল কতদিন আর সইবি অত্যাচার, শিরায় শিরায় উঠছে ফুটে উষ্ণ শোণিত ধার। ছুরির ফলায় শেষ করে দিই রক্তবীজের ঝাড়'। এই ভাবে শক্তির খেলা, রণচণ্ডী নারীর খেলা সমাপ্ত হয়। শৌর্যবীর্য ও শক্তির প্রতিমূর্তি রূপিণী নারী তখন ক্ষতবিক্ষত। অত্যাচারীর অত্যাচার স্তব্ধ করে দেবার দৃঢ়সঙ্কল্প নেয় তারা। মেয়েরা যখন এই শক্তির খেলায়

নিজেদের বাহুবলের, নিজেদের সাহসের পরিচয় দেয় তখন ছেলেরাও কিন্তু শুধু দর্শকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। তারাও প্রাঙ্গণে লাঠি, বর্শা, অসি, ছোরা খেলায় মত্ত হয়ে পড়ে।

দুই আড়াই শ বছর পূর্বেও বাঙালী স্বাস্থ্য-সম্পদে, ধনে, মানে এত হীন ছিল না। অসি, লাঠি, মল্লযুদ্ধাদিতে অগ্রণী ছিল তারা।

এই লাঠিরই জোরে বাঙালি বিদেশী আক্রমণকারীদের প্রতিহত করেছিল। বাঙলার অনেক মনীষী বাঙালীর লাঠির গুণকীর্তন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন—'হায় লাঠি! তুমি ছার বাঁশ বংশের বংশ বটে, কিন্তু শিক্ষিত হস্তে পড়িলে তুমি না পারিতে এমন কাজ নাই। তুমি বাংলার আব্রু রাখিতে, মান রাখিতে, ধন রাখিতে।' তখন বাঙালী পল্লীতে পল্লীতে আখড়া স্থাপন করে, লাঠি, অসি, ছুরি প্রভৃতি নানারূপ স্বাস্থ্যপ্রদ খেলার মধ্য দিয়ে, আত্মরক্ষা, সমাজরক্ষা ও দেশরক্ষার প্রস্তুতি চালাত। অনেক সময় আখড়ায় আখড়ায় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হত। ধরা যাক, এ ধরণের কোন একটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে কার্তিক কৃষ্ণা-চতুর্দশীতে কোন এক কালীমন্দির প্রাঙ্গণে। দক্ষিণ চব্বিশপরগণার সুন্দরবন অঞ্চলের কোন এক বিশেষ স্থানে বা জঙ্গলে যেখানের একদিকে ভক্তজনের ভিড়, অপরদিকে খেলোয়াড়দের ভিড়। খেলার দর্শকদের ভিড়। ভিড় ঢাক-



ঢোল কাড়া-নাকাড়া-কাঁসর-দামামার। বাজনা চলছে—দিদিং ধিনাক, তিতিং তিনাক। ধিনাক্ ধিনাক্ ধিনাক্ ধিদিং ধিনা। মশালের দাউ দাউ, লেঠেলের হাউহাউ চলছে। চলছে বিকট শব্দ। পটকার আওয়াজ। এ আওয়াজের মারফত জানান দেওয়া হচ্ছে খেলা শুরু হবার সময় আগতপ্রায়। বলা হচ্ছে, দর্শকেরা যেন অবিলম্বে খেলা দেখতে ছুটে আসে।

ঐ ধরণের অনেক খেলার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাদের আছে, পটকা বা হাত-বোমার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে হয় পিপীলিকার মত জনসমাবেশ। সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ে মালকোঁচা মেরে তেল চপ চপ বাঁশের লাঠি হাতে এগিয়ে আসে একপক্ষ ওপক্ষ। দুপক্ষে গান চলে—'কে বলে রে বাঙালীর নাইকো লাঠির জোর? তোরা পাঁয়তারাতে ঘোর্, তোরা আড়াইপায়ে ঘোর্।' লাঠিখেলার বিভিন্ন ঢং ও প্যাঁচ আছে। যেমন পৃষ্ঠাবেষ্টন, মিশ্রমণ্ডল, হর্ষাবর্তন, বৈষ্ণবীঠমক, বাহেরা, পাততাড়ি, নন্দাবর্তন, মিশ্রাবর্তন, বিমোহন, পাঁয়তারা, আড়াইপা, ধুমাকিটি, ষাগুাবেষ্টন প্রভৃতি। গানের তালে তালে খেলোয়াড় ঘোরে, প্যাঁচ মারে, আঘাত হানে। ওদিকে বাজনা বাজে—ঝাঁ ঝাঁ-ঝাঁ, ঝাঁ-তা। ঝিন-তাক্-তাক্-তাক্-তাক্। দিদিং পাট্টা দিদিং পাট্টা দিঙ্গা। চলে—ধিন্‌তা ধিনা তাগিনা ধিনা। ধেএ ধেএ ধেএ তাগিনা ধিনা ধেৎ। ধে ধে ধে ধেৎ। ধিন ধিনা ধিন্ তাক্ ধিনা ধিন্। তাগিনা ধিনা তাক তাক্ ধেৎ। এই বাজনার সঙ্গে সঙ্গে নানাভাবে প্যাঁচ মারার কথা বলা হয়। 'এই মার এই ধর' বলে একপক্ষ লাঠি ওঠায়। অপরপক্ষ সে আঘাত সামলে নিয়ে বলে—'নহি মোরা হীন, কভু নাহি হব পরাধীন' এই বলে লাঠির আঘাত ঠেকায়। পাল্টা মার দেয়। একপক্ষ অপর পক্ষকে এগিয়ে নিয়ে যায় ঠেলে। প্রতিপক্ষ সে আঘাত সামলায়। এই সময়ও গান হয়। সে গানের বিষয়বস্তু কি ভাবে একপক্ষ অপরপক্ষকে মারবে—'সাপটা মেরে ধুমাকিটি তাক্। ঝাপটা দে রে ঘিন তেনে তাক্। সামনে আগড় ধুমাকিটি তাক্। পিছন বাড়ি ধিন তেনে তাক্।' আবার বলে—'তোরা পাঁয়তারাতে ঘোর, তোরা আড়াইপায়ে ঘোর। তোরা মারের খেলা খেল, তোরা অন্ধ আঁখি মেল'। এর পরই সুরু হয় মারের খেলা। একপক্ষ অপরপক্ষকে মারের পর মার দিয়ে চলে। এই মারের খেলার সময়ও গান। 'একাবর্তন হাত ঘুরিয়ে, শিরাবেষ্টন শির বাঁচিয়ে। উদাবর্তন লম্ফ দে রে, শিরমণ্ডল মাথায় মেরে। মুদাবর্তন দুপাশ ঘুরে, ভগ্নকরণ সমুখ জুড়ে। উগ্র-যমক রুদ্রযমক। লাগাও চমক লাগাও চমক।' খটাখট্ ঠকাঠক্ শব্দ। সে শব্দে 'আগুন ছোটে, আগুন ছোটে, আগুন ছোটে রে। তরুণ বুকে দারুণ দুঃখে রক্ত ছোটে রে। টগ্‌বগিয়ে টগ্‌বগিয়ে টগবগিয়ে রে'। এই টগ্‌বগ্ রক্তের খেলায় নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে—'শির বাঁচিয়ে সামনে ঘোরা, ষাগুা মেরে ডাইনে ঘোরা। বাহেরা চাকী ত্রিহর ভানে। ভুজ্জা ভুজ চির গ্রীবাণে। নেত্রছলে হাতকাটিতে, মনকাটি দে সাকমুটিতে। ভাণ্ডারয়নি হীনায়ণে, অন্তরে আর জনার্দনে। লাঠির মুখে আগুন ছোটা। বজ্রফুলের ছিঁড়বে বোঁটা।

দুশমনে তোর ভুঁইয়ে লোটা। আঁক শোণিতে জয়ের ফোঁটা'। এই ধরনের উন্মাদনার মধ্যে খেলা সমাপ্ত হয়।

লাঠি খেলোয়াড়দের লাঠি চালনা অনেক সময় এত দ্রুত হয় যে প্রক্ষিপ্ত ঢিল পর্যন্ত প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। লাঠিখেলার কৌশল ও যুদ্ধের কৃত্রিম মহড়া থেকে বাঙলায় নানা রণনৃত্যের উদ্ভব হয়েছে। শিকারী ও কৃষক উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই শরীর ক্রীড়ায় আনন্দ পায়। ব্যাধ ও শিকারীরা তীর, ধনুকের এবং কৃষকসম্প্রদায় বর্শা. বল্লম, লাঠি, ছোরার সাহায্যে আত্মরক্ষা করে। ক্রীড়া, নৃত্যানুষ্ঠানে লাঠি, অসি, ছুরি, ছোরা, বর্শার চর্চা বজায় রাখে। ঢোলের তালে তালে, গানের সঙ্গে সঙ্গে দেহভঙ্গির হয় কসরৎ। শক্তি পরীক্ষা ও শক্তি চর্চার সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় নানাবিধ নাচ ও গান এই বাঙলায়।

অসিখেলোয়াড় অসি হস্তে এসেই প্রথমে সকলকে প্রণাম জানায়। দুপক্ষ একই সঙ্গে বলে—'প্রণাম করি মুণ্ডকেশী মুণ্ডমালিকে, মৃত্যুহরা পরাৎপরা ভদ্র-কালিকে। দাও মা মোরে চরণধূলি অঙ্গে মেখে যাই, বরাভয়া তোর আশিসে মরণভয় আর নাই। প্রণাম করি পণ্ডিতে আর ভূদেব ব্রাহ্মণে। পূরব পশ্চিম উতোর দক্ষিণ আর চারি কোণে। ইন্দ্র আদি সূর্য দ্বাদশ রুদ্র একাদশ। অষ্ট বসু অগ্নি বরুণ সকলেই হোক বশ। তাক্ ঝাঁ-ঝাঁ,—নাক ঝাঁ-ঝাঁ।' তারপর দেববন্দনান্তে বলে—'প্রণাম করি গুরুর পদে ঘুরাই অসি রে। আজকে শুভরাত্রিভরা চতুর্দশী রে। বিশাল ভূমে মশাল জ্বলে সাক্ষী থাকুন মা, প্রথম খেলি অর্ধপদে পরে আড়াইপা। ঝাঁ-ঝেঁ-ঝেঁ-ঝাঁ, তাগিন্যি-গিনে-তা-গিগ্যি গিনে-নেজা গিনে তা'। তালে তালে এগিয়ে চমৎকার বীর্যের খেলা. অসিখেলা। অসিখেলার এ চিত্র রাঢ়বঙ্গের। এ খেলার খেলোয়াড়গণ



শক্তির পূজারী। কালীভক্ত। সুতরাং এ খেলার অনুষ্ঠানও হয় কালী প্রতিমার সামনে। সাধারণতঃ কালীমন্দির প্রাঙ্গণই এ খেলার উপযুক্ত স্থান। কিন্তু কোন কারণে মন্দির প্রাঙ্গণে এ খেলা অনুষ্ঠিত না হলে খেলার মাঠের এক কোণে শক্তিময়ী কালীর কোন মূর্তি বা ফটো রাখা হয়। তাঁর পূজা করা হয়। আশীর্বাদ ভিক্ষা করা হয়। তারপরই ঝাঁকড়া চুলে, মালকোঁচা মেরে

কাপড় পরে, বাজের পালকের গহনা নিয়ে অসি হস্তে একে একে মাঠে গিয়ে নামে খেলোয়াড়বৃন্দ। খেলা খেলতে, খেলা দেখাতে। রক্ত ছোটাতে, শৌর্যবীর্যের পরীক্ষা দিতে।

আমরা বহু আলোচিত রায়বেঁশে নাচের কথা জানি। এ নাচ লাঠি খেলাকে স্মরণীয় করে রাখার নাচ, শক্তিশালী জনগোষ্ঠীর দেহক্রীড়ার নাচ। রায়বেঁশে বা অনুরূপ নৃত্যে বাউরী, বাগদী, ভল্লা প্রভৃতি আদিবাসী-উপজাতি গোষ্ঠীর বীর সন্তানেরাই অংশ গ্রহণ করে থাকেন। বোলান নাচও শরীর চর্চার নাচ। ছোট ছোট বাঁশের লাঠি নিয়ে দলবেঁধে ছেলেরা কাঠি নাচও নাচে। প্রত্যেক নাচের সঙ্গেই আছে গান। কাঠি নাচের গানের একটি নমুনা—'কাঠির ন্যাচো করি সারি রে—। ও ভাই দিলেক মোরে সারি রে—, দিলেক মোরে সারি রে। গাঙচিলেরে শব্দে মোরা, হলাম গুড়িগুড়ি রে। কোথায় ছিল চাঁদ। মেরেছে ফাগুরি রে, মেরেছে ফাগুরি।' এইভাবেই এগিয়ে চলে দেহক্রীড়া, নাচ ও গান। একদলের বিদায়ের পরে হয় আরেকদলের আগমন। লাঠির পরে আসে অসির খেলোয়াড়। তারপর অন্যেরা। এ সব খেলায়ই আছে নাচ, আছে গান।

মধ্যযুগে সারা বাঙলায় ছিল ঢালী নৃত্যের প্রচলন। বীর ও রুদ্র নৃত্য এই ঢালি নাচ। আক্রমণ ও প্রতিরোধাত্মক ভঙ্গিতে উন্মাদনাপূর্ণ নাচ। ছুরি ও লাঠি খেলার মত এ খেলায়ও আছে অগ্রগতি, পশ্চাৎ অপসরণ, পার্শ্বে যাওয়ার রীতি ইত্যাদি। রণসাজে সজ্জিত যোদ্ধাদের প্রতিঘাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য হাতে থাকে ঢাল। এই ঢাল কাঠ, বেত ও চামড়া দিয়ে তৈরী। অসি ছাড়া বর্শা ও শূল খেলায় বা নৃত্যেও ঢালের ব্যবহার হয়। বর্শা ও শূলের খেলা প্রায় লাঠি খেলারই সামিল। শূল মানে ত্রিশূল, দেবাদিদেব মহাদেবের অস্ত্র। এ অস্ত্রের আঘাতে মৃত্যু অনিবার্য। সাধারণ কৃষক সমাজের মধ্যে লাঠি ও বর্শার চলন খুবই বেশী। ওদের আত্মরক্ষার জন্য এগুলো ওদের অকৃত্রিম বন্ধু, যেমন সাঁওতাল ও অন্যান্য উপজাতিদের তীর ও ধনুক। আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে প্রকৃতিপ্রদত্ত এই সব অস্ত্রই বাঙলার আপামর জনসাধারণকে বল জোগাত।

বাঙলার জমিদারশ্রেণী একদা তাঁদের জমিদারী রক্ষাকল্পে হাড়ী-বাগ্দী-ডোম প্রভৃতি আদি ও উপজাতিগোষ্ঠীর লোকেদের নিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন ঢালীসমাজ, যোদ্ধাসমাজ। তাদের ডান হাতে বর্শা বা অসি, বাঁ হাতে ঢাল। কখনও ঢালের নীচে অসি, কোমরে ছোরাও রাখত সাক্ষাৎ যুদ্ধের জন্য।

পাঞ্জারও প্রচলন ছিল একদা। মূলযোদ্ধার পাশে থাকত দেহরক্ষী। তারাও অনুরূপ সাজে সজ্জিত। এই ঢালীদের প্রতাপহেতুই প্রতাপাদিত্য আদি বাঙলার নরপতিগণ দিল্লীর বাদশাহের হুকুমনামা অমান্য করার স্পর্ধা রাখতেন। আগ্নেয়াস্ত্র বহুল প্রচলনের পূর্বে ঢালীরাই ছিল বাঙলার প্রধান পদাতিক যোদ্ধা। এই যোদ্ধাদের নাচ পাইকান। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া জেলায় এখনও পাইকান নৃত্য দেখা যায়। বিভিন্ন পাঁয়তারা ও লাঠিচালনার কৌশলে অসিনৃত্য দারুণ উন্মাদনা সৃষ্টি করে। এই খেলানুষ্ঠানে উপযুক্ত সাজে সজ্জিত হয়ে এগিয়ে আসে খেলোয়াড়বৃন্দ। কৃষ্ণকালো সুঠাম দেহ। শিরায় শিরায় রক্তের নেশা। হাতে লোহার রুলি। সেই রুলি নাকি তাদের সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার করে। কনুইর উপরে আছে কড়ির তাবিজে সিঁদুরের দাগ একই কারণে।

প্রথমে উভয় দল উভয় দলকে অভিবাদন জানায়। তখনও চলে—'খড়্গের ঝনঝন বর্মের বন্ধ, খড়্গের চকমক্ চক্ষের ধন্ধ। খড়্গের ঘূর্ণন ঝঞ্ঝার শন্ শন্। গ্রহে গ্রহে ঘর্ষণ স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ'। অভিবাদনের পরে চলে উন্মত্ত খেলা। রক্তের খেলা। কেউই হারতে চায় না। অবিরাম চলছে—'ঠন্ ঠন্ ঠন্ ঠনাক্ ঠন্। জোনাক-ভরা ভাঁটের বন। শত্রুভীরু হঠ পিছে। পাঁয়তারা তোর সব মিছে। উল্কা নামে ব্যোম ফুঁড়ে। ফুল্কি ছুটে ভুঁই জুড়ে। রক্ত চাই রক্ত চাই। দামাল অসির সামাল চাই'। উভয় দলের লোকেরই রক্তের নেশা। রক্তের জন্য তাই কলরব।

উভয় পক্ষই অসির আঘাত সামলাতে, রক্ত বাঁচাতে বদ্ধপরিকর। এই অসিখেলায়ও কতগুলো প্যাঁচ আছে। সে প্যাঁচের আছে নানা নাম। যেমন—প্রথম আঘাত বাহেরা, দ্বিতীয় তামেচা, তৃতীয় কড়ক, চতুর্থ সাকম, পঞ্চম প্রপদ, ষষ্ঠ আসর, সপ্তম ত্রিহর, অষ্টম চাপনি, নবম ওলট ও দশম পালট। তাছাড়াও আছে শ্যামল আঘাত, আছে বিষম আঘাত প্রভৃতি।

আঘাতের পর আঘাতে অসির খেলা জমে ওঠে। বাজনার গতি দ্রুত হয়—ঝেনাক্-তা, তেনাক্-তা, ঝেনাক্ ঝেনাক্ ঝেনাক্ ঝা, তেনাক্ তা তেনাক্ তা। গান চলে'—ধর ধর মার মার, ঘোর অসি খরধার। বাজা ভেরী ঢাক ঢোল, ডাকিনীর কলরোল'। চলে—'দ্বিঘাত ত্রিঘাত হাতকাটি। ওলট-পালট দাব্ মাটি। সন্ সন্ রবে অসি ঘোরে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে,' একদলের রক্তের ফিনকি দেখে সে দল মরিয়া হয়ে ওঠে রক্ত নিতে। পিছন থেকে পালট মারে। পাশ দিয়ে ওলট মারে। যেভাবে পারে প্রতিপক্ষকে খতম করতেই হবে। রক্ত নেবার রক্ত দেবার খেলায় অসি গিয়ে বিদ্ধ

হয়। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে। অসির ফলা একটু বিঁধে ছিটকে পড়লে গান সুরু হয়—'রক্ত ছোটে রক্ত ছোটে রক্ত ছোটে রে।' রক্তের নেশায় তখন মন মহুয়া-পাগল। বিদ্যুৎবেগে অসি ঘোরে। ওদিকে বাজে রণবাদ্য। চলে গান— 'বন্ বন্ বন্ বনাৎ বন্। জয়ের নেশায় মাতাল মন। ডাকছে শিবা ডাকছে ফেউ। আজ রাতে কি ঘুমায় কেউ? মশালশিখা কাঁপছে ধীর। ডুববে এবার আঁধার তীর। রক্ত চাই রক্ত চাই। দামাল অসির সামাল যাই। মর্মভেদী খড়্গ এ যে ঝঞ্ঝাবেগে ধায়। দুষ্কৃতেরে দণ্ড দিতে মুণ্ড নিতে চায়। পেয়েছি মার বর জয় করেছি ডর। সর সর সর সর'। এক পক্ষ হেরে যায়। পরাজিত দলের দুঃখের সীমা থাকে না। বিজিত দল রণক্লান্ত অবস্থায় কালী প্রতিমার সামনে গিয়ে বলে—'শত্রু রুধির পান করে হও তৃপ্ত কালিকে। আর কেন মা ভয়ঙ্করী মুণ্ডমালিকে? দৈত্যদানা যতেক ছিল আজ তারা নেই কেউ। শান্তি এল, ক্ষান্তি এল, উঠছে হাসির ঢেউ।' শৌর্য বীর্য রক্তের খেলা—অসিখেলা সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়।

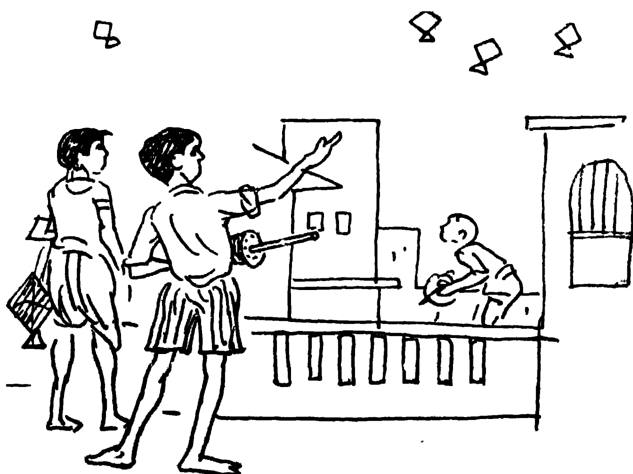
সভ্যতার ছোঁয়ায় এ খেলা আজ বন্ধপ্রায়। কিন্তু তবুও যখনই প্রাকৃত জনেদের বীর সন্তানেরা সুযোগ পায় তখনই এ খেলায় মাতে। নাচে ও গান গায়। রক্ত দিয়ে লেখে জীবনের জয়গান। লাঠি, বর্শা, ছুরি, অসি, ঢাল প্রভৃতি যেমন শৌর্য বীর্যের খেলা স্থলের, নৌকা বাইচ তেমনি বীর্যের খেলা জলের। আকাশে বীর্যের খেলা ঘুড়ি। ঘুড়ি আকাশযানের পূর্বপুরুষ। বাঙালী এই ঘুড়ি খেলায়ও বিশেষ পটু। বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে বাঙালী ঘুড়ি খেলে, কিন্তু সর্বাধিক উত্তেজনাপূর্ণ খেলা বোধহয় ভাদ্রসংক্রান্তি দিবসেই অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়। বাঙলার সর্বত্র এ খেলা জনপ্রিয়।

অন্যদিন ঘুম ভাঙ্গে কাক মোরগের ডাকে বা কোন প্রভাতী সঙ্গীতের সুরে তাঁদের যাঁরা ধাক্কা বা চীৎকারে গা-সওয়া হয়ে গেছেন। কিন্তু ভাদ্র সংক্রান্তির প্রাতে কলকাতাবাসীর ঘুম ভাঙ্গে উল্লসিত এক জনতার সরব চীৎকারে, 'তুয়ো সুতো বাড়ে না জুতোয় খায়,' 'বোদাবুদি,' 'ভোঁকাট্টা,' 'হাত্তা' প্রভৃতি বুলিতে অথবা মাইক্রোফোনের বিকট গর্জনে কিংবা বিশ্বকর্মা পূজারীদের তড়িঘড়ি কলরবে।

এইসূত্রে বলে রাখা কর্তব্য যে অন্তরীক্ষের খেলা হিসাবে ঘুড়ি নিয়ে মোটামুটি বিশদ আলোচনায় আমরা চলেছি তার তথ্যভিত্তির দিক শহর কলকাতা। গ্রামবাঙলার আপামর জনসাধারণের খেলার সঙ্গে স্বভাবতই

এর পার্থক্য আশমান জমিন্। অর্থাৎ শিক্ষিত পটুত্বের লক্ষণ যা শহরসংস্কৃতির বিশিষ্টতা তারই ইতিকথা বর্ণনায় এই মুহূর্তে আমরা যেতে চাইছি।

চীন কাগজ ও চাঁচারি দিয়ে তৈরী বিভিন্ন আকারের ঘুড়ি আকাশে উড়িয়ে সুতো, লাটাই ও হাতের খেলা চলে বিষম উত্তেজনায়। বাজপাখীর মত দৃষ্টির তীক্ষ্নতা, কুকুরের মত ধৈর্য, স্ত্রীলোকের মত উপস্থিতবুদ্ধি আর অঙ্ক বিজ্ঞানীর মত বিবেচনা এই বিজ্ঞানভিত্তিক শিল্পকর্ম সমন্বিত খেলার অবশ্য সহচর। অনেকে মনে করেন প্রাচীনকালে চীনদেশে প্রথমে ঘুড়ি খেলার সূত্রপাত হয়, ক্রমে কোরিয়া, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া থাইল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে এ খেলার বিস্তৃতি ঘটে। চীন ও জাপানে প্রায় এক মিটার বৃহৎ ঘুড়ি ওড়ানো হয়ে থাকে। ভারতবর্ষে এই ঘুড়িকে ঢাউস বলে। ঢাউস ছাড়া পান্তা, তাওয়া, ছয়দশ, আড়া, কলিদার আড়া, ডিজাইনী প্রভৃতি নানা জাতের ঘুড়িও ওড়ানো হয় এদেশে। তিব্বতে খাঁচার আকারের বৃহৎ ঘুড়ি দুর্গমস্থানে মানুষ পরিবহনে



সক্ষম বলে শোনা যায়। আবহাওয়া তথ্য সংগ্রহ করার কাজে, সংবাদ পরিবেশনে এমন কি যুদ্ধের সময় ইঞ্জিনিয়ারীং সংক্রান্ত কাজেও ঘুড়ির ব্যবহার হয়ে আসছে। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন এই ঘুড়ির মারফৎ মেঘে অবস্থিত বিদ্যুতের সন্ধান পান। ১৯০১ সনে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় উড়োজাহাজে ওড়ার আগে ঘুড়ি উড়িয়ে আবহাওয়ার সংবাদ নিয়েছিলেন আকাশের। জাপানের

হামামাট্সর (Hamamatser) সহরে ঘুড়িখেলা উপলক্ষে নাকি জাতীয় ছুটি উদযাপিত হয় ঘুড়িখেলার মরশুমে খেলারম্ভের দিনটিতে।

প্রাচীনকাল থেকে ভারতে ঘুড়ির প্রচলন থাকলেও মুসলমান বা নবাবী আমলে খেলাটি অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কলকাতা শহর প্রতিষ্ঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এখানে ঘুড়ি খেলা সুরু হয়ে যায়। এবং এখান থেকেই ঘুড়ি খেলার নানা ঘরাণার উৎপত্তি হয়। ঘুড়িখেলার উৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে চলে নানাবিধ কায়দা। একে অপর অপেক্ষা যে বেশী ওস্তাদ বা পটু এটা প্রমাণের জন্য বিভিন্ন মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি কাজ করে চলেছ। মাঞ্জা ছাড়া সাদা সুতোয় বাবুযুগের ঘুড়ির প্যাঁচ, ঘুড়িতে নোট সেঁটে কায়দা বা প্রতিপত্তি দেখান সে সময় অহরহই চলছিল।

কোম্পানীর আমলে লখনউর নবাবের খিদিরপুরে নির্বাসনের পর মেটিয়াবুরুজ অঞ্চল প্রায় ছোটখাট লখনউয়ে পরিণত হয়েছিল। ক্লাসিক্যাল গানের সঙ্গে সঙ্গে লখনউ ঘরাণার ঘুড়িখেলাও এখানে চলে আসে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এলাহাবাদ ঘরাণার খেলাও সুরু হয়ে যায়। বাবুযুগের সৌখিন ঘরাণা তো ছিলই। মেটিয়াবুরুজের শাহ্ কলকাতা আসার পর থেকে নবাবী ঘরাণারও উপস্থিতি ঘটে। নবাবী ঘরাণা বলতে আমরা লখনউ ঘরাণাকেই বলতে চেয়েছি। এ ঘরাণায় চলে হাতের কাজ বা টক্কিবাহার। এলাহাবাদ ঘরাণায় চলে লাটাইয়ের কাজ। লখনউ ঘরাণায় আছে হাতের কারুকার্যভরা শিল্পকাজ, এবং এলাহাবাদ ঘরাণায় আছে সুতো হাতে না নিয়ে লাটাই খেলার বাহাদুরী। প্রত্যেক খেলার মতই এ খেলায়ও প্রত্যেক যোগ্য খেলোয়াড়ের নিজস্ব স্টাইল আছে, প্যাঁচেরও নিজস্ব ঢঙ আছে। ঘুড়ির প্যাঁচের কতগুলো স্তর আছে। যেমন—ভলকা, ডোরছোড়, টাইট, ঢিলা, খিঁচ, আরখিঁচ, গদ্দা প্রভৃতি। এই প্রত্যেকটি স্তরের নামের বিশেষ বিশেষ অর্থ আছে, যেমন খুব আলগা দেওয়া বা সুতো ছেড়ে যাওয়া, একটু একটু সুতো ছাড়া, আস্তে আস্তে সুতো ছেড়ে দেওয়া, হঠাৎ সুতো ধরে টানা, উপর থেকে কোপ বা চিলের মত ছোঁ মারা, পাশ থেকে টানা বা ছোবল মেরে ঘুড়িকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা ইত্যাদি। ভোকাট্টাই আসল কথা। ঘুড়ির চরিত্র চিত্রণ করে নানাজনে নানা কবিতা লিখেছেন। চমৎকারএকটি কবিতা উপহার দিয়েছেন বন্ধুবর রূপদর্শী। সে কবিতা থেকে একটি পংক্তি উধৃত করছি—'আমি একখানি ঘুড়ি, তোমার সুখে তুমি ওড়াও, আমার সুখে আমি উড়ি। ঘুরিফিরি এদিক সেদিক যাই বাজের সঙ্গে বাজী মারি আর চিলকে পাশ

কাটাই।' নবাবী আমলে হারেমের বিবিরা ঘুড়ি ওড়াতেন বার্তা বিনিময়ের জন্য। পাখির দলের নেতা রূপচাঁদ পক্ষী মাঞ্জাছাড়া সুতোর প্যাঁচে এমনই পারদর্শী ছিলেন যে তিনি যখন তাঁর স্ত্রীর ভয়ে বান্ধবী সন্দর্শনে অপারগ হলেন তখন বান্ধবীর আর্থিক অভাব অনটনের কথা অনুমান করে ঘুড়িতে নোট সেঁটে বান্ধবীর কাছে পাঠাতেন, এবং অনুরূপভাবে বার্তাবিনিময় করতেন। এই ধরণের বার্তাবিনিময় ছাড়া দৌত্যকর্মেও ঘুড়ির ব্যবহার দেখা যায়। ঘুড়ির দৌত্যকার্যের ঘোষণাযুক্ত একটি বার্তা লোকসঙ্গীতের মধ্যে চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে—'ঘুড়ি হে যাও গো তুমি প্রিয়ার খোঁজে। মরমের যত কথা বল গিয়ে নীরবে। কত আমি সেধেছি, কত আমি কেঁদেছি, তবুও পাই নি স্থান সে নিঠুর মনে। ঘুড়ি হে যাও গো তুমি, প্রিয়ার বদন চুমি, আমা হয়ে বলো কথা অশ্রুসিক্ত লোচনে। কেঁদে কেঁদে আঁখি রাঙা, হৃদয়ের বৃন্ত ভাঙা, তোমারে নিশ্চয় হেরি উপজিবে দয়া মনে।'

প্রিয়তমা দারুণ অন্তর্বেদনায় ভুগছেন। পাচ্ছেন না প্রিয়তমের কোন সংবাদ। তাই তিনি একখানি ঘুড়ি আকাশে উড়িয়ে দিলেন প্রিয়তমের সংবাদ সংগ্রহ করতে। দীর্ঘদিন থেকে ঘুড়ি এইভাবে নানা জনের নানা কাজের সহায়তায় এসেছে, ক্রীড়ামোদী ও খেলোয়াড়দের মনোরঞ্জন করে চলেছে। সমাজের নানা উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে ঘুড়িও এগিয়ে গেছে। সামাজিক প্রয়োজনের চাহিদানুযায়ী নিজে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিজের স্থান করে নিয়েছে। সে স্থান করে নেবার জন্য ঘুড়িকে নির্ভর করতে হয়েছে ক্রীড়া-



মোদীদের উপর, ঘুড়ি যাঁরা ওড়ান সেই সব সারথীদের উপর। ঘুড়িকে, নবাবী মেজাজ, রাজারাজড়াদের খেয়াল, বাবুদের হুজুগ সবকেই মানিয়ে নিতে হয়েছে, মানিয়ে নিতে হয়েছে সাম্প্রতিক রেওয়াজকেও। কারণ, নবাব, জমিদার ও বাবুদের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই চলে গেছে তাঁদের মোগলাই মেজাজ। নতুন ধনিক শ্রেণীর, নতুন উৎসাহী ও উদ্যোক্তাদের নতুন মেজাজের

সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে ঘুড়ি তার স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। রেখেছে বলেই সুপ্রাচীন কালের সে হেঁয়ালী আজও তাজা, আজও সরব : 'বেগে ধায় রথখান না চলে এক পা। না চলে সারথি তায় পসারিয়া গা ॥ হিঁয়ালী প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ দেখি মতি। অন্তরীক্ষে যায় রথ ভূতলে সারথি ॥' অথবা, 'নদীরা সব কূল ছাপিয়ে বন্যা যখন ছলকায়। শুধুমাত্র একটি প্রাণী আশ মিটিয়ে জল খায়' ॥ ঘুড়ির চরিত্র বর্ণনায় এইসব হেঁয়ালী মস্তিষ্ক চর্চা এবং চিন্তাভাবনা বাড়াতে অদ্বিতীয়।

তৎকালীন ঘুড়ির সারথীদের একজন ছিলেন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ম্যাক-সুইনি। ইনি বিশ শতকের গোড়ায় সারা কলকাতা কাঁপিয়েছেন। আরেক জন ছিলেন চেটার। ইনিও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। চেটারের খেলা জমত তালতলার কাল্লুর সঙ্গে। এদের খেলা নিয়ে জুয়াও চলতো। চেটার ও ম্যাকসুইনি নিপুণ খেলোয়াড় ছিলেন। তাঁদের হারাতে পারেন এমন খেলোয়াড় সে সময় ছিল না বললেই চলে। ওঁদের খেলা নিয়ে বাজী ধরা হতো। এই সংবাদ যখন ওঁরা জানতে পারলেন তখন চেটার কাল্লুর কাছে, কিংবা ম্যাকসুইনি চেটারের কাছে হরবখতই হার মানতেন। খেলার বাহাদুরীর জন্য নয়, পূর্বের ব্যবস্থা অনুযায়ী অর্থাৎ ঘুষ বা চাঁদি রূপার মহিমায়।

চেটার ও ম্যাকসুইনির প্যাঁচ পরবর্তীযুগে অনেক অভিজাত ঘুড়ি খেলোয়াড় তৈরী করতে সহায়তা করেছে। এঁদের মধ্যে একজন হলেন বৌবাজার মধুগুপ্ত লেনের শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র ধর। যতীনবাবুর ভাই শ্রীমনি ধরও ঘুড়িখেলায় চ্যাম্পিয়ান ছিলেন। দেড় হাত সুতোর মধ্যে ঘুড়ির প্যাঁচে এমন মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন তিনি যে ঘুড়ি খেলোয়াড় ও ঘুড়ি রসিকদের কাছে তিনি দেড় হাতী মনি ধর নামে সুপরিচিত। এই ধর ব্রাদার্সের ঝরণা কলমের ব্যবসায় তখন দারুণ রবরবা। ব্যবসাটি এখনও আছে মহাত্মা গান্ধী রোডের সেই পুরানো জায়গাতেই। যতীনবাবু নিজেই সে ব্যবসা দেখাশুনা করেন। আর মনিবাবু রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে বেড়ান আদ্যাপীঠের চাঁদা সংগ্রহ করতে। যতীনবাবু যে ঘুড়ি ওড়াতেন সে ঘুড়ি তিনি নিজেই তৈরী করতেন। ঘুড়ির ডিজাইনে যতীনবাবুর কৃতিত্বের কথা সকলে এক কথায় মেনে নেন। তাঁর ঘুড়ির ট্রেড মার্ক ছিল 'ডি' এবং তা সব সময়েই মেচোয়ালি বা কালিদার ঘুড়ি।

ঘুড়ির খেলোয়াড় বলেই নয় ঘুড়ির ব্যবসায়ী হিসাবেও কাল্লু আর নাজিরের খুব নামডাক ছিল। কলকাতার ঘুড়ি ব্যবসায়ীদের হাতেখড়ি পার্কসার্কাসের মুন্সীজীর কাছে একথা কলকাতার তাবৎ ঘুড়িওয়ালা একবাক্যে স্বীকার করেন।

যতীনবাবুও ঘুড়ি তৈরীর কাজ ও কারুকার্য শেখেন মুন্সীজীর কাছে। পরবর্তীকালে নিজের অধ্যবসায় ও সাধনা দিয়ে ঘুড়ির নানা ডিজাইন ও উন্নতি বিধান করেন তিনি। মুন্সীজী বিশ শতকের গোড়ার দিকের লোক। তাঁর সময় তিনি শুধু ঘুড়ির জগতেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না, সঙ্গীত জগতেও সুপরিচিত ছিলেন। তিনি লিণ্ডসে স্ট্রীট পাড়ার জনৈক ওস্তাদ সঙ্গীতজ্ঞের প্যারেদার ছিলেন। পরলোকগত কালীপদ পাঠক ছিলেন মুন্সীজীর গুরুভাই। টপ্পা গানে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন মুন্সীজী। তিনি মাঞ্জা সুতো, ঘুড়িতৈরী ও লড়াইয়েও চ্যাম্পিয়ান ছিলেন তাঁর সময়ে।

একটি পা-বিহীন ভানু দত্ত ঘুড়ি চ্যাম্পিয়ানদের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য নাম। কলুটোলার দত্তবাড়ীর নুটু (বিহারী) দত্তও ঘুড়ি খেলোয়াড় হিসাবে স্বনামধন্য ছিলেন। ধর্মতলার কাসেম ছিলেন আরেকজন চ্যাম্পিয়ান। ১৯২৫-৫০ প্রায় পঁচিশ বছর ধরে ঘুড়ি তৈরী ও মাঞ্জায় মাতব্বরী করেছেন এঁরা সকলেই। মুন্সীজীর আশীর্বাদপুষ্ট কাসেম গৃহিণীপনায় পটু ছিলেন বলেই সুদীর্ঘদিন তাঁর মাতব্বরী বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঘুড়ি ব্যবসায়ীদের মধ্যে এখন একটি উল্লেখযোগ্য নাম মীরজাপুরের কচি বা কোচে। কোচে প্রতিযোগিতামানের ঘুড়ি তৈরী করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। স্মরণীয়, আধুনিকতার ছোঁয়া ঘুড়ির রাজ্যেও লেগেছে। তাই এখন প্রচুর পরিমাণে প্লাস্টিকের ঘুড়ি তৈরী হয়ে চলেছে। আনন্দের বিষয়



যে প্লাস্টিকের ঘুড়ি রপ্তানি করে ভারতবর্ষ সম্প্রতি উল্লেখযোগ্য বিদেশী মুদ্রা অর্জন করতে পারছে।

গোড়ায় এখনকার প্রতিযোগিতার মত নিয়মের এত বাঁধন ছিল না। সাধারণতঃ ঘুড়ি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে বিশ্বকর্মা পূজার পরে। বিশ্বকর্মা পূজার সঙ্গে ঘুড়ি প্রতিযোগিতার কোন

সম্পর্ক নেই। গত দুই দশকের মধ্যে উত্তর কলকাতায় দুটি উল্লেখযোগ্য ঘুড়ি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। একটি বাগবাজারের নন্দবাবুর বাড়ীতে। অপরটি শ্যাম স্কোয়ারে (সুভাষ বাগ)। এখানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন শ্রীভানুদত্ত এবং অতিথি খেলোয়াড় ছিলেন শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র ধর। ধর মশাই কিন্তু এদিন ঘুড়িখেলায় শিষ্যের কাছে পরাজয় বরণ করেছিলেন।

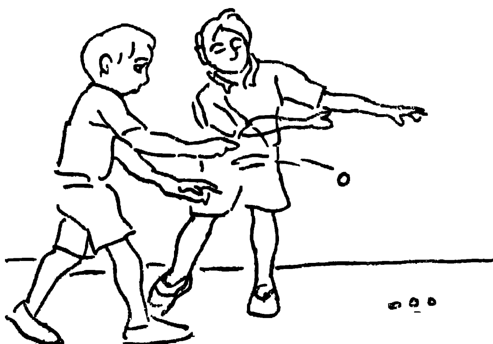
আকাশে ঘুড়ি উড়তে দেখে ঘুড়ির ষ্ট্যাণ্ডার্ড যাচাই করার মত মানসিকতা বা শিক্ষা একদিনে আসে না। সেজন্য ঘুড়িখেলার সঙ্গে জড়িত সমস্ত লোককে একনিষ্ঠ আন্দোলন করতে হয়েছে। অবশ্য সে আন্দোলন সাম্প্রতিক আন্দোলনের পথ ধরে অগ্রসর হয়নি। তাকে অগ্রসর হতে হয়েছে খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি নিয়ে। ক্লাব ও সংগঠন তৈরী করে তাঁরা ঘুড়ি সম্পর্কে সচেতন করেছেন তাঁদের যাঁরা এ খেলায় নিরুৎসাহিত ছিলেন, বা এ খেলা সম্পর্কে যাঁরা অনীহা প্রকাশ করতেন। ঘুড়িখেলার প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে তাঁরা বক্তৃতা দিয়েছেন, ঘুড়ি তৈরী, মাঞ্জা, প্যাঁচ প্রভৃতি শিখিয়েছেন ; আরও অনেকভাবে জনতাকে আকৃষ্ট করেছেন এবং করছেন কাইট ক্লাবের কার্যক্রমের সাহায্যে।

ধরমতলা ইউনিয়ন কাইট ক্লাব, ডিকসন কাইট ক্লাব, মেটেবুরুজ কাইট ক্লাব ঘুড়ি খেলার মান উন্নয়ন করেছেন। মেটেবুরুজ কাইট ক্লাবের ছিল নবাবী স্বীকৃতি। সর্বশ্রী যতীন ধর, ভানু দত্ত, কাসেমআলী প্রভৃতি যখনই ধরমতলা ইউনিয়ন কাইট ক্লাব গড়লেন তখনই এ ক্লাব জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। ডিকসন কাইট ক্লাবের বিষ্ণুবাবু, মনিবাবু (ধর), গণেশবাবু প্রভৃতি তাঁদের ক্লাবকে জনপ্রিয় করে নিজেদেরও জনপ্রিয় করেন। মৌলালী ও তালতলার চেটার এবং কাল্লু ও ইলিয়ট রোডের ম্যাকসুইনি কোন ক্লাবের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন বলে শোনা যায় নি। তাঁরা সব জায়গায়ই 'খেপ' খেটে বেড়াতেন। জুয়ারীদের পসার করে দিয়ে নিজেদের পকেটও ভরাতেন অবিশ্বাস্যভাবে খেলার পরিণতি ঘটিয়ে। অর্থাৎ ইচ্ছাখুশীমত খেলায় হেরে যেতে তাঁদের মোটেই বাধতো না যদি সে হারায় পয়সা আসত।

ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের প্রতিযোগিতায় কখনো 'সোলো' বা একের সঙ্গে একের, কখনো দঙ্গল লড়াই বা অধিক ব্যক্তির সঙ্গে একাধিক ব্যক্তির লড়াই অনুষ্ঠিত হয়। স্বভাবতই প্রত্যেকটি কাইট ক্লাব চেষ্টা করেন নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে। একক খেলোয়াড়েরাও এখানে অংশ নিতে পারেন। কলকাতার ঘুড়িখেলার মান এক সময় এত উচ্চস্তরে উঠেছিল যে ওদের নামডাক শুনে

রামদাসবাবু কাইট ক্লাব অব লখনউ-এর তরফ থেকে ভাঁয়রোপ্রসাদ বাঙলা দলকে আহ্বান জানালেন লখনউয়ে ঘুড়ি প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে। বাঙলা দল এ আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করলেন। বাঙলাদলের এ খেলায় নেতৃত্ব করেছিলেন শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র ধর। স্বীকার করতেই হবে যে খেলায় বাঙলাদল ৩-০তে হেরে আসেন। বাঙলাদলের অন্ততঃ দু'জন খেলোয়াড়, হেরে যাওয়া সত্ত্বেও এমন চমৎকার খেলা খেলেছিলেন যে, তাঁদের প্রচুর মাসোহারা দিয়ে 'কোচ' হিসাবে চাকুরী দিতে চেয়েছিলেন অনেক ঘুড়ির পৃষ্ঠপোষক ধনীসম্প্রদায়। এ খেলায় ভাঁয়রোপ্রসাদ বাঙলাদলকে অভিবাদন জানাতে এক অবিস্মরণীয় স্যালুট জানিয়েছিলেন, যা কিছুতেই ঐ খেলার দর্শকবৃন্দ ভুলতে পারবেন না। পরাজিত বাঙলাদলের যে দু'জন খেলোয়াড় কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন রায়গড়ের মহারাজা তাঁদের দু'জনকে তৎকালেই হাজার টাকা করে মাসোহারা দিয়ে তাঁর দলের বাঁধা খেলোয়াড় করে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাঙলাদলের সেই দুই খেলোয়াড় রায়গড়ের রাজার গোলামী করতে তখন রাজী হননি। তাঁরা বাঙলারই সেবা করে চলেছেন।

কাইট ক্লাবের ওস্তাদ ও খেলোয়াড়গণ ছাড়া সৌখিন ঘুড়ি খেলোয়াড় ও রসিকদের সংখ্যাও বড় কম নয়। সৌখিন ঘুড়ির লোক বলতে সর্বপ্রথম যে নাম মনে পড়ে তিনি মেটেবুরুজের শাহ্, নবাবী মেজাজ ও রক্তের বহনদার।



দ্বিতীয়, রায়গড়ের মহারাজা যিনি নিজে দল তৈরী করেছিলেন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ঘুড়ি খেলোয়াড়দের নিয়ে। তাছাড়া ছাতুবাবু, লাটুবাবু, বাবু শিবচরণ, দুর্গাচরণ বাবুও কম যান না। বাগবাজার নিয়োগী বাড়ীর হরি নিয়োগীও একটি অবশ্য উল্লেখনীয় নাম। আরও অনেক ব্যক্তি আছেন, কিন্তু এখানে সেই সব নামোল্লেখের তেমন সুযোগ নেই। তবে তৎকালীন বাবুর লক্ষণ

সম্বন্ধে একটি ছড়া—'মানিয়া বুলবুল আখড়াই গান, খোশপোষাকী পশমী দান। আড়ি ঘুড়ি কানন, এই নবধা বাবুর লক্ষণ' উল্লেখের দাবী রাখে। কিছুদিন পূর্বেও মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিতসমাজের বৃহদংশ এ খেলাকে ছোটলোকের খেলা মনে করে তাঁদের সন্তান সন্ততিদের ঘুড়িখেলায় যোগদান করতে দিতেন না। যদিও উচ্চবিত্ত, বাবু এবং নিম্নশ্রেণীর লোকেদের কাছে এ খেলার বহুল প্রচলন ছিল তখনও। মধ্যবিত্ত সমাজ এখন এ খেলাকে মানিয়ে নিয়েছে।

ঘুড়ির মতই অন্তরীক্ষের খেলা বুলবুলির লড়াই, পায়রার লড়াই, ফানুস ওড়ানো প্রভৃতি। প্রাচীনকাল থেকে বাঙলাদেশের সামন্তরাজারা অন্তরীক্ষের খেলা—সজীব প্রাণী পায়রা নিয়ে খেলায় মেতেছেন। মধ্যযুগের আলো-আঁধারি দিনে সংবাদ বা সন্দেশ প্রেরণে যেমন এই পায়রা কাজে লেগেছে তেমনি কোন কোন সামন্তরাজ পরীক্ষামূলকভাবে অন্যান্য পাখির সঙ্গে মিশিয়ে দোআঁশলা জাতের বিভিন্ন পায়রার জন্ম দিয়েছেন। আজও সহরে, গঞ্জে, গ্রামাঞ্চলে পায়রা দিয়ে অন্তরীক্ষের খেলা চলছে। চলছে ম্যাকাওলের সঙ্গে ঘুঘু মিশিয়ে নতুন জাতের ক্ষুদে পায়রা সৃষ্টির কাজ। আজও ছাদের ওপরে বাঁশ বেঁধে 'বোম্' তৈরী হচ্ছে পায়রা খেলবার জন্য। এখনও গোরোয়াজের জোড়াকে পাঁউরুটি, রাবড়ি খাইয়ে হাজার মাইল দূরে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতা হয় পায়রায় পায়রায়। তাই পায়রার প্রতিযোগিতার দলও বড় কম নেই। প্রসঙ্গত, লোকশ্রুতির চন্দ্রকেতুরাজের পারিবারিক বিপর্যয়ে পায়রার ভূমিকা স্মরণ করা যেতে পারে। রাজা চন্দ্রকেতু যুদ্ধে বিজয়ী হলেন, কিন্তু রাজবাড়ীতে সমাচার পাঠালেন যে পায়রা দিয়ে তা পরাজয়ের প্রতীক। উৎফুল্ল, রণজয়ী রাজা শ্রান্তক্লান্ত হয়ে স্বজন-পরিজনদের সামনে যখন হাজির হলেন তখন সেই পরিবারে আর কেউ জীবিত নেই বিজয়ীকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। শত্রুর হাতে নিগৃহীত হবার আশঙ্কায় অনেক আগেই তাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন। রাজা নিজেই হলেন এই বিপর্যয়ের কারণ। এই পায়রা আবার যক্ষিণী এবং আরো পরবর্তীস্তরে ধনজন কল্যাণদায়িনী লক্ষ্মীর সঙ্গেও জড়িয়ে আছে। সেদিনও বর্ধমানরাজের বাড়ীতে পায়রার সমাদর ছিল। বোঝা যায় ওঁরা পায়রার সঙ্গে ঐশ্বর্যের একটা আত্মীয়তা বা নৈকট্য খুঁজে পেয়েছিলেন। কলকাতা বা মফঃস্বলে ভোররাত্রে খাবারের দোকান খোলার সময়ে পালিত রীতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পায়রাকে তুষ্ট না করে কোন দোকানী খরিদ্দারকে খাবার জোগান দেয় না। সম্ভবত পায়রা লক্ষ্মী-বাহন বলে অথবা আয়ুর্বেদমতে পায়রার মাংস অত্যন্ত

গরম বলে সাধারণতঃ তা অভক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়। যাইহোক, বাবুদের পৃষ্ঠপোষিত বহু খেলা জনমনে গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। কিন্তু স্থলের খেলা মুরগী লড়াই এখনও আদিম-উপজাতি গোষ্ঠির শ্রেষ্ঠ খেলা সমূহের অন্যতম। মুরগীর পায়ে ছুরি, কখনও কখনও গলায় ঘন্টা বেঁধে দিয়ে লড়াই-এর জন্য মাঠে ছেড়ে দেওয়া হয়। সে সংগ্রামে যার মুরগী অপরের মুরগীকে আহত করতে পারবে আহত মুরগী হবে তার। ভয়ানক উত্তেজনাপূর্ণ এ খেলা শুধু বাঙলায়ই নয়, বাঙলার বাইরেও সমান জনপ্রিয়। ষাঁড়ের লড়াইও একটি চমৎকার খেলা। কৃষিজীবী মানুষের খেলা হাডুডু বা কপাটি। এ খেলা সারা বাঙলার যুব সমাজের জনপ্রিয় খেলা। কিশোর-কিশোরীরাও এ খেলা খেলে। কিশোর-কিশোরী হাডুডু খেলতে গিয়ে নানাবিধ ছড়া আওড়ায়। যেমন—'চুরে গাই, মধু কোথা পাই। মধুর গন্ধে ছুটে ছুটে যাই', অথবা 'হা-ডু-ডু খেলতে গিয়ে কুড়িয়ে পেলাম বেল, বেলের ভিতর লেখা আছে হা-ডু-ডু খেল, হা-ডু-ডু খেল, হা-ডু-ডু খেল।' বা 'হা-ডু-ডু খেলতে গিয়ে কুড়িয়ে পেলাম সিকি, সিকির উপর লেখা আছে রামবাবুর টিকি, রামবাবুর টিকি, রামবাবুর টিকি' প্রভৃতি। এ খেলা দমের খেলা। এ খেলাকে অনেকে ডুগডুগ, ছিছ্‌ছুয়ারাণী খেলাও বলে। হা-ডু-ডু খেলায় পাঁচ, সাত কি নয় জনের দুটি দল এবং একটি কোট্‌ বা দুই ঘরবিশিষ্ট নির্দিষ্ট স্থানের দরকার। দরকার রেফারীরও। অনেক সময় কোদাল দিয়ে মাটি কেটে কোটের বা ঘরের সীমানা ঠিক করা হয়। অনেক সময় গুঁড়ো চূণ দিয়ে দাগ কেটেও ঘর করা হয়। দুই ঘরের মাঝে থাকে সীমানা। সীমাবদ্ধ



স্থানের মধ্যে বিপক্ষদলের খেলোয়াড়দের ছোঁবার জন্য তাদের সীমাবদ্ধ স্থান থেকে যে কোন ছড়া অথবা হা-ডু-ডু-ডু বা ডুগ্‌-ডুগ্‌-ডুগ্‌ অথবা কিৎ-কিৎ-কিৎ-কিৎ বা ছি-ই-ই শব্দে ধাবিত হয় একজন খেলোয়াড় শ্বাসরোধ করে বা এক নিঃশ্বাসে ছড়া বা শব্দ আওড়াতে আওড়াতে। প্রতিপক্ষ দলের যাকে সে ঐ অবস্থায় ছুঁতে পারবে সে মারা পড়বে। এভাবে ছুঁয়ে যদি সে নিজের ঘরে

ফিরে আসতে না পারে অর্থাৎ বিপক্ষদলের ঘরের মধ্যে কোন অবস্থায় শ্বাস বা দম নেয় এবং সে অবস্থায় বিপক্ষদলের কোন খেলোয়াড় তাকে ছুঁয়ে দেয় তবে সে মারা যাবে বা মোর হবে। খেলোয়াড় মারা যাক কি মেরে আসুক, পরবর্তী দানে অনুরূপ অবস্থায় বিপক্ষদলের একজন এপক্ষের লোকেদের মারতে আসবে। এভাবে কোন খেলোয়াড়কে মারতে পারলে নিজদলের মৃত খেলোয়াড় বেঁচে যাবে, সে আবার খেলায় যোগদান করবে। এইভাবে খেলতে খেলতে যে দলের সব খেলোয়াড় নিঃশেষে মারা যায় তারা পরাজিত হয়। খেলার সময় ঘরের বাইরে গেলেও খেলোয়াড় মারা পড়ে। এ খেলার আরও কয়েকটি ছড়া— 'ছি-ছি খেলা আচ্ছা খেলা, দশ বারোটা মাইর‍্যা ফেলা। দশবারোটা এ্যাং ব্যাং। কুড়ালে কাটিল ঠ্যাং' বা 'ছি ধর কটরা ধর, বাইন্যা-বাড়ীর পুলা ধর। পুলার হাতে বল্লার চাক, ওরে পুলা তুই বাপ ডাক' ইত্যাদি। বুড়ী-বসন্ত, ছি-বুড়ী বা ছি-খেলাও দমের খেলা। সাধারণতঃ এ খেলা মেয়েদের। এ খেলায় কোন কোট বা ঘর আঁকা হয় না, তবে মোটামুটি একটা সীমানা ধরা হয়ে থাকে, যে সীমানার মধ্যে খেলোয়াড়েরা যেতে পারবে তার বাইরে নয়। এ খেলায় থাকে একজন বুড়ী। খেলোয়াড়দের মধ্য থেকেই কাউকে বুড়ী নির্বাচিত করা হয়। বুড়ী সীমানার শেষপ্রান্তে বসে থাকবে। বুড়ীর গা-ছুঁয়ে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকবে একজন খেলোয়াড়। অন্যেরা সব সীমানার এখানে সেখানে গিয়ে পালাবে। খেলা সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ীর কাছে দাঁড়ানো খেলোয়াড় ছি-ই-ছি শব্দ করতে করতে বিভিন্ন স্থানে লুকানো খেলোয়াড়দের ছুঁতে যাবে। সে যাকে ছুঁয়ে একই দমে আবার বুড়ীর কাছে ফিরে আসতে পারবে সে মারা যাবে অর্থাৎ তখন সে চোর হবে। এই ভাবে ছুঁয়ে বুড়ীর কাছে ফিরে যাবার মধ্যে যদি সে দম হারিয়ে ফেলে এবং সে দৌড়ে বুড়ীর কাছে ফিরে যাবার আগেই অপর কেউ যদি তাকে ছুঁয়ে দেয় তবে সে-ই পুনরায় চোর বা মোর হবে। সে যাকে মারতে পারবে তখন সে আবার অনুরূপ ভাবে অপরকে মারবে বা নিজে মারা পড়বে।

টোক্কাটুক্কি বা নাম পাতাপাতি খেলা চমৎকার অনুভূতির খেলা। এ খেলা সাধারণতঃ মেয়েদের। সাত-আট বছর বয়সের ছেলেরাও এ খেলা খেলতে পারে মেয়েদের সঙ্গে। অন্তত দশ-বারো জন লোক না হলে এ খেলা জমে না। এ খেলায় সমপরিমাণ লোক দুটি দলে ভাগ হয়ে যায়। দু'দলে দু'জন রাজা থাকে। রাজাদ্বয় স্ব স্ব দলের লোক নিয়ে দুটি সীমান্তে বসে। রাজাদের নির্বাচন মোটামুটি সর্বসম্মতিক্রমেই হয়। কিন্তু রাজাদের দল

গঠন অত সহজে হয় না। রাজা ঠিক হয়ে গেলে যে কয় জোড়া খেলোয়াড় থাকে তাদের জোড়ায় জোড়ায় কাল্পনিক নাম পাতিয়ে আসতে বলা হয়। সে নাম খেলোয়াড় দু'জনেই মাত্র জানে। ধরা যাক দু'জন খেলোয়াড় তাদের নাম রাখল যথাক্রমে দূর্বা ও ফুল। নাম পাতিয়ে এসে ওরা একজন রাজাকে জিজ্ঞেস করে—'কি চাও, দূর্বা চাও না ফুল চাও'। রাজা হয়ত বলে 'ফুল চাই'। তখন ফুল নামীয় খেলোয়াড় এক রাজার দলে আসে, দূর্বা অন্য দলে চলে যায়। এইভাবে দল গঠন হয়ে গেলে দু'জন রাজা তাদের দলের লোকেদের নিয়ে নির্ধারিত স্থানে গিয়ে বসে। সেখানে উভয় রাজাই নিজ দলের লোকেদের একটা করে নাম রাখে। প্রথমে ঠিক করে একদল রাখবে ফুলের নাম। অপর দল ফলের নাম, বা অন্য কোন বিষয়ের নাম। উভয়দলকেই যাতে একই নামের বিভ্রাটে পড়তে না হয় তার জন্য এই সতর্কতা। তারপর বিপক্ষ দলের রাজা বিরোধী দলের একজনের চোখে আঙুল দিয়ে এমন ভাবে চেপে ধরে যাতে সে কিছু দেখতে না পায়। তখন নিজ দলের জনৈক খেলোয়াড়কে, ধরা যাক তার নাম গোলাপফুল, ডাকা হয় এই বলে—'আয়রে আমার গোলাপফুল'। সঙ্গে সঙ্গে গোলাপফুল নাম্নী খেলোয়াড় পা-টিপে-টিপে এসে চোখ-চাপা মেয়েটির কপালে একটি টোকা মেরে আবার পা-টিপে-টিপে নিজের বা কোন এক জায়গায় গিয়ে বসবে। সে বসে গেলে রাজা চোখ খুলে দেবে এবং বলবে-'বল তো দেখি কে টোকা দিয়েছে?' যদি ঠিক মত উত্তর দিতে পারে তবে সে এক লাফে যতটা আসতে পারে ততটা জায়গা এগিয়ে বসবে। যদি না পারে তবে যে টোকা দিয়েছিল সে এক লাফে যতটা পারে ততটা এগিয়ে যাবে। এইভাবে যতক্ষণ এক রাজার দল অপর রাজার জমি বা সীমানা দখল করতে না পারছে ততক্ষণ খেলা চলবে। খেলাশেষে বিজিত দলের রাজা পদ্মাসনের মত করে বসবে দু' পায়ের দুটো বুড়ো আঙুল শক্ত করে ধরে। পরাজিত রাজার লোকেরা তখন চ্যাং দোলার মত করে রাজাকে দোলাতে দোলাতে পরাজিত রাজার সীমানায় নিয়ে যাবে। নিয়ে যেতে যেতে ছড়া বলবে—'রাজা যায় হেলিতে দুলিতে, পানের পিচ ফেলিতে ফেলিতে' ইত্যাদি।

নানাবিধ ছড়া আওড়াতে আওড়াতে পাঁচগুটি খেলা হয়। পাঁচটি গুটি হাতে নিয়ে খেলোয়াড় নীচের ছড়াটি বলে আর এক একটি করে গুটি শূন্যে ছুঁড়ে দেয় আবার হাত দিয়ে ধরে ফেলে। শূন্যের গুটি ধরতে না পারলে খেলোয়াড় হেরে যাবে। ছড়ার নমুনা—'ফুলনা ফুলনা, ফুলনাটি, একেতো দুলনাটি,

তেলেনাটি। জামন, জামন জামনটি, একে তো জোড় জামনটি। সুসম সুসম সুসমটি, একে তো জোড় সুসমটি। কদম কদম কদমটি, একে তো জোড় কদমটী, বকুল বকুল বকুলটি, একে তো জোড় বকুলটি। তাড়িজম তাড়িজম তাড়িজমটি। একে তো চুপ। মুখ পচা মুখ পচা মুখ পচাটি। একে তো জোড় মুখ পচাটি। সাচ্চা বেগুন সাচ্চা বেগুন সাচ্চা বেগুনটি। একে তো জোড় সাচ্চা বেগুনটি। লণ্ঠ লণ্ঠ লণ্ঠটি, একে তো জোড় লণ্ঠটী। সারি খেল, গুটি বদল, গুটী বদলটী। একে তো জোড় সারিকেলটী। পঞ্চে পাকা। তোমার মুখ ঢাকা। ছয়-এ রেখা। সাতে শালিখ নাচে। আটে বাধা কাটে। নয়-এ নেব পোড়া। দশে পড়লো জোড়া। এগার এক রুলি। বারো ক্ষীর পুলি। তেরো তেছার কাটা। চৌদ্দ রুপার বাটা। পনের পান খিলি। ষোল ঝাঁকড়ি তুলি। সতের সতরঞ্চি। আঠার বাঁশের কঞ্চি। উনিশে লাখ, বিশে ঝাঁক।' নানা ধরণের গুটী খেলায় আছে নানা ধরণের ছড়া। স্থান বিশেষে একই ছড়ার নানা কথান্তরও শোনা যায়।

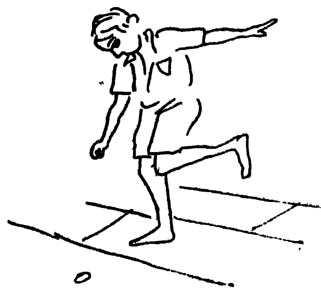
আরেকটী আনন্দপূর্ণ খেলা এলাডিং বেলাডিং। এ খেলারও সীমানা থাকে। দুটী দল থাকে। থাকে দু' দলের দু' জন রাজা। উভয় রাজার আছে নিজ নিজ সীমানা। এক এক রাজার দলের লোক স্ব স্ব রাজাকে ঘিরে হাত শিকল অবস্থায় ছড়া বলবে—'এলাডিং বেলাডিং সইলো, একটী খবর আইল'। অপর দিক থেকে অনুরূপ হাত শিকল করা রাজার লোকেরা বলবে—'কি খবর আইল'। প্রথমদল—'রাজা একটী বালিকা চাইল'। দ্বিতীয় দল—'কোন



বালিকা চাইল'। প্রথম দল—'কবিতা বালিকা চাইল'। দ্বিতীয় দলের কবিতা নাম্নী বালিকাটিকে তখন প্রথম দলের লোকেদের হাতে সমর্পণ করতে গিয়ে বলবে—'নিয়ে যাও নিয়ে যাও তোমাদের বালিকা'। প্রথম দল তখন বলবে—'দিয়ে দাও দিয়ে দাও কবিতা বালিকা।' কিন্তু দিয়ে দেওয়া হবে না, জোর করে নিয়ে যেতে হবে। জোর করে টেনে আনার জন্য প্রথম দল এগিয়ে যায়।

দ্বিতীয় দলও এগিয়ে যায় তাদের রুখতে। প্রথম দল কবিতা বালিকাকে নিয়ে যাবার জন্য টানাটানি সুরু করে। কবিতা বালিকাও যে তাকে টানছে তাকে টেনে আনতে চেষ্টা করবে। যার শক্তি বেশী সে দুর্বলাকে টেনে আনবে। তখন বিজিত দল বলবে—'আমরা বড় আনন্দিত হলাম।' পরাজিত দল বলবে, 'আমরা বড় দুঃখিত হলাম।' এইভাবে দুই দল থেকেই বালিকা টানাটানি চলবে। যারা সব বালিকা টেনে নিয়ে যেতে পারবে তারা খেলায় জিতবে।

উপেনটি বাইস্কোপ খেলাটিও চমৎকার। এ খেলায় দুজন দলনেত্রী হাত বাড়িয়ে পাঞ্জায় পাঞ্জা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। ওদের ঘুরে বাঙলা চারের মত করে মেয়েরা বা কিশোর ছেলেরা ঘুরবে। যখন ওরা ঘুরবে তখন দলনেত্রীদ্বয় ছড়া বলবে—'উপেনটি বাইস্কোপ। রাইটেন টেইস্কোপ। চুলটানা বিবিআনা। সাহেববাবুর বৈঠকখানা। আজ বলেছে যেতে। পান সুপারী খেতে। পানের ভিতর মৌরীবাটা। ইস্কাবনের ছবি আঁটা। ছোট ছোট যাদুমণি। যেতে হবে অনেকখানি। কলকাতার মাথা ঘষা। মেদিনীপুরের চিরুণী। এমন খোঁপা বেঁধে দেব। বেলফুলের গাঁথুনি। যার নাম রেণুবালা। বর আসবে চতুর্দোলা।' ছড়াটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে যে মেয়েটি দলনেত্রীর সম্মুখে পড়ে যাবে তাকে রেণুবালা হিসাবে ধরবে সকলে। তারপর তাকে ধরে নিয়ে যাবে রাজার কাছে। অনেক সময় এই খেলাই বারে বারে চলে। আবার অনেক সময় রেণুবালাকে কানামাছি করে সকলে পালিয়ে যায় আর বলে—'কাণামাছি ভোঁ ভোঁ যাকে পাবি তাকে ছোঁ।'



ছোট ছোট ছেলেরা মেয়েরা বুড়োবুড়ীর খেলাও খেলে। বুড়োবুড়ীর নাচও আছে। এ নাচ বা খেলার বাজনার বোল চমৎকার। বাজনার বোল—ধিনাক্ ধিনাক্ ধিনাক্ ধিনাক্ দিদিং, ধিন্নাক্ তিন্ তেনা। তিনাক্ তিনাক্ তিনাক্ তিনাক্ দিদিং, তিন্নাক তিন্ তেনা। বাজনার মধ্যে বুড়ো ও বুড়ীর সাজে সজ্জিত হয়ে আবির্ভূত হয় দুটি বালক বা বালিকা। বুড়োর হাতে

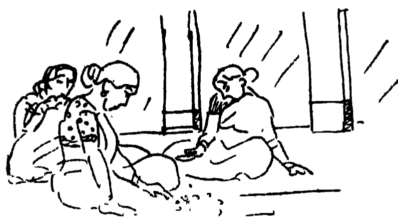
লাঠি, বুড়ীর হাতে খেংরা ঝাঁটা। বুড়ী এক কোণে জবুথবু হয়ে বসে আছে। তখন বুড়ো বলে—'ভাত রাইন্ধ্যা দাও তুমি, হাল বাইতে যাইব আমি।' বুড়ী—'ভাত রাইন্ধতে পারিব না, বাপের বাড়ীত যাইব আমি।' বুড়া—'বাপের বাড়ীত যাইবা তুমি, চুল ধরইয়া আনব আমি।' বুড়ী—'চুল ধরইয়া আনবা তুমি, লেছুর দিয়া থাকব আমি।' বুড়া—'লেছুর দিয়া থাকবা তুমি, কান্ধে করইয়া আনব আমি।' বুড়ী—'কান্ধে করইয়া আনবা তুমি, থু থু দিয়া পালাইবাম আমি।' বুড়া—'থু থু দিয়া পালাইবা তুমি, বানার নদীত ধুইবাম আমি।' বুড়ী—'বানার নদীত ধুইবা তুমি, জলের তলে পালাইবাম আমি।' বুড়া—'জলের তলে পালাইবা তুমি, জাল দিয়া ছাঁকব আমি।' বুড়ী—'জাল দিয়া ছাঁকবা তুমি, কাঁকড়ার গাথায় পালাইবাম আমি।' বুড়া—'কাঁকড়ার গাথায় পালাইবা তুমি, কোদাল দিয়া তুলবাম আমি।' বুড়ী—'কোদাল দিয়া তুলবা তুমি, ছনক্ষেতে পালাইবাম আমি।' বুড়া—'ছনক্ষেতে পলাইবা তুমি, আগুন দিয়া পুড়বাম আমি।' বুড়ী—'আগুন দিয়া পুড়বা তুমি, তোমারে থুইয়া মরবাম আমি।' বুড়া—'আমারে থুইয়া মরবা তুমি, তোমার সাথে যাইবাম আমি।' কিছুক্ষণ বিরতি। পরে বুড়ী আবার আসে মঞ্চে। এসে নাচের তালে তালে গান ও বাজনার সুরে বলতে থাকে—'হাইস্য না গো বাবুরা, বুড়া আমায় মারিছে। আমার কান কাটিছে। সেই কানে বুইড়্যা আবার দুল দিয়াছে।' এই ভাবে একে একে নাকের নোলক, পায়ের মল প্রভৃতি গহনা পাওয়ার কথা জানিয়ে দেয়। মারের চোটে তার যেসব অঙ্গে গহনা জুটেছে সেই সব অঙ্গ যে ভেঙেছে তাও জানিয়ে দেয় বুড়ী এই সময়। তারপরেই হয় খেলা সমাপ্ত। চারিদিকে ওঠে হাসির রোল।

কখনও কখনও কুলবৃত্তির সঙ্গে জড়িয়ে কোন কোন লোকক্রীড়া জন্ম নিয়েছে। গ্রামবাঙলায় বৈদ্য প্রধান অঞ্চলে পাতাখেলার ভূমিকা এই সূত্রে মনে আসে। প্রকৃতির অবদানকে কাজে লাগানোর জন্য বৈদ্যসন্তানরা প্রায়ই ভেষজ গুরুত্বসম্পন্ন গাছের পাতা চেনার এক খেলা খেলে থাকে, এ খেলারই নাম পাতাখেলা। বলাবাহুল্য, অন্যান্য সামগ্রীও (কুলবৃত্তির সঙ্গে জড়ানো) এই প্রক্রিয়ায় লোকক্রীড়ার সীমানা বৃদ্ধি করেছে।

শারীর ক্রীড়ার সঙ্গে মানসিক ক্রীড়ার যোগ অচ্ছেদ্য। হেঁয়ালী বা ধাঁধা-রচনা ইত্যাদিকে মানসিক ক্রীড়া বলা যেতে পারে। অন্যান্য ক্রীড়ার মত এই ক্রীড়ায়ও দু'পক্ষের দরকার এবং দু'পক্ষেরই সমান ভূমিকা আছে। এই দুই পক্ষে কখনও কখনও সমবয়সী ছেলেরা মেয়েরা আবার কখনও ঠাকুরদা-

ঠাকুরমা-নাতি নাতনি বা অন্য কেউ স্বচ্ছন্দে অংশ নিতে পারে। কিন্তু সকলের কাছেই প্রশ্ন ও উত্তরের ঢং একই। যেমন কারুর প্রশ্ন—'বলত এটা কি হবে?' 'ওপার থেকে এলো টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে। যদি টিয়ে মন করে, মাঠের মাটী চুর করে?' উত্তর অবশ্যই লাঙ্গল। অথবা 'উঠে পড়ে ডাণ্ডা সাপ। যে কইতে পারে তায় মেরা বাপ।' উত্তর ঢেঁকি। অথবা 'বাঘ নয় ভালুক নয়, আস্ত মানুষ গিলে খায়। বল তো দেখি কি হয়?' উত্তর জামা। 'কালো গরুর দেহখানি দুধ দেয় সেরখানি। গরু যখন হাম্বায় লোকে তখন চমকায়।' উত্তর মেঘ। 'আমার ভাই নিতাই যায় একশ একটা জামা গায়।' উত্তর কলার মোচা। 'তিন অক্ষরে নাম তার সর্ব ঘরে আছে। শেষের অক্ষর ছেড়ে দিলে কেউ যায় না কাছে। আগের অক্ষর ছেড়ে দিলে সর্বলোকে খায়। মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে রাম গুণাগুণ গায়।' উত্তর বিছানা। 'তুমিও খাও আমিও খাই। মুখ বাড়ালেই পেয়ে যাই। যতই খাই পেট ভরে না। বল না ভাই এ কি বালাই।' উত্তর চুম্বন। এইভাবেই খেলাধূলার মধ্য দিয়ে বাঙালী দৈহিক ও মানসিক ক্রীড়া ও অনুশীলনাদি করে যাচ্ছে সুপ্রাচীনকাল থেকে। 'হাসতে হাসতে বসলো নারী পরপুরুষের কাছে। হস্তাহস্তি কস্তাকস্তি ভিতর যাবার আশে। ভিতর গিয়ে শীতল হন। যে ভাব মনে করেন সে ভাব নন।' উত্তর শাঁখা পরিধান। শাঁখা পরিধান ও শাঁখারীর কৃত্যটিকে আপাত অশ্লীল শ্রাব্য ভাষায় ব্যক্ত করলেও এটি বাঙালী হিন্দু সধবার অন্যতম পবিত্র কর্মসমূহের এক।

শাঁখার সঙ্গে সিঁদুরের অচ্ছেদ্য যোগ বাঙলায়, তাই এখানে সিঁদুর খেলার আলোচনাও প্রাসঙ্গিক। বাঙালী জীবনে সিঁদুরের বিশিষ্ট ভূমিকা বিদ্যমান।



রক্তবর্ণ চূর্ণ-বিশেষ এই পদার্থ স্যন্দ+উরন থেকে উদ্ভূত। সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা ও কপালে সিঁদুরের টিপ নারী সৌভাগ্যের বা সধবা অবস্থার পাকা প্রমাণ। সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় করে রাখার জন্য বাঙালী রমণীর প্রচেষ্টার অন্ত নেই। তাই কোন সধবা নারীকে আশীর্বাদ করতে গিয়ে বলা হয়—'পাকা চুলে সিঁদুর পরো'। এবং কোন ব্রত অন্তে 'ব্রতিনী কি বর চান?'

'সিঁথের সিঁদুর মরায়ের ধান, ভরযুবতী এই বর চান'। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাই বাঙালী রমণী সিঁদুর খেলায় তদ্‌গতচিত্ত। সিঁদুর খেলা এক গুরুত্বপূর্ণ স্ত্রীআচার। কিন্তু বৈদিক গৃহ্যসূত্রাদি এবং আর্যজাতির প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে সিঁদুরের এই সম্মান অনুপস্থিত। উত্তর ও দক্ষিণভারতের হিন্দুসমাজে সিঁদুর দানের প্রথা নেই, পূর্বভারতে তথা বাঙলা, ত্রিপুরা, আসাম প্রভৃতি রাজ্যে এ প্রথা বহুল জনপ্রিয়।

বাঙালীর সিঁদুরপ্রিয়তা অনার্য-সভ্যতার দান, এবং আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সমন্বয়ের ফসল। প্রাচীনকালে এ দেশে সিঁদুরের ব্যবহার ছিল এমন কোন প্রমাণ নেই। তখন লোহিতবর্ণের জন্য রক্তচন্দন ও কুমকুম ব্যবহার হত, এবং এখনও পশ্চিমাঞ্চলে তা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ভবিষ্য-পুরাণের ব্রহ্মপর্বে, অন্যান্য প্রাচীন পুরাণে যে ঘটস্থাপনের ব্যবস্থা আছে সেখানে সিঁদুর দানের ব্যবস্থা নেই। বাঙলার ভট্টভবদেব এবং পশুপতি পণ্ডিত প্রভৃতি সিঁদুর দানের অনুকূলে বৈদিক, স্মার্ত অথবা পৌরাণিক কোন শাস্ত্র খুঁজে পান নি। সুতরাং পালযুগে ভট্টভবদেব এবং পশুপতি পণ্ডিত ভদ্র হিন্দু সমাজে প্রচলিত প্রথা অনুসারে 'শিষ্ট সমাচারাং' মারফৎ সিঁদুর দানের স্বীকৃতি দেন। তার আগে ব্রাহ্মণ্যস্বীকৃতি ছাড়াই সিঁদুর জনপ্রিয় ছিল। অনার্য, সাঁওতাল, ভূমিজ, কোল, মুণ্ডা, বাগ্‌দী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে সিঁদুর সুপ্রাচীন কাল থেকেই জনপ্রিয়। সৌভাগ্য ও বিজয়ের প্রতীক হিসাবে সিঁদুরের বিশিষ্ট ভূমিকা। লালবর্ণ বিজয়ের বার্তা ঘোষক। রক্তবর্ণ লাল চিহ্ন সসাগরা পৃথিবীর তাবৎ জনমনে উল্লাসের সৃষ্টি করে। সাঁওতাল বিবাহে বর কর্তৃক বধূর ললাটে সিঁদুর লেপন থেকেই আর্য হিন্দুবিবাহে সীমন্তে সিঁদুর দানের আমদানী হয়েছে। সাধারণতঃ হোমাদির শেষে বর কর্তৃক বধূর সীমন্তে সিঁদুর পরানো হয়। কোথাও বর তার আংটির সাহায্যে বধূর সীমন্তে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। আবার কোথাও কুনকের পিঠে সিঁদুর মাখিয়ে বর এক হাত দিয়ে বধূর কপাল থেকে মাথার দিকে সিঁদুরের রেখা এঁকে দেয়। এবং অপর হাত দিয়ে বধূকে ঘোমটা পরিয়ে দেয়। অনেক জায়গায় আবার শঙ্খের উল্টোদিক দিয়েও সিঁদুর পরান হয়ে থাকে বিবাহে। এই সিঁদুরচিহ্ন বাঙালী রমণী ততদিন পরমশ্রদ্ধাভরে উজ্জ্বল রাখেন যতদিন তিনি সধবা থাকেন। বাঙালী সধবা সিঁদুরের সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করবেন শাঁখা ও নোয়া। হোমযজ্ঞ অন্তে এসবের ব্যবহারই বিধান। কিন্তু সাঁওতাল, মুণ্ডা, বীরহোড় প্রভৃতির মধ্যে সিঁদুর দানই বিবাহের মুখ্য আচরণীয় কাজ। ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রাক্‌-আর্য এই সম্প্রদায়দের নিকট থেকে সিঁদুরদান প্রথাকে গ্রহণ

করে ব্যবহারের রীতি সম্পর্কে এক ব্রাহ্মণ্য প্যাঁচ কষলেন। সিঁদুরদানের পূর্বে যজ্ঞাদির বিধান দিলেন এবং সিঁদুর ললাটে লেপন না করে সিঁথিতে লেপনের বিধান দিলেন। তখন থেকেই বঙ্গনারীর কপালে উঠলো সিঁদুরের টিপ।

এই সিঁদুর দান প্রথার পূর্ববর্তী প্রথা ছিল বর ও বধূর উভয়ের হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর রক্ত দিয়ে উভয়ে উভয়কে ফোঁটা দিয়ে-চিহ্নিতকরণ। এরূপ রক্তের চিহ্ন দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল যে উভয়ে উভয়ের রক্তে মিলে গিয়ে এক ও অভিন্ন হল। এখনও বহু আদিবাসী সমাজে এই রীতি বর্তমান। নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা মনে করেন যে আদিবাসী সমাজের এই রক্ততিলককে চিহ্নিত করানোরই সংস্কৃত রূপ বর্তমান বাঙালীর সিঁদুর দান। রাক্ষস এবং পৈশাচিক রীতির বিবাহে বা কন্যাহরণ করে বিবাহে হরণকারী যুবক নিজের আঙুল কেটে রক্ত বের করে অপহৃতা যুবতীর ললাটে একটা ছাপ বা ফোঁটা দিয়ে তার উপর নিজের স্বত্ব বা অধিকার প্রতিষ্ঠা করত। এই রক্ত চিহ্নের প্রতীক বর্তমান বিবাহিতা নারীর ললাটে সিঁদুরের ফোঁটা। এই প্রথা তথাকথিত সভ্য হিন্দুসমাজ অনার্য বা আদি প্রতিবেশীদের নিকট থেকে গ্রহণ বা অনুকরণ করেছে। কেবল হিন্দু নয় অনেক বাঙালী মুসলমান নারীও সিঁথিতে সিঁদুর ব্যবহার করেন বলে উল্লেখ আছে। সিঁদুর ব্যবহারকারী এই মুসলমানদের পূর্বপুরুষেরা ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত হিন্দু ছিলেন। সুতরাং ধর্মান্তরিত হয়েও বহুকালের প্রাচীন সংস্কার বা আচার সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে পারেন নি তাঁরা। পারেন নি বলেই সিঁদুর পরার অভ্যাস অনেকেই এখনও পরিত্যাগ করতে পারেন নি। প্রমাণস্বরূপ—'বিবির সিন্দুর লইয়্যারে বিদেশী দামান। চান ফেরে নদীর কূলে। কার লইগ্যা কেনলাম সিন্দুর রে। আল্লা বিধি চিনতে না পারে। মুই আগে যদি জানতাম, ছোবহান আল্লা। ছোটভাইধন আনতাম সাথে রে।' অথবা 'পাঁচ কাপড়া পর্যা দামান্দ সভাতে বসিল হায়। আচ্চাই ঝল্লোকে স্যান্দুর আন্দোরে পটাইলো হায়। আচ্চাই ঝল্লোকে স্যান্দুর মণ্ডলে পটাইলো হায়। স্যান্দুরের কৌটা খুল্যা দ্যাকি সবিই স্যান্দুর ফ্যাষ্টা। ও তোর স্যান্দুরের কউটা আছিড়া ভাঙ্গিমু হায়। হাতো ধরি ভাবীছায়েব গুণা মাপো করো। কালি ফজরে বাণিয়া বসামু হায়। আচ্চাই ঝল্লোকে স্যান্দুর অন্দোরে পটামু হায়। আচ্চাই ঝল্লোকে স্যান্দুর মণ্ডলে পটামু হায়।' ইত্যাদি তাছাড়া—'কেমোন সিন্দুর আনাছিন দামান্দ। সিন্দুরের বরণ তো ভাল নয়। দামান্দ ঘুমানিন, ফির তুমি বগুড়াত যাও। দামান্দ ঘুমানিন, একে ত আন্দরি রাত, একেলা যাবার নয়, বিবি ছরেদা। তুমি দরজা খুলিয়া

দাও বিবি ছরেদা।` তুমি হস্ত বাড়াইয়া দাও বিবি ছরেদা।' সিঁদুর সম্পর্কিত এ গান মুসলমান সমাজের। এবম্বিধ নানা গান হিন্দু সমাজে প্রচলিত। যেমন —'ঘর থেকে জিগায় মায়ে—কী কী শোভা গো আমার রামের গায়ে, হস্তে শোভে গো হস্তজ্যোতি—গলে শোভে গো রামের গজোমতি। অঞ্চলে বাঁধিয়া কড়ি যান, যান গো রামের মা বাণিয়া বাড়ী। হ্যাদেরে বাণিয়ার ছেলে, কত লইবারে তোমার সিঁদুর তোলা—আমার সিঁদুরের মূল্য সোনার পঞ্চ কড়া গো, রামের মা।' এই ভাবে বিয়ের গান গাওয়া হয়।

ভট্টভবদেবের সময় থেকে সিঁদুর বাঙালী উচ্চবর্ণের মধ্যেও এমন জনপ্রিয়তা লাভ করে যে বাঙালীর পূজা অর্চনা, বিবাহ, সাধভক্ষণ বা যে কোন অনুষ্ঠানে সিঁদুরের ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বাঙালী রমণী এই সিঁদুরকে অক্ষয় করে রাখার উদ্দেশ্যে সারা বৎসর কোন-না-কোন উৎসব অনুষ্ঠানের মারফত সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন। ব্রতানুষ্ঠান করেন। নিৎ-সিঁদুর এবম্বিধ ব্রত আচরণের একটি যা চৈত্র মাসের চড়ক সংক্রান্তির দিনে সুরু করতে হয়। চলে সারা বৈশাখ মাস। একাদিক্রমে চার বৎসর এ ব্রত করার রীতি। চতুর্থ বৎসরের বৈশাখ-সংক্রান্তির দিনে ব্রতের সমাপ্তি। পূর্বেই এসব বলা হয়েছে।

চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন সকালে ছোটবড় সকল এয়োদের কপালে সিঁদুর এবং জ্যেষ্ঠদের পায়ের ধূলো নিয়ে ব্রতের সুরু। সারা বৈশাখ মাস ধরে সকালে ব্রতিনী যত এয়ো দেখবেন তত এয়োর কপালে সিঁদুর দিতে হবে। বিকালে তাদের নানারকম খাবার ও মিষ্টান্ন খাওয়াতে হবে। একাদিক্রমে চার বৎসর চলবে এই অনুষ্ঠান। চতুর্থ বৎসর বৈশাখ সংক্রান্তির দিনে চারজন এয়োকে নিমন্ত্রণ করে এনে তাদের পা ধুইয়ে দিয়ে আলতা লাগাতে হবে, সিঁথি, শাঁখা ও ললাটে সিঁদুর পরিয়ে দিতে হবে, এবং পেটভরে সুখাদ্য খাওয়াতে হবে। খাওয়া দাওয়ার পর প্রত্যেক এয়োকে দিতে হবে একখানা করে লাল পেড়ে শাড়ী, একগাছি করে লোহা, রুলি, আলতা, সিঁদুরচুবড়ি, আর্শি, চিরুণী, পাখা ও সিঁদুরভর্তি সিঁদুরের কৌটা। এই ব্রতে পুরুতঠাকুরের দরকার হয় না। সিঁদুরব্রত ও নিত্য-সিঁদুরব্রত একই অনুষ্ঠান। নিত্য-সিঁদুর ব্রতানুষ্ঠানে সামান্য রকমফের দৃষ্ট হয়। যেমন ব্রত নেবার দিনই সেখানে এয়োর পা ধুইয়ে, চুল আঁচড়িয়ে, সিঁদুর পরিয়ে, নখ চেঁচে ও আলতা পরিয়ে দিতে হয়। তারপর এয়োকে আস্ত দুটি পান, আস্ত দুটি সুপারী আর কিছু মিষ্টান্ন ও পয়সা দিয়ে নমস্কার করতে হয়। এই রকম ভাবে এক চৈত্র সংক্রান্তি থেকে আরেক চৈত্র পেরিয়ে বৈশাখ সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতিদিন এই

অনুষ্ঠান পালনীয়। এই অনুষ্ঠান ছাড়া ব্রতিনী চৈত্র সংক্রান্তিতে একজন, বৈশাখ সংক্রান্তিতে দুইজন, জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে তিনজন, এমনি করে চৈত্র অবধি তেরোজন ও বৈশাখে আরেকজন এই চৌদ্দজন সধবাকে নিমন্ত্রণ করে তাঁদের সকলের পা ধুইয়ে-মুছিয়ে, আলতা-পরিয়ে, চুল আঁচড়িয়ে, সিঁদুর পরিয়ে দেবেন। পরিয়ে দেবেন নতুন লালপেড়ে শাড়ী, লোহা-রুলি, সিঁদুর চুবড়ি প্রভৃতি। তারপর আলপনা দেওয়া পিঁড়িতে বসিয়ে তাঁদের নানাবিধ সুখাদ্য দিয়ে আপ্যায়িত করবেন এবং ব্রতের সুরু যে এয়োকে নিয়ে হয়েছিল তাঁকে সোনার লোহা ও রুপার সিঁদুরের কৌটা দিবেন। আগেই বলা হয়েছে, অক্ষয়তৃতীয়া দিবসে নিতে হয় অক্ষয়সিঁদুরব্রত। একাদিক্রমে চার বৎসর ধরে করে যেতে হয় এ ব্রতানুষ্ঠান। একজন এয়োকে অক্ষয়তৃতীয়ার দিন ভোরবেলা সিঁদুর পরিয়ে কড়ি, লোহা, একপাতা সিঁদুর, আলতা, শাড়ী, পান, সুপারী,



মিষ্টান্ন ও পয়সা দিয়ে ব্রতারম্ভ। এই ব্রতেও পুরোহিতের প্রয়োজন নেই। একজন সধবা পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করেন। প্রতি বৎসর একজন করে বেশী এয়োর দায়িত্ব নিতে হবে। শেষ বছরের অক্ষয়তৃতীয়া দিবসে চারজন এয়োকে বাড়ীতে এনে পা-ধুইয়ে, আলতা পরিয়ে, সিঁদুর পরিয়ে, নতুন শাড়ী, লোহা ইত্যাদি দিয়ে ও সিঁদুর মাখিয়ে উত্তমরূপে ভূরিভোজন করাতে

হবে। সিঁদুর অক্ষয় করতে এ ধরণের একক প্রচেষ্টা ব্যতীত নানাবিধ যৌথ প্রচেষ্টাও দেখা যায়। যেমন দশহরা দিবসে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের পূর্ব মুহূর্তে বাঙালী সধবাগণ একত্রিত হন পূজা মণ্ডপে দেবী দুর্গাকে বরণ করতে। বরণান্তে এয়োরা সিঁদুর-খেলায় মেতে ওঠেন। একে অপরের সিঁথিতে, ললাটে সিঁদুর লাগিয়ে দেন। শাঁখায়ও লাগিয়ে দেন সিঁদুর। তারপর কনিষ্ঠা বয়োজ্যেষ্ঠার পদধূলি গ্রহণ করেন। আশীর্বাদ করেন জ্যেষ্ঠা—'ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক'; 'হাতের নোয়া অক্ষয় হোক'; 'সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হোক'; 'শাঁখা সিঁদুর নিয়ে বেঁচে থাকো', 'দীর্ঘজীবী হও' ইত্যাদি। শত্রুমিত্র ভেদাভেদজ্ঞান থাকে না সেদিন। খেলার আনন্দে, উৎসবের ঐক্যবোধে নতুন করে একে অপরের সান্নিধ্যে আসে, মৈত্রীবোধে উদ্বুদ্ধ হয়। বাসিবিয়ের দিনেও সধবারা এ ধরণের সিঁদুর খেলায় মাতেন। বাঙালী সধবাদের প্রধান চিহ্ন ও শ্রেষ্ঠ অলঙ্করণ সিঁথির সিঁদুর। সিঁদুর সম্পর্কে একটি কৌতুককর প্রথা এই যে, স্ত্রী কখনও স্বামীর নিকট চেয়ে সিঁদুর ব্যবহার করেন না। ঘরে সিঁদুর ফুরিয়ে গেলে সেকথা গৃহিণী কাউকে বলবেন না। ঘরে সিঁদুর না থাকলে তিনি বলবেন, সিঁদুর বাড়ন্ত। সিঁদুর দান এবং সধবার কপালে সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দেওয়া মহিলাদের পক্ষে বিশেষ পুণ্যের কাজ। কেউ সিঁদুর পরার সময় কোন সধবা সম্মুখে থাকলে তাঁকেও সিঁদুর পরিয়ে দেবার প্রথা আছে। সধবাদের আলতা, সিঁদুর পরান এয়ো-সিঁদুর, নিৎ-সিঁদুর প্রভৃতি ব্রতের অঙ্গ। সিঁদুরের মত আলতাও বঙ্গরমণীদের আদরের সামগ্রী। যে কারণে সিঁদুর সধবা বঙ্গরমণীগণের প্রধান অলঙ্করণ, সেই কারণেই আলতা তাঁদের পায়ের অলঙ্করণ। বিধবাদের সিঁদুর ও আলতা উভয় পদার্থই পরিত্যাজ্য। কুমারী মেয়েরাও খুব একটা আলতা ব্যবহার করে না। তারা ঠোঁট লাল করার জন্য পানের বদলে লিপস্টিক ব্যবহার করে। সহরের অনেক সধবাও লিপস্টিকের প্রতি অনুরক্ত। অঙ্গসজ্জা ও শিল্পকর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে এদিকে নজর দেওয়া যাবে। খেলার আলোচনায় বিভিন্ন ধরণের খেলার, খেলার উপকরণের, বিভিন্ন আচরণের কথা মনে পড়ে। কিন্তু সর্বপ্রকার খেলার আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তাই খেলার আলোচনা সমাপ্ত করার পূর্বে আমরা গীতিপ্রধান কিছু খেলার দিকেও নজর দিতে পারি। গীতিপ্রধান খেলা অনুষ্ঠিত হয় গান সহযোগে। গাথা কবিতায় উল্লেখ্য এই খেলা শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিকাভক্ষণ বিষয়ক একটি গাথা। এই গাথাটির উল্লেখ আছে গৌরহরি মিত্র সম্পাদিত 'বীরভূমের ইতিহাস' গ্রন্থে। য.শো মতীকে আপন মুখগহ্বরে বিশ্বরূপ প্রদর্শনের কাহিনী বিবৃত হয়েছে

এখানে। খেলার ছলে একদা শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তিকা মুখে পুরে দিলে—'হারে হারে বলিঞা, যশোধা ধৈল হাতে, মৃত্তিকা ভক্ষণ কর কেনে, কিছু পাওনা খেতে।' শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'শুন গো মা যশোমতী করি নিবেদন, তোমার সাক্ষাতে দেখ মিলিব বদন। মায়া করি মুখ যে মিলিএ চক্রপানি, বিশ্বরূপ বদনে দেখিলা নন্দরাণী'। এই প্রসঙ্গে পাশাখেলার গানও হয়। যেমন—'পাশা খেইলব বংশীধারী, আইজ তোমারে পরাজয় দিব রাইকিশোরী। পাশা যে খালাইতায় শ্যাম রে, আগে থও দাও, আরিলে আরণ দিবায় গলার মণিহার, পাশা যে খেলাই তায় রাইগো, আগে থও পণ, এগো, আরিলে আরণ দিবায় এই নব যৌবন। দশ দশ করিয়া পাশা ঢালইন শ্যামরায়। বিশ বিশ করিয়া পাশা দেখ, তুলইন রাধিকায়। আর জিতিল সে রাধিকা, আরইন শ্যামরায়। সখিগণে মিলিয়া তারা মঙ্গল জোগার গায়'। হুলুধ্বনি দিয়ে খেলা শেষ। এ খেলা সাধারণতঃ মেয়েদেরা খেলা। পুরুষেরা এ খেলায় জব্দ হবেই। কিন্তু তাতে পুরুষ নিরুৎসাহ হয় না। সুপ্রাচীনকাল থেকে পুরুষ দ্যূত-ক্রীড়া করে চলেছে। রঘুনন্দনস্মৃতিতে উল্লিখিত হয়েছে যে কার্তিক মাসের শুক্লাপ্রতিপদে শঙ্কর মনোহর দ্যূত-ক্রীড়ার প্রবর্তন করেন। লক্ষ্মী-পূর্ণিমায়ও অক্ষক্রীড়ার উল্লেখ আছে। অনেকে কার্তিক অমাবস্যায় বাজী রেখে যে সব তাস, পাশা, ঘুঁটির নানাবিধ খেলা খেলেন তার সঙ্গে কুবেরের একটা সম্পর্ক টেনেছেন। মহাভারতের সভাপর্বে শকুনির পরামর্শে যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য খর্ব করার জন্য আছে দ্যূত-ক্রীড়ার নানা বিবরণ। অজ্ঞাত-বাসের সময় যুধিষ্ঠির নিজে নিজেকে 'অক্ষদক্ষ' বলে পরিচয় দিয়েছিলেন বিরাট রাজ্যে। কুরুগণের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ফিরে এসে উত্তর প্রচুর আড়ম্বর সহকারে দ্যূত-ক্রীড়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। নিষাদাধিপতি নল পুষ্করের সঙ্গে দ্যূত-ক্রীড়ায় সর্বস্ব হারালে দময়ন্তীকে পণ রেখে খেলার কথা বলা হয়েছিল—'দ্যূতে প্রবর্ত্ততাং ভূয়ঃ প্রতি প্রণোক্তি বান্তব। শিষ্টাতে দময়ন্তেকা দর্বমনার্জ্জিতং ময়া॥ দময়ন্ত্যাঃ পণ সাধু বর্ত্ততাং যদি মনস্য'। মৃচ্ছকটিক নাটকেও দ্যূত-ক্রীড়ার উল্লেখ আছে। বাজী ধরে এ খেলায় ক্রমে নানা অশান্তির সৃষ্টি হয়ে চলল। ধর্মশাস্ত্রকারগণের অনেকেই তাই এ খেলার বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করলেন। বাজী ধরে খেলার বা জুয়াখেলার বিরুদ্ধে যতই আইনকানুন রচিত হউক না কেন, গোপনে গোপনে এ ধরণের খেলা এখনও অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। অবশ্য বৃদ্ধবৃদ্ধারা সময় কাটাবার জন্য যে পাশা, তাস ইত্যাদি খেলেন বা মহিলারা নানাজাতীয় ঘুটি, কড়ি-

খেলায় ব্যস্ত থাকেন, সেখানে বাজীর আবশ্যক নেই। প্রায়শই সে সব খেলা নির্দোষ খেলা—সময় কাটাবার বা মস্তিষ্ক চর্চার খেলা। যাজ্ঞবল্ক্য বাজীর বা জুয়া খেলার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে ধূর্ত কিতব প্রতি খেলায় শত পণের কম বাজী রাখে না। এই টাকার শতকরা কুড়ি ভাগ সভিক অর্থাৎ দ্যূত সভাধ্যক্ষ পান। এই টাকাকে বর্তমানের জুয়ার খেলোয়াড় বলেন 'বোর্ডমনি'। মনু বলেছেন, রাজা অতি অবশ্য দ্যূত-ক্রীড়া তাঁর রাজ্য থেকে নিবারণ করবেন। তিনি বলেছেন যে দ্যূত এবং সমাহ্বয় এই দুই খেলা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং রাজার পক্ষে হানিকর। সমাহ্বয় হচ্ছে মেষ, কুক্কুটাদির দ্বারা ক্রীড়া। রাজা খুশী হলে দ্যূত এবং সমাহ্বয় খেলোয়াড়দের জীবন নাশও করতে পারেন। নারদও মনুর মত অনুসরণ করেছেন। এখন অনেক প্রকাশ্যস্থান থেকে জুয়াখেলা উঠে গেছে, কিন্তু গোপন আশ্রয়ে এ খেলা আজও জনপ্রিয়। যে কোন হাট বা মেলা উৎসবে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। সহরের বাবুরা তো কোন গোপনস্থান ঠিক করে নিয়ে সমস্তপ্রকার আইন কানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে হরবখত তিন তাস ও নানাবিধ জুয়া খেলা, নেশা, ভাঙ, পান ইত্যাদিতে মেতে থাকেন ইচ্ছামত। ভদ্র-ইতর মহলে সমান জনপ্রিয় এ খেলা। এর আনুষঙ্গিক সংগ্রহেও কোন অসুবিধা হয় না খেলোয়াড়দের। রেস বা ঘোড়দৌড়ও জুয়া খেলাই। হাসি কান্নার দোলায় দোলে এ খেলার খেলোয়াড। খেলাচ্ছলে পুরুষেরাও নানা গান গায়। মেয়েরা পুরুষদের জাতি নিয়েও নানা কথা শোনায়, অন্যত্র চলে যেতে বলে। কিন্তু তারা হাল ছাড়ে না। তারা গান ধরে—'জাতি ধরুম ভুয়া কথা নিতাই চাঁদ বলে। বিষ অমৃত হয় ওঝায় পাইলে। সুস্থান অস্থান নাই, সুজন কুজন। ধুলামাটি বেছে লও পীরিতি বড় ধন। আসল পীরিতি নাহি জানে জরামরা, দুষমনে কাটিলে অঙ্গ পীরিতি লাগে জোড়া।' আরেকটি খেলার গাথা শ্রীকৃষ্ণের তালভক্ষণ। এই গাথায় গ্রাম্য বালকগণের দুরন্তপনার পরিচয় পাই—'প্রভাত হইল আল্য জত সিসুগণ, রাম কানু সঙ্গে লঞা আনন্দিত মন। সিঙ্গাবেনুস্বরে সভে হরসিত হআ, পরম কৌতুকে নাচে নন্দ দুলালিয়া।' এভাবে নাচতে নাচতে বালকেরা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামসহ বনে যায়। বনে সকলে কানুর সঙ্গে খেলা করে। ছেলেদের মধ্যেই একজন কানু ও একজন বলরাম সাজে। খেলা শেষে ক্ষুধার্ত বালকেরা—'তাল বিক্ষে উঠে সভে করিতে ভক্ষণ।' তাল পেড়ে তারা যখন তাল খাওয়া আরম্ভ করে তখন কংসের প্রহরী এসে বলে—'এই কাননে তোরা উপনিত হয়া, লণ্ডভণ্ড

কইলে কেনে কিসের লাগিয়া।' সে বালকদের ভয় দেখায়। এবং 'বনমাঝে একাকিনি সব সিষুগণ, ধ্বনি মণ্ডলে পড়ি হল্য অচেতন।' তখন—'দেখিয়া বালক বধ প্রভু জগৎপতি, প্রাণদান সভাকারে দেন রমাপতি। আনিয়া য়মৃত বিষ্টি করাল্য সভায়, মাএতে ভোজন জল করান তথায়।' তারপর অসুর বধ হলেই খেলা শেষ। অনেকটা শ্রীকৃষ্ণের তাল ভক্ষণের মতই আরেকটি খেলা শ্রীকৃষ্ণের ফলভক্ষণ। এই গাথাটিও চমৎকার। 'একদিন গকুল নগরে এক বুড়ি, প্রভাতে লইঞা আইল্য ফল এক ঝুড়ি। বসিল পথ্যের ধারে, বসিল পথের ধারে; ডাকে ওরেঃ গকুলবাসি ছেল্যা উচ্চস্বরে ধ্বনি করেঃ ফল লাউস্যা বল্যা।' ফলওয়ালী—'মৃত্তিকার ভাণ্ডে রাখে পাকা জামের ফল, ফল কিন্না নেয়রে এস্যা বালক সকল। শ্রীদামাদি গোপ সিসু সুনিবারে পায়, ধান চাল কড়ি লয়্যা অতি বেগে ধায়।' তারপর ফল খেতে খেতে বালকগণ বলরামসহ কৃষ্ণের কাছে গেলে—'জিজ্ঞাসা করেন কৃষ্ণ কি খাওরে ভাই, পাকা জামের ফল খাই বলেন বলাই।' তখন কৃষ্ণ যশোদার কাছে গিয়ে ফলের জন্য আবদার করলে—'রাণী বলে পেটের সময় এখান হতে জা, আঙ্গিনায় সুখায় ধান্য লয়্যা ফল খা।' এই ধরণের খেলায় অনেক মহাশয় ব্যক্তিও বহুসময় ব্যয় করেছেন শিশুবয়সে। 'আত্মচরিতে' শিবনাথ শাস্ত্রীও সে কথা জানিয়েছেন। তাঁর ছেলেবেলার খেলা ছিল গানের দল গঠন। তিনি লিখেছেন—"আমার উৎসাহে দলটি জমিয়া গেল। এক ছেলের গলায় একটা ঢোল, আরেকজনের হাতে করতাল ও মূল গায়েনের হাতে চামর দিয়া, আমরা নূপুর পায়ে দিয়া দোহার হইলাম, সন্ধ্যার সময় বাড়িতে বাড়িতে গান গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। সে গানের মাথামুণ্ডু ভাব অর্থ কিছুই থাকিত না। পাড়ার একজন কৌতুকপ্রিয় লোক হাসাইবার মতো কতগুলো ছড়া বাঁধিয়া আমাদিগকে শিখাইয়া দিলেন। তাহাই আমরা বাড়িতে বাড়িতে মেয়েদিগকে শুনাইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। মেয়েরা হো হো করিয়া হাসিয়া কে কার গায়ে পড়িয়া যাইতে লাগিলেন..." তাঁর অন্য খেলার মধ্যে "টুনটুনি, বুলবুলি, দোয়েল, ছাতারে, শালিখ, টিয়া, ওসকল তো পুষিয়াছি, পিঁপড়েও পুষিতাম। ফড়িং ও পিঁপড়ে পোষা আমার একটা বাতিক ছিল। তাহাদিগকে অতি যত্নে কৌটার মধ্যে রাখিতাম। ফড়িংদিগকে কচি কচি দুর্বা ঘাস খাওয়াইতাম, পিঁপড়েদিগকে চিনি ও মধু খাইতে দিতাম।...পাখির বাসা হইতে বাচ্চা চুরি করিয়া আনিতাম, আনিয়া তাহার মায়ের মতো যত্নে তাহাকে পালন করিতাম।...মাঠে মাঠে ঘাস বনে ফড়িং ধরিতে যাইতাম।...

ফড়িং ধরিয়া আনিয়া পাখিকে খাওয়াইতাম।…ধাড়ী পাখিও পুষিতাম। বড় পাখি ধরিবার তিনপ্রকার কৌশল ছিল। প্রথম, আমাদের উঠানে একটি ধামা খাড়া করিয়া তাহার সম্মুখে চাল কড়াই ছড়াইয়া, ধামার পৃষ্ঠে একগাছি বাঁকারির অগ্রভাগ লাগাইয়া, অপর প্রান্ত দাবাতে লাগাইয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতাম। কোনো ঘুঘু বা পায়রা বা শালিখ আসিয়া এক মনে চাল, কড়াই খাইত। অমনি বাঁকারির দ্বারা ধামাটি ঠেলিয়া তাহাকে চাপা দিতাম। দ্বিতীয়, গাছের ডালে ডালে যখন পাখিতে পাখিতে ঝগড়া ও মারামারি করিত, তখন তাহার নিচে গিয়া কাপড়ের জাল পাতিতাম। তাহারা মারামারি করার সময় রাগে এত অন্ধ হয় যে, দুজনে জড়াজড়ি করিয়া পাকা ফলটির মতো গাছের তলায় পড়িয়া যাইত। তৃতীয়, টুনটুনি, দোয়েল প্রভৃতি ক্ষুদ্র পাখিরা যখন অন্যমনস্কভাবে গাছের ডালে বসিয়া থাকিত, তখন ভোঁ করিয়া তাহার পায়ের নিকটস্থ ডালে সজোরে ঢিল মারিতাম। তাহারা দিশেহারা হইয়া পড়িয়া যাইত। আমি অমনি তাহাদিগতে ধরিতাম…বেড়াল ছানা আনিয়া উন্মাদিনীকে দিতাম, সে পুষিত।…শেয়ালখাকি একটা মাদি কুকুর।…আমরা পাড়ার বালক বালিকাদের সঙ্গে মিশিয়া কখনো কখনো বনভোজনে যাইতাম। পাড়ার নিকট কোন জঙ্গলময় স্থান পরিষ্কার করিয়া সেখানে উনান করিয়া প্রত্যেকের বাড়ি হইতে কাঠ, কুটা, চাল, ডাল বহিয়া লইয়া যাইতাম। বালিকারা রাঁধিত, বালকেরা হইত নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ এবং তাহাদের মা খুড়ী জেঠিরা হইতেন অতিথি। পরমসুখে বনভোজন হইত। শেয়ালখাকি আমাদের সঙ্গে সমস্ত দিন থাকিত। আহারান্তে আমরা যখন লুকোচুরি খেলিতাম তখন শেয়ালখাকি বনের মধ্যে লুকাইত। আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতাম। আমরা তাহাকে খেলার সাথী বলিয়া জানিতাম।"

কুলাই-মুলাইও একটি খেলা। ব্রত আলোচনায় আমরা ঠাকুর কুলাইর একটি ছড়া উদ্ধৃত করেছি। এখানে সেই ছড়ার পুনরাবৃত্তি না করে খেলাটি সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পারে। কুলাই মুলাই দুই ভাই। তারা অজ্ঞাত দেবকুমার। কিন্তু লোকে তাদের পূজা করে না। একদিন তারা নদীর ধারে নৌকার মাঝির কাছে এসে একটু তামাক খেতে চাইল। এবং মাঝিকে সন্তুষ্ট করার জন্য বলল—'এঙ মাটি ব্যাঙ, রাখাল কি ব্যাঙ, রাখাল ভ্যাঙাতে সেউতি, সেউতির কড়ি নয় নয় বুড়ি। এক কড়ি দুই কড়ি কড়িওয়ালা ভাই, আইজকে ঠকাইয়া গেলে মা গঙ্গার দোহাই। মা গঙ্গা পাঁচ পীর থাকেন মধুপুর, তাঁহার হিসাব নিবে দরিয়ার উপর। চাল দিবে দাল দিবে আর দিবে

কি। বদর আলী নামে দিবে সোয়াসের ঘি। সোনার খাটে বসে মাঝি, রূপার খাটে পা। দুই মুড়া দিয়া পড়িতেছে শ্বেত চামরের বা। খাটা খাটা লাও গুলি ঘন ঘন গুড়া, মাঝির কোমরে দেখি সোনার সুসুরা।' এ খেলার একজন মাঝি থাকে, আর থাকে কুলাই-মুলাই ও অন্যান্য। মাঝি তামাক দেয় না। কুলাই-মুলাইর অভিশাপে সে বিপদে পড়ে। তারপর কুলাই-মুলাইর পূজা করলে তার সমস্ত বিপদ কেটে যায়। সাপখেলাতেও খেলোয়াড় মা-মনসার প্রতি ভক্তজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি থেকেই সারা বাঙলায় সাপখেলা দেখতে পাওয়া যায়। বেদে বেদেনীরা সাপের ঝাঁপি মাথায় নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে সাপখেলা দেখিয়ে বেড়ায়। খেলার সঙ্গে নানাবিধ গান গাইতে গাইতে সাপের ঢাকনা খুলে দেয়। সাপের সামনে হাত নাড়তে নাড়তে খেলোয়াড় বলে—'লেচে লেচে মা কাল ভোজঙ্গিনী'। সঙ্গে সঙ্গে বাজে তুবড়ী, বাঁশী বা বিষম ঢাক। গান গাওয়া হয়—'বেউলো কেঁদোনা কেঁদোনা রে, কাঁদলে ন'খায় পাবে না। নোহার আঁচির, নোহার পাঁচির, নোহার বাসর ঘর। বেউলো কেঁদোনা রে'। ওরা সাপের ঝুড়ি নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ছোটে। বাড়ীর উঠানে মাথা থেকে ঝাঁপি নামাতে নামাতে গান ধরে—'সাপখেলা দেখবি যদি আয়, আয়লো সোনা বউ, সাপখেলা দেখবি যদি আয়। এই সাপে যখন ফণা ধরে, আলকাতরার মায় চিক্‌রাইয়া মরে, মোড়াইতে মোড়াইতে সাপ গর্তে চলে যায়। আয়লো সোনা বউ, সাপখেলা দেখতে হলে আয়।' গান গায় আর সাপের ফণার কাছে হাত নাড়ে। মাটিতে চাপড় মারে। বলে—'খা-খা-খা-বক্ষিলারে খা। গাইঠে, পয়সা বাইন্ধ্যা যে না দেয় তার চক্ষু উপরাইয়া খা'। সাপখেলার মতই উপভোগ্য খেলা বানরখেলা, ভাল্লুকের নাচ প্রভৃতি। সার্কাসের সঙ্, রিং খেলা প্রভৃতিও কম আকর্ষণীয় খেলা নয়। সাপখেলার গান—'সাপা বলে সাপিনীকে শোন গোকুলের কথা, কৃষ্ণ অবতারে সাপার জন্ম হল কোথা। জনম হল যেথা সেথা দেবকির উদরে, দেবকিকে নিয়ে গেল গোকুল নগরে। গোকুল নগরে ছিল লোহার বাসর ঘর, তাতে শুয়ে নিদ্রা যায় বালা লখিন্দর।' অথবা—'চাঁদসদাগর রাখবো না তোর বংশে দিতে বাতি গো, বাঁদরেরি বাদ বালার নয়কো কভু ভাল গো। কি হল কি হল বলে দেখিতে লাগিল। সুতার সঞ্চার হয়ে কাল নাগ বাসরে বিঁধিল গো,… বিষে অঙ্গ জর জর কালিয়া করিল গো, কি হল কি হল বলে বেহুলা কাঁদিতে লাগিল।' সাপখেলার এ গান মনে রেখে আমরা গ্রাম প্রদক্ষিণে বেরিয়ে পড়ব। এবং এই গ্রামকে কেন্দ্র করেই আমরা লোকজীবনের সংস্পর্শে আসব।

॥ ৮ ॥

পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার ঝালকাঠী থানার অন্তর্গত কেওড়া একটি গ্রামের নাম। গ্রামটি কে. বি. আর. বা কেওড়া-বেলদাখান-রণমোহিত নামে জনপ্রিয়। আমাদের এই গ্রাম বর্ধিষ্ণু। বৈদ্যপ্রধান, বিভিন্ন বর্ণের লোকেরাও এখানে বসবাস করে। বাঙলাদেশের যে প্রান্তে আমাদের এই গ্রাম তার চারদিকে আছে নদীনালাখালবিল। বড় নদী এঁকেবেঁকে কত ছোট ছোট গ্রাম, কত গঞ্জ, কত হাটের নীচ দিয়ে বয়ে গেছে। কত দেশ থেকে ছোট বড় নৌকা এসে চাল, সুপারী, নারকেল, নানাবিধ সব্‌জি নিয়ে যায়। গ্রামে রোজই একটি ছোট্ট বাজার বসে। পাশের মুসলমানপ্রধান সাহেবগঞ্জের গ্রামে শনি ও মঙ্গলবার, অপর গ্রামে সোম ও বুধবার হাট বসে। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে লোক এসে জোটে এই হাটে। হাটের চারদিন খেয়াঘাটের পাটনী বিশ্রামের অবসর পায় না। বিয়ে ইত্যাদির হাটবাজারের জন্য যেতে হয় -হয় কীর্তিপাশা নয় ঝালকাঠী। ঝালকাঠী থানার সদর, বাণিজ্য বন্দর। আমাদের গ্রাম খুব বড় নয়। জমিদার সামান্য সম্পন্ন গৃহস্থ মাত্র। কিছু তালুকদারও আছেন। পাঁচ-ছয় ঘর ব্রাহ্মণ, ত্রিশ-বত্রিশ ঘর বৈদ্য, পনের-ষোল ঘর কায়স্থ এবং আরও প্রায় ত্রিশ ঘর গৃহস্থ নিয়ে এ গ্রাম। এখানে এক ঘর চণ্ডাল, দুই ঘর কুম্ভকার, এক ঘর নট্ট বা বাজনাদার, তিন ঘর ধোপা, দু' ঘর নাপিত, এক ঘর ভুঁইমালী, এক ঘর যোগী বা নাথও বাস করে। যোগী পরিবারটি বিত্তশালী। ঝালকাঠীতে ওদের কাপড়ের গদি আছে। পাশের গ্রামের তিলি, নমঃশূদ্র, গোয়ালা, মুসলমানেদের সঙ্গে আমাদের গ্রামের মানুষদের খুব সদ্ভাব। সকলের সঙ্গে সকলের ভালবাসা।

আমাদের গ্রামের আলোচনা প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে বাঙলার প্রত্যেকটি গ্রামেই নানাশ্রেণীর লোক বসবাস করে। গ্রামবাসী অধিকাংশই চাষী। কোনও কোনও গ্রামে কামার অথবা কুমারের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। আবার কোনও গ্রাম ব্রাহ্মণ প্রধান, কোনও গ্রাম বৈদ্যপ্রধান, কোনও গ্রাম মুসলমান প্রধান। তাছাড়া এমন গ্রামও আছে যেখানে প্রাধান্য দেশীয় খৃষ্টানদের। বাঙলায় আদিবাসী প্রধান গ্রামও আছে। আছে মিশ্র গ্রাম। যেখানে হয়েছে সর্বজাতির সমন্বয়। চাষীপ্রধান গ্রামে আছে চাষের প্রাধান্য।

অনেক গ্রামে জমির অভাব। সেখানে চাষ অপেক্ষা কুটিরশিল্প ও অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। সারা বৎসর জাতব্যবসা চালিয়ে অনেকেরই জীবিকানির্বাহ হয় না। তাই অনেকেই খানিক চাষ, খানিক জাতব্যবসা, খানিক হাতেরকাজ, কখনও মজুরেরকাজ, বা ঘরামিরকাজ ইত্যাদির মারফত জীবিকানির্বাহ করে। বহু গ্রাম বর্ধিষ্ণু। বর্ধিষ্ণু গ্রামে আধুনিক ও প্রাচীন বা ঐতিহ্যসম্পন্ন বিদ্যার চর্চা হয়। অনেক গ্রামে ধনী, জমিদার, বর্গাদার প্রভৃতি বসবাস করে। অনেক গ্রামে বসবাস করে তাদের প্রতিনিধিরা। অনেক গ্রামেই স্কুল, পোস্ট-অফিস ইত্যাদি আছে। অনেক গ্রামে কলেজও তৈরি হয়েছে, থানা বা পুলিশের চৌকিও বিরল নয় গ্রামে। অনেক গ্রামের নদীতে ঘুরে বেড়ায় জল পুলিশ। এই সব কারণে প্রতিনিয়ত এক গ্রাম থেকে অপর গ্রামে গ্রামবাসীর যাতায়াত ঘটে। গ্রামে বসবাসকারী মানুষদের নিয়ে তৈরি হয় পাড়া। যেমন কায়স্থ প্রধান অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের নিয়ে তৈরি হয় কায়স্থ পাড়া। তেমন ব্রাহ্মণ প্রধান অঞ্চল ব্রাহ্মণ-পাড়া, বৈদ্য প্রধান অঞ্চল বৈদ্যপাড়া, হাড়ি, ডোম, বুনো প্রভৃতি প্রধান অঞ্চল হাড়িপাড়া, ডোমপাড়া, বুনোপাড়া। বৃত্তি অনুযায়ী, বাড়ী বা পাড়া ঠিক হয়। যেমন কুমোরপাড়া, কামারপাড়া, জমিদার বাড়ী, উকিল বাড়ী, ডাক্তার বাড়ি ইত্যাদি। উকিল বা ডাক্তার গ্রামে বসবাস না করলেও তাঁদের বৃত্তি অনুসারে বাড়ীর নাম ঠিক করতে কোন অসুবিধা নেই। পদবী অনুযায়ীও বাড়ী ঠিক করা যায়।



যেমন সেন বাড়ী, গাঙ্গুলী বাড়ী, বোস বাড়ী ইত্যাদি। এই সব গ্রাম পত্তন বা বিন্যাসের রীতি এক এক অঞ্চলে এক এক প্রকারের। বাঙলার গ্রামে প্রত্যেক বাড়ীর মাঝে একটি উঠোন থাকবেই, ঘর মাটি, বাঁশ, টিন, করোগেট প্রভৃতির সাহায্যে তৈরী। বাঙলায় আয়ত বা চতুরস্র আসন বিশিষ্ট ও সমতল ছাদযুক্ত কুটির যেমন দেখা যায়, তেমন দেখা যায়

আয়ত আসন ও ঢালু ছাদযুক্ত বাড়ী অথবা চক্রাকার আসন ও শঙ্কুবৎ ছাদবিশিষ্ট কুটির। কুটিরের দরজা ঘরের দেওয়ালের সঙ্গে বসান থাকে, এবং কুঠরিতে প্রবেশের জন্য থাকে পৃথক দরজা। অনেক পাহাড়ী-দেশে কাঠের খুঁটির উপর পাটাতন বা বাঁশ দিয়ে মঞ্চ তৈরি করে তার উপর ঘর নির্মিত হয়। চালাঘরের দেওয়াল নানাভাবে দেওয়া হয়। পশ্চিম-বঙ্গের পল্লীগৃহের দেওয়ালে সাধারণতঃ থাকে মাটির দলা, তার উপর পলেস্তরা প্রায়ই করা হয় না। কিন্তু সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতিদের ঘরের মাটির দেওয়ালে লাল, কালো প্রভৃতি রঙের বাহার দেখা যায়। তাদের দেওয়ালে ময়ূর, হাতী, ফুল প্রভৃতি অহরহই চোখে পড়ে। মাটির দেওয়াল ছাড়া অনেক জায়গায় শালের বল্লা পাশাপাশি বসিয়েও দেওয়াল নির্মিত হয়। এ ধরণের কুটির দেখা যায় জঙ্গলমহল অঞ্চলে। পূর্ববঙ্গে বাঁশ ও বেত সহজলভ্য হওয়ায় সেখানে বাঁশ ফাটিয়ে তা দিয়েই বেড়া দেওয়া হয়। অনেক জায়গায় দেওয়া হয় হোগলার বেড়া। এবং ছাদে খড়কুটো, ছন বা করোগেট। ছনের চাল বাঙলায় খুবই জনপ্রিয়। পশ্চিমবঙ্গের অনেক স্থানে খোলার চাল দেখতে পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের অনেক গ্রামের বাড়ির চালে 'রাগ' বা 'কোর' দেওয়া হয়। এ ধরণের চাল মুঘলদের আমলে দিল্লী, আগ্রা, রাজস্থানেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ঐসব স্থানের মিস্ত্রীদের কাছে 'বাঙালীছত্রী' বা বাঙলাদেশের ছাত নামে এই ছাত জনপ্রিয় ছিল। 'রাগ' দেওয়া চালের কোণা চারচালা ঘরের কোণাচের মত সোজা করে না রেখে বাঁকিয়ে রাখতে হয়। চালের নীচের ভার 'পাড়' বা 'পাড়ি'র উপর ন্যস্ত থাকে। যদি ঘর খুব লম্বা হয় তবে 'পাড়' বা 'পাড়ি' ছাড়া 'তীর' ও 'শাঙ্গা'ও ব্যবহৃত হতে পারে। ঘরকে পোক্ত করার জন্য একপ্রস্থ 'তীর' ও 'শাঙ্গা'র দুই দিকে বা দুই মুড়োর নীচে আবার 'তীর' ও 'শাঙ্গা' বসান হয়। এইভাবে সৃষ্ট ঘরবাড়ী নিয়েই বাঙলার গ্রামের পত্তন হয়েছে। এই গ্রামেই পাওয়া যায় বাঙালীর আসল পরিচয়, সঠিক পরিচয়। বাঙালীর বাঙালীত্ব এখানেই এখনও অটুট।

আমাদের গ্রামে বহু কিছু ছিল। পাঠশালা ছিল, একটা মেয়েদের জুনিয়র হাইস্কুল ছিল, একটা ছেলেদের হাইস্কুল ছিল। মেয়েরা জুনিয়র হাইস্কুলে পাস করার পর ঘরে বসে লেখাপড়া করত, এবং ছেলেদের হাইস্কুলের মারফত 'প্রাইভেটে' ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিত। আমাদের এই গ্রামে পোস্টঅফিস ছিল, খেলার মাঠ ছিল, থিয়েটার করার পাকা স্টেজ ছিল। অনেক পুকুর

ছিল। বিরাট একটি দীঘি ছিল। লঞ্চঘাট ছিল। লঞ্চঘাটে বসার জায়গায় বড় সেতু ছিল। সেতুর উপর বসে গালগল্প করার ব্যবস্থা ছিল। আমাদের জেলায় রেলওয়ে নেই। আমাদের যাতায়াত করতে হয় জলযানে, নৌকায়, লঞ্চে বা স্টীমারে। আমাদের গ্রামে স্টীমারঘাটও নেই। পাশের গ্রাম—সাহেবগঞ্জে গিয়ে বরিশাল শহরে যাবার স্টীমার ধরতে হত আমাদের। অথবা ঝালকাঠীতে গিয়েও স্টীমার ধরতে পারতাম। লঞ্চঘাটের বিশেষ ভূমিকা বা-কদর আছে আমাদের গ্রামে, আমাদের জেলায়। নদীবহুল আমাদের গ্রামের মধ্য দিয়েই লঞ্চ যাতায়াত করে। যাতায়াত করে গয়নার নৌকাও। সারি সারি ডিঙ্গি ও ডোঙ্গা নৌকা। নদীর ঘাটে গেলে মাঝিদের রান্নার ঘ্রাণ ভেসে আসে। ইলিশমাছের ডিঙ্গি ঢেউয়ের তালে তালে ভেসে চলে। কাঁকড়া ধরার জন্য সকলে এসে সমবেত হয় নদীর ঘাটে কাঁকড়ার ওজানীর সময়। বঁড়শী, নানাপ্রকার জাল, ছাবি, চাই প্রভৃতি দিয়ে মাছ ধরার প্রচেষ্টা আছে। দৈনন্দিন মাছ ধরার কাজে নিযুক্ত আছে পালতোলা নৌকা। নদীর পাড়ে বা ব্রিজের উপর বসে বসে দূরদিগন্তে বাঁকা রামধনু, নৌকা-মাঝিদের ব্যস্ততা, কৃষিজীবী, শ্রমজীবী মানুষদের কর্তব্যপরায়ণতা দেখে দেখে আমরা দিন কাটাতাম। বেশ আনন্দ ছিল তখন মনে।

পাঠশালার গুরুমহাশয় জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। আফিং-এর প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল। এখনও তাঁর দড়ি দিয়ে বাঁধা চশমার চাহনি, তেলে পাকানো তিন-চার রকমের বেত ও কঞ্চির ছড়ি ও সযত্নে রক্ষিত কিছু ভাঙা ইটের টুকরোর কথা মনে হলে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। তিনি বাদী-বিবাদী মানতেন না। তাঁর বেত যখন তখন যত্রতত্র ব্যবহৃত হত। ইটের টুকরো হাতে দিয়ে 'নিল-ডাউন' করে রাখতে তাঁর কখনই কষ্ট হত না। পড়া না-পারলে সকলকে শাস্তি পেতে হত। তবু তিনি দুষ্টুমি বরদাস্ত করতেন কখনও কখনও, কিন্তু পড়া না-পারাকে নৈব নৈব চ। তিনি সিধার ভক্ত ছিলেন। আমাদের সাধ্যমত 'সিধা' তাঁকে দিতাম। কিন্তু 'সিধা' নিয়েও তিনি বেত্রখণ্ড বা কঞ্চির ছড়িকে বিশ্রাম দিতেন না। শাস্তি দেবার জন্যই যেন বিধাতা তাঁকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আমরা তাঁকে এত ভয় করতাম যে পারতপক্ষে তাঁর ধারেকাছে দিয়ে যেতাম না। যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলতাম তাঁকে।

চোখ সংবেদনশীল ইন্দ্রিয়। এই চোখ মানুষের বহির্জগত ও অন্তর্জগতের সংযোগ সাধনের পথ। চোখ মানুষকে আলো ও অন্ধকারকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার শক্তি দিয়েছে। যারা সে ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ ব্যবহার করে পথ নির্বাচন

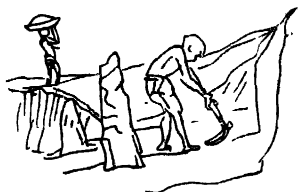
করেন তাঁরা বিজ্ঞ, জীবন-যুদ্ধে জয়ী হন তাঁরা। আমাদের গুরু মহাশয় এই রকম বিজ্ঞ ছিলেন। তাই দুটি জিনিষের প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল। তিনি স্ত্রী-লোকদের অতিমাত্রায় ভয় করতেন। কোনদিন অতিরিক্ত বেত্রাঘাতের ফলে আহত কোন বালকের মাতা বা মাতৃস্থানীয়া কেউ তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে আসছেন দেখতে পেলেই তিনি চণ্ডীমণ্ডপের পাশের কুঠরীতে বা নিকটস্থ পোস্টঅফিসে গিয়ে লুকাতেন। এবং যতক্ষণ না তিনি সংবাদ পেতেন বা দেখতে পেতেন যে আগন্তুকা রাগে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে চলে গেছেন ততক্ষণ তিনি কিছুতেই পাঠশালায় ফিরে আসতেন না। তাঁর দ্বিতীয় দুর্বলতা ছিল তাঁর নাম সম্পর্কে। এক দুঃসাহসিক বালক রামদাস পণ্ডিতমশাইর নামের অর্থ—হনুমান চালু করে দেওয়ায় তিনি বড়ই কষ্ট পেয়েছিলেন। কিছুতেই তিনি রামযাত্রা শুনতে যেতেন না। গ্রামের বাগানের বাঁদর দল তাড়াতে গিয়ে তাঁর শিষ্যবৃন্দ যখন 'ঐ পণ্ডিতমশায়', 'ঐ পণ্ডিতমশায়' বলে চীৎকার করত এবং সে চীৎকারের ধ্বনি যখন তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছাত তখন তাঁর মুখের যে চেহারা হত তা দেখে সত্যি আমরা কষ্ট পেতাম।

পণ্ডিতমশাই কিন্তু যেমন মারতেন তেমনই ভালবাসতেন আমাদের। তাঁর ভালবাসার প্রমাণ পেয়েছিলাম তখন—যখন বিভিন্ন পরীক্ষায় কিছু কিছু জলপানি পেয়েছিলাম। প্রত্যেক জলপানি পাবার পর যখনই প্রথম তাঁর সঙ্গে দেখা হত তখনই তিনি আমাদের বুকে জড়িয়ে ধরতেন। এবং শুনিয়ে দিতেন যে এ জলপানি তাঁরই জন্য। তাঁরই শিক্ষার গুণে। সে কথা অস্বীকার করিনি, করতেও পারি না। আদর্শ-শিক্ষক ছিলেন তিনি।

ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর পূর্বে স্মৃতি নির্ভর এই গ্রামের কথায় ফেলু বা সুরেন ঠাকুর বা আমাদের গোঁসাঞ্রির ঠাকুরের পূজকের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে নসা ঠাকুরের কথা। এঁরা একাধারে পুরোহিত, বিপদে-আপদে পরামর্শদাতা, এবং হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। সুরেন ঠাকুর অতি প্রত্যূষে স্নানাদি করে ফুল তুলতেন আর কৃষ্ণের সহস্র নাম সঙ্কীর্তন করতেন। তাঁর গানে আমাদের ঘুম ভাঙত। এই দুই পুরোহিতের একজনের নাদুসনুদুস, অপরজনের অতি দীর্ঘ দেহ। তাঁদের চন্দন-চর্চিত ললাট, বিরাট উপবীত, সদাহাস্য মুখ এখনও মনে পড়ে। সুরেন ঠাকুর পূজাআচ্চা নিয়েই থাকতেন। নসা ঠাকুর তাস-পাশা-দাবাও খেলতেন। প্রতি সন্ধ্যায় আমরা নসা ঠাকুরের কাছে গিয়ে তাঁর নানা গল্প শুনতাম। তিনি গল্প বলতে বলতে মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোক বলে আমাদের তাক্ লাগিয়ে দিতেন। একই গল্প রোজ শুনেও আমরা ক্লান্তি অনুভব করতাম না। এই নসা

ঠাকুর একবার কলকাতায় এসেছিলেন। ফিরে গিয়ে তিনি শুধু প্রাচীন কলকাতার গল্পই বলতেন। বলতেন যে, গত শতকের কলকাতার এত রবরবা ছিল না। বরং তাকে বর্ধিষ্ণু গ্রাম বলা যেত। কলকাতায় ধানচাষও হত শদেড়েক বছর আগে। যাদের চাষের জমি ছিল না তারা দিনমজুর খাটত। ধানের জমিতে চাষ ছাড়া চাষী ফুল ও ফলের জমি চাষআবাদ করত। নানাবিধ পেশার লোক ছিল তখন কলকাতায়। কূপ বা ইঁদারা খনন কাজের জন্যও নির্দিষ্ট লোক ছিল। নলকূপ ও কলের জলের আমদানীতে এই বৃত্তির লোকেরা বৃত্তিচ্যুত হল, সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তিচ্যুত হল তারা যারা ইঁদারার ভিতর নেমে ঘটি ঘড়া বালতি প্রভৃতি তুলে দিত। শহরের পত্তনে এইসব বৃত্তির অবলুপ্তি হলেও অনেক নতুন বৃত্তিতে অধিক লোকের দরকার হয়ে পড়ে। যেমন পাল্‌কি-বেহারা। অন্তত একশ বছর আগেও কলকাতায় প্রায় তিন হাজার পাল্‌কি-বেহারা ছিল। পালকি-বেহারাদের সাহায্যকারী মশালচী বা মশাল-বাহকের সংখ্যা কলকাতায় ছিল তিন শতাধিক। একই সময় কলকাতায় পাখাওয়ালাদের সংখ্যা ছিল দুই সহস্রের উপর। এদের সকলেই সর্বক্ষণের কর্মী ছিল না। ছেলেরা বা মেয়েরা উভয়েই এ কাজে উপযুক্ত বিবেচিত হত। ঢেঁড়াওয়ালা ছিল আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৃত্তি। সেকালে ডুম্ ডুম্ শব্দ করে ঢেঁড়াওয়ালা দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করত। লোক জড়ো হলে ব্যবসায়ী বা সরকারী বিবৃতি ঘোষণা করা হত। দোলযাত্রার পূর্বে পুলিশের লোক ঢেঁড়াওয়ালা সঙ্গে করে ঘুরত। পুলিশ কমিশনারের বিজ্ঞপ্তিও প্রচার করা হত এইভাবে। এইসব কথা শুনতে আমাদের বড় ভাল লাগত। নিলামের কথা জানান দিতেও নাকি ছিল ঢেঁড়াওয়ালা। তামাকওয়ালাও ছিল অনেক, ওরা ফরসিওয়ালা। গুড়গুড়িতে তামাক সাজিয়ে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত। বিড়ি-সিগারেটের প্রচলনে এই তামাকওয়ালারা বেকার হয়ে পড়ে। শহর থেকে বিতাড়িত হলেও ওদের অনেকেই সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তিচ্যুত হয় না। অনেকে গ্রামে আশ্রয় পায়। নসা ঠাকুর এমন চমৎকার গুছিয়ে গুছিয়ে এ সব কথা বলতেন যেন মনে হত তিনি সবই তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন। তিনি আবার বলতেন, শহর পরিত্যক্ত বহু জিনিস সহজেই গ্রাম গ্রহণ করে। ক্রমে কুয়া কাটার লোকেরা তাই গাঁয়ের পুকুর কাটা লোকেদের সঙ্গে মিশে যায়। যেমন আদিবাসী কোড়া সম্প্রদায়। পুকুর কাটতে ওদের চেয়ে ওস্তাদ সম্প্রদায় আর নেই। কোন পুকুর কাটা শুরু করলে সে পুকুরে জল না তোলা পর্যন্ত ওদের

কাজের শেষ হয় না। কিন্তু এই পুকুরের জল শুদ্ধ বা শোধন করে না নিলে পবিত্র কোন কাজে সে জল ব্যবহার করা যায় না বলে লোকের বিশ্বাস। এই পরিশুদ্ধির প্রক্রিয়াকে অনেকে বলেন পুকুর বিয়া। পুকুর বিয়া খুবই ব্যয়সাধ্য। বিয়ের আগে পর্যন্ত নাকি জলে দুর্গন্ধ থাকে। পুকুর বিয়েতে ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয়। ব্রাহ্মণ ছাড়া লৌহকারেরও বিশেষ স্থান আছে এখানে। পূজার আগে পুকুরের মাঝে গাছের থাম বা স্তম্ভ পোতা হয়। পাড়ে কীর্তন বা অনুরূপ কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নাচনী বা যাত্রাও হতে পারে। আত্মীয়-স্বজন-পরিজনদের নিমন্ত্রণও করার রীতি আছে। পুরুত ঠাকুর পুকুর পারে গঙ্গার উদ্দেশ্যে পূজা করেন। অনেক স্থানে হোমযজ্ঞ করার রীতি, কিন্তু তা বাধ্যতামূলক নয়। পুকুরের মালিক ও মালিকগিন্নী পূজার পূর্ব পর্যন্ত উপবাসী থাকেন। পূজান্তে সকলকে প্রসাদ এবং অতিথি অভ্যাগতদের সেবা হয়ে গেলে নিজেরা জলপান করেন। এ পূজায় বলিরও রেওয়াজ আছে। বলিপ্রদত্ত পশুকে ঘাস, লতাপাতা প্রভৃতি খেতে দেওয়া হয়। পূজায় বেলপাতা, সিঁদুর, চন্দন, দুর্বা, ধূপদীপ, মিষ্টি সামগ্রীর ব্যবহার হয়। পশু যদি এই ভোজ্যদ্রব্য না খায় তবে তা দুর্ভাগ্যের সূচনা করে বলে লোক বিশ্বাস। বলির রক্ত সর্বত্র ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এই পূজায় অন-আর্য-রীতি সুস্পষ্ট। পুকুর পূজায় যে স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা তার সঙ্গে রূপকথার স্ফটিকস্তম্ভের তুলনা করা যেতে পারে। এই স্তম্ভের ভ্রমর-ভ্রমরীর মধ্যে থাকে রাক্ষস-খোক্কসের প্রাণ। কোড়া-সম্প্রদায়ের লোক ছাড়া আরও অনেক লোক পুকুর কাটার কাজ করে। যখন চাষের কাজ থাকে না তখন যে চাষীকে আহ্বান করা যায় সে-ই পথে মাটি দিতে মাটি কাটার কাজ করে থাকে।



মাটি কেটে 'রিলিফে'র যে টাকা পায় তা দিয়ে কোনরকমে তাকে চালিয়ে নিতে হয় সংসার-খরচা। অন্য যানের আগমনে পাল্কিবেহারা কলকাতা থেকে বিতাড়িত হলে চলে যায় গাঁয়ে। দুলে-বাগদী, বাউড়ী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকদের আগে পাল্কি বহন করাই ছিল প্রধান কাজ। এখনও অনেক আচার অনুষ্ঠানে তাদের ডাক পড়ে। যদিও ওদের অনেকেই এখন কৃষিকাজ করছে।

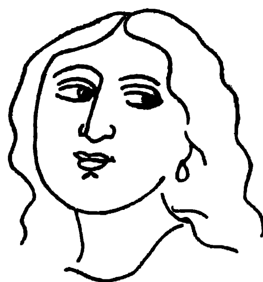
করছে অন্যান্য শ্রমের কাজও। কয়লা খনি অঞ্চলে কামিন বা শ্রমিকের কাজে মেয়েদের মধ্যে বাউড়ী সম্প্রদায়ের মেয়েরাই ছিল পথিকৃৎ। তাছাড়া ধাত্রীর কাজ তো ওদের প্রায় একচেটিয়া। তামাকওয়ালা এখন নেই। গ্রামের লোক নিজেরাই তামাক সাজায়, নিজেরাই তা সেবন করে। সহর থেকে যেমন নানাবৃত্তি লোপ পেয়েছে তেমনি লোপ পেয়েছে নানাবিধ ছোট ছোট শিল্প ও কুটিরশিল্প গ্রাম থেকে। মৃৎশিল্প, পটশিল্প, দারু ও কারুশিল্প, লাক্ষাশিল্প, কাঁসাশিল্প, কাঠ, বাঁশ ও বেত প্রভৃতি শিল্পের অনেক শিল্পীই বৃত্তিচ্যুত হয়েছেন, আবার বহু বৃত্তিচ্যুত লোক পেয়েছে বহুবিধ কাজ। সকলেই কোন-না-কোন রকমে মানিয়ে নিয়েছেন নিজেদের। নসা ঠাকুরের একটা চেষ্টা ছিল কলকাতার সঙ্গে আমাদের গ্রামের একটা সম্পর্ক গড়ে তোলার। তা যখন পারতেন না তখন তিনি কখনও করতেন কলকাতার প্রশংসা, কখনও করতেন কলকাতার নিন্দা। কলকাতার যখন প্রশংসা করতেন তখন এমনভাবে কলকাতার বর্ণনা দিতেন যা শুনে মনে হত এই কলকাতা দেখা না গেলে মানব জীবনই বৃথা। যখন নিন্দা করতেন তখন বলতেন কলকাতা একটা নরক, সমস্ত অনাচার অপরাধের জগৎ। কলকাতার নানাগল্প শুনে শুনে কলকাতা সম্পর্কে আমরা একটা অদ্ভুত ধারণা পোষণ করতাম। তারপর একটু বড় হয়ে যখন বরিশাল শহরে এলাম তখন বরিশাল শহরের আলো, কলের জল, সিনেমা, বাজার, দোকানপাট, ভালমন্দ লোক ইত্যাদির সঙ্গে কলকাতার তুলনা করতে চাইতাম, কিন্তু কলকাতা প্রবাসী সমস্ত লোক আমাদের তুলনাকে নস্যাৎ করে দিয়ে আমাদের কষ্ট দিত। নসা ঠাকুরের অপরূপ বিবরণ শুনে আমরা যেভাবে কলকাতার উপর আকৃষ্ট হয়েছিলাম, বলতে বাধা নেই, কলকাতা এসে সেভাবেই আমরা মায়াবী কলকাতার আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম। মনে হল যেন এক অবিশ্বাস্য জগতে এসে পড়েছি। রাজপুত্তুরের রাজকন্যা পাওয়ার মতই কৌতূহল উদ্দীপক স্থান এই কলকাতা। এখানে ভাল-মন্দর চমৎকার সহাবস্থান ঘটেছে। সহাবস্থান ঘটেছে কালোর সঙ্গে আলোর।

যাইহোক, কলকাতার কথা ছেড়ে দিয়ে আমরা আমাদের যে গ্রামের কথা বলছিলাম তার কথায় ফিরে যাই। আমরা যখন কলকাতার কথা, সাহেবদের কথা, ধর্মের কথা, পরণকথা ইত্যাদি শুনতাম নসা ঠাকুরের কাছে তখন রাঙ্গাগিন্নিও নিমন্ত্রিত আমাদের সঙ্গে গল্পের আসরে এসে যোগদান করতেন। রাঙ্গাগিন্নি বালবিধবা। পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলে তাঁর কেউ না থাকায় শতাধিক বিঘা জমির মালিকাণী ছিলেন তিনি। আমাদের সঙ্গে যখন গল্প

শুনতেন তিনি তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশের কম হবে না, কিন্তু তাঁর সুঠাম দেহ তাঁর বয়স বুঝতে দিত না। সেই সদা প্রফুল্ল, সহাস্য, সেবাপরায়ণা, অনন্যসুন্দরী মহিলাকে এখনও যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

তিনি স্বপাকে একবেলা হবিষ্যান্ন করতেন, মোটা দেশী কাপড় পরতেন, কোনদিন ব্লাউজ পরতে দেখিনি তাঁকে। কখনও সেমিজ পরতেন, কখনও তাও ছিল না। কাপড়ের উপরিভাগ দিয়েই চমৎকার পরিপাটী করে সামলে রাখতেন নিজেকে। তিনি ছিলেন আমাদের গাঁয়ের প্রধান 'যজ্ঞের রাঁধুনী'। তাঁর রান্না সোনামুগের ডাল, সুক্তো, চচ্চড়ী, মোচারঘন্ট, নানাবিধ অম্বল, পিঠা ও আচার যে খেয়েছে সে জীবনে তাঁকে ভুলতে পারবে না। অমন গোছাল-গৃহিণী বড় বেশী দেখা যায় না। পুরান ঘি, পুরান গুড়, পুরান চাল প্রভৃতি যখন যার দরকার হত সেই গাঁয়ের সকলেই তখন ছুটত এই রাঙ্গাগিন্নীর কাছে। আচার, আমসত্ত্ব, গঙ্গাজল সবই তাঁর ভাণ্ডারে সর্বদা মজুত থাকত।

তিনি গ্রামের মেয়েদের সূচীশিল্প শিক্ষা দিতেন। তাঁর বয়সী অন্য বিধবারা প্রায়ই মুখরা ও কড়া মেজাজের ছিলেন। কিন্তু এই রাঙ্গাদিদি, রাঙ্গাপিসী, রাঙ্গাঠাকুরমা, রাঙ্গামামীর রাগ কখনও কেউ দেখে নি। যদিও তিনি ছিলেন ভয়ানক সংস্কারবাদী। শনি ও বৃহস্পতিবারের বারবেলায় কোন কর্ম তিনি করতেন না। বলতেন—শনি ও বৃহস্পতিবারের বারবেলায় যে কাজ করা যায় তা নিষ্ফল হয়। বলতেন—মঘানক্ষত্রে যাত্রা করলে বিপদ ঘটবেই। এই ধরণের অনেক সংস্কার তাঁর অস্থি-মজ্জার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। ভূতেরও ভয়



ছিল তাঁর প্রচণ্ড। তিনি হাতজোড় করা নমস্কার অপেক্ষা ভূমিষ্ঠ প্রণাম বেশী পছন্দ করতেন। কেউ দুহাত তুলে নমস্কার করলে তিনি সুখী হতেন না। বলতেন, প্রণাম ও নমস্কারের মধ্যে তফাত আছে।

নমস্কার নমঃ, এই ক্রিয়া। সম্মুখে মাথা নত করলেই নমস্কার। গলায় কাপড় দিয়ে মাথা সম্মুখে রেখে বুক পর্যন্ত নীচু হয়ে নমস্কার করা হয়,

এই নমস্কারের অর্থ আমি আপনার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করছি, আমার মাথা নীচু করলুম। এখন আপনি আমার শিরোচ্ছেদও করতে পারেন। একবস্ত্রে কারুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারা যায় না। দ্বিতীয় বস্ত্র বা-চাদরের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে নেওয়া যেতে পারে। তাই যখন হাত জোড় করা হয় তখন দেখান হয় যে হাতে কোন অস্ত্রশস্ত্র নেই। জোড়হাত যখন মাথায় তোলা হয় তখন দেখান হয় বাহুমূলেও কোন অস্ত্র নেই।

প্রাচীন আমলে নমস্কার জানাতে জোড়হাত মাথার উপরে তোলাই রীতি ছিল। কিন্তু এখন হাতজোড় করে কপালে ঠেকান হয়। এ ভাবে হাতজোড় করে নমস্কার অপেক্ষা ভূমি স্পর্শ করে প্রণামে গাঁয়ের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অনেকেই বেশী তৃপ্ত হন। এবং সম্মানিত হন বলে মনে করেন। রাঙ্গাপিসী নমস্কার একদম সহ্য করতে পারতেন না। তিনি বলতেন—প্রণামের ভূমি স্পর্শের মধ্যে আরও দীনতা প্রকাশ পায়। অর্থাৎ সেখানে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, মাথা আপনার পায়ের কাছে রাখলাম, ইচ্ছা করলে আপনি আমার শিরশ্ছেদও করতে পারেন। ভূমিষ্ঠ প্রণাম ছাড়া যে সাষ্টাঙ্গপ্রণাম তাতে লম্বা হয়ে শুয়ে অষ্টঅঙ্গ দ্বারা ভূমি স্পর্শ করার রীতি। অষ্টঅঙ্গ অর্থাৎ দুই হাত, দুই পা, দুই পার্শ্ব, বক্ষ ও শির। তাছাড়াও আছে দণ্ডবৎ প্রণাম। দেহকে দণ্ডবৎ লম্বা করে মাটির উপর উপুড় হয়ে শুয়ে দু খানা হাত মাথার উপর থেকে মাটিতে রেখে প্রণাম। এখানেও দেখান হয় হাতে কিছু নেই। আপনি স্বচ্ছন্দে আমার শিরশ্ছেদ করতে পারেন। তাছাড়া পাদস্পর্শ করেও প্রণাম করা যায় এবং 'গড় করা' যায়। গড় করা মানে দুই বাহুদ্বারা পদযুগল বেষ্টন করা। গড় মানে গর্ত এবং দুই হাত মানে দুর্গ প্রাকার। প্রাচীনকালে 'গড় করা'কে অনেকে 'শিয়ালীকরা' বলত।

যদিও মেয়েদের প্রণামের ব্যাপারে 'সাষ্টাঙ্গপ্রণাম', 'দণ্ডবৎ', 'গড় করা' প্রভৃতি আচরণ শোভন নয়। তারা জোড়হাত বুক পর্যন্ত তুলে মাথা নুইয়ে হাত স্পর্শ করে। হাত উপরে তোলে না। তারা গুরুজনদের পদস্পর্শ করে প্রণাম করে। প্রণামের মধ্যে নাকি সমীহ আছে, ভক্তি আছে। আর নমস্কারে আছে ঔদ্ধত্য, অশ্রদ্ধা রাঙ্গাপিসীমার মতে।

রাষ্ট্রীয় কারণে গ্রামছাড়া হলেও এবং কার্যোপলক্ষে কোন গ্রাম-সমীক্ষা করতে এসে তাই ভুলতে পারি না ফেলে আসা আমাদের সেই গ্রামের কথা। রাঙ্গাপিসীর কথা। ভুলতে পারি না দীর্ঘ শ্মশ্রুশোভিত সেনমহাশয়কে,

ভুলতে পারি না হরিয়ার মাকে। ভুলতে পারি না গ্রাম্য বিবাদ-বিসম্বাদকে। এরা যেন সেই আদিকাল থেকে একইভাবে বাঙলার গ্রামে গ্রামে বসবাস করে যাচ্ছে। কোন পরিবর্তন, কোন রদবদল এদের হয় নি।

সেনমহাশয় কারুর সঙ্গে বড় একটা মেলামেশা করতেন না। তিনি ছিলেন কালীভক্ত। নিজে নিজের কাজ করতেন আর কালীকীর্তনে সময় কাটাতেন। সংসারে তাঁর আর কেউ ছিল না। গাঁয়ের জমিদার তাঁকে কিছু জমিজমা দিয়েছেন। এমনিতেই তাঁর চলে যায়। জমিদারবাবু সহরবাসী। তিনি প্রতি পূজায় গাঁয়ে আসেন। মহাধুমধাম করে পূজা করেন। দানধ্যান করেন। গ্রামের লোকেদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলেন। সেনমহাশয়ের অনুষ্ঠিত কালী-পূজা অবধি গাঁয়ে থেকে জমিদারবাবু আবার সহরে ফিরে যান। জমিদারবাবু যে কয়দিন গ্রামে থাকতেন সে কয়দিন সেনমহাশয় ও জমিদারবাবু দুইজনে একত্রিত হয়ে নানাগল্প, নানাকথা বলতেন। জমিদারবাবু দানশীল, গম্ভীর প্রকৃতির লোক। তাঁর শাসন ছিল কঠোর। কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারত না সেনমহাশয় ছাড়া। সকাল-সন্ধ্যায় তামাক টানতে টানতে দুই বৃদ্ধের অনুচ্চ স্বরে কথাবার্তা চলত। আমরা এই নিয়ে অনেক জল্পনাকল্পনা করতাম। অত কি কথা বলেন ওঁরা দু'জনে।

সেনমহাশয় ছিলেন অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। তাঁর মেজাজকে ভদ্র-ইতর জনেরা ভয় করত। ফাজিল কথা বলে অন্যায় কাজ করে কেউ তাঁর কাছে রেহাই পেত না। লোকে অসাক্ষাতে তাঁকে 'মাথা পাগলা' বলত। সাক্ষাতে ভয় করত। তিনি নিজের কাজ করতেন, গান করতেন আর বাঁশের লাঠি, হুঁকো-কল্‌কে নিয়ে ছুটোছুটি করতেন। কেউ তাঁকে তাঁর নাম ধরে ডাকতে সাহস করত না। একবার জমিদার-নন্দন তাঁকে প্রকাশ বলে ডাকায় প্রকাশ সেন মহাশয় এমন গর্জন করে তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে ভবিষ্যতে সেও সাবধান হয়ে চলত। পিতৃবন্ধুকে সমীহ করত।

সুযোগ বুঝে সকলে একদিন সেনমহাশয়কে ধরলাম, জমিদারের সঙ্গে তাঁর এত কি কথা হয় তা জানতে চাইলাম। তিনি বললেন—'এসব তোরা কি বুঝবি, জমিদার আর আমি একসঙ্গে পাঠশালায় পড়তাম। তারপর তিনি সখের-যাত্রার দল খুললেন—সে আজ পঞ্চাশ বছরের কথা। তখন আমরা ছেলের-দল লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে দিবারাত্র যাত্রার মহলা দিতাম। রাস্তাঘাটে জমিদার রচিত গান গেয়ে বেড়াতাম। এই সখেরযাত্রার দলে জমিদারের অনেক অর্থ ব্যয় হয়েছে। জমিদার হতেন রাজা আর আমি রাণী। দেখে

সকলে অবাক। সেসব দিনকাল বদলে গেছে, সেদলের এখন আমরা দু'জনেই বেঁচে আছি।' বলেই সেনমশায় হুঁকো টানতে থাকেন।

হুঁকো গ্রাম বাঙলার পরম আদরের সামগ্রী। সাধারণ হুঁকোয় তামাক খাবার সময় সেটাকে হাতে তুলে নিতে হয়, কিন্তু গুড়গুড়ি, গড়গড়া, ফুরসি, আলবোলা প্রভৃতি মাটিতে বসান থাকে। খোলের সঙ্গে লম্বা নল ও পাইপ থাকে। নল, নইচ্যা, খোল প্রায়ই নানারূপ কারুকার্যমণ্ডিত। গ্রামাঞ্চলে এখনও ভদ্রতা রক্ষায়, অতিথি অভ্যাগতদের আদর আপ্যায়নে পান-তামাক বিশেষ জনপ্রিয়। হুঁকো সম্পর্কে বাঙলায় বিভিন্ন কথা, কাহিনী, ধাঁধা, ছড়া প্রভৃতি প্রচলিত আছে। হুঁকো বন্ধ করা মানে সমাজচ্যুত করা। হুঁকোর মাথায় থাকে কলিকা। কলিকা ফুলের আকৃতি বিশিষ্ট মাটির পাত্র। এই পাত্রে তামাক সাজিয়ে কাঠকয়লা বা গুল দিয়ে তামাকে আগুন ধরিয়ে দিতে হয়। কলিকার ছিদ্রপথে একটি গোল টুকরা বা চাকতি রেখে তার উপর তামাক সাজান হয়। বোধহয় আকবরের রাজত্বকালে তামাক আমদানী হয় এদেশে, সপ্তদশ শতকের গোড়ায়, আনুমানিক ১৬০৪-০৫ সনে। ইংরেজ বণিকদের আমলে হুঁকোর নব-জাগৃতি ঘটে। হাটে, মাঠে, ঘাটে, বৈঠকখানায়, কাছারীতে সর্বত্র হুঁকো, সর্বত্র আলবোলার ফুরুড়ু ফুড়ুৎ টান। এই সময়ই থেলো হুঁকো আলবোলায় পরিণত হয়। এবং অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে আলবোলায় তামাক সেবন প্রতিষ্ঠাবানদের বিলাসিতার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। তাই হুঁকাবরদারদের সৃষ্টি হয়েছিল। হুঁকাবরদারেরা সাহেবদের খানাপিনার সময় চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে আলবোলার নল হাতে নিয়ে কলকেতে ফুঁ দিত—সাহেব খানা সেরে গল্প করতে করতে নলটি নিয়ে আরামে চোখ বন্ধ করে দিতেন একটি টান। অনেক টান। সুখ টান। নাক মুখ কানের ছিদ্রপথ দিয়ে বের করে দিতেন ধোঁয়া। সাহেব আরামের আওয়াজ ছাড়তেন—আঃ, তারপর শান্তি।

মেম সাহেবও তাম্রকূটের আস্বাদ নিতেন। কোন পুরুষকে সম্মান প্রদর্শন করতে মেয়েরা সেই পুরুষের মুখের আলবোলার নলে বা হুঁকোয় ধূমপান করতেন। পুরুষেরাও শিষ্টাচারের অঙ্গ হিসাবে হুঁকো বা আলবোলা এগিয়ে দিতেন মহিলাদের দিকে। রাজভবনেও আলবোলার প্রবেশ ঘটেছিল ঐ সময়ে। কোন বিশিষ্ট আসরে কেউ ভুক্ ভুক্ করে ধূম উদ্গীরণ করছে, কেউ ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে শব্দ করছে, এ দৃশ্য না-দেখাই ছিল

তখন অস্বাভাবিক। বিভিন্ন ধরণের হুঁকো, গুড়গুড়ি, আলবোলায় বিভিন্নসুগন্ধি তামাক সেবনকে নিয়ে অনেক কাব্য সাহিত্যও রচিত হয়েছে বাঙলায়। তবুও কটন সাহেব ১৭৮৪ সনে সায়েব মেমসায়েবদের বলনাচের সভা থেকে হুঁকোর ব্যবহার নিষিদ্ধ করেন। যেভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ধূমপান নিষিদ্ধ করেছেন সিনেমা, থিয়েটার ও ট্রাম বাস থেকে। ১৮৪০ সনের মধ্যে হুঁকো, গুড়গুড়ি বা আলবোলার প্রচলন বন্ধ হয় শহরে, কিন্তু গাঁয়ে হুঁকো এখনও সমান আনন্দ ও তৃপ্তির ধারক ও বাহক। শহরের সিগারেট, চুরুট এখনও গ্রামদেশে তেমন প্রতিপত্তি বিস্তার করতে পারে নি। খাঁটি নেপালী সুখায় প্রস্তুত বিড়ি গ্রামান্তরে জনপ্রিয় হলেও গ্রামের যাঁরা হুঁকোয় অভ্যস্ত তাঁরা বিড়িতে সুখ পান না।

তাই কৃষক কানে বিড়ি গুঁজে রেখে তামাকের জন্য আকুপাকু করে। সাময়িক বিশ্রামের সুযোগে হুঁকোয় টান দিয়ে নেয়। সেনমহাশয়ের হুঁকোঅন্ত প্রাণ। বিড়ি বা সিগারেট খেতে দেখে নি তাঁকে কেউ। কেউ বিড়ি বা সিগারেট দিলে তিনি তা নিতেন না, ডান হাত উঁচু করে হুঁকো কল্‌কে দেখিয়ে বলতেন—'এর কাছে ওসব কিচ্ছু লাগে না।'

সেনমহাশয়ের কাছ থেকে জমিদারবাবুর যাত্রার দলের কাহিনী ও অন্যান্য গল্প শুনে যখন চৌরাস্তার মোড়ের তেঁতুল গাছের তলা দিয়ে বাড়ী ফিরতাম তখন গা ছম্ ছম্ করত। ভয় করত। কয়েক হাত তেঁতুল গাছের সীমানা। তেঁতুল গাছে আছে ভূতের সংসার। এই সীমানা পার হতে রাম রাম বলে



চোখ বুজে দৌড় দিতাম। অনেকসময়ই হোঁচট খেতে খেতে সীমানা পার হতাম। প্রতিদিন এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হত। এরই মধ্যে যদি কোনদিন—শিয়াল—পাতিশিয়াল-এর হুক্কা-হুয়া ধ্বনি শুনতে পেতাম তখন আর এগুতে পারতাম না। কে যেন পা দুটোকে পাষাণচাপা দিয়ে দিত। যেদিন এমন হত সেদিন একনাগাড়ে আরও নানা বিপদ এসে আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে

জড়িয়ে ফেলত ভূতের গন্ধ, বাদুরের ঝাপটানি, বুদ্ধ-ভূতুমের ডাকে আমাদের হিমশীতল গায়ে ঘামের জোয়ার বয়ে যেত। মাঝে মাঝেই এমন হত। তবুও আমরা সেনমহাশয়ের কাছে যেতাম। তাঁর কাছে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা, জমিদারবাবুর অভিজ্ঞতার কথা ইত্যাদি শুনে পুলকিত হতাম। তাঁর কাছে নানা জিনিষও খেতে পেতাম। আমাদেরও সময় কাটাতাম ভালভাবে।

জমিদারবাবুর পরলোকগমনের পর তাঁর পুত্র জমিদারীর দায়িত্ব পায়। সে ন্যায়পরায়ণ, শহরপ্রেমী এবং সর্বপ্রকার দান-ধ্যানের বিরোধী ছিল। সে পূর্বপুরুষের পূজাপার্বণ বজায় রাখল বটে তবে আত্মীয় সমাগম ও অকাতরে অন্নদানের ব্যবস্থা বন্ধ করে দিল। সে বলত—'আমার ন্যায্য পাওনা ষোলআনা নেব, সওয়া ষোলআনা চাই না, আর পৌনে ষোলআনা নেব না'। কর্তা-বাবুর সময়ে প্রজাদের দুঃখেকষ্টে খাজনা মাপ হত। তাঁর পুত্রের কাছে মাপ বস্তুটি কি তা জানা ছিল না। তাই সে নালিশের তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করে চলল। প্রজার দুঃখে তার বিবেক দংশন করে না।

জমিদারতনয় আবিষ্কার করল যে সেনমহাশয়ের বিস্তর টাকা খাজনা বাকী। তাছাড়া তিনি প্রায় পনের বিঘা জমি নিষ্কর ভোগ করছেন। কিস্তি কিস্তি খাজনা প্রায় তিন বছর ধরে দিচ্ছেন না, নগদী-পাইক গেলে তাদের গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। সে ভেবে পায় না, কেন সেনমহাশয় এ কাজ করেন। কি হয় তাঁর এত টাকা দিয়ে। জমি তো অনেক, মানুষ তো একা।

সে সেনমহাশয়কে ডেকে পাঠাল। খাজনা না দেবার কারণ বর্ণনা করে তিনি বললেন—'দু' তিন বছর অজন্মা হওয়ায় তিনি খাজনা দিতে পারেন নি। তাছাড়া জমিদার কর্তার মৃত্যু হওয়ায় তাঁর মনও ভেঙে গেছে। চাষীর কাজের কোন কিছু দেখাশুনা করেন নি। ওরা যা দিয়েছে তাতে সম্বৎসরের খোরাকীও হয় না। আমার জমান টাকাও নেই, তাই খাজনা বাকী। কর্তা চলে গেছেন, এখন আমিও চলে যেতে পারলে বাঁচি ; কি সুখে আর বাঁচা ?'

জমিদার পুত্র এইসব কথায় খুসি হল না। সে বলল—'তোমার নামে বাকী খাজনার জন্য নালিশ হবে।' সেনমহাশয় এরূপ ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি সামলাতে না পেরে ক্রোধাগ্নি বর্ষিত করে বললেন—'তুমি জমিদারের কুপুত্র।' এই বলে তিনি কাছারী পরিত্যাগ করলেন।

সেইদিনই নালিশ হল এবং একতরফা ডিক্রি হয়ে গেল। সেনমহাশয় কোন মোকদ্দমাতেই জবাব দিলেন না। জমিদারপুত্র ডিক্রির টাকার জন্য অস্থাবর ক্রোকের হুকুম আনল। এইদিন জমিদারবাবুর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ।

ব্রাহ্মণ ভোজনের পর নতুন জমিদার বৈঠকখানায় বসে কোর্টের নাজির এবং নায়েবের কাছে সেনমহাশয়ের মালক্রোকের বিবরণ শুনছিল এমন সময় মলিন বেশে সেনমহাশয় জমিদারবাবুর সামনে এসে দাঁড়ালেন, সঙ্গে ছিল তাঁর সেই চিরপরিচিত হুঁকো-কলকি এবং রূপা বাঁধানো বাঁশের লাঠি।

এসেই বললেন—'ছোটবাবু তোমার মনের সাধ মিটেছে, কি কুলপ্রদীপ তুমি—তোমার বাবা যা দিয়েছিলেন তুমি তা কেড়ে নিলে! তা বেশ, আমি গরীব, তুমি বড়লোক, জমিদার। খাজনা দিতে পারি নি তাই মালক্রোকের আদেশ পর্যন্ত আনিয়েছ। ভালই করেছ। কিন্তু তুমি কি জানতে যে নিষ্কর জমিগুলো তোমার বাবা আমাকে ভালবেসে দিয়েছিলেন? বোধ হয় জানতে না, তাই শোন, জেনে রাখ যে, তুমি যখন ছ' মাসের শিশু হঠাৎ তখন তোমার ধনুষ্টঙ্কার হতে আরম্ভ হয়। অনবরত বৃষ্টি। চতুর্দিক বানে ভেসে গেছে। চারদিকে শুধু জল আর জল। ঘরের বার হবার উপায় নেই। এমন সময়, তোমার বাবা হিরণ্যবাবু এসে বল্লেন—প্রকাশ এক্ষুণি সহরে গিয়ে ডাক্তার ডেকে না আনলে আমার ছেলে বাঁচবে না। কিন্তু এ দুর্যোগে সাড়ে তিনক্রোশ পায়ে হেঁটে গিয়ে ঝালকাঠী থেকে কে ডাক্তার আনবে? তোমার বাবার মুখ দেখে আমার বুক ফেটে যেতে লাগল। আমি বললাম—আমি যাব ডাক্তার ডেকে আনতে। তারপর বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় জনমানব নেই। তুমি জান যে দেড়-দুই ক্রোশ হেঁটে যাবার পরই নদী। নৌকা নেই, কি করি! দুর্গা বলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম জলে। কে যেন আমায় হাতীর বল দিল। নদী সাঁতরে তীরে উঠতেই বাঁধান রাস্তায় গিয়ে পড়লাম। শীতে কাঁপতে কাঁপতে খুঁজে বের করলাম ডাক্তারবাবুকে। এই দুর্যোগের মধ্যে সে আসতে চায় না। তাকে বেশী লোভ দেখান হল। মাঝিদের ডবল ভাড়া কবুল করে সন্ধ্যা নাগাদ ডাক্তার ও প্রয়োজনীয় ওষুধ নিয়ে ফিরে এলাম। জমিদার কর্তা আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন ছেলে-বেলাকার মত। অবশেষে তুমি সেরে উঠলে। তখন তোমার বাবা আমাকে পনের বিঘে নিষ্কর জমি লিখে দিলেন। আমি বলেছিলাম—জমি দিয়ে আমার কি হবে, আমার স্ত্রীপুত্র নেই, সংসার নেই। কিন্তু তা কে শোনে। তক্ষুণি হুকুম হয়ে গেল। ছোটবাবু সেই জমি, যে জমি জোর করে তোমার বাবা আমায় দিয়েছিলেন, তা তুমি কেড়ে নিলে! তাতে আমার দুঃখ নেই, আমি মরলে এটা এমনিতেই তোমার হাতে এসে যেত। আমি কোনদিনই ও জমির ফসল ঘরে তুলি নি। যারা চাষ করত তারাই সে জমি ভোগ করত।

অজন্মায় ওরা খাজনা দিতে পারে নি ক'বছর তাই জমিদারীর খাজনাও দেওয়া হয় নি। কিন্তু তবুও তুমি নালিশ করে ক্রোকের ব্যবস্থা করে কেন এ অপমান করলে আমায়? তোমরা অনেক বড়লোক, সামান্য কটা-টাকার লোভ সম্বরণ করতে পারলে না?' এই বলে সেনমহাশয় কোথায় যেন চলে গেলেন। আর গাঁয়ে ফেরেন নি। আর কেউ তাঁর খোঁজ পায় নি।

আত্মসম্ভ্রম সম্পন্ন এই ভদ্রলোকটির কথা মনে হলে ভারী কষ্ট হয়। এখনও বিরক্তির উদ্রেক হয় জমিদার-নন্দনের উপর। মনে পড়ে হরিয়ার মা অর্থাৎ কালিচরণ নাগের স্ত্রীর কথা। দু'বছর বয়সে তাঁদের একমাত্র ছেলে হরি মারা যাবার পর আর কোন সন্তান হয় নি। সকলে তাঁকে হরিয়ার মা বলেই ডাকে। এই ডাকের জন্যই তার পিতৃপ্রদত্ত নাম অপেক্ষা এই নাম চালু হয়ে যায়, আসল নাম সৌদামিনী অন্তরালে চলে যায়।

কালিচরণবাবু নির্বিবাদ ভালমানুষ এবং একটু মুখচোরা। তাঁর স্ত্রী আমাদের পাশের গাঁয়ের মেয়ে। সকলেই তাঁকে চিনত পাড়া-কোঁদলী হিসাবে। তিনি ছিলেন ভয়ানক শুচিবায়ুগ্রস্ত। কত সকালে তাঁর ঘুম ভাঙত জানি না তবে এটুকু জানি যে বাড়ীর ভিতরের দু'খানি শোবার ঘর, রান্নাঘর, বারান্দা, গোয়াল, উঠোন প্রভৃতি তিন-চারবার করে গোময়লিপ্ত করে তিনি যখন 'সেন-পুকুর' থেকে স্নান সেরে ফিরতেন তখন আমরা পাঠশালায় যেতাম, এবং পথে হরিয়ার মার গমনভঙ্গী লক্ষ্য করতাম। অশুচি হবার ভয়ে পথ দিয়ে সোজা চলতে পারতেন না তিনি। মধ্যে মধ্যে সকলসী লাফ দিতেন। স্ফীতদেহী, বেঁটে, ফরসা এই মহিলার লাফ দেখে আমরা আনন্দ পেতাম, এবং পথ অশুচি করে রাখার দরুণ অদৃশ্য শত্রুর প্রতি গালাগালির রকম শুনে বিস্মিত হতাম। 'ওই পোড়ামুখো কাক কি ফেলে গেছে'। কোথাও কলসীভাঙা, কাগজের টুকরো, ছাই পড়ে আছে, কোথাও ছেঁড়া ন্যাকড়া পড়ে আছে, তা দেখে পাড়ার সকলকে 'শতেকখোয়ারী', 'পোড়াকপালী', 'মুখপোড়া-মিনসে' প্রভৃতি শব্দে মুখ ব্যাদান করতে করতে অগ্রসর হতে হতেও ছোঁয়াচে পড়া থেকে রক্ষা পেতেন না তিনি। ফলে পথে যে-সব পুকুর বা ডোবা পেতেন সেখানে আর একটা ডুব দিয়ে শুদ্ধ হয়ে নিতেন। এমনি করে যখন তিনি ঘরে পৌঁছতেন তখন পাঠশালা থেকে ফেরার পথে আবার আমাদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে যেত। একবার আমাদের একজন বলল—'হরির মা পচা ডোবার জলে ডুব দিয়ে তুমি কিভাবে শুদ্ধ হও?' উত্তরে তিনি সেই বালকের ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষের জন্য নানাবিধ সুখাদ্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ভয়েভয়ে কেউ আর তাঁকে ঘাঁটাত না।

তবু সকলেই তাঁকে নিয়ে টিটকারী দিতে মশকরা করতে চেষ্টার ত্রুটি করত না।

তাঁর শুচিবাই দেখে কোন আধুনিকা তাঁকে কিছু বললে তিনি খুব রেগে যেতেন। বলতেন—'আমি যা খুশী করি তাতে আবাগীদের চোখ টাটায় কেন? নিজেরা তো ঢঙী, বেঙী, মেমেদের মত আচরণ, আ-মর, মর'। বলতেন 'আমরা শুদ্ধ হয়ে দেবতার অর্চনা করি, ক্ষুধিতের পেটে নিজের হাতে রেঁধে খেতে দিই, তাতেও আবাগীদের ঈর্ষা। কেন তোদের কে নিষেধ করেছে এ সব কাজ করতে। ব্যাডাদের লগে ফুল হয়ে গল্প করতে তোদের লজ্জা করে না, কিন্তু আমাদের করে। তোদের ভাবভঙ্গি দেখে আমাদের পিত্তি জ্বলে যায়। দ্যাখ না ওদের কাণ্ড। আমরা যখন রাত্তিরে সোয়ামীর ঘরে ঢুকি তখন আলো নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করে তবে ঢুকি। সে লজ্জা তোদের আছে কি? তোদের লজ্জা নেই, তোরা বেহায়া, তাই আমাদের আচরণে তোদের এত গা জ্বলে, শুদ্ধতায় বুক পোড়ে। আমরা সকালে একহাত ঘোমটা দিয়ে সোয়ামী ওঠার আগেই বিছানা ছাড়ি। সারাদিনে আর তার সঙ্গে দেখা করি না। লজ্জায় মরি। লজ্জায় লজ্জায় থাকি। রান্নাঘরে বসে দশজনের সেবাযত্ন করে আমরা শান্তি পাই। দেশীয় ভাবে, দেশীয় দ্রব্যসম্ভারে আমরা তৃপ্তি পাই। আবাগীদের মত বিলিতী ঢঙ আমরা পছন্দ করি না। ঠোঁটে রঙ লাগাতে দেখলে আমাদের মন বিষিয়ে ওঠে। গা রি-রি করে ছোট করে চুল ছাঁটা দেখে! তা যাই বলো বাপু, বাঙালী



মেয়েদের চুলেই মানায়। সে চুলই যদি না থাকে, তবে বাঙালীত্ব থাকে কি ভাবে। হাঁ, আমাদের আত্মমর্যাদা আছে। আমরা ওসব করি না, তোদের মত মেমী-ঢঙ করতে লজ্জায় মরে যাই। আমরা পরের হাতে ভাত খেতে শিখি নি। নিজে রাঁধিবাড়ি, দশজনকে দিই, নিজে খাই। তাতেই আমাদের আনন্দ। স্ফুর্তি। কলসী-কাঁখে নদী-পুকুরঘাটে জল আনতে যাই, সারাদিন অন্ন-

ব্যঞ্জনাদি রান্না করি, চিড়া, মুড়ি, খই, মিঠাই, মণ্ডা, পিঠা, পায়স তৈরী করি, খালি পায়ে হাঁটি, অল্প খরচায় সংসার চালাই। সায়া, সেমিজ, ব্লাউজের দরকার হয় না আমাদের। কাপড়ের আঁচল দিয়েই নিজেদের ঢেকে রাখতে আমরা জানি। আমরা শুধুমাত্র শুচিশুদ্ধ হয়ে আমাদের কাজকর্ম করতে চাই। তাতে কার কি? কেন তাতে আবাগীদের চোখ টাটায়? আমরা সকালে ঘরে, দাওয়ায় গোবরের ছিটা দিই, ঘর লেপি, বাসি বাসনকোসন মাজি, বাসি কাপড় ছেড়ে রান্নাঘরে ঢুকি, স্নান করে আহারের ব্যবস্থা করি, ঘরদোর ধুই, মুছি। সকাল-সন্ধ্যায় ধূপ দিই, প্রদীপ জ্বালি, আরতি দিই—শুদ্ধমতে দেবতার আরাধনা করি। এই সব কি কু-সংস্কার? এই সব কি শুচিবাই? স্নান করে আসার সময় আমাদের ছুঁতে নিষেধ করি, জুতা পায়ে রান্নাঘরে ঢুকতে বারণ করি। নিজেদের শরীর ও সংসারের সকলের মঙ্গলকামনায় উপবাস করি, তাতে কার কি? আমাদের মা দিদিরা যেভাবে চলত, আমরা সেভাবেই চলবো, তাতে যে কপালপুড়িদের চোখ টাটায়, টাটাক। কিছুতেই আমরা ওদের মত ঢলাঢলি করতে পারব না'। এমনিভাবেই নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে নাগগিন্নি স্নানান্তে যখন গৃহকর্ম ও রান্নাবান্নায় প্রবৃত্ত হতেন তখনও তাতে নানা বিঘ্ন দেখা দিত। কখনও বিড়াল এসে তাঁকে ছুঁয়ে দিত বা রন্ধন-সামগ্রীর প্রতি মুখ ছোঁয়াত। সঙ্গে সঙ্গে কাপড় পরিবর্তন করে, নতুন খাদ্য-সামগ্রীর জোগাড় করা ছাড়া উপায় থাকে না তাঁর। তারপরেও যে বিপত্তি ঘটত না এমন নয়—'পোড়া পেটের জন্য দুটা ভাত রাইন্ধ্যা খামু তাও কি শুদ্ধ অইয়া খাবার উপায় আছে'! কোনও দিন ঘুঁটের সঙ্গে চুল, কোনও দিন সাতবার ধোঁয়া কাঠের মধ্যে নেকড়ার ফালি, তার উপর কাক, চিল, চড়াই প্রভৃতি পাখিদের উপদ্রব তো আছেই। ডেয়ো পিঁপড়ার আঁস্তাকুড় থেকে সোজা তরকারীর থালায় ওঠা প্রভৃতি উপদ্রব যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এদের প্রত্যেকের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে ও শুদ্ধ হয়ে খাবার খেতে সব জিনিষ ফেলে দিয়ে পুনরায় রান্নার জোগাড় করতে হত তাঁকে। ফলে, বহুদিন নাগ মহাশয়ের নিজেকে হবিষ্যান্ন করে আহারের ব্যবস্থা করতে হত। সে রান্না গিন্নী খেতে পারেন না, তাই তিনি ফলার করে কাটাতেন। অশুদ্ধভাবে খেয়ে জাত জন্ম দেওয়া অপেক্ষা অনাহারী, ফলাহারী থাকাকে তিনি উপযুক্ত কাজ মনে করতেন। এবং তার জন্য অনুতপ্ত হতেন না।

বিকেলে তিনি যখন পাড়াবেড়াতে বের হতেন তখন সঙ্গে নিতেন জলভরা

একটি ঘটি। নিজ ঘটির জলে পা ধুয়ে শুদ্ধ হয়েই কারুর বাড়ীতে গিয়ে উঠতেন। ঘটিবিহীন হরিয়ার মাকে কল্পনা করা যায় না। অনবরত স্নান, জলঘাঁটার ফলে তার হাতে পায়ে হাজা হয়েছিল। সে হাতে কোন মিষ্টান্ন দিলে মিষ্টান্নলোলুপ বালকেরা পর্যন্ত তা গ্রহণে আপত্তি জানাত।

এই নাগ-গিন্নীর শুদ্ধাচারের জীবনে একবার অশুচিতার পরিচয় পাওয়া যায়। বসন্তের প্রকোপে গ্রামের অনেকের সঙ্গে বাগ্দী বদন চৌকিদারের স্ত্রী কমলা মারা যায়। চৌকিদার-গিন্নী কমলা হরিয়ার মাকে দিদি বলত। মহামারীতে চৌকিদারও মারা যায়। মরবার সময় বদন চৌকিদারের স্ত্রী হরিয়ার মাকে বলেছিল, 'দিদি, মেয়েটা রইল। জানি না, মা শীতলা ওকে ছাড়বে কি না। ওটা যদি বাঁচে একটু দেখো, ওটাকে দেখবার আর কেউ নেই। তোমার উপর ভার রইল দিদি।'

এই অন্তিম অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না পুত্রহারা নিঃসন্তান নাগ-গিন্নী। সন্তানহারা নারীহৃদয়ে মাতৃস্নেহের বেদনা হাহাকার করে উঠল। তিনি আচার-বিচার শুচিতা সামাজিক বৈষম্য সব ভুলে গিয়ে মেয়েটিকে কোলে তুলে নিলেন। তাঁর এই আচরণে গ্রামের অনেকেই তাঁর প্রতি রুষ্ট হল। বলাবলি আরম্ভ করল—'বুড়ো বয়সে নাগ-গিন্নীকে ভীমরতিতে ধরেছে, মাগী এবার মরবে।' নাগ-গিন্নী ওদের পরোয়া করেন না। তিনি মেয়েটার নাম রাখেন উমা। দিনে দিনে সে বেড়ে ওঠে। এক বর্ধিষ্ণু চাষী পরিবারে তার বিয়েরও ব্যবস্থা করেন নাগমশায়। পাত্র পেতে খুবই কষ্ট করতে হয়েছিল, অনেক খোঁজাখুঁজি করতে হয়েছিল নাগ দম্পতিকে।

বিয়ের আগে উমার বিয়ের ব্যাপারে যত উৎসাহ ছিল, বিয়ের দিন ঘনিয়ে আসতে ততই উৎসাহ কমে যাচ্ছিল হরিয়ার মার। মধ্যে মধ্যে কারণে অকারণে তাঁর চোখে জল দেখা যেতে লাগল। তাঁর মেজাজ রুক্ষ হয়ে উঠল। নাগমশাইর বাড়ীতে টেকা দায় হয়ে পড়ল। তিনি পালিয়ে বেড়ান। গিন্নী উমাকে দিয়ে কর্তাকে ডাকিয়ে আনেন। তবুও উমার বিয়ে হয়। কন্যা বিদায়ের দিনে নাগ-গিন্নীর হৃদয়ে যে বিপ্লব উঠেছিল, তা ঈশ্বর ছাড়া আর কে বুঝবে। নাগ-গিন্নীর মনের যখন এই অবস্থা তখন নতুন বউ পালকিতে বসে। পালকিওয়ালা 'শালাবড় ভারী হেই', 'শালাবড় ভারী হেই' শব্দ করতে করতে তালেতালে চলছিল। অবিরাম শোনা যাচ্ছিল সে শ্রমধ্বনি। এই ধ্বনিরই মধ্যে ভেসে আসছিল হৃদয়বিদারক ও করুণ বামা-কণ্ঠ। পালকিতে বসে উমা ও তার বর নাগ-গিন্নীর উত্তরবঙ্গীয় ঝির কণ্ঠে রাজসাহীর উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের

সঙ্গীত শুনতে লাগল। উমা বড় হবার পর নাগ-গিন্নী আচারের মাত্রা কিছুটা কমিয়ে দিয়েছিলেন। বয়স হয়ে যাওয়াতে তিনি উত্তরবঙ্গীয় একজন ঝি রেখেছিলেন। উমার শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় সেই ঝি গান গাইছিল—'বোলো হায় হায় সাতশ কোদালে রাস্তা বাঁধে রাজার মালী। বোলো হায় হায় উড়িয়া যায়ছে বরের মায়ের পালকি ॥ বোলো হায় হায় রাস্তায় আছে মুচিয়ার বাসা। বোলো হায় হায় আধো রাস্তা আইসতে ছিনিয়া নিল পালকি ॥ বোলো হায় হায় সখের বিয়াত মায়কে হেরানু। বোলো হায় হায় সাতশ কোদালে রাস্তা বাঁধে রাজার মালী। বোলো হায় হায় রাস্তায় আছে মেথরের বাসা। বোলো হায় হায় আধা রাস্তা আইসতে ছিনিয়া নিল পালকি ॥ বোলো হায় হায় রঙের বিয়াত ভাবীকে হেরানু। বোলো হায় হায় সাতশ কোদালে রাস্তা বাঁধে রাজার মালী ॥ বোলো হায় হায় এদিক দিয়া যায়ছে বরের চাচীর পালকি। বোলো হায় হায় রাস্তায় আছে ডোমের বাসা। বোলো হায় হায় আধো রাস্তা আইসতে ছিনিয়া নিল পালকি ॥ বোলো হায় হায় তামসার বিয়ায় চাচীকে হেরানু।' বরবধূ এগিয়ে চলে। পালকি বেহারাদের শ্রমধ্বনিতে ওর গান আর শোনা যায় না। ঘরে বসে নাগ-গিন্নী তখনও কেঁদে চলেছেন। কাঁদে উমাও পালকিতে বসে। স্বামীর আদরে ও সোহাগে সে কান্না ঝড় হয়ে বয়ে যায়। কিন্তু পালকি বেহারাগণ থামে না। তারা তাদের 'হুম্ না, হুম্ না', 'ধাক্কুনাবড়, হেঁইয়ানাবড়', 'বোলো হায় হায়' ধ্বনির আজান দিতে দিতে এগিয়ে চলে। তাদের ধ্বনিতে গ্রামবাসী বুঝতে পারে যে নতুন বউ যাচ্ছে। কেউ কেউ কৌতূহলবশত উঁকি মেরে দেখে কে যায়। যে গাঁয়ে নতুন বউ যাবে সে গাঁয়ে চলছে তখন অন্য উল্লাস, অন্যরকম ব্যস্ততা।

নতুন বউ আসার সংবাদে উল্লাস জাগে গ্রামে। 'ধাক্কুনাবড়, হেঁইয়ানাবড়' শব্দ করতে করতে আট ফুট লম্বা, চার ফুট উচ্চতা ও চার ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট একটা বাক্সের মধ্যে বর ও কনেকে নিয়ে চারজন জোয়ান পালকি বেহারা এগিয়ে চলে। প্রতিপদক্ষেপে তাদের শ্রমধ্বনি। হুম্ না—হুম্ না, হেঁইয়ানাবড়, ধাক্কুনাবড় শব্দ। এই শ্রমধ্বনি শ্রমজীবী মানুষের জীবনের অঙ্গ। ছাদপেটান গানে, নৌকা-বাইচে, অথবা কোন ভারী জিনিষ তুলতে বা বহন করে নিতে, পোস্ট অফিসের রানারের দৌড়ে সর্বত্রই আছে শ্রমধ্বনির অস্তিত্ব। পালকিবেহারাদের নিজস্ব গানও আছে। এ গান যাত্রী-মনোরঞ্জনের গান নয়। এ গান শ্রম লাঘব করার গান। স্থান কাল পাত্রভেদে গানের কথা ভিন্ন ভিন্ন।

সে গানে থাকে কখনও সামাজিক চিত্র, কখনও পাওয়া-না-পাওয়ার কাহিনী। নানা সুর, ছন্দ ও ধ্বনি সহযোগে তা গীত হয়। মানুষ বহনে ক্লান্ত বেহারা কখনও দৌড়ে দৌড়ে, কখনও পায়ে-পায়ে হেঁটে, কখনও ধীর মন্থরগতিতে পালকি চালায়। অধিক ক্লান্ত হয়ে পড়লে কোনও বৃক্ষছায়ায় পালকি নামিয়ে বিশ্রাম নেয়। আবার যখন যাত্রা সুরু হয় তখন গানও সুরু হয়। এই মেহনতী মানুষের ছন্দোবদ্ধ অঙ্গ সঞ্চালনের কথা সুর ও ছন্দোময় একটি গানের কথা মনে পড়ছে। গানটি—'হুম না হুম না। হুম না হুম না। পাল্‌কি চলে, হুম না। পালকি চলে, হুম না। গগন-তলে আগুন জ্বলে কি হুম না, হুম না। স্তব্ধ গাঁয়ে আদুল গায়ে, হুম না, হুম না। যাচ্ছে কারা রৌদ্রে সারা, হুম না, হুম না। ময়রা মুদি চক্ষু মুদি, হুম না, হুম না। পাটায় ব'সে ঢুলছে কষে, হুম না, হুম না। দুধের চাঁছি শুষছে মাছি, হুম না, হুম না। উড়ছে কতক ভন্‌ভনিয়ে, আসছে কারা হন্‌হনিয়ে। হাটের শেষে রুক্ষবেশে, ঠিক দুপুরে ধায় হাটুরে, হুম-না, হুম-না।...দুলকি চালে নৃত্য তালে, ছয় বেহারা জোয়ান তারা। গ্রাম ছাড়িয়ে, আগ বাড়িয়ে, নামল মাঠে তামার টাটে। তপ্ত তামা যায় না থামা, হুম-না হুম-না।...পেরজাপতি হলুদবরণ, শশার ফুলে রাখছে চরণ। কার বহুড়ি বাসন মাজে? পুকুর ঘাটে ব্যস্ত কাজে। হুম না হুম না।... পালকি চলে রে, অঙ্গ ঢলে রে। আর দেরী কত? আর কত দূর? "আর দূর কি গো বুড়ো শিবপুর? ওই আমাদের ওই হাটতলা। ওরি পিছুখানে ঘোষেদের গোলা"। হুম-না, হুম-না। পালকি চলে রে, অঙ্গ টলেরে, সূর্য ঢলে রে, পালকি চলে, পালকি চলে রে। হুম-না হুম না হুম-না, পালকি চলে হুম না।' চলেছে উমা ও তার বর। প্রাচীন যানবাহনের অন্যতম বাহন এই পালকি। ঐশ্বর্য ও বাবুগিরি দেখাবার জন্য, ধনী গৃহিণীদের গঙ্গা স্নানের জন্য, সাহেবদের অফিস যাবার জন্য এমন কি যুদ্ধযাত্রায় পর্যন্ত এই



পালকির ব্যবহার ছিল এককালে এই বাঙলার শহরে ও গ্রামে।

অনেক সময় দূরদেশে যেতেও পালকির ব্যবহার হত। তখন একটা ছোট-খাটো সংসার থাকত পালকিতে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর সামাজিক প্রথানুযায়ী যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে হাতী, ঘোড়া, পালকি ও গোরুর গাড়ীর মধ্যে একটা যানকে বেছে নিতে হত রাজারাজড়াদেরও। অবশ্য এই বেছে নেবার

মধ্যে রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থানের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। যেমন রাজ্যটি পূর্বদিকে অবস্থিত হলে হাতী, পশ্চিম দিকে হলে ঘোড়া, উত্তর দিকে হলে পালকি এবং দক্ষিণ দিকে হলে গরুর গাড়ীর দরকার হত।

শ্রমধ্বনি মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হাটতলায় এসে বর ও কনে নামে। ছুটে আসে গ্রামের বৃদ্ধবৃদ্ধা, কুললক্ষ্মীরা বরণডালা হাতে। ছেলেমেয়েরা ভীড় জমায় নতুন বরকনে দেখতে। চারদিকে খুশী উজ্জ্বল চোখের চাহনি। 'কোথায় বউ?' এরই মধ্যে পালকির দরজা খুলে যায়। রাঙা টুকটুকে পা দুটো পাপড়ির মত বেরিয়ে আসে। শাঁখ, উলুধ্বনি মুখরিত করে নূতন বউ নামে। তার পরনে রাঙাচেলী, কপালে চন্দন আর সিঁদুরের টিপ। লাজুক গম্ভীর হাসি। শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, মঙ্গলগানে চারদিক মুখরিত। নববধূ দুধ ও আলতা-গোলা থালায় পা রাখে, কাঁখে নেয় জলের কলস। মাথায় রাখে ধানের কুনকে এবং হাতে এক খাড়ই মাছ নিয়ে দাঁড়ায়। বরের মা এয়োস্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে বরণকুলায় সজ্জিত বিবিধ মঙ্গলদ্রব্য দিয়ে, ধানদুর্বা দিয়ে, বধূকে বরণ করে ঘরে তোলেন। বরণকুলায় থাকে গঙ্গামাটি, শিলাখণ্ড, শঙ্খ, কাজল, হলুদ আয়না, প্রদীপ, সিঁদুর, চন্দন, সাদাসরিষা, মাশকলাইয়ের ডাল, ধান, ঈশারমূল, দুর্বা, ফুল, ছুরি, তাম্রখণ্ড, ঘি ও স্বস্তিক চিহ্ন। তাছাড়া কিছু ধান, কলার কাঁদি, চারটি ছোট ছোট মাটির ঘটে আম্রপল্লব, মাশকলাই ও হলুদ মিশ্রিত জল এবং কিছু মিষ্টি সামগ্রী। বরণ করে সকলেই বধূকে একটু একটু মিষ্টি খাইয়ে দেয়। ঘরে উঠবার পথে একখানা নতুন শাড়ী বিছিয়ে দেওয়া হয়। ঐ শাড়ীর উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে বধূ ঘরে ঢোকে। ঢোকার মুখেই সে দেখে একজন দুধ জ্বাল দিচ্ছে। এমনি ভাবে বসে দুধ জ্বাল দেওয়া হচ্ছে যাতে নববধূ দেখতে পায় যে দুধ উথল দিয়ে পড়ে যাচ্ছে। সচ্ছলতার প্রতীক দুধ উথলে পড়ে যাওয়া। কিন্তু ঘরে উঠতে গিয়ে বাধা পায় ননদ বা তৎস্থানীয়াদের দ্বারা। তখন বরের কাছ থেকে পারিতোষিক না পাওয়া পর্যন্ত পথ ছাড়ে না। বর ওদের খুশী করার জন্য পুরস্কার দেয়। চারদিকে খুশী উজ্জ্বল চোখের চাহনি। বউ ঘরে প্রবেশ করে। পালকিবেহারা বকশিসের আশায় বসে থাকে পালকি নিয়ে। তারা বকশিস নেয়, খায়-দায় চলে যায়।

একদা এই পালকি শুধু গ্রামদেশেই নয় শহরাঞ্চলেও জনপ্রিয় ছিল। যন্ত্রযানের আবিষ্কারে শহর থেকে পালকির নির্বাসন হয়েছে। কিন্তু গ্রামে বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে এখনও পালকি দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের সিউড়ী, মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম, দাসপুরে; পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে, উত্তরবঙ্গের পাবনা,

বগুড়া প্রভৃতি স্থানে পালকি তৈরী হত। দুলু বেহারা বা বাগ্দীজাতীয় লোকেরাই সাধারণতঃ এই পালকির বাহক ছিল। পালকির জনপ্রিয়তা হ্রাসপ্রাপ্ত হলে এ কাজের জন্য বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা বেকার হয়ে পড়ে। আমাদের গ্রামে পালকিতে ছাড়া নৌকায় চড়েও বউ আসে। নৌকায় করে বউ আনার প্রথা আমাদের গ্রামে বিশেষ জনপ্রিয়। তাতে খরচাও কম। মেয়ে-জামাইকে বিদায় দিতে অশ্রুসিক্ত হয়ে মা-বাবা আত্মীয়স্বজনেরা দুঃখ জানায়। কন্যা-বিচ্ছেদের করুণ রসঘন পরিবেশেও গান হয়—'সুনামগঞ্জের নৈদ্যার ঠাকুর, দ্যাখনগঞ্জের মাইয়ারে। (ও) মাইয়্যা লইয়্যা যায় লইয়্যা যায় রে।' পরের বাড়ী মেয়ে পাঠাবার রীতি দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে। যেদিন থেকে বিবাহ প্রথা চালু হয়েছে, সেদিন থেকে অদ্যাবধি একই ভাবে বিবাহাচারাদি অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে গ্রামে ও শহরে। অনুষ্ঠানের ত্রুটি কোথাও পরিলক্ষিত হয় না।

গ্রীষ্মের তাপদগ্ধ বরবধূকে আরাম দেবার জন্য টানা-পাখার ব্যবস্থা করেছিলেন উমার শ্বশুর। ঘরের বাইরে দরজার কাছে বসে রামার মা একনাগাড়ে পাখা টেনে চলেছে। ছয় ঘণ্টা তার 'ডিউটী'। ছ' ঘণ্টা পরে বেঙি এসে রামার মার স্থান পূর্ণ করে। পালা করে রামার মা ও বেঙি পাখা টানে। খাওয়াপরা ছাড়া চার টাকা করে মাইনে পায়। রামার মা দুপুর বারোটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত, আর বেঙি রাত এগারোটা থেকে চারটা পর্যন্ত পাখা টানে। কিন্তু ঘণ্টার জ্ঞান প্রায়শই ওদের থাকে না। তাই ক্ষণে ক্ষণে জিজ্ঞেস করে—'এখন কত প্রহর?' কোনদিন দিনে বেঙি, রাতে রামার মা; কোনদিন রাতে বেঙি, দিনে রামার মা পাখা টেনে চলে। একনাগাড়ে পাখা টানতে টানতে ক্লান্ত হয়ে যখন ঝিমুনি আসে তখন পাখার 'স্পীড' কমে আসে। সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে চীৎকার আসে—'উহুঃ, কি গরম।' সেই চীৎকারে ঘর্মাক্ত ওদের তন্দ্রা ছুটে যায়। জোরে জোরে পাখা টানে, আবার গতি মন্থর হলে আবার চীৎকার। এভাবেই দিন শেষ হয়ে রাত্রি আসে। রাত্রির অবসানে হয় দিনের উদয়। দিন রাত্রির উদয় অস্তে রামার মা বেঙিরাও পাখা টেনে চলে দিবারাত্র পোড়া-পেটের জন্য। একগণ্ডা টাকার জন্য।

রাতে মশা, দিনে মাছি এবং সূর্যের প্রচণ্ড তাপ থেকে উদ্ধার পেতে শহরেই টানা পাখার প্রচলন হয় প্রথম। সে পাখা বিজলীর তাড়নায় বিতাড়িত হলে শহর থেকে গ্রামে চলে যায়। শহর ও গ্রামে বসবাসকারী বর্ধিষ্ণু পরিবারে এই পাখা সিলিঙ-এর সঙ্গে ঝুলান থাকে। একই দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে সব টানাপাখা তৈরী হয় না। কখনও কখনও এক ঘরে একাধিক

পাখা থাকে। সাধারণতঃ মেহগনি কাঠের ফ্রেম দিয়ে এ পাখা তৈরি। কাঠের ফ্রেমের সঙ্গে ঝুলানো ঝালর। ঝালরে নানাবিধ কারু-শিল্প ও সূচীশিল্পের অবস্থান দেখা যায়।

একটা শক্ত দড়ি এই পাখার কেন্দ্রের সঙ্গে বেঁধে দরজার ফাঁক দিয়ে বের করে দেওয়া হয় যাতে ঘরের বাইরে বসেই পাখা টানা যায়। এক ঘরে অনেক পাখা থাকলেও এমনভাবে দড়ি বাঁধা হয় যাতে একজন লোকই সে ঘরের সমস্ত পাখা এক সঙ্গে একই দড়ি দিয়ে টেনে যেতে পারে। টানা-পাখা শহর থেকে চলে গেছে ইলেকট্রিক পাখার চলনে, কিন্তু এখনও বহু গ্রামে এর অস্তিত্ব স্পষ্ট। এখনও বেঙি ও রামার মায়েরা ঘুমিয়ে-না-ঘুমিয়ে পাখা টেনে চলেছে। এখনও চোখ বুজলে পাখাটানা মেয়েদের, ছেলেদের দেখতে পাই। সদাহাস্যলাস্যময়ী রসিক এই ছেলেমেয়েরা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা হয়ত এখনও হারিয়ে যায় নি আমাদের গ্রাম থেকে। হয়ত হারিয়ে যায় নি তারা যারা কারণে-অকারণে গ্রাম্য বিবাদের ঝড় তুলে দিত। গ্রাম্য-বিবাদের এক চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন উইলিয়ম কেরী। গ্রাম্য-বিবাদের কথা মনে পড়লে কেরী সাহেবের উদ্ধৃতি উত্থাপনের লোভ সম্বরণ করা যায় না। এই ধরণের বিবাদ আমাদের গ্রামে প্রায়ই শোনা যেত। 'শুনেছিস তো নির্মলের মা। এই বেনে মাগীর অহঙ্কারে আর চকে মুখে পথ দেখে না।...এ ভাতারখাগি সর্বনাশির পুতটা মরুক তিন দিনে উহার তিনডা বেটার মাথা খাউক ঘাটে বসে মঙ্গল গাউক।... হ্যাঁলা ঝি জামাইখাগি কি বলছিস। তোরা শুনেছিস গো এ আঁটকুড়ি রাঁড়ির কথা। তুই আমার কি অহঙ্কার দেখিলি তিনকুলখাগি আমি দেখে তোর ছেলের মাথার উপর দিয়া কলসি নিয়া গিয়াছিলাম যে তুই ভাতার পুত কেটে গালাগালি দিচ্ছিস। তোর ভালডার মাথা খাই হালো ভালোডা মাগি তোর বুকে কি বাঁশ দিয়েছিলাম হারে। থাকলো ছারকপালি গিদোর থাক। তোর গিদেরে ছাই পল প্রায়। যদি আমার ছেলের কিছু ভালমন্দ হয় তবে কি তোর ইটা ভিটা কিছু থাকিবে যা মনে আছে তা করিব। তখন তোর কোন বাপে রাখে তাই দেখিব। হে ঠাকুর তুমি যদি থাক তবে উহার তিন বেটা যেন সাপের কামড়ে আজি রাত্রে মরে।...ওলো তোর শাপে আমার বাঁ-পার ধুলা ঝাড়া যাবে। তোর ঝি-পুত কেটে দি আমার ঝি পুতের পায়। যালো যা বারোদুয়ারি ভাড়ানি, হাটবাজারকুড়ানি খানকি যা।...ওও পোয়াতি বটে। যা বুন। তুইও যা। ও ও যাউক। আর ঝকড়া কন্দলে কাজ নাই।' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত সাহিত্য-সাধক গ্রন্থমালার

বিভিন্ন খণ্ডে যে এই ধরনের সংবাদ সাহিত্য ছড়িয়ে আছে তা পাঠকদের অজানা নয়। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে জমিদারবাবু ও সেনেদের বিবাদের কথা। এখনও শুনতে পাচ্ছি জমিদারবাবু ও দোয়ারী (দ্বারিকা) সেনের ভাবমিলনের কথা। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মত ছিলেন একে অপরের। কিন্তু কেন জানি না সে আত্মীয়তা প্রচণ্ড রেষারেষিতে পরিণত হয়। বেড়ে চলে ঝগড়া ও বিবাদ। একে অন্যের চেয়ে বেশী বিক্রমশালী, প্রতিপত্তিশালী এটা প্রমাণ করার জন্যই উভয়ের প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতারই ফলে চরের ধারের একটা জমি নিয়ে উভয়ের মধ্যে দারুণ বিবাদ বেধে গেল। উভয়পক্ষই লাঠিয়াল ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য লোক পাঠাল। প্রায় প্রত্যেক গাঁয়েই ওদের পাওয়া যায়। টাকার বদলে জীবন দেয়া-নেয়ার খেলায় গাঁয়ের লাঠিয়ালদেরই শহুরে সংস্করণ ভাড়াটিয়া গুণ্ডা।

আমাদের গ্রামের পাশের গ্রামের করিম সেখ আর বসির সেখ এতদঞ্চলের সেরা লাঠি লড়িয়ে। দুর্দান্ত বলশালী দু'ভাই। বাঘে মহিষে একঘাটে জল খায় এই দু'ভাইয়ের প্রতাপে। ওদের বাদ দিয়ে এতদঞ্চলের কোন বিবাদ জমে না। করিম-বসির দুই ভাই জমিদার ও দোয়ারী সেন উভয়েরই প্রিয়। তাদের উভয়কেই জমিদার ও দোয়ারী সেন নিজ নিজ পক্ষে নিতে চাইলেন। অবশেষে রফা হল। দু' ভাই দু'দলে ভাগ হয়ে গেল। বৃদ্ধ মায়ের দোয়া আর ছেলেমেয়েদের প্রীতিচুম্বন দিয়ে দু' ভাই দুদলের হয়ে লড়তে গেল। পাখিরা গাছে, পশুরা মাঠে, কেউ কারু তোয়াক্কা করে না। খাবারের চিন্তা নেই ওদের। কিন্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ সর্বদা খাদ্যাভাবে প্রপীড়িত। এক দিকে



মেদক্লিষ্ট অপরদিকে শুষ্ক মানুষ। শুষ্ক মানুষেরা মেদক্লিষ্টদের মেদ বাড়াতে সাহায্য করে, তাদের বেঁচে থাকার তাগিদে। করিম-বসিরও তাই কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করতে বাধ্য হয়। টাকার জন্য, পেটের দায়ে! চরের ধারের মাঠে লাঠি, সড়কি আর নানারকম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দু' পক্ষের লোক জড়ো হল। এক দিকের সর্দার করিম। অপর দিকের সর্দার বসির। প্রাণাধিক প্রিয় দুই ভাই।

নিদারুণ হট্টগোলের মধ্যে দাঙ্গা আরম্ভ হল। চীৎকারের সুরে জমিদার ও দোয়ারী বাবুর বিজয়ধ্বনি করতে করতে রণোন্মত্ত লোকগুলো একে অন্যকে আহত নিহত করতে মরিয়া হয়ে ছুটল। ছেরে-রে-রে-রে বলে বিকট চীৎকার, মর্মভেদী আর্তনাদ। সর্দার খুন করার দিকেই সকলের লক্ষ্য। সর্দার খতম হলে জয় অনিবার্য। মোটা রকমের পুরস্কার মিলবে এ কাজের জন্য বিজয়ীর।

করিম ও বসির দু'জনেই নিজ নিজ দলের লোকেদের চীৎকার করে উৎসাহিত করছিল। এরই মধ্যে একে অপরের সম্মুখে এসে পড়ল। মারামারি কাটাকাটির তীব্র উত্তেজনায় ওরা দু'জন যে এক মায়ের পেটের ভাই সে কথা ভুলে গেল। উভয়েই উভয়কে আক্রমণ করল সুতীব্র বর্ষার ফলকে। এক নিমেষে তাদের রক্তলোলুপ শাণিত বর্ষা অস্তগামী সূর্যের রশ্মিপাতে ঝলসে ওঠে, পরক্ষণেই বিদীর্ণবক্ষ দু' ভাইয়ের রক্তাক্ত দেহ লুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। উভয় দল উভয় পক্ষের সর্দারের শব নিয়ে গেল মালিকদের দরবারে পুরস্কারের আশায়। কোন মীমাংসা হবার পূর্বেই করিম-বসিরের মৃত্যু। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দাঙ্গা থেমে গেল।

এই দাঙ্গার সূত্র ধরে দোয়ারী সেন তাঁর জ্ঞাতি জমিদারের সঙ্গে খালকাটা সম্পর্কিত পুরানো বিবাদকেও পাকিয়ে তুললেন। গাঁয়ের বড় নদী থেকে সরাসরি একটা ছোট্ট খাল কেটে তাঁর বাড়ীর ঘাট পর্যন্ত নিয়ে আসতে চাইলেন দোয়ারী সেন। তিনি তাঁর পুত্রের বিবাহান্তে পুত্রবধূকে এই নদীর ঘাটেই বরণ করে তুলতে চাইলেন। কিন্তু জমিদার যদি অন্তত আধমাইলটাক জায়গা এজন্য ছেড়ে না দেন তবে সে খাল কাটা যায় না। জমিদার কিছুতেই সে জায়গা ছাড়বেন না। আর দোয়ারী সেনও উকিল, তিনিও নাছোড়বান্দা। খাল কাটবেনই। চর দখলের সদ্য বিবাদকে কেন্দ্র করে জমিদারবাবু যখন চর দখলের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তখন চর দখলের যুদ্ধ ছাড়াও সাতশ' লোক সংগ্রহ করে এক রাত্রের মধ্যে ওদের দিয়ে দোয়ারী সেন খাল কেটে বাহাদুরী দেখালেন। খালকাটা হয়ে যাবার পর জমিদার খাল কাটার খবর পেলেন। জমিদারবাবু তৎক্ষণাৎ মামলা ঠুকে দিলেন দোয়ারী সেনের বিরুদ্ধে বেআইনী জমি দখলের জন্য। সে মামলা চলল দীর্ঘদিন। এর মধ্যেই দোয়ারী সেন ঐ খাল দিয়ে নৌকায় তাঁর পুত্রবধূকে ঘরে তুললেন। অবশেষে পুত্রবধূর দৌলতে পুরানো ঝগড়া মিটমাট হয়ে গেল। খালও আবার বুজিয়ে দেওয়া হল। দোয়ারী সেন জমিদারবাবুকে ঝগড়া মিটিয়ে নিতে বললেন। জমিদারবাবুও এই জ্ঞাতি-বিবাদ জীইয়ে রাখতে চাইলেন না। উভয়ের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হল। তার আগে বুদ্ধিতে হেরে গিয়ে জমিদারবাবু ওঝা ডেকে দোয়ারী সেনেদের বাড়ীতে

রোগ চালনা করার আয়োজন করেছিলেন। জ্ঞাতি-বিবাদ মিটিয়ে নেওয়ায় তিনি ওঝাকে আবার ডাকিয়ে আনলেন তাঁর সেরেস্তায়। বললেন, সেনেদের বাড়ী রোগ চালনা বন্ধ করতে। ওঝা এই আদেশে খুব খুশী হল না। সে বলল, 'তখনই জানতাম যে এরকম একটা কিছুই ঘটবে। নইলে আপনার এখানে আসার সময় বাঁজা মাগীটার মুখ দেখবো কেন।'

স্মরণীয়, গাঁয়ে কলেরা-বসন্ত প্রভৃতি মহামারীরূপে দেখা দিলে গ্রামবাসী অনেক সময় ফকির-ওঝাদের শরণাপন্ন হয়। তারা নানা যাদুক্রিয়ার সাহায্যে সেই রোগ এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে চালান করে দিতে পারে বলে গ্রামের লোকেদের বিশ্বাস। রোগচালান দেবার নাম করে ভয় দেখিয়ে অনেক সময় এই সব ওঝা-ফকিরেরা তাদের মজুরী আদায় করে। এবং গ্রামের রোগ সারাতে পারুক না পারুক রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে অন্য গ্রামের পুকুরে বা ঘাটে অনেক সময় রোগের বীজাণু ফেলে আসে। সেই বীজাণুপূর্ণ জলের সঙ্গে সারা গ্রামে ঐ রোগ ছড়িয়ে পড়ে। গ্রাম্য বিবাদেও এদের কাজে লাগান হয়। নানাভাবে বিরোধী ব্যক্তিকে বিব্রত করতে ওরা অদ্বিতীয়। ওদের দিয়ে ভয় দেখান হয়। এইরূপ শত্রুতার কথা গ্রামবাসী যদি আগে থেকে টের পায় তবে তারা ভুলা পোড়ায়—অর্থাৎ গ্রাম থেকে আপদ-বালাই দূর করার জন্য খড়কুটো দিয়ে মানুষের মত একটা মূর্তি তৈরী করে তার মাথায় ধূপ, সরিষা, শুকনা পাটপাতা, মরা মশামাছি ইত্যাদি রেখে আগুন দেয় আর ছড়া কাটে—'ভাল আইয়ে, দোষ যায়, মশামাছি পোড়া যায়। দো-দো দো!' এখনও এইসব তন্ত্রমন্ত্র ও দোয়া-কালামের ঝাড়া-ফুঁকার কাজ চলছে। আপদ-বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য ছড়া বলা হয়—'ইর কাছুম, বীর কাছুম, কাছুম যমদূত। আন্ধাচোরা কাচ কাছুম, চণ্ডীমার পুত। ভূত পেরেত যত পাই, বুক চিরইয়া রক্ত খাই'। ভেল্‌কী লাগানোও হয়। ভেল্‌কী লাগানো মানে মন্ত্রমুগ্ধ করা, জিহ্বা লাগিয়ে বা বোবা করে দেওয়া। এর মন্ত্র—'ভেল্ ভেলকা ভেল্‌কি, লাগ ভেল্‌কি চতুর্মুখী, রামের আজ্ঞা গুরুর পায়, রক্ষা কর কালিকা চণ্ডীর মায়। হকনা এলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদর রাসুলুল্লাহ।' বাঙলার প্রত্যেক গ্রামেই ওদের অস্তিত্ব আছে।

এই সব গ্রাম্য বিবাদের জনক জমিদারবাবু, দোয়ারীবাবুদের মত ব্যক্তিরাই। তাঁদের মর্জিতে কোন্দল বাড়ে, অনিচ্ছায় কোন্দল হয় না, হওয়া কোন্দল থেমে যায় নাটকীয়ভাবে। এই নাটকীয়ভাবেই একদিন জমিদারবাবু

দোয়ারী সেনকে বললেন—'জানিস, এই ঝগড়া আমার মর্মপীড়ার কারণ হয়েছে। আমাদের মধ্যে বহুদিনের যে সম্পর্ক সামান্য কিছু জমির জন্য তা কোনমতে বিসর্জন দেওয়া উচিত নয়।'

দোয়ারী সেন কতক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর বললেন—'বিরোধ চালাবার আমার কোন ইচ্ছাই ছিল না, আজও নেই। তথাপি যেটুকু করেছি তা বাধ্য হয়েই।'

এরূপ আলাপ আলোচনান্তে উভয়ে একটা মীমাংসায় এলেন। বিবাদে নিহত লোকেদের বিলের ধারে পুঁতে রাখা হল। করিম-বসিরের মৃত্যু-সংবাদে ওদের মা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের মধ্যে শোকের বন্যা বয়ে চলল। টাকা দিয়ে তাদের আর্থিক দৈন্য কিছু কমানো গেল বটে, কিন্তু কান্না থামান গেল না। থামান যায় না। করিম-বসিরের মা নুরুন্নেসা প্রায় পাগলিনী হয়ে গেলেন। তাদের স্ত্রী-পুত্র কন্যাদির অবস্থাও তথৈবচ। কিন্তু প্রতিকারের উপায় নেই।

জমিদার দোয়ারী সেনেদের কাছে এ দু'টি প্রাণের কোন মূল্য নেই, তাঁদের টাকা আছে। তাঁরা টাকা দিয়েই মানুষের জীবনের পরিমাপ করেন। টাকা দিয়েই সব কিছু বশ করতে চান। কিন্তু টাকা দিয়ে তাঁরা প্রাণ দিতে পারেন কি? বারে বারে এ প্রশ্ন করে চলল তারা যাদের টাকা নেই, যারা ওঁদের টাকার প্রত্যাশী। আজও যখন করিম-বসিরের সুঠাম দেহ ও বলিষ্ঠ পুরুষের মত সোজা হয়ে হাঁটা ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা ভাবি তখন যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়ি।



করিম-বসিরের মৃত্যু, জমিদার-দোয়ারীবাবুর মিলনের কথা মনে পড়লে সোলেমান-পতাকীর বন্ধুত্ব-বিবাদের কথাও স্মরণ না করে পারা যায় না। সোলেমান আর পতাকী ছিল বন্ধু, অকৃত্রিম বন্ধু। হঠাৎ ওদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হল। পতাকীরা আমাদের গাঁয়ের যে প্রান্তে বাস করত সেই প্রান্তের গ্রামটি মুসলমান অধ্যুষিত। সোলেমানদের বাড়ীকে নিয়েই সে গ্রামের

সুরু। উভয় পরিবারের মধ্যে বেশ মিল ছিল। তথাপি একদিন বিবাদ লেগে গেল পতাকীর মায়ের কিছু অসংযত বাক্যের জন্য। সোলেমানরা মুরগী পুষত। পতাকীরা মুরগী পুষত না। মুরগীর ডিম বা মাংসও খেত না। ওরা বলত, হিন্দুদের ওসব খেতে নেই। খেলেই জাত যায়। মুরগী ছুঁলে স্নান করতে হয়। এইরূপ যখন মানসিক অবস্থা তখন সোলেমানের মেয়ে রাজিয়ার তাড়া খেয়ে একটা মুরগী এসে পড়ল পতাকীর মার নিরামিষ রান্নাঘরে। মুরগীর আগমনে পতাকীর মা বলে উঠল—'দেখ দিকি মোছলমান ছুঁড়ীর আক্কেল, ইচ্ছে করে মুরগীটা আমার রান্নাঘরে ঢুকিয়ে দিলে। বেহদ্দ মেয়েছেলে আমার জাত মারতে চায়।' রাজিয়া একথা শুনে জ্বলে উঠল। ক্রমে ঝগড়া পেকে ওঠে। উভয় পরিবারের ঝগড়ায় গাঁ গমগম করতে লাগল। দ্বিপ্রহরে পুরুষেরা ঘর্মাক্ত কলেবরে ক্ষুধিত পশুর মত যখন ঘরে ফিরল তখন উভয় পরিবারের স্ত্রীলোকেরা কণ্ঠ সপ্তমে চড়িয়ে উভয়পক্ষের পিতৃপুরুষের এবং নিজেদের চরিত্রের কথা বলে অকথ্য ভাষায় সমালোচনা ও গালাগালি দিয়ে চলছিলো। ক্ষুধাকাতর পতাকী স্ত্রীকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিয়ে ঝগড়া থামাতে বলল। মাকেও তদ্রূপ গালাগালি দিল সে। সোলেমানও রাজিয়াকে, রাজিয়ার মা ফতেমাকে সামলাতে চেষ্টা করল। সাময়িক বিরতি হলেও ঝগড়া থামল না। উভয় পরিবারের মেয়েরা ফোঁস ফোঁস করে চলল, সুযোগের অপেক্ষায় দিন কাটাতে লাগল।

এই ঝগড়ার রেশ ধরেই পতাকী জমিদার কাছারীতে নালিশ করল রাজিয়ার বিরুদ্ধে, সোলেমানের বিরুদ্ধে। এরই মধ্যে পতাকীর গরু সোলেমানের বাগানে ঢুকে অনেক ধানগাছ ও সব্জি নষ্ট করে, খেয়ে ফেলে। পতাকীর ছাগল সোলেমানের চাষের সবজিও খেয়ে ফেলে। গরুটাকে অবশ্য খোঁয়াড়ে পাঠায় সোলেমান, কিন্তু ছাগলকে ধরতে পারে না। পূর্ব ঝগড়ার রেশ ধরে এবং জমিদার কাছারিতে পতাকীর নালিশের জবাবে ও গ্রাম্য মাতব্বরদের পরামর্শে সোলেমানও থানায় গিয়ে পতাকীর নামে নালিশ করে এল। এইভাবেই চলছিল। এর মধ্যে কোরবানির দিন এগিয়ে এলে গোবধ করা হয়। সেই গরুর একখানি হাড় সোলেমান জাত মারার জন্য নাকি পতাকীর ঘরে সামনে রেখে গিয়েছে। আর যায় কোথা! আরম্ভ হয় প্রচণ্ড ঝগড়া, হাতাহাতি। পতাকী সহরে এসে সোলেমানের নামে একনম্বর মামলা ঠুকে দেয়। পতাকীর কাকা মধুবাবু এ কাজে উৎসাহ দিলেন না। তিনি ঝগড়া মিটিয়ে নিতে বললেন, তাতে কাজ হল না।

এক পরিবার অপর পরিবারকে শিক্ষা দিতে এসে উভয় পরিবারের সুখ ও শান্তি বিঘ্নিত হল।

সোলেমানের বাবা মনসুরও সোলেমানকে কাজিয়া না বাড়াতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু কোন ফল হল না। পতাকীর বাপ ও সোলেমানের বাপ দু'জনে দোস্ত ছিলেন। একের প্রয়োজনে অন্যে অপরের পাশে এসে দাঁড়াতেন। একের জন্য অপরে জমিদারের সঙ্গেও লড়াই করতেন। এ সব কথা জানান দিয়েও কোন কাজ হল না। সোলেমান তাকে-তাকে ছিল। গ্রাম্য পরামর্শ মত সে পতাকীর বউর নামে ধান চুরি করার অপরাধে এক মামলা রুজু করল। মামলার সুরুতেই অনেক খরচা হয়ে গেল সোলেমানের। কয়েক-দিন বাদে তার ছেলের সুন্নত হবার কথা। এ জন্য রাখা পয়সা সব মামলায় ব্যয় হয়ে যায়। তবুও পতাকীকে সমুচিত শিক্ষা দিতে না পারলে তার ঘুম হচ্ছিল না। ধারদেনা করে সুন্নতের টাকা সংগ্রহ করল।

মুসলমান সমাজে সুন্নত অবশ্যকৃত্য অনুষ্ঠান। হিন্দু উচ্চবর্ণের যেমন পৈতা। বারো বৎসর বয়সের মধ্যে দ্বিজগণ উপবীত নেবেনই, না নিলে দ্বিজত্ব চলে যায় বলে শুনি। উপবীত নেওয়ার মধ্যে এবং ছেদন অনুষ্ঠানের মধ্যে একটু তফাৎ আছে। হিন্দু সমাজের সমস্ত লোক উপবীত ধারণ করার অধিকারী নন। ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য ও কায়স্থদের কেউ কেউ উপবীত নিতে পারেন। অবশ্য, অব্রাহ্মণদের উপবীত গ্রহণ রীতিসিদ্ধ করতে অনেক বাদানুবাদ, অনেক হুজ্জতি সইতে হয়েছে। অথচ এখন অনেক ব্রাহ্মণও উপবীত নিচ্ছেন না। কিন্তু ছেদন বা সুন্নত সমস্ত শ্রেণীর মুসলমানের অবশ্য কৃত্যকর্ম। সহর ও গ্রামের মুসলমানদের এখানে প্রভেদ নেই। সাধারণতঃ সাত কি আট বৎসর বয়সের মধ্যেই সুন্নত করণীয়। উচ্চবিত্ত মহলে এ অনুষ্ঠান উপলক্ষে গান বাজনার আয়োজন করা হয়। ছেদনের কাজ অনেক সময় পরিবারের নাপিত করে থাকে। অনেক সময় সমাজেরই কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছেদন কার্য সমাধা করেন। ছেদনের পূর্বে ছেলেকে একটি চেয়ারে বসান হয়। ছেলে কি হবে বুঝতে পারে না, তবে এটা বুঝতে পারে যে একটা অনুষ্ঠান হতে চলেছে যার নায়ক সে নিজে। তাই চেয়ারে বসে প্রায়শই সে হাসে। কেউ কেউ আবার কেঁদে ওঠে। চেয়ার ছেড়ে পালাতে চায়। ছেদন ধারাল কাঁচি অথবা বাঁশের চর দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণতঃ সাত থেকে দশ দিন ঘা শুকোতে সময় নেয়। যতদিন না ঘা শুকোয় ততদিন ছেলেকে

বিশ্রাম দেওয়া হয়। শীতকালেই ছেদন কার্য করা হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে। ছেদন হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে চীৎকার করে কেঁদে ওঠে, এবং উপস্থিত সকলে 'দীন দীন মোহাম্মদ,' 'সোবাহন আল্লা' 'সোবাহন আল্লা' বলে ধ্বনি দিয়ে ওঠে। অনেক সময় ছেলের মনোযোগ অন্যদিকে আকৃষ্ট করার জন্য ছেলের প্রিয় নানাবিধ খেলনা, পশু, পাখীর দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়, ছড়া কাটা হয়। অনেক সময় বলা হয়– 'ফুরুৎ করতে মানা। তিন টাকা তাঁর জরিমানা। আজ হতে ফুরুৎ'। অথবা 'আল্লাহর আসন, আল্লাহর বাসন, আল্লাহর সিংহাসন। এই আসনে এস গো আল্লাহ। আপনি চির নূতন।' ছেদনান্তে উপস্থিত সকলকে আপ্যায়িত করা হয় জিলাপী, বাতাসা বা অনুরূপ মিষ্টান্ন দিয়ে।

পতাকীও মরিয়া হয়ে লড়াই করে চলল। সে সোলেমানের সুন্নতের ঋণের কথা জানতে পেরে বিশেষ সুখী হল। ভাবল, এবার জব্দ হবে ব্যাটা। অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল উকিল মোক্তারদের পিছনে। উভয়েরই পণ জিততে হবেই। মোকদ্দমায় উভয় পক্ষেরই খরচা হল। উভয়েই ফৌজদারী কোর্টে মামলা রুজু করেছিল। কিন্তু এই মামলা ফৌজদারী আদালতের বিচার্য নয়, দেওয়ানী আদালতের বিচার্য—হাকিমের এই আদেশে উভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। মোকদ্দমা কিছুকাল বন্ধ থাকল, কিন্তু ঝগড়া বন্ধ হল না।

এরই মধ্যে একদিন কাপড় কাচতে কাচতে রাজিয়া পতাকীর নববিবাহিত পুত্রবধূকে ছুঁয়ে দিল। পুত্রবধূ রাণীর শাশুড়ী তখন ঘাটেই ছিলেন। তিনি তা দেখতে পেলেন এবং ঘাট থেকেই যে ঝগড়া গালাগালি আরম্ভ করলেন, ঘরে এসেও তা থেকে ক্ষান্ত হলেন না। দুপুর অবধি ঝগড়া চলল। কারুর ঘরে উনুন জ্বলল না। তিনি রাজিয়ার চরিত্র সম্পর্কেও নানাবিধ কুৎসিত গালাগালি দিয়ে চললেন। সোলেমান বাড়ী ফেরার পথে ঐ সব কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে হাতের পাচন দিয়ে এক বাড়ি লাগিয়ে দিল পতাকী-গিন্নীকে। দেখতে দেখতে চারদিকে লোক জমে গেল। পতাকী আবার গিয়ে ফৌজদারী মামলা রুজু করল সোলেমানের বিরুদ্ধে। এবার নারী নিগ্রহের দায়ে পড়ল সোলেমান। অতি সাংঘাতিক 'চার্জ'। কিন্তু মুন্সেফ এই দুই পরিবারের বিবাদের কথা আগে থেকেই জানতেন। তিনি উভয় পক্ষের উকিলকে ডেকে মামলা মিটিয়ে নিতে বললেন। কিন্তু উকিলদের পয়সা চাই। মামলা জীইয়ে না রাখলে তাদের চলে না। তবুও মুন্সেফ সাহেব যখন উভয় পক্ষের উকিলকে ডেকে মামলা মিটিয়ে নিতে পরামর্শ দিলেন তাতে তখন ওঁরা রাজী হলেন, এবং

সোলেমানের অপরাধের জন্য জনসমক্ষে তাকে বিশ ঘা বেত মারার আদেশ দিলেন বিচারক।

বেত্রাঘাতের পর চার-পাঁচ দিন সোলেমান বিছানায় পড়ে ছিল। সে ভয়ানক লজ্জা পেল। লজ্জায় দিনের বেলায় কাউকে মুখ দেখাতে চাইল না। অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে বেড়াত। আর কিভাবে পতাকীকে শাস্তি দেওয়া যায় তার ফন্দি আটত। ভাবল অন্ধকার রাতে পতাকীর খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে দেবে। পতাকীকে সর্বস্বান্ত করবে। অনেকক্ষণ এইরূপ ভাবনার পর সে পতাকীর খড়ের গাদার দিকে গেল। আগুন লাগাতে গিয়েও ফিরে এল। কে যেন তাকে আগুন লাগাতে দিল না। কে যেন তাকে মিলেমিশে থাকার জন্যে উৎসাহিত করল। অবশেষে সোলেমান পতাকীর কাছে তার দুষ্ট বুদ্ধির কথা অকপটে প্রকাশ করল। দু'জনে দু'জনেরই কাছে ক্ষমা চাইল। ওরা আবার-পুরানো বন্ধুত্বে ফিরে এল। অবাক করার মত ব্যাপার। গাঁয়ের লোক এমনিভাবে অনেকে অনেককে অবাক করে, বিস্মিত করে।

আমাদের গাঁয়ের কথা মনে হলেই কত যে অবিস্মরণীয় চরিত্র স্মৃতিপটে জাগরিত হয় তার হিসাব দেওয়া কষ্টসাধ্য। কিন্তু আমাদের সেই পুরাতন ভৃত্য সতীশ, যাঁকে আমরা সতীশকাকা বলে ডাকতাম, তাঁর কথা না বললে শান্তি পাচ্ছি না। দীর্ঘদিন ধরে সতীশকাকা আমাদের পরিবারে কাজ করছেন, আমাদের গার্জিয়ান এক কথায় ছিলেন তিনিই। তাঁকে আমরা নানাভাবে কষ্ট দিয়েছি, আহত করেছি। তিনি আমাদের মারতে হাত উঁচু করেছেন, লাঠি নিয়ে। বেত নিয়ে তাড়া করেছেন কিন্তু কোনদিন মারেন নি। পরিবারের বড়রা কেউ তাঁকে বুড়া বলতেন, কেউ সতীশদা বলতেন, বোন-ঝি, বোন-পো-রা বলত সতীশমামা। আমরা বলতাম সতীশকাকা। নাম ধরে কেউ ডাকত না। তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়েছিল বহুপূর্বে। একটি ছেলে ছিল, সে দেশে থাকত না, শহরে থাকত। বাবার খুব একটা খোঁজ খবর নিত না। সতীশকাকাও ছেলের জন্য খুব চিন্তা করতেন না। তিনি আমাদের পরিবারেরই একজন হয়ে গিয়েছিলেন।

হঠাৎ একদিন তিনি চাকুরী ছেড়ে দিতে চাইলেন, ছুটি চাইলেন। বললেন, শেষজীবনে মহাপ্রভু তাঁকে ডাকছেন। তিনি কোন এক আশ্রমে গিয়ে নিভৃতে মহাপ্রভুর ভজনা করবেন। আমরা কেউই তাঁকে ছাড়তে রাজী হলাম না। পরিবারের কর্তা বললেন, 'মহাপ্রভুকে ডাকতে বিবাগী হবার কি আছে! এখানে বসে কি তোমার প্রভুর সেবা হয় না'। তিনি বললেন, 'তা কি করে হয়, ঘরের কাজ করে কি ভাবে এক মনে তার সেবা করি। সে হয় না।'

তিনি ছুটি পেলেন না। মনে মনে খুব কষ্ট পেলেন বোধ হয়। তবুও ঘর-বাড়ীর কাজ করেন আর যখন ছুটি পান তখন বাড়ির পাশের পোড়ো জমিকে সাফ করে দিব্যি এক বিরাট সবজি বাগান করে বসলেন। এই দেখে কর্তাবাবু সতীশকাকাকে ডেকে একদিন বললেন—'এই তুমি বিবাগী হয়ে মহাপ্রভুর সেবা করতে চাইলে, আর এই তুমি এত বড় বাগান করে বসলে, কি দরকার ছিল এ সবের। বুড়ো বয়সে এ খাটুনী খাটার কি দরকার ছিল'? এই কথা শুনেই তাঁর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। তিনি কাঁদতে লাগলেন। বললেন, 'তা সত্যি, পোড়ো জমিতে একটু বাগান করেছি তা নিয়ে এত কথা শুনতে হল। আর দশ-বিশ বছর আগে এ সংসারের জন্য দিনে ষোল-আঠার ঘণ্টা খেটেও সকলের মন পাই নি। আমার যে বয়স হয়ে গেছে, আমি যে বুড়ো হয়ে গেছি, কর্তাবাবুও আজ সে কথা শুনিয়ে গেলেন।' এই বলেন আর নিজে নিজেই কাঁদেন। কারুকে কিছু বলেন না।

কর্তাবাবুকে আমরা গিয়ে বললাম কেন তিনি সতীশকাকাকে বকেছেন। তিনি আমাদের অনুযোগের উত্তরে না কিছু বললেন আমাদিগে, না কিছু বললেন সতীশকাকাকে। বোধ হয় তিনি লজ্জা পেয়েছিলেন। অথবা বুঝতে পারেন নি যে সতীশকাকা তাঁর আন্তরিকতাকে ভুল বুঝে বসবেন।

সতীশকাকার জন্য আলাদা একটি একচালা ঘর ছিল, বাইরের দিকে। সর্বদাই সেখানে তাঁর নানা বন্ধু ও কুটুম্বের ভীড়। ওরা এলে কেউই অভুক্ত ফিরে যেত না। অথচ সতীশকাকা যা মাইনে পেতেন তাতে এত কুটুম্ব খাওয়ান যায় না। পরিবারের কেউ কিছু না বললেও আশেপাশের অনেকেই কর্তাবাবুর কাছে সতীশকাকার বিরুদ্ধে নালিশ জানায়। সতীশকাকাকে তাই একদিন কর্তাবাবু ডেকে বললেন, 'তোমার এত আত্মীয়-কুটুম্ব, সর্বদাই তাদের ভীড়, এটা ভাল নয়। তা ছাড়া তো দেখছি তুমি বাগান বাড়িয়েই চলেছ, এ বয়সে কি আর এত সয়?' সতীশকাকা বললেন—'বাগান করেছি তাতে কার কি ক্ষতি! ইন্দ্র জল দিচ্ছে, পৃথিবী ফসল দিচ্ছে!' কর্তাবাবুকে কে যেন সংবাদ দিয়েছিল যে সতীশকাকা বাগানের সব জিনিস বিক্রী করে চাল ডাল মাছ কেনেন। একদিন কর্তাবাবু নিজে তা দেখতেও পেলেন। তিনি বললেন—'এ সব মোটেই ঠিক নয়। তা ছাড়া এটা কি হোটেল?' সতীশকাকা অবাক। তিনি বললেন—'তিনি খাইয়ে কারুর কাছ থেকে পয়সা নেন না, তবে এটা হোটেল হল কি করে? প্রভু তাকে মানুষ করে জন্ম দিয়েছেন, তিনি চাকুরী করেন বটে, কিন্তু তিনি মানুষ, পশু নন। একমাত্র পশুর নাকি

দয়ামায়া নেই। লোকগুলো তাঁর কাছে আসে তাই ওদের খাইয়ে দিই। এটাও প্রভুরই ইচ্ছা। নইলে লোকগুলো অন্য বাড়ীতে না গিয়ে এখানে আসে কেন? ঘরের সমস্ত কাজকর্ম সেরেই আমি ওদের সঙ্গে কথা বলি, হাসি। ওদের সেবার ব্যবস্থা করি। আমি নিজের হাতের তৈরি বাগানের ফলমূল বিক্রী করে যা পাই তা দিয়েই ওদের সৎকার করি। এটা চুরিও নয়, এর মধ্যে কোন অপরাধও নেই। জমি তো পতিতই ছিল, সেখানে এখন যে ফসল জন্মে তা ওদেরই ভাগ্যে। কি ভাবে তা থেকে ওদের বঞ্চিত করি! যাই হোক, আপনার যখন আপত্তি'—এই বলে সতীশকাকা তাঁর বিছানা আসবাব নিয়ে কোথায় যেন চলে গেলেন আর তাঁর দেখা পাই নি। আমরা অনেক খোঁজ করেছি তাঁর। তিনি চলে গেলে তাঁর বাগানেরও হতদশা হয়। কিছুতেই ভুলতে পারছি না এই সতীশকাকাকে। তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসাকে। তাঁর ঈশ্বরপ্রেম, মানবপ্রেমকে।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম-সংবাদ সংগ্রহ করতে এসে আমাদের গ্রামের স্মৃতি জাগরিত হওয়ায় মনে পড়ছে শ্রমপটু কৃষকগণকে যারা সারাদিন মাঠে খাটে, রাত্রে কুম্ভকর্ণের মত নিদ্রায় ভেঙে পড়ে। মনে পড়ে তাদের যারা যৌবন অতিক্রম করেও বৃদ্ধের খাতায় নাম লেখাতে অনিচ্ছুক। যারা প্রতিবেশীসহ গল্পের বৈঠক বসায়। নলদময়ন্তী, শ্রীবৎসচিন্তা, বিজয়বসন্ত, বিল্বমঙ্গল, কংসবধ, রূপমনোহর প্রভৃতি ধর্মমূলক আখ্যান শুনে সময় কাটায়। খোলকরতাল বাজিয়ে হরিসঙ্কীর্তন গায়। মনে পড়ে সেইসব যুবকদের যারা মনসার ভাসান, কৃষ্ণলীলা, নৌকা বিলাস, বাইদ্যানী, গাজি প্রভৃতি পালা অভিনয় করে পল্লীবাসীর মনোরঞ্জন করে।

সাধারণতঃ কার্তিক মাস থেকে ফাল্গুন মাস এই পাঁচটি মাস পল্লীজীবনে আনন্দের বান ডাকে। চৈত্র-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে পাট ও ধান বপন করা, নিড়ানী দেওয়া, বোরো ধান কেটে ঘরে তোলার কাজেই সময় চলে যায়। আষাঢ় মাসে জল বাড়তে থাকে, কর্মেও ব্যস্ততা কমে। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয় ঘাটু গান, মনসার গান প্রভৃতি। এই সব শেষ না হতে আউশ ধান পাকে। জমি কোমর জলে পেট জলে ভরে যায়। বিল হাওর সব এক হয়। লাখে লাখে কুমুদ কহ্লার, শাপলাফুল ফোটে। জলে থাকে রক্তশোষক জোঁক, সাপ। তাদের অবজ্ঞা করে কৃষক ধান কাটে আর গান গায়—'কঁড়া শিকারী বিনোদ রে, ভইনের ক্রান্দন আইতে যাইতে রে'। গায়—'নিশাকালে নিদ্রা ভাঙ্গলো সখি জাগিলাম তরাসে রে, শুইলে শ্যাম কালিয়া স্বপনে গো দেখি, বান্ধিয়া হৃদয়ে রাখি গো

সখি—জাগিয়া না পাই। ওরে শ্যাম কালিয়া।' পাট ও আউশধান কাটা শেষ হতে হতে শ্রাবণমাস এসে যায়। এই মাসে হয় পদ্মাপুরাণ পাঠ। নানাবিধ গীতও হয় গ্রামব্যাপী। পদ্মাপুরাণ পাঠ না করলে অথবা মনসার রয়ানী পাঠ না করলে মনসা পূজায় অঙ্গহানি হয় বলে লোকবিশ্বাস। এই বিশ্বাস থেকে সারা শ্রাবণমাস ধরে পূর্ববঙ্গের সর্বত্র রয়ানি পাঠ হয় ঘরে ঘরে।

ভাদ্র সংক্রান্তিতে হয় বিশ্বকর্মাপূজো। এ দিনে আকাশ পরিষ্কার থাকলে ঘুড়ি ওড়ানো হয়। নৌকাবাইচ, অনুষ্ঠিত হয় অনেক জায়গায়। আসে আশ্বিন মাস। সকলের মনে দুর্গাপূজার আনন্দ জেগে ওঠে। সারা গাঁয়ে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। শহর থেকে গ্রামবাসী গ্রামে ফিরে আসে। সহরফেরা গ্রামবাসীদের কাছে সহরের কথা শোনবার জন্য ভীড় জমে। যতদিন সহরবাসী ওঁরা গাঁয়ে থাকেন ততদিন ওঁদের বিশ্রাম হয় না। কথার ফুলঝুরি ছোটান। শহরের ওঁদের দেখে ওঁদের কথা শুনে গ্রামের আমাদের যে স্ফূর্তি হত, তৃপ্তি হত, শহরে এসে বসবাস করার পরে সে স্ফূর্তি, সে তৃপ্তি পাই নি অকপটে তা স্বীকার করি।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যে ইংরেজ তাড়াবার সংগ্রামে আমাদের গ্রাম সক্রিয় ছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হবার পূর্বে যখন সারাদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন জনমত গঠন করতে, তাঁর বক্তব্য জনসমক্ষে তুলে ধরতে, তখন তিনি আমাদের গ্রামেও গিয়েছিলেন। প্রকাণ্ড সভা হয়েছিল বড়বাড়ীর সামনের খালের পারের মাঠে। সে সভায় বালক স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করতে হয়েছিল আমাদের অনেককে। অশ্বিনী-কুমার দত্ত, সতীন্দ্রনাথ সেন, ফজলুল হক, মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন, আমাদের গ্রামে। পি. সি. যোশীরও কিছু সমর্থক ছিল। আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর বিশেষ সমাদৃত হত। পোস্ট-অফিসে সংবাদপত্র আসা মাত্র গোল হয়ে বসে সে কাগজ গলাধঃকরণ করতেন সংবাদ পিপাসু সকলে। সোমনাথ লাহিড়ী সম্পাদিত একপয়সার 'স্বাধীনতা' খুবই জনপ্রিয় ছিল আমাদের গ্রামে। 'নবযুগ'ও খুব চলত। শুনেছি বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে রাখী-সঙ্গীতে কণ্ঠমেলাতে আমাদের গ্রামের হিন্দু-মুসলমান কেউই আপত্তি করে নি। লবণ সত্যাগ্রহও খুব জমেছিল। আমাদের গ্রামে মদের দোকান ছিল না, গাঁজা, আফিং-এর আবগারী দোকান ছিল। সেই দোকানে অনেক-দিনই পিকেটিং হতে দেখেছি। আমাদের গ্রামে আমাদের জেলায় স্বদেশী আন্দোলন এমন ভাবে দানা বেঁধে ওঠে যে তৎকালীন সরকার এই জেলাকে

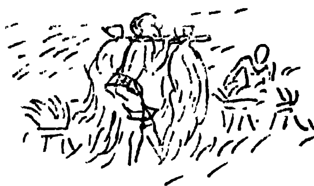
প্রোক্লেমড ডিস্ট্রিক্ট বা আইন শৃঙ্গলা ভঙ্গকারী জেলা বলে ঘোষণা করেছিলেন। এইজন্যই বোধহয় আমাদের গ্রামের অনেক থিয়েটার, অনেক যাত্রা পুলিশ ভেঙ্গে দিত। কি যে রাগ হত তখন তা বোঝাতে পারবো না। শুধু থিয়েটার বা যাত্রা ভেঙ্গে দিয়েই ওরা ক্ষান্ত হত না, অনেককে ধরে নিয়ে যেত। যেমন নিয়ে যেত কেষ্টদাকে, নির্মলবাবুকে, আরও অনেককে রাজনীতি করার জন্য। কিছু লোক 'জনগণ যুদ্ধের বহ্নি জ্বালো' বলেও গান গাইত। জাপানের বিরুদ্ধে, নেতাজীর বিরুদ্ধে নানা কুৎসা রটাত তারা। আমাদের গ্রামের অনেকেই এই কুৎসা রটনাকারীদের গালি দিত, মন্দ বলত, কিন্তু তাতে ওরা দমত না। যে কয়জন লোক একাজ করত তারা নিরুদ্বেগে তাদের কাজ করে যেত। পুলিশও নাকি ওদের কিছু বলত না। কিন্তু অন্য অনেককেই ধরে নিয়ে যেত। ঝালকাঠি থেকে পুলিশ আসত রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেপ্তার করতে। অনেক সময় জলপুলিশ ঘুরে বেড়াত নৌকায় করে জলে জলে। জলপুলিশের নৌকা অনেকদিনই আমাদের গ্রামে থেকে যেত। কয়েকদিনই থাকত, তারপর চলে যেত। শিকার পেত কি না, জানি না, ডাক্তারবাড়ীর কেষ্টদাকে খুবই হয়রানি করত এই পুলিশের দল। পুলিশী অত্যাচার সত্ত্বেও ঘরে ঘরে শোনা যেত মনোমোহন বিরচিত মুকুন্দদাসের গান—'ছেড়ে দাও কাচের চুড়ী, বঙ্গনারী কভু হাতে আর পরোনা। জাগো গো ভগিনী, ও জননী মোহের ঘোরে আর থেকো না।' বহুদিন মুকুন্দদাসের যাত্রা অর্ধেক পথে ভেঙে দিয়েছে পুলিশ। আমরা ব্যর্থ মনোরথে বাড়ী ফিরে এসেছি মাঝ রাত্রে। বিরাজমোহন সেন, পঞ্চু সেন প্রভৃতি নট্ট কোম্পানীর নটেরা চাষার ছেলের অভিনয়ে, চাষী-বাপের অভিনয়ে বহু লোককে মাতিয়েছেন। এইসব যাত্রা দিয়েও জনমত গড়ে উঠেছে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে। তার মধ্যে যখন রবীন্দ্রনাথ উপহার দিলেন—'আমি ভয় করব না, ভয় করব না। দুবেলা মরার আগে মরব না ভাই, মরব না। তরীখানি বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে, তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে কান্নাকাটি করব না'। তখন অকুতোভয় সকলে এ গান গাইত আর স্বদেশের উন্নতির চিন্তা করত। ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচনের সময় যথেষ্ট উত্তেজনা দেখা যেত। অন্য সময়ে সব শান্ত। এমনি ভাবেই আমাদের গ্রামের দিন কাটছিল। পূজা এসে গেলে আমাদের গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সাধ্যমত নববস্ত্রাচ্ছাদিত হয়ে ঘুরে বেড়াত। একে ওকে পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়ে বেড়াবার মধ্যে আনন্দ ও তৃপ্তি পেত সকলে। পূজোর উৎসবে যাত্রাও হত অনেক স্থানে। সারারাত যাত্রা শুনে

ফিতে আসার পথে যে নারকেলগাছ পড়ত, দল বেঁধে সে গাছ থেকে ডাব পেড়ে খাওয়া হত। তারপর নদী বা খালে প্রাতঃস্নান সমাপ্ত করে বাড়ী ফিরে লম্বা ঘুম দিতে বেশ আরাম লাগত। দুপুরে দলবেঁধে স্নান করতে যেতাম বড়খালে, সে স্নানেও ছিল উন্মাদনা। আধঘণ্টা থেকে একঘণ্টা ব্যাপী চলত তেল ঘষা, সাঁতার কাটা ইত্যাদি। ক্লান্ত হয়ে ফিরেই খেতে বসে যেতাম। যা পেতাম গোগ্রাসে তা গিলে যেতাম। প্রচুর খেতে পারতাম তখন।

মনে পড়ে মেয়েদের কথা। যারা কোন আনন্দে উৎসবে একত্রিত হলেই গান গাইত। জল আনতে যাবার সময় গাইত—'জলে যাবিনি গো সই, অবিরত শ্যামের বাঁশী বাজতে আছে কই?' আবার—'নাইচ্যা নাইচ্যা রতনমণি যাইবি মায়ের কোলে' অথবা 'কে যাবে মথুরার হাটে সাজাইয়া পসার'। এসব গান এখনও শুনতে পাওয়া যায়। শুনতে শুনতে মনে পড়ে লালবিহারীর কাঞ্চনপুর গাঁয়ের কথা। পশ্চিম বাঙলার একটি প্রাচীন গাঁয়ের কথা। ছেড়ে আসা গাঁয়ের সঙ্গে শতাধিক বৎসর পূর্বের এই গাঁয়ের খুব একটা তফাৎ এখনও দৃষ্ট হয় না। গ্রাম যতই বদলাক না কেন, গ্রাম বাঙলার চরিত্র এখনও মোটামুটি একই রকম আছে। আজও কৃষক অন্ন উৎপাদন করে। ভূমি কর্ষণ করে। গোধন পালন করে। ফসল কেটে ফসল খামারে রাখে। আজও জোয়ার ভরা নদীতে জ্যোৎস্না রাতের পালতোলা নৌকা মাঝিদের সঙ্গীত চাঁদনী রাতের নীরবতা ভঙ্গ করে। সারাদিনের কাজের পর আজও মন্থরগতিতে পায়ে হেঁটে চলে চাষী। শ্রমোৎপাদিত কৃষি সামগ্রীর বদলে কাঁচের চুড়ি, খেলনা এখনও সে কেনে—পত্নীর জন্যে, ছেলের জন্যে। নিজের জন্য কেনে বাঁশের বাঁশী। তা বাজায়। সারিন্দা নিয়ে, বাঁশী নিয়ে ছোটে নদীর ঘাটে। উপরে চাঁদ হাসে, মাঝে সঙ্গীতের স্রোত, নীচে নদীর জলের কলকলানী। কোন ভূষণ নেই, কোন সঙ্গত নেই। আছে রাত্রির নীরবতা, আছে আদিগন্ত মাঠ, আছে নীল আকাশ ও সবুজ ঘাসের বিস্তার। এরই মধ্যে কৃষক হাসে, কাঁদে, নাচে, আমোদ স্ফূর্তিতে দিন কাটায়। হেমন্ত চলে যায়। শীত আসে। তখনও মাঠ, গাছ, দূরের বাড়ী সবই যেন চিত্রার্পিত। জোর বাতাস ঠাণ্ডা হাওয়া চর্মভেদ করে দেহ আক্রমণ করে। তার মধ্যে নির্জনে সাধক একা বসে আছে। রাত্রের শীত তাকে বিব্রত করে না। হিংস্র পশুপাখী তাকে বিরক্ত করে না। ক্রমে শীতের মেঘ পাহাড়ে চলে যায়। সেখানকার তুষাররেখা ভাসা মেঘের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। গ্রীষ্মের সূর্য এগিয়ে এলে রূপার শিখর গলে গিরিপ্রপাতের সৃষ্টি

করে। ষড়ঋতুর খেলার সঙ্গে প্রাণধারা প্রবাহিত ও সংরক্ষিত হয়ে দিবারাত্রির আনাগোনা হয়। সপ্তাহ, পক্ষ, মাস, বৎসর আসা-যাওয়া করে।

বসন্তের বাতাসে নতুন পাতা হাসে। ভালবাসার অত্যাচারে অনেক মানুষ বিব্রত বোধ করে। রাষ্ট্রের অত্যাচার নিবারণের উপায় আছে, সমাজের অত্যাচারের হাত থেকে উদ্ধার পাবারও উপায় আছে। কিন্তু ভালবাসার অত্যাচার বড় সাঙ্ঘাতিক। তাই গাঁয়ের কেউ শহরে চাকুরী পেলে মা সোনা-মণিকে একা ছেড়ে দিতে রাজী হন না। পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্নী, পুত্রকন্যা, আত্মীয়কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধব যে-ই একটু ভালবাসে সে-ই একটু অত্যাচার করে। মাতার ভালবাসার অত্যাচারে-দারিদ্র্য ও অশিক্ষিত থাকার কথা গ্রামবাঙলার লোকেদের অজানা নয়। ভার্যার ভালবাসার অত্যাচারের কথা বাঙালীদের কাছে নতুন করে বলার দাবী রাখে না। চিরকালই মানুষ অত্যাচার প্রপীড়িত। ছোটবেলায় বাহুবলের অত্যাচার, চড়, থাপ্পড়, কিল, ঘুষি ; তারপর বলশালীর পীড়ন, সামাজিক অত্যাচার, ছোট বড়র কোন্দল, জাত-বেজাতের কলহ সব মিলিয়ে গ্রামের মানুষ দিশেহারা। এখনও গ্রাম্যবধূ শাঁখা, শাড়ি, সিঁদুরকৌটা, লালশাড়ী, হাতে পৈছা, কঙ্কনসহ সম্মার্জনী উঁচিয়ে চলে। কপালে সিঁদুর, নাকে নথ, পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় তুঙ্গ কবরীশিখর নিয়ে গ্রামের মেয়ে শাড়ী গাছকোমর বেঁধে, ঝাঁটা হাতে, খোঁপা খাড়া করে, নথ নেড়ে কোন্দলে, ঝগড়ায় চীৎকারে এগিয়ে যায়। পরস্পরের পৃষ্ঠত্বকের সঙ্গে তাদের সম্মার্জনীর বিশেষ সম্পর্ক। বাঙলার গ্রামের এই সাম্প্রতিক চিত্রের সঙ্গে শতাধিক বৎসর পূর্বের লাল-বিহারীর সোনাপলাশী গাঁয়ের মিল অবশ্যই আছে। সোনাপলাশীই নাকি কাঞ্চনপুর। সোনাপলাশীর লোকেরা সে দাবী করেন। যদিও কাঞ্চনপুর নামেও



গাঁ আছে বর্ধমানে সোনাপলাশীরই কাছে। জানি না লালবিহারীর এ কল্পিত নাম থেকেই কাঞ্চনপুর নামের উৎপত্তি কি না। আমরা এ গ্রামকে কাঞ্চনপুরই বলব। যদি সে নাম কাঞ্চনপুর না হয়ে সোনাপলাশী হয় তাতেও ক্ষতি নেই। প্রায় হাজার দেড়েক লোক বসবাস করেন এখানে। সদগোপেদের সংখ্যাধিক্য হলেও ছত্রিশ বর্ণের লোকেরই সন্ধান মেলে এ গাঁয়ে। গ্রামের মাঝখানে

মুখোমুখি দুটি বিরাট শিবমন্দির। প্রায় প্রত্যেকবাড়ীর সংলগ্ন উদ্যানে ফুল, আম, পেয়ারা, পেঁপে ও দু'চার ঝাড় কলার গাছ। গাঁয়ের মাঝে মস্ত বড় একটা সান-বাঁধানো বকুল গাছ। অপরাহ্নে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এখানে সমবেত হয়ে গ্রাম্য রাজনীতির চর্চা করেন। অনেকে তাস-দাবা-পাশা খেলে বা খোশ-গল্প করে সময় কাটান। বর্ধিষ্ণু গ্রাম এটি। স্বয়ম্ভর গ্রাম। এ গ্রামের উৎপাদিত সামগ্রীতে এ গাঁয়ের লোকেদের ভালভাবে চলে যায়। এখানে আছে পাঁচ ছ'খানা মুদির দোকান। সমস্ত দোকানে চাল, ডাল, লবণ, তেল, মসলা ইত্যাদি পল্লীবাসীর নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মেলে। গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের সমতল ক্ষেত্রে প্রতি শনি ও মঙ্গলবার হাট বসে। সে হাটে শাক-সব্‌জি, কাপড় থেকে আরম্ভ করে ছুরি, কাঁচি, বাসনকোসন ইত্যাদি হাজার রকম জিনিষ পাওয়া যায়। গ্রামের মধ্যে পুকুর বা জলাশয়ের অভাব নেই। দুটো বড় জলাশয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে হিমসাগর দীঘির জল বরফের মত শীতল। মার্বেল বাঁধান দুটো ঘাট আছে এই দীঘিতে। যার একটাতে পুরুষ আর একটাতে মেয়েরা স্নান করে। ঘাটের উপরে সিঁড়ি যেখানে আরম্ভ সেখানে আছে দুধারে দুটো তুলসী গাছ। ঘাটের সামনে চৈতন্যদেবের মূর্তি। আরেকটা বড় দীঘির নাম কৃষ্ণসাগর। এর জল কাকচক্ষুর মত কাল। অগাধ জল। থৈ পাওয়া যায় না। এখানে মাছ রয়েছে অফুরন্ত। এই দীঘিতে বড় কেউ স্নান করে না। পল্লীর মেয়েরা সকাল ও সন্ধ্যায় এখান থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করে। নানাজাতীয় জলজ উদ্ভিদে পরিপূর্ণ এ দীঘি।

এ গাঁয়ের সব পুষ্করিণীর পারে আছে বড় বড় তালগাছ। বৃক্ষকুঞ্জ শোভিত গ্রামের চারদিকের শস্যক্ষেত্র সর্বদাই শস্যপূর্ণ। বাঙলার মাটি যে সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা এ গাঁয়ের উপর চোখ বুলোলেই তা প্রতীত হয়।

মনে করা যাক কোন এক গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে একটুও বাতাস নেই। দৈত্যের মত দীর্ঘ চওড়া তালপাতাগুলো নিস্পন্দ। গরুগুলো নিশ্চিন্তে গাছতলায় আশ্রয় নিয়ে চোখ বুজে জাবর কাটছে তারা। পাখীরা দুপুরে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করছে। প্রকৃতি নিস্তব্ধ। হঠাৎ বজ্রপাত সহ এক পশলা বৃষ্টির সুযোগে মান্ধাতার আমলের লাঙ্গল নিয়ে মানিক সামন্ত গ্রামের পূব দিকের জমি চাষ করে চলেছে, আউশধানের জন্য। লাঙ্গলের মাথা দুহাতে চেপে ধরে জোরগলায় বলদ দুটোকে গালাগালি দিচ্ছে সে ঠিকমত সহযোগিতা না করার জন্য। বলছে—'আরে শালারা নড়ছিস না ক্যান? বেলা হয়ে যাচ্ছে যে? শালার গরু লাঠিপেটা না করলে দুরস্ত হবি নি দেখছি'। লাঠি ও গালিতে যখন কোন

কাজ হয় না তখন সে সুরু করে তোষামোদ—'ধন আমার, বাবা আমার, বাছা আমার, একটু টেনে চল।' কিন্তু কিছুতেই কাজ হয় না। অবসন্ন, তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত জীব দুটো একটু বিশ্রাম চায়। কিছু খেতে চায়।

খানিক দূরে অশ্বথ গাছের তলায় মানিকের দুভাই হুঁকো হাতে বসেছিল। এই হুঁকো কৃষকজীবনের শান্তি ও সান্ত্বনা। মাঠে যাবার সময় কৃষক হুঁকো ও ট্যাকে একটু তামাক জড়িয়ে নিয়ে যাবেই। দেয়াশলাইয়ের বড় একটা দরকার হয় না ওদের। যাবার সময় পোয়ালের শলাকায় আগুন ধরিয়ে নিয়ে যায়। মাটির কলকেতে তামাক সেজে তার উপর পোয়ালের আগুন ঢেলে গুরুক্ গুরুক্ টানে। এই শব্দ বড়ই মধুর। গাছতলায় বসে তামাক টানতে টানতে মানিক আর গরু দুটোর দুর্দশা দেখে ওদের একজন বলল—'মানিক গরু দুটোকে না হয় ছেড়ে দাও, ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তুমিও গাছতলায় এসে বসে একটু বিশ্রাম নাও।' বলদ দুটোকে ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা সম্মুখের পুকুরে চলে যায়। সেখানে দু পা জলে দিয়ে পেটভর্তি জল পান করে। মানিক লাঙ্গল কাঁধে নিয়ে গাছতলায় ওদের সঙ্গে মিলিত হয়। সেখানে আসতেই ক্ষুধার তাড়না অনুভব করে সে। গামছায় বাঁধা ভিজা মুড়ি চিবোতে সুরু করে। মুড়ি খাওয়া শেষ হলে আঁজল ভরে পুকুর থেকে জল পান করে। এরই মধ্যে মালতী ভাত নিয়ে আসে। বুড়ো চাষী জিজ্ঞেস করে—'বাড়ীর খবর ভাল তো?' 'হাঁ বাবা, একটা খোকা হয়েছে' জবাব দেয় মালতী। 'খোকা হয়েছে ভাল কথা।' তিন জনেই সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে। আবার প্রশ্ন 'কখন হলো?' উত্তর 'দুপুর বেলা।' তারপর মালতী ওদের তিনজনকে খাবার পরিবেশন করে, ওরা পেট ভরে ভাত খায়। খাওয়ার শেষে তামাক টানে। একটু বেশী বিশ্রাম করে সেদিন। পুত্র হওয়ার আনন্দে ওরা টগবগ করতে থাকে।

পুত্র হওয়ার সংবাদে শুধু বদন বা মানিক নয়, গ্রামবাসী সকলেও খুশী। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী বললেন—'দেবতারা সুপ্রসন্ন হয়ে তোমাকে পুত্র দান করেছেন। বাছা দীর্ঘজীবী হোক।' আরেকজন বৃদ্ধা বললেন—'সুন্দর ছেলে, ভগবান ওকে দীর্ঘজীবী করুন।' পল্লীধাত্রী রূপার মার সেদিন জয় জয় কার। যেখানে কারুর প্রবেশাধিকার নেই, এমন কি ছেলের বাপের অবধি, সেই আঁতুর ঘরের দুয়ার থেকে সগর্বে সে সকলকে ছেলে দেখাচ্ছে। সকলে ছেলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মা ও ছেলে আঁতুড় ঘরেই থাকবে ততদিন যতদিন অশৌচান্ত না হয়, আচারাদি প্রতিপালিত না হয়।

শিশু জন্মের সাত বা নয় দিনের দিন সন্তানকে বিদ্বান করার

ইচ্ছা নিয়ে একটি দোয়াত ও কলম নবজাতকের শিয়রের কাছে রেখে দেওয়া হয়। পাড়াপড়শী ও আত্মীয়কুটুম্বেরা সারারাত প্রসূতির ঘরে হাসি ঠাট্টা আমোদ ও গীত করে। পরদিন প্রথমে প্রসূতি ও পরে নবজাতককে স্নান করান হয়। তারপর বাড়ী ঘর নিকিয়ে, মুছে, কাপড়চোপড় ধুয়ে, হাত-পা পরিষ্কার করে রান্নার কাজে লিপ্ত হয়। সেদিন শুচি-স্নানের পর নবজাতক ও মাকে নতুন বস্ত্রে সজ্জিত করা হয়। বাড়ীর উঠোনে একটি মাদুর বা চাটাই এর উপর ধান মেলে দেওয়া হয়। প্রসূতি নবজাতককে কোলে নিয়ে এবং হাতে একটি পাত্র বা 'লোরা' নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। লোরার অভ্যন্তরে কাঠ, কয়লা, সরষে, প্রভৃতি থাকে। সামনে থাকে দু'জন স্ত্রীলোক। তারা নবজাতক ও মায়ের মাথার উপর ছাতার মত করে একখানা কাপড় মেলে ধরে। পরিবারের অন্য কোন মেয়ে তখন একঘট জল নিয়ে আসে। সে ঘটের জলে আম্রপল্লব ডুবানো হয়। শিল-পাটা ধোয়া জল দিয়ে এই ঘট পরিপূর্ণ করা হয়। এই জল শিশুর ও মায়ের উপর শান্তিজলের মত করে ছিটিয়ে দিতে দিতে বলা হয়—'ডাইল মিডুরী খাইছে গো ?' উত্তর—'ডাইল মিডুরী খাইছি গো।' প্রশ্ন—'এক ছেঁড়া (ছেলে) ডেটে কইর‍্যা' ? উত্তর—'সাত জেঁড়া অওক'। সকলে 'অওক, অওক, অওক'। তারপর লোরা ও সন্তান সহ প্রসূতি ধান মেলে দেওয়া চাটাইটির কাছে যায়। সেখানে অন্যেরা বড় থালায় বা কুলোয় পান, সুপারী, ধান, দুর্বা সাজিয়ে রাখে পূর্বদিক মুখ করে। প্রসূতি শিশুসহ ঐ থালা বা কুলোকে নমস্কার করে।



তারপর পশ্চিম ও উত্তর দিককে নমস্কার করে। কিন্তু দক্ষিণ দিককে নমস্কার করে না, সেদিকে সমুদ্র বলে। তারপর মা সন্তানকে কোলে নিয়ে মাথার উপর ফুল লতাপাতায় সাজান মাথাল বা ছাতা ধরে নিজের পায়ে ধানগুলো নাড়তে থাকে। এই সময় ছাতার উপর পিঠা, বাতাসা, পান, সুপারী ফেলা হয়। তারপর সকলে সমস্বরে গান গায়। যেমন—'আশমানের

ছাউয়ালিয়া, আরে ছাউয়ালিয়া—জমিনে ঘিরিল রে। ছাউয়ালিয়ার নছিবের লেখন, আল্লাজী দু' লেখুইন রে, ছাউয়ালিয়ার শিরের লেখন, আল্লাজী দু' লেখুইন রে। আসমানের ছাউয়ালিয়া, আরে ছাউয়ালিয়া—জমিনে ঘিরিল রে। ছাউয়ালিয়ার রিজিকের কলম, আল্লাজী দু' ধরুইস রে, ছাউয়ালিয়ার টপরনের কলম, আল্লাজী দু' মারুইন রে।' ইত্যাদি। এ অনুষ্ঠান বাঙলাদেশের মুসলমান সমাজের। এ গানও তাঁদের। হিন্দু সমাজেও এ ধরণের গান ও অনুষ্ঠানাদি আছে। সাধারণতঃ নবজাতকের জন্মের ছয়দিনের দিন বা ষষ্ঠীর দিন অনেক হিন্দুর মধ্যে এ ধরণের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় গান হয়—'কলম রাখছি কালি গো রাখছি, রাখছি সিসের কাজল রে। জামা রাখছি, জোড়া রাখছি, আরও রাখছি কম্ড়ের তাগা রে। আরু রাখছি উরু রাখছি—রাখছি পাঞ্চ ঘিওয়ের বাতি রে, দেবদারু ঘিইরা রাখছি নবীনা জাঙ্গল রে।' এইসব আচার আচরণের মধ্যে নবজাতককে বিজ্ঞ ও শিক্ষিত করার কামনা বাসনার কথা সুস্পষ্ট। বাঙলাদেশের মুসলমান সমাজের আচরণের সঙ্গে ঐস্থানের হিন্দু সমাজের আচরণের খুব একটা তফাৎ বা পার্থক্য নেই। উত্তর-পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রও আছে এ ধরণের অনুষ্ঠান। আছে আঁট কৌড়ে বাঁট কৌড়ে এবং শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের গামছা শিশুর মাথার কাছে রাখার রীতি। নানাস্থানে নানাভাবে এই অনুষ্ঠানের বর্ণনা আছে। বদনের ঘরের নবজাতকের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আচরিত আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের নবজাতক সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায়।

বদনের মাটির চওড়া দেওয়ালের উপর বিচালী-নির্মিত চালের ঘরে অকেজো-তরুণী ও বাক-সর্বস্ব বৃদ্ধাদলের চলেছে কথার মালাগাঁথা, বদনের ঘরের নবজাতকটিকে নিয়ে। যে ঘরের বারান্দায় বসে মহিলাগণ আলাপ-আলোচনা, কথাবার্তা বলছেন, সে ঘরখানি দাঁড়িয়ে আছে বাঁশের কাঠামোর উপর। ঘরের চালে একহাত গভীর বিচালী বিছান। বারান্দার চাল কয়েকটা তালের খুঁটির উপর দাঁড়িয়ে। বারান্দা ছাড়া ওঘরে আছে আরও দুটো প্রকোষ্ঠ। বড় প্রকোষ্ঠটিতে বদনেরা শোয়। ছোটটি ভাঁড়ার ঘর। খাদ্যদ্রব্য ভরা মাটির হাঁড়ি ও টিনের কৌটা থাকে এ ঘরে। বারান্দা হচ্ছে বৈঠকখানা। বদনের শয়নকক্ষেই কাঁসার বাসনকোসন ইত্যাদি রাখা হয়। ঘরে চৌকি নেই। মাদুর ও তোষক মেঝেয় পেতে বিছানা পাতা হয়। উঠোনের দিকে আছে আরেকটি

ছোটঘর। বাড়ীতে কোন ক্রিয়াকর্ম হলে মেয়েরা ঐ ঘরেই আশ্রয় নেয়। অন্য সময়ে সেখানে কৃষির হাতিয়ারসমূহ রাখা হয়। এই ঘরকে এখন আঁতুড় ঘর করা হয়েছে। এই ঘরের বারান্দায় ঢেঁকি পাতা আছে বলে এই ঘরের নাম ঢেঁকিশাল। আমরা পশ্চিমবঙ্গের চাষী পরিবারের একটি বাস্তব চিত্র কল্পনা করে নিতে পারি বদনদের ঘরবাড়ী, আচার-আচরণ কর্মকৃত্যাদি দেখে। বদনের বাড়ীর উঠোনের একপ্রান্তে ঢেঁকিশালের সমকোণে আরেকখানা অপেক্ষাকৃত ভাল ঘর। ঐ ঘরে গয়ারাম নিদ্রা যায়। ঘরের বারান্দায় রান্না হয়। রান্নাঘর নামেই এ ঘরের পরিচয়। উত্তর দিকে আছে গোয়ালঘর। এ ঘরখানি আকারে অনেক বড়। ঘরের ভিতরে আছে গামলা পাতা। গামলাগুলোর কাছে কয়েকটি খুঁটি। এইসব খুঁটায় গরুগুলোকে আটকে গামলায় জাবর বা গরুর খাবার দেওয়া হয়।

বাড়ীর পূর্বদিকে আছে খিড়কীর পুকুর। স্নান ও গৃহস্থালীর কাজ এই পুকুরেই করা হয়। পানীয় জল সংগ্রহ করা হয় গ্রামের কিছু দূরের কৃষ্ণসাগর থেকে। উঠোনের মাঝে গোশালার নিকটে আছে একটা ধানের গোলা বা মরাই। এখানে বছরের ভুজ্‌নো ধান রক্ষিত থাকে। মরাই-র নিকটে বিচালীর গাদা। গরু-মহিষের বাৎসরিক আহার্য থাকে সেখানে। রান্নাঘরের পিছনে পুকুরের নিকট ছাইকুণ্ড। অগভীর এই গর্তে ছাই, গোময়, খড়কুটো, তরকারীর খোসা ইত্যাদি জমা করে রাখা হয়। সারের কাজ করে ওরা। এ সারই কম্পোস্ট।

এই পরিবারে বদন, মানিক, গয়ারাম, বদন-জননী অলঙ্গ, বদনের স্ত্রী সুন্দরী, কন্যা মালতী ও গয়ারামের স্ত্রী আদুরী এই সাতজনকে নিয়ে সংসার। বড়বউ সুন্দরী রান্নার কাজ করে। ছোটবউ আদুরী তাকে সাহায্য করে। আদুরী একটু খিটখিটে ধরণের। সুন্দরী শান্ত মেজাজের। পুরোপুরি ঘোমটায় আবৃত আদুরী শাশুড়ীর মুখের উপর জবাব দেয়, ফলে রাত্রে স্বামীর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, এমন কি মাঝে মাঝে কিল চড়ও খেতে হয় আদুরীকে। সব সময়ই রাগে তার মুখ ভার। মালতী মায়ের মত সুশীলা। কোনরকম রূঢ় ব্যবহার তার স্বভাব বিরুদ্ধ। সারাদিনের সংসারের ঘটনাবলী পরিশ্রান্ত বদন এই সপ্তবর্ষীয়া শিশুকন্যার মুখেই শুনতে পায়। সংসারের নানা কাজেও সে মা-ঠাকুমাকে সাহায্য করে। নানারকম ফায়ফরমাস খাটে। বদনের আদরের বলদ কেলে ও সামলা। ওরাই কৃষক পরিবারটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে বলে ওদের যথেষ্ট সমাদর ও যত্ন। গয়ারাম প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় ওদের গামলা ছোট ছোট করে কাটা বিচালি ও খইলজলে ভর্তি করে দেয়।

বলদ দুটি ছাড়া আছে তিনটি গাভী, দুটো এঁড়ে বাছুর ও একটি বকনা। এঁড়ে দুটোকে লাঙ্গলে জোড়ার জন্য জোংলানো হচ্ছে। বুড়োগাই ভগবতী সকালে তিন পোয়াটাক ও বিকালে আধসেরটাক দুধ দেয়। মেজো গাই ঝুমরী সকাল-বিকাল প্রায় আড়াই সের দুধ দেয়। ছোট কামধেনু প্রায় পাঁচসের দুধ দেয় দৈনিক। গয়ারাম এ পরিবারের রাখাল। সে ওদের বিচালী দেয়, ভুষি, গুড় ও গুড়ের জল দেয়, অন্য খাবার দেয়। বাঘা কুকুরটির জন্য কারুর কোন নজর দেবার প্রয়োজন হয় না। আহার শেষে বাড়ীর লোকের নিকটে যে এক এক মুঠো খাদ্য পায় সে, তাতেই সে সন্তুষ্ট।

সকালে কৃষক পরিবারের মেয়েরা কাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে শয্যা ত্যাগ করে। সোজা চলে যায় পুকুরে। পুকুর থেকে এসে গোবরজলের ছিটা দেয় উঠোনে, ছেঁড়া কাপড় দিয়ে ঘরের ভিতর ও দাওয়া নিকোয়। গোবর দিয়ে ঘুঁটে দেয়। এই গোবর পচিয়ে সারও তৈরী করা হয়। গরুর সবই প্রয়োজনীয় এমন কি মূত্র অবধি। গো-চোনা টোটকার কাজ করে। ঘর নিকোনো ও ঘরদোর ঝাঁট দেওয়ার পর মেয়েরা ঘরকন্নার কাজে আত্ম-নিয়োগ করে। ধান সিদ্ধ করা, তা রোদে দেওয়া, কাঁসা ও পাথরের বাসন মাজা ইত্যাদি কাজে অনেক সময় চলে যায় তাদের। তারপর স্নান এবং রন্ধনের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বাড়ীর সকলের আহারের ব্যবস্থা, মাঠে কর্তব্যরত মানুষদের জন্য খাবার পাঠানো, সবই করতে হয় তাদেরকে। বিকালে সময় পেলে অনেককেই চরকায় সুতা কাটাতে হয়। তাঁতীরা সে সুতো নিয়ে ধুতি বুনে, শাড়ী বুনে। অনেকের নিজেদের ঘরেই তাঁত থাকে। নিজেরাও সুযোগসুবিধামত তাঁত চালায়। এই কুললক্ষ্মীরা প্রতিসন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি দেয়। সন্ধ্যাপূজা করে। দিবারাত্রের খাবারের যোগাড় করে। এভাবে একই নিয়মে রাত্রি দিন কেটে যায়। শতাধিক বৎসর পূর্বের লালবিহারী বর্ণিত পল্লী-ধাত্রী, গ্রাম্য-চৌকিদার, কুকুরের ঘেউঘেউ, নিশি ও নৈশ-প্রেতিনী, কেরোসিনের বাতি, রূপার-মার কুঁড়ে ঘর, মাঠ-মজলিশের হুঁকোর টান, মুদির দোকান, লাঙ্গল চাষ, গ্রামের হাট, কৃষকের কুটির, আঁতুড় ঘর, গোয়ালঘর, গণকঠাকুর, ষষ্ঠীপূজো, আটকোড়িয়া উৎসব, সূতিকাস্নান, অন্নপ্রাশন, কোষ্ঠীরচনা, পাঁজি পাঠ, যাদুক্রীড়া, পেঁচোয় পাওয়া, পাঠশালার পণ্ডিত, মালতীর বিয়ে, সাঁজবাতি, গেঁয়োভূত, বৈরাগী, শিয়াল, ওঝা, সান্ধ্য-সম্মিলনী, হিন্দু-বিধবা, ঝাড়ফুক, অশৌচপালন, প্রকৃতির রূপ, তেপান্তরের মাঠ, গামছা থেকে মুড়ি খাওয়া, গাছ থেকে ডাব পেড়ে

খাওয়া, পল্লীর বাজার, পল্লীর আখড়া, মেয়েদের আলোচনা-সভা, কামারশালা, গ্রাম্য মহাজন, পল্লীর ছেলেদের বীরত্ব, সংগ্রাম, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি সমস্তই প্রায় সমান মর্যাদা নিয়েই বেঁচে আছে। সাম্প্রতিক গাঁয়ে অবশ্য জমিদারদের অত্যাচার নেই। কিন্তু সেখানে জমিদারদের বদলে জমিদারদের বেনামদার একশ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে যারা জমিদারদের মতই অত্যাচারী, সরকারী আইন-কানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে নিজ নিজ শোষণ ও শাসন বজায় রাখতে যারা পটু। পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের ফেলে আসা ও প্রাচীন গ্রাম দুটি সম্পর্কে যে কথা বলা হল সেখানে এখন নানা পরিবর্তন এসেছে। তৎসত্ত্বেও প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসরণ করে চলে গ্রামবাসী। পরিবর্তন এসেছে বিজ্ঞানের জয়যাত্রায়, পুরাতন শিল্পের প্রস্থান ও নতুন শিল্পের আগমনে এবং লেখাপড়া ও চাকুরীর সুযোগবৃদ্ধিতে। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতায় অনেক টিনের ঘর, ছনের ঘর, দালান হয়ে চলেছে। অনেকেই ঘরের মেঝে পাকা করে উপরে টালী বা করোগেট টিন লাগাচ্ছেন, কিন্তু পূর্বে এ ধরণের ঘর খুবই কম ছিল গ্রামে। তাছাড়া পূর্বে বাড়ীঘর তৈরীর পরিকল্পনায় একটা কঠোরতা ছিল। সাধারণতঃ যেখানে ব্রাহ্মণ বসবাস করতেন তার পাশে হয় ব্রাহ্মণ নয় উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরাই থাকতে পারতেন। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু বা অহিন্দুদের বসবাস করার অধিকার ছিল না তাঁদের আশেপাশে। আবার যেখানে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু বা অহিন্দুরা বসবাস করতেন সেখানে তাঁরা দলবেঁধে, পাড়া তৈরী করে থাকতেন। যদিও তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় অনেক বেশী তথাপি তাঁরা ব্রাহ্মণ ও উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের প্রাধান্য স্বীকার করতেন, তাঁদের আর্থিক সচ্ছলতার জন্য, তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধির জন্য। সংখ্যায় কম এই বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় ছিল তখন জমির মালিক, নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানেরা ছিল কৃষক বা বর্গাদার। জমির মালিক বা জমিদারদের ছিল অখণ্ড প্রতাপ। কিন্তু স্বাধীনতার পরে জমিদারী প্রথা রহিত হলে এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হলে সংখ্যালঘু ধনিকশ্রেণীর সেই পুরাতন প্রাধান্য কমে যায়। ক্রমে নিম্নশ্রেণীর লোকেদের বা প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন সম্প্রদায়ের ছেলেরা-মেয়েরা সরকারী বদান্যতা গ্রহণ করে নিজেদেরকে শিক্ষিত করে চলে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তারা অনেক গ্রামেই নেতৃত্ব করতে পারছে এখন। ফলে অনেকস্থানে পুরাতন বা বংশপরম্পরাগত নেতৃত্বের সঙ্গে নতুন নেতাদের অনেকস্থলে সংযোগ, অনেকস্থলে বিরোধ দেখা দিয়েছে। নতুন নেতৃত্বের উদ্ভবে সামাজিক কঠোরতাও হ্রাস পাচ্ছে। অর্থাৎ পূর্বে যখন ছোঁয়াছুঁয়ির বাছবিচার ছিল প্রচণ্ডভাবে তা কমে আসছে। কমে আসছে

বারোয়ারী পূজায় ও নানাবিধ আচার আচরণের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর লোকেদের অংশ গ্রহণ করার নিয়মের কঠোরতা। তাছাড়া বিয়াশাদী উপলক্ষে পূর্বে বংশ, কুল, গোত্র প্রভৃতি নিয়ে যেরূপ গোঁড়ামী দেখান হত অনেকক্ষেত্রেই এখন তা নেই। যেমন স্বগোত্রে বিয়ে দিতে এখন অনেক গোঁড়া সম্প্রদায়ও আপত্তি করেন না। পূর্বে কোন গ্রামে একটা 'ইন্টারকাস্ট-ম্যারেজ' বা একজাতির ছেলে অন্যজাতির মেয়ে বিয়ে করলে তাকে সমাজচ্যুত করা হত। এখন গ্রাম্য সমাজ এ বিষয়ে তত কঠোর হতে পারছেন না। তাছাড়া কুলীন, অকুলীন বিবাহ, বারেন্দ্র-রাঢ়ী বিবাহ, বৈদিক-অবৈদিক বিবাহ প্রভৃতিও হত না। এখন অনেকেই এ ধরনের বিবাহে আপত্তি জানান না। কিছুদিন পূর্বেও অব্রাহ্মণদের পৈতা নেওয়া নিয়ে সাড়া পড়েছিল বাঙলায়। আমাদের গ্রামে দারুণ গণ্ডগোল হয়ে গেছে এ নিয়ে। পৈতা নিলে পূজা-আচার-শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কর্মে অব্রাহ্মণদেরও নাকি ব্রাহ্মণদের ন্যায় অধিকার জন্মে। শ্রাদ্ধকার্য এগার দিনে করা যায়, অন্যথায় একমাস অশৌচ প্রতিপালন করা বিধি। মনে পড়ে আমাদের গ্রামের জমিদারবাবুদের বাড়ীতে বৃদ্ধ জমিদার বাবুর শ্রাদ্ধ একমাস অশৌচান্তে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে আমাদের গ্রামের অনেক গোঁড়া সে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান বর্জন করেছিলেন এবং তা নিয়ে একটা রেষারেষিই হয়েছিল। একই ভাবে বৈদ্য-কায়স্থ বিয়ে নিয়েও হয়েছিল অনেক আত্মীয় বিবাদ। কিন্তু এখন এ সব খুব সমস্যার সৃষ্টি করে না। তাই এখন অনেক ব্রাহ্মণ, অনেক কায়স্থ-বৈদ্য সম্প্রদায় জুতোর দোকান দিতে ভীত নয়। কিছুদিন পূর্বেও এ কাজ ছিল অনুন্নত ও মুচি সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট। তেমনি অনেক নিম্নশ্রেণীর লোক এখন গ্রামের নেতা। গ্রামের সকলে তাদের মানে, মানতে বাধ্য হয় ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ সম্প্রদায়ের লোকদের যারা কিছুদিন পূর্বে পর্যন্ত কাউকে না মেনে তাঁদের মানাবার কায়দায় নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখতেন। এইভাবেই বাঙলার অনেক গ্রাম থেকে বনেদী নেতৃত্ব উঠে গেছে। বনেদী জমিদার, বনেদী ধনী চলে গেছে। তার বদলে এসেছে নতুন নেতৃত্ব, নতুন ধনিক শ্রেণী। এই নতুন ধনিকশ্রেণীর অনেকেই সরকার পৃষ্ঠপোষিত। নানাভাবে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে ওঁরা ধনবৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। রাজনৈতিক দলের শ্রীবৃদ্ধি, প্রসার বা পতনের সঙ্গে সঙ্গে এইসব নতুন ধনিক সম্প্রদায়ের প্রতাপ প্রতিপত্তি বাড়ে বা কমে। এই নতুন ধনিক সম্প্রদায় স্থিতিশীল নয়। কিন্তু হাট বাজারের সুদখোর, মহাজন প্রভৃতি যে কোন অবস্থায়ই তাদের দাপট চালিয়ে যেতে পারেন। আগে এ কাজ

করতেন জমিদার বা তাঁর মুৎসুদ্দিরা। এখন মহাজনেরা গ্রামের অন্যতম প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। এই মহাজনদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের লোক আছে। কিন্তু কখনও কোন কারণে শ্রেণী বা বর্ণ-বিদ্বেষ উপস্থিত হলে তাঁরা নিজ নিজ শ্রেণী, বর্ণ, সম্প্রদায়ের কথা ভুলে গিয়ে মহাজনদের কথাই ভাবে। সেখানে তারা এককাট্টা, একজোট। ফলে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত অধিকার এখন গ্রামে অচল। প্রতাপ ও প্রতিপত্তির জন্য এখন চলছে অর্থের লড়াই। মর্যাদার লড়াই। উচ্চবংশজাত, জ্ঞানী বা বিদ্বানের কদরের চেয়ে এখন অনেক বেশী কদর সরকারী অফিসার ও কর্মীর, সরকারীদলের নেতৃবৃন্দের এবং সদস্যের। বাঙলার গ্রামের এই নতুন চরিত্রের সঙ্গে পুরাতন ঐতিহ্য অনেক স্থলে একই সঙ্গে চলেছে। চলেছে বলে ছাত্র-যুবকদের অনেকে পিতৃপিতামহদের সব কিছুই খারাপ বলে মনে করেন, আবার অভিভাবকশ্রেণীও মনে করেন—'ছেলে মেয়েরা একেবারে গোল্লায় গেছে, ওদের যা ইচ্ছা তা করুক'। এই বিরোধ চলছে, চলবে। তাই এই বিরোধ ও পরিবর্তনের কথা মনে রেখে, গ্রাম-বাঙলার তথা বাঙলার ছেড়ে আসা ও প্রাচীন গ্রামের কথা মনে রেখে, আমরা পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার বিদিশা গ্রামে চলে যাবো। নতুন গড়ে ওঠা গ্রাম এটি। এই গাঁয়ের মাটি সর্বাঙ্গে মেখে নিয়ে গ্রাম্য মানুষের অন্তরের অন্তঃস্তলে যাবার প্রয়াস পাব।

শিয়ালদহ থেকে রাণাঘাট অবধি যে ট্রেন যায় সে ট্রেনে রাণাঘাট,



রাণাঘাট থেকে বনগাঁগামী ট্রেনের প্রথম স্টেশন গাঙ্গনাপুর নেমে হেঁটে, সাইকেলে বা গোরু, মোষের গাড়ীতে অথবা রাণাঘাট থেকে সাইকেল রিক্সা বা অপর কোন যানে পূণ্যপুকুর পর্যন্ত এসে মেঠো গ্রাম্যপথ দিয়ে হেঁটে, গরু-মোষের গাড়ীতে বা সাইকেলে এ গাঁয়ে এসে পৌঁছান যায়। শীতকালে পথঘাট ভাল থাকলে রাণাঘাট থেকে ঘোড়ারগাড়ীতে

করেও যাওয়া যায় বিদিশার দীর্ঘ সাড়ে তিন মাইল-চারমাইল পথ অবলীলাক্রমে।

সীমান্তে অবস্থিত এ গাঁয়ের এ রাস্তাটির যদিও গুরুত্ব অসীম তবুও এ রাস্তার উন্নয়নের জন্য সরকারী কোন প্রচেষ্টা নেই, গ্রামবাসীরা নানাভাবে তাঁদের দুঃখ দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেছেন সরকারের কাছে, আমলাদের কাছে, কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। জনগণের দুঃখদুর্দশায় সাড়া দিলে পাছে সরকার সত্যিকারের জনকল্যাণমূলক কোন কাজ করে বসেন সেই ভয়ে মন্ত্রীদের প্রতিশ্রুতি, বিধানসভার সদস্যের আশ্বাস, বেসরকারী লোকেদের প্রচেষ্টার পরেও সেই কাদামাখা জলেডোবা রাস্তা পাকা করা যাচ্ছে না। কিন্তু কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে সরকারী বন বিভাগের ট্রাক চালিয়ে কাঁচা রাস্তায় খাদ তৈরী করতে, গ্রামবাসীদের আরও কিছু কষ্টের মধ্যে ফেলে দিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না তাঁদের যারা রাস্তা তৈরী করার কর্তা হয়েও তা করে না। কাঁচা মেঠো রাস্তা সংস্কারের কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। যদিও এ গাঁয়ের অন্যদিক থেকে উন্নতি হয়েছে। বঙ্গ বিভক্ত হবার পর ওপার বাঙলার পাসকরা সুবর্ণপদক প্রাপ্ত চিকিৎসক, এ্যালোপেথিক ডাক্তার এসেছেন। আগে যে দু'জন হাতুড়ে বা হাটের ডাক্তার ছিলেন তাঁরাও আছেন। পোষ্ট সম্প্রতি অফিসও হয়েছে। সাপ্তাহিক হাট বসে, তবুও সর্ববিধ যোগাযোগ রাণাঘাটের মাধ্যমেই করা হয়ে থাকে। শুধু যে বিদিশাবাসীই এই রাস্তার জন্য চরম দুর্দশা ভোগ করেন এমন নয়। আশেপাশের আরও পনের-বিশটা গ্রামের অধিবাসীদেরও দুর্দশার অন্ত থাকে না বর্ষাকালে। ঐ সময় সর্বপ্রকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করতে হয় এই সব গাঁয়ের কয়েক হাজার লোককে যারা দিবারাত্র পরিশ্রম করে ধান, পাট উৎপন্ন করছে। উৎপন্ন করছে আরও নানাবিধ শাক সব্জি ও ফল ইত্যাদি শহরের জন্য।

এই গ্রামে ও আশেপাশে একদিকে যেমন আছেন বর্ণ-হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা তেমনি অপরদিকে আছেন তপশীলীজাতি, খণ্ডজাতি ও বন্যজাতির চাষীরা। সমস্ত বর্ণের সমস্ত লোকের মিশ্রণে গড়ে উঠেছে এ গ্রাম। পূর্বে এ গাঁয়ে মুসলমান চাষী বসবাস করত। তারা বঙ্গভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই ও-পার বাঙলায় চলে গেছে, বা ওদের চলে যেতে হয়েছে বর্তমান নমোপাড়ার অধিবাসীদের তাড়নায়। নানাস্থানের লোক এসেছে এ গাঁয়ে। প্রায় সকলেই স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে জায়গাজমি

বদল করে চলে এসেছে। এখন এ গাঁয়ে মুসলমান চাষী বা অধিবাসী নেই। এ গাঁয়ের যিনি ডাক্তার তিনি আশেপাশের গ্রামেরও ডাক্তার। খুব নামডাক আর হাতযশ তাঁর। ও-পার বাঙলা থেকে এসেছেন। জমিজমা করেছেন। একদিকে ডাক্তারী অপরদিকে জমিজমা দেখার কাজে ভদ্রলোক সর্বদাই ব্যস্ত। এক মিনিট সময় অপব্যয় করতে পারেন না তিনি। ইনি জাতিতে বৈদ্য। এ গ্রামে এই এক ঘরই বৈদ্য। ব্রাহ্মণ এক ঘরও নেই। কয়েক ঘর বর্ধিষ্ণু কায়স্থ আছেন। কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা প্রভৃতি স্থান থেকে এসে বসবাস করছেন দেশবিভাগের পর থেকে। ডাক্তারবাবুর বসতবাটীর সম্মুখের ঘরেই ডাক্তারখানা। সম্মুখের বারান্দায় একটা টুল বা বেঞ্চি পাতা। রোগীরা ঐ বেঞ্চিতে এসে বসে লাইন দিয়ে। মাঝের ঘরে বসেন ডাক্তারবাবু। পিছনে আরেকটি ঘর ও তার সংলগ্ন একটি বারান্দা। পিছনের ঘরে ডাক্তারবাবুর ভাগ্নে থাকেন। অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পারেন ভাগ্নেবাবু। প্রায়ই সব কাজ গুছিয়ে করতে পারেন না, সেই জন্য অন্য লোকের যে কাজ করতে লাগে একঘণ্টা সময় সেই কাজ করতে ভাগ্নেবাবু অনায়াসে পাঁচ-ছ ঘণ্টা লাগিয়ে দিতে পারেন। পিছনের বারান্দায় কৃষকেরা সকাল-বিকাল আহার করে। দরকার মত ওদের কেউ নিদ্রাও যায় ঐ জায়গায়।

ডাক্তারখানার সম্মুখের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে হাট বসে প্রতি শনি ও মঙ্গলবার। প্রাঙ্গণ ঘেঁষে আছে প্রকাণ্ড একটা এজমালী পুকুর। ওই পুকুরে পাট পচানো হয়। গরু-মোষদের স্নান করানো হয়, কাপড় কাচাও হয়। হাটের বটতলার নীচে তাস, দাবা চলে। চারখানা দোকানঘর আছে। এই দোকানে সব পাওয়া যায়—স্টেশনারী, মুদি, মনোহারী দোকানের সব মালই কিছু কিছু ওরা রাখে। গ্রামবাসীদের প্রয়োজনে লাগে এমন মাল সর্বদাই মজুত থাকে দোকানে। তাছাড়া কোন জিনিস মজুত না থাকলে অর্ডার মত সে সব জিনিসও তারা সংগ্রহ করে এনে পরিবেশন করে। হাটেরই পাশে গ্রাম্য বিদ্যালয়, তারই পাশে চণ্ডীমণ্ডপ, প্রতি বছর বারোয়ারী পূজো হয়। প্রথমদিকে কেউই এ পূজোর দায়িত্ব নিতে চায় না, কিন্তু পূজোর দিন যত এগিয়ে আসে ততই যেন সকলে পূজোর প্রতি ঝুঁকে পড়ে। সকলেই পূজোর নেতৃত্ব নিতে সচেষ্ট হয়, সকলের সমবেত চেষ্টায় অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়।

একদা এই অনুষ্ঠানেরই পথ ধরে আয়োজন হয়েছিল ধর্মসভার, কবিগানের, অন্যান্য আনন্দানুষ্ঠানের। গাঁয়ের লোক ফেটে পড়ে এই সব অনুষ্ঠানে।

এমন কি কর্মব্যস্ত ডাক্তারবাবু পর্যন্ত মাঝে মাঝে ঘুরে যান অনুষ্ঠান ঠিক ঠিক হচ্ছে কি না তা প্রত্যক্ষ করতে।

ধর্মসভায় লোকশিক্ষার ব্যবস্থা হয়ে থাকে। কথক বঙ্কিমচন্দ্রের কথানুকরণে বলতে লাগলেন—এখন ধর্মসভার তেমন কদর নেই কিন্তু চিরকাল তো এরূপ ছিল না। সেদিনও গ্রামে নগরে বেদীপিঁড়ির উপর বসে সুগন্ধ মল্লিকামালা শিরোপরে বেষ্টিত করে কথক সীতা, অহল্যা, দ্রৌপদী, সাবিত্রী, বেহুলা প্রভৃতির সতীত্ব বর্ণনা করতেন। অর্জুনের বীরধর্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয় জয়, দুর্যোধনের অহংবোধ, দধীচির আত্মদানের কথা বলতেন। নারী সমাজকে সতীত্বধর্মের প্রতি শিক্ষা দিতেন। এই শিক্ষায় সকলেরই সমান অধিকার ছিল। যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পেঁজে, যে কুটনো কাটে, যে ভাত পায় না, যে ভাত পায়, যে শিক্ষিত, যে অশিক্ষিত সকলেরই ছিল এখানে সমানাধিকার। আজিকার এ সভা সেই পুরাতনকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। স্বতঃই তাই মা জননীদের সম্পর্কে কিছু বলতে উৎসাহিত বোধ করছি আজ। আমরা সকলেই জানি, আমাদের যা কিছু আপনার, যা কিছু আদরের তা সবই এই মা-জননীদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তাই মা-জননীরা আমাদের কাছে আরাধ্যা। এই জননীরাই আবার প্রকৃতির রূপ নিয়ে পুরুষের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে চলেছেন সুখী সংসার গঠন করতে। সুতরাং পুরুষদের মনোরঞ্জন করার জন্য নারীদের নানাবিধ কলাবিদ্যা অনুশীলন করার প্রয়োজন। প্রাচীন শাস্ত্রে কলাবিদ্যার উল্লেখ আছে বলে কথক জানালেন।

তিনি বলে চললেন, আগেকার দিনে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন কলাবিদ্যার চর্চা হত। প্রত্যেক নারীর পক্ষে কলাবিদ্যা চর্চা অপরিহার্য ছিল। এই কলাবিদ্যা চর্চার দ্বারা তাঁরা অঙ্গশোভা বর্ধন করেন, মানসিক উৎকর্ষ লাভ করেন। স্ত্রী কলানিপুণ হলে স্বামীর অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। শাস্ত্রকারেরা তাই বলেছেন, কলাবিদ্যার সম্যক্ চর্চা ছাড়া মানুষ ধর্ম অর্থ কাম কিছুই লাভ করতে পারে না। কলাবিদ্যার অনুশীলনে অর্থোপার্জনের পথ সুগম হয়। ধর্মপথে বিচরণ করবার প্রতিবন্ধকতা অপসারিত হয়। মেয়েদের জন্য প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা চৌষট্টিপ্রকার কলার বিধান দিয়েছেন। এই কলা যথাক্রমে—গান, বাজনা, নাচ, আলেখ্য বা নানারকম বর্ণ প্রয়োগের সাহায্যে চিত্র রচনা। এই চার প্রকার কলার সাহায্যে নারী নিজ চিত্তবিনোদন এবং অপরের মনে অনুরাগ জন্মাতে পারেন। চন্দন-কুসুমাদি দ্বারা কপাল ও গালে অলকা তিলকা রচনা, আলপনা ও মালা গাঁথা,

শয়নাগারে বা পূজাগৃহে পুষ্পশয্যা রচনা, এবং প্রসাধনে অঙ্গশোভা বর্ধনকে পাঁচ থেকে আট কলার মধ্যে ধরা হয়। প্রত্যেক নারীর পক্ষে এগুলো জানা আবশ্যক। নয় থেকে বারো কলার মধ্যে আছে নানা রঙের পাথর এবং মরকত বা পান্না জাতীয় প্রস্তর লতাপাতা নক্‌সার শিল্পে ঘরের মেঝে নির্মাণ, ঋতুভেদ অর্থাৎ গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শয্যা রচনার কৌশল। উদক বাদ্য বা জলতরঙ্গাদি বাজনা এবং উদকাঘাত জলক্রীড়া, সাঁতার, হস্ত লীলায়িত করে অপরের গায়ে জল ছিটানো। ঈর্ষাবশত পরের অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে বিবিধ প্রক্রিয়া বা তুক্‌ করা ওষুধ দেওয়া ইত্যাদিও শিক্ষণীয় কলার একটি। এটি ত্রয়োদশ কলা। দেবতা পূজার জন্য মালা-গাঁথা, বিনা সুতায় হারগাঁথা, শেখরকাপীড় বা চুলে জড়াবার জন্য বিবিধ ফুলের মালা রচনা, নেপথ্য-প্রয়োগ অভিনেত্রী সাজানো, কর্ণপত্রভঙ্গ বা হাতির দাঁত, শঙ্খ ইত্যাদির দ্বারা কানবালা জাতীয় জিনিষ তৈরী, গন্ধদ্রব্য বা অগুরুচন্দনাদির দ্বারা অঙ্গরাগ তৈরী, ভূষণ-যোজন বা জড়োয়া গহনা এবং বাজু কুণ্ডলাদির দ্বারা অঙ্গসজ্জা ও ইন্দ্রজাল বা যাদুবিদ্যা চৌষট্টি কলার চৌদ্দ থেকে কুড়ি কলার অন্তর্গত। একুশ থেকে পঁচিশ কলায় আছে —কৌচুমার যোগ অর্থাৎ যে কলায় কুরূপাকে সুরূপা এবং সুরূপাকে কুরূপা দেখানো সম্ভব, হস্তলাঘব বা হাতের কৌশলে বাজি দেখানো, শাক-অন্ন-ব্যঞ্জন-মিষ্টান্নাদির পাকপ্রণালী, সেলাইয়ের কাজ এবং সূচীশিল্প বা কাঁথা, ফুল তোলা পরিধেয়র বর্ডার তৈরীর কৌশল ইত্যাদি। বীণা ডমরু প্রভৃতি বাজানো, প্রহেলিকা বা ধাঁধা রচনা, প্রতিমালা বা ছড়াকাটা, শব্দ ও ধ্বনিক্রীড়া, দুর্বাচক বা কবিতায় দুরূহ শব্দ নিয়ে কাব্যক্রীড়া



বা কবির লড়াই, পুস্তকবাচন বা রূপকথা, ব্রতকথা, উপকথা, কথকতাদির বর্ণন, এগুলি যথাক্রমে ছাব্বিশ থেকে ত্রিশ কলার মধ্যে। অন্য চৌত্রিশটি কলার মধ্যে আছে—নাটক, আখ্যায়িকা দর্শন বা নাটকের কাহিনী সম্পর্কে জ্ঞান ; কাব্য, সমস্যা পূরণ বা উপমা ও কবিতার চিত্রকল্পের জ্ঞান, পত্রকাবেত্রবান বিকল্প বা বেত দিয়ে পাটি, আসন, মোড়া প্রভৃতি তৈরী

তক্ষকর্ম বা টোকোর কাজে কুঁদা পালিশ করা, তক্ষণ বা ছুতোরের কাজ, বাস্তুবিদ্যা বা গৃহ নির্মাণের কাজ, রূপরত্ন পরীক্ষা বা হীরক মণিমুক্তা প্রভৃতির গুণ-পরীক্ষা, ধাতুজ্ঞান বা পাথর, রত্ন ধাতু প্রভৃতির পাতন ও শোধন সম্বন্ধীয় জ্ঞান, মণিরাগকের জ্ঞান বা পদ্মরাগ প্রভৃতি মণির উৎপত্তি-স্থান সম্পর্কিত জ্ঞান, বৃক্ষায়ুর্বেদযোগ বা গাছপালা কিভাবে রোপণ করতে হয়, কিভাবে রোগাক্রান্ত গাছপালার চিকিৎসা করতে হয় যে বিষয়ে জ্ঞান, মেষকুক্কুটলাবক যুদ্ধবিধি বা ভেড়া মুরগী পাখী ইত্যাদির লড়াই, শুকসারিকাপ্রলাপণ বা টিয়া চন্দনা ময়না শালিক প্রভৃতিকে কথা বলতে শেখানো, চুল বৃদ্ধি করতে, চুল ওঠা বন্ধ করতে কেশনুমর্দন ও কেশমর্দন করার কৌশল শিক্ষা, অক্ষরমুষ্টিকাকথন বা ঠারেঠোরে কথাবলার কৌশল অর্থাৎ মুদ্রাম্লেচ্ছিত বিকল্প বা যে বাক্য সাধু শব্দে রচিত অথচ অক্ষরের কুটিল বিন্যাসবশতঃ যার অর্থ স্পষ্ট বা সোজা হয় না সেরূপ বাক্য গঠনের শিক্ষা, দেশজভাষাবিজ্ঞান বা নানান্ দেশের নানান্ ভাষা জানা, পুষ্পশকটিকা বা বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে ফুল দিয়ে গাড়ী সাজানো, নিমিত্তজ্ঞান বা যে কোন ব্যাপারের মূলহেতু বলতে পারা, যন্ত্রমাতৃকা বা যন্ত্রচালিত যানের গঠন কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞান, ধারণমাতৃকা বা স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধি বা শ্রুতিধর হওয়ার সাধনা, সংপাঠ্য বা একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে মিলে গ্রন্থপাঠ, মানসী বা কবিতা পাঠ শুনে আবৃত্তি, কাব্যরচনা, অভিধান, কোষগ্রন্থাদির ব্যবহারিক জ্ঞান, ছন্দ সম্পর্কে জ্ঞান, অলঙ্কার শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান, ছলিতক যোগ বা ছলনা করার জন্য আকৃতির রূপান্তর সাধন, বস্ত্র পরিধানের কৌশল তথা বক্ষবন্ধনী, অন্তর্বাস ইত্যাদি পরিধানের ঠিক ঠিক জ্ঞান, তাস, কড়ি, ঘুঁটি ইত্যাদির খেলা, বল, গুলি ইত্যাদির দ্বারা ছোটদের সঙ্গে খেলা, পাশাখেলা, হাতী, ঘোড়া, সিংহ, বাঘ প্রভৃতি জন্তুদের বশীভূত করার জ্ঞান, বৈজয়িকী বিদ্যা বা যে বিদ্যার দ্বারা বিজয় লাভ করা যায় যেমন শস্ত্রবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা ইত্যাদি সম্পর্কিত জ্ঞান এবং বৈয়ামিকী বিদ্যা বা নানাপ্রকার ব্যায়াম, যুযুৎসু, মৃগয়া ইত্যাদি সম্পর্কিত জ্ঞান। এই চৌষট্টি কলাবিদ্যা স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই শিক্ষনীয়। অবশ্য পুরুষদের আরও কিছু বেশী কলা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হয়। কথক ঠাকুর বলে চললেন, পুরুষ হবে সুন্দর, সুকুমার, সুহাস, সুভাষ। তার দেহ-সৌষ্ঠব হবে চিত্তহারী, সে হবে উন্নত শির, সুঠাম দেহের অধিকারী। তার থাকবে কুঞ্চিত কেশদাম, সে হবে

স্ফুটবাক, চতুর, বিশাল অথচ আরক্ত নয়ন এবং সুকণ্ঠের অধিকারী। সর্বপ্রকার শিক্ষার প্রতি থাকবে তার আগ্রহ। শিক্ষা গ্রহণের সামর্থ্যও তার থাকা চাই। শিক্ষাপ্রাপ্ত বিষয় স্মরণ রাখা, লজ্জা, ভয়, ইত্যাদি জয় করা ও সমস্ত রকম পরিশ্রমের মধ্যে আনন্দ পাওয়ার শিক্ষা তাকে গ্রহণ করতে হয়। সে হবে মধুরবাক, বিদ্বান, দক্ষ, বাগ্মী, অভিজাত, কলা ও বিজ্ঞানশাস্ত্রবিৎ, গীতাভিজ্ঞ, বাদ্যনিপুণ, নৃত্যপারদর্শী, আত্মনির্ভরশীল, উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন এবং কৌতুক ও পরিহাসপ্রিয়। সে ধৈর্য ও গাম্ভীর্যেও হবে অদ্বিতীয়। সে হবে শান্ত, ধীর, স্থির, সত্যবাদী ও রসসিদ্ধ। রস মানে শৃঙ্গার বা আদিরস, বীররস, করুণরস, অদ্ভুতরস, ভয়ানকরস, বীভৎসরস রৌদ্ররস, শান্তরস এবং বাৎসল্যরস। তাছাড়া দাস্যরসও তার জানা উচিত। জানা উচিত ভাব ও রসের সম্পর্ক। কারণ, ভাব থেকেই রসের সৌন্দর্যে প্রকাশ ও বিস্তার। আবার রস থেকেই ভাবের মাধুর্যের বিকাশ। এই বলেই কথক ঠাকুর একটা সংস্কৃত শ্লোক আওড়ালেন—'বিভাবোনুভাবেন ব্যক্ত সঞ্চারিণা তথা, রসতামেতি রত্যাদি ঃ স্থায়ীভাবঃ সচেতসাম'—অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব ছাড়া ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাবের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় সচেতন ব্যক্তির রতি, হাস প্রভৃতি স্থায়ীভাব এবং তা সরসতাপ্রাপ্ত হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সঞ্চালনের দ্বারা প্রকাশিত হয় হৃদগত ভাবের অভিব্যক্তি। স্থায়ীভাব অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ। এর যেমন উৎপত্তি আছে, তেমনি বিনাশ আছে। স্থায়ীভাব বলতে রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়কে বোঝান হয়। রস ও ভাবের চর্চায় সে হয় রূপদক্ষ, কলাবিজ্ঞানী ও শিল্পবিজ্ঞানী। কলার সাধনা থেকে আসে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দায়িত্বজ্ঞান; ক্রমে সে হয়ে ওঠে সদালাপী, মিতাচারী, প্রিয়ভাষী, অমায়িক, বন্ধুবৎসল, সামাজিক ও



বিশ্বপ্রেমিক, এবং হয় সত্য, শিব ও সুন্দরের পূজারী। কলাবিদ্যার সাধক জীবনে পায় প্রতিষ্ঠা, মান, সম্মান ও প্রতিপত্তি। অর্থাৎ সুখ, সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির জন্য সমস্ত পুরুষ ও সমস্ত স্ত্রীলোককে নানাবিধ কলাবিদ্যার চর্চা এবং তা অধ্যয়ন করার আবশ্যকতা আছে। এক নাগাড়ে এত সব কথা বলে কথক ঠাকুর একটু ঢোক গিললেন। উপস্থিত সকলে নির্বাক হয়ে

বিশেষ উৎসাহ নিয়ে তাঁর কথা শুনছিলেন। একটু থেমে আবার তিনি বলতে সুরু করলেন, কলাবিদ্যা অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা এত অধিক হওয়া সত্ত্বেও কলাবিদ্যার বহু বিষয়ের প্রতি আমাদের একটা অনীহা এসেছে। এটা সুলক্ষণ নয় বলেই কথক ঠাকুর মনে করেন। তাই 'মা-জননীদের কাছে সমবেত-ভদ্রমণ্ডলীর কাছে আমি নিবেদন জানাই, এই কলাবিদ্যায় পারদর্শী হতে। ধর্মাচারের সঙ্গে এ কলাবিদ্যার অঙ্গাঙ্গী যোগ। অঙ্গাঙ্গী যোগ জীবনচর্যার সঙ্গে বলার। 'সুগৃহিণী, সুমাতা, সুকন্যা, সুগৃহী, আদর্শ পিতা, আদর্শ ভ্রাতা হবার জন্য আপনারা এই কলাবিদ্যার চর্চা অব্যাহত রাখুন—এই মিনতি জানাই মা জননীদের ভদ্রমহোদয়দের কাছে।'

ভণিতার পরে কথক ঠাকুর রামায়ণ-কাহিনী সুরু করলেন। চারদিকে বৃষ্টি, খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন বৃদ্ধারা কথক ঠাকুরের কথা। রামচন্দ্রের বিবাহের পাকাপাকি ব্যবস্থা করে কথক ঠাকুর সেদিনকার মত তাঁর কথা সমাপ্ত করলেন। বললেন, আজ এই পর্যন্ত, আবার কাল।

এই সমাপ্তিতে তৃপ্তি পেলেন না তাঁরা যাঁরা একাগ্রচিত্তে রামকাহিনী শুনছিলেন। কথা সমাপ্ত করেও কথক ঠাকুর স্থান ত্যাগ করতে পারছিলেন না বৃষ্টির জন্য। জনৈকা বৃদ্ধা তখন এগিয়ে এসে কথক ঠাকুরকে অনুরোধ করলেন 'হাঁ বাবা, শ্রীরামচন্দ্রের বিয়েটা দিয়ে দাও না!' অনেক কণ্ঠস্বর বৃদ্ধাকে সমর্থন জানাল। কথক ঠাকুর ন্যাকড়ার পুটলীতে পুঁথিখানি বাঁধতে বাঁধতে বললেন—"তা মা, বিয়ে দিতে তো আমার আপত্তি নেই, কিন্তু বরযাত্রীরা এলে বসাই কোথা?" এই বলেই উঠে পড়লেন তিনি, বগলে পুঁথি, মাথায় বাঁশের বাটের তালি লাগানো ছাতা। যেতে যেতেও কাষ্ঠ পাদুকার ঠক ঠক শব্দ করে মুখ বাড়িয়ে বললেন—'কাল ধুমধাম করে বিয়েটা দিয়ে দেব, হাঁ কাল, কাল' বলতে বলতে চলে গেলেন তিনি। বৃদ্ধাদের কেউ কেউ কথক ঠাকুরের উদ্দেশ্যে, শ্রীরাম-চন্দ্র সীতাদেবীর উদ্দেশ্যে চোখ বুজে করজোড়ে নমস্কার জানালেন। কেউ কেউ কথক ঠাকুরের পাঠের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। কেউ কেউ বললেন, 'অমুক গাঁয়ের কথক ঠাকুরের গলার স্বরটি এই কথকের চেয়েও মিষ্টি। আহা-হা সে সুর তুলবার নয়।' এই ধরনের কথাবার্তা শেষ হতে না হতে বৃষ্টি ধরে যায়। শ্রোতারা যে যাঁর ঘরে ফিরে যান, সেদিনের মত আসর ভেঙে যায়।

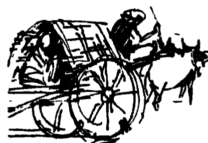
পরদিবস কথক ঠাকুর এসেই বললেন,—'আজ শ্রীরামচন্দ্রের বিয়ে হবে।' সকলেরই খুশী খুশী ভাব। কয়েকজন মিলে তো গানই সুরু করে দিলেন—'বরণ কুলা আনল সখি, বরণ কুলা আন। চল আমরা স্নানের ঘাটে যাই। আমরা

জল সইতে যাই। ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালাও সখি, ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালাও। ধানদূর্বা মঙ্গলদ্রব্য দিয়া বরণকুলা সাজাও। ও তোরা আয় গো আয়, আয় সকলে রামসীতাকে স্নান করাব সুশীতল জলে। জলে কস্তুরী মিশায়ে ঢেলে দে গো রামের শিরে। ধোপার ছেলে ডেকে আন, ছুতরের পিঁড়ি, কুমোরের ঘট আন। গঙ্গাজল ভরে আন সখি সকলে। ধান্য ঢালে রাজরাণী রামের বিদ্ধির বাড়া। এলা ঢেঁকি বেলার মৈনি অরুল বাঁশের কুলা। সুবর্ণের ঘরখানি মানিক্যের ঝরা। তাহার মধ্যে রান্ধেন রাণী রামের বিদ্ধির বাড়া। রামের শিরেতে ঢালে ঘটের জল গো। সে বলে দিয়া আম্রপল্লব রাজরাণী ধান্য ঢালে গো। জয় জয় মঙ্গলের ধ্বনি, ওগো জয় জয় মঙ্গলের ধ্বনি। এস এস রে বাছা নীলমণি। ক্ষুধায় উনেছে বাছা, রৌদ্রে ঘেমেছে বাছা। নীলচন্দ্র বদন ওগো রামের মা, কোথায় গেল গো রামের দাসী, গামছা আনগো বদন মুছি। ঘর থেকে জিগায় মায়ে—কি কি শোভা শোভে গো আমার রামের গায়ে? হস্তে শোভে গো হস্তজ্যোতি, গলে শোভে গজমতি। অঞ্চলে বাঁধিয়া কড়ি কহি যান। যান গো রামের মা বাণিয়া বাড়ী। হ্যাদেরে বাণিয়ার ছেলে, কত লইবারে তোমার সিঁদুরের তোলা? আমার সিঁদুরের মূল্য সোনার পঞ্চ কড়া গো রামের মা। অঞ্চলে বাঁধিয়া কড়ি যান গো রামের মা জেলেবাড়ী। হ্যাদেরে জালিয়ার ছেলে, কত লইবারে তোমার মাছের মূল্য? আমার মাছের গোটা, পঞ্চকড়া গো রামের মা। অঞ্চলে বাঁধিয়া কড়ি, রামের মা যান বারুই বাড়ী। হ্যাদেরে পানুয়ার ছেলে, কত লইবারে তোমার পানের বিড়া? আমার পানের বিড়া, সোনার পঞ্চ কড়া গো রামের মা। জয় জয় মঙ্গলময়। যিনি মঙ্গল আধার। অমঙ্গল দূরে যায় লইলে নাম তাঁহার। উলু-উলু-উলু!' গান শেষ না হওয়া পর্যন্ত কথক ঠাকুর চোখ বুজে মেরুদণ্ড সোজা করে বসে থাকেন। তারপরেই খক্ খক্ করে দুটো কাশির শব্দে গলা ঝেড়ে নেন, বা গলা সেধে নেন।

শ্রীরামচন্দ্রের বিয়ের ব্যাপারে সকলেই উদগ্রীব। কথক ঠাকুরের সভায় গাঁয়ের আবালবৃদ্ধবনিতা সব এসে সমবেত হয়েছে। কথক ঠাকুর বলতে সুরু করেছেন—শ্রীরামচন্দ্র বিবাহ বাসরে উপস্থিত। রাজ্যের ভিড় বিবাহমণ্ডপে। তখন পাছে কেহ রাম-সীতার অনিষ্টসাধন করে তাকে তাড়িয়ে দেবার জন্য কন্যাপক্ষের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে পরিবারের নাপিত উচ্চ গলায় কটূক্তিপূর্ণ ছড়া আবৃত্তি করে—'শুন সবে এবে আমি করি নিবেদন। ছাদনাতলায় এসেছেন বর মহামহিম শ্রীরাম। মন্দলোক থাক যদি যাও সরে যাও। ছাউনি নাড়ার সময় হল এয়োরা দাঁড়াও। খুঁটিখাটা ছেড়ে দাও, ভাতার পুতের মাথা খাও।

যে ধরবে চালের বাতা, সে খাবে ভাতারের মাথা। যে জন করবেক কু তার বাপের মুখে গু।' এই গৌড়বচনের পর হয় শুভদৃষ্টি বিনিময়। একে একে কথক ঠাকুর শ্রীরামচন্দ্রের বিয়ের নানা কাহিণী বর্ণনা করে যাচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে হিন্দু বিবাহের নানা আচার-আচরণ সম্পর্কেও অবহিত করাচ্ছিলেন শ্রোতৃবৃন্দকে। কথক ঠাকুর নানা কথা বলে যাচ্ছিলেন। তাঁর সব কথা আমরা শুনতে পারি নি। কারণ আমরা গ্রাম পরিভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলাম। এই গ্রাম সম্পর্কে ইতিমধ্যেই হয়তো আমরা অনেক কথা বলে ফেলেছি। কিন্তু গ্রামের সীমা নির্ধারণ বা সংজ্ঞা নিরূপণ করে এখনও আমরা কোন কথা বলিনি। সাধারণতঃ জরিপের একক মৌজাকে গ্রাম বলে ধরা হয়। গ্রামের সীমা সর্বত্র সুনির্দিষ্ট থাকে না। জরিপের মৌজার আয়তন সাধারণত একার্ধ থেকে দেড় বর্গমাইল হয়ে থাকে। কোন কোন মৌজা জনহীন। আমাদের সমীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট গ্রাম বিদিশার সীমানাও সুনির্দিষ্ট নয়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ গ্রামের রূপও পাল্টিয়েছে। জনহীন মাঠে চাষবাস করা হয়। বিদিশা একটি কৃষিপ্রধান গ্রাম। কিন্তু বর্ষার কয়মাস বাঙলার অন্যান্য গ্রামের পথঘাটের ন্যায়ই বিদিশার গ্রাম্যপথ অব্যবহার্য হয়ে পড়ে। আষাঢ় থেকে আশ্বিন-কার্তিক অবধি গরু-মোষের গাড়ী ব্যতীত বিদিশার পথে চলাই কঠিন। গাড়ীর চাকা কর্দমাক্ত পথে গভীর দাগ কেটে চলে। তাই বর্ষার অবসানে সমান্তরাল সরু সরু নালা এবং তাদের ফাঁকে ফাঁকে ভূমি শিরায় রাস্তা করোগেটেড হয়ে যায়। কঠিন ঢেউতোলা পথ, যে কোন যান এমন কি পায়ে হাঁটার পক্ষেও পীড়াদায়ক।

বাঙলা বিভক্ত হবার পরে ওপার বাঙলার বিভিন্ন জেলার বহুলোক এ গাঁয়ে এসে বসবাস আরম্ভ করেছেন। জনসংখ্যাবৃদ্ধিহেতু এ গাঁয়ের অনেক



বৃক্ষ, লতা গুল্ম ও ঘাস বিনষ্ট করতে হয়েছে। বনের সঙ্গে সঙ্গে বনের পশু-পক্ষীও লোপ পেয়েছে। তবু সমভূমিতে বট, অশ্বত্থ, দেবদারু, তেঁতুল, বেল, আম, জাম, পেয়ারা, খেজুর, তাল, নারকেল, সুপারী, বাঁশ, কলা, আমলকী, হরিতকী, জলপাই, মটমটি বা শিয়ালমুত্রি প্রভৃতি ছোট বড় নানা গাছ এ গাঁয়ে অদৃশ্য নয় এখনও। কিছু কিছু ঔষধের গাছগাছড়াও এ গাঁয়ে পাওয়া যায়।

গরু, মহিষ, বিড়াল, হাঁস, পায়রা, রাজহাঁস, বনবিড়াল, শুকর, ঘড়িয়াল, শিয়াল, বানর, কুকুর, বেজী, কাঠবেড়ালী প্রভৃতি বিদিশার নিত্যসঙ্গী। বিড়াল, ইঁদুর, চামচিকা, বাদুর, প্যাঁচা, কোকিল, বাবুই, কাক, চিল, শকুন, বক, খড়গোস, বাজ, শালিক, টুনটুনি, ঘুঘু, চড়াই, টিয়া, কাঠ-ঠোকরা, মাছরাঙ্গা, বউকথাকও, ফড়িং, চাতক, ডাহুক, বিলহাঁস, প্রজাপতি, পাতিহাঁস, পানকৌড়ি বুদ্ধভূতুম, প্রভৃতি পশু ও পক্ষী বিদিশার সর্বত্র। তাছাড়া আছে নানাবিধ সাপ—ময়াল, ঢোঁড়া, গো-সাপ, চন্দ্রবোড়া প্রভৃতি। আছে অসংখ্য জোঁক, ঝিঁঝি পোকা, জোনাকি, ডাসা, আইডলি পোকা, প্রভৃতি। আছে মিঠাজলের মাছ, নদীর মাছও এখানে পাওয়া যায়। মাছের চাষও হয়। মাগুর, সিঙি, কই, শোল, গজাল, চ্যাঙ, খলিসা, পুটি, কই, আমেরিকান কই, ফলি, রুই, মৃগেল, কাতল, কালোবাওস, চিংড়ি, ভেটকি, ভেদি প্রভৃতি মাছও পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। সারা গাঁয়ের বিভিন্ন স্থানে আবার ভূতের বাসাও আছে।

পরিবর্তনশীল ঋতুচক্রে অন্যদের মতই এ গাঁয়ের মানুষেরও দিন বদলায়। লাঙলের গরুগুলোকে হট হট করে চালিয়ে নিতে নিতে গান গায় কৃষক মোষকে বা-হাব্বা-বা-হাব্বা বলে চালাতে গিয়ে গান গায়। ধানের চারা তোলা আর রোপনের ফাঁকে ফাঁকেও শোনা যায় গান। শোনা যায় কাজে-অকাজে বুনো মেয়েদের গান, সন্ধ্যায় ওদের মাদলের মায়াবী আওয়াজে দেহে তোলে গুঞ্জরণ, কণ্ঠে আসে সুর। হাঁড়িয়ার নেশায় মশগুল ঢাকুরিয়ার বুনোপাড়া। অপরদিকে মোড়লপাড়ার এক কোণে মাদুর পেতে বসে আছে মোড়ল আর গ্রাম পঞ্চায়েতের কিছু সদস্য। চাষবাস ও মহাজনদের নিয়ে গল্পে মশগুল।

পঞ্চায়েত প্রধানের ছেলে তালপাতার তাড়া, পাখের কলম, দোয়াত শ্লেট ও পেন্সিল নিয়ে বসে নামতা পড়ে। পড়তে পড়তে ঘুমের ঘোরে ঝিমোয়। মোড়লের তাড়া খেয়ে হস্তলিপি লিখতে আরম্ভ করে, লিখতে লিখতে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে সে। ওদের গল্প ভেঙে গেলে মোড়ল-গিন্নী নিদ্রিত ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে যায় খাবার খাওয়াতে। ছেলেকে খাইয়ে সংসারের সকলকে খাইয়ে মোড়ল-গিন্নীর বিছানায় যেতে রাত বারোটা বেজে যায়। আবার সাতসকালে কাকের কা-ডাকার আগেই উঠতে হয় তাকে। সংসারের যাবতীয় কাজ তাকে একলাকেই সামলাতে হয়। অত সকালে উঠে এবং অত দেরীতে বিছানায় যাওয়ার পরেও অনেকদিন তার মনে হয় দিনগুলোকে আরও একটু বড় করা গেলে ভাল হত, সব কাজ সুষ্ঠুভাবে করা যেত। কয়েকদিন ধরে দিনে-রাতে এ গাঁয়ের নানাস্থান ঘুরে

ঘুরে আমরা ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লাম, অনেকের অনেক সুখদুঃখ ব্যথা। যন্ত্রণা দেখে আমরাও যন্ত্রণা কাতর হয়ে পড়লাম। তাঁবুতে ফিরে এসেও আমাদের যন্ত্রণার শেষ হয় না। ভীমরুলের চাকে ঢিল ছোঁড়াতে আমাদের নতুন দুর্ভোগ। গাঁয়ের পথ দিয়ে হেঁটে চলেছি। পথের পাশে গাছে সারি সারি আতা, পেয়ারা ঝুলছে। দেখে লোভ হল। পেরে নেবার ইচ্ছা জানালাম। গাঁয়ের লোকেদেরও আপত্তি ছিল না। পেয়ারা পাড়ার জন্য গাছে উঠেও বুঝতে পারি নি ওদের অস্তিত্ব। খুব বড়, রসে টয়টম্বুর একটা পেয়ারা উঁচু ডালে ঝুলছিল। সেটা পাড়ার জন্য হাত বাড়িয়েছি অমনি কিসে যেন দংশনাহত হলাম। কিছু বুঝতে পারার পূর্বেই আমার হাতের চাপে ভীমরুলের বাসাটি গেল ভেঙে। হাজারে হাজারে সৈন্য হুল নিয়ে আমাকে আক্রমণ করল। সঙ্গীরা সকলে চীৎকার করে বললেন, পালান, পালান। পালাতে পেরেছি কিনা জানি না, অনেকক্ষণ পরে লক্ষ্য করলাম আমার সর্বাঙ্গে মধু, গোবর ও চূণের প্রলেপ। তাঁবুতে ফিরে এসে ওগুলো সব ধুইয়ে ফেলতে চাইলাম। সঙ্গীরা ধুতে নিষেধ করলেন। তখনও যন্ত্রণায় ও বিষে জর্জর আমার সর্বশরীর। লোভের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে ভীমরুল ও বল্লার আক্রমণ সহ্য করতে হল।

পরদিন প্রায় দুপুর অবধি তাঁবুতেই কাটালাম। যেদিকে গিয়ে ভীমরুলাহত হয়েছিলাম গাঁয়ের সেদিকে আর না গিয়ে অন্যত্র সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টায় আছি, এমন সময় দেখতে পেলাম খড়ের গাদায় আগুন নিভাবার জন্য কেউ বালতি, কেউ ঘটি, আর কেউ লাঠি নিয়ে ছুটছে। কেউ জল ঢালছে, কেউ লাঠির বাড়ি দিয়ে জ্বলন্ত খড় মাটিতে ফেলে দিচ্ছে যাতে আগুন আরও বেশী তীব্র হয়ে উঠতে না পারে। আগুন নিভে গেলে দেখা গেল প্রায় সব খড়ই পুড়ে গেছে। মালিক জানালেন যে প্রায় বিশ ছালি খড় নষ্ট হয়েছে তাঁর। বিশ ছালি মানে প্রায় তিনশ কুড়ি মন বা হাজারের উপর টাকা। আগুন নিভে যাবার পর একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছিলাম। তা সদ্য প্রসূত মেয়েদের স্তনামৃত সংগ্রহ। আগুন নিভাতে গিয়ে যারা দগ্ধ হয়েছেন তাঁদের দগ্ধস্থানে দেওয়া হচ্ছে স্তনামৃতের প্রলেপ। বিন্দুমাত্র লজ্জা না পেয়ে গ্রাম্য মেয়েরা অবলীলাক্রমে সামাজিক দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন উন্মোচিত বক্ষ টিপে অমৃত বের করতে। মাতৃজাতির কর্তব্য সম্পাদন করতে।

এ গাঁয়ের একদিকে শ্রীধরপুর, কোড়াবাড়ী, গাঙনাপুর, অপরদিকে ঢাকুরিয়া, কুটিপাড়া, শঙ্করপুর, দেবগ্রাম, আন্দুলপোতা, নোকাড়ী প্রভৃতি। সর্বত্রই আছে ওপার বাঙলাদেশের নানা জেলার লোকেদের ভীড়। পাশের

গ্রাম শ্রীধরপুরের ব্রাহ্মণেরা বিদিশার পুরোহিত। ডাক্তারবাবুদের একঘর বৈদ্য ছাড়া কায়স্থ, মোদক, বর্ণক্ষত্রিয়, মালী ও নমঃশূদ্রদের নিয়ে চারটি পাড়ায় বিভক্ত বিদিশা। এই পাড়া চারটি হচ্ছে যথাক্রমে, বনেদিপাড়া, বোসপাড়া, কুড়িপাড়া ও নমঃপাড়া।

এ চত্বরের সব মুসলমান কুটিপাড়ায় আশ্রয় নিয়েছে। এদের মধ্যে প্রায় সকলেই ওপার বাঙলায় চলে গিয়েছিল, আবার অনেকেই ফিরে এসেছে। ওরা সকলেই প্রচণ্ডভাবে পাকিস্তানের ভক্ত, পাকিস্তানবাসীদের অপেক্ষাও বেশী ভক্ত, তবুও ,কেউই পাকিস্তানবাসী হতে রাজী নয়। তাই সেখানে গিয়েও অনেকে ফিরে এসেছে। ফিরে এসে অনেকেই স্ব স্ব গাঁয়ে স্থান পান নি আর। তাই এখন চারধারের সব মুসলমান কুটিপাড়ায় গিয়ে জড়ো হয়েছে। গ্রাম থেকে বিতাড়িত হলেও, বা অদ্ভুত পাকিস্তান প্রেমী হলেও, এ চত্বরের স্থানীয় মুসলমানদের সঙ্গে চলে আসা হিন্দুদের অসদ্ভাব নেই। মিলেমিশেই আছে সকলে।

উৎসব অনুষ্ঠানও হয় নানাধরণের এ গাঁয়ে। কয়েক বছর আগে খুব ধূমধাম করে দোল উৎসব হয়েছিল। হয়েছিল কাদাখেলা। কাদাখেলায় হয় প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সরাসরি যোগাযোগ। সোনার অঙ্গ ধূলোয় মিশিয়ে দেবার আকুতি আছে কাদা খেলার মধ্যে। অষ্টপ্রহর অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন এ গাঁয়ের একটি বিশেষত্ব। তাছাড়া সার্বজনীন দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজারও অনুষ্ঠান হয়।

সার্বজনীন পূজোয় নমঃশূদ্রেরা অংশ নিলেও তাদের কাছ থেকে চাঁদা নেওয়া হয় না। চাঁদা না নেওয়ার দরুণ চাঁদা দেওয়া লোকেদের মত অধিকার পায় না এ পূজোয় গাঁয়ের নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের লোকেরা। দুর্গাপূজার সময় একটি মেলাও বসে এখানে বিগত ছ' সাত বছর থেকে।

এ গাঁয়ের বিশিষ্ট ধনী বুড়োকর্তা বা বোসকর্তা। কণ্ট্রাকটরী করে, সুদে টাকা খাটিয়ে ও জমিজমা বাড়িয়ে অনেক টাকা রেখে গেছেন। বনেদী কৃপণ ছিলেন তিনি। মিত্তির মশায়েরও অনেক টাকা এবং অনেক সন্তানাদি। তিনি বিপত্নীক। ছেলেমেয়েরা তাঁর কাছে থাকে না। তাঁর সেবাযত্ন করে সন্ধ্যার মা। সন্ধ্যার মা বলে—'তা বাপু যে খেতে পড়তে দেয়, তার ইচ্ছা অনিচ্ছাকেও একটু দাম দিতে হয়।' মিত্তির মশায় ওষুধ খেয়ে বেঁচে আছেন। সন্ধ্যার মা ছাড়া ওষুধ ঢেলে দিবার লোক নেই তার। এটা ঘটনা। মিত্তির মশায় কারুকে পরোয়া করে না। সে তাঁর কাজ করে যান। গাঁয়ের লোকেরা, এমন কি তিনি তাঁর নিজের ছেলেমেয়েরা অবধি মিত্তির মশায়ের প্রতিসন্ধ্যার মায়ের

আদরযত্নকে ভাল চোখে দেখে না। সন্ধ্যার মা গতর খাটায়, খায়। গাঁয়ের লোকেরা কেন যে তা নিয়ে ঘুস্ ঘুস্ করে তা সে বোঝে না। তবুও মাঝে মাঝে সন্ধ্যার মা মিস্তির মশায়ের কাজ ছেড়ে দেয়। তখন মিস্তির মশায় সন্ধ্যার মায়ের বাড়ী গিয়ে তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে নিয়ে আসে। এরূপ রাগ-অনুরাগ মাঝে মাঝেই হয়। তা নিয়েও গাঁয়ের লোকেদের হাসিঠাট্টা চলে। কিন্তু সন্ধ্যার মা বোঝে না কেন ওরা এরূপ করে। সে পরিষ্কার বলে—'যেখানে থাকতে হয় সেখানে সব কাজই করতে হয়, কোন কাজ করতে বললে তো আর না করা যায় না।' অবাধ্য হবার শিক্ষা সে পায় নি। এই কথা সে তার মেয়ে সন্ধ্যাকেও বলেছে। তবু সন্ধ্যা তার মায়ের আচরণে খুশী নয়। মিস্তির মশায়ের সঙ্গে দেখা করে ফিরছি এমন সময় পথে সত্য পাঠকের সঙ্গে দেখা। বিদিশা থেকে শ্রীধরপুর যাচ্ছিলেন তিনি। একজন বললেন—এই যে সত্য পাঠক, ইনি তিন গাঁয়ের পুরোহিত। ভারী কৃপণ। এই লোকটি গাঁয়ের সন্তোষ মণ্ডলকে পাঁচ টাকা ঋণ দিয়েছিলেন। টাকা আদায় করতে না পেরে তিনি বাছুরের মত গরুর বাট থেকে চুষে এক দিন প্রায় আধ সের দুধ খেয়ে গেছেন। এ কাজ সম্ভব নয়, এবং বিশ্বাসযোগ্যও নয়। তবুও এই বক্তব্যের সমর্থনে অনেক ব্যক্তি এগিয়ে এলেন। এগিয়ে এলেন জনৈক ব্যক্তির চরিত্র বর্ণনায়। তিনি ত্রাস্ত হয়ে ছুটে যাচ্ছিলেন ঐ সময় আমাদের সম্মুখ দিয়ে। হৃষ্টপুষ্ট সুঠাম দেহী ভদ্রলোকটি নাকি চিকিৎসক ছিলেন। দীর্ঘদিন পূর্বে বিবাহ করেছেন, তার তিনটি মেয়ে ও দুটি ছেলেও আছে, মেয়েরাই বড়। নিজেদের চেষ্টায় নিজেরা যতটা পড়েছে লেখাপড়া করেছে মেয়েরা, দেখতে শুনতেও মন্দ নয়, তবু সেই ভদ্রলোক প্রায় বিশ বৎসর বিবাহিত জীবন কাটাবার পর গাঁয়ের কার এক বউকে নিয়ে ভেগে গিয়েছেন। তা নিয়ে প্রচণ্ড হৈ চৈ। আসলে নাকি দীর্ঘদিন ওই বউটির সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল, এ কাজে ক্রুদ্ধ হয়ে বৃদ্ধ পিতা ছেলেকে ত্যাজ্য করেছেন, ছেলেও এ গ্রামে আসতে পারে না। আজ হঠাৎ এসেছিলেন, সকলে যখন তাড়া করছিল। সেই সময়ই তার দেখা পেলাম পথে।

আরও কিছুদূর এগিয়ে যেতে মেজবাবু, নিতাই বোস, তারক অধিকারী প্রভৃতির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। গাঁয়ের স্কুলের দুরবস্থা দূরীকরণে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আহূত এই সভায় একে অপরকে দায়ী করছেন। গাঁয়ের যে কোন বিবাদ, মনোমালিন্যের ব্যাপারে সালিশী করেন মেজবাবু। তিনি সকলকে শান্ত করতে চেষ্টা করছিলেন। গ্রাম্য সালিশীর নমুনা দেখে এগুতেই

দেখতে পেলাম চারুশীলা বৈষ্ণবীকে। দারুণ ঠমক তার। গ্রামের কোন এক দোকানদার, মহেশ না কি নাম, নাকি তাকে ঘোর দুপুরে একা পেয়ে রাস্তার উপরই কি করতে চেয়েছিল। তা নিয়ে প্রচণ্ড হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল গ্রামে।

পথে আমরা নানাবিধ পশু ও পক্ষীরও সাক্ষাৎ পাই। দেখি বাগানের গাছের উঁচু ডালটিতে দুটো কাক কা কা করছে। হঠাৎ ভেসে আসে শালিকের কিচির মিচির, চড়াইয়ের চড়চড়, হাঁড়িচাঁচার কেঁচর-মেচর, চিলের চি-হি-হি ডাক। মাটিতে মানুষ যেমন ব্যস্ত আকাশে তেমন ব্যস্ত পাখিরা। আমরা হেঁটে এগুচ্ছি এমন সময় হঠাৎ প্লুই-ই-ই শব্দ করে কে যেন উড়ে গেল। অদূরে দুই দল শালিক মুখোমুখি বসে একদল আর একদলকে কিচির মিচির ভাষায় গালা-গালি দিয়ে যাচ্ছিল। ওদের ভাষা আমরা জানি না তাই বুঝতে পারি নি কি কারণে ওদের এই ঝগড়া।

পাখিদের দেখে নৌকার কথা মনে পড়ে। নৌকা যেমন দাঁড়ের জোরে জল কেটে এগিয়ে যায় পাখিরাও তেমনি পাখার জোরে বাতাস কেটে শূন্যে উড়ে বেড়ায়। মাঝি যখন জোড়া জোড়া দাঁড়ে জল আটকিয়ে খিচ মারে তখনই নৌকা এগিয়ে যায়। এবং যখন নৌকা ঘুরাবার দরকার হয় তখন হালের মোচড় দিতে হয়। কেবল দাঁড়ে যেমন নৌকা চলে না, তেমন কেবল ডানা নাড়ালেই পাখি ইচ্ছামত এদিক-ওদিক যেতে পারে না। ওদের শরীরে হালের মত একটা কিছু জিনিষের দরকার হয়। পাখিদের পেছনের লেজ নৌকার হালের কাজ করে আকাশে।

পাখিদের ঠোঁট বড় কাজের জিনিষ। ঠোঁট দিয়েই তারা মাটি থেকে খাবার খুঁটে খায়। খাবার বয়ে আনে, এবং শত্রুর উৎপাত হলে ঠোঁট দিয়ে ঠুকরিয়ে তাদের তাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে। পাখিদের চোখ বড় সুন্দর।



গোলাকার। এই সুন্দর চোখে চিল, শকুনের মত অনেক পাখি দু' মাইল দূরের জিনিষও দেখতে পায়। মাঠে ছোট মরা ইঁদুর পড়ে থাকলে তাও দেখতে পায়।

ভাগাড়ে মরা গরুবাছুর ফেলে দিলে শকুনের মাথার টনক নড়ে দেখতে পেলাম। ওদের চোখের তেজ আমাদের চেয়ে বেশী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরা গরুর মাংস সংগ্রহ করার কাণ্ড দেখছিলাম। শকুনদের কাণ্ড। শকুনদের

চোখ দেখতে লাগলাম। আমাদের যেমন চোখের উপরে ও নীচে দু'টি পাতা আছে, ওদের সে দুটি ছাড়া আরও একটা বেশী পাতা আছে। তৃতীয় পাতা চোখের ভিতরকার কোণেঅবস্থিত। এজন্যই আমাদের পোষা টিয়াপাখি দিনের বেলায় যখন ঘুমোয় তখন তার চোখ খোলা থাকে। আসলে ঐ সময় সে তৃতীয় পাতাখানি দিয়ে চোখ বুজে ঘুমায়। এই তথ্যটা যেন হঠাৎ আবিষ্কার করলাম বিদিশার মাঠে দাঁড়িয়ে শকুনদের কাণ্ডকারখানা দেখতে দেখতে। ভারী খুশী হলাম শকুনদের প্রতি। ভাগাড়ে মরা জন্তুজানোয়ার দেখতে না পেলে ওরা মাটিতে নামে না। সকাল থেকে সন্ধ্যা আকাশে উড়ে বেড়ায়। কাক, চিল, বাবুই, মাছরাঙ্গা পাখিদের মত শকুনেরা চুপ করে বসে থাকতে পারে না। শকুন, ফিঙে ও বুলবুলের মত অলস নয়। ফিঙে ও বুলবুল অলস লোকেদের মত বাঁশঝাড়ের উঁচুস্থানে বা শুকনো বাঁশের ডগায় অথবা গাছের শুকনো ডালে ভালমানুষটির মত বসে থাকে এবং মাঝেমাঝে ঘাড় বাঁকিয়ে সামনে পিছনে আশেপাশে তাকায় কোন পোকা মাকড়ের আশায়। দেখতে পেলেই তাদের প্রতি ছোটে।

কর্মঠ শকুনেরা উড়ে-যাবার পরেও কিছুক্ষণ আমরা মাঠের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। তারপর যখন হঠাৎ এগুবার জন্য পা বাড়িয়েছি অমনি গাছের সেই কাক দুটো আমাদের প্রায় পায়ের কাছে উড়ে এসে বসল। ভারী মজার পাখি এই কাক। মাছ, মাংস, ফল, মূল, ভাত, তরকারী, গুয়োপোকা যা পায় তা-ই খায়। বক, শালিক, চড়াই, দোয়েল, কুকো, ঘুঘু, পায়রা, শকুন, হাঁস, মুরগী প্রভৃতির মত কাক মাটির উপরে ঘুরে ঘুরে খাবার জোগাড় করে। কাক চিলেদের মত নয়। চিল মাটিতে বেড়িয়ে খাবার জোগাড় করে না। গাছের ডালে বা বাড়ীর ছাদের খুব উঁচু জায়গায় চুপ করে বসে থাকে সে। মাটির উপরে বা অসতর্ক অবস্থায় কেউ কোন খাবার নিয়ে যাচ্ছে দেখতে পেলে ছোঁ মেরে সে খাবার নিয়ে পালিয়ে যায় গাছের মাথায়। সেখানে বসেই খাবার খায়। খাবার হয়ে গেলে আবার ছোঁ মারার জন্য তৈরী হয়।

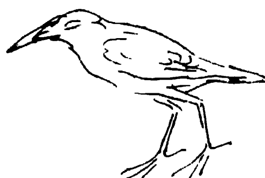
পাখিদের রাজ্যে চোর ও ডাকাত যথাক্রমে কাক ও চিল। বেচারি মাছরাঙ্গা অতি কষ্টে একটা মাছ ধরে নিয়ে যাচ্ছিল অমনি একটি কাক ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সে মাছটা নিয়ে গেল। একটি ছোট্ট ছেলে পাত্রের উপরে ঠিকমত ঢাকনা না দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল কাটা মাংস। ছোঁ করে আর একটা চিল কোত্থেকে এসে সেই ছেলেটির হাতের বাটি থেকে কতক মাংস নিয়ে পালাল। কতক মাংস মাঠে ছড়িয়ে দিল। মুহূর্তমধ্যে চিলের বাজার বসে গেল।

ছেলেটি চীৎকার করে কান্না শুরু করে দিল। হয়ত কাকের ছোবলে মাছ হারিয়ে মাছরাঙা ও কেঁদেছিল, লজ্জায় ও দুঃখে কাতর হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তার কান্নার ভাষা আমাদের অজ্ঞাত থাকাতে তার দুঃখ বুঝতে পারি নি।

কাক শুধু চোরই নয় ভারী দুষ্টুও বটে। মাছরাঙ্গা পাখিটাকে ঐভাবে নাজেহাল করতে দেখে কাকেদের দুষ্টুমীর একটা কাহিনী মনে পড়ে গেল। কোন একটা বইয়ে পড়েছিলাম যে একটা দুষ্টু কাক মানুষের চশমা পরা দেখে নিজেও চশমা পরতে চাইল। ফলে এক চশমাওয়ালার দোকান থেকে একটি সোনার ফ্রেম চুরি করে নিয়ে পালায়। সেই দিন থেকে রোজই চশমা ওয়ালার দোকানের ফ্রেম চুরি যেতে লাগল। দোকানদার পুলিশে খবর দিল। পুলিশ চাকর, দারোয়ানদের ধমক দিল, কিন্তু কিছুতেই চোর ধরা গেল না। অবশেষে একদিন কাকের চোখে চশমা দেখে চোরের হদিশ পাওয়া গেল। ঝাউগাছের মাথায় কাকের বাসা থেকে সব চশমার ফ্রেম পাওয়া গেল।

কাকেদের দুষ্টুমির কথা ভাবতে ভাবতে চলেছি হঠাৎ একটা শালিককে বাসা বাঁধতে দেখতে পেলাম। খড়কুটো, সাপের খোলস, ময়লা নেকড়া-কানি দিয়ে শালিক বাসা তৈরী করছে গাছের ফোকরে। শালিক চমৎকার চটপটে মিস্ত্রী। এই ঘর তৈরী করতে দেখে আমাদের গাং-শালিকের বাসা তৈরীর কথাও মনে পড়ে গেল। নৌকা পথে যেতে যেতে নদীর উঁচু পাড়ে গাংশালিকের বাসা দেখতাম। সে বাসা লতাপাতা বা খড়কুটো দিয়ে তৈরী নয়—নদীর ভাঙনের গায়ে যে সব গর্ত থাকে সেখানেই ওরা বাসা বাঁধে। ইঁদুরের গর্তেও গাং-শালিক বাসা বাঁধে বলে শুনেছি।

শালিকের বাসা বাঁধতে দেখে কোকিলের কথা বলা প্রয়োজন। কোকিল



বাসা বাঁধে না। চৈত্র-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে কত পাখি কত রকমের বাসা বাঁধে। কিন্তু কোকিল কখনই বাসা বাঁধে না। ওরা গাছে বসে কুহু কুহু রবে দিন কাটায়। খিদে পেলে পোকামাকড়, পাকা বটের ফল খেয়েজীবন বাঁচায় বাসা নেই বলেই স্ত্রী কোকিল কাকের বাসায় গিয়ে লুকিয়ে ডিম পেড়ে আসে। কাকেরা নিজেদের ডিম মনে করে সে ডিমকে রক্ষা করে। বাচ্চা

বের হলে যত্ন করে বড় করে। এবং পরে যখন সেই বাচ্চাদের কোকিল বলে চিনতে পারে তখন তাদের তাড়িয়ে দেয়।

এই ভাবেই কোকিল বাসা না বেঁধে গাছের ডালে বসে গান গেয়ে দিন কাটায়। আমরা একটা চকচকে কালো কোকিল দেখতে পেলাম। তার কুহু কুহু রব শুনতে পেলাম। এই সময় তিলে বা স্ত্রী কোকিলকে দেখতে আমাদের বড় সখ হল। অনেক খোঁজ করার পর তাকে দেখতে পেলাম। দেখলাম পুরুষ কোকিলটি যে গাছে বসে গান গাইছে সেই গাছেরই পাতার আড়ালে স্ত্রী কোকিল লুকিয়ে গান শুনছে। স্ত্রী কোকিলের কণ্ঠে সুর থাকে না।

বর্ষা থেকে শীত অবধি কোকিলের কুহু শব্দ শোনা যায় না। কারণ, বর্ষায় তাদের গলা খারাপ হয়ে যায়। তখন টানা সুরে কুহু কুহু ডাকতে পারে না। কোকিলের কুহু কুহু শুনতে শুনতে আমরা এগুচ্ছি এমন সময় বিলের ধারে, ঝোপে একজোড়া ডাহুক আমাদের দৃষ্টিতে এল। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ডাহুক খুব চীৎকার করে। জলের পোকামাকড়ই তাদের খাদ্য। জলের ধারের বাঁশঝোপে ডাহুকদের বাসাও দেখতে পেলাম। ডাহুকের বাসায় গেলাম ডিম দেখতে। কালচে ধরণের ডিমের উপরে খয়েরি ও লাল রঙের ছিট। শিশুরা এ ডিম নিয়ে খেলতে বড় ভালবাসে।

ডাহুকের ডিম দেখে এগিয়ে চলেছি পথে দেখি পত্রহীন আমড়া, শিউলী প্রভৃতি গাছ দাঁড়িয়ে আছে। জানি বসন্তের হাওয়া বইতে আরম্ভ করার সঙ্গেই এইসব পত্রহীন গাছের গাঁটে গাঁটে ফুল ও পাতার অঙ্কুর বের হবে। বর্ষার জল ও হেমন্তের শিশির পেয়ে যখন এই গাছগুলো



পরিপুষ্ট হয় তখন ভবিষ্যতের ফুল ফল এবং পাতার জন্য খাদ্য জমা করে রাখে তারা। বসন্তের আমড়া, শিমুল, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি গাছ চার পাঁচদিনের মধ্যে মুকুলে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে। আমরা পাতার গন্ধ শোকার জন্য লেবু, বেল, জাম, তুলসী, কদবেল প্রভৃতি গাছের পাতা হাতে রগড়িয়ে নাকের কাছে নিয়ে ঘ্রাণ নিলাম। এখনও নাকে সেই ঘ্রাণ লেগে আছে। পাতার

রসের ঘ্রাণ নিতে নিতেই বেলা পড়ে এল। দেখতে পেলাম রাত্রের দৈত্য অন্ধকার বিকট রূপ নিয়ে ধীরে ধীরে নেমে আসার চেষ্টা করছে।

কর্মব্যস্ত হয়ে উঠেছে সকলে। খেয়াঘাটের পাটনীর জন্য চীৎকার করে চলেছে যাত্রী শীঘ্র নদী পার করতে। ধানভানা বন্ধ করে সান্ধ্য কৃত্যাদির জন্য ছুটেছে রমণী। রাখাল গরুর পাল নিয়ে ফিরে এসেছে। পাখিরা কল কল রবে যে যার বাসায় ফিরে চলেছে। বাদাম গাছের তলায় বাদুর-খাওয়া বাদামের জন্য প্রতীক্ষা করছিল যে ছেলেমেয়েরা তারাও ফিরে এল। ফিরে এল ছেলের দল খেলা বন্ধ করে, মেয়েরা ইতিমধ্যেই সান্ধ্য প্রসাধন করে, চুল বেঁধে সংসারের কাজে, লেখাপড়ার কাজে লেগে গেছে। এখন চুল যে না বাঁধলেই নয়। কারণ সন্ধ্যের পরে এলোচুলে থাকলেই সেই শাকচুন্নীর ভয় আছে। গামছা কাঁধে পুকুরঘাটে কিশোর কিশোরীর ভীড়। মাঠের ধুলোবালি ধুয়ে ফেলতে, হাত-পা ধুয়ে পাঠে বসার জন্য তৈরি হচ্ছে তারা।

যেসব ছেলেমেয়েরা নিজেরা হাত পা ধুতে পাছে না তারা মা অথবা দিদিদের সঙ্গে নিয়ে এসেছে ঘাটে। ঘাটে বসে দুষ্টুমি করার জন্য ছোটরা চাঁটি খাচ্ছে গালে, পিঠে। গৃহলক্ষ্মী প্রদীপ হাতে ছুটে চলেছেন তুলসীতলে, ঠাকুর ঘরে। প্রদীপের আলো, নারকেলের ছোবড়া ও ধূপের ধোঁয়ার গন্ধে সারা বাড়ী ম' ম' করছে। মেঝে পাটি বা মাদুর বিছিয়ে ছেলেমেয়েরা পড়তে বসে গেল। রান্নাঘরে রাত্রের খাবার তৈরী করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন গৃহিণী। ঠাকুরমা থলে হাতে মালা জপ করতে করতে ছোটদের সামলাচ্ছেন। তাদের কাছে পুরানো গল্প বলছেন। আদর করছেন।

পুকুরঘাট থেকে, নদীঘাট থেকে গা ধুয়ে এসে কবরী রচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ছে যুবতী কন্যা ও বধূ। সন্ধ্যা দেবী হীরের হার পরে এসে সকলকে সচকিত করে দিলেন। জানিয়ে দিলেন সূর্যসেনা বাঙলার লোকসমাজ সূর্যের অস্তাচলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অসাড় ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়বে। আবার সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তারা হয়ে উঠবে কর্মচঞ্চল। মাঝে মাঝে চাঁদের আলো বাঙলার সূর্য-সেনাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে। তাই অনেক পূর্ণিমা রাত লোকসমাজের আনন্দ উদ্বেলের কারণ। সন্ধ্যায় শুয়ে থাকতে নেই ঘরে। শুলে নাকি লক্ষ্মীদেবী রুষ্ট হন। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী দোকানী নগদ ছাড়া ধারে কিছু বিক্রী করে না সন্ধ্যায়। বিক্রী করে না সুঁই রাত্রে। রাত্রে লোক-সমাজনাম নেয় না সাপের। যদি সাপের নাম নেওয়া দরকার হয় তবে সাপের বদলে বলতে হয় লতা। গাছের পাতা, ফুল বা ফলও ছিঁড়তে নেই সন্ধ্যায়

বা সন্ধ্যার পরে। গাছতলায়ও দাঁড়াতে নেই, দাঁড়ালে ভূতে ধরে। পরগাছা ছুঁতে নেই, ছুঁলেও ভূতে ধরে। বলাবাহুল্য, সব গাঁয়েই নানাবিধ গাছগাছড়ার সঙ্গে আছে সুপ্রচুর পরগাছা। এই পরগাছার চালচুলা নেই, নিজের শিকড় অন্য গাছে জড়িয়ে বেঁচে আছে। কোন কোন পরগাছা আবার আশ্রয়দাতার ডালের ভিতরে শিকড় চালিয়ে দিয়ে রস চুষে নিচ্ছে। এখানে আম গাছেই বেশী পরগাছা দেখতে পেলাম। এই পরগাছাকে কেউ মাঁদা, কেউ বাঁদরা বলে।

সন্ধ্যা হবার একটু আগে থেকেই লক্ষ্য করতে লাগলাম, অনেক গাছের বহু ফলক পাতা জোড় বেঁধে মরার মত হয়ে আসছে। তেঁতুল, লজ্জাবতী, আমলকী, শিরীষ গাছগুলো একে একে ঝিমিয়ে পড়ছে। অবশ্য, লজ্জাবতী লতা পাতা বুজিয়ে যেভাবে ঘুমায় শিরীষ গাছ ঘুমাবার সময় সেভাবে পাতা বুজোয় না। তেঁতুল গাছ যে ভাবে পাতা বুজোয় কৃষ্ণচূড়া সে ভাবে পাতা বুজোয় না। প্রত্যেকেরই পাতা বুজোবার বা ঘুমোবার রীতি ভিন্ন ভিন্ন।

স্মরণীয়, যে সবুজ রঙ গায়ে মেখে এক একটি গাছ সমস্ত জীবন একই স্থানে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দেয় তা শুধু মাত্র আমাদের চোখ জুড়াবার জন্য নয়। সবুজ রঙ দিয়ে গাছেদের খাবার প্রস্তুত হয় বলে গাছ কোষে কোষে সবুজপাতা সঞ্চয় করে রাখে। রঙিন ফল ও ফুলের গন্ধে প্রজাপতি ও মৌমাছির দলকে সে কাছে ডেকে আনে। শীত লাগলে আমরা যেমন হাত পা গুটিয়ে শরীরের তাপ রক্ষা করি গাছও তেমনি রাত্রে পাতা গুটিয়ে নিয়ে নিজ দেহ গরম রাখে। তাই আমরা যেমন দেহকে বিশ্রাম দেবার জন্য রাত্রে ঘুমোই, গাছ সেজন্য ঘুমোয় না। পাতা গরম রাখার জন্যই রাত্রে গাছ ঘুমোয়। অবশ্য সব গাছের আকৃতি একরকম নয়। ডাল পাতা গুঁড়ি প্রায় সব গাছেরই থাকে। ঝাউ প্রভৃতি গাছে গুঁড়ির গায়ের কুঁড়ির চেয়ে গুঁড়ির মাথার উপরকার কুঁড়িই বেশী জোড়াল। পাইন ও দেবদারু গাছেরও পাশের ডাল জোরালো নয়। কিন্তু আম জাম কাঁঠালের বাগানে গেলে দেখা যাবে যে এদের মাথায় কুঁড়িগুলো কয়েক বৎসর ধরে রক্ষা করে এবং পরে তা দুর্বল হয়ে এলে ঝরে পড়ে। এই গুঁড়ি থেকেই পরে ডালপালা গজায়। খুব সোজা গুঁড়ি বড় একটা দেখা যায় না এ সব গাছে। বটের ডাল প্রায়ই মাটির সঙ্গে সমান্তরালভাবে বের হয়। অদূরের বটগাছ দেখে মনে হয়েছিল কে যেন ডাল ও পাতা-গুলোকে কাঁচি দিয়ে ছেঁটে সুডৌল করে রেখেছে। অনেক কাঁটা গাছও আছে। যেমন লেবু, বেল, বৈঁচি, কুল, সিজ প্রভৃতি। ফণী মনসা বা

সিজ গাছের পাতা হয় না, পাতাগুলোই বিকৃত হয়ে কাঁটায় পরিণত হয়। লেবু, বেল, বৈঁচির কাঁটা ডালের রূপান্তর, এবং কুলের কাঁটা উপপত্রের বিকৃতি বলে বৃক্ষ বিশারদরা মনে করেন। গোলাপের কাঁটার উৎপত্তি ছালে। কাঁটা থাকে বলে অনেক গাছ শত্রুর হাত থেকে মুক্তি পায়। লতা গাছের আঁকড়ি একটা অদ্ভুত জিনিষ। লাউ, কুমড়ো, ঝিঙে, শশা প্রভৃতি গাছের ডাল থেকে যে আঁকড়ি বের হয় সেগুলো স্ক্রুপের পাকে কাছের জিনিষকে এমন শক্ত করে জড়িয়ে ধরে যে আঁকড়ি ছিঁড়ে গেলেও বাঁধন ছেঁড়ে না। গাছের জীবনের এ প্রাণচাঞ্চল্য দেখতে দেখতে আমরা হঠাৎ বৃক্ষ বিশারদ হয়ে উঠলাম জনৈক বর্ষীয়ান চাষীর সুন্দর বর্ণনায়। তাঁরই কৃপায় আমরা ফুল সম্পর্কেও অনেক তথ্য জানতে পারলাম।

লতা ও গাছের এ খেলা দেখার পর আমরা ফুলের বাগানে ঢুকলাম। নানা ফুল, নানা রঙ। জবা, পলাশ ও শিমুল ফুল লাল; টগর, চামেলি, যুঁই, মল্লিকা, মালতী, দ্রোণ ও গন্ধরাজ ফুল সাদা; অতসী, কুমড়ো, শশা, ঝিঙে এবং কলকে ফুলের রঙ হলদে। অপরাজিতা ফুল প্রায় নীল। আরও নানা ফুলের নানা রঙের মধ্যে নিজেদেরকে মিলিয়ে দিলাম। ফুল গাছের কোন একটি বিশেষ অংশ থেকে বের হয়। ডালের কুঁড়ি যেমন পাতার গোড়া থেকে বা পুরানো ডালের মাথা থেকে বের হয়, ফুলের কুঁড়িও সেভাবে বের হয়। যখন গাছের এই সব অংশে একটির বেশী ফুল বের হয় না তা একক ফুল—যেমন জবা, গোলাপ ইত্যাদি। কিন্তু তুলসী, হাতীশুঁড়া, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি ফুল একটা লম্বা দণ্ডের উপর মঞ্জরীর মত সাজান থাকে। এই মঞ্জরী নারকেল, ধান, গম ও যবের গাছেও দেখতে পাওয়া যায়। পদ্ম, ভুঁইচাঁপা প্রভৃতি গাছের মাথায় লম্বা পুষ্পদণ্ড থাকে। সরিষার মঞ্জরীকে এ গাঁয়ের লোক বলে ফুলঝাড়। বিয়ের সময়ে বাঁশের গায়ে কতগুলো রঙবেরঙের কাগজের ফুল আঠা দিয়ে যেরূপ ফুলছড়ি বানান হয় সেরূপ ফুলছড়ির আকারের মঞ্জরী দেখা যায় চিড়চিড়ে বা আপাং গাছের ফুলে এবং কলা গাছের মোচায়। অতসী, গম, জোয়ার, এবং ঘাসের মঞ্জরীও ফুলছড়ি।

স্মরণীয়, তাল, কচু প্রভৃতি গাছের মঞ্জরী অন্য রকম। এদের পুষ্পদণ্ড বেশ মোটা। মোচার খোলাও একরকম মঞ্জরী। নারকেল, সুপারী, খেজুর, তাল প্রভৃতি গাছের ফুলগুলোও মঞ্জরীর আকারে সাজান। ছুড়ছুড়ে, ভেরেণ্ডা প্রভৃতি গাছের মঞ্জরী অন্যরূপ। এ গাছে নীচের দিক থেকে ফুলের বোঁটা ক্রমে ছোট হতে হতে উপরে ওঠে। আম,

জাম, লিচু, ঘেঁটু ইত্যাদি ফুলেরও মঞ্জরী হয়। সূর্যমুখী, গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা, জিনিয়া প্রভৃতি ফুল একা একা ফুটলেও এরা পৃথক ফুল নয়। কুকুরশোঁকা, সোমরাজ, হিঞ্চে, ভৃঙ্গরাজ, চন্দ্রমল্লিকা, অতসী প্রভৃতি ফুলের ন্যায় এরা বহু পুষ্পক। পেয়ারার মাথায় যে গোলাকার বের তা কুণ্ড। দাড়িম ফলের মাথায়ও এই কুণ্ড বিদ্যমান। চালতার কুণ্ড দিয়ে আমরা অম্বল খাই। চালতার ফল থাকে ভিতরে। নারকেল, তাল, খেজুর, মটর, বেগুন, ধুতরা, লঙ্কা, টম্যাটো প্রভৃতি ফলে স্থায়ী কুণ্ড আছে। টেপারীর আবরণই টেপারীর কুণ্ড। সেগুন ও ঘেঁটু ফুলেও ঐ কুণ্ড আছে। আমকুসির ফল বা হিজলী বাদামে কুণ্ড নেই। ফুলের দণ্ড থেকেই সৃষ্টি হয়েছে পানিফলের শিঙ। কুণ্ডের রঙ সাধারণতঃ পাতার মত সবুজ, কিন্তু দাড়িম ফুলের কুণ্ড সিঁদুরের মত লাল। সোঁদাল, কৃষ্ণচূড়া ও চাঁপাফুলের কুণ্ডে সবুজ রঙ নেই। গোলাপ, জবা প্রভৃতি ফুলের কুণ্ড এলোমেলো।

ফুলছড়ির কথায় ব্যাঙের ছাতার কথা মনে হতে পারে। এ গাঁয়ে প্রচুর ব্যাঙের ছাতা দেখতে পেলাম, পচামাটিতে পচাগোবর ও পচাগাছপালার কাছে। এদেরকে অনেকে পাতালফোঁড় বলে থাকে। এরা আম, জাম, কাঁঠাল গাছের মত এক প্রকার গাছ। অনেকে এই গাছের তরকারী খায়। ব্যাঙের ছাতা মানুষের উপকারী। লতাপাতা, গোবর প্রভৃতি খারাপ জিনিষ পচতে থাকলে সেগুলোকে নষ্ট করে দিয়ে ব্যাঙের ছাতার আমদানী। গাছের তাজা ডালে বা পাতায় সময়ে সময়ে যে সব ব্যাঙের ছাতা জন্মে তা গাছের ভয়ানক ক্ষতি করে। কিন্তু মানুষের উপকারে আসে সে গাছ। এই ধরণের নানা প্রকার কথা শুনতে শুনতে আমরা এগিয়ে চলেছি। পথে দেখতে পেলাম খালি জায়গায় হাঁড়িহাঁড়ি খেজুর, আখ ও তালের রস পড়ে আছে। ভীষণ গন্ধ বের হচ্ছে। শুনলাম এই খেজুর, তাল ও আখের রস কয়েক ঘণ্টা বাতাসে ফেলে রাখলে তা গেঁজে উঠে তাড়ি হয়। এই তাড়ি গ্রামের লোকেদের পরম আদরের পানীয়। গুড়, পান্তাভাত এবং মহুয়ার রস দিয়েও তাড়ি, হাড়িয়া বা পচাই তৈরী করা হয়। তাড়ি বা হাড়িয়া গ্রামীণ মানুষদের, আদিবাসী, উপজাতি, খণ্ডজাতি লোকেদের জীবন ধারণে অপরিহার্য। এ গাঁয়ের পাশের ঢাকুরিয়ার বুনোরা পচাই, তাড়ি বা হাড়িয়ার অভাবে কোন কাজই করতে পারে না। প্রকৃতির পত্র-পুষ্পের বিচিত্র বিলাস-বিভংগী আর বাঁকা চাঁদের অলক পরশ শিল্পী করে তোলে অরণ্যের

সন্তানদের। এই শিল্পী মন নিয়ে তারা পালন করে গরু খোটান উৎসব। গান গায়—'খুকুড়া মা ডাকি গেল ভাগল বিহান গো। শ্রীগাই তো ঠুকেরে কাঠাড়। উঠরে আহীরা জাগরে আহীরা শ্রীগাইকে খুলত ময়দানে। নাই হামে উঠব নাই, হামে জাগবো গো। কার্তিক মাসে শিশিরে গো কাঁপে অঙ্গ মোর হইবে মিলন। গায়ে যে দিব অহীরা দহরী চাদর গো। পায়ে যে দিব অহীরা রেশমের জুতা গো। মাথায় যে দিব অহীরা ঝিলিমিলি টুপি গো। হাতে যে দিব অহীরা টইনীর বাঁশি গো। নাই যে লিব বাবা রেশমের জুতা গো। নাই যে লিব বাবা ঝিলিমিলি টুপী গো। নাই যে লিব বাবা টইনীর বাঁশি গো। কার্তিক মাসে শিশিরে গো কাঁপে অঙ্গ মোর হইবে মিলন।' সর্বদাই ওরা আনন্দ করে, গান গায়, হাসি ঠাট্টা করে, নাচে। নেচে নেচে বলে—'লাচ্যে লাচ্যে কুল ঘুচাস না। দিদি ডেগিস না, আর বাজু দোলায়েঁ লাচিস না। পাঁক দিয়ে বাঁধলি ঝুটি, কত লোকে ছুটোছুটি। না মিলে তাব ঠহর ঠিকানা। দিদি ডেগিস না, আর বাজু দোলায়ে লাচিস না।' কোন অভাব, কোন দৈন্য বা নিপীড়ন বুনোদের নাচগানের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতে পারে না।

ঢাকুরিয়ার বুনোদের নাচগান দেখে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। বিদিশার তাঁবুতে ফিরে আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাক্তারবাবুদের বাড়ী থেকে চীৎকার শুনতে পেলাম। সে চীৎকারে আমরা ওদের বাড়ীর দিকে এগিয়ে যেতে না যেতেই সেখানকার তীব্র আলো মিলিয়ে গেল। ঝট্‌পট্ কিছু লোক এধার ওধার পালিয়ে গেল। ডাকাত এসেছিল, ডাকাতি করে পালিয়েছে। ডাক্তারবাবুর বন্দুক আলমারীতে পড়ে রইল, ব্যবহার করার সুযোগ দেয় নি ডাকাতেরা। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী তাঁর গলার বিছাহার ডাকাতের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন ডাকাতদেরই সামনে। সে হার তিনি শিয়রের বালিশের তলায় রেখে অন্যদিক সামলাতে ছুটেছিলেন, কিন্তু রক্ষা করতে পারেন নি শাশুড়ীর দেওয়া সে হার। ডাকাতেরা যাবার সময় পাটিসাপ্‌টা পিঠের মত বিছানাটাকে পাকিয়ে ফেলে রেখে হার নিয়ে পালিয়েছে। বিছানার রোলের মধ্যে তখন দু বছরের মেয়েটি মা মা বলে ভাঙাগলায় কাঁদছিল। এই ডাকাত ছিঁচকে ডাকাত। একে ডাকাতি না বলে চুরি, ছিঁচকে চুরি বলাই যুক্তি সঙ্গত। এ ধরণের চুরি-ডাকাতির জন্য সজ্জন গ্রামবাসী সর্বদাই ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকে। তথাপি তারা চুরির সাফাই গেয়ে বলে থাকে— 'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা।' বাঙলার পল্লীর মানুষের মুখে

মুখে একথা প্রবাদের মত ঘোরে। চোরের বুদ্ধির প্রখরতা প্রতিপাদ্য করার জন্য নানা গল্প ও কাহিনী পল্লী বাঙলায় প্রচলিত আছে। 'চোরচক্রবর্তী' জাতীয় গল্পের সঙ্গে বাঙলার গ্রামবাসীর পরিচয় সুদীর্ঘদিনের। সুচতুর চোরের চৌর্যকাহিনী বর্ণনা এ সব গাথা-কবিতার প্রধান বিষয়। যদিও চোরের প্রশংসা বা চৌর্যবৃত্তির উৎসাহ প্রদান করা হয় না এই সব গল্প-কাহিনীতে। বরং সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকেদের বাড়ীতে যাতে চুরি-ডাকাতি করা না হয় তার জন্য চোর-ডাকাতদের সর্দারদের দিয়েই চোরদের নানা উপদেশ দেওয়া হয়। যারা উপদেশ দেয় সেই সব চোর-ডাকাত বা 'চোরচক্রবর্তী' গোছের লোকেরা সাধারণ চোর নয়। চোরের দল জনৈক চোরচক্রবর্তীর কাছে কোটালের অত্যাচারেব কথা জানায়। ব্রাহ্মণদের উপরও নাকি কোটাল অত্যাচার করে। "সুনিঞা প্রতিজ্ঞা কোপ হইল প্রচণ্ড, এখনই জাইব চম্পাবতী পুরি করিব লণ্ডভণ্ড। একে একে করিব সকল নগর চুরি, নাগরিঞা লোকেরে আমি করিব ভিখারী।" তারপর নানাভাবে চোরচক্রবর্তী চুরির পর চুরি করে চলে। কেউ তাকে ধরতে পারে না। ফলে কিছু নির্দোষ লোক শাস্তি ভোগ করে রাজার হাতে। তখন চোরচক্রবর্তী ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করে রাজার সমীপে উপস্থিত হয়ে বলল—চুরি করার উদ্দেশ্যে সে চুরি করে নি, কোটাল বড়ই নিষ্ঠুর ও উৎপীড়ক, তাকে শিক্ষা দিবার জন্যই সে একাজ করে চলেছে। তারপর চোরচক্রবর্তীর সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ। বিবাহান্তে স্বদেশে ফিরে সে ব্রাহ্মণদের অনেক টাকা দান করে এবং পরে চোরেদের উপদেশ দিয়ে বলে—'আপন সুখে তোমরা জথা তথা যাও, ব্রাহ্মণ সজ্জন এড়ি চুরি করে খাও। ব্রাহ্মণ-সজ্জন দাতা-বৈষ্ণব তিনজন, ইহাদের ঘরে চুরি না করিও কখন।' ব্রাহ্মণাদি সমাজকে চোরের উপদ্রব থেকে রক্ষা করার জন্যই যেন এ ধরণের গল্প-গাথা-কবিতার উৎপত্তি। গোবিন্দবিজয় ইত্যাদি মঙ্গল কাব্যেও এ ধরণের কাহিনীর ছড়াছড়ি। এখানে শিক্ষিত চিন্তার বা চালাকির পূর্ণ সুযোগ নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে।

এই চুরির কথায়ই আবার মনে পড়ে আমাদের গ্রামের কথা। মনে পড়ে আমাদের গ্রামের লাড়িয়া ডাকাতের কথা। আমাদের পাঠশালার ঘরে যার দশধারায় বিচার হয়েছিল। প্রথম বয়সে সে লাঠি খেলা শিখবার জন্য রহমত আলীর দলে যোগ দেয়। রহমত আলীর ডাকাতের দল ছিল। সে কখনও সাধুর বেশে, কখনও ফেরীওয়ালার বেশে, গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ করত। যখন কোন নির্ভরযোগ্য সংবাদ সংগৃহীত হত তখন নির্দিষ্ট

সময়ে ও স্থানে দলের লোককে ডেকে রহমত আলী সব বুঝিয়ে বলত। অনুচরেরা যে যার অস্ত্র নিয়ে জমায়েৎ হত। জমায়েতে কোন বাধা পড়লে সেদিন কোন কাজ হত না। যে যার বাড়ী ফিরে যেত। যখন অনুচরদের কাজ থাকে না তখন সর্দার সামান্য কিছু রাহাখরচা দিয়ে তার দলের লোকদের পুষতো। ডাকাতি করতে যাবার আগে কালীপূজা করত। পীরগাজীদেরও নাম নিত রহমত আলী। ডাকাতে-কালীপূজার সময় দলের সকলকে উপস্থিত থাকতে হত। গভীর জঙ্গলে ছিল তাদের কালীর মণ্ডপ, সর্দারের আখড়া। দলের মধ্যে যারা চৌকির কাজ করত তাবা পূজোর সময় এক সারিতে বসত. অন্যেরা বসত ভিন্ন সারিতে। সকলের অস্ত্রশস্ত্র কালীমূর্তির সামনে রেখে সর্দারের বিশ্বস্ত তান্ত্রিক পুরোহিত কালীর পূজো করতেন। পূজা হয়ে গেলে ঠাকুরমশায় সকলকে কালী-প্রণাম করতে বলতেন। তারপর সর্দারকে ও পরে সকলকে কোষা মাথায় ঠেকিয়ে শক্তির মন্ত্র পাঠ করতেন। সকলের কপালে সিঁদুরের লাল টিপ এঁকে দিতেন তিনি। তারপর সর্দার সকলের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করত—'তোমাদের এই ডাকাতিতে সমর্থন আছে কিনা?' অনুচরেরা একবাক্যে বলত 'হঁা আছে'। যদি কেউ আপত্তি করত তবে তাকে দল থেকে বাদ দেওয়া হত আবার অনেক সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের বিরুদ্ধে ডাকাতি করতেও যেত না।

ডাকাতি করতে কালীপূজার রেওয়াজ সুপ্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য নানাভাবেই কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয় বাঙলায়। এই কালী এক এক নামে পরিচিত যেমন রক্ষাকালী, শ্মশানকালী প্রভৃতি। কালী কৈবল্যদায়িনী। সাধক কালীপূজা করেন কৈবল্য প্রাপ্তির আশায়। মহামারীর হাত থেকে উদ্ধার পেতে নানাস্থানে অনুষ্ঠিত হয় রক্ষাকালী পূজা। শ্মশানের পবিত্রতা রক্ষার জন্য হয় শ্মশানকালীর পূজা। বরাভয়া, নৃমুণ্ডমালিনী কালী সর্বপ্রকার বিপদ-আপদের রক্ষাকর্ত্রী, শত্রুদলনের ও বিজয়ের প্রতীক তিনি। এইজন্যই ডাকাত ডাকাতিতে সাফল্যলাভ করতে কৈবল্যদায়িনী জগজ্জননীকে একধাপ নীচে নামিয়ে আনে। মানবের স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেবকৃপা কামনা কোন নতুন ব্যাপার নয়। সমস্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিই একাজ করে থাকেন। বিগত বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধ বন্ধের জন্য, শান্তির জন্য গীর্জায় গীর্জায় গণ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এখনও এধরণের প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে ভিয়েৎনামের যুদ্ধ বন্ধ করতে, অশান্ত পরিবেশ থেকে শান্তির পরিবেশে জীবনকে চালিত করতে। বাঙলাদেশের

মসজিদে মসজিদে মুক্তিবাহিনীর, মিত্রবাহিনীর বিজয়ের জন্য সেদিনও গণ প্রার্থনা করা হয়েছে। এ সব প্রার্থনার মধ্যে কারুর কোন আপত্তি থাকতে পারে না। আপত্তি ওঠে তখন যখন ডাকাতি, লুণ্ঠন প্রভৃতি অপরাধমূলক কাজের হাতিয়ার হিসাবে দেবতাকে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আপত্তি উঠুক আর যা-ই উঠুক অপরাধপ্রবণ মানুষেরা তাদের অপরাধের স্বীকৃতির জন্য একটা আশ্রয় চায়ই। মৃণ্ময়ীমূর্তির কালী বা কোন শক্তির দেবতার আলেখ্য তাদের সে আশ্রয়স্থল। ডাকাতে-কালী বা ভবানী অথবা ডাকাতদের দেবীকে ডাকাতেরা নিকৃষ্টকাজের জন্য ব্যবহার করে আসছে সুদীর্ঘদিন থেকে দাক্ষিণাত্য থেকে হিমালয় অবধি। মা তুষ্টা হলেই হবে তাদের কার্য সিদ্ধি, তাদের জয়। এই ডাকাতদের অনেকে যেমন বিশে ডাকাত, বোদে ডাকাত প্রভৃতি, ধনীদের বিত্ত হরণ করে দরিদ্রের মধ্যে বিতড়ণ করে দিত 'রবিনহুডে'র মত। বাঙলার সর্বত্র এই ধরণের ডাকাতের কাহিনী ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। স্মরণীয়, ভবানীভক্ত ডাকাতদের অনেকেই ঠগদের পূর্বপুরুষ। একদা বাঙলায় ঠগেদের দারুণ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সংস্কৃত 'স্থগ' থেকে ঠগ শব্দ এসেছে। 'স্থগ' বা ঠগেরা গোপনে অসৎ কর্মে লিপ্ত থাকত। দ্বাদশ শতকের গোড়ায় (১১৫০) ঠগেদের প্রথম উল্লেখ দেখা যায় বাঙলায় 'শ্রীকণ্ঠচরিত' গ্রন্থে। ঠগ থেকেই ঠকান শব্দ এসেছে বাঙলায়। যে ঠকায় সে ঠগ। নানাভাবে ঠকান যেতে পারে, যাতে বৈষয়িক ক্ষতি হয়। অবশ্য বুদ্ধিতে যারা ঠকায় তারা ঠগ নয়। সাধারনতঃ ঠগ বলতেই একদল দস্যুর কথা বাঙালীমনে জাগরিত হয়। এই ঠগ কিন্তু বর্গী নয়। ঠগেদের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে তারা যে যে রাজ্যে বসবাস করত সেই সেই রাজ্যে ডাকাতি বা লুণ্ঠন করত না। বৎসরের অধিকাংশ সময়ই তারা ডাকাতি ও লুণ্ঠনের কাজে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াত। দেশে ফিরে এসে মহাধূমধাম করে কালীপূজার আয়োজন করত। এই ঠগেদের বিশ্বাস ছিল যে তারা যা করত তাই ঠিক। তাদের ধারণা ছিল, এ বৃত্তি স্বয়ং আদ্যাশক্তি সার্থক করেছেন। আদ্যাশক্তির পূজায় তারা মূর্তিপূজা অপেক্ষা খড়্গকে পূজা করত। খড়্গকে দেবীর প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করে অনুষ্ঠিত হত পূজা প্রত্যেকটি অভিযানে বের হবার পূর্বে। খড়্গের উদ্দেশ্যে বলিও দেওয়া হত। বলির প্রসাদ সকলে ভক্তিসহকারে গ্রহণ করত। তারপর শুরু হত অভিযান শুভ দিন ও ক্ষণ দেখে। এই অভিযানে থাকে আশা ও হতাশা। যাবার আগে রহমত আলীর মতই

সর্দারেরা নিজের হাতে মাটির পাত্রে প্রসাদীভাঙ গুলে তা দিয়ে সকলের কপালে ফোঁটা দিয়ে দিত। তারপর বলত—'তোমরা সকলেই যখন একমত তখন যাত্রা করা যাক।' এই বলে মশাল হাতে সর্দার এগিয়ে যেত। যাত্রার সময় যদি গরুর হাম্বা শোনা যেত বা টিকটিকির টক্‌টক্ শব্দ, অথবা দলের কেউ হাঁচি দিত, তবে যাত্রা স্থগিত রাখা হত অমঙ্গল এড়াবার জন্য। আবার যাত্রার সময় কখনও কোন শিয়াল যদি দলের সামন দিয়ে ডান থেকে বাঁয়ে চলে যেত তবে দ্বিগুণ উৎসাহে ডাকাতের দল এগিয়ে যেত। কারণ, এ ভাবে শিয়াল দেখা মানেই বিজয়ী হওয়া।

লাড়িয়া যতদিন রহমতের দলে ছিল ততদিন সে তোফা ছিল। কিন্তু রহমতের সঙ্গে তার মনোমালিন্য হওয়ায় সে নিজেই নিজের দল গড়ে। অনেকগুলো ডাকাতিও করে। পুলিশের হাতে ধরা পড়তে পড়তেও কয়েকবার পালাতে পেরেছিল সে। কিন্তু সেবার আর পালাতে পারল না। একসঙ্গে সতেরটা চুরি ও ডাকাতির দায়ে সোপর্দ করল পুলিশ তাকে। আমাদের গ্রামের পাঠশালায় 'স্পেশাল কোর্ট' বসিয়ে বিচার হচ্ছিল তার। তখন আমরা খুবই ছোট। তাই বিচারের সময় উঁকি মারতাম আর সেপাইর তাড়া খেতাম। নয়দিন ধরে বিচার চলে। বিচারে লাড়িয়ার দশবৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছিল বলে পরে শুনেছি।

ডাক্তারবাবু তাঁর বাড়ীর ডাকাতদের অনেককেই চিনতে পারলেন। তাঁর রোগীদের মধ্যেও নাকি কয়েকজন ছিল সে ডাকাতদের দলে। তিনি থানা পুলিসে সংবাদ দিলেন কিন্তু ওটা নিয়ে পড়ে থাকতে পারলেন না। 'যা গেছে তা তো আর পাওয়া যাবে না। তার চেয়ে পরিশ্রম করে, খেটে, আবার নতুন করে গড়ে তুলতে হবে সব।' এই বলে তিনি নিজের কাজ করে গেছেন।

এই ধরণের ডাকাতি ছাড়াও ছিঁচকে চুরি, গরু, ছাগল, ধান, চাল চুরিও লেগে আছে গ্রামে। এই চোর ডাকাতদলের লোকেরা সাধারণতঃ এসেছে চাষী, শ্রমিক ও বেকার মানুষের ঘর থেকে। অপরাধপ্রবণতার দিকে কেউ একবার ঝুঁকে পড়লে স্বাভাবিক জীবনে প্রায়ই ফিরে আসতে পারে না সে। তখন একটির পর একটি অপরাধের জালে জড়িয়ে পড়তে হয় তাকে। কারণ এ পথে সহজে কাঁচা টাকা ও পয়সা মেলে। তাছাড়া মেলে অবাধ নারী-সঙ্গ। অনেকে মা-বাবার মমতার স্নেহস্পর্শ না পেয়েও অপরাধী হয় বলে অপরাধ বিজ্ঞানীদের অভিমত।

কাঁচা বয়সের ছেলেরা ভুল করে বিপথগামী হবার পরে পাকা

লোকদের হাতে পড়ে আর বেরুতে পারে না।" ছিঁচকে চুরি থেকে তখন পকেটমার, ঘাওবাজ, চেনটানাপার্টি, দালাল, গব্বাবাজ, ছেলেধরা প্রভৃতি কাজে লেগে যায় তারা। পকেটমারদের মধ্যে যারা শুধু রেজকি বা খুচরা পয়সাকড়ি তুলে থাকে তারা ছেচকিবাজ। পাকাপোক্ত সেয়ানা চোর ঘাওবাজ। পাঞ্জাবী সার্ট থেকে যারা গলার বোতাম চুরি করে তারা চেনটানাপার্টির লোক। গব্বাবাজেরা বাড়ীর চাকর, দারোয়ান, মালী প্রভৃতির নিকট থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে দলপতিকে জানিয়ে দেয়। তারপর দলপতি দলবলসহ ডাকাতি করে। অনেক সময় ওরা ফেরিওয়ালা, সাধু, সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে ঘুরে ঘুরেও নানাসংবাদ সংগ্রহ করে থাকে। সহরের পুরানো কাগজের ফেরিওয়ালারাও গব্বাবাজদের অনেক সংবাদ পরিবেশন করে থাকে। অবশ্য এ কাজের জন্য তারা পারিশ্রমিক পায়। ভবঘুরেজাতীয় বহু লোক ছেলেধরার কাজ করে। আছে ভিখিরি, চোলাইমদের ক্রেতাবিক্রেতা ও 'ব্ল্যাকে'র দোকানদার প্রভৃতি। সমাজ হল সভ্যভব্য, সাক্ষর-নিরক্ষর, অগণিত মানুষ নিয়ে। অপরাধী, অপরাধপ্রবণ, অপরাধবিমুখ সকলেই সমাজের অঙ্গ। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অপরাধীরা এসে ভীড় জমায় বাঙলায়। তাদের ভাষা জগাখিচুড়ি। চুরি, পকেটমারি, রাহাজানি, মদচোলাই, মেয়ে বেচাকেনা করা লোকেদের ভাষার সঙ্গে বয়ে-যাওয়া যুবক, উঠ্‌তি গুণ্ডা ও মস্তানদের ভাষার একটু তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া মেয়ে অপরাধী, বেশ্যা প্রভৃতির ভাষার ধারাও আলাদা। স্বভাবতঃই বয়ে-যাওয়া যুবক, উঠ্‌তি গুণ্ডা ও মস্তানদের ভাষা অপেক্ষাকৃত মার্জিত। এই দলে শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত ও নিরক্ষর সকলরকম কিশোর-যুবকের সন্ধান মেলে। আবার এদের মধ্যে যারা পকেটমার তাদের ভাষার সঙ্গে চোর, জুয়াচোর প্রভৃতির ভাষার অমিল লক্ষণীয়। ছিনতাইবাজ, গব্বাবাজ, ছ্যাঁচোর, চোর, তেলেনবাজ, মালগাড়ি পার্টি, প্রভৃতির আচার-আচরণ ও বচনের সঙ্গে ডাকাত, জালিয়াৎ, চোরাই মালের পার্টি, ছেলেধরা, চালবাজ, গণিকা, হিজরা প্রভৃতির চলনে, বলনে ও আচারে, আচরণে অনেক তফাৎ। গণিকাদের মধ্যে আছে কয়েকটি সামাজিক স্তর। খান্দানি গণিকাদের সর্বত্র সমাদর। অতি দরিদ্রশ্রেণীর পতিতা সবদিক দিয়েই বিপর্যস্ত হয়। অপরাধীদের অনেকেই দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভোগে। যক্ষ্মা, যৌনব্যাধি, কুষ্ঠ, অপরাধজগতের নিত্য সহচর। খুন, জখম, রক্তপাতের স্বাভাবিক নায়কেরা তাদের নিজস্বভাবেই

চলে। মদ-চোলাইকারী ও মাতালের বচসা অনেক সময় উপভোগ্য হয়। চণ্ডু গাঁজার আড্ডায়ও অনেক তথ্য জানতে পারা যায়। অপরাধ জগতের লোকেদের একটা বিরাট অংশ আসে গ্রাম থেকে। শহরে এসে তারা গ্রামকে ভুলে যায়। তখন তারা হয়ে পড়ে শহরের বাসিন্দা। শহরে এসে এইসব লোকেদের অপরাধের পদ্ধতিও পাল্টিয়ে যায়। ছিঁচকে চুরি শহরে অচল। সর্দারদের শিক্ষার গুণে নানাভাবে নিজেরা নিজেদেরকে তৈরী করে নেয়। তথাপি ওদের অনেকে ঐতিহ্য বর্জন করতে পারে না। যারা পারে না তাদের কাছে জানা যায় লোকসমাজের জীবন সম্পর্কে বহু তথ্য। শিল্প বাণিজ্যের প্রসারহেতু অপরাধের 'টেকনিক' পাল্টে গেছে বলে পল্লীগ্রামের অপরাধ পদ্ধতি থেকে শহর ও শিল্পাঞ্চলের অপরাধ পদ্ধতি পৃথক হয়ে চলেছে। পল্লীতে এখনও আছে ছিঁচকে চুরির ঢেউ। গরু, ছাগল, ধান, চাল, বাসনকোসন ইত্যাদি চুরি যাওয়া পল্লী বাঙলার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। শহরের চায়ের দোকান, রক, বিশেষ বিশেষ অঞ্চল, বস্তি, ছোটখাট দোকান, হোটেল, রেস্টুরেণ্ট প্রভৃতি



অপরাধীদের জায়গা জোগায় বা আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়। এই সব জায়গায় অপরাধী, অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের সঙ্গে অনেক সময় বুঝে-না-বুঝে সাধারণ মানুষও আড্ডা জমায়। ক্রমে ওদের অনেকে 'ডেনে' প্রবেশ করতে বাধ্য হয়। এদের মধ্যে অপরাধীদের সন্তান; জারজ সন্তান, কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তের সন্তানেরাও থাকতে পারে। শহরের

অপরাধপ্রবণ মানুষের সঙ্গে গ্রামের অপরাধপ্রবণ মানুষের বাহ্যতঃ তফাৎ থাকলেও জেল প্রভৃতি স্থানে উভয়ের মিলনে উভয়ে উভয়ের সংস্পর্শে আসে। তাছাড়া যাতায়াতের সুযোগ সুবিধার জন্যও এখন একে অপরের সাফল্যের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে বলে অপরাধের 'টেকনিকে' গ্রাম-শহরের মধ্যে তেমন পার্থক্য থাকছে না। মদের আড্ডা, পতিতালয়, জুয়ার আড্ডার লোকেদের বিভিন্ন আচরণের মধ্যে সমাজ ইতিহাসের বিবিধ উপকরণ ছড়িয়ে আছে। ছড়িয়ে আছে লোকজীবনের নানা সংবাদ। ভিক্ষুক শ্রেণীর লোকেদের মধ্যেও একপ্রকার অপরাধী আছে যারা সভ্যমানুষের সহজাত সহানুভূতি আকর্ষণ করতে বালক বালিকাদের অঙ্গহানি ঘটিয়ে তাদের দিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করায়। অনেকে পঙ্গু ছেলেমেয়েদের ভাড়া খাটায়। গ্রামের কোন মেলা বা জমায়েতে ভিক্ষারত পঙ্গু বা বিকলাঙ্গ ছেলেমেয়ে-দের দেখা যায়ই। শহরের সর্বত্র ওদের অবাধ গতি। হিন্দুধর্মে ভিক্ষার একটা বিশেষ মর্যাদা আছে, তাই মহাদেবকে অন্নপূর্ণার কাছে ভিক্ষা করতে যেতে হয়েছিল। উপবীত, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কর্মে ভিক্ষার বিধান আছে। কোনও মুসলমানী পর্ব উপলক্ষে অথবা জুম্মাবার বা শুক্রবার মসজিদের আশে-পাশেও ভিখারীদের ভীড় দেখা যায়। খয়রাতী দেওয়া বা ভিক্ষাদান ইসলাম ধর্মের স্বীকৃত বহু পুণ্য কর্মের একটি।

পশ্চিমবাঙলার সমাজবিরোধী যুবকদের অধিকাংশই বাঙালী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে দুর্ভিক্ষ, দেশবিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মুদ্রাস্ফীতি, কালোবাজারী, বেকারী প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে অপরাধীদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। মদ, গাঁজা, বিভিন্ন নেশা, নারীসঙ্গ এদের উগ্র করে তোলে। অপরাধীদের দলে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে পকেটমারও আছে। সাত আট বছরের ছেলে এমন কি মেয়েদেরও এ কাজে পোক্ত করে তোলা হয়। সাধারণতঃ পকেটমারেরা তাদের এলাকা চট করে ছাড়ে না। প্রত্যেক পকেটমারের এক একটি অঞ্চল থাকে। এবং সে অঞ্চল বাইরের পকেটমারের কাছে নিষিদ্ধ অঞ্চল। এদের প্রায় সকলেই অবিবাহিত ও বেশ্যাসক্ত। ঘাওবাজরা সেয়ানা চোর। জিভের তলায় ব্লেড লুকিয়ে রাখে তারা। সুবিধামত তা বার করে চালিয়ে দেয় পকেটে। চেনটানাপার্টি সাধারণতঃ গলার বোতাম খুলে উধাও হয়। পতিতার দালালদের মধ্যে বাঙালী অবাঙালী উভয় সম্প্রদায়ই আছে। দালালদের মধ্যে হয়েছে সর্বধর্মের সমন্বয়। বাঙালী দালালদের

অনেকে বাড়ীর মালিক। অনেক সময় পতিতার চাকরও দালালের কাজ করে। অনেক সময় তারা পূর্বতন মনিবের মনিবও হয়ে বসে। প্রায়ই পতিতার দালাল ও ভবঘুরে জাতীয় লোক ছেলে-ধরার কাজ করে। চোরাই ছেলেমেয়ের দামও চড়া। অনেক অপরাধেরই কারণ নারী। চুরি, ডাকাতি ও লুঠের টাকা খরচা করার স্থান বেশ্যালয়। যে সব পতিতা ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই বৃত্তি নিতে বাধ্য হয়েছে তাদের অনেকের মধ্যেই মাতৃস্নেহ অত্যন্ত প্রবল। তাদের অনেকেই তাদের ছেলেমেয়েদের সভ্য করে তুলতে নানাভাবে চেষ্টা করে এবং নিজেদের জীবনের বিনিময়ে ওদের গড়ে তুলতে চায়। হিজড়া আর একটি সম্প্রদায়। এদের মধ্যে কিছু আছে জন্মসূত্রে হিজড়া। অনেকে লিঙ্গ ছেদন করে হিজড়া হয়। এই ছেদন সম্পর্কিত নানা রীতিনীতি প্রচলিত আছে সারা ভারতবর্ষে। বিভিন্ন স্থানে ছেদন রীতি বিভিন্ন প্রকার। সাধারণতঃ দলপতি ছেদন কার্য করে থাকে। ছেদক দুটি হাত পেতে ধরে, হাতে একমুঠো টাকা ছাড়া দিতে হয়, একশো টাকা মজুরী। লিঙ্গ অপসারণের পর রুগীকে চব্বিশ ঘণ্টা জাগিয়ে রাখা হয়। অর্থাৎ ঘুমোতে দেওয়া হয় না। তখন আড্ডায় চলে নাচ, গান, হৈ-চৈ। ঘা শুকোতে কাটা জায়গায় একতাল খয়ের চাপা দেওয়া হয়। বিবাহ, জন্ম ও হিন্দু-মুসলমানদের নানা উৎসবে নাচ-গান ও কুকথা বলে অর্থ উপার্জন করে এরা। হোলি ইত্যাদি উৎসবে বাঙলার অনেক জায়গায় হিজড়াদের নাচ গান হয়। যদিও হিজড়া দর্শন অযাত্রা বলে লোক-বিশ্বাস। হিজড়া শব কবর দেওয়া হয়, পোড়ান হয় না। তাদের দলের নেতাকে 'গুরুমা' বলা হয়। একবাটি দুধ একত্রে চুমুক দিয়ে হিজড়া বন্ধুত্ব স্থাপন করার নিয়ম। বহু আদিবাসী সমাজের মধ্যে এবম্বিধ আচরণ প্রচলিত আছে। সেখানে কোন মহিলার অধীনতা স্বীকার করার জন্য মহিলার মাই চুষতে হয়। যেমন শিশু মাতৃদুগ্ধ পান করে তেমনি করে কোন পুরুষ যদি কোন নারীর স্তনামৃত পান করার কায়দায় স্তনে মুখ রাখে তবে সে পুরুষটি সেই নারীর সন্তান তুল্য হয়ে পড়ে। এইভাবে একবার নারী-কর্তৃত্ব মেনে নিলে আর কখনও সে তার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না। হিজড়াদের মধ্যে বাঙালী প্রায় নেই বললেই হয়, কিন্তু বেশ কিছু বাঙালী উৎসব অনুষ্ঠানে নবজাতকের সংবাদ পেলেই সেখানে তাদের উপস্থিতি দেখা যায়। এই জন্যই বাঙলার লোকজীবনের সামগ্রিক আলোচনায় হিজড়াদের আমরা বাদ দিতে পারি না। অপরাধ জগতের সমস্ত অপরাধীদেরই

আছে নিজস্ব আচার, আচরণ, ভাষা, শব্দ প্রভৃতি যা লোকবৃত্তের আওতায় আসতেই পারে। ওদের জগতে বিভিন্ন দেবদেবীরও পূজা হয়। এবং সে পূজার পদ্ধতি কিছুটা অন্যরূপ। সাধারণতঃ কালী, চণ্ডী, কার্তিক, মনসা ও শীতলার প্রাধান্য ওদের মধ্যে। এরা সকলেই লৌকিক দেবদেবী। প্রায়শই মূর্তি গড়ে এই সব পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পূজার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় নানাবিধ নাচ, গান, পান, যাত্রা, হৈ-হুল্লা। এই সময় শোনা যায় ওদের ব্যবহৃত নানা ভাষা। যেমন 'ঝিল্লির অভিসার-ঝারি ছানকোআকে মহুয়া বানিএছে', অর্থাৎ মেয়েটার চটুল চাহনি ছেলেটাকে পাগল করেছে। বা জুঁইফোটান, মানে কোন মেয়ের মন রাখা। বিভিন্ন শব্দে ওরা মেয়ে, পুলিস, মদ, বোমা প্রভৃতি বুঝতে পারে। যেমন চামর, চিছা, হেডলাইট, ঝিল্লি, ট্যাপারি, ডাটিভাতি, ফানটুস, বোচা, বাঁটুল, মাকৃড়ি, মাল, মিচ্‌রি, সাঁকরি, হরিণঘাটা প্রভৃতি শব্দে মেয়ে ; কর্‌করো, কোঠারি, কুত্‌তা, খোচর, খেট্‌খেল, গোরমেন্টটুপি, চোক্‌, ঝাঁকামুটে, ঠোলা, মাকু, বুদ্‌দা, মাচর্‌, চামার্‌, লেপাই, লালজি, লুপিস, টিকটিকি, জুমলি, সুককম, চামচ, খেচাপার্টি, হরমা, হুসহুস প্রভৃতি শব্দে পুলিস ; চারু, খিটা, কিটা, পাগলি, ভাজি, মোধু, লিডো, গ্যাসোলিন, পেট্রোল প্রভৃতি শব্দে মদ ; এবং অন্‌ডা, গ্যানা, নাড়ু, ডিমু, পেটোআ, পোলা, লেবু, রুটি প্রভৃতি শব্দে বোমা বোঝান হয়। অপরাধজগতের এইসব অনেক কথাই আজকালকার বহু ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতীদের মুখেও শোনা যায় কলকাতায়। কোনও রকের আড্ডায়, কোনও 'কমনপ্লেসের' আশপাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে ও দেওয়ালের লেখায় নানা কথা ও বাণী শোনা বা দেখা যায়। প্রস্রাবাগারে, ট্রেনের কামরায়, কমনরুমে, কোন দেবালয়ে এমন কি সৎকার স্থানের বিশ্রামাগারের চারদিকে কাঠকয়লা, পেন্সিল, চকখড়ি প্রভৃতি দিয়ে যে সব কামনা বাসনার কথা লিখিত থাকতে দেখা যায় ভদ্রবেশী অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকদের দ্বারা অপরাধজগতে তাই জীবনের সঙ্গী। গ্রামের মানুষকে যদিও অনেকেই প্রাকৃত, অসংস্কৃত, সরল, অভব্য ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করেন, কিন্তু সেই গ্রামের মানুষ প্রায়শই এমত ইতরামো বা নোংরামোর অনেক ঊর্ধ্বে থাকতে পছন্দ করেন। অবশ্যই গ্রাম্যতা দোষে তাদের অনেকেই দুষ্ট ও সরব। তাদের প্রত্যেকটি আচার-আচরণের মধ্যেই তা পরিস্ফুট। শহরের তথাকথিত সভ্য বাবুদের মত ভদ্রতার নামাবলী গায়ে জড়িয়ে মিশ্রির ছুরি তারা মারে না, মারতে পারে না।

তারা যাকে ছুরি মারবে তাকে জানিয়ে দিয়ে, জানান দিয়েই মারবে। কোন কিছুর আবরণের দরকার হয় না তাদের। অপরাধীদের মধ্যে নানা কুসংস্কারও আছে। যেমন রাতের চোর চুরি করতে যাবার সময় কুকুরের ডাক শুনলে চুরি করে না। যাত্রার মুখে যে কোন রকম বাধা বিপদের সঙ্কেত বলে মনে করা হয়। অনেকে চুরির জায়গায় বিড়ির টুকরো ফেলে রাখে, অনেকে মলত্যাগ করে রাখে। পিছু ডাকা অমঙ্গল সূচক। পুত্রবতী বিবাহিতা মহিলা দেখে যাত্রা শুভলক্ষণ, সে মহিলা গর্ভবতী হলে আরও ভাল। ওদের অনেকে তাস ও জুয়া খেলার সময় তাসের বাণ্ডিল কপালে ঠেকায়। অনেকে তাস কেনার পর তাসের প্যাকেটকে ঝাঁটাপেটা করে। অনেকে দরজার চৌকাঠে পান পাতায় কর্পূর রাখে, অমঙ্গল দূরীকরণের জন্য। দুর্দিনে চোকাঠ গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে ফেলার ও পাকানো কাগজ জ্বালিয়ে দরজা বন্ধ করার রীতিও আছে। এভাবে দরজা বন্ধ করলে বিপদের হাত থেকে নাকি উদ্ধার পাওয়া যায়। দরজার মাথায় ঘোড়ার ক্ষুর রাখা হয় অনেক স্থানে দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য। অনেক সময় ঘরের কোণে লবঙ্গ রাখে বারবণিতা। এই জগতের লোকেরা নিজেরা নিজেরা কথা বলার সময় নানাবিধ অশ্লীল বা 'স্ল্যাঙ' শব্দ ব্যবহার করে। যেমন—খোচর চল্‌তাই আখেয়াএ চোলেছে> পুলিশ সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে চলেছে, বা ছাবিচামর আড়িআ দে>মেয়েটা সুন্দর ইশারা করে। চামর চামটাকে চামিএ নে>সুন্দরী মেয়েটাকে দলে ভেড়া। কালোতে ছপ্‌পর খাওআ>অন্ধকারে লুকনো। ফাঁকা কাটকে ভসকানা চাই>চুপিসারে জানলার কপাট ভেঙে ফেলা দরকার, ইত্যাদি। অপরাধজগতের যাদের কথা বলা হল প্রধানত তারা শহর ও নগরের অপরাধী। অনেক গ্রামবাসী এদের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই গ্রামবাসীদের সংখ্যা অধিক নয়, গ্রামের অপরাধের ধারা আলাদা। রেষারেষি, দলাদলি ছিঁচকে চুরি প্রভৃতি গ্রামদেশের নিত্য সঙ্গী।

ডাক্তারবাবুর বাসায় চুরি হয়ে যাবার পর সে চুরি পর্যালোচনা করতে করতে এত সব কথা মনে এসে গেল। ইতিমধ্যে আমাদের চলে যাবার ডাক এল। অন্যত্র চলে যাবার ডাক। এ গ্রামে আমাদের সমীক্ষা সমাপ্ত।

তাঁবু খুলে ফেলতে ফেলতে আর একবার পশ্চিমবঙ্গের এই নম্বা গ্রামটির দিকে তাকালাম। প্রাণভরে দেখে নিলাম এ গ্রামের বাঘা দরজীকে। হাটের এক কোণের ছোট্ট একখানা চালাঘরে বসে অনবরত

সেলাই করে চলেছে সে। কখনও নতুন জামা বা কামিজ সেলাই করছে, কখনও পুরাতন ছেঁড়া জিনিষে তালি লাগাচ্ছে। এ গাঁয়ের কেষ্টা মণ্ডল ছাতি সারায়। গ্রীষ্ম-বর্ষার হাটের দিন ছাড়া অন্য দিনে সে বড় একটা গ্রাহক পায় না। গাঁয়ের অনেকেই ছাতা ব্যবহার করে না। হোগলার টোকা, বস্তার টোকা, কচুপাতা মাথায় দিয়ে বর্ষা পাড়ি দেয়। সাপে কাটার ওঝা, ভূত ছাড়াবার ওঝাও আছে এ গাঁয়ে। কিন্তু পাসকরা বড় ডাক্তার থাকার দরুন অনেকে এখন ওঝা অপেক্ষা ডাক্তারবাবুকে বেশী পছন্দ করে। ফলে ওঝাদের আয় কমে গেছে। অবশ্য ভূতে ধরার রোগী ডাক্তারবাবু নেন না। নল চালান, লাঠি চালান, বাটি চালান, হাত চালান দেবার ব্যাপারও আছে। চোরবন্দীর ছড়া আছে। যেমন—'চোর-চোরানি গাছের পাতা। যে চোর আইয়্যে কাট মাথা। ভাঙা লাঙ্গল পুরান ঈশ। চোরার বান্লাম চৌ-দিশ। আইব চোরা হাস্স্যা। মরবো চোরা কাইন্দ্যা। ঘরের গিরির দুয়ার বান্ধা। তেলের হাঁড়িত চক্চক্। লুনের হাঁড়িত ফুল। হিঙ্গের মুখ বাইন্ধ্যা থইছি ন জন চোর। চোরার মায় পুছ করে। আমার চোরায় কি করে। গুয়া খায় পিছকি ফালায়। ফালের উপুর লড়-বড়ায়। চোরা রে থাইক্যা যা। পানিভাত খাইয়া যা'। তাছাড়া আছে আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য নানাবিধ মন্ত্র ও ছড়া। এই সব ছড়ার একটি—'ইর কাছুম বীর কাছুম, কাছুম যমদূত। আন্ধা চোরা কাচ কাছুম চণ্ডীমার পুত ॥ ভূত পেরেত যত পাই, বুক চিরইয়া তার রক্ত খাই। রামচক্রবান, ঠাণ্ডা জিলকী বান ॥ দেও দান বান কাইট্যা করি খান খান। রামের আজ্ঞা গুরুর পায় ॥ রক্ষা কর কালিকা চণ্ডীর মায়। হক্লা এলাহা ইল্লাল্লাহ। মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহ ॥' গ্রামের বিবরণ সংগ্রহ করতে এসে শহরের আমাদের মাঝে মাঝেই শহরের সঙ্গে গ্রামের একটা সম্পর্ক খুঁজে বের করার প্রবণতা দেখা দেয়। দেখা দেয় বলেই স্থানে স্থানে গ্রামের কথা বলতে গিয়ে শহরের কিছু কিছু কথাও এসে গেছে প্রাসঙ্গিক ভাবে। এসে গেছে ছেড়ে আসা গ্রাম ও প্রাচীন গ্রামের নানা আচার-আচরণাদির কথা। গ্রাম সমীক্ষায় যে তিনটি গ্রাম—ছেড়ে আসা গ্রাম, ফেলে আসা গ্রাম ও গড়ে ওঠা গ্রামের কথা বলা হয়েছে সেখানে পাওয়া যায় বাঙলার গ্রামের সার্বিক পরিচয়। এ তিনটি গ্রামকে সামগ্রিকভাবে দেখলেই বাঙলার গ্রামকে দেখা যায়, দেখা যায় গ্রামের সাদাসিদে মানুষগুলোকে, বিশুদ্ধ জলবায়ুকে। বৃক্ষলতাপাতা, পশুপক্ষীকে, ঋতু প্রভৃতিকে, জলাশয়, নদী ও গ্রাম্য পথকে। গ্রাম্য আচার আচরণকে।

সত্যকথা স্বীকার করতে পারলে বলতেই হবে যে এখানে এসেই যেন গ্রামকে নতুন করে চিনলাম। নতুন করে জানলাম। নতুন করে স্মৃতিচারণের সুযোগ পেলাম। হঠাৎ যেন দেখতে পেলাম আমাদের গ্রামকে। আমাদের ঘর-বাড়ীকে, যে ঘরের চালের খড় খসে পড়েছে, দেওয়ালের গায়ে মাটির নিকানা না পড়ায় তা খয়ে ফেটে হাঁ হয়ে যাচ্ছে। রান্নাঘরের শিকেতে খালি হাঁড়ি ঝুলছে। ঘরের পাটাতনে আরশুলা, ইঁদুর, চিকা, নাচানাচি দাপাদাপি করছে। গোয়ালঘর শূন্য, গোলাঘর শূন্য। খুঁটির বাতায় বাতায় ঘুণ ধরে চাল পড়ে যাচ্ছে। চালের খড় বাতাসে উড়ে গিয়ে এখানে সেখানে জানালা সৃষ্টি করে চলেছে। দেওয়ালের ফাটলের গায়ে বাদুর ও চামচিকের বাসা। পুকুরে কচুরিপানা ভর্তি, সানবাঁধা ঘাটে শেওলা। নিঝুম দুপুরে আধপেটা খেয়ে কিষাণের গরু বৃক্ষছায়ায় একা। বকুলতলায় বকুল-ফুলের ছড়াছড়ি, কুড়িয়ে নেবার কেউ নেই। দেবতার ঘরে সন্ধ্যাদীপ, সান্ধ্যগান নেই। আউলবাউলের গান, তরজা, পাঁচালির ছড়া নেই। শনি-সত্যনারায়ণের পূজা, ত্রিনাথের পূজা, মনসা-ভাসান, মুস্কিল-আসান প্রভৃতি প্রায় সবই বন্ধ হয়ে গেছে আমাদের ছেড়ে আসা গ্রামে। সেখানে আজ জনমানুষ নেই। কিন্তু প্রকৃতি আছে। একই দশা পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন গ্রামেরও। আর্থিক কারণে সেখানকার লোক চলে এসেছে শহরে। এখন আমাদের এই গ্রামকে জনমুখরিত করে তুলতে হবে, আবার এই গ্রামে ফিরে যেতে হবে। পল্লীর উন্নতি ব্যতীত জাতির উন্নতি অসম্ভব বলে চীৎকার করছেন এখন অনেকেই।

অনেক বদল, অনেক ভাঙা গড়ার মধ্যে প্রকৃতি আজও বৈশাখ রোষের বহ্নি জ্বালে। আজও সর্বত্র হয় ঝাউ, নারকেল, সুপারী ও খেজুরের বনে রোদন। আজও গাঙ-শালিক, পানকৌরিরা সূর্যতাপ থেকে আত্মরক্ষা করতে ঘরে গিয়ে বসে। আজও হিজলের শাখায় তৃষাতুর পিক ডাকে। চোখ গেল পাখী এ গাছ থেকে ওগাছে উড়ে যায়। কচিতাল, কালজাম, পাকাগাব রাশি রাশি, খাবার লোক নেই। যারা আছে তারা প্রকৃতির এত দান গ্রহণে সমর্থ নয়। তারা অন্যান্য কাজে নানাভাবে ব্যস্ত। এদেরই কেউ কেউ বর্ষার আগমনের পূর্বেই ভাঙা ঘর সারাবার জন্য ভিজে গামছা মাথায় জড়িয়ে চালের মটকা সারাতে লেগে যায়। কেউ সুতো কাটে, কেউ জাল সারে, কেউ রান্না ঘরের দাওয়ায়, পুকুরের পারে বসে সাত গাঁয়ের কুড়নো কুৎসা রোমন্থনে আনন্দ পায়। এভাবেই দিন কাটিয়ে দেয় ওরা। ওদের বাগানে বাতায় বাতায় লাউ, কুমড়ো ঝুলে আছে। ফুটে আছে ঝিঙে ফুল। ঝোলে

রঙ-বেরঙের সীম। দেখা যায় টগর, শিউলী, রক্তকরবী, গন্ধরাজ, অপরাজিতা, পাঁচমুখী জবা, দোলনচাঁপা, বক ফুল, সোনাচাঁপা, বকুল, মালতী, কাঁটালি চাঁপা ও নানাবিধ লতা ফুল। চারদিকে ভেন্নার বেড়া ও তল্লাবাঁশের ঝোপের মধ্যে করিম শেখের বাড়ী। পালং, মূলোরক্ষেত, রাঙা-মেটে-গোল আলু গাছ, শালগম, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বিট, গাজর, টম্যাটো, লঙ্কা, বরবটি, কাঁকুড় ফলে আছে বাগানে। ফলে আছে সজনে, আমড়া, চালতা, নোনা, আতা, জাম্বুরা বা বাতাবী, পেয়ারা, জামরুল, লিচু, জলপাই, করমচা, কামরাঙা, কুল, সবেদা, পদ্ম, মান, গুড়ি কচু প্রভৃতি। অদূরে দামুদের মনসার দেউল, তুলসী-মঞ্চ, কীর্তনের প্রাঙ্গণ। সব আছে। সকলেই তাদের প্রাচীন কীর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নেই শুধু তারা যাদের জন্য হয়েছিল ওদের সমারোহ সেই মানুষ। সেই মানুষ এখন চলে গেছে শহরে, নগরে। গ্রাম শহুরে বাবুদের কাছে আজ আর আনন্দের বার্তা বহন করে না। তবুও দেখা যায় কঞ্চির বেড়া দিয়ে আগলানো সরষে-মটর-কলাই ক্ষেত; রাস-দেউলের চূড়া, ঝুলমন্দির, দুর্গাবাড়ী। দেখা যায় বৃদ্ধ অশ্বত্থ ও বট, ভাঙা ইট, শেওলাভরা পুকুরে অসংখ্য কলমীলতা ও শাপলা ফুল। দু-এক শরিকও আছে। তারা মিটমিটে আলোর প্রদীপ জ্বালে। তাদের সেদিন নেই, সে প্রাণ নেই, কোথাও এবং কেন যেন তারা মিলিয়ে গেছে। কেন গেছে? গ্রামের পাখীরা তাদের পুরান জীবন নিয়ে বেঁচে আছে। আজও যারা গাঁয়ে আছে সকালে পাখীর ডাকে এখনও তাদের ঘুম ভাঙে। এখনও কোপাই বিল সূর্যের সোনালী আলোয় যখন ঝিকমিক করে ওঠে তখন আকাশ বাতাস মুখরিত হয়। দোয়েল, শালিক, পাপিয়া ও কোকিলের গানে আশা জাগে। এখনও শ্যামা, বউ কথাকও কথা বলে, ফিঙে, বুলবুলি, টুনটুনি মাঠে বনে উড়ে বেড়ায়, ঘুরে বেড়ায়। এখনও কাক, ঢালিবক, কুচবক ভাবুকের মত নদী-তীরে, পুকুর পারে দাঁড়িয়ে থাকে। শামুক শম্বুক গতিতে এগোয়। গো-বক মাছ ধরে খায়। এখনও দাঁড়মাঝি গয়নার নৌকাকে পিছে ফেলে দিয়ে সারি গান গাইতে গাইতে ঢেউয়ের তালে তালে এগিয়ে যায়। যাবার সময় কিষাণবধূর নদীঘাটে জল আনা প্রত্যক্ষ করে। এখনও বাঁশবনে বাঁশঘুঘু, নদীতীরে বাস্তুঘুঘু নিজ মনে ডেকে যায়। মাদার মিঞা জারি গান গাইতে গিয়ে বন্দনা করে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণপতি প্রভৃতি দেবদেবীকে। প্রকৃতির অযাচিত দান এখনও যারা গাঁয়ে আছে তারা প্রাণ-ভরে উপভোগ করে।—'শ্যাম সরোবর খালবিল নদী বিস্তৃত খোলামাঠ, মাথার উপরে রঙীন আকাশ, দীঘল গাঁয়ের বাট। এমন স্নিগ্ধ শ্যামল শোভা সে খুঁজিয়া কোথা না পাই, বন-বিহঙ্গ বিহানে

বিষাদে বন্দনা গাহে তাই।...আরো চাই-আরো চাই—হে দেবী, তোমারে সেবিয়া এখনও হৃদয় যে ভরে নাই।...প্রকৃতির সাথে পরাণ যে মোর এক হয়ে হয় লীন। হৃদয়-বীণায় ঝঙ্কারি বাজে পূরবীর রিনঝিন।'

গ্রামের ও গ্রামের মানুষদের জানার আগ্রহ নিয়ে আমাদের চলে যেতে হল অন্যত্র। তাদের আচার-আচরণ, পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার, ধর্মকর্ম ইত্যাদির মারফৎ লোকজীবনকে প্রত্যক্ষ করতে। অন্তর দিয়ে তাদের বুঝতে ও জানতে। গ্রাম বাঙলার স্বাস্থ্যোদ্ধারেই এর প্রয়োজন। গ্রাম বাঙলার সুখ সম্পদ, ধন-দৌলত অটুট থাকলে গ্রামের মানুষ আজ এভাবে গ্রাম ছাড়া হতেন না, শহরেরও এ হাল হত না। বাঙলার বর্তমান গ্রামের চিত্রটি রীতিমত বিষণ্ণ। এখানে সবুজ-বিপ্লব অসম্পূর্ণ। সারা দেশের উন্নয়নের হার যেখানে সাড়ে পাঁচ ভাগ, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের হার তিন ভাগ মাত্র। কৃষিক্ষেত্রের চেয়েও নৈরাশ্যময় অবস্থা শিল্পক্ষেত্রের। সরকারী কর্তাদের কেউ কেউ বলছেন যে কৃষির উন্নতি হলে কৃষিক্ষেত্রে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব। যদি তা হয় তবে গ্রাম তার পুরাতন চরিত্র ফিরে না পেলেও গ্রামের সমস্যার কিছু সমাধান যে হবেই তাতে সন্দেহ নেই। গ্রাম-সমীক্ষায় গ্রাম বিবরণী তুলে ধরার সার্থকতা এখানেই। এই কথা মনে রেখেই আমরা গ্রামের মানুষদের অন্যান্য কর্মধারা প্রত্যক্ষ করব পরবর্তী রচনায়।



॥ ৯ ॥

কৃষিপ্রধান বাঙলার ধান প্রথম ও প্রধান উৎপন্ন বস্তু। তাই ভাত বাঙালীর প্রধান খাদ্য। ভাত ভক্ষণের অভ্যাস ও সংস্কার অষ্ট্রিক ভাষাভাষী ও আদি-অস্ট্রালয়েড জনগোষ্ঠীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির দান বলে পণ্ডিতদের গবেষণায় স্বীকৃতি পেয়েছে।

সারা পৃথিবীতে প্রায় সাত হাজার রকমের ধান উৎপন্ন হয়, তার মধ্যে চার হাজার ধরনের ধান জন্মায় ভারতবর্ষে। বাঙলাদেশে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর ধানের চাষ হয়– বর্ষায় আউশ, হেমন্তে আমন এবং গ্রীষ্মে বোরো। আউশ ও আমন ধানের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি লোকশ্রুতি জনপ্রিয়। লোক-শ্রুতিটি শিবকে নিয়ে। শিব ভিক্ষা করে যা পান তা দিয়ে সংসার চালাতে পারেন না গৌরী। তিনি তখন স্বামীকে ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করে চাষের কাজে মনোযোগী হতে পরামর্শ দেন। ভার্যার পরামর্শে শিব ইন্দ্রের নিকট থেকে চাষভূমির পাট্টা নেন। কুবেরের নিকট থেকে নেন বীজ ধান। ভৃত্য ভীমকে সঙ্গে নিয়ে মর্ত্যে এসে চাষে মেতে ওঠেন। শিব মর্তালোকে চাষের কাজে এতই উন্মত্ত হলেন যে গৌরীর কথা ভুলে গেলেন। সাধ্বী স্ত্রী দীর্ঘদিন স্বামীর বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পেরে মর্ত্যে উঙানী মশা পাঠালেন। শিব সর্বাঙ্গে তৈল লেপন করে মশার উপদ্রব থেকে নিজেকে রক্ষা করলেন। তখন গৌরী ডাঁশ ও মাছি পাঠালেন। শিব সর্বাঙ্গে ঘৃত মেখে ডাঁশ ও মাছির দংশন থেকে নিজেকে রক্ষা করলেন। মাছি ও ডাঁশের দংশনে তাঁর সর্বাঙ্গে যে ঘা হয়েছিল তা সারালেন ক্ষতস্থানে রসুনতেল মালিশ করে। এত কার্যের পরও কিছু না হওয়ায় এবার গৌরী প্রেরণ করলেন মশক। ধোঁয়ার সাহায্যে মশক তাড়ালেন শিব। তখন জোঁক পাঠালেন, চূণ ও লবণ দিয়ে শিব জোঁক মেরে ফেলতে লাগলেন। কিছুতেই শিবকে জব্দ করতে না পেরে শেষে গৌরী নিজেই এলেন। শিব-ভৃত্যের সঙ্গে ছদ্মবেশী শিবানীর কলহ হয়। বাগদিনীর রূপলাবণ্য দেখে শিব তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। বাগদিনী প্রথমে তাঁকে নিরস্ত করেন। তখন বাগদিনীকে মাছ ধরার পথ সুগম করে দেবার জন্য শিব মাঠের জল সিঞ্চন করে দেন। বাগদিনীকে সন্তুষ্ট করার জন্য শিব তাঁর অঙ্গুরী প্রদান করেন। শিবকে

আলিঙ্গন দেবার সময় গায়ের কাদা ধোবার ছল করে শিবানী কৈলাস চলে যান। বাগদিনীর বিলম্ব দেখে শিব বুঝতে পারেন যে বাগদিনী তাঁকে ঠকিয়েছে। মর্ত্যে শিবের ধানক্ষেত দেখতে পেয়ে গৌরীর 'আই ঔ! কি ক্ষেতি ঔ' শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ থেকে দুটি অগ্নিপিণ্ড বেরিয়ে এল। এই অগ্নিশিখা তখন শিবের ধানে আগুন লাগাল। শিব পিনাক ধারণ করে আগুন নেভালেন। অগ্নিশিখা দুটি বললেন, আমাদের বাঁচান, আমরা শিবানীর মুখনিঃসৃত থুথু থেকে জন্ম নিয়েছি। আমরা আপনার সন্তান। মহাদেব ওদের কথা শুনে ওদের বাঁচাবার ব্যবস্থা করলেন এবং বললেন অদগ্ধ ধান শালিধান, আমনধান। আর দগ্ধধান আউশধান। এখন থেকে উভয় প্রকার ধানই পৃথিবীতে ফলবে। সেই থেকে পৃথিবীতে আমন ও আউশ দুইপ্রকার ধান জন্মাচ্ছে। অগ্নিশিখা-দ্বয়ের কাছে শিবানীর কথা শুনতে পেয়ে মহাদেব শিবানী সন্দর্শনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কৈলাসে চলে গেলেন।

এখন আমন, আউশ ও বোরো ধান ছাড়া আরও কয়েকপ্রকার ধান উৎপন্ন হচ্ছে জাপানী ও কোরীয় প্রথায়। তিন মাসের মধ্যে এর ফলন পাওয়া যায়, তবে বোরো ধানের মত এই ধানের গোড়ায় সর্বদা কিছু জল রাখার এবং রাসায়নিক সার দেওয়া প্রয়োজন। বাঙলার নানারকম ধানের মধ্যে—অমৃত-শালি, অঞ্জনলক্ষ্মী, আম্রশাল, আগালী, আকাশমণি, আজান, আমফক্‌রা, উডাশাল, উত্তমশালি, ওড়কচু, কয়া, কর্পূরকাটি, কপিলভোগ, কার্তিককলমা, জটাকলমা, মানিক কলমা, কলামোচা, কাকুয়া, কাটারিভোগ, কামিনী, কাল-জিরা, কালিন্দী, কাশফুল, কুমারভোগ, কুসুমশালি, কৌতুকমণি, খাসকামানি, খয়েরচুর, খেজুরছড়ি, গঙ্গাজল, গন্ধতুলসী, গন্ধরাজ, গৃহিণীপাগল, গোপালভোগ, গোবিন্দভোগ, গৌরীকাজল, ঘোড়াশাল, চন্দ্রমণি, চামরমণি, চামরশালি, চিনিসাগর, ছত্রশালি, জগন্নাথশালি, জামাইভোগ, জোড়মাধব, ঝিঙ্গাশাল, তুলসী, তুলাশালি, দুধকমল, দুধসর, দুর্গাভোগ, নন্দনশালি, নাইওর, নীলকণ্ঠি, নেয়ালি, পক্ষীরাজ, পদ্মরাজ, পাটশালি, পাতাসাভোগ, পদ্মকেশরী, পানাতি, পায়রারস, পারিজাত, বলাইভোগ, বাঁকই, বাঁকচুর, বাঁকশালি, বাগেনবীচি, বাদশাপছন্দ, বাদশাভোগ, বামনভোগ, বাগাম, বাঁশগজা, বাঁশফুল, বাসমতি, বিন্ধ্যশালি, বিষ্ণুভোগ, বেনাফুল, বোয়ালী, ভবানীভোগ, ভোগরাজ, মতিহার, মধুমালতী, ময়ূরলতা, মহীপাল, মাধবলতা, মানিকশোভা, যাত্রামুকুট, রণজয়, রাঙ্গামাইট্যা, রাঙ্গিশাল, রাজভোগ, রাঁধুনীপাগলা, রামশালি, রূপনারায়ণ, লক্ষ্মীকাজল, লাউশালি, লীলাবতী, লোয়াগড়া, শঙ্করচিনা, শঙ্করজটা, শঙ্খমুখী,

ভোলাপ্রিয়, শনফুলি, শিয়ালরাজা, শুঁয়াশালি, সজনী, সন্ধ্যামণি, সমুদ্রফেনা, সীতাহার, সুধাভোগ, সুবর্ণখড়্গ, সিন্দুরমুখী, সীতাশাল, সূর্যভোগ, সোনাগাজী, সোনাদীঘা, পীরপ্রিয়, হরিশঙ্কর, হাতীকান, হাতীদাঁত, হিঞ্চি, কর্ণফুলি প্রভৃতির নাম এখন মনে পড়ছে। এই সব ধান উৎপাদনের উপরই বাঙালীর সমৃদ্ধি নির্ভরশীল। সুতরাং ধান্য উৎপাদনের জন্য যে নানাবিধ ক্রিয়া, শ্রম ও ইন্দ্রজালের আশ্রয় নেবে বাঙালী তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

বাঙলা যে শস্যশ্যামলা তা বাঙলার চাষীদেরই আনুকূল্যে। এই বাঙলার কোথাও পার্বত্যাঞ্চল, কোথাও উর্বর সমতলক্ষেত্র, কোথাও নিবিড় অরণ্যানী, আবার কোথাও উদার মুক্ত খোলা মাঠ। গঙ্গা-যমুনার করুণাধারায় এর মৃত্তিকা কখনও উর্বর, কখনও সমুদ্রের জলস্পর্শে লবণাক্ত ; এর কোথাও আছে কঙ্করময় লালমৃত্তিকা, কোথাও আছে বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল। প্রকৃতির রুদ্র মধুর পরিবেশ অনুযায়ী বাঙালীর চরিত্র কখনও রুদ্র, কখনও মধুর। এই বৈচিত্র্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গকে ধান্য উৎপাদনের ছয়টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি অঞ্চলে একটি করে কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, যেমন পলিমৃত্তিকা অঞ্চল, গবেষণা কেন্দ্র চুঁচুড়া। লবণাক্ত অঞ্চল, গবেষণা কেন্দ্র ক্যানিং, গোসাবা। বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল, গবেষণা কেন্দ্র গুসকরা। কঙ্কর বা বালুকাময় অঞ্চল, গবেষণা কেন্দ্র বাঁকুড়া। শুষ্ক অঞ্চল, গবেষণা কেন্দ্র পুরুলিয়া এবং পার্বত্য অঞ্চল, গবেষণা কেন্দ্র কালিম্পং। এই গবেষণা কেন্দ্র সমূহে অনেক উচ্চ উৎপাদনোক্ষম ধান পাওয়া গেছে। এই উন্নত জাতের ধানের মধ্যে আশু, নাবি এবং সুগন্ধযুক্ত ধান রয়েছে। এ ছাড়াও বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে, খরা অঞ্চলে, পার্বত্য অঞ্চলে ও পলিমাটি অঞ্চলের জন্য বিভিন্ন প্রকারের ধান্য উৎপাদনের গবেষণায় সুফল পাওয়া গেছে। আউশ খন্দের জন্য দলার, চারনক, এন-সি ১৬২৬, এন-সি ৯১৮ ; আমন খন্দের জন্য চূর্ণকাটি, রূপসাইল, ইন্দ্রসাইল, ভাসামানিক, পাটনাই ২৩, রঘুসাইল, লাটি সাইল, এন-সি ৬৭৮, এন-সি ১২৮১ প্রভৃতি ও সুগন্ধযুক্ত ধান যেমন রাঁধুনী পাগল, বাদশাভোগ, বাসমতী, কাটারীভোগ, এন-সি ৩২৪, এন-সি ৩৬৫, সীতাভোগ ইত্যাদি ফলাবার চেষ্টায় সুফল পাওয়া যাচ্ছে। লবণাক্ত অঞ্চলে এস-আর ২৬ বি, পাটনাই ২৩, রূপসাইল, কুমড়াগোড় ; বন্যাসহনশীল অঞ্চলে এফ-আর ১৩এ, এফ-আর ৪৩ বি, এবং পার্বত্য অঞ্চলে এন-সি ৬৭৮, এন-সি ১২৮উৎপাদিত হচ্ছে। আউশ এবং আমন ধান ছাড়া বোরো ধানেরও উৎকৃষ্ট ফসল পাওয়া যাচ্ছে গবেষণায়। 'আলটা ধানের পালটা চিড়ে, ঢ্যাপা ধানের খই, মা কয়েছে বাড়ী যাতি, পথ ঘাট কই।'

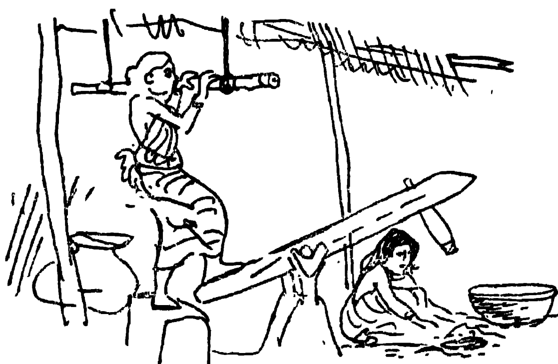
এই সব ধান উৎপাদনে এখনও বাঙলার বৃহৎ অংশে লাঙল ব্যবহৃত হয়। এখনও চাষীর মধ্যে ট্রাক্টরের জনপ্রিয়তা সীমাবদ্ধ। এই লাঙলকে মোটামুটি চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এই চার শ্রেণী হচ্ছে—মুড়া বা মুণ্ড, ধড় বা দেহ, মুঠাসহ হাতল এবং ঈষ। একখানা কাঠের দ্বারা ঈষ বাদে গোটা লাঙল তৈরী করা হয়। আবার কখনও কখনও হাতলকাঠ জুড়েও লাঙল তৈরী করা হয়ে থাকে বাঙলার গ্রামে।

ভারতে সবুজ-বিপ্লব বলতে গম ও ভুট্টার বিপ্লবই বোঝায়। কিন্তু বিভিন্ন গবেষণার সুবাদে সারা দেশে যে ভাবে ধান্য উৎপাদন বেড়ে চলেছে তাতে ধান্য বিপ্লবেরও আর বেশী দেরী নেই। যদিও ধান উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ যথেষ্ট অগ্রসর হতে পারে নি। অবশ্য ধান্য উৎপাদনে আছে দারুণ জটিলতা। অধিক বৃষ্টিপাতের অঞ্চলের জন্য চাই একজাতের ধান, অল্প বৃষ্টিপাত অঞ্চলের জন্য আরেক জাতের ধান। তা ছাড়া গ্রীষ্মে এক জাতের ধান লাগালে শীতে চাই অন্য জাতের ধান। উঁচু বেলেমাটি অঞ্চলের ধান চলবে না কাদামাটিতে। এ ছাড়াও লবণাক্ত ভূমি, বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল, পাহাড়ী অঞ্চল, খরা অঞ্চল প্রভৃতির জন্য চাই ভিন্ন ভিন্ন জাতের ধান। উচ্চ উৎপাদনশীল ধান। ধান্যে পোকা-মাকড়ের উৎপাতও অন্য শস্যের চেয়ে বেশী। সুতরাং এই সব উপদ্রবের হাত থেকে উদ্ধার পেতে সরকারী প্রচেষ্টায় নানাবিধ উদ্যম কাজ করে চলেছে। চাষীরাও তাতে লাভবান হচ্ছেন।. সরকারও পাচ্ছেন প্রচুর ফসল। গবেষণা দ্বারা উদ্ভূত উন্নত ধরনের ধানের চাষে উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই আমাদের দেশ ন' মাস ধরে বাঙলাদেশের এক কোটি লোককে খেতে দিতে পেরেছিল উনিশ শ' একাত্তর-বাহাত্তর সনে। এই এক কোটি লোক পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকদের অত্যাচার, উৎপীড়ন, বর্বর আচরণ, দস্যুতা ও নৃশংসতার হাত থেকে উদ্ধার পাবার আশায় নিজ দেশ থেকে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিল এদেশে। তারপরেও ভারত ঘোষণা করতে পেরেছে ভারত খাদ্যে প্রায় স্বয়ম্ভর। সর্তাধীনে কোন দেশ থেকে ভারত আর খাদ্য আমদানী করবে না। ভারতের এই সবুজ-বিপ্লবে পশ্চিমবঙ্গ এখনও পিছিয়ে আছে, পশ্চিম বাঙলার চাষী ও কৃষিজীবী মানুষদের কাছে এটা দুঃখের সংবাদ বলেই তারা অপবাদ ঘোচাতে সচেষ্ট হয়েছে।

স্মরণীয়, ধান্য উৎপাদনের পশ্চাতে আছে শত শত বৎসরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, হাজার হাজার নরনারীর প্রচেষ্টা ও উদ্ভাবন ক্ষমতার স্পর্শ। একই দিনে পৃথিবীর অর্ধাংশ লোক ধান বা চালকে প্রধান খাদ্যরূপে গ্রহণ

করেনি, বা একই দিনে পৃথিবীর আড়াই শতাধিক নিযুত একর জমিতে ধানচাষ সুরু হয়নি। একদা মানুষ এই শস্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল, তখন ধান তাদের কাছে ছিল নিছক জঙ্গলের এক উদ্ভিদ। খাদ্য হিসাবে ধানের ব্যবহারেরও বহু পরে মানুষ যখন ধানের অপরিহার্যতা বুঝতে পারে তখন থেকেই ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালাতে থাকে সে নিজস্ব উপায় ও পদ্ধতি অনুসারে ধান্য উৎপাদন করতে। ক্রমাগত চেষ্টায় মানুষ ধান্য উৎপাদনের স্বকীয় পদ্ধতি আয়ত্ত করে। ধান্যের পূর্বে প্রায় সমস্ত প্রাচীন সভ্যতাবিশিষ্ট মানুষের প্রধান খাদ্য ছিল গম। গমের জমিকে চাষের উপযোগী করতে যে পরিশ্রমের প্রয়োজন তাতে সারা বৎসর শ্রমদানের দরকার হয় না। বৎসরের একটা সময় বহু লোকের কঠোর শ্রমের দরকার গম উৎপাদনে। তাই গমভোজী ও গম উৎপাদনকারী মানুষ ধান উৎপাদনকারী ধানভোজী মানুষদের অপেক্ষা জীবন পরিকল্পনায় বেশী অবসর পেয়েছে। এবং সে অবসরকে সে শিল্পকলাদির চর্চায় ব্যবহার করেছে। তাই মিশর, মধ্য-এশিয়া এবং ভারতবর্ষের সিন্ধু সভ্যতার মত সভ্যতাসমূহ গমকেন্দ্রিক। চীন, ইন্দোচীন, মালয়, বার্মা প্রভৃতি দেশের সভ্যতা গড়ে উঠেছে ধানকে নির্ভর করে। মায়া, অ্যাজটেক ও ইনকা সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ না হবার অন্যতম প্রধান কারণ মূল খাদ্য হিসাবে ভুট্টার ব্যবহার। ভুট্টা কোনক্রমেই গম বা ধানের সমগোত্রীয় নয়। খৃষ্টপূর্ব আড়াই তিন হাজার বৎসর পূর্বে এদেশে যে গমের ব্যবহার ছিল আজও সে গমের রুটির প্রচলন আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো থেকে প্রধানত তিন ধরণের গম ও এক ধরণের যব আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সময়ে কিছু কিছু ধানেরও ব্যবহার ছিল বলে অনেকে মনে করেন। অবশ্য সিন্ধু উপত্যকা থেকে সংগৃহীত পুরাসংগ্রহে এখনো ধান বা চাউল ব্যবহারের কোন প্রমাণ মেলেনি। গুজরাটের লোথালে পাওয়া ধানের চিহ্ন এবং ধানের খোসা সম্ভবত চাউলের প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গুজরাটের রঙপুর থেকেও ধানের নমুনা আবিষ্কৃত হয়েছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে এই ধান্যের ব্যবহার খৃষ্টপূর্ব দুই হাজার বৎসর পূর্বের। পশ্চিমবঙ্গের অজয় নদের দক্ষিণে পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত পুরা সামগ্রী এবং মঙ্গলকোটের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ঢিবিতে প্রাপ্ত পোড়াচাল পরীক্ষা করে কোন কোন পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করেছেন যে খৃষ্টপূর্ব দেড়হাজার বৎসরেরও পূর্বে ওখানে চাউলের ব্যবহার

ছিল। মধ্যভারতের নর্মদা নদীর উপকূলে নাভদাটেলি থেকে খৃষ্টপূর্ব এক হাজার বৎসরেরও পুরাতন পোড়াধানের অবশিষ্ট আবিষ্কৃত হয়েছে। হস্তিনাপুরে প্রাপ্ত পোড়াধানের অবশিষ্ট থেকেও প্রমাণিত হয়েছে যে একই সময়ে আর্যাবর্তেও চাউলের ব্যবহার হত। ঠিক কবে থেকে সারা দেশে চাউলের ব্যবহার আরম্ভ হয়ে যায় বা কবে থেকে ধান বঙ্গবাসীর অপরিহার্য খাদ্য সামগ্রীতে পরিণত হয় তা স্পষ্ট করে বলা না গেলেও অনুমান করা যেতে পারে যে অন্ততঃ সাড়ে তিনহাজার বৎসর ধরে বাঙালী ধানের চাষের মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে পেরেছে। বুদ্ধদেবের আমলে যে সারা ভারতবর্ষে চাউলের ব্যবহার ছিল তার সাক্ষ্য দিচ্ছে উজ্জয়িনী, পাটলিপুত্র, রোপাড়, নাগদা প্রভৃতি স্থান উৎখননে প্রাপ্ত পুরাসামগ্রী। তুর্কীস্থানের খোটানেও এই সময় চাউলের ব্যবহার ছিল বলে অনুমিত হয়। সম্ভবত ভারতবর্ষ থেকেই শস্যটির আমদানী হয় ওখানে। গ্রীক ঐতিহাসিকেরা বলেছেন যে ধান ছিল একান্তই ভারতবর্ষের নিজস্ব সম্পদ। যদিও একথা নিশ্চয় করে বলা যায় না যে কোন দেশ ধানের প্রকৃত জন্মস্থান। পুরাতন চীন-সাহিত্যে চাউলের যে উল্লেখ আছে তাই বোধহয় লিখিত উদাহরণের মধ্যে সর্বপ্রাচীন। তবুও সকলে ধানের জন্মস্থান



হিসাবে চীনকে গ্রহণ করতে রাজী নন। রুশ উদ্ভিদবিজ্ঞানী ভ্যাবিলব মনে করেন যে ধানের জন্মস্থান ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষ থেকে ধানের ব্যবহার চীনদেশে প্রসার লাভ করে। এই মতের স্বপক্ষে যুক্তি এই যে, যে জাতীয় ধান বর্তমানে চাষ করা হয় তার প্রায় সমগোত্রীয় ধান চীনে বেশী পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ নানা ধরণের বন্যজাতীয় শস্য যে অঞ্চলে অধিক

সংখ্যায় পাওয়া যায় সেই জায়গাকেই তার পর্যায়ভুক্ত চাষোপযোগী শস্যের জন্মভূমি বলে ধরা হয়ে থাকে। সারাবিশ্বে প্রায় পঁচিশ জাতের ধান পাওয়া যায় তার মধ্যে চাষ-উপযোগী ধানের সংখ্যা মাত্র দুটি। পৃথিবীতে যে ধরণের ধান এখন চাষ করা হয় তারা মাত্র তিন প্রকার বন্য ধানের সমগোত্রীয়। এই বন্যজাতীয় ধানের কিছু আফ্রিকায় উৎপন্ন হয়। তাছাড়া ভারতের মধ্যপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের চাষের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে বন্যধান জন্মে। এই বন্যধানের সঙ্গে চাষের ধানের অনেক সাদৃশ্য বর্তমান। এইসব বন্যধানই বর্তমানের কৃষি-উপযোগী ধানের নিকটতম পূর্বপুরুষ বলে কৃষিবিজ্ঞানীদের অভিমত। প্রাচীন পূজা-পার্বণে এই সব বন্যধানের প্রয়োজন হত এদেশে। সম্প্রতি অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানেও বন্যধান থেকে চাউল উৎপাদিত হয়ে চলেছে। ভারতের বিভিন্ন পূজা-উৎসবে বন্যধানের ব্যবহার থেকে মনে করা যেতে পারে যে ধানকে কৃষি-উপযোগী শস্য হিসাবে প্রথমে গ্রহণ করেন ভারতবাসীই।

সম্ভবতঃ দক্ষিণ ভারতেই চাউলের প্রথম ব্যবহার সুরু হয়। এখনো দক্ষিণ ও পূর্ব-ভারতে চাউলের প্রচলন বেশী। বন্যধান দক্ষিণ-ভারত ও উড়িষ্যায় প্রচুর পরিমাণে জন্মে। চাউল থেকে নানাপ্রকার খাদ্য তৈরী করার প্রচেষ্টা দক্ষিণ-ভারতীয়দের মধ্যে দেখা যায়। বাঙালীর পূজা-পার্বণে চাউল দিয়ে প্রস্তুত নানাবিধ সামগ্রী যথা চিড়া, মুড়ি, খই, পিঠা, পায়স বা চরু ব্যবহৃত হয়। চাউলের প্রসারে সিন্ধু সভ্যতার কোন দান আছে কি না আমরা জানি না। তবে এটা জানি যে ঋকৃবেদে ধানের স্পষ্ট কোন উল্লেখ নেই। মনে করা যেতে পারে যে ভারতে প্রবেশ করার পর আর্যেরা আদিম অধিবাসীদের নিকট থেকে চাউলের ব্যবহার শিখে নেয়। খ্রীষ্টপূর্ব আড়াই-তিন হাজার বৎসরের ঐতিহ্য নিয়ে চাউল এশিয়া ও আফ্রিকার সীমানা অতিক্রম করতে পেরেছে মাত্র মধ্যযুগে। মুসলমান আমলে মুরেরা ভারতবর্ষ থেকে চাউল স্পেনে পাঠায়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে স্পেন থেকে চাউল ইটালী যায়। ক্রমে মধ্য আমেরিকা ও ব্রাজিলে এবং অন্যান্য স্থানে চাউল ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, এশিয়া ছাড়া অন্য কোন দেশ এখনও চাউলকে প্রধান খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে নি।

বাঙলার সর্বশ্রেণীর জনগণের প্রধান ভোজ্যবস্তু ভাত। তাই 'হাঁড়িত ভাত নাহি, নিতি অবেশী'-ই বাঙালীর জীবনের সর্বাধিক দুঃখের কারণ। ভাত তৈরীর প্রক্রিয়া, চাউল উৎপাদনের প্রক্রিয়া, চাউলজাত অন্যান্য

খাদ্য সামগ্রীর প্রস্তুতির মধ্যে আছে বাঙালীর স্বাতন্ত্র্য। উদাহরণস্বরূপ ধান্য থেকে চাউল উৎপাদনের কথা বলা যেতে পারে। ভারতবাসী যে চাউল খায় সে চাউল আতপ। বাঙালী উচ্চবর্ণের হিন্দুর বিধবা ছাড়া বড় কেউ আতপ চাউল খায় না। খেতে চায় না। রেশনের যুগে শহরের বাঙালী বাধ্য হয়েই আতপ চাউল খায়। সাধারণত বাঙালী খায় সিদ্ধ চাউলের ভাত। বোধহয় পান্তা-ভাতের কথা মনে রেখেই বাঙালী সিদ্ধ চাউলের ভাত খাওয়া আরম্ভ করে। আতপ চাউলের পান্তাভাত অখাদ্য। এবং পান্তাভাত ব্যতীত লোক জীবন দুঃসহ। তাছাড়া ভাত পচিয়ে যে হাঁড়িয়া জাতীয় পানীয় প্রস্তুত করে বাঙলার প্রাকৃতজন, তা আতপ চাউলে হয় না। সম্ভবত এই কারণেই ধান্য উৎপাদনের জন্য চিন্তা, মনন ও নানা প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীকে সিদ্ধ চাউল উৎপন্ন করার কথা ভাবতে হয়েছে। ভাবতে হয়েছে চিড়া, মুড়ি, খই, পিঠা ইত্যাদির কথা। বাঙলার মুড়ি ভারতের অন্য কোনখানে বড় একটা পাওয়া যায় না। অন্যত্র যে মুড়ি পাওয়া যায় তাকে মুড়ি না বলে চাউল ভাজা বলাই যুক্তি সঙ্গত। পিঠা, পায়স, চিড়া প্রভৃতিতেও আছে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য। বৈশিষ্ট্য আছে ভাত তৈরীতে, খিচুরী রান্নায় ও অন্যান্য চাউল জাতীয় সামগ্রী তৈরীতে। প্রাকৃত বাঙালী আহার্য—'ওগ্‌গরা ভত্তা গাইক ঘিত্তা'—গো-ঘৃত সহযোগে সফেন গরমভাত কলাপাতায় করে খাওয়া হত। এই ভাতই তার জীবন। ধান উৎপাদনের জন্য তাই ব্যাপক প্রচেষ্টা। ভাত ছাড়া ধানের আরও নানাভাবে ব্যবহার আছে। কৃষিকে কেন্দ্র করে, ধান্যকে কেন্দ্র করে নানাবিধ উৎসব-অনুষ্ঠান গড়ে উঠেছে বাঙলায়। ধান বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় পঞ্চশস্যের অন্যতম পবিত্র ও মাঙ্গলিক দ্রব্য। দেবপূজায় ঘটের নীচে ধানের প্রয়োজন। প্রয়োজন লক্ষ্মীপূজায় লক্ষ্মীর আসনে ধানের। ধান্যাঙ্কুরযুক্ত স্থানে কার্তিক পূজা করার বিধান। মাটির সরায় ধানের চারা গজায়, সরাসহ গজান ধানাঙ্কুর কার্তিক ঠাকুরের পাশে রাখা হয়। বিভিন্ন ব্রতে, গৃহপ্রবেশে, বরণে, আশীর্বাদে, যমপুকুর, ইতু, গার্সি, লক্ষ্মী প্রভৃতি ব্রতে এমন কি দুর্গা ইত্যাদি পূজায় সর্বত্রই ধান্যের প্রয়োজন। তাই প্রাকৃতজনের মনে ধানের প্রাচুর্যে উল্লাস, অপ্রতুলতায় নৈরাশ্য। ধানের উৎপাদন কম হলে আমাদের সরকারকে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়তে হয় দেশবাসীর ক্ষুন্নি-বৃত্তির কথা চিন্তা করে।

ধান্য বা কৃষির মূলে জমি। মাটি। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম উত্তর প্রান্ত ছাড়া অন্যত্র মাটির বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নেই। পশ্চিমপ্রান্ত ব্যতীত ভূগর্ভস্থ জল সাধারণত সমস্তরে বিদ্যমান। জমি নিম্ন বা উচ্চ, পাহাড়ী বা সমতল, জমি যে স্থানে অবস্থিত সেস্থানের ঋতু-প্রকৃতি কিরূপ তা না জেনে চাষ-বাস করা যায় না। বর্ধমানের পশ্চিমাংশের অনেকস্থানে বৃষ্টি তাপ বায়ু প্রভৃতির প্রভাবে শিলা থেকে সরাসরি মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়েছে, পূর্বাঞ্চলের অনেক মাটিতে প্রচুর ধান ও আখ জন্মায়। এ মাটি জলে কাদা, রোদে পাথরের মত শক্ত। আবাদী অঞ্চলের বেশীর ভাগ জমিই নিম্নভূমি এবং নদীবাহিত পলিদ্বারা গঠিত। প্রতি বর্ষায় জমিতে পলির নতুন প্রলেপ পড়ায় বিনা সারে শীত ও বসন্তের শস্য—ডাল, গম, যব, তৈলবীজ ও তরিতরকারী জন্মায়। কৃষকের কাছে নদীতীরের এ জমির বিশেষ সমাদর। বীরভূমের মেটেল মাটিতে নানাবিধ ধান, আখ, গম, ছোলা, কলাই প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। নদীর খাতে ও প্লাবন অঞ্চলে পলি জন্মে। পলিতে বিনা সেচে রবিশস্য জন্মে। মৃৎশিল্পের মাটি এখান থেকে সরবরাহ করা হয়। বাঁকুড়ার ডাঙ্গামাটিতে আউশ ধান, ভুট্টা ও রবিশস্য জন্মে। এখানকার নিম্নভূমি ও উপত্যকার মৃত্তিকা সাধারণত উর্বর। মেদিনীপুরের এঁটেল মাটিও পলি অঞ্চলের মাটি অপেক্ষা উর্বরতায় হীন। কুশ মাটি সমুদ্রের ধারে ও সমুদ্রের জোয়ার আসে। এরূপ মাটি নদী ও খালের পারে দেখা যায়। লবণভরা মাটি চাষের অযোগ্য। পলিমাটি এবং খড়ি মাটিতে প্রচুর ধান্য ও অন্যান্য শস্য উৎপন্ন



হয়। হুগলীর গোঘাটের ল্যাটেরাইট ও কঙ্কর মিশ্রিত জল ছাড়া সর্বত্র পলিমাটি। উত্তরদিকে খানিক এঁটেল আর খানিক মোটা লাল মাটি। হাওড়ার সর্বত্র পলিমাটি। চব্বিশ পরগণার মাটি নানা প্রকার। মেটেল, দোআঁশ, বেলে এবং নোনা। সুন্দরবনের একমাত্র শস্য আমন ধান। কালান্তর অঞ্চল, করিমপুকুর থানা এবং রানাঘাট

মহকুমার কোন কোন অঞ্চল ছাড়া নদীয়া জেলার সর্বত্র হালকা বেলে দোআঁশ মাটি। মুর্শিদাবাদের পলিভূমি খুব উর্বর। আউশ ধান ও পাট উঠে গেলে শীতকালের রবিশস্য উৎপন্ন হয়। রাঢ় অঞ্চলের শক্ত মাটির প্রধান শস্য আমন ধান। মালদহের দক্ষিণাঞ্চলের গঙ্গার পলি অতিশয় উর্বরা। অধিকাংশ স্থানেই দুই প্রস্থ ফসল ফলে। পশ্চিম দিনাজপুরের মাটি ছাইরঙা, বেলে ও দোআঁশ। এ জেলার দক্ষিণের মাটির নাম খিয়র, খিয়র সাধারণতঃ এক ফসলা। জলপাইগুড়ির অধিকাংশ জমিই পলি আবৃত। এখানকার মাটি ইট ও মাটির দ্রব্যাদি নির্মাণের পক্ষে উত্তম। দার্জিলিঙ-এর তরাই অঞ্চলে পলি-গঠিত হালকা বেলে দোআঁশ মাটি। কোচবিহারের দোআঁশ মাটিও পলি-গঠিত। পুরুলিয়ার দোআঁশ মাটি কোথাও উর্বর কোথাও কাঁকরে। কাঁকরে-মাটির উৎপাদিকা শক্তি সামান্য। কৃষক সাধারণত পাথুরে, বালি, উষর, লবণাক্ত জমি পরিত্যাগ করার চেষ্টা করে; কারণ এই সব জমি কার্যোপযোগী করে তুলতে প্রচুর শ্রম, অর্থ ও সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু সকলের ভাগ্যে দোআঁশ ও উর্বর জমি জোটে না। উর্বর এবং দোআঁশ জমিও পর্যায়ক্রমে চাষে তার উর্বরতা হারায়। তাছাড়া সমস্ত প্রকার জমির উর্বরতা নির্ভর করে জলের উপর। পরিকল্পিত অর্থনীতিতেও আমাদের সরকার এখনও জল-সেচের ব্যবস্থা করে উঠতে না পারার দরুণ বৃষ্টির উপরই নির্ভর করতে হয় কৃষককে ফসলের জন্য।

তাই অনাবৃষ্টির সময়ে কৃষককুলে হাহাকার ওঠে। অনাবৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অতিবৃষ্টিও একটা সমস্যা। অতিবৃষ্টি বা প্লাবনে আসে মহামারী, চরম বিপর্যয়। পরিকল্পিত শাসনে তাই একদিকে যেমন চলেছে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি থেকে উদ্ধার পাবার জন্য বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা; অন্যদিকে তেমনি সমানে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে যাদু ও ইন্দ্রজাল বৃষ্টি থামাতে, বৃষ্টি নামাতে। সুতরাং পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের অনেক গাঁয়ের মেয়ে বর্ষা-আহ্বানে তৎপর। গাঁয়ের বয়োজ্যেষ্ঠা ব্রাহ্মণী সহ যাবতীয় কৃষিসামগ্রী এবং হুঁকো নিয়ে মাঠে গিয়ে নানা প্রকার দেবদেবীর আরাধনা করেন তাঁরা। সূর্য, ইন্দ্র, বরুণ, শচীমাতা, পবন, ধর্মঠাকুর, বাঁকুড়ারায়, বাসুদেব, পোড়ামা, গোষ্ঠ, এমন কি অনেক স্থানে লক্ষ্মীর পূজাও হয়। অনেক সময় শিব এবং দুর্গার কাছেও প্রার্থনা জানানো হয় বর্ষার জন্য। এই সব অনুষ্ঠানে সঙ্গীয় মেয়েরা হাতজোড় করে বসে অনুষ্ঠিত আচরণ প্রত্যক্ষ করেন। পূজা করেন ব্রাহ্মণী। পূজা অন্তে জলঅচল সমাজের তিনজন স্ত্রীলোককে অনাবৃত করে ফেলা হয়।

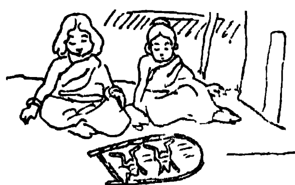
তাদের একজনকে মাঠের উপর চিত করে শুইয়ে দেওয়া হয় এবং অপর দু' জন তার সর্বাঙ্গে বৃষ্টির ফোঁটার মত করে জল ছিটিয়ে দেয়। বৃষ্টির অনুকরণে জলসিঞ্চনে তার অঙ্গ ভিজে যায়। এই অনুষ্ঠানে নাকি বৃষ্টি হয়ই।

বৃষ্টি নামাবার আর একটি অনুষ্ঠান ভাঁজো পূজা। 'ভাঁজে লো কলকলানী মাটির লো সরা' বলে নানাবয়সী নারী গান গায় বর্ষা আহ্বানে। ইন্দ্র পূজার পর আট দিন ধরে হয় এ অনুষ্ঠান রাঢ়ের বিভিন্ন স্থানে। গৃহস্থের বাড়ী থেকে ভিক্ষে করে আনা হয় চাল, ডাল, তেল, নারকেল প্রভৃতি। ভাঁজুই মায়ের জাগরণের দিনে সমস্ত গ্রামবাসী উপবাসান্তে একত্রিত হয়ে পুকুর-স্নান করেন। স্নানান্তে পুকুর থেকে এক কলসী ভর্তি জল আনা হয়। আসার সময় ঢাক, কাঁসি, ধূপধুনা, শালুকের মালা, সিঁদুর ও পূজার অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে উপবাসী স্ত্রীলোকেরা ভাঁজুই মাকে অনুসরণ করেন। যাঁর মাথায় বারি বা জলভর্তি কলসী তাঁর ভর নামে। সকলে বারির উপর ফুল রাখেন। এইফুল বারি থেকে আপনা হতে গড়িয়ে ভর পাওয়া মহিলার হাতে পড়লে বোঝা যাবে ভাঁজুই মা এসেছেন। এই অনুষ্ঠানে নানাপ্রকার গান গাওয়া হয়। সে গানের বিষয় বস্তু হচ্ছে ইন্দ্রের চরিত্রহীনতার কথা। ইন্দ্রের চরিত্রহীনতার জন্য বৃষ্টি হচ্ছে না, তাই গান ও আচরণের মারফৎ ইন্দ্রকে অপমানিত করা হয়। ইন্দ্র তখন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে বৃষ্টি প্রেরণ করেন। গানের নমুনা—'শালুক ডাঁটার ঘর করিলাম নেকের পেকের করে। কাল আনলাম পরের বেটি, ও লাজের মাথা খাও, জলে ভিজে মরে॥ কাঁতরা ভেঙে শাক বুনলাম শাক দলমল করে। শাক বেচে শেঁকা পেলাম সতীন কেঁদে মরে। ও লাজের মাথা খাও॥ মোড়লের বাড়ীতে ওল ফুলল্ছে, খেয়েছে কি না খেয়েছে। ও লাজের মাথা খাও, গলা লেগেছে॥ আম ধরে থোকা থোকা তেঁতুল ধরে বেঁকা, হায় হায় তেঁতুল ধরে বেঁকা। নামাল দেশে দেখে এলাম, ও লাজের মাথা খাও, রাঁড়ীর হাতে শেঁকা॥ মোড়লের বাড়িতে ভাই শত নুড়ি আকড়া, মোল্লানকে কাঁধে নিয়ে, ও লাজের মাথা খাও, মোড়ল বাজায় নাকরা॥ বেউল বাঁশে বাঁকখান তেউর লতার শিকে। কেষ্টর কাঁধে ভার দিয়ে চলিল বাঁধিকে ও লাজের মাথা খাও। ভাঁজুই লো সুন্দরী মাটির লো সরা। আমার ভাঁজুইকে দেবো ও মজার আচ্ছা বেশ, পঞ্চ ফুলের মালা। ও লাজের মাথা খাও॥ ও পারের নিমগাছটি নিম ঝলমল করে। ছোট্ট ঠাকুরের কোঁচা দেখে, ও লাজের মাথা খাও। মন ছটফট করে। আলুন্দার বিলেরে ভাই বগাবগি চড়ে। শচী মাতার দুঃখ দেখে মন ছটফট করে॥' এ গানে যৌন মিলনের

কামনাবাসনার কথা প্রতিধ্বনিত। মিলনের কামনা সন্তানের কামনা, উর্বরতার কামনা ও বৃষ্টির কামনা। সব মিলিয়ে সুন্দর জীবনের কামনা। বৃষ্টির অভাবে জীবন সে সৌন্দর্য হারায়। সুতরাং বৃষ্টির অভাবে কৃষাণ মেয়েরা মেঘারাণীর কুলা নামায় বাঙলার নানাস্থানে।

বীরভূমের নানাস্থানে বৃষ্টির জন্য জুড়ীর অনুষ্ঠানও হয়। এই অনুষ্ঠানের জন্য সারা গাঁয়ের মানুষ একত্রিত হয়ে অনুষ্ঠানের দিন ধার্য করে। নির্ধারিত দিনে গ্রামবাসী এবং নির্বাচিত পুরোহিতগণ আদিনাথ মন্দিরের কাছে জলাশয়ে বুকসমান জলে নেমে বরুণদেবের নাম সঙ্কীর্তন করেন। একশ আটটি মাটির কলসী জলপূর্ণ করে শিবকুণ্ডে ফেলে দেন। তারপর হোমযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।

বাঙলার নানাস্থানে বৃষ্টির জন্য মেঘারাণীর কুলা নামান হয়। কুলা, জলঘট নিয়ে কৃষক মেয়েরা, বউরা বাড়ী বাড়ী যায়, গান গায়, নাচে। জল ঢেলে দেয় উঠানের মাঝে বা ঘরের চালের উপর দিয়ে বৃষ্টির মত করে জল ছিটায়। বেঙ্গাবেঙ্গির বিয়ে হয়। গান গাওয়া হয়—'বেঙা ছেড়ীর বিয়া। সোনার লাডুম দিয়া। বেঙী লো মেঘ লামাইয়া দে। মোড়লের বউ-এর দাঁত খোঁটা। মেঘ পড়ে ফোঁটা ফোঁটা। একছিটা পানি দেও ঘরে ভিজ্যা যাই। বেঙী লা মেঘ লামাইয়া দে। কালামেঘা ধলামেঘা তোমরা দুটি ভাই। একফোঁটা জল দাও সাইলের ভাত খাই। ঘরে ভিজ্যা যাই। বেঙীলো মেঘ লামাইয়া দে। চাচামিঞা কান্দন করে ক্ষেতের আইলে বইয়া। ক্ষেত খলা বিরাণ অইল জল না পাইয়া। বেঙী লো মেঘ নামাইয়া দে।'
ছোটছোট ছেলেমেয়েরাও ছড়া কাটে—'ঠাকুরদাদার ভাঙ্গা ঘর। বিষ্টি নামে আড়াইফর। ঠাকুরদা ওভাই। ছিটি ছিটি জল দেরে ঝাপ্পুরি খেলাই।



চিনা খ্যাতে চিন্‌চিনানি, ধান খ্যাতে আড়ুপানি। ঠাকুরদারে ভাই। আড়াই ফুট জল দেও নাইয়া ধুইয়া যাই। শরীলটা জুড়াই।' ছিটে ফোঁটা জল যখন ওদের গায়ে পড়ে তখন বলে—'বিষ্টি পড়ে ফোঁটা ফোঁটা। ঠাকুরদার প্যাটটা মোটা' ইত্যাদি ছড়া বলে হাসে, নাচে, গান গায়।

এই ভাবে হয়ত ধারা বৃষ্টি নামে। থামতে চায় না সে বৃষ্টি। চারদিকে

যখন ঝুমঝুম বর্ষা, সকলে ঘরের প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ, তখন বা অন্য সময়ে গ্রামের কিশোরীরা দেয় পুতুলের বিয়ে। পুতুল বিয়ের মাধ্যমে নিজেদের বিয়ের কথাই ঘোষিত এই অনুষ্ঠানে। পুতুল বিয়ে কিশোরীদের অনুষ্ঠান হলেও প্রৌঢ়ারাও এতে যোগদান করতে পারেন। সাধারণত পুতুলের বিয়ে হয় কোন্ পুকুর পাড়ে বা বাড়ীর চাতালে। সেখানে পুকুরের ন্যায় ছোট গর্ত করে, তার চারপাশে পোঁতা হয় চারটি কলাগাছ। গর্তের চারপাশে আল বেঁধে আলের উপর চুনের, হলুদের ফোঁটায় চিত্রিত করা হয়। কোনও কোনও জায়গায় দেওয়া হয় আলপনা। আলের ওপর দুটি পুতুল সাজ পোষাকে সজ্জিত করে গর্তের পাশে রাখা হয়। কিশোরীরা দলবেঁধে কুলায় কিছু ধান, দূর্বা, জলভর্তি ঘট, আম্রপল্লব প্রভৃতি নিয়ে গান গায় আর চাল ডাল মাগে। তারপর সকলে সেই পুকুরের পাড়ে আসে, এসে মেগে আনা চাল-ডাল তরিতরকারী রাঁধে, বিবাহের ভোজ খায়। সঙ্গে সঙ্গে চলে গান। ধারা বৃষ্টির সময় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যে পুতুল বিয়ে দেয় তা দেওয়া হয় ঘরের এক কোণে অথবা বিছানার উপর। এ বিয়ে একটা খেলা। কিন্তু অনাবৃষ্টির হাত থেকে উদ্ধার পেতেও পুতুল বিয়ে হয়। সেই বিয়েতে নানাবিধ আচরণ ও গান গীত হয়। এই সব গানের একটি নমুনা—'পুতলারে যাইবে পরের ঘরে। ভাডির দেশ'অ মেঘ নাই, গোছল করবার পানি নাই, পুতলারে যাইবে পরের ঘরে। ভাডির দেশে'অ মেঘ নাই, বাসুন ধইবার পানি নাই, পুতলারে যাইবে পরের ঘর। ভাডির দেশ'অ মেঘ নাই, ছিপি ধইবার পানি নাই, পুতলারে যাইবে পরের ঘরে। ভাডির দেশ'অ মেঘ নাই, পাইলা ধুইবার পানি নাই, পুতলারে যাইব পরের ঘরে।' ইত্যাদি। অন্য সময়ে যে পুতুলের বিয়ে হয় তার গান আলাদা। যেমন—'পুতলারে মায়ে কান্দে গো পুতলা কোলে লইয়া, অতই দয়ার পুতলা গো কেমনে দিয়াম বিয়্যা। পুতলার চাচীয়ে কান্দে গো, পুতলা কোলে লইয়া, অতই সুন্দর পুতলা গো কেমনে দিবাম বিয়্যা। পুতলার ভইনে কান্দে গো, পুতলা কাঁহে লইয়া। অতই আদরের পুতলাগো কেমনে দিবাম বিয়্যা...পরের ঘরে ধান নাই, বুর ক্ষেতে আশা নাই, পুতলা যাইব পরের ঘরে। দিনে লইল আওলী বাওলী, আশমান আইল হাইজ্যা, পরের ঘরে যায় গো পুতলা, মাফার মাইঝে ভিইজ্যা, পুতলা যাইব পরের ঘরে।' বৃষ্টি কামনায় অথবা বৃষ্টির জন্য বন্দী অলস সময় কাটাতে ও খেলাচ্ছলে পুতুল বিয়ে সারা বাঙলায় জনপ্রিয়।

বৃষ্টির কামনায় ব্যাঙ বিয়ার গান—"কিলো ব্যাঙ মেঘ দিছ না কিয়া"

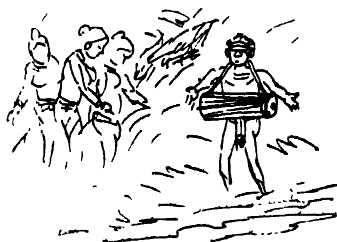
এ অভিযোগ গানের ছত্রে ছত্রে। ব্যাঙ বর্ষা না পাঠাবার জন্যই বেঙ্গীর ভাগ্যে জোটে ভাঙা পাল্কী। ব্যাঙের বিয়ের একটি গানের নমুনা–'বেঙ্গের ঝির বিয়া গো, গিরস্থের অলদী দিয়্যা, ও বেঙ্গি মেঘ দেছ না কেয়্যা। বেঙ্গের ঝির বিয়া গো, আফন মেন্দীর পাতা দিয়্যা, ও বেঙ্গি মেঘ দেছ না কেয়্যা। বেঙ্গের ঝির বিয়া গো, ডুমুরের কুলা দিয়্যা, ও বেঙ্গি মেঘ দেছ না কেয়্যা। বেঙ্গের ঝির বিয়া গো, আবের কাকই দিয়া, ও বেঙ্গি মেঘ দেছ না কেয়্যা। বেঙ্গের ঝির বিয়া গো, আবের আয়না দিয়্যা, ও বেঙ্গি মেঘ দেছ না কেয়্যা। বেঙ্গের ঝির বিয়া গো, বাদাম তেল দিয়্যা, ও বেঙ্গি ম্যাঘ দেছ না কেয়্যা। বেঙ্গের ঝির বিয়া গো, জলে ভাসার সাবান দিয়্যা, ও বেঙ্গি মেঘ দেছ না কেয়্যা। বেঙ্গের ঝির বিয়া গো, রেশমী রুমাল দিয়া, ও বেঙ্গি মেঘ দেছ না ক্যায়া। বেঙ্গের ঝির বিয়া গো, মাথার ছিহল দিয়া, ও বেঙ্গি মেঘ দেছ না কেয়্যা। বেঙ্গের ঝির বিয়া গো, নাকের লুলুক দিয়্যা, ও বেঙ্গি মেঘ দেছনা কেয়্যা। বেঙ্গের ঝির বিয়া গো, গলার আঁসলী দিয়্যা, ও বেঙ্গি মেঘ দেছ না কেয়্যা। বেঙ্গের ঝির বিয়া গো, ডেনার বাজু দিয়্যা, ও বেঙ্গি মেঘ দেছ না কেয়্যা। বেঙ্গের ঝির বিয়া গো, আতের বইল্যা দিয়্যা, ও বেঙ্গি মেঘ দেছ না কেয়্যা। বেঙ্গের ঝির বিয়া গো, পায়ের খাউরা দিয়্যা, ও বেঙ্গি মেঘ দেছ না কেয়্যা। বেঙ্গের ঝির বিয়া গো, গা'র সেমিজ দিয়া, ও বেঙ্গি মেঘ দেছ না কেয়্যা। বেঙ্গের ঝির বিয়া গো, বোম্বাই শাড়ী দিয়া, ও বেঙ্গি মেঘ দেছ না কেয়্যা। বেঙ্গের ঝির বিয়া গো, পায়ের জুতা দিয়্যা, ও বেঙ্গি মেঘ দেছ না কেয়্যা। বেঙ্গের ঝির বিয়া গো, আবের মুড়ুক দিয়্যা, ও বেঙ্গি মেঘ দেছ না কেয়্যা। দিনে হাজ করছে রে— আইর‍্যা কোণা দিয়্যা, ও বেঙ্গি মেঘ দেছ না কেয়্যা। হগল মেঘ চাইল্যা দিলাম, বুর জমিন দিয়্যা, ও বেঙ্গি মেঘ দেছ না কেয়্যা। এক ছিডা মেঘের লাইগ্যা, গিরছ মরে কাইন্দা, ও বেঙ্গি মেঘ দেছ না কেয়্যা। বর্ষার জন্য মেয়েদের নানাবিধ আচরণের মধ্যে আছে বর্ষণের দেবতাকে তোষামোদ, আছে বর্ষণের দেবতাকে কটুক্তি ও অপমানিত করার চেষ্টা। তোষামোদে তুষ্ট হয়ে অথবা কটুক্তি ও অপমান সইতে না পেরে বর্ষণের দেবতা বৃষ্টি পাঠান। ধরিত্রী ফল, ফুল, শস্য ও পুষ্পে পূর্ণ হয়ে হেসে ওঠেন। বর্ষার বৃষ্টি, শরৎ, হেমন্তেও থাকে। শীত এসে গেলে বৃষ্টির প্রয়োজন নেই। বৃষ্টি তখন ঘরে ঘরে ফসল তোলার, ফসল কাটার কাজে বাধা স্বরূপ।

অনাবৃষ্টির হাত থেকে উদ্ধার পেতে নানাবিধ ব্রতানুষ্ঠানও করে থাকেন বাঙলার মেয়েরা। বিজ্ঞানের অগ্রগতি সত্ত্বেও এসব সমান জনপ্রিয়। বৃষ্টির

কামনায় যে বসুধারাব্রত তার আলপনায় আটটি তারা আঁকতে হয়। একটি মাটির ঘট ফুটো করে বৃষ্টির অনুকরণে গাছের মাথা থেকে জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের পূর্বেই এই জল সঞ্চিত করে রাখা হয় কোন একটি পাত্রে। কামনা করা হয়—'গঙ্গা গঙ্গা ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ বাসুকি। তিনকূল ভরে দাও ধনে জনে সুখী।' তাই আট তারা বা অষ্টবসুকে সাক্ষী রেখে ব্রতিনী বলে—'অষ্টবসু অষ্ট তারা তোমরা হলে সাক্ষী। আট দিকে আট ফল আমরা রাখি। অষ্টবসু অষ্ট তারা তোমরা হলে সাক্ষী। আট দিকে আট ফুল আমরা রাখি।' ইত্যাদি।

এই বৃষ্টি নামাতে বা থামাতে পীরের দরগায় শিন্নি মানত করা হয়। চেরাগ জ্বালান হয়। গান গাওয়া হয়—'আসমানেতে নাই রে পানি (এ আল্লা)। খন্দের দশা দেইখ্যা কান্দে সোনা মিঞার নানী।'

প্রকৃতিকে ধরিত্রীদেবী এবং বৃষ্টির দেবতা বরুণ ইত্যাদিকে ধরিত্রীর বর রূপে কল্পনা করা হয় অনেক ক্ষেত্রে। বৃষ্টিদেব ধরিত্রীদেবীর সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন না বলেই অনাবৃষ্টি। বৃষ্টি হচ্ছে বীজ। এই বীজ পেলে তবেই ধরিত্রীদেবী অন্তঃসত্ত্বা হতে পারেন। ফসল ফলাতে বা সন্তান প্রসব করতে পারেন। তাই পৃথিবীর সমস্ত আদিম মানুষ ধরিত্রীদেবীর প্রতীক হিসাবে যুবতীদের অনাবৃত করে নাচগানের আসর জমিয়েছে বরুণাদিদেবকে তৃপ্তি দিতে। বৃষ্টিদেবকে নানাভাবে আবেদন জানান হয় সম্পূর্ণ অনাবৃত মহিলাদের সঙ্গে মিলিত হতে। হুদমা অনুষ্ঠানের—হিল্ হিলয়াছে কমরটা মোর শির শিরায়ছে



গাও। কোন্ঠে কিনা গেইলে এলা হুদমার দ্যাখা পাঁও। পটানখান পড়ছে খসিয়া। হুদমা দেখা দ্যাও গে আসিয়া। আইসক রে হুদমা দেওয়া, তোর বাদে মই আছ বসিয়া। ভাঙ সোল সোল কমরটা। তাতে নাই মোর ভাতারটা। কঁরো কি মুই কাঁয়বা কয়। কোন্ঠে গ্যালে দেখা হয়। দ্যাখা হলে দেহটা কুড়ায়। আইসেক রে হুদমা দেওতা, তোর বাদে মই আছ ও

বসিয়া। কণ্ঠে গ্যালে কণ্ঠে পাইম'। এ মিলনের মধ্যে দেহসুখ উপভোগ করার চেয়ে ফসল ফলানোর আর্তিই প্রকাশিত। এই ধরনের অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে যে মনোবেদনা প্রকাশিত তা হৃদয়গ্রাহী। অর্থাৎ 'হাড় কট্ কট্ হাড় কট্ কট প্রাণ কট্ কট্ করে। সেই যে গেছে সেই মানুষডা আর আসে নি ঘরে॥ হাত টন্ টন্ মাথা টন্ টন্ মন টন্ টন্ করে। কবে আমার প্রাণের মানুষ আসবে আমার ঘরে॥ ঘুম হয় না ঘুম হয় না বালিশ মাথায় দিয়ে। আসবে কবে রাত পোয়ালি যাবে আমায় নিয়ে'॥ মনের কামনা বাসনার কথা সুন্দর ও চমৎকারভাবে তুলে ধরেছে অন্তর্বেদনাহত নারী। সে তার দমিত হৃদয়ের করুণ-কাহিনী, প্রিয়-মিলনের আকাঙ্ক্ষা সোজাসুজিই ব্যক্ত করেছে। বলেছে—'বউ কথা কও বউ কথা কও সুখ নেই আর মনে। কাঁচা বউ ঘরে ফেলে আছে কোন প্রাণে॥ গীষ্ম গেল বর্ষা গেল এলোনা তো ঘরে। শীত কাটাতে রাতের কালে মনের মধ্যে কেমন কেমন করে॥ পাখি যদি আমার হও এক্ষুণি উড়িয়া যাও। পাষাণডারে কও গিয়া ঘরে ফির্যা যাইও॥ চোখের জলে বুক ভেসে যায় আর তো বাঁচি না। মনের মধ্যে কেমন করে সইতে পারি না। এ্যামন যদি পাষাণ হৃদয় বিয়ে করল্যা ক্যান? চিন্তায় চিন্তায় রাইত কাইটে যায় এবার যাবে প্রাণও। এমনি পাষাণ ক্যান?' এ সবই মিলনের আহ্বান। এ ছাড়া আরও সমাজ জীবনের নানাপ্রকার চিত্র পাওয়া নারী সঙ্গীতে। অনেক সময় রঙ্গ রসিকতাও অনুষ্ঠিত হয়। অনেক সময় বলা হয়—'ইচুনী বিচুনী চাইল কাঁড়নী মাসী গো। মামা আইছে ঘামাইয়া। ছাতি ধর নামাইয়া। ছাতির উপর কদমফুল। মুচকি হাসে মেহের কুল। মেহের কুইল্যার ভাঙাঘর। বেড়া দিয়া বগা ধর। ধরছি বগা, জবাই কর। দাওতো বোতা। মেহের কুইল্যারে হোতা।' প্রসঙ্গত আরও একটি মেয়েলী সঙ্গীত স্মরণ করছি। সঙ্গীতটি হচ্ছে—'তোমাকে না বলি মামানি, মামু কোথায় গিয়াছে রে। সুন্দর অ মোর মামানি রে, তোমার মামু গিয়াছে ভাগিনা, দূরের বাণিজ্যে রে। সুন্দর অ মোর ভাগিনা রে, মামু গিয়াছে ভালই হইচে, মামু থাকলে ভাত খাইতে রে। সুন্দর অ মোর ভাগিনা রে, তোমাকে না বলি মামানি। মামু গেছে ভালই হইচে, মামুর বাটার পান খাইব রে। সুন্দর অ মোর মামানি রে, তোমাকে না বলি মামানি, মামু গেছে ভালই হইচে, ফর্সি হুঁকা খাইব রে। সুন্দর অ মোর মামানি রে, তোমাকে না বলি মামানি, মামু গেছে ভালই হইচে, পালঙ্কে শুইব রে। সুন্দর অ মোর মামানি রে, দেউরিতই না রাখিব ভাগিনা, বিলাতের আনা কুকুর রে। পাগলা

অ মোর ভাগিনারে, ওইনা কুকুরে বশ মানাইব মামানি, পাতের ভাত দিয়া রে। সুন্দর অ মোর মামানি রে, ওধারে পাহারা দিতেছে গরমেন্টের পুলিশ রে। পাগলা ও মোর ভাগিনা রে, ওইনা পুলিশ মানাবো মামানি শয়েক টাকা দিয়া রে। ওই না পুলিশ মানাবো মামানি হাজার টাকা দিয়া রে। পাগলা অ মোর মামানি রে।' মামী-ভাগ্নে গোপন মিলনের ইচ্ছা প্রকাশের সঙ্গে বৃষ্টিদেব বরুণদেবের সঙ্গে রাজবংশী মেয়েদের মিলনের বাসনার কারণ ভিন্ন। বরুণদেবকে যারা ডাকছে তারা বলছে, আমার স্বামী বাড়ী নেই, আমার শরীর শির শির করছে, কোমর কটকট করছে, বসন সব খসে পড়েছে, গা দিয়ে আগুন বের হচ্ছে, হে বরুণ তুমি এস, আমি সম্পূর্ণ অনাবৃত হয়ে এসেছি তোমার সঙ্গে মিলিত হতে। আর এখানে মামার অবর্তমানে মামী-ভাগ্নের মিলনের বাসনা প্রতিফলিত। হিরালী শিরালী, ভোগ, প্রভৃতিও অনুষ্ঠিত হয় বর্ষা আহ্বানে। খেঁকশিয়ালের বিয়েও অনুষ্ঠিত হয়। 'উপরদেশে জল হইল। নামো দেশে জল নাই। বাদ বেইহেড় সুকি গোয়ালা' রাঢ়দেশে এ ধরণের গান প্রায়ই শোনা যায়। শোনা যায় এ অঞ্চলের ভল্লা ধাঙরদের গান—'কালো মেঘ আড়াল হ'তে ওলো। কার হাসি ফুটিল ফুটিল লো। মাঠে ঘাটে জল নাই ডাঙ্গাতে হ'ল সাঁতার। কাজলা মেঘে আড়াল হতে ওলো, কার হাসি ফুটিল।' আদিবাসী সম্প্রদায় গান গায়—'সাহার দিলাম গোবর দিলাম কি ধান পুঁতলি। কি ধান পুঁতে লাগে লা, মা বল হে রেষ্টমনি ধান রে, বারহা বলে রৌলে ধান, কেরি কান্দার ধান'।

প্রকৃতির শক্তির কাছে মানুষ অসহায়, দুর্বল। তবুও সে চায় অলৌকিক শক্তির অধিকারী হতে। ইন্দ্রজাল মানুষকে সেই আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক শক্তি অধিকারের প্রতিশ্রুতি দেয়। নানাভাবে ও নানাপ্রকারে যাদুবিশ্বাস বাঙালী জীবনকে ঘিরে রেখেছে। উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য তাই সে প্রতিপালন করে নানাবিধ যাদুক্রিয়া। এই যাদুক্রিয়ায় মত্ত হয়ে অনেক সময় আদিম কৃষি-সমাজের স্ত্রীলোকেরা এক অভিনব প্রক্রিয়ায় হল কর্ষণ করত। বৃষ্টির আহ্বানে রোদেফাটা মাঠে পূর্ব নির্বাচিত তিনটি মেয়ে সম্পূর্ণ অনাবৃত অবস্থায় যেত। মাঠে ওদের তিনজনের দু'জনে গরুর বদলে হালে যায়, এবং তৃতীয় জন হল চালনা করে। হল চালনা করার সময় বরুণদেবের কাছে তৃষ্ণার জল, ক্ষুধার আহার্য পেতে চায় তারা। তখন যার জমিতে চাষ করা হচ্ছে সেই জমির মালিক, চাষী ও গ্রাম-প্রধান খাদ্য ও জল নিয়ে ওদের কাছে আসে। খাদ্যদ্রব্য ও জল দেয়। এবং পরে ওদের তিন জনের সঙ্গে তাদের দেহ-মিলন ঘটায়। এ

নুষ্ঠানের পর বেশাচ্ছাদিত হয়ে মেয়ে তিনজন নিজ নিজ ঘরে প্রত্যাবর্তন করে। এ ভাবেও নাকি বৃষ্টি হয়ে থাকে।

এইসব অনুষ্ঠানের পরেও বৃষ্টি না হলে বৃষ্টিদেবকে তাঁর চরিত্রহীনতার জন্য নানাভাবে বিদ্রূপ ও অশ্লীল গালাগালি দেওয়া হয়। বলা হয়—ইন্দ্র তাঁর সাধ্বী কে অবহেলা করে অন্য মহিলায় আকৃষ্ট হয়ে যেতে থাকাতে ইন্দ্রাণী ক্রুদ্ধ হয়ে বৃষ্টি নামাতে দিচ্ছেন না। চরিত্রস্খলনের জন্য নানাভাবে ইন্দ্রকে অবমাননা করা হয়। বিরক্ত হয়ে তখন ইন্দ্র বর্ষা পাঠান পৃথিবীতে। বৃষ্টি বারি হয়ে নেমে আসে। তখন গান গাওয়া হয়—'কালো মেঘা নামো নামো। ফুল তোলা মেঘ নামো। ধূলটমেঘা তুলটমেঘা তোমরা সবাই নামো। কালো মেঘা টলমল বার মেঘার ভাই। আরো ফুটিক জল দিলে চিনার ভাত খাই। কালো মেঘা নামো নামো চোখের কাজল দিয়া। তোমার কপালে টিপ দিব মাদের হলে বিয়া। আড়ইয়া মেঘা হাড়ইয়া মেঘা কুড়ইয়া মেঘার নাতি। নাকের নোলক বেইচা দিবাম তোমার মাথার ছাতি। কৌটা ভরা সিন্দুর দিবাম সিন্দুর মেঘার গায়ে। আইজ যেন বৃষ্টির চোটে মাঠ ডুবিয়া যায়।' মাঠ ডুবে গেলেও অশান্তি। অবিরাম বৃষ্টি ও প্লাবন আনে দৈন্য ও হতাশা। তখন আবার নানাপ্রকার যাদু ক্রীড়া শুরু হয়ে যায় বৃষ্টি থামাতে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রোদের জন্য উপরি উপরি সাতটি কচুপাতা এবং এই পাতার উপর রেখে বলে—'দেবীর মা মরেছে, সাতকুলা দিয়া ঘুরছে। কাইন্দ না গো ীর ঝি, কান্দলে আর অইব কি। হাইস্যা দে রইদ তুল, ফুটাইয়া দে বাসনা ফুল। রইদ উঠ ফাইট্যা। চুণ দিয়াম বাইট্যা। পান দিয়াম চিরর‍্যা। দে গাঁ ভইর‍্যা'। বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর পূজানুষ্ঠানও হয়। 'পুর'-ওয়ালা জায়গার নামের আবৃত্তি হয় (যেমন মেদিনীপুর)। দরগায় শিন্নি, ঠাকুর দেবতার দরবারে মানত, বাটিপোতা প্রভৃতি নানাবিধ আচরণ অনুষ্ঠিত বৃষ্টি থামাতেও। বাটিপোতার সময় গ্রামের এক মেয়ের মাকে খুঁজে বের হয়। এক মেয়ের মা আঁটকুড়ি, সে বাটি পুঁতলে বৃষ্টি হবে না। বৃষ্টির পরিবর্তে কামনা করে অনেক সময় ছড়া কাটা হয়—'এক পয়সার অলদি। বৃষ্টি থাম অলদি দিমু বাইট্যা। রোদ ওঠ ফাইট্যা। বেলগাছে কাঁটা। রোদে টাক ফাটা। বুড়ি লো বুড়ি বকুলতলায় যাবি? সাতখান কাপড় পাবি। সাত রে দিবি। নিজে পিনবি ত্যানার খোট। চমচমাইয়া রইদ ওঠ।' বলা য়—'লেবুপাতা করমচা, হেই বৃষ্টি থেমে যা' প্রভৃতি ছড়াও। সন্তানহীন হিন্দু বিধবা অনেক স্থানে বর্ষা থামাবার জন্য গর্ত খুঁড়ে সেই গর্তে একটা ঘটি লুকিয়ে

রাখে। বৃষ্টিপাত বন্ধ করার জন্য অনেক সময় খেলার সঙ্গীদের সঙ্গে আড়িদেবার মতন বলা হয়—'আড়ি আড়ি আড়ি বৃষ্টির সঙ্গে আড়ি। বৃষ্টিরে তুই থাম আমি যাব বাড়ি। বৃষ্টির সঙ্গে আড়ি দিয়া আমি যাব ঘর। ও বৃষ্টি তুই ধর, (আর) হনুমানের ল্যাজটা ধরে টানাটানি কর।'

রোদ উঠলে বা বৃষ্টি নামলেই সব কাজ সমাপ্ত হয় না। প্রয়োজনীয় কৃত্য, আচার, উৎসব, অনুষ্ঠানাদি পালন করতে হয়। লোকসমাজের উৎসব বা অনুষ্ঠান মাত্রেই ঋতু-উৎসব বা ঋতু অনুষ্ঠান। উৎসবের দেবদেবী মাত্রেই কৃষির দেবতা বা ক্ষেত্র দেবতা। তাঁরা প্রজনন শক্তি ও উর্বরতার প্রতীক। তাই ভূমিকে কল্পনা করা হয়েছে নারীরূপে। এই নারী ও ভূমিকে উর্বর করে তোলার জন্য পুরুষের প্রচেষ্টার অন্ত নেই লোকসমাজে। নারী ও জীবনের সফলতায় এবং ভূমি বা বৃক্ষাদির জীবনের সার্থকতায় লোকাচরণে কোন ইতরবিশেষ হয় না। তাই যারা মাটির একান্ত কোলঘেঁষা তারা মাটির অন্তরে মানবিক স্পন্দন ও অনুভূতির পরিচয় পায়। সুতরাং সন্তান জন্মকে শস্য উৎপাদনের হেতু বলে বিশ্বাস করা হয়। বন্ধ্যানারী এজন্যই অমঙ্গলের প্রতীক ও বহু সন্তানবতী নারী বৈষয়িক জীবনের পরম সহায়। আদিবাসী সমাজে গ্রামপ্রধানের সঙ্গে গ্রামপ্রধানের স্ত্রীর নতুন করে বাৎসরিক বিবাহ, বৃক্ষের প্রথম ফল বহু সন্তানবতী নারীকে প্রথম খেতে দেওয়া, ছেলে কোলে নিয়ে নারী কর্তৃক বীজ বপন করা, গর্ভবতী নারীকে দেখে হলচালনা করতে যাওয়া, যমজ সন্তানের মাকে দিয়ে প্রথম হলচালনা করা



প্রভৃতি আচরণের সব কিছুই অধিক ফসলের জন্য। তাই বস্তুবিশ্ব এবং জীববিশ্ব লোকসমাজের কাছে একই প্রাণসূত্রে বাঁধা। জমিতে লাঙ্গল জুড়ে দিয়ে কৃষক গান গায়—'আয় রে তরা ভুঁই নিরাইতে যাই। ভুঁই মোগো মাতাপিতা ভুঁই মোগো পুত। ভুঁইর দৌলতে মোরগো আশী কোঠা সুখ।...(এই) পৌষ মাসে দেলাম পূজা বাস্তু দেবতার পায়। মাঘ মাসে বসুমতীর চরণ ছোঁয়ায়। ফাল্গুন

মাসে দেলাম লাঙল চৈত্র মাসে বীজ। বৈশাখেতে চিকচিহিনী জ্যৈষ্ঠে ধানের শীষ। আষাঢ় মাসে সোনার ধান সোনার ফসল ফলে। ছেরাবনে আউশ ধান গেরস্তেতে তোলে। ভাদ্র গেল আশ্বিন আইল কার্তিক দেয় সাড়া। অগ্রাণেতে ক্ষ্যাতের পরে দেখরে আমনছড়া। আমন ওঠে ঘরে ঘরে দুঃখ কিছু নাই আর। আইস এবার যাবার বেলা চরণ বন্দি তাঁর। (ওগো) সপ্তডিঙ্গা মধুকরে যত ধান্য ধরে। এবার যেন সোনার ধানে আমার গোলা ভরে।'

লোকসমাজ ধর্মবিশ্বাসী। তাদের ধর্ম সর্বদা শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত নয়। তারা নিজেরা নিজেদের ধর্ম ও বিশ্বাস রচনা করেছে। শাস্ত্রীয় ধর্ম গ্রহণ করার ব্যাপারেও দেখা গেছে যে লোকসমাজ তাদের ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী তা শোধন করে নিয়ে তবেই গ্রহণ করেছে। তাদের ধর্ম ও বিশ্বাসের সঙ্গে ইন্দ্রজাল মিলেমিশে গেছে। সাধারণত অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার কথা মনে রেখেই তারা ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছে। চাষ-আবাদের ব্যাপারে—বৃষ্টি, কুয়াশা, বন্যা ইত্যাদি গণনা, শস্যগণনা, হালচাষের সময় নির্ণয়, শস্যাদি রোপণ ও কাটার সময় নিরূপণ, আলবন্ধন প্রণালী, এবং গো-মহিষাদির যত্ন ও আহারাদির ব্যাপারে প্রচলিত লোকবিশ্বাস, লোকাচার ও লোকোক্তি দ্বারা অনেক সময়ই যে তারা চালিত হয় তা নতুন করে ও বারে বারে বলার দাবী রাখে না।

উৎপাদনের প্রাচুর্যের জন্য ঐতিহ্যমণ্ডিত কৃত্যাদি অবশ্য পালনীয়। তাই জমি চাষ সুরু করার আগে বাৎসরিক অনুষ্ঠানাদি পালন করে কৃষক। রোহিণীর উদয় না হলে বীজ বপন করে না সে। তেরই জ্যৈষ্ঠ হয় রোহিণীর উদয়। সেদিন প্রাতঃস্নানান্তে শুদ্ধ হয়ে ফুল, বেলপাতা, আলোচাল ও ফলমূলাদি নিয়ে কৃষক তার ক্ষেতে গিয়ে পূজা করে। তারপর খানিকটা জমি কোদাল দিয়ে কুপিয়ে ধানের বীজ ছড়িয়ে দেয়। সে ক্ষেত্রকে প্রণাম করে। যদি সেক্ষেত্রে পূর্বেই লাঙল দেওয়া হয়ে থাকে তবে তাতেও বীজ ফেলা যেতে পারে।

রোহিণে বৃষ্টিপাত কাম্য। এ-দিনে বৃষ্টিপাত না হলে শস্য হবে না, সাপের বিষও নষ্ট হবে না। রোহিণের দিনে ওঝা ও মন্ত্রগুরুরা তন্ত্রমন্ত্র শেখাবার জন্য আখড়া খোলে বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-ধলভূম প্রভৃতি অঞ্চলে। মন্ত্রগুরুদের চেলা থাকে, তারা পূজা অর্চনা করে। এই দিন থেকেই সুরু জাত গান। চলে শ্রাবণ-সংক্রান্তির মনসা পূজা অবধি। কৃষকদের ধারণা, বিষাক্ত সাপেরা রোহিণে-মুঁদ গেয় অর্থাৎ বিবরে আত্মগোপন করে। ঋক্‌বেদের ঋষিগণও এই সময় ক্ষেত্রপতির প্রসাদ প্রার্থনা করতেন।

রোহিণ উদয় কৃষকমাত্রেই বুঝতে পারে। এ দিনে ঘরের চালের

ঈশান কোণে শ্যাওড়া গাছের ডাল গুঁজে দিলে নাকি সে ঘরে বজ্রপাত হয় না। এইদিনে যে ক্ষেত্রব্রত অনুষ্ঠিত হয় তাতে কোন পুরুত দরকার নেই। কৃষক রমণী কোন এক বাড়ীর সংলগ্ন মাঠে একটি ঘট প্রতিষ্ঠা করে তাতে সিঁদুর পুত্তলী আঁকে। আম্র পল্লব, ডাব বা ছোট কোন ফলও সে ঘটে রাখা হয়। প্রাচীনা সকলকে ব্রতমাহাত্ম্য বুঝিয়ে বলেন, হাতে ফুল ও দূর্বা নিয়ে সকলে বৃদ্ধার কথা শোনে। অবশেষে ব্রত সমাপনান্তে ছেলেমেয়েরা সমবেত কণ্ঠে গান গায়—'বন্দেমাতা বসুমতী পুরাণে মহিমা শুনি। অগতির গতি তুমি মোদের কর ত্রাণ। চাষার ছাওয়াল মোরা যে ভাই। চাষ বিনা আর জানি নাই। এবার ধররে লাঙল শক্ত কইর‍্যা। জেবন থাকতেও ছাড়া নাই।...(ওই) পূর্বকালে মিথিলাতে জনক নামে রাজা ছিল। চাষের গুণে লক্ষ্মীদেবী গোলক থুইয়্যা তাঁর ঘরে আইল। (মোরা) আসল থুইয়্যা নকল লইয়া কাটাই বারোমাস। হেইতে মোগো দুঃখের সীমা নাই। তাইত বলি ভাই মোরগো চাষ ছাড়া গতি নাই। জেবন থাকতে চাষ ছাড়ব নাই।' এই ভাবে চলে চাষের মহিমা কীর্তন, চাষী-জীবনের পূর্ণতার কাহিনী বর্ণন।

কৃষি ও হল চালনার সঙ্গে নানাভাবে প্রজননকে যুক্ত করা হয়েছে। হল কর্ষণ আরম্ভের দিনে বহু আদিম সমাজের কৃষক যখন হল চালনা করে তখন ভূমির এক কোণে চলবে একজোড়া স্ত্রী-পুরুষের রতিক্রীড়া। অর্থাৎ হল-কর্ষণ ও প্রজনন একই সঙ্গে চলবে। আদিম সমাজে এ ধরণের কৃষকও ছিল যারা তাদের মহিলাদের অপরকে উপভোগ করতে দিত হলকর্ষণের সময়। পুরোহিতের মারফত এই কৃত্য সম্পন্ন করা হত। এই অনুষ্ঠান ছাড়া কৃষিকার্যের অনুষ্ঠান বে-আইনী বলে পরিগণিত হত। কোনও কোনও স্থানে যখন শস্য উদ্গীরণ হয় তখন রাত্রে স্বীয়-পত্নীসহ কৃষক মাঠে গিয়ে স্ত্রী-সঙ্গ উপভোগ করত। কোন আদিম সমাজেই 'বাঁজা মহিলা'কে কৃষিক্ষেত্র ছুঁতে দেওয়া হয় না। এখনও ছুঁতে দেওয়া হয় না অশুদ্ধ মহিলাকে। কিন্তু যে মহিলা যমজ সন্তান প্রসব করেছেন সে মহিলার উর্বরতার আধিক্যের জন্য তাঁকে মাঠে নিয়ে যাওয়া হত হল কর্ষণারম্ভের জন্য, অন্য পুরুষের সংস্পর্শে আসার জন্য। ভাবানুষঙ্গবশত জমির উর্বরতা বৃদ্ধির কামনায় ও যাবতীয় যাদুর অনুষ্ঠানেই আছে নারীর অধিকার।

জমির উর্বরতা কিম্বা কৃষির প্রাচুর্যের যাবতীয় ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় আছে মানুষের বংশবৃদ্ধির প্রয়াস। অনগ্রসর কৃষি সমাজের মূল কামনা শস্য ও সন্তানের জন্যই নানাবিধ ইন্দ্রজালের অবতারনা। কালক্রমে ইন্দ্রজাল ধর্মের

অবয়বে রূপান্তরিত হয়। অবশ্য ইন্দ্রজালের ব্যর্থতা ধর্মকে জন্ম দিলেও ইন্দ্রজাল একেবারে বিলুপ্ত হয় না। ইন্দ্রজালভিত্তিক লৌকিক আচার-আচরণ, উৎসব-অনুষ্ঠান যখন নিমেষে গ্রাস করা গেল না তখন লৌকিক আচার-আচরণের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য আচার-আচরণের একটা আপস করা হয়। ফলে কোথাও ইন্দ্রজাল ও ধর্ম একাত্ম হল, কোথাও ধর্ম ইন্দ্রজালকে গ্রাস করল, কোথাও ইন্দ্রজাল নিছক যাদুতে পরিণত হল। বাঙালীর পূজাচার পদ্ধতি, ব্রত অনুষ্ঠান এবং জীবনবৃত্তের খুঁটিনাটি আলোচনায় এ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য জানা সম্ভব।

শস্য ও সন্তানের জন্য এল লিঙ্গ ও লাঙ্গল। ভূমি বা পাথরে সিঁদুর দিয়ে প্রকৃতিকে ঋতুমতী কল্পনা করা হল। প্রকৃতির নানা ফসল প্রকৃতির সন্তানরূপে গৃহীত হল। বিভিন্ন বৃক্ষে বিভিন্ন দেবদেবীর আস্তানা কল্পিত হয়ে বৃক্ষপূজা অনুষ্ঠিত হতে লাগল। পূজিত হতে লাগল নানা ফল ও ফসল। বিশ্বাস, সংস্কার, টোটেম, টাবুআদি লোক-জীবনের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। এরই মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কারাদি এসে ভীড় জমাল লোক-সমাজে, কৃষিজীবী সমাজে। তাই শুধু হলকর্ষণের জন্যই নয়, বীজ বপনের জন্যও নানাবিধ শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় আচার-আচরণ অনুষ্ঠিত হতে লাগল। অনুষ্ঠিত হতে লাগল লোক-সমাজের সেই আদিম ও অকৃত্রিম ব্রত, আচার আচরণাদিও।

তাই হলকর্ষণের পরে লোক-বিশ্বাস অনুযায়ী বীজ রোপনের দিন নির্দিষ্ট করতে হয়। যেমন—'শ্রাবণের পুর, ভাদ্রের বারো, এর মধ্যে যতো পারো' বা



'আগে বেঁধে দিবে আলি, তাতে রুইয়ে দিবে শালি।' প্রত্যেক বৎসরই ক্ষেত্রকে আলি দিয়ে বন্ধন করা উচিত। আরও লোকোক্তি—'আউশ ধানের চাষ লাগে তিনমাস। দিনে রোদ রাতে জল, তাতে বাড়ে ধানের বল। থোর তিরিশে, ফুলো বিশে। ঘোড়ামুখো তের দিন, ইহা বুঝে ধান কিন। আষাঢ়ে কাড়ান নামকে, শ্রাবণে কাড়ান ধানকে। ভাদ্ররে কাড়ান শিষকে, আশ্বিনে কাড়ান

কিসকে। বাড়ীর গাছে ধান পা, যার মার আগে ছা। চিনিস বা না চিনিস, খুঁজে দেখে গরু কিনিস। শিস দেখে বিশ দিন, কাটতে মাড়তে দশ দিন। আষাঢ়ে পঞ্চদিনে রোপয়ে যদি ধান, সুখে থাকে কৃষিজীবী তার বাড়য়ে সম্মান'। অর্থাৎ আউশ ধান রোপনের সময় থেকে কাটা অবধি তিন মাস সময় লাগে। বর্ষার অধিকাংশ দিনে রৌদ্র ও রাত্রে বর্ষায় ধান গাছ তেজস্বী হয়। ধানের থোড় জন্মালে ত্রিশ দিনে, ফুলে গেলে কুড়ি দিনে, ও শিস নত হয়ে পড়লে তেরো দিনে কাটা দরকার। আষাঢ় মাসে জলবর্ষণে কাড়ান বা আবাদের উপযুক্ত হলেও সকলে এ সময়ে সময় পায় না। সুতরাং আষাঢ় মাসের কাড়ানে সমস্ত কৃষক লাভবান হয় না। শ্রাবণ মাসের কাড়ানে সকল কৃষক লাভবান হয় ও প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হয়। ভাদ্রের কাড়ানে শিষ হয়, আশ্বিনের কাড়ানে নিষ্ফলা যায়। বাড়ীর নিকটের জমিতে চাষবাস করা এবং খোঁজ করে গরু কেনা কর্তব্য। ধানের শিস বের হলে সেদিন থেকে কুড়ি দিনের মধ্যে ধান কাটতে হবে। ধান কাটাই-মাড়াই করতে লাগবে দশ দিন। তাছাড়া পাঁচুই আষাঢ়ের মধ্যে ধান্য রোপন সম্পন্ন করা গেলে প্রচুর ফলন ফলে। ধান ছাড়া অন্যান্য ফসল সম্পর্কেও এইরকম ইঙ্গিত বর্তমান। যেমন—'ষোল চাষে মূলা তার অর্ধেক তূলা, তার অর্ধেক ধান, বিনা চাষে পান'। আরও নানাবিধ নির্দেশ আছে। যেমন—'ফাল্গুনের আট চৈত্রের আট, সেই তিল দায়ে কাট। সাতহাত তিনবিঘেতে, কলা লাগাবে মায়ে পুতে। কলা লাগিয়ে না কাটবে পাত, তাতেই কাপড় তাতেই ভাত'। এবং 'শরতের শেষে সরিষা রো। চৈত্র মাসে ভুট্টা রো। ঘন সরিষা পাতলা রাই, নেঙ্গে নেঙ্গে কাপাস যাই। কাপাস বলে কোষ্টা ভাই, জ্ঞাতি পানি যেন না খাই। লাউ গাছে মাছের জল, ধোনা মাটিতে বাড়ে ঝাল। শরতের শেষে মূলা বুন, বেলে মাটিতে পটল বুন। তামাক বুনে গুঁড়িয়ে মাটি, বীজ পুতো গুটি গুটি। ঘনরূপে পুতো না, পৌষের অধিক রেখো না। চৈত্র-বৈশাখ দিয়ে বাদ, দশমাস কর বেগুনের চাষ। পোকা ধরলে দিবে ছাই, এর চেয়ে উপায় নাই। যদি না হয় অঘ্রাণে বৃষ্টি, তবে না হয় কাঁঠালের সৃষ্টি। এক পুরুষে রোপে তাল, অন্য পুরুষে করে পাল, অপরপুরুষে ভুঞ্জে তাল। হাত বিশে করি ফাঁক, আম কাঁঠাল পুতে রাখ। গাছগাছালি ঘন সবে না, গাছ হবে তার ফল হবে না। কলা লাগাবে আষাঢ়-শ্রাবণ, সকলে মিলে করিবে ভক্ষণ'।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় কলা নানাভাবে বাঙালী জীবনকে প্রভাবিত করছে। পাকা ও কাঁচা উভয় প্রকার কলাই বিশেষ প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

পাকাকলা ফল, কাঁচাকলা সব্‌জি। কলার থোড়ও সব্‌জির কাজ করে। মোচাও সব্‌জি। বাসনা দিয়ে উনুন ধরান হয়। কলার শুকনা পাতা ও খোলের ছাই দিয়ে যে ক্ষার হয় তা লোকসমাজের কাপড় পরিষ্কারে লাগে। কলার খোল দিয়ে বাঙালী নৌকো বানায়। কলার পাতায় থালার কাজ চলে। বাঙালীর এমন কোন আচার-আচরণ বা অনুষ্ঠান নেই যেখানে কলার গাছ ও ফলের উপস্থিতি নেই। আঁতুড়ঘরে পর্যন্ত হয় কলাগাছের প্রবেশ। প্রসূতিকে কলার পাতার বিছানায় শোওয়ান হয়। চিতা বা কবরের উপরেও কলা গাছ লাগান হয় অনেক সমাজে। কাঁঠালি কলা ছাড়া লক্ষ্মী পূজা হয় না। অন্যান্য পূজা ও ব্রতানুষ্ঠানও সিদ্ধ হয় না কলা ছাড়া। হবিষ্যান্ন করতেও লাগে কলা।

কলা সম্পর্কে নানাবিধ সংস্কারও আছে। যেমন চাঁপা কলা পূজায় লাগে না, লাগে কাঁঠালি কলা। কলা দেখে যাত্রা অযাত্রা। কাঁচকলা দেখান মানে অসম্মান প্রদর্শন করা। তবুও হিন্দু বিবাহে কলাতলা বা চারটি কলাগাছবেষ্টিত সমচতুর্ভুজাকার স্থানের অবশ্য প্রয়োজন। বাসি-বিবাহের কলতলায় স্নানের জন্য আছে কলা গাছ। কলার নৈবেদ্য ছাড়া দেবপূজা হয় না। রুধির নৈবেদ্যেও কলা চাই। কলার খোলের ডোঙ্গায় পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডাদি অর্পণ করা হয়। স্মরণীয়, কলা ফল অযাত্রা হলেও কলা গাছ যে কোন স্থানে যাত্রা, গৃহপ্রবেশ, অতিথিবরণ ও মঙ্গলানুষ্ঠানে মঙ্গলের বার্তাবহ। কলা বিবাহ বসনরা ব্রতের কৃত্যাদির একটি। এই কলা গাছ দিয়েই তৈরী হয় কলাবউ, লক্ষ্মী ও গণেশ জায়ারূপে তিনি পূজিতা। নবপত্রিকা সৃষ্টিতেও কলাগাছ। কলাগাছ লক্ষ্মীরও প্রতীক। কলার ভেলায় করে বেহুলা লখীন্দরের শব নিয়ে ভেসেছিলেন। পূর্ববঙ্গের অনেক স্থানে দীপাবলীদিবসে কলার ভেলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে সে ভেলা ভাসান হয়।

নানাভাবেই লোকোক্তি লোকসমাজে প্রভাব বিস্তার করে। যেমন—'শোন রে বলি চাষার পো, পরে নারিকেল আগে গুয়া। নারিকেল বারো, সুপারী আট, এর ঘন দেখলে তখনি কাট। আট চার গুয়া, আম নাড়ায় টুকটুকি কাঁঠাল নাড়ায় ভুও। সিত নাড়ায় গুয়ো, ছায়া ছায়া তিনে থাঁটি আগে কাট কুও।' এ ছাড়া সংস্কারাদিও আছে যেমন—'শুভক্ষণ দেখি করিবে যাত্রা, পথে যেন না হয় অশুভ বার্তা।' কৃষক সমাজে এই সব প্রবচনের প্রভাব বিস্তর। এবং কোন কারণে কেউ এইসব প্রবচনের বিরুদ্ধাচরণ করলে এবং সে বৎসর আশানুরূপ ফসল উৎপাদিত না হলে কৃষক মনে করে বা কৃষককে মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে কর্ম

পরিচালনার জন্যই তার এই দুর্দশা। দুর্দশা এড়াবার জন্য সকলেই আগ্রহী।

লোকসমাজ বিশ্বাস ও ইন্দ্রজাল পুরোপুরি মেনে নেয়। তাই বাঁকুড়ার সাঁওতাল কৃষকেরা পয়লা মাঘ আখানযাত্রা অনুষ্ঠান করে। এই অনুষ্ঠানে গৃহকর্তা সকালে প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন না করে গরু-মোষ নিয়ে মাঠে যান, এবং পূর্বদিকে মুখ করে উল্টোভাবে হল কর্ষণ করেন। বাড়ি ফিরে এসে স্নানাদি করেন, কিন্তু তখনো লাঙ্গল পরিষ্কার করেন না। স্নানান্তে শুদ্ধ হয়ে গরু-মোষের পা ধুইয়ে দেন, ওদের মাথায় তেল, সিঁদুর মাখেন ও পূজা করেন। এই পূজা যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ গৃহকর্তা অভুক্ত থাকবেন। নৃত্য ও সঙ্গীতাদির মধ্যে মনসার জন্ম, সাপের উৎপত্তি, শিবদুর্গার কথা, ওলাই চণ্ডী, হাড়ির ঝি, চণ্ডীর কথা বিধৃত করে চারণ ও মন্ত্র। একটি মন্ত্র-গানের নমুনা—'শতেক শিকলের আগে বজ্রি, তায় বসিলেন গড়ুর পক্ষী, যখন গড়ুর কম্পেঝম্পে, তিনভুবনের বিষ থরহরি কম্পে, আয় বিষ সনালে, সদারে, সেই মহাগড়ুর বীরের হুহুঙ্কারে বিষ নাই ধরে, ঈশ্বর মহাদেবের আজ্ঞায় বিষ ঘা মুখে ঝরে।' রোহিণযাত্রার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই রোহিণ যাত্রার পরে অনুষ্ঠিত হয় গরুর চাঁদবদনী—কার্তিক মাসে। এই দিনে কৃষক পরিবারের মহিলারা গরু পূজা করেন। গোহাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় এবং নানাপ্রকার আলপনা আঁকা হয়। মাটির প্রদীপ ফুলের মালা, সরিষার তৈল, কাঁচা হলুদ, সিঁদুর, ধান, সরিষা, মুগ, দূর্বা প্রভৃতি পিতলের থালায় করে গোহালে নিয়ে যাওয়া হয়। গরুর শিং-এ তেল হলুদ লাগিয়ে, গলায় মালা পরিয়ে দেওয়া হয়। গায়ে জ্যামিতিক চিত্রাদি অঙ্কণ করা হয়। এবং কলার পাতায় করে গরুকে খাবার দেওয়া হয়। তারপর গরুকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করা হয়। এই দিনে গরুদের বিশ্রাম। এই উপলক্ষে বাঁধনা গীত বা আহীরা গীতও গাওয়া হয়। কার্তিক অমাবস্যার উৎসব গরু খোঁটান, দ্বিতীয়ার উৎসব বুড়ী বাঁধ্‌না ও তৃতীয়ার উৎসব দেশ বাঁধ্‌না। তিন দিনের এ উৎসবের দ্বিতীয় দিনে গোরু-মোষদের মোটা খুঁটিতে শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে গান গাওয়া হয়। এই গানে গরু মোষের জন্মকথা, তাদের বিয়ে-থার কথা, অতীত জীবন কথা বর্ণিত হয় প্রশ্নোত্তরের ঢঙে।

রাঢ় অঞ্চলের সহরাই বা বাঁধ্‌না পরবে মহুয়ার নেশায় মাতাল সাঁওতাল পুরুষ মাদল বাজায়। তালে তালে নাচে তাদের রমণীর দল। এ উৎসবের পূজা অঙ্গ গৌণ ; নাচ, গান ইত্যাদি অনুষ্ঠান মুখ্য। জাহিরথানে পূজানুষ্ঠান হয়। পূজার পুরোহিত নির্বাচিত হয় গ্রামবাসীদের ভোটে। বংশগত কোন দাবি নেই এ পূজার পুরোহিত নির্বাচনে। পূজার উপকরণ—আতপ চাল, সিঁদুর,

মোরগ প্রভৃতি। পূজার পর পুরোহিত মোরগ বলি দেবেন। সে মোরগের মাংস সকলে পাবে। মেয়েরা এ প্রসাদ পাবে না। সন্ধ্যায় মেয়েরা পচাই খাবে, ছেলেমেয়ে একত্রিত নাচ-গানে মাতবে। যেমন—'আশ্বিনী যায়তে, কার্ত্তিকা আওয়াই গো। কঁন্দাসাগেমুড়োরিয়া গাই আজ অরে। তোর দুয়ে শিঙে মাখাব তেলের সিঁদুর। মাখাইব কুজুরিয়া তেল আজ অরে। গাই মা চরায় বাবু শ্রীবৃন্দাবনে হেয়। মহিষিণী চরায় গাঁগা পার আজ অরে। গাই মা আওয়াই বাবু বেলা মা ডুবি গেল। মহিষিণী আওয়াই আধা রাত আজ হে।' একাদিক্রমে ছয় দিন ধরে চলে এ গান, এ উৎসব। ছেলেমেয়েদের একত্রিত উৎসব।

সমাপ্তি বা ষষ্ঠদিবসে হয় বনঝাড়া বা শিকার। এই দিনে গাঁয়ের সব পুরুষ নাকাড়া, তীর, ধনুক, লাঠি নিয়ে বেরিয়ে যায়। সমষ্টি শিকারে যা পাওয়া যায় বিকালে তা কাটার পর সকলকে সমান ভাগ করে দেওয়া হয়। শিকারের পূর্বেই গ্রামের মোড়লের কাছে দেওয়া থাকে একটি চালের পিঠে। সেই পিঠেকে রাখা হয় গ্রামের প্রান্তের একটি বাঁশের খুঁটির মাথায়। তার পর প্রথমে পুরোহিত ও পরে এক একজন করে গ্রামবাসী ওই পিঠে লক্ষ্য করে তীর মারে। যার তীরে ঐ পিঠে পড়ে যায় সে হয় বিজয়ী। তাকে কাঁধে নিয়ে সকলে আনন্দ করে, স্ফূর্তি করে। সেই বিজয়ী বীর মেয়েদের বাদ দিয়ে সমস্ত বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষকে প্রণাম করে।

এই অনুষ্ঠানে কৃষির সঙ্গে শিকার এবং পশুপালনের যোগ দেখা যায়। সারা বাঙলার অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সব জায়গার কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যেই আছে নানাবিধ কৃষি অনুষ্ঠান। গ্রামের সমস্ত কৃত্যে ও আচরণে সর্বত্রই অনুষ্ঠানের আয়োজন। স্থানীয় প্রভাব ও পরিবেশ অনুযায়ী কোন কোন সমাজে কিছু কিছু আচার-অনুষ্ঠানের রকমফের দৃষ্ট হলেও সমস্ত প্রকার কৃষি অনুষ্ঠানের মূল সুর অভিন্নই থাকে।

মুসলমান কৃষিজীবীরা বাস্তু পূজা বা ক্ষেত্রে মঙ্গলঘট স্থাপন করেন না বটে তবে তাঁরাও বৎসরের প্রথম মাঠে আসার আগে নামাজ পড়েন, আল্লা-তাল্লাহর দোয়া ভিক্ষা করে হল চালনার কাজ সুরু করেন। এবং অনেক সময় হিন্দু কৃষিজীবীদের সর্বাধিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। তাই অনুষ্ঠানান্তে বিকেলের আমোদ-আহ্লার্দের আসরে উভয়ে একত্রিত কণ্ঠে গান গায়—'ও আমার আহ্লাদি, ও তোর সোহাগ বড় ভারী। এবার ক্ষ্যাতে যদি সুফল ফলে ত, কিম্বা দিমু ঢাহাই শাড়ী। শাড়ী দিমু, গামছা দিমু, দিমু

নাকের নাক ছবি। ও আমার আহ্লাদি, তোর সোহাগ বড় ভারী। (ও) শুভক্ষণে দেলাম পূজা বাস্তুদেবতার পায়, জমি জিরাত সবই যে ভাই হেনারই দয়ায়। মাটির মানুষ, মাটিই খাঁটি, মরলে পরে দেবে মাটি। এহোন সময় থাকতে ধর রে লাঙল, নইলে হেষে হইবে গণ্ডগোল।' এইরূপ আনন্দ ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চাষের কাজ এগিয়ে যায়। এই সময় নানা বিধিনিষেধও প্রতিপালন করতে হয় কৃষককে। যেমন হলকর্ষণের সময়ে স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ। অশুদ্ধ মেয়েদের লাঙল, গরু বা মাঠ ছোঁয়া নিষেধ। হলকর্ষণে যাবার পথে কলসকাঁখে গর্ভবতী মহিলা দেখা ভাল। পথে হিজড়ার সাক্ষাৎ অশুভ শুচনা করে। প্রজনন শক্তিহীন এই সম্প্রদায়ের লোক দেখে ভূমির প্রজনন শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টায় উৎসাহ থাকে না মনে। পথে হোঁচট খাওয়া, যাবার সময় পিছু ডাকা এবং হাঁচি প্রভৃতির বাধায় শুধু কৃষকই নয় সমগ্র লোক-সমাজই বিব্রত। কারণ প্রকৃতির সন্তান কামনাই লোকসমাজের শস্যকামনা।

শস্যের জন্য সূর্যোদয়ের পূর্বেই কৃষক হাল-বলদ নিয়ে মাঠে ছোটে। তাদের জীবনের বৃহত্তর অংশ মাঠে-ঘাটেই কাটে চাষের প্রয়োজনে। কাজের ফাঁকে তামাক খায়, পরস্পরের সুখদুঃখের কথা, গত বৎসর আর চলতি বৎসরের চাষের সম্ভাবনা ও ফলশ্রুতির কথা আলোচনা করে। গান গায়—'বারো বাংলো তেরো কুঠি মধু চৌকিদার। যার মাথাতে লাল পাগুড়ী সঙ্গে দফাদার। চলো যাবো মধুসূদন। তোর লেগে কি হারাবো জীবন।' স্পষ্টতই খাজনা দিতে না পারার জন্য কৃষক চৌকিদার-দফাদারদের দেখে ভয় পায়। ভালো করে আরও ভালো করে চাষের জন্য সে উৎসাহিত করে বলদকে। আশানুরূপ ফসল না হলে যে কি বিষম দুর্ভোগ ভোগ করতে হবে তাকে তা ভেবেই আশঙ্কিত হয়ে পড়ছে সে। অমানুষিক পরিশ্রমে তার ক্লান্তি নেই। চাষের সময় আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের সংবাদ নেবার ফুরসুত নেই। কাজ আর কাজ। শ্রম আর শ্রম। কিন্তু অবুঝ মন চঞ্চল। তাই যখন বন্ধুর দেশের পাখি আকাশে উড়ছে তখন তাকে জিজ্ঞেস করছে—'বলরে পাখি সত্য করে কে কেমন আছে?' কিন্তু পাখি উড়ে যায় নীরবে। একই পরিবেশে পাটের চাষ হয় বাঙলায়। পাট গাছের আঞ্চলিক নাম নালিতা। নালিতা শাক উপাদেয় খাদ্য। এ শাকে পিত্তদোষ দমন করে। এ শাকের কাণ্ড প্যাকাটি। প্যাকাটি জ্বালানী ও বেড়ার কাজে লাগে, এবং ছাল দিয়ে হয় পাট। পাট বাঙালীকে দেয় বিদেশী মুদ্রা। অগণিত লোকের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ করে দেয় এই পাট। নানাজাতের পাট আছে—দেশাল, মাতনলা, তুষা, শ্যামপুরী, মেস্তা

ইত্যাদি। তুষাজাতীয় পাট সর্বোৎকৃষ্ট। এই পাট গাছ বড় হলে গোড়া কেটে আঁটি বেঁধে জলে পচান হয়। পচান গাছ তুলে ছাল বের করে নিয়ে রোদে শুকান হয়। আঁশযুক্ত এই ছালই পাট বা কোষ্টা। ছালহীন গাছ প্যাকাটি বা পাটকাঠি। উল্কাদান ও নানাবিধ আচার আচরণেও প্যাকাটির প্রয়োজন। শুকনা পাট বিক্রয়ার্থে নানা ওজনের আঁটি বাধা হয়। যেমন হাতা, বিনকা, মোনা, তুদাঁ, লাছি, ডুপলি প্রভৃতি। পাট দিয়ে তৈরী হয় চট, বস্তা। প্যাকিং এর জন্য এই চট সারা বিশ্বে ব্যবহৃত হয়। পাটের যাঁরা ওজন করেন তাঁরা কয়াল। পাটের যাঁরা ব্যবসা করেন তাঁরা পাটুয়া। পাট থেকে নানা প্রকার দড়ি এমন কি বস্ত্রাদিও তৈরি হয়।

পাটের মতই আরেকটি প্রয়োজনীয় সামগ্রী পান। বাঙালীর যে কোন আচার-আচরণ বা অনুষ্ঠান ও ধর্মকর্ম পান ছাড়া হয় না। এই পানের যারা চাষ করেন তাঁরা বারুজীবী, লোকসমাজ তাঁদের বলেন বারুই। বিবাহাদি কাজ এবং আত্মীয়স্বজন আপ্যায়নেও পান। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই পানের সমান সমাদর। পান খাদ্যও বটে। এই পান নানা প্রকারের। বাঙলা পান, কড়িপান, কর্পূর পান, মিঠা পান, সাচিপান ইত্যাদি। বোরোজে উৎপাদিত পান ছাড়া এক প্রকার পান আছে যা গাছ পান। এ পান বড় বড় গাছের তলায় রোপিত হয় এবং বৃক্ষকে আশ্রয় করে বেড়ে ওঠে। অপবিত্র দেহে ও অশুচি অবস্থায় কেউ পানের বোরোজে প্রবেশ করে না। পান পীনস রোগ ও বাতনাশ করে ও পচন দোষ নিবারক। অজীর্ণ, গ্রহণী ও মুখের দুর্গন্ধ রোগে পানের ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। সর্দি ও কাশিতে পানে তেল মেখে তা আগুনে শেঁকে অগ্নিউত্তপ্ত পান বুকের উপর রাখলে উপকার পাওয়া যায়। সতীনদের বা কোন লোককে অনিষ্ট করার জন্য পানপড়া গ্রাম-জীবনে ব্যবহৃত হয়। বশীকরণের কাজে লাগান হয় পানকে। পানপড়ার ভীতি থেকে অনেক সমাজের লোক পান খিলি করে না দিয়ে পান সুপারী খয়ের চুন ইত্যাদি আলাদা আলাদা করে দিয়ে থাকেন। অনেক ব্রতের মূলে আছে পান সুপারী। এ পান গোছ, বিড়া, পণ প্রভৃতি হিসাবে বিক্রী হয়।

বছরের পর বছর কাজ করে যায় চাষী। হল চালনা, বীজ বোনা, ধান কাটা, ধান গোছান, ধান গোলাজাত করা—পাট কাটা, পাট তৈরী করা, পান ইত্যাদি উৎপন্ন করা, নানাবিধ কাজ। কাজের ফাঁকে সে গান গায়। চাষের কথা, ক্ষেত্র বন্দনাদি করে নানা সুরে। গম্ভীরা গানও গায় চাষী—

'তুমি চাষা হয়ে কাশীবাসী কেন মহেশ্বর। তোমার কর্মক্ষেত্র এই ব্রহ্মাণ্ড ক্ষেত্র তব হর। লয়ে মদন-রতির লাঙ্গল ঈষ, চাষ জুড়ছে জগদীশ। (তুমি) বিষম বেগে বিপুল বিশ্ব ঘুরাও নিরন্তর। ব্রহ্মা যিনি বিষ্ণু কুমার, বীজ বুনানী মজুর তোমার। কতই যে বীজ হয় না সুমার, ওহে গঙ্গাধর। (তুমি) বীজ বুনাতে ব্রহ্মায় ভুগাও, বিষ্ণু দ্বারা ফসল জোগাও। নিজে বসে ঠমরু-তালে ডমরু বাজাও (আর) ঝুমরুতে গান ধর'। অন্য দিকে মিথ্যার বেসাতি যারা করে বা যারা অহেতুক দর্প প্রকাশ করে তাদের প্রতি চলে তীব্র কটাক্ষ—'দর্প করে বলছে ব্যাঙ, আমার হাতির মত চারটে ঠ্যাঙ, আমি ভাই সত্য কথা কই, সর্পের ছানা ফেলে শশব্যস্তে যাই যে সরে, আমি বাপের ব্যাটা পুরুষ মন্দ নই। দর্প করে বলছে ফেউ, আমার মত নাইকো কেউ, আমি ভাই বাঘের পিছনে লাগি, কেলে কুকুর দেখলে পরে, লেজকে গুটাই পিছন ভরে, নদীর ঝোপে ঠকঠকিয়ে কাঁপি। দর্প করে বলছে ছার, আমার সব জায়গায় অধিকার, বাগেবুগে পাই যদি লেপ কাঁথার ফাঁকটি, মরা মানুষের রক্ত খাই, আপন পেটটি ভরে ভাই, জ্যান্তের হাতে পড়লে পরে পটাং করে ফুটিয়ে দেয় পেটটি। দর্প করে বলছে মশা, আমার ভাই বড় গোঁসা, মশারি খাটালে আমি জব্দ, ফাঁকা জায়গায় পেলে পরে, রক্ত খাই পেটটি ভরে, সুরাসুর কম্পমান শুনলে আমার শব্দ। দর্প করে বলছে পাঁঠা, আমার বড় বুদ্ধি আঁটা, তাইত আমার মাথা মোটা ছিল, যদি গাত্রের গন্ধ ঘুচে যেত, শুধু মুখে দাড়ি হত,



লোকে বলত শালগ্রামশিলা। দর্প করে বলছে ষাঁড়, আমার সব জায়গায় অধিকার, আমি কিষ্টের মত গোষ্ঠযাত্রা করি, কিষ্ট যেমন ব্রজাঙ্গনার সনে, ফিরতেন সদাই বনে বনে, তেমনি আমি গাভীগণের পিছনেতে ফিরি'। এই সব গানের মধ্যে আছে বাঙলার নিজস্ব ঢঙে রচিত বিভিন্ন সুর ও কথার কলতান। বোকামির বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে আহাম্মকদের প্রতি অশ্রদ্ধা

প্রকাশান্তে গীত হয়—'বোকার মধ্যে বোকা বল বোকা হ'ল এক। বামনকুলে জন্ম লিয়া যে জন লিল ভাগ্যি। বোকার মধ্যে বোকা বল বোকা হ'ল দুই। সমস্ত ঘর ছাইয়া যে জন ঘরের না মারে টুই। বোকার মধ্যে বোকা বল বোকা হ'ল তিন। নিজের টাকা দিয়া যেজন পরের করে ঋণ। বোকার মধ্যে বোকা বল বোকা হ'ল চার। নিজে না করে উপায় বউয়ের উপায় খায়। বোকার মধ্যে বোকা বল বোকা হ'ল পাঁচ। পরার পুকুরে যে জন ভাগে ছাড়া দেয় মাছ। বোকার মধ্যে বোকা বল বোকা হ'ল ছয়। নিজের টাকা লিয়া যে জন পরের বাড়ী থয়। বোকার মধ্যে বোকা বল বোকা হ'ল সাত। নিজের বাপকে ভাত দেয় না শ্বশুরকে দেয় ভাত। বোকার মধ্যে বোকা বল বোকা হ'ল আট। স্বামী বর্তমানে মাগী করা দেয় হাট। বোকার মধ্যে বোকা বল বোকা হ'ল নয়। বউ মারা গেলে ও শ্বশুর বাড়ী যায়। বোকার মধ্যে বোকা বল বোকা হ'ল দশ। নিজের জমি থুয়ে যে করে পরের জমি চাষ। বোকার মধ্যে বোকা বল বোকা হ'ল এগার। এগার নম্বর বোকা রে ভাই তার কিবা দশা। দুই মাস দুই 'ডানার' চলত দশমাস খায় কি তা। ভাদ্র মাসে দেখতে মজা সারামাটির পুল। আশ্বিন মাসে দেখতে ভাল রাঙ্গা জবাফুল। মিঞার মাথায় দেখতে ভাল কেঁকরা-কেঁকরা চুল। দয়ের মিঠা বালু কুড়ালের মিঠা শীল। ভাল মানুষের জবান মিঠা কামিনের মিঠা কিল। যাত্রা গান শুনতে ভাল ফুলট বাঁশীর গান। মৃত্যুকালে শুনতে ভাল আল্লা নবীর নাম। বৈশাখ মাসে খাতে ভাল লিবুগুলা জাম। জ্যৈষ্ঠ মাসে খাতে মজা পাকাফল আম। আষাঢ় মাসে খাতে ভাল পাকা কাঁঠালের কুয়া। শ্রাবণ মাসে খাতে মজা আনারসের কোয়া। ভাদ্র মাসে খাওয়া মজা তালপিঠা করিলে। আশ্বিন মাসে খাওয়া মজা শ্বশুর বাড়ী গেলে। মাসের মধ্যে দু' চারবার যে যায় শ্বশুরবাড়ী। তার কপালে মুড়াঝাঁটা পান্তার ঘটা হয়। বৎসরেতে দু' চারবার শ্বশুরবাড়ী যায়। শালাসম্বন্ধীর মাগেরা তাকে আকরে খাওয়ায়। (আর) বলে যে নানা ঠাকুর আছে।' বোকাদের কথা বলেই ক্ষান্ত হয় না। দেমাকি-নারীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়—'অবোধ নারী করে সব যৌবনের গৌরব, বুঝতে নারি কিসের কারণে। চিরকালের বস্তু নয়, থাকে বছর আট নয়, একবার ভেবে দেখ মনে। বোষ্টমী যায় গৃহস্থ ঘরে, বুকের যৌবন থাকলে পরে, আকড়া চাল দিলে ভিক্ষা লয় না। যদি ঘোষের নারীর যৌবন থাকে, ঘোর ঘোর বলিয়া ডাকে, খইল কিনলে আক্রা বইত দেয় না। যৌবন গরব

মিছে ধন, বাজীকরের বাজী যেমন, কিছুদিন সিসে দেখায় সোনা। যৌবন যাওয়া মাত্র কিসে বা জুড়াবে গাত্র, তালপত্র ছায়ার তুলনা'। এই ধরণের আচরণ অনুষ্ঠানাদির মধ্যে নতুন ধান তোলা হয়। সেই নতুন ধানকে উপলক্ষ করে লক্ষ্মীদেবীর আহ্বান জানান হয়। হয় নবান্ন বা শস্যোৎসব মাটি ও মানুষের সহযোগিতার উৎসব। এই উৎসবে পিতৃপুরুষ, গৃহদেবতা, আত্মীয় পরিজন ও পশু-পক্ষীদের অন্ন নিবেদন করা হয়। আমন ধান বাঙলার প্রধান ফসল তাই আমন ধান দিয়েই হয় বিধি-ব্যবস্থা। বাঙলার অনেক জায়গায় আমন ধানের সাধভক্ষণের ব্যবস্থাও আছে। আশ্বিন বা নল সংক্রান্তিতে এই অনুষ্ঠান হয়। কৃষিজীবী মানুষ সুগন্ধাদি দ্বারা ধান্যলক্ষ্মীকে অভিনন্দিত করে এদিন। সেদিন আম্রপাত্রে ভাজা মেথি রেখে বেঁধে দেওয়া হয় প্যাকাটির মাথায়। প্যাকাটিকে ধানের ক্ষেতে গুঁজে দিয়ে আসার সময় বলা হয়—'আশ্বিন যায় কার্তিক আসে সকল শস্যের গর্ভ বসে।...হাতে গুমা ধান হইস তিন দুনা।' প্যাকাটিকে নল বলা হয়। নল পোঁতার সময় ওল, মানকচু, সরিষা, আউশ ধানের আলোচাল, ঘি, মধু ইত্যাদি দিয়ে পূর্ণগর্ভা ধান্যলক্ষ্মীকে সাধ দেওয়া হয়। লক্ষ্মীকে ডেকে বলা হয়, 'সোরহা! সোগারে ধান টোনামোনা, মোর ধান পাকা সোনা, সোরহা।' এই ভাবেই এগিয়ে যায় বারো মাসে তেরো পার্বণ।

ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ পত্নীমূলক। গৃহীর ত্রিবর্গের সহায় উর্বরতা। মানুষের উর্বরতা বাড়াবার জন্য তাই চড়ুই পাখির অংশ, ছাগের মাংস ও অণ্ডকোষ খেতে দেওয়া হয়। সুকণ্ঠের জন্য কোকিলের মাংসও খাবার বিধান আছে। অনাবৃষ্টির জন্য শিলা জলে ডুবান হয়। নব বিবাহিতা অথবা পুষ্পবতী নারী বাচ্চা ছেলে বা নোড়া কোলে করে থাকলে সন্তানবতী হয়। যেহেতু শিলা ধ্রুব এবং নক্ষত্র অচল সেই হেতু শিলা ও নোড়ার উপর দাঁড়ালে নারী পতিকুলে অচলা থাকে। ইতুপূজার শরায় যে নানাবিধ শস্যবীজ বপন করা হয় তা প্রচুর রবিশস্য উৎপাদনের জন্য।

পর্বন থেকে এসেছে পার্বণ। পর্বন অর্থে গ্রন্থি, সন্ধি। সকলের সঙ্গে মিলেমিশে শত্রুমিত্রের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে প্রতিপালিত হয় পার্বণ। বাঙলার কোন দুটি পার্বণ এক প্রকার নয়। এই কারণে পার্বণের আনন্দও এক প্রকার নয়। নবান্নে হয় নতুন ধানের চাল ব্যবহার উপলক্ষে অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের মুখ্য অঙ্গ নতুন চালে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান। বিশুদ্ধ দিনে এ অনুষ্ঠান পালনীয়। সূর্য বিশাখা নক্ষত্রে গত হলে ত্রয়োদশী, রিক্তা ও নন্দা তিথিতে শনি, মঙ্গল ও শুক্রবারে চৈত্র, পৌষ ও কার্তিক

মাসে, হরিশয়নে, কৃষ্ণপক্ষে মৃগনেত্রাতে, অষ্টম ও জন্মচন্দ্রে এবং জন্ম-তিথিতে, পূর্বাষাঢ়া, পূর্বভাদ্রপদ, পূর্বফাল্গুনী, মঘা, ভরণী, অশ্লেষা ও আর্দ্রা নক্ষত্রে নবান্ন শ্রাদ্ধ বা নবান্ন ভক্ষণ প্রথাসিদ্ধ নয়। এই সকল ভিন্ন অপর তিথি, নক্ষত্র ও বারহত্যাদিতে নবান্ন শ্রাদ্ধ বা নবান্ন ভক্ষণ প্রশস্ত।

এই সব পার্বণানুষ্ঠানের মারফত লোককবি সরল ভাষায় ভাবের গভীরতা ও কাব্যের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছেন—'ধান কুটি পরিপাটি। ধান আমাদের লক্ষ্মী মাটি। ধান কুটি ধান কুটি ধান কুটি'। হাসিখুশীতে ভরা এই গান। আঁটি আঁটি ধানে বাড়ির উঠোন ভরে যায়, ধান মাড়াইর কাজও শেষ হয়। তখন আসে ধান ভানার কাজ। ধান ভানার জন্য একদা ঢেঁকি অপরিহার্য ছিল। তাই ঢেঁকি পূজার আয়োজনও ছিল। ঢেঁকিপূজা ও ঢেঁকিতে নান্দীমুখের বারাভানা বিবাহাদি-সংস্কারের অন্যতম প্রধান অঙ্গ ছিল সমস্ত প্রাচীন উৎসবে। বাঙালীর নবান্নের সমগোত্রীয় উৎসব—লেপচাদের তফালভুর করুবির পূজা এবং ত্রিপুরাদের মমিতা উৎসব। অন্যান্যদেরও আছে নবান্ন উৎসব।

ঢেঁকিশাল বাঙালী গৃহিণীর বিশেষ পবিত্র স্থান। অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ও বিবাহে ঢেঁকি পূজার ও ঢেঁকিতে ধানভানা ও হলুদ কোটার রেওয়াজ আছে। 'ঢেঁকি পড়ন্ত', 'গাই বিয়ন্ত', 'উনুন জ্বলন্ত' তাই সচ্ছলতার প্রতীক। সচ্ছল অবস্থার আনন্দ ফেটে পড়ে ছড়ায়—'ঢেঁকি কুর কুর। বেড়িয়া আসেক ধান রে। ঢেঁকি কুর কুর। জামাই আচ্চে বাড়ী রে। ঢেঁকি কুর কুর। হবে চাল তাড়াতাড়ি রে। ঢেঁকি কুর কুর। হইয়া গেছে চাল রে।'

কাঠের বা মাটির বাটির ধরণে যে গর্তে ঢেঁকির মুষলের ঘা পড়ে তাই ধানভানা। ধানভানার সময় গর্ত থেকে যাতে ধান এদিক ওদিক ছড়িয়ে যেতে না পারে সেজন্য আছে কুমোরের চাকের মত মাটির লোট। ঢেঁকির লেজ বা পিছনের দিকের চেপ্টা অংশে ধানভানুনীরা পা চাপায়। মাটির যে বেদীর উপর দাঁড়িয়ে ঢেঁকিতে পাড় দেয় তা হচ্ছে পৈঠা। ঢেঁকি চালাবার সময় যাতে তার মাথা এদিক ওদিক হেলতে দুলতে না পারে তার জন্য অনেক জায়গায় ঢেঁকির গা ঘেঁষে দুটি লম্বা খুঁটি বা ঘাসনা ও গায়না পুঁতে দেওয়া হয়। ধানভানুনীদের অনেকে পরিবারের নিজ কাজ করেন। অনেক সময় আবার বাইরের স্ত্রীলোকও এ কাজে লাগান হয়। পারিশ্রমিকের বদলে তাঁরা নগদ বা ধান বা চাল পান।

ধান ভানার সময় যে স্ত্রীলোক গড় বা লোটের কাছে থাকেন, তিনি এদিক ওদিক ছড়ানো ধান হাত দিয়ে আবার গর্তে ফেলে দেন। এ কাজ

করতে গিয়ে অনেক সময় ঢেঁকির পাড় তাঁর হাতের উপর এসে পড়তে পারে, খুব সতর্কতার সঙ্গে তিনি হাতের কাজ করেন। তাঁকে গ্রামের মেয়েরা বলেন সৈঁকতদিয়নি। ধান ভানার প্রথম দুই এক স্তরে তুষ নিষ্কাসিত চাউলের সঙ্গে কতক আভাঙ্গা, কতক আধাভাঙ্গা ধান, তুষ ও লাল চাউল থাকে। এই চাউল আউড়িয়া চাউল। আউড়িয়া চাউল কুলোয় ঝেড়ে আবার গড়ে ফেলা হয় চাউল কাঁড়াবার জন্য। বা যে চাউলের ভাত আমরা খাই সেই চাউল তৈরির জন্য। 'ভিক্ষার চাল কাড়া আর আকাড়া' কথাটি চাউল উৎপাদনের এই পদ্ধতি থেকে এসেছে।

ধান ভানতে ভানতে অনেক সময়ই মেয়েদের গান গাইতে শোনা যায়— 'ধান ভানি ধান ভানি মচ্ছির গুঁড়ো দিয়ে। ঐ আসছে খোকার শ্বশুর দু'খানা কুলো নিয়ে। একখানা কুলো মাঠে একখানা কুলো ঘাটে। বাঁশ মড় মড করে, সোনার টোপর ভেঙে পড়ে। কে গড়াতে পারে? খোকার ভাই বলরাম সে-ই গড়াতে পারে।' মেয়েদের নিজেদের সৃষ্ট গানের সঙ্গে সঙ্গে পল্লীকবি রচিত ঢেঁকির গান গাওয়া হয়। যেমন 'ধান বলে রে মুরলী বদনী। বৃন্দাবনে ধান ভানে ষোলশ' গোপিনী। ঢেঁকিটা বলেরে ভাই আমি নারদের হাতি। সব ঠাঁই থাকতে আমার পাছায় মারে লাথি। ঘাসনা গায়না বলে আমরা জোড়ের ভাই। দুই সখিতে ধান ভানে কৃষ্ণ গুণ গাই। মুখ সলাই বলে আমার লোহায় বাঁধা ঠোঁট। আমার এঁটো খেয়ে লোকের চাঁদপারা মুখ। কুলোটা বলে রে ভাই আমি বাঁশের চাঙ্গারী। যত কিছু ধান চাল আমিই পাছুরী। চালুনটা বলে রে ভাই আমি সহস্রধারা। যত কিছু ধান চাল আমি করি সরাভরা। আগুনটা বলে রে ভাই আমায় করে হেলা। যত কিছু ধান চাল আমিই করি মেলা। হাঁড়িটা বলে রে ভাই আমার নাম হরে। যত কিছু ধান চাল আমিই রাখি ভরে।' এমনি করেই নবান্ন এসে যায়।

নবান্ন যেতে না যেতেই এসে যায়—পৌষ আগলানো। পৌষ আগলানো বা পৌষ-পার্বণ উপলক্ষে গুপ্ত কবি লিখেছেন—'সুখের শিশির কাল, সুখে পূর্ণ ধরা। এত ভঙ্গ বঙ্গদেশে তবু রঙ্গে ভরা॥ ধনুর তনুর শেষ মকরের যোগ। সন্ধিক্ষণে তিন দিন মহা সুখ ভোগ॥ মকর সংক্রান্তি স্নানে জন্মে মহাফল। মকর মিতিন সই, চল্ চল্ চল্।...উনুনে ছাউনি করি বাউনি বাঁধিয়া। চাউনি কর্তার পানে কাঁদুনি কাঁদিয়া॥...মাগীদের নাহি আর তিন রাত্রি ঘুম। গড়াগড়ি ছড়াছড়ি রন্ধনের ধুম।' পড়ে যায় বিবাহ উৎসবের ধুম। ধন ও জনে ধরিত্রীকে পরিপূর্ণ করার জন্য নানাবিধ আয়োজন। নবান্নের কৃষি উৎসবের মধ্যে যে ধরিত্রীর সুপ্রসবের আনন্দ পৌষ আগলানোর

মধ্যেও তা স্পষ্ট। তাই ক্ষেত্র-প্রতীক পৌষবুড়ি সিঁদুর চর্চিত নোড়া। এই নোড়াকে ঝুড়ি চাপা দেওয়া হয় যেন নবদম্পতির বাসরঘর।

পৌষবুড়ি তৈরী করতে লাগে বকনা গরুর গোবর। পৌষবুড়ির উপর তুলসীর মঞ্জরী, ধনে-জিরের শীষ, খড়ের বেষ্টনী দিয়ে বুড়িকে আগলানো হয়। পৌষসংক্রান্তির পর সন্ধ্যায় হয় বুড়ি বিসর্জন। বিসর্জন স্নানান্তে শুষণী কলমী শাকের শীষ আর জলভরা ঘট নিয়ে ঘরে ঢোকার সময় চীৎকার করতে হয়—'পৌষপাললো, পৌষপাললো, আগল দে, আগল দে'। সব ঘরের দরজা এক মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যায়। পৌষবুড়িকে ধরে রাখার ম্যাজিক এটা। এই ম্যাজিকের গান—'এসো পৌষ যেও না, জন্ম জন্ম ছেড়ো না'।

পৌষ আগলানো. এবং আওনি বাওনি একই অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে এক মুঠো ধানগাছ পূজো করে সে ধানের এক একটি শীষ বাক্স, সিন্দুক, খাট, চৌকি, গোলা, গোশালা, ঘরের চাল, বেড়া প্রভৃতি স্থানে বেঁধে রাখতে রাখতে বলা হয়—'আওনি বাওনি চাওনি, তিন দিন পিঠা খাওনি, তিনদিন না কোথাও যেও, ঘরে বসে পিঠা খেও'। উত্তরবঙ্গের আওরি বাওরি এই একই প্রথা। সর্বত্র একই যাদু বা ম্যাজিক। প্রজনন শক্তি বাড়াবার ও বংশবৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা। এই অনুষ্ঠানের এক মুঠো ধান, ধনে-জিরে-যবের শীষ, আলুর ফুল, দুর্বা ঘাস সবই উর্বরতার প্রতীক। পৌষের পুলিপিঠা, চুষিপিঠা, চিতইপিঠার আকৃতির মধ্যে জননাঙ্গ প্রতীকের ইঙ্গিত পরিস্ফুট।

পৌষ জনজীবনে শস্যের সম্ভার নিয়ে আসে তাই পৌষকে ছেড়ে দিতে মন চায় না—'ঘাটের পোষ মাঠের পোষ, মেউতলাতে জড়ো হোস, আদারের পোষ বাদাড়ের পোষ, ঘরের মেঝেয় জড়ো হোস, পোষের হাতে আড়ি, কাঁকালে আড়ি, পোষ যায় রে গেরস্থের বাড়ী। পোষমাসের পোষের ঝারি, বিন-কাপাসের ঘর ভরি'। তবুও আটকানো যায় না পৌষকে। পৌষ আগলাবার নানা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাকে ধরে রাখা যায় না। প্রকৃতির রাজ্যের নিয়মাধীন পৌষ প্রকৃতির নিয়মেই যায় ও আসে।

গ্রামের পথ চলতে চলতে ফসলের জমিতে, লাউ-কুমড়োর মাচায়, ধানের জমির এক কোণে উঁচু বংশদণ্ডের উপর খড়ের একটি মূর্তি অথবা চুনকালি মাখানো হাঁড়ির উল্টো দিক, ছেঁড়া জামা জুতো, পুরানো বস্ত্র দেখতে পাওয়া যায়। এ ধরণের মূর্তি সহসা দেখলে অনেকেরই ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। বিশেষত নির্জন দুপুরে হঠাৎ এই প্রকার অরণ্য বা আচাভূয়া মূর্তি দেখে অনেকেই ভূত ভূত বলে চীৎকার করে ওঠে। এই

অরগার ভয়ে যখন পথিক পীড়িত তখন হাসতে হাসতে কৃষক এগিয়ে এসে ভীতত্রস্ত পথিককে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—'পশুপক্ষীদের ভয় দেখাবার জন্য এ মূর্তি এখানে রাখা হয়েছে, যাতে ওরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। তাছাড়া কুনজুরে লোকেদের দৃষ্টি থেকে শস্য রক্ষা করার জন্যও এর দরকার। যাদের দৃষ্টি খারাপ তাদের দৃষ্টি সোজা সুজি ভুঁই ও ফসলের প্রতি পড়লে ভুঁই ও ফসলের ক্ষতি হয়। অরগা কুনজুরেদের পাহারা দেয়!' অরগা দেখতে এবং গ্রামের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান অনুধাবনে আমরা পদযাত্রা ব্যতীত যে সব যান ব্যবহার করি তার মধ্যে জীপ, সাইকেল, গরু ও মোষের গাড়ী অন্যতম। গ্রাম বাঙলায় চলাফেরার জন্য পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র গরু ও মোষের গাড়ী যথেষ্ট জনপ্রিয়। লাঙ্গল বা ঢেঁকির মতই প্রাচীন এই গাড়া। প্রয়োজনভেদে এ গাড়ীর চাকা ছোট বা বড় মাপের করা হয়। চাকা অরযুক্ত অথবা অরবিহীন হতে পারে। অরগুলো সাজানোর ব্যবস্থা দু-তিন প্রকারে হতে পারে। গাড়ীর উপরের অংশ বা মাচাড় অর্থাৎ যেখানে মাল রাখা হয় বা যার উপর ছই দিয়ে মানুষ টানা হয় তা আয়ত বা ত্রিকোণাকৃতি হতে পারে। সাধারণত অরবিহীন চাকা কয়েকখণ্ড কাঠের উপর জুড়ে দেওয়া হয়। বাঙলায় অরযুক্ত চাকাই অধিক প্রচলিত। জোড়া চাকার গাড়ীও আছে। এই চাকায় অরগুলো এক এক করে জোড়া দিয়ে বেলনের ভিতর দিয়ে গাঁথা হয়। গঙ্গামাতৃক সমতল ভূমিতে অরযুক্ত চাকার প্রচলন বেশী। শ্যামদেশ, চীন, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের এই গাড়ীর চাকা অরযুক্ত নয়।

বাঙলাদেশে বিশেষত বরিশাল প্রভৃতি জেলার যাতায়াতের প্রধান যানবাহন নৌকো। সম্প্রতি সাইকেল খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। রাস্তা ক্রমশ পাকা হয়ে ওঠায় অনেকে গ্রাম-প্রদক্ষিণে জীপগাড়ী ব্যবহার করেন আজকাল। আধুনিক ও ঐতিহ্যসম্পন্ন যান অর্থাৎ গো-শকটাদি ছাড়া স্কুটার, মটর সাইকেল, মটরগাড়ী প্রভৃতি আধুনিক যানে করেই শহরের মানুষ লোক জীবনের সংস্পর্শে আসেন—নানা আচার-অনুষ্ঠানে, পৌষ আগলানো ইত্যাদিতে যোগদান করেন। পৌষ আগলানো অনুষ্ঠানে মেয়েরা ও ছেলেরা আগুন নিয়ে খেলা করে। সেখানে চাপান কাটান চলে। জ্বলন্ত মশাল হাতে নিয়ে যোগদানকারী বিভিন্ন গাছের নীচে গিয়ে বসে আর গান গায়। শস্য ও সন্তানকে বিপদ-মুক্ত করার জন্য এ গান। ছেলেরা—'পাথুরিতে টেঙ্গা দৈ, ভাইভাতারাদির ভাতার কৈ?' মেয়েরা—'পাথুরিতে টেঙ্গা দৈ, বোনমেগোদের মাগ কৈ?' ছেলেরা—

'উলোর বনে চেলা লো, ভাইভাতারাদির খেলা লো'। মেয়েরা—'তাঁত খোলাখান তাতলো বোনমেগোরা মাতলো।' মেয়েরা—'কুলোর ডগে নুন, বোনমেগোদের গুণ। কুলোর ডগে জিরে, বোনমেগোদের কিরে।' ছেলেরা—'ভাই খা ভাতার খা, এগিয়ে আয় আর এক পা। আর এক পা আয় লো, ভাইয়ের মাথা খালো'। এরূপ চাপান কাটানের পর হয় সমাপ্তি সঙ্গীত যুবক-যুবতীদের মিলিত কণ্ঠে। এ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি সঙ্গীত সন্তান ও শস্যের দ্বৈতচিন্তাকে অদ্বৈত সন্ধিতে সমন্বিত করে। তাই গান গাওয়া হয়—'কেউটি কুটি মেউটি ; দুয়ারে বসো সে। ছোট ছোট পিঠেগুলো, গালে ভরো সে। হুক্কাহুয়া কাঁঠালের কোয়া, ছেলেপিলেদের বাগিয়ে শোয়া'। ইত্যাদি গানের মধ্যে যে চিন্তাভাবনার প্রকাশ তা নিঃসন্দেহে কামগন্ধময়।

সন্তানের বৈধ রূপ বিবাহে। বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিবাহের মত গাছের সঙ্গে গাছের ও অন্যান্য সামগ্রীরও বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে নানা কৃত্য। বিবাহে শাস্ত্রীয় ও লৌকিক অনুষ্ঠান মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। বর্তমান আলোচনায় স্বভাবতই আমরা লৌকিক আচার-আচরণের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ছি। বিবাহের আলোচনায় তার অন্যথা হবে এমন আশা করা যায় না। তাই বিবাহ আলোচনার পূর্বে আমরা আরও কয়েকটি লোকায়ত অনুষ্ঠানের কথা, লোক-সমাজের দিনলিপির সংক্ষিপ্ততম কিছু বিবরণী পেশ করতে চাই। এবং তা করতে গিয়ে বঙ্গললনাদের দ্বারস্থ না হয়ে উপায় নেই। কিন্তু তাঁরা সদাব্যস্ত। কখন শোনাবেন তাঁরা তাঁদের নিজেদেব কথা! সুতরাং বঙ্গললনা-সংবাদ সংগ্রহে আমাদের এমন একটি দিন বেছে নিতে হবে যেদিন তাঁরা আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করতে অন্তত কিছুক্ষণ সময় অপব্যয় করতে পারেন ; যেদিনে অন্তত তাঁদের হেঁসেলের ঝামেলা পোহাতে হয় না, অর্থাৎ রান্নাঘরের কাজকর্ম তাঁদেব যেদিন থাকবে না। অরন্ধনই তাঁদের সে সুযোগ করে দেয়। তাই অরন্ধনকে স্বাগত জানাই এই মুহূর্তে।

রন্ধন বর্জন প্রথাই অরন্ধন। এই দিনে আনুষ্ঠানিক রান্না বন্ধ। বাসি খাবার খাওয়ার রীতি। বিশেষ বিশেষ দিনে যেমন ভাদ্র সংক্রান্তি, শীতল ষষ্ঠী বা শ্রীপঞ্চমীর দিনে নানা স্থানে অরন্ধন প্রতিপালিত হয়। অনেক জায়গায় আবার দশহরা এবং শ্রাবণ সংক্রান্তিতেও রান্না করা হয় না। তাছাড়া ইচ্ছা অরন্ধনও আছে। যেদিন ইচ্ছা সেদিনেই কোন ব্রত বা তজ্জাতীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে অরন্ধন প্রতিপালিত হতে পারে।

ভাদ্র সংক্রান্তির অরন্ধনকে রন্ধন ধর্মঘট বা রান্না বনধ্‌ও বলা যেতে পারে। বিশ্বকর্মা পূজো উপলক্ষে কলকারখানাদি বন্ধ থাকার জন্য এদিনে পুরুষেরা যেমনি বেকার, তেমনি বেকার মেয়েরাও রান্না না করার দরুন। নিষ্কর্মা এ দিনে বাঙলার নারী সমাজের ছুটি। এই ধরণের কোনদিন ছাড়া অর্থাৎ অরন্ধন ছাড়া অন্য কোন উৎসব বা অনুষ্ঠানে আমরা আমাদের নারী সমাজকে বিশ্রাম বা ছুটি দিতে পারি না। নারীসমাজও তাঁদের নিত্যনৈমিত্তিক রন্ধনকার্য থেকে কোন-মতেই বিশ্রাম নেন না, নিতে পারেন না।

ভাদ্র সংক্রান্তির অরন্ধনের দিনে উনুনের ভিতর সিজ বা মনসা গাছের ডাল রেখে সাধারণত মনসা পূজা করার রীতি। মনসাদেবীর সাপ এদিনে বৃষ্টি ও জলের উপদ্রব থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য নানা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে চেষ্টা করে—উনুনের গর্তেও গিয়ে লুকোয় সে। এ দিনে উনুনে লুক্কায়িত সাপেরা যাতে নিরাপদে বিশ্রাম করতে পারে তার জন্যই অরন্ধনের সূত্রপাত বলে কিছু লোক মনে করেন। আবার কেউ কেউ বলেন যে বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে সমস্ত যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ায় রন্ধন সামগ্রীর ব্যবহারও লোকাচার অনুযায়ী নিষিদ্ধ। যার ফলে অরন্ধন প্রতিপালন না করে উপায় থাকে না। হয়ত অন্যপ্রকার বিশ্বাসও প্রচলিত আছে কোন সমাজে।

সাপ প্রজনন শক্তির প্রতীক। বহুক্ষেত্রেই তাই সাপ মারা নিষিদ্ধ। মূলত কৌম সমাজের প্রজনন শক্তি বৃদ্ধির পূজার পথ ধরেই মনসা পূজার উদ্ভব বলে বহু পণ্ডিত মনে করেন। মনসাদেবীর সঙ্গে একাধিক সর্পের ক্রোড়াসীন একটি মানব শিশুর, একটি ফলের এবং মনসাঘটের প্রতিকৃতি সবই প্রজনন শক্তির প্রতীক। মনসার ব্রতকথায়ও এ তথ্য স্পষ্ট। এ দিবসের অরন্ধনান্তে মনসা বা সিজ পূজা মূলত প্রজননশক্তি বৃদ্ধির আরাধনা বা প্রচেষ্টা ব্যতীত কিছুই নয় বলেই অনেকে মনে করেন।

অরন্ধন লোকায়ত অনুষ্ঠান। ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা এখানে শালপ্রাংশু হবার অবকাশ পায় নি। যৌথ স্পৃহা ও একত্রিত কর্মকাণ্ডই অরন্ধন অনুষ্ঠানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ। সমষ্টিপ্রবণতা থেকেই এ সব উৎসবের বিকাশ ও বিবর্ধন। এ অনুষ্ঠান সমগ্র লোকসমাজের। কৃষি ও গ্রাম-নির্ভর সমস্ত সমাজ এখানে সচল। এ উৎসব গোষ্ঠীবদ্ধ ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানের একটি। ইন্দ্রজালে বৈজ্ঞানিক সচেতনার অভাব থাকলেও অত্যাচারজর্জর মানুষের হা-হুতাশ বা আর্তনাদের অবকাশ নেই। বাস্তবকে বশ করার জন্য মানুষ সেখানে বিরূপ প্রকৃতির বিরুদ্ধে সতত সংগ্রামশীল। কালে ইন্দ্রজাল ধর্মের অবয়বে

রূপান্তরিত হলে সেখানে ধর্ম ও যাদু মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

সন্তান প্রজননের ক্ষেত্রে যেমন পুরুষ নারীর সহযোগী, অরন্ধন অনুষ্ঠানেও তেমনি পুরুষ নারীর সহযোগী। কারণ পুরুষের অনিচ্ছায় নারীর অরন্ধন প্রতিপালন অসম্ভব। নারী সন্তান ধারণে সক্ষম অতএব সে উর্বরতার প্রতীক। নারীর প্রজনন ক্ষমতা প্রকৃতির ক্ষেত্রে জনন-ক্ষমতা সঞ্চারিত করবে এ ধারণার বশবর্তী হয়েই বহু প্রাচীন জাতি কৃষিকর্মের সুরুতে মাঠের পাশেই নানা প্রকার্ মৈথুন ক্রীড়ায় লিপ্ত হত অধিক ফসল কামনার উদ্দেশ্যে। মনে করা হয় জমির উর্বরতা বৃদ্ধির কামনায় অনুষ্ঠিত নানাবিধ যাদুর অনুষ্ঠান নারীর এক্তিয়ারে। জমির উর্বরতা বৃদ্ধির কামনা কিংবা কৃষি উৎসব অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ফসলের ফলন বৃদ্ধি এবং মানুষের বংশবৃদ্ধি। মনসার ব্রতকথাতেও বংশবৃদ্ধির ও যাদুর প্রভাব স্পষ্ট। তাই প্রথম ব্রতচারিণী অর্থাৎ যাঁকে দিয়ে মনসাব্রতের প্রচার করা হয়েছে তাঁকে পোয়াতী বা 'প্রেগনেন্ট' অবস্থায় 'পিক্ আপ' করা হয়েছে। সওদাগরবাড়ীর ছোটবউ, যিনি পোয়াতী, যাঁর 'মাছের অম্বল দিয়ে পান্তাভাত' খাবার ইচ্ছা হওয়ার পরে যখনই স্নান করতে গেলেন তখনই তিনি স্নানের পুকুরে কতগুলো মাছ খেলা করছে দেখতে পেলেন। যেমনি দেখা অমনি নিজের গামছা ছাঁকা দিয়ে সে মাছগুলো ধরে ফেললেন। বাড়ী ফিরে মাছগুলো একটা বড় মাটির জালার ভিতর জিইয়ে রাখলেন। পরদিন সকালে মাছ কুটবার জন্য যেই জালার সরা খুললেন অমনি দেখতে পেলেন মাছগুলো সাপ হয়ে ভাসছে। ছোটবউ অবাক। তবুও তিনি সাপদের অবহেলা না করে দুধকলা দিয়ে পুষতে লাগলেন। সাপেরা ছোট বউয়ের আপ্যায়নে খুশী হয়ে মা মনসাকে বললেন ছোটবউকে তাদের কাছে নিয়ে আসতে। মনসাদেবী ছেলেদের আগ্রহে ছোটবউর মাসীর ছদ্মবেশে সওদাগর-বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন। সওদাগরগিন্নী বললেন, 'কে গো বাছা তুমি, কি তোমার অভিপ্রায়?' শাঁখা-সিঁদুর-চুপড়ী-নোয়া-নথাদি-পরা মাসীরূপী মনসাদেবী বললেন, 'বেয়ানঠাকুরুণ, আমাকে চিনবেন না, আমি আপনার ছোটবউর মাসী'। গিন্নী বললেন—'তা মাসী হয়েছ বেশ কথা, কিন্তু হঠাৎ আজ এখানে?' মনসাদেবী বললেন—'এমনি আর কি, কখনো বোনঝিকে একটু যত্নআত্তি করতে পারি নি। তাই এসেছি আপনার ছোট বউমাকে কিছুদিনের জন্য আমার কাছে নিয়ে যেতে। এখন যদি আপনি অনুমতি করেন তবেই সেটি সম্ভব হয়।' গিন্নী রাসভারী ভঙ্গিতে বললেন—'কোনদিন তো জানতুম না ছোট বউয়ের আপনার কেউ আছে। তা তুমি যখন এতদিন পরে এসেছ,

তখন নিয়ে যাও—অনুমতি দিচ্ছি।' অনুমতি পেয়ে মাসী বোনঝিকে রথে চড়ালেন। রথে উঠে তিনি বললেন—'দেখ মা, তুমি চোখ বোজ। যখন খুলতে বলব তখন চোখ খুলবে।' ছোটবউ মাসীর আদেশ পালন করে বসে রইলেন। হঠাৎ মনসা দেবী চোখ খুলতে বললেন ছোটবউকে। চোখ খুলতেই বিস্ময়ে হতবাক ছোটবউ। মস্ত বড় বাড়ী আর চমৎকার সব আসবাব। পাশে সেই অষ্টনাগ খেলা করছে যাদের মৎস্য ভ্রমে ছোটবউ একদা দুধকলা দিয়ে পুষছিলেন। তারপর অনেক কথা। হঠাৎ কোন কারণে সাপেরা তাঁর উপর রেগে গেল, কামড়াবার জন্য ধাওয়া করল। মনসাদেবীর পরামর্শে তিনি রক্ষা পেলেন। তখন মনসাদেবী চুপি চুপি ছোটবউকে বললেন, 'কি জানিস, আমি তোর মাসী নই, আমি মনসা। ফণামনসা গাছে থাকি। তুই আমার পূজো পৃথিবীতে প্রচার করবি। সারা শ্রাবণমাস ধরে আমার মঙ্গল-কাহিনী গাইবি, ব্রতকথা শুনবি। নাগপঞ্চমী, দশহরা, ভাদ্র-সংক্রান্তিতে সিজ বা ফণী-মনসা গাছ এনে উনুনে আমার প্রতীক হিসাবে রেখে পূজো করবি। এদিনে রান্না করবি না। উনুন জ্বালাবি না। শুদ্ধাচারে রান্নাপূজো করে আমাকে পান্তাভাত সাধ দিবি। তাহলে আর কখ্‌খনো সাপের ভয় থাকবে না। সন্তানের জন্য কষ্ট পেতে হবে না। বন্ধ্যা হতেও হবে না। এ ব্রত যে করবে আমার বরে ধনে জনে পূর্ণ হয়ে সে পরম সুখে দিনাতিপাত করবে'। ছোটবউ আনুপূর্বিক সকল ঘটনা সবিস্তারে সকলের কাছে বললেন। সব কথা শুনে সকলে তাঁর সুখ্যাতি করলেন। তিনি মনসাপূজো সুরু করে দিলেন রান্না ধর্মঘট ও আনুষঙ্গিক কৃত্যাদির মাধ্যমে। যথাসময়ে ছোটবউ সুন্দর ছেলে প্রসব করলেন। পরে আরও ছেলে। ধনজন সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধিশালিনী হয়ে উঠলেন তিনি মনসাদেবীর বরে। ক্রমে সারা দেশব্যাপী মনসার পূজা ও ব্রত অনুষ্ঠিত হয়ে চললো। একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে চললো রন্ধন ধর্মঘট বা অরন্ধন। জনজীবনে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি স্থাপন ছাড়া এ ধর্মঘটের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। ধনজন বৃদ্ধি, বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি, অন্যায় ও পাপের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাবার উদ্দেশ্যেই রন্ধন ধর্মঘট। এ ধরনের আরেকটি ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয় বর্ষা ঋতুতে অম্বুবাচী উপলক্ষ্যে। অম্বুবাচী একটি প্রসিদ্ধ লোকাচার। যেদিন সূর্যের দক্ষিণায়ন হয়, সেদিন অম্বুবাচী। সেদিন মনে করা হয় বর্ষা ঋতুর আরম্ভ। বর্তমানে ৭৷৮ আষাঢ় অম্বুবাচী অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় পৃথিবী জলময় হয়। নানাস্থানে অশুচি জল একাকার হয়ে পড়ে। শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ ও বিধবা পাকদ্রব্য ভোজন করেন না এই সময়। ফলমূল ও কাঁচাদুধ

খেয়ে থাকেন তাঁরা। ঠিক কোন্ দিন দক্ষিণায়ন, সন্দেহ হতে পারে, এই কারণে তিনদিন অম্বুবাচী। অনেকে সাতদিন অম্বুবাচী প্রতিপালন করেন। লাগাতার এ ধর্মঘটে তিন কি সাতদিন রান্না বন্ধ। মাটি খোঁড়া বন্ধ। এমন সব কাজ বন্ধ যাতে পৃথিবীর, মাতা বসুন্ধরার অঙ্গে আঘাত লাগতে পারে। প্রচলিত বিশ্বাস, এ কদিন মাতা বসুন্ধরার ঋতুপর্ব। এবং যতদিন তিনি ঋতুমতী থাকেন ততদিন তাঁর অঙ্গে কোন আঘাত লাগে এমন কোন কাজ করা যাবে না। দরিদ্র চাষী, ক্ষেতমজুর, দিনমজুরাদি সকলেই তাঁদের কাজকর্ম বন্ধ রাখেন এ সময়। বন্ধের আমেজ বিশ্রাম বা 'ফোর্সড রেস্ট' উপভোগ করেন এঁরা সকলে নববর্ষার সূচনায় অন্তত তিনদিন। এই সময় জলের হাত থেকে উদ্ধারের আশায় বিল থেকে সাপ বেরিয়ে ঘরে আশ্রয় নেয়। এবং যেহেতু রান্নাঘরের মেঝে প্রায়ই নীচু হয় সেহেতু সাপ রান্নাঘরের উনুনে আশ্রয় নেয়। সাপের জন্য উনুনে বাটিতে করে দুধ রাখা হয়, সাপ গৃহস্থকে কামড়াবে না এই বিশ্বাসে।

উড়িষ্যার এ পার্বণের তারিখ জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি থেকে তিনদিন। উড়িষ্যাবাসী এ অনুষ্ঠানকে বলেন রজউৎসব। এ উৎসব উড়িষ্যার প্রতিটি ঘরে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি করে। এ সময়ে সব কাজ বন্ধ, এমন কি কলকারখানা, অফিস আদালত পর্যন্ত বন্ধ। আসামের অম্বুবাচী উৎসব আর বাঙলার উৎসব প্রায় একই সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। অম্বুবাচী উপলক্ষে আসামের কামাখ্যা মেলার খুব নামডাক। নদীয়া জেলার মাটিয়ারী গ্রামের অম্বুবাচী মেলায়ও প্রচুর জনসমাগম হয়। পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে এ সময়ে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। নানাবিধ ফলমূলের প্রদর্শনীর বাহার হয় অম্বুবাচী মেলায়। ছুটির আমেজ ও মেলার আনন্দে সকলের উল্লাস। কাদা ঘাঁটা থেকেও বিশ্রাম এ দিন কৃষকের, কাজ থেকে বিশ্রাম শ্রমিকের, সকলের বিশ্রাম। ধনী-দরিদ্র, মালিক-শ্রমিক, চাষী-মজুর, শিক্ষক ও ছাত্র সকলের ছুটি, সকলের বিশ্রাম এই সময় উড়িষ্যায়। বাঙলা বা আসামের অধিবাসীবৃন্দ এত বিশ্রাম উপভোগ করতে পারেন না এ সময়। অবশ্য বিধি যদি বাম হন, অর্থাৎ এক নাগাড়ে বরুণদেব যদি কৃপাবারি বর্ষণ করে চলেন তবে 'রেইনি ডে' যে এক-আধদিন উপভোগ করা যায় না এমন নয়। স্মরণীয়, অম্বুবাচী মূলত বিধবা সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান হলেও অনেক আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বিধবাদের মত অম্বুবাচী পালন করেন। আমরা অরন্ধনের কথা বলছিলাম। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাষষ্ঠী, মাঘ মাসের শীতলষষ্ঠী প্রভৃতি নানা দিনে নানা কারণে রান্না বন্ধ হয়ে থাকে। কোন এক বাড়ীর ছোটবউ রান্না চুরি

করে খেয়ে বিড়ালের নামে দোষ দিতেন। বলতেন, বিড়াল খেয়ে গেছে। এই অপরাধে ও বিড়ালের ক্রোধে একে একে তিনি হারালেন সাতটি ছেলে আর একটি মেয়ে। আঁটকুড়ি বউর মুখ কেউ দেখতে চায় না। সকলে বলে, 'দূর ছাই, দূর ছাই'। বলে—'বউয়ের কি মূর্তি, যেন শেওড়াগাছের চক্রবর্তী' বা ওর 'শুনলে কথার ছন্দ, হাঁড়ি ভেঙে মাছ পালায়, ঝোল রইল বন্ধ'। বলে—'পরিহর বিনা কড়িতে হাট, পরিহর বিনা লড়িতে বাট। পরিহর নদীর তীরে গাছা, পরিহর মায়ের বিহনে বাছা। পরিহর গুয়া রুণাঝুনা, পরিহর ঠাকরুণ কুবচনা। পরিহর নারী যার দুই সাঁই, পরিহর যার দুই গোঁসাই। পরিহর যত্নে ঋণের শেষ, পরিহর রত্নে লাসের বেশ। পরিহর বিনা ঢাকনে বারি, পরিহর লাজ বিহনে বহুড়ী। পরিহর পাঁচদিন ভুঞ্জন-সুখ (অষ্টমী, চতুর্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি)। পরিহর চিরদিন দুর্জন-মুখ। পরিহর নিত্য রতি-পিয়াস, পরিহর ধনী কুটুম্ব পাশ। পরিহর শূন্য নগরের কূপ, পরিহর ব্যঞ্জন বাসি সূপ। পরিহর দুই গ্রামে বাস, পরিহর পরযুবতীর আশ। পরিহর বাটে ক্ষেতের আশ, পরিহর গভীর বয়সের কাশ। পরিহর নিত্য জিরার ঝোল, পরিহর দুষ্টা নারীর কোল। পরিহর পোখরী পিছল-ঘাট, পরিহর যত্নে ভাঙা হাট। পরিহর সুশ্রী বাঁজা-বউ, পরিহর আঁটকুড়ো মাগীর ছোঁ।' ছোট বউকে দেখে যখনতখন এ ছড়া শুনিয়ে দেওয়া হয়। তাকে আঁটকুড়ো বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। ছোট বউ এ সব শোনেন আর কাঁদেন। দেবতার কাছে হয় সন্তান নয় মৃত্যুর প্রার্থনা জানান।

ছোটবউর এত দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা দেখে মা ষষ্ঠীর দয়ার উদ্রেক হয়। তিনি ছদ্মবেশে ছোট বউর কাছে এসে শুক্লাষষ্ঠীর দিনে ষষ্ঠীব্রত পালন করতে বললেন। বললেন 'ও আবাগীর বেটি, তুই সব খাবার চুরি করে খেয়ে বেড়ালের নামে দোষ দিতিস কেন? সেই জন্যই তো আমার বেড়াল তোর ছেলে-মেয়েদের এনে আমাকে দিয়েছে।' ছোটবউ কাঁদতে কাঁদতে বললেন—'মা আমি বড় পাপিষ্ঠা, সংসারে সকলেই আমায় ঘেন্না করে, আমাকে দেখে ছড়া কাটে। তাই আমি বনে এসেছি মরতে। এ জীবনে আর আমার সাধ নেই'। মা ষষ্ঠী বললেন—'মরবি কেন, যা ঐ ওখানে গিয়ে দেখ একটা বিড়াল মরে পচা গলা অবস্থায় পড়ে আছে। এক হাঁড়ি দই এনে ঐ বেড়ালটার গায়ে ঢেলে দে গে, যা। তারপরে জিভে করে ঐ দই আবার হাঁড়িতে তুলে আমার কাছে নিয়ে আয়, তাহলে তোর ছেলেমেয়েদের সব পাবি।'

ছোটবউ তাই করলেন। তখন ষষ্ঠী ছেলেদের আর মেয়েকে ছোটবউর

কাছে এনে দিয়ে বললেন, 'এদের কপালে দই-এর ফোঁটা দে। আর কখনও চুরি করে খেয়ে বেড়ালের নামে দোষ দিস নি যেন। বেড়ালকে কখনও লাথি মারবি নি। ছেলেদের কখনো বাঁ হাতে মারবি নি। তাদের মর বলে গাল দিবি নি। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাষষ্ঠীতে পিটুলীর কালো বেড়াল গড়ে, পিটুলীর কঙ্কন গড়ে, ফল-ফুলের বাটা সাজিয়ে, ছটা পান, ছটা সুপারি, ছটা কলা আর বাঁশপাতায় হলুদের নেকড়া জড়িয়ে, দুগাছা সুতো পাকিয়ে তাতে বাঁধবি। এই সুতোকে বলে ষাট সুতো। তারপর তেল হলুদ দিয়ে অরণ্যষষ্ঠীর পূজো দিবি। পূজোর পর সেই সুতো প্রত্যেকের কপালে ছুঁইয়ে ডান হাতে বেঁধে দিবি। তারপর ষষ্ঠীব্রতের কথা শুনে ফলমূল কিংবা ফলাহার করবি। খবরদার এদিন রেঁধে ভাত খাবি নি যেন। রান্না করবি নি যেন। এদিনে রান্না বন্ধ। এদিন অরন্ধন। এ নিয়ম মেনে চললে ছেলেপুলে মরে না। বন্ধ্যানারীরও সন্তান হয়।'

মনসাব্রতের কাহিনী ও আচরণের সর্বত্রই আছে যাদু। সর্বত্রই অলৌকিক এবং অতিপ্রাকৃত ঘটনার আমদানী হয়েছে। লোকজীবনে আছে অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত উপাদানের ছড়াছড়ি। যাদু ও ইন্দ্রজালের বাহুল্য। অবশ্য শুধু লোক-জীবনেই বা কেন, বৈদিক সমাজেও যাদুর প্রভাব কম ছিল না। বৈদিক যজ্ঞ ও কৃত্যেও আছে নানাপ্রকার যাদুবিশ্বাস। যেমন সোমযাগের অঙ্গ সোমক্রয়। সোমক্রয়ের পর অগ্নি-প্রণয়নের পূর্ব পর্যন্ত অনুচ্চস্বরে মন্ত্রপাঠ করতে হয়। সোমকে ক্রয় করা হয় বাক্‌দেবীর পরামর্শ অনুযায়ী। তিনি দেব ও ঋষিগণকে বললেন—'গন্ধর্বেরা স্ত্রীকামুক. আমাকে সোমের মূল্যরূপে ধার্য কর, আমা-দ্বারা সোমকে ক্রয় কর। আমি আবার তোমাদের কাছে ফিরে আসব।' দেবগণ উলঙ্গিণী বাক্‌দেবীর বিনিময়ে সোমকে ক্রয় করলেন। বাক্‌দেবী চলে গেলেন গন্ধর্বদের কাছে। সোম এলেন দেবগণের মধ্যে। দেবগণ তখন অগ্নি প্রণয়নে ব্যস্ত। বাক্‌দেবী ব্যস্ত নয়াপ্রভু গন্ধর্বদের মনোরঞ্জনে। গন্ধর্বদের তৃপ্তি দিয়ে বাক্‌দেবী পুনরায় দেবগণের মধ্যে ফিরে এলেন অগ্নিপ্রণয়নের সময়। আমরা জানি সোমযাগে ছোটগাভীর বিনিময়ে সোম ক্রয় করা হয়। ছোটগাভী হচ্ছে বাক্‌দেবীর প্রতীক। দীর্ঘজিহ্বী নাম্নী অসুর জাতীয় একজন স্ত্রীলোক দূর থেকে যজ্ঞস্থলে নিষ্কাসিত সোমরস লেহন করত। ইন্দ্র শত চেষ্টা করেও তা বন্ধ করতে পারেন না। তখন কুৎস-পুত্র সুমিত্রকে ইন্দ্র বললেন—'তুমি সুপুরুষ। সুপুরুষদের সঙ্গে মেয়েরা গল্প করতে ভালবাসে। তুমি দীর্ঘজিহ্বীকে কথা বলে আটকে রাখো।' দীর্ঘজিহ্বী সুমিত্রের প্রস্তাবে রাজী হয় না যৌন অসমতার জন্য। ইন্দ্রের বরে বলশালী ও সর্বাঙ্গে শিশ্নযুক্ত হয়ে সুমিত্র পুনর্বার গেল

দীর্ঘজিহ্বীর কাছে। এবার মিলন হয়। মিলনের সুযোগে সুমিত্র চেপে ধরলো মসুরীকে। তাকে মেরে ফেলল। দৈবশক্তির সাহায্যে অসম্ভাব্য ঘটনা সম্পাদন এটি। এ ছাড়া নানারূপ যাদুমন্ত্র দ্বারাও বৈদিক সমাজ চালিত হত। এই সময়ও অনেক তরুণ ও তরুণীর যথাসময়ে বিবাহ হত না। এদের ভরসা ছিল অর্যমাদেব। অর্যমা অবিবাহিতদের বর ও কনে জুটিয়ে দিতেন। সমন বা যুবক-যুবতীদের মিলিত স্থানে গিয়ে পতি ও পত্নী লাভের মন্ত্রপাঠ করতেন। তাতে নাকি কাজ হত। গান্ধর্ব-বিবাহেরও আভাস আছে বৈদিক মন্ত্রে। প্রেম-সংক্রান্ত যাদুমন্ত্রের দ্বারা একে অপরকে বশীভূত করতে চেষ্টা করতেন। তান্ত্রিক বশীকরণেও মন্ত্রশক্তির প্রয়োগ হত। দম্পতির গর্ভদানের জন্যও মন্ত্র রয়েছে। দেবতারা গর্ভধারণে সাহায্য করেন। বিষ্ণু যোনি রক্ষা করেন। ত্বষ্টা আকাঙ্ক্ষিত পুত্রসন্তানের রূপদাতা। এবং প্রজাপতি রেতঃসিঞ্চনের পরিচালক। স্ত্রী ক্ষেত্র! এই ক্ষেত্রে বা স্ত্রীতে পতি বীজ বপন করেন। বৈদিক সাহিত্যে, স্মৃতিশাস্ত্রে ও লৌকিক সমাজে একই ভাবে ক্ষেত্র ও বীজের উপমা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। উর্বরতামূলক যাদুবিশ্বাস থেকে এ জাতীয় উপমার সৃষ্টি হয়েছে। স্ত্রীযোনি থেকে সন্তান সৃষ্টি এবং মাটি থেকে ফসল সৃষ্টি সমজাতীয় ঘটনা এই বিশ্বাস অনুসারে। তাই স্ত্রী ধেনুকা, পুরুষ ঋষভ। সন্তান না হলেও মন্ত্রশক্তির সাহায্য নেওয়া হয়। ব্যর্থ প্রেমিকা পুরুষের ক্লীবত্ব কামনায় মন্ত্র প্রয়োগ করত। ওষধিও তারা যাদুরূপে ব্যবহার করত। বাজীকরণের বা পুরুষত্বহানি দূরীকরণের জন্যও মন্ত্র আছে। গৃহস্থালীর শান্তিরক্ষার মন্ত্র হচ্ছে—জায়া পতিকে মধুমতী বাক্য বলুক, পিতার অনুগত হোক পুত্র ভ্রাতা যেন ভ্রাতাকে দ্বেষ না করে', ইত্যাদি। লোকসমাজে এ সব রীতি এখনও প্রচলিত আছে।

তাই দেখি অরণ্যষষ্ঠী পূজোর আগে ব্রতিনীরা একখানা তালপাতার পাখা ও ভোজ্য এবং নৈবেদ্যের দ্রব্যাদি সহ বনে যান পূজো দিতে। যেখানে বন বা অরণ্য নেই সেখানে গৃহমধ্যে অরণ্য কল্পনা করে অরণ্যষষ্ঠীর পূজো অনুষ্ঠিত হয়। শিলাখণ্ডে ষষ্ঠীদেবীর অধিষ্ঠান বলে ধরে নেওয়া হয়। শিলাখণ্ডের অভাবে মশলা পেশার নোড়া দিয়েও কাজ চালান যেতে পারে। ব্রতের সঙ্কল্প বাড়ীর মেয়েদের নামে হয়। এখানেও মেয়েদের একাধিপত্য। যতজন ব্রত উদযাপন করবেন ততটি তালপাতার পাখা, পাকা আম, দূর্বাগুচ্ছ (ছয় কুড়ি ছয় গাছ) আবশ্যক। ওগুলো নিয়ে ব্রতিনী স্নান করবেন কোন এক জলাশয়ে। বুক জলে দাঁড়িয়ে পাখা ও আম বাঁ হাতে রেখে দূর্বাগুচ্ছ দিয়ে ছয় কুড়ি বার চোখে জলের ছিটা দিবেন। স্নানান্তে ও ব্রতকথা শোনার পর পূর্ব সংগৃহীত অতিরিক্ত

দূর্বা এক এক গাছি করে পূর্বোক্ত নোড়ার উপর দিয়ে বলবেন—'অগ্রহায়ণে মূলোষষ্ঠী ষাট ষাট ষাট (দূর্বাদান)। পৌষে লোটনষষ্ঠী ষাট ষাট ষাট। মাঘে শীতলষষ্ঠী ষাট ষাট ষাট। ফাল্গুনে গুণোষষ্ঠী ষাট ষাট ষাট। চৈত্রে অশোকষষ্ঠী ষাট ষাট ষাট। বৈশাখে দইষষ্ঠী ষাট ষাট ষাট। জ্যৈষ্ঠে অরণ্য-ষষ্ঠী ষাট যাট ষাট', প্রভৃতি বিভিন্ন ষষ্ঠীর ষাট। কালে কালে এই ব্রতের সঙ্গে জামাইষষ্ঠী অনুষ্ঠান যুক্ত হয়ে যায়। ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে জামাইষষ্ঠী অনুষ্ঠানের কোন যোগ নেই। জামাইকেও ষাট দেওয়া হয়। এই ব্রত করলে কি হয়? 'হয়ে পুত্র মরবে না। চোখের জল পড়বে না।'

অরণ্যষষ্ঠী বা শুক্লাষষ্ঠী ব্রতের মত শীতলষষ্ঠীর দিনেও অরন্ধনের বা রন্ধন ধর্মঘটের বিধান আছে। কিন্তু এদিন সওদাগরবাড়ীর গিন্নির কি দুর্মতি হল যে তিনি বউদের ডেকে বলে বসলেন আজ কিন্তু ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে পারব না। আমাকে এক হাঁড়ি গরম জল করে দাও, ভাতও রেঁধে দাও। গরমজলে চান করে গরম গরম ভাত খেয়ে দেখি শীতটা মরে কি না। পেট ভর্তি থাকলে শীতের সঙ্গে যোঝা যাবে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে বুদ্ধদেবের কথা। তিনি বলেছেন, 'সব্বে সত্তা আহারট্‌ঠিতিকা'—সকল সত্ত্ব জীব, আহারে স্থিত, অর্থাৎ প্রাণী-জীবন আহার-নির্ভর। আহার-নির্ভর জীবনকে বুঝতে হলে এই প্রবর্তন (প্রবহমান, বর্তমান) জীবনের আহার নির্ভরশীলতার সঙ্গে জীবনপ্রবাহ অর্থাৎ পূর্বাপর জীবনের আহার নির্ভরশীলতাকেও বুঝতে হবে। আহারই জীবন প্রবাহিকা শক্তির উৎস। আহার নিরোধই এই জীবন প্রবাহের সমাপ্তি। এই আহার চার প্রকার যথা চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য পেয়। ১। আমাদের সাধারণ আহার—যাকে বলা হয় কবলীকৃত বা কবলাকারে গৃহীত আহার বা রূপাহার, ২। স্পর্শাহার, ৩। চেতনা বা মনোসঞ্চেতনাহার এবং ৪। বিজ্ঞানাহার বা প্রতিসন্ধিচিত্তের বা জন্মচিত্তের আহার। আহার অর্থে আহরণ বা সংগ্রহ। যা আমাদের নামরূপকে (মন-দেহকে) সংরক্ষণ, পরিপোষণ, পরিবর্ধন করে তাই নামরূপের আহার। আহারের উৎপাদিকা শক্তি তো আছেই, তাছাড়াও আছে আহারের পরিপোষণ শক্তি। আহারের এই উৎপাদিকা এবং পরিপোষণ শক্তিই সত্ত্বগণের বা জীবজগতের জীবন প্রবাহকে প্রবহমান করে রেখেছে। চার প্রকার আহারকে আবার রূপাহার এবং অরূপাহার রূপে ভাগ করা হয়েছে। রূপাহার হল জড় আহার, আর অরূপাহার হল অ-জড় আহার বা

নামাহার বা চিত্তাহার। রূপাহার দেহের আহার, অরূপাহার চিত্তের বা মনের আহার। এই আহার ব্যতীত জীবন স্তব্ধ হয়ে যায়।

কবলীকৃত বা রূপাহার হচ্ছে যা আমরা কবলী বা গ্রাস আকারে ভোজন করি। পানাহারও এ পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ দেহ মাধ্যমে দেহ রক্ষার্থে আমরা যা গ্রহণ করি তাই এ পর্যায়ের আহার। অবশ্য স্থুল-সূক্ষ্মভেদে এ আহারকে আবার দু ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন হিংস্র পশুর আহার, তৃণভোজী পশুর আহারের চেয়ে স্থুল। হিংস্র পাখীর আহারও নিরীহ পাখীর আহারের চেয়ে স্থূল। প্রত্যন্ত দেশবাসীর আহারও নগরবাসীদের আহারের চেয়ে স্থুল। সেরূপ মানুষের মধ্যেও উন্নত-অবনত, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, কোমল শক্তদেহীর বা আরও ক্রমোন্নত সত্ত্বগণের আহারের মধ্যে স্থুলতা-সূক্ষ্মতার তারতম্য বিদ্যমান। স্থুল আহারের ওজঃধাতু (শক্তি) দুর্বল, সূক্ষ্ম আহারের ওজঃশক্তি সবল। ক্ষুধা নিবৃত্তির ক্ষমতা সূক্ষ্ম আহারের চেয়ে স্থুল আহারের অধিক। দেহের তাপশক্তি সতেজ রাখবার ক্ষমতা স্থুল আহারেরই বেশী। মাতৃগর্ভে শিশুর দেহ আহারজ শক্তি দ্বারা বর্ধিত ও পরিপোষিত হয়। সত্ত্বগণের দেহে প্রতিসন্ধি সহজাত কর্মজ ওজঃধাতুও বিদ্যমান থাকে। কবলীকৃত আহার দেহে ৮ প্রকার রূপ আহরণ করে। যেমন ঃ বর্ণ, গন্ধ, রস, ওজঃ, পৃথিবী (দেহের কোমল-কঠিন পদার্থ), জল, অগ্নি (তাপ, তেজ), বায়ু ইত্যাদি। এই আটটি রূপের সমাহারই দেহ। এই রূপ আহরণই দেহের আহার। 'রূপং আহরতীতি আহারো।' কবলীকৃত আহার আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজন। এ আহার রূপকারের সন্ততির বা প্রবাহরূপে স্থিতির কারণ। কর্মফলে রূপকায়ের উৎপত্তি হলেও তার পোষণ ও সন্ততি আয়ুষ্কাল পর্যন্ত অবিচ্ছেদে রক্ষা করে এই রূপাহার। রূপকায় রূপাহারই খোঁজে, এটাই তার একমাত্র অবলম্বন। মৃত্যুর সময় রূপাহারে স্থিত রূপদেহের মৃত্যু হয়। চিত্তের মৃত্যু হয় না। প্রতি চিত্তক্ষণে আমাদের চিত্তের মৃত্যু হচ্ছে। একটি চিত্ত প্রতি চিত্তক্ষণে নিজের মৃত্যু বরণ করে অপর চিত্তের উৎপত্তির কারণ হয়। এ ভাবে জীব চিত্তের জন্ম-মৃত্যুর সন্ততিক্রমে এই প্রবর্তন জীবনে বেঁচে আছে অর্থাৎ সে জীবনপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে। মৃত্যুতে ইহজন্মে আহরিত রূপাহার শক্তির ছেদ হয়। কিন্তু জীবনপ্রবাহের ছেদ হয় না। সে আত্মার সঙ্গে মিলেমিশে থেকে যায়।

স্পর্শাহার হচ্ছে তা যা প্রতি মুহূর্তে আমাদের জীবনে চক্ষুর সঙ্গে

রূপের বা দৃশ্যের, কর্ণের সঙ্গে শব্দের, জিহ্বার সঙ্গে রসের বা স্বাদের, নাসিকার সঙ্গে গন্ধের, দেহের সঙ্গে স্পর্শের, চিত্তের বা মনের সঙ্গে ভাবের বা চিন্তনীয়, চিন্তাগ্রাহ্য বিষয়ের সংযোগে বা স্পর্শে উৎপন্ন হয়। এই স্পর্শ অন্তত ত্রিবিধ বেদনারূপে প্রতিভাত হয়। যেমন—সুখবেদনা, দুঃখ-বেদনা, নদুঃখ-নসুখ বেদনা। ষড়-ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তৎতৎ বিষয়বস্তুর স্পর্শের মাধ্যমে সুখ, দুঃখ, নদুঃখ-নসুখ বেদনা আহরিত হয়। তাই স্পর্শ বেদনার আহার এবং বেদনাও স্পর্শই খোঁজে। স্পর্শ বেদনা জন্মায়। দুঃখবেদনা অনভিপ্রেত। অনভিপ্রেততাও তৃষ্ণা। ন দুঃখ-ন সুখ বেদনা ভোগেচ্ছা বা তৃষ্ণা উৎপন্ন করে না। তবে এটাও একপ্রকার অনুভূতি। স্পর্শজাত সুখবেদনা উপভোগের জন্য সত্ত্বগণের মধ্যে তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়। তৃষ্ণাই উপাদান বা দৃঢ় ভোগাকর্ষণ এবং কর্মোৎপত্তির কারণ। এই কর্মোৎপত্তিই জীবনপ্রবাহ আহরণ করে এবং তাতে জীবনপ্রবাহ ক্ষুণ্ণ থাকে।

চেতনা বা মনোসঞ্চেতনাহার বলতে চিত্তের কুশল অকুশল চেতনাকেই বোঝায়। চিত্তের এই কুশলাকুশল চেতনা ত্রিভব কামভব। অর্থাৎ কামলোকে এর জন্ম এবং রূপভব বা রূপলোকে এর উৎপত্তি ও অরূপভব বা অরূপলোকে এর আহরণ। কুশলচেতনা শক্তিরূপে কাম-রূপ-অরূপ লোকে সৃষ্ট হওয়ায় তা তৎতৎভবের সুখচেতনার সঞ্চার করে জীবকে ভোগ করায়। অকুশলচেতনা কামভবে দুঃখচেতনার সৃষ্টি করে। সুতরাং জীবগণ ষড়িন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তথা কায়-বাক্যে-মন দ্বারে প্রতিনিয়ত কুশলাকুশল চেতনা সংগ্রহ বা আহরণ করে যাচ্ছে। দ্বাদশ প্রকার অকুশলচেতনা মানব বা মানবেতর জীবের কামলোকে দুঃখোৎপত্তির কারণ। আর আট প্রকার কুশলচেতনা মানব, মানবেতর ও মানবোত্তর জীবগণের সুখোৎপত্তির হেতু। এ ছাড়াও যে পাঁচ প্রকার রূপচেতনা আছে তা রূপলোকের প্রীতিসুখ উৎপন্ন করে। এবং যে চার প্রকার অরূপচেতনা তা অরূপলোকের সুখোৎপত্তি করে। এমনি করেই ত্রিভবে সত্ত্বগণ কুশলাকুশল চেতনার মাধ্যমে জীবন-প্রবাহের আবর্তন-বিবর্তন অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে। জীবন প্রবাহের এই আবর্তন-বিবর্তনেরই অপর নাম কর্ম বা সংস্কার বা কর্মভব, যা বিপাকচিত্তের আহার বলে অনেকে একে মনে করেন।

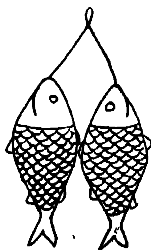
কর্মফলের জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানাহার। এখানে বিজ্ঞান বলতে প্রতিসন্ধি চিত্তকে বুঝায়। প্রতিসন্ধিচিত্ত উনিশ প্রকার। এটাই বিজ্ঞানাহার। এই বিজ্ঞানাহার নামরূপ, ষড়ায়তন ও স্পর্শের আহার।

এই আহারের মারফত চিত্ত বা বিজ্ঞান চ্যুতিক্ষণে বা মৃত্যুক্ষণে পরবর্তী জীবনের নামরূপ আহরণ করে। প্রতি মুহূর্তে সত্ত্বগণ সুখ-দুঃখ অনুভূতির মাধ্যমে পূর্ব কুশল-অকুশল কর্মের ক্ষয় করছে, আর প্রতিনিয়ত ত্রিকর্ম (কায়-বাক্য-মন কর্ম) দ্বারা নব নব কুশলাকুশল উৎপন্ন করছে। বর্তমান জীবনে চিত্ত দ্বারা সমুত্থিত রূপই চিত্তসমুত্থান রূপ। সেই সঙ্গে ঋতু সমুত্থান রূপপ্রবাহে জীবদেহের এবং দেহতর রূপেরও অবস্থান্তর ঘটায়। আহার সমুত্থান রূপ জীবগণের জীবন প্রবাহের কারণ। সত্ত্বগণের জীবনচক্র বা প্রবাহ তিন প্রকার নামাহারের শক্তিতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে আবর্তিত হচ্ছে। স্পর্শাহার চেতনাহারকে পোষণ করে। চেতনাহার বিজ্ঞানাহারকে পোষণ করে। বিজ্ঞানাহার স্পর্শাহারকে পোষণ করে। এভাবে নামচক্র বা চিত্তোৎপত্তি জন্মজন্মান্তরে আবর্তিত হয়। কার্যকারণবশত (চার আহার সমুত্থান সংযোগে) যতদিন এই উৎপত্তি বিলয় ধাবা প্রবাহিত থাকবে, ততদিন জীবন প্রবাহ বিদ্যমান থাকবে। এই জীবন প্রবাহ বিদ্যমান রাখার জন্যই গিন্নি আচরণীয় অনুষ্ঠান থেকে দূরে সরে এসে অরন্ধনের দিন, বাসি ও শীতলাহারের দিন, গরম গরম মাছভাত খেতে চেয়ে বসলেন।

নাত-বউয়েরা গিন্নীর কথা শুনে অবাক। তারা একে অন্যের মুখের দিকে চাইতে লাগল, ইশারায় কথা কয়ে চলল। সকলেই ভাবল বুড়িকে ভীমরতিতে ধরেছে। নইলে আজ শীতলষষ্ঠীর দিন। উনুন জ্বালাতে নেই। আজ কিনা বুড়ি তাই করতে বলছেন। বুড়ির আদেশে নাতবউয়েরা তাঁকে গরম জল ও গরম গরম ভাত রেঁধে দিল। খেয়েদেয়ে বুড়ি ঘুমিয়ে পড়লেন, পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বুড়ি কিনা দেখেন যে বাড়ীর কুকুর বিড়াল সহ পুত্র-পুত্রবউ, নাতি-নাতবউ সব মরে পড়ে আছে যে যার জায়গায়। বুড়ি কেঁদে পাড়া মাথায় করলেন। অবশেষে ষষ্ঠীদেবী এক বৃদ্ধার বেশে এসে বললেন—'ভাল করে গরম জলে চান কর আর গরম গরম ভাত খাও! দেখলে তো মজা!' বুড়ি ষষ্ঠীদেবীর পা জড়িয়ে ধরে বললেন—'আমাকে বাঁচাও মা, কথা দিচ্ছি আর কোনদিন এ কাজ করব না'। ষষ্ঠীদেবী তখন বললেন—'যা, তোর নাতবউয়েরা যে শীতলষষ্ঠী পেতেছে সেই ষষ্ঠীর গায়ে যে দই হলুদ আছে তা এনে সকলের আগে কুকুরের কপালে ফোঁটা দিবি। তারপর আর সবাইর কপালে। তারও পর ঐ হলুদ ছোপান সুতো ছেলে নাতি ছেলেরবউ নাতবউদের হাতে তাগা করে বেঁধে দিবি। তাহলেই সব আবার বেঁচে উঠবে। আর হাঁ, আর কখনও শীতলষষ্ঠীর দিন উনুন জ্বালাবি

না। গরম ভাত খেতে চাইবি না। এদিনে অরন্ধন পালন করবি।' মা ষষ্ঠীর পরামর্শানুযায়ী কাজ করে বুড়ী সকলকে ফিরে পেলেন। অন্যেরাও বুড়ীর দুর্দশা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলেন।

স্মরণীয়, বারো মাসে তেরো পার্বণের মত বারো মাসে তেরো ষষ্ঠী বাঙলার লোকজীবনের অচ্ছেদ্য সঙ্গী। মেদিনীপুর অঞ্চলে চরপটা ষষ্ঠী উপলক্ষে অরন্ধন প্রতিপালিত হয়। এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ভাদ্রের শুক্লা ষষ্ঠী দিবসে। যে যুগে মানুষ কৃষিকাজ জানত না, ঘাসের বীজ ও গাছের ফলের উপর নির্ভরশীল ছিল, যে যুগে বনকচুর পাতা মাথায় দিয়ে বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টা চলত—সেই যুগের কৃত্যাদি স্মরণ করার জন্য এই অনুষ্ঠান। যাকে সপ্তপর্ণীমন্থন ষষ্ঠী উৎসবও বলা হয় অনেক স্থানে। বর্ধমান অঞ্চলের মেয়েরা ভাদ্র মাসের মন্থন ষষ্ঠী থেকে শুক্লা দ্বাদশী অবধি সসাপাতার ব্রত বা ভাঁজো পূজা উদযাপন করেন। এই উপলক্ষে পঞ্চমী তিথিতে মটর, মুগ, অড়হর, কলাই ও ছোলা ভিজিয়ে রাখা হয় এবং পরদিন অর্থাৎ ষষ্ঠীর দিন ষষ্ঠী পূজার নৈবেদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। একটি সরাতে এগুলো রাখা হয় সরষে ও ইঁদুর মাটি সহ। প্রতিদিন ব্রতান্তে এই সরায় জল দেওয়া হয়। তখন যদি অঙ্কুর দেখা যায় তবে ধরা হয় ফলন ভাল হবে। সপ্তপর্ণী মন্থন বা চরপটা ষষ্ঠীর ত্রিশ দিনের মধ্যে দুর্গাষষ্ঠী। দুর্গাষষ্ঠীতে নবপত্রিকা ব্যবহার হলেও চরপটা ষষ্ঠীতে ব্যবহৃত হয় সপ্তপত্রিকা অথবা কেয়া গাছ, চাপটা বা শ্যামাজাতীয় ঘাস, কাল কচুর গাছ, ধান গাছ, হেঁসাতী, তেশিরা গাছ, বাঁশপাতা, জু-ডাল (শমী বৃক্ষের শাখা)। এই সাতটি গাছের পাতা একটি



হলদে ন্যাকড়ায় বেঁধে বানানো হয় একটি গুচ্ছ। অনুষ্ঠানের দিন একটি কাঠের পিঁড়িতে আলপনা দিয়ে এই সপ্তপত্রগুচ্ছ স্থাপন করা হয়। তার পাশে রাখা হয় একটি অখণ্ড কলার ছড়া, একটি পুতা, একটি তালপাতা ইত্যাদি। সপ্তপত্রর এক অংশ পিঁড়ির উপরে পূজিত হয়, এবং আরেক অংশ উনুনের মধ্যে রেখে পূজা দেওয়া হয়। এখানে মনসা বা সিজ গাছের প্রয়োজন হয় না।

এদিনে অরন্ধন। আগের দিন রাত্রে আতপ চালের ভাত রান্না করা হয়। সেই ভাতে সিদ্ধ দেওয়া হয় কুমড়ো, লাউ, চালকুমড়ো, চালতা, আমড়া ইত্যাদি। চরপটা ষষ্ঠী ব্রতের সময় অন্যান্য ফলমূল ও নৈবেদ্যের সঙ্গে পূর্বরাতের রাঁধা আতপ চালের পান্তা ভাত ও সিদ্ধ ফলাদিও উপঢৌকন দেওয়া হয় ষষ্ঠীদেবীর শ্রীচরণে। ষষ্ঠীপূজার দিন উনুন পূজা হয়। পূজার সময় উনুনের চারপাশে সাতটি চালকুমড়ো পাতার উপর সাতটি চালকুমড়োর ফুল উপুড় করে দেওয়ার রীতি। লোকবিশ্বাস, এই পূজার দিনে গৃহীর ঘরে কেউ সন্তান-সম্ভবা থাকলে ও সে বছর বেশী লাউ ফললে জাতক মেয়ে এবং বেশী চালকুমড়ো ফললে প্রসূতি ছেলে প্রসব করবে। পুত্র কামনায়ই চালকুমড়ার ব্যবহার।

এই পূজা উপলক্ষে সকল বাড়ীতেই অরন্ধন অনুষ্ঠিত হয় না। আবার যাদের পুরুষানুক্রমে অরন্ধন হয়ে আসছে তাদের উপর ষষ্ঠী বিরাগ হলে অরন্ধন বন্ধ হয়ে যায়। ষষ্ঠী বিরাগ হলে সন্তানাদি হবে না। ষষ্ঠীর ভোগের পান্তা-হাঁড়ির মধ্যে যদি মরা সাপ, ব্যাঙ প্রভৃতি পড়ে থাকে তবেও অরন্ধন বন্ধ হয়ে যাবে। এটাও নাকি ষষ্ঠীর বিরাগ থেকেই হয়ে থাকে। অনেক বাড়ীতে মন্থন ষষ্ঠীর দিনে অরন্ধন না হয়ে ভাদ্রসংক্রান্তিতে অরন্ধন হয়। এই অরন্ধনকে অনেকে অরাঁধ বা সংক্রান্তি অরন্ধন বলে। ভাদ্র সংক্রান্তির অরন্ধনে যে উনুন পূজা অনুষ্ঠিত হয় তাতে সপ্তপত্রির বদলে মনসা বা সিজ ডালের প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রেও উনুনের চারদিকে আলপনা দেওয়া হয়। অনেক জায়গায় এই পূজোতেও উনুনের চারপাশে সাতটি মনসা পাতার উপর সাতটি অন্নভোগ দেবার রীতি আছে। পূজান্তে ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবারও প্রথা আছে। এই নিমন্ত্রণে খাওয়ানো হয় পান্তা ভাত ও বাসি ব্যঞ্জনাদি।

আশ্বিন সংক্রান্তির দিনে যে গাড়শী ব্রত উদযাপিত হয় তাও হয় রন্ধন ধর্মঘটের মাধ্যমেই। 'আশ্বিনে রাঁধিয়া কার্তিকে খায়, যে বর মাগে সেই বর পায়'—এই ছড়া বলে ব্রত আরম্ভ। ব্রত অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

গঙ্গাপূজার দিনেও পশ্চিমবঙ্গে অরন্ধন প্রতিপালিত হয়। শ্রাবণ সংক্রান্তির অরন্ধন অঞ্চল ভেদে নানা নামে অভিহিত। যেমন হাওড়ায় 'ঢেলাফেলা', বাঁকুড়ায় 'খইধরা', বর্ধমানে 'খইদই', নদীয়ায় 'পাতালফোঁড়' প্রভৃতি। প্রত্যেক সংক্রান্তিতেই স্নান, দান, ব্রত, উপবাস প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ বিধান আছে হিন্দুমতে। জলসংক্রান্তি, দানসংক্রান্তি, অন্নসংক্রান্তি, ফলসংক্রান্তি, ধর্মঘট-আইয়ো সংক্রান্তি প্রভৃতির সঙ্গেও অরন্ধন বা রান্না বন্ধের যোগ আছে।

ধর্মঘট-আইয়ো ব্রতে এক্মাস প্রতিদিন একটি জলপূর্ণ কলসী দানের বিধান আছে। অরন্ধন থেকে শুদ্ধাচারে কলসী দান করলে তাতে সুফল পাওয়া যায়। এই ব্রত শেষে বলা হয়—'পরের মন্দে ভাল যে করে, ভাতে পুতে সে বাড়ে। পরের ভালোয় মন্দ যে করে, ভস্ম হয়ে সে মরে।'

ইচ্ছা অরন্ধনও আছে অনেক সমাজে। অর্থাৎ যে কোন শুভদিনে রান্না বন্ধ রেখে লোকাচার পালন করা। ইচ্ছা অরন্ধনের সর্বময় কর্ত্রী পরিবারের গৃহকর্ত্রী। তাঁর এই বিধান পুরুষ সমাজকেও মেনে নিতে হয়।

অরন্ধন লোকায়ত ধর্মানুষ্ঠান। স্বর্গলাভ এখানে কাম্য নয়। বিশ্বাস ও ক্ষুদ্র-ক্ষেত্রের সাফল্য বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করে যাদু সৃষ্টি করে। তাই লোকায়ত ধর্মে আছে ইন্দ্রজালের প্রবণতা। এই ইন্দ্রজাল কালক্রমে ধর্মের অবয়বে রূপান্তরিত হয়। ধর্ম ইন্দ্রজালকে ধীরে ধীরে নিস্তেজ করে এগিয়ে যায়। তাই যেখানে ইন্দ্রজালের ব্যর্থতা সেখানে ধর্মের সূত্রপাত।

ইন্দ্রজালের দৃঢ়ভিৎ বিশ্বাস ; প্রকৃতির নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। আর ধর্মের ধারণা প্রকৃতির নিয়মের অধিদেবতাকে পরিতুষ্ট করে নিয়মের সীমা লঙ্ঘন করা চলে। সমাজ থেকে রাতারাতি এ বিশ্বাসের বিলুপ্তি অসম্ভব। বিশেষত আমাদের সমাজে যেখানে বিজ্ঞানবুদ্ধি অনায়ত্ত। দৈনন্দিন জীবন আমাদের প্রতিদিনের অশন-বসন, চলন-বলন, আমোদ-উৎসব, খেলাধূলা, মনন-কল্পনা, অভ্যাস ও সংস্কারকে ব্যক্ত করে শীলাচরণ এবং ব্যবহারিক জীবনচর্যার মাধ্যমে। আজও তাই সেইসব প্রাচীন আচার-আচরণ-আদর্শ-অনুষ্ঠান আমাদের মধ্যে সক্রিয় যা আমাদের পিতা পিতামহ প্রপিতামহদের আমলেও ছিল। মাতার যে কামনা—শুভ্র নিষ্কলঙ্ক সুদর্শন সন্তানের জননী হওয়া—তা সেকালেও ছিল, আজও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এই কামনা থেকেই এ বিশ্বাস চলে আসছে যে শুক্লপক্ষের গোড়ার দিকে নবোদিত চন্দ্রের পূর্ণ-গোলক রেখা প্রত্যক্ষ করলে প্রসূতি চাঁদের মত স্নিগ্ধ সুন্দর সন্তান প্রসব করবেন। ঋতুস্নান করে আরাধ্য দেবতা বা পুরুষের ছবি দেখলে তাঁর মত সন্তানেরই জন্ম হবে। তীর্থ-স্নান, উপবাস, দান ও অরন্ধনাদি প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় সমান উৎসাহ ও বিশ্বাস নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে।

বলাবাহুল্য যে শুধু কৃষিজীবনকে আশ্রয় করেই নয়, শিল্পজীবনেও বিশেষ বিশেষ দিনে কামারের হাপর, কুমারের চাকা, তাঁতীর তাঁত, চাষীর লাঙল, ছুতোর রাজমিস্ত্রীর কারুযন্ত্র, কলকারখানার যাবতীয় যন্ত্রপাতিকে আশ্রয় করে এক এক ধরণের ধর্মানুষ্ঠান চলে আসছে। এরই কিছুটা আর্যীকৃত রূপ

আমরা ভাদ্র সংক্রান্তির বিশ্বকর্মা পূজার মধ্যে প্রত্যক্ষ করি। বিশ্বকর্মা বিশিষ্ট শিল্পী ও স্থপতি। দেবতাদের পংক্তিতে পাংক্তেয় হলেও তিনি দেবতাদের বেতনভুক কর্মচারী। আর্যদের মহলে তাঁর আভিজাত্য অত্যন্ত ক্ষীণ। তিনি শিল্পসমূহের আবিষ্কারক, স্থপতি ও মিস্ত্রীরূপে বন্দিত। সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ রেখে চলে তাঁর স্তুতি। এদিনে রান্নাও বন্ধ। নিষ্কর্মা এ দিনটিতে নানাবিধ আমোদ আহ্লাদের আয়োজন করা হয়। একদিকে চলে পূজানুষ্ঠান, অন্যদিকে ঘুড়ি ওড়ান, নৌকা বাইচ প্রভৃতি খেলানুষ্ঠান। ভাদুয়া, মাইকের গর্জনাদিও চলে। মূল অনুষ্ঠানের সঙ্গে এ সবের কোন যোগ নেই, তবুও এসব অনুষ্ঠিত হয় এমনভাবে যাতে মনে হয় এ সবই অনুষ্ঠানের আবশ্যিক অঙ্গ। ভাদুয়া প্রধানত নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে উদ্যোক্তাগণ চালের গুঁড়ো ও গুড় দিয়ে একপ্রকার পিঠা তৈরী করেন। এই পিঠার নাম ভাদুয়া। বাসি পিঠা খাওয়ার নিয়ম। উনুন ধরানো নিষেধ। আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান বাইচ খেলা। সকলে উদ্‌গ্রীব থাকেন সে খেলায় অংশ নেবার জন্য, দর্শক হিসাবে উপস্থিত থাকার জন্য। গ্রামের ধনী সম্প্রদায় বাইচ খেলার বায়ভার বহন করেন। স্বল্পপ্রস্থ দীর্ঘকায় বহু নৌকো সুসজ্জিত করা হয়। প্রত্যেক নৌকোর দুই কাতারে সারি সারি বৈঠা হাতে অংশ-গ্রহণকারী খেলোয়াড়বৃন্দ বসেন। নৌকোর আগায় ও পিছনে সিঁদুর মাখান থাকে। নৌকোয় দেওয়া হয় ফুলের মালা, পূজো করা হয় নৌকোকে। প্রত্যেক নৌকোয় একজন করে লীডার বা মাতব্বর থাকেন। তাঁর পরণে নতুন কাপড়, গলায় মালা। তিনি নৌকোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে চালকদের উৎসাহ যোগান। গ্রামের মুসলমানেরাও এ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। খেলা সাধারণত নদী বা সুবিস্তীর্ণ খাল বিলে অনুষ্ঠিত হয়। আগে থেকেই খেলার স্থান ঘোষণা করা হয়। খেলায় বিজয়ী দলকে পুরস্কার দেওয়া হয়। খেলা সমাপ্ত হলে সকলে বাড়ী গিয়ে পুনরায় ভাদুয়া পিঠা খান। গ্রামের এই বাইচ খেলার উন্মাদনার সঙ্গে শহরের ঘুড়ি খেলার উন্মাদনার তুলনা করা যেতে পারে। একটি জলের খেলা, অপরটি আকাশের খেলা। দুটো খেলাই সার্বজনীন ও ধর্মনিরপেক্ষ। নিছক খেলার উদ্দেশ্যে খেলা। খেলা অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

বিশ্বকর্মা অষ্টবসুর এক বসু। প্রভাসের ঔরসে এবং বৃহস্পতির ব্রহ্মচারিণী ভগ্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। দানবকুলে যেমন ময়দানব, দেবকুলে তেমন বিশ্বকর্মা, উভয়েই উভয় সমাজে অসাধারণ শিল্পী বলে

পরিচিত। রোমীয় দেবতা মিনার্ভার সঙ্গেও বিশ্বকর্মার মিল আছে। অবশ্য মিনার্ভা স্ত্রী দেবতা, বিশ্বকর্মা পুরুষ দেবতা। তিনি দেবতাদিগের বর্ধকী। পিতামহ ব্রহ্মার জন্য তিনি পুষ্পক রথ তৈরী করে দিয়েছিলেন। পিতামহ সে রথ কুবেরকে দান করেন। দুটি ধনুক দিয়েছিলেন বিশ্বকর্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে। মহেশ্বরের ধনুক ব্যবহৃত হয়েছিল ত্রিপুরাসুর বিনাশে, আর বিষ্ণুর ধনুক পরশুরামকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। শ্রীরামচন্দ্র পরশুরামের এই ধনুকভঙ্গ করেই পরশুরামের দর্প চূর্ণ করেছিলেন।

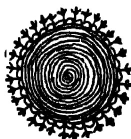
ইন্দ্রের অমরাবতী, হস্তিনাপুর প্রভৃতি দেবশিল্পীরই সৃষ্টি। জয়ন্তী নগরে মনসাপুরীও নির্মাণ করেছিলেন বিশ্বকর্মা—'নাগ বলে বিশ্বকর্মা করি নিবেদন। এইক্ষণে জয়ন্তীতে করহ গমন॥ পদ্মার আদেশ বিশাই যখন শুনিল। আপনার অস্ত্র ল'য়ে জয়ন্তীতে গেল॥......বিশ্বকর্মা আপনে নির্মাণ করে পুরী।......কনক রচিত হইল বনবাস পুরী॥......হইতে অমরাপুরী অধিক শোভা করে। মেলানি করহ মাগো যাই নিজ ঘরে॥ এত বলি বিশ্বকর্মা হইল বিদায়। প্রণাম করিয়া তখন নিজ ঘরে যায়॥' মনসামঙ্গলের এই কাহিনী সর্বজনবিদিত। গোবিন্দচন্দ্রের গীতেও বিশ্বকর্মার পূর্তশিল্পীর ভূমিকার কথা ঘোষিত—'তিনি পুর বন্দিলা, সে পাথর যাচে চিরি। তিনি তাল গম্ভীর বিশাল খনাখুলি॥ জগতী আটালী সেচ় মণ্ডপ নবর। উপরেণ খোয়া ঢালি ভিতরে হিঙ্গুর॥ চন্দ্রশালাপুর গঙ্গামন্দির উপমা। অষ্টরত্তর্ণ মিশাই গড়িলা বিশ্বকর্মা॥'

বিশ্বকর্মা এতবড় শিল্পী, স্থপতি, দেবকুলে তাঁর অবাধ গতিবিধি, বেদব্যাস কিন্তু তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। ছিলেন না বলেই তিনি অভিশাপ দিয়েছিলেন বিশ্বকর্মাকে 'তোর গুণধর যত কারিগর হইবে দুঃখী বেগার' (অন্নদামঙ্গল)। নিম্নশ্রেণীর শিল্পীরা ছাড়া কোন অভিজাত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাঁর পূজা বড় একটা করতেন না। তাঁকে কুৎসিত একজন মিস্ত্রী বলেই জানতেন তাঁরা।

কিন্তু দেবকুলে তাঁর বিশেষ জনপ্রিয়তা ছিল। ছিল, কারণ বিশ্বকর্মার মত শিল্পী ছিল বিরল। তাঁর যে নয়টি সন্তান জন্মগ্রহণ করে ঘৃতাচীর গর্ভে, তাঁরা—'মালাকার কর্মকাংসশঙ্খকার কবিন্দকান। কুম্ভকার সূত্রধার স্বর্ণচিত্রকরাংস্তথা' (ব্রহ্ম ১০।৯০) ব্রাহ্মণেরা তাঁদেরও অভিশাপ দিয়েছিলেন—'সূত্রধারশ্চিত্রকারঃ স্বর্ণকারস্তথৈবচ। পতিতাস্তে ব্রহ্মশাপাদ যাজ্যা বর্ণসঙ্করাঃ' (ঐ, ১০।২১)। শিল্পকার্যোপলক্ষে তাঁর অবাধ ও

দুর্বার গতি যত্রতত্র, এমনকি ব্রাহ্মণাবাসেও। শুধুমাত্র মন্দির, পুরী, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি নির্মাণকল্পেই নয়; রাস্তা, পথঘাট তৈরী করতেও তাঁর ডাক পড়ত। যে কোন পূর্তশিল্পের বা ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে তাঁর উপস্থিতি না হলে চলত না। সেখানেও তিনি অসমান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাই হাড়িপা মায়ের আদেশ রক্ষার্থে মারুলি অর্থাৎ গ্রাম্যপথ তৈরীর ভার দিয়েছিলেন বিশ্বকর্মার উপরই। 'হাড়ি বলে হারে জাদু কার প্রাণে চাও। রাজার ছেইলা নিদ্রা পাইল বুককের তলে। মারুলি বান্ধি নইব আমি ডরাইপুর সহরে॥ জা জা গাড়া অন্য জঙ্গল ভাঙ্গিয়া। যা যা বিশ্বকর্মা বেটা ডিটমুণ্ড হইয়া॥ কামকাজ্য করিয়া পাইয়া গেল কূল। বিদায় হইবার আসিল হাড়ির হুজুর॥ মারুলি দেখিয়া হাড়ি খুশি ভালা হইল। ভাল মল্লি স্থির করিয়াছেন ডরাইপুর সহরে॥' দর্জি বা জীবনশিল্পীরূপেও বিশ্বকর্মার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' গৌরী যখন অন্নপূর্ণা মূর্তি ধারণ করতে মনস্থ করলেন তখন বিশ্বকর্মা তাঁকে পানপত্র, অলঙ্কার ও নানা বস্ত্র তৈরী করে দিলেন—'রত্ন মুকুট দিল নানা অলঙ্কার। অমূল্য কাঁচুলি শাড়ি উড়লি যে আর।' কবিকঙ্কন চণ্ডীতে আছে যে গোধিকারূপিনী ভগবতী কালকেতুকে নিজমূর্তি দেখাবার জন্য বিশ্বকর্মা সৃষ্ট অপূর্ব বেশভূষায় সজ্জিত হলেন। এই সজ্জার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল দশাবতার বর্ণিত কাঁচুলি।

দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে দেবভক্ত মানুষ অবশেষে দেবতা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কলকারখানা, শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ঘরে ঘরে তিনি পূজিত। তিনিও 'দংশপাল মহাবীর সুচিত্র কর্মকারক। বিশ্বকৃদ বিশ্বধৃকচৈব বাসনামানদণ্ডধৃকচৈব। শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি, প্রসার নৈপুণ্য, উৎকর্ষ দেবানং



কার্যসাধক। বিশ্বকর্মণঃ নমস্তভ্যং সর্বভীষ্ট প্রদায়ক' প্রভৃতি মন্ত্র ধ্যান ও প্রণামের। তাঁর মূর্তি গড়ে পূজা হাল আমলের রেওয়াজ। কিছুদিন পূর্বেও কলকারখানার ছুতোর ও রাজমিস্ত্রীদের যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, হাতা, খুন্তি, দা, কুড়োল, প্রভৃতিকে পূজো করা হতো বিশ্বকর্মার প্রতীক হিসাবে।

শিল্প বাণিজ্য প্রসারের ফলে শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে চলল। সমাজের

নানা স্তর থেকে আগত শ্রমিক সম্প্রদায় তাঁদের উপাস্য দেবতাকে শুধুমাত্র যন্ত্র প্রতীকের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চাইলেন না। এখানে শ্রমিক বলতে আমরা প্রধানত হিন্দু শ্রমিকের কথাই বলতে চেয়েছি যারা দেববিগ্রহে বিশ্বাসী, মূর্তি পূজায়ও উৎসাহী। বিশ্বকর্মার শিল্পীসুলভ একটি প্রতিমা বা মূর্তি প্রতিষ্ঠার কথা ভাবতে লাগলেন তাঁরা। দেবশিল্পীর মূর্তির চিন্তা প্রকট হয়ে দেখা দিল বাঙলার শ্রমজীবী মানুষের কাছে।

শ্রমিক সমাজের এই মনোভাবের সঙ্গে এসে যুক্ত হল জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব। ১৮৯৬ সনে কলকাতা কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশনের সঙ্গে যে শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল সেখানেও শিল্পের অধিষ্ঠাতা দেবতা বিশ্বকর্মার মূর্তির অভাব বোধ করেছিলেন উদ্যোক্তাদের একাংশ। কিন্তু তাঁরাও দেবশিল্পীর মূর্তির কোন হদিস দিতে পারেন নি। ফলত একথা ধরেই নেওয়া যেতে পারে যে সাম্প্রতিক বিশ্বকর্মা প্রতিমার প্রচলন এই সময়েরও পরে।

স্মরণীয়, ১৯০৫ সনের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকে নতুন এক জাতীয় চেতনা ও স্বাদেশিকতা প্রবলাকারে দেখা দেয় বাঙালী মনে। একের পর এক দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে, কলকাতায় ঢাকায় ও অন্যত্র। বেড়ে চলে শ্রমিকের সংখ্যা। এই শ্রমিক সম্প্রদায় তাঁদের সংগঠনও তৈরী করলেন। তৈরী করলেন ট্রেড ইউনিয়ন। দলবদ্ধভাবে তাঁরা তাঁদের বক্তব্য রাখতে সুযোগ পেলেন। বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষেও দলবদ্ধভাবে তাঁরা চাইলেন বিশ্বকর্মার সৌম্য এক মূর্তি। সংখ্যাগরিষ্ঠের দাবী অহিন্দুরাও মেনে নিলেন। তাঁরাও এ কাজে হাত মেলালেন। ১৯১১-১২ সালে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হবার পর হঠাৎ এই আন্দোলনটি দানা বেঁধে ওঠে। এর কিছুদিন পরেই বিশ্বকর্মার বর্তমান মূর্তির সৃষ্টি হয়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার যে বিবরণ ও দৈহিক গঠনের সংবাদ প্রাচীন শাস্ত্র ও গ্রন্থে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে, তাতে তিনি আর যাই হোন, সুশ্রী যে ছিলেন না, এটা স্পষ্ট। কিন্তু মূর্তি গড়ার উদ্যোক্তাগণ অসুন্দর কোন মূর্তি মেনে নিতে রাজী হলেন না। তাঁরা বিশ্বকর্মার সৌম্য মূর্তির জন্য বিধান চাইলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছে ও সংস্কৃতজ্ঞ সমাজের কাছে। এক একজন পণ্ডিত এক এক প্রকার বিধান দিলেন মূর্তি গড়তে। অনেকে কোন উত্তরই দিলেন না উদ্যোক্তাদের অনুরোধপত্রের। নানা

মুনির নানা মত নিয়ে নতুন এক বিপদে পড়লেন প্রতিমাগড়ার উদ্যোক্তাগণ। তখন তাঁরা ছুটলেন কুমোরটুলী। কুমোরটুলীর কুমোরেরাই আসল কারিগর। তাঁদের সহায়তা না পেলে কোন বিধানেই কোন মূর্তি উপহার দেওয়া সম্ভব নয়। তাই কুমোরদের দরবারে পেশ করলেন তাঁদের আরজি; মৃৎশিল্পীরা বিশ্বকর্মাকে তাঁদের আদিপুরুষ বলে মনে করেন। এঁরা নবশাখ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত; নবশাখ অর্থাৎ চিত্রকর, শঙ্খবণিক, স্বর্ণকার, কর্মকার, তন্তুবায়, ক্ষৌরকার, কুম্ভকার, সূত্রধর ও মালাকারের মধ্যে স্থান তাঁদের আছেই। এক একজন পণ্ডিত এক এক ভাবে এই শ্রেণী বিভাগ করছেন। রিজলে সাহেব নবশাখদের ভাগ করেছেন— তিলি, মালি, তাম্বুলি, কামার, কুমোর সদগোপ, তাঁতি, বণিক ও ময়রা সম্প্রদায়ের মধ্যে। অধ্যাপক নৃপেন্দ্রকুমার দত্ত বলেছেন যে প্রথমে নবশাখ বলতে নয় প্রকার বৃত্তিভিত্তিক মানুষকে বোঝাতো, পরে এদের সংখ্যা চৌদ্দতে দাঁড়ায়। এঁরা হয়েছেন—তিলি, মালি, তাম্বুলি, সদগোপ, নাপিত, মধুনাপিত, বারুই, কামার, কুমোর, গন্ধবণিক, তাঁতি, শঙ্খবণিক, কংসবণিক ও ময়রা। এই তালিকা থেকে সুবর্ণবণিক ও সাহা সম্প্রদায় বাদ পড়েছেন এবং যুক্ত হয়েছেন নাপিত ও মধুনাপিত সম্প্রদায়। মিঃ রিজলে বা শ্রীদত্ত কেউই চিত্রকর সম্প্রদায়কে নবশাখ সম্প্রদায়ের মধ্যে রাখেন নি পৃথক ভাবে। সম্ভবত সূত্রধর বা কুম্ভকার সম্প্রদায়ের মধ্যে চিত্রকরকে যুক্ত করেছেন তাঁরা।

এ কথা সকলেরই জানা যে, বাংলা দেশে পটুয়া বা পোটো নামে যে বিচিত্র এক সম্প্রদায় আছেন, যাঁরা না হিন্দু না মুসলমান, তাঁরা তাঁদের বিশ্বকর্মা ও ঘৃতাচী থেকে উদ্ভূত বলে মনে করেন। ঘৃতাচী বিশ্বকর্মার স্ত্রী। দেব ইচ্ছানুযায়ীই তাঁরা ধরাধামে জন্মগ্রহণ করেন এবং নয়টি সন্তান সৃষ্টি করেন। এই নয়টি সন্তানের বংশধরেরাই নবশাখ সম্প্রদায়ের লোক বলে দাবী করা হয়। এঁদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায়কে আবার ব্রাহ্মণদের অভিশাপও কুড়োতে হয়েছে। পটুয়াদের বৃহৎ এক অংশের বক্তব্য যে তাঁরা চিত্রকর সম্প্রদায়ের লোক। তাঁদের চিত্রিত কোন এক ছবির বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি দেবাদিদেব মহাদেবকে কুপিত করে। মহাদেবের অভিশাপে তাঁরা জাতিচ্যুত হন—'য্যামনে শালা শিবে আঁকা, অমনি বাবা হলেন বাঁকা, এই মলুম আমরা'—জাতিচ্যুতির কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে জনৈক বর্ষীয়ান পোটোর কথা। তাঁর ছেলেমেয়ে

অবশ্য নিজেদের মুসলমান সমাজের লোক বলে দাবী করেন। কিন্তু হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি আঁকতে, গড়তে, বা মূর্তি বিশ্লেষণ করে হিন্দুর ধর্মীয় গান গাইতে আপত্তি করেন না, কখনও নামাজও পড়েন। বিচিত্র এক সম্প্রদায়ের বিচিত্র জীবনধারণ প্রণালীর বিশদ আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তবুও মনে রাখতে হবে যে বিশ্বকর্মা তাঁদেরও উপাস্য।

উদ্যোক্তাদের অনুরোধে বিশ্বকর্মার বংশধর মৃৎশিল্পীরা প্রথমে অর্ডারী মূর্তি তৈরী করতে অস্বীকার করলেন। বিশ্বকর্মা যে রূপবান ছিলেন না এটা তাঁরা ভাল করেই জানতেন। কিন্তু উদ্যোক্তারা নাছোড়বান্দা। তাঁরা বললেন, অতবড় একজন শিল্পী, কুরূপ হতে পারে না। হলেও শিল্পকার্যের অধীশ্বর দেবতা হিসাবে যিনি প্রতিষ্ঠিত, পূজিত, তাঁর সম্পর্কে জনমনে এমন একটি ধারণা, রূপকল্প বা ইমেজ তৈরী হয়ে গেছে, যাঁর কুরূপ কোন মূর্তি বা তাঁদের মনে মনে প্রতিষ্ঠিত মূর্তির অন্যথা ভক্তবৃন্দকে ব্যথিত করবে। তাতে শিল্পীশ্রেষ্ঠ দেবপুরুষটি সম্পর্কে, তাঁর দৈহিক গড়ন বা রূপ সম্পর্কে, অনেক জল্পনাকল্পনা করার পথ করে দেবে। ফলে, দেবশিল্পী শিল্পসমূহের স্রষ্টা ও আবিষ্কারক হিসাবে জনমনে যে আসন অধিকার করে বসে আছেন তা থেকে দূরে সরে আসতে পারেন। বিশেষত যখন মেটিরিয়ালিস্ট বা নাস্তিক্যবাদীরা দেবপূজা বা বিগ্রহের বিরুদ্ধে অহরহই নানাকথা বলছেন। কুমোরদের লক্ষ্য করে এঁরা বললেন যে একবার বিশ্বকর্মার সৌম্য এক মূর্তি চালু করতে পারলে তা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে, এবং তাতে দরিদ্র মৃৎশিল্পীদের কিছু নিয়মিত আয়ের পথ খুলে যাবে।

উদ্যোক্তাদের এই সব যুক্তি বা সেন্টিমেন্টে আঘাত, কিছুতেই কাজ হল না। একজন শিল্পী একদিন রাজী হন তো পরের দিনই তিনি সমাজের তাড়নায় অস্বীকার করেন মূর্তি গড়তে। অবশেষে জনৈক কুমোর রাজী হলেন পয়সার লোভে। তিনি বললেন, এটাও সামাজিক কাজ। পূর্ব-পুরুষদের সম্পর্কে অনেক মানুষই কিছু অতিশয়োক্তি করে থাকেন, অবশ্য সে পূর্বপুরুষেরা যদি কৃতী হন, স্মরণীয় হন। তাই 'আমাদের আদিপুরুষ বিশ্বকর্মার রূপ ও দৈহিক গঠনে একটু 'অতি' রূপ সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে!' পরন্তু আদিপুরুষ বিশ্বকর্মার সুরূপ মূর্তি চালু ও জনপ্রিয় করা গেলে আমাদের মৃৎশিল্পীদের কেউ না কেউ তা থেকে উপকৃত হবেন, বাৎসরিক যা হোক একটা আয়ের পথ খুলে যাবে

তাঁদের কাছে।' এই মৃৎশিল্পীটি সাহসিকতার সঙ্গে নিজ সমাজকে মোকাবিলা করে গজবাহন বিশ্বকর্মার এক মূর্তি সৃষ্টি করলেন।

স্মরণীয়, মধ্যযুগের সাহিত্যে, মঙ্গলকাব্যে সর্বত্র বিশ্বকর্মার ডাক। ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট প্রভৃতি পূর্তশিল্পের কাজ থেকে যে কোন শিল্পকর্মেই বিশ্বকর্মা ছাড়া লোক নেই। ভল্লুকবাহন এ দেবতাটি সর্বদাই সৃষ্টি করে চলেছেন, অক্লান্ত সৃষ্টি, বিশ্রামহীন সৃষ্টি। বিশ্বকর্মার বাহন এই ভল্লুক কি ভাবে গজে পরিণত হল তা বলা কষ্টসাধ্য। মনে করা যেতে পারে, অসুন্দরকে সুন্দর করতে গিয়ে যে মানসিকতা কাজ করেছে মূর্তি গড়তে, তা-ই ভল্লুককে গজে পরিণত করতে সহায়তা করেছে। এ সম্পর্কে গবেষণার অবকাশ আছে। এখন আমরা বিশ্বকর্মার যে মূর্তি পূজো হতে দেখি তিনি দেখতে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়র মত সুশ্রী ও সুঠাম। এই মূর্তির উৎপত্তির বয়স পঞ্চাশ বৎসরও হবে না। এবং এই মূর্তির উৎপত্তির উৎস অজ্ঞাত। প্রথমে যে মৃৎশিল্পী বিশ্বকর্মার এই মূর্তি সৃষ্টি করেন তিনি কুমোরটুলীর কুমোরদের কাছে তিরস্কৃত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সাহস ও বুদ্ধি এবং নতুন সামাজিক ব্যবস্থার পত্তনে কুমোরটুলীর তাবৎ শিল্পীরা তাঁকে ও তাঁর সৃষ্ট মূর্তিকে মেনে নিয়েছেন, মেনে নিয়েছেন এ মূর্তি অগণিত ভক্তবৃন্দ।

বিশ্বকর্মার পুত্রের নাম ছুঁচা। নিপুণ শিল্পীর ঐকান্তিক সাধনার ব্যর্থতার নিদর্শন হিসাবে বিশ্বকর্মার পুত্র ছুঁচার কথা বলা হয়।

এই প্রসঙ্গে আমরা পাখিরদলের নেতা রূপচাঁদ পক্ষীর (উড়িষ্যার জাজপুর নিবাসী রূপচাঁদ দাস মহাপাত্র) বিশ্বকর্মার রূপ বর্ণনার উল্লেখ করছি। 'শুনেন ভদ্র ইতরগণ বিশ্বকর্মার রূপ বর্ণন। ধন্য ধন্য হে বিশ্বকর্মা, (বিভু তুমি) অসীম মহিমা॥ তুমি যে হে কারিগর, দেবগণ অগোচর। কি বর্ণিতে পারে নর, না পারে দেব ব্রহ্মা॥ রূপে গুণে মান্য তুমি হে সুধীর। নীলাচলে গঠিলা শ্রীহস্তেতে মন্দির॥ ভুবনেশ্বরে লীলা প্রকাশিলা। আপনি গঠিলা নউকোটী শিলা॥ তব হস্তের কারিগরি, ইন্দ্রের অমরাপুরী। আহা মরি, মরি মরি কি দিব হে উপমা॥ ছুতোরের র‍্যাঁদো তুরপুন জিনবাড়ী। স্বর্ণকারের কিটকিটে যন্তরী লেই হাতুড়ী॥ ধোপার ঘরেতে তুমি ইস্তিরী। ঘরামীর গুণছুঁচ আর কাটারী॥ কখন কিবা ধর রূপ, হও ঘোড়ার ঘাসছোলা খুরপো। চোরে সিঁদকাটি গুপো, ডাকপেয়াদার মোমজামা॥ ছুঁচ কাঁচি আঙ্গস্তানা

দরজির। চাষার লাঙল কাস্তে হেঁসো হও সিওলির ॥ মিতুয়ার তুমি হে ঝুড়ি কোদাল। নাপিতের খুরভাণ্ড, ডাকাতের ঢাল তরোয়াল ॥ শাঁখারীর করাত বট, আসিতে যাইতে কাট। তাঁতির সোনামাকু, তুমি বাদ্যকরের দামামা ॥ যন্ত্র অস্ত্র কেহ ছাড়া নাই। মুচির বীরসুল জুতিয়ার শেলাই ॥ তোমার কৃপায় ইংরেজ ভাসায় লোহার জাহাজ। চীনের ফক্কিকারী কাজ, কহে খগ পরহাসা ॥ …বিশ্বকর্মার কি মহিমা কে জানে। যাঁর সুতো শ্রীযুক্ত, বাস করেন চীনে ॥ ইনি বিশ, তিনি বিয়াল্লিশ, শিল্পবিদ্যারি গুণে। বিশাই-এর গঠন ঘটিবাটি থালা। বিয়াল্লিশের গঠন পিরিচ ডিস পেয়ালা ॥ এর চ্যানা জ্যার, ওর ঢাকাই জ্বালা। ওর স্ক্রুপ-এর একেলে (ছোট পেরেক) ॥ ঢাল, তরোয়াল, চক্র, ধনুর্বাণ। রঞ্জক সহ বন্দুক-এর পিস্তল কামান ॥ ওর খুন্তী, গাঁতি, এর বর্শা নিশান। এর গাঁজাখোর, ওর শিষ্য চণ্ডু টানে ॥ এর পেড়ী পিঁড়ে, প্যাটরা তক্তা ক্যাওড়া কাষ্ঠ। ওর জিঙ্ক টি-ট্রে লোহার আয়রণচেষ্ট ॥ ওর কামার, ছুতার হতে চীনের শিল্পীশ্রেষ্ঠ। উৎকৃষ্ট, স্পষ্ট লোক বাখানে ॥ এর হুঁকো দেরকো চৌপল লাণ্ঠনে। ওর ওয়াল লাইট ফিট শ্যামাদান ॥ ওর শিষ্য মাংস খায়। এর জীবন রক্ষা হয় চাল ধানে ॥ ছুঁচের কাজে চীনের মত কেহ নাই। বাঙালীর তালি ঠিক কাঁথার শেলাই ॥ হুজুগে বাঙালী চীনে শিল্পী তাই। খগে ভণে গীতি মূলতানে ॥' বিশ্বকর্মার চরিত্র চিত্রণ করে এর চেয়ে স্পষ্ট বক্তব্য বাংলা সাহিত্যের আর কোথায় আছে ?

ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আক্রমণে আমাদের প্রাচীন জীবনের 'মোড়' বা প্যাটার্ণ গেল পালটে। অথচ এর জায়গায় বলশালী ধনতান্ত্রিক সভ্যতারও উদয় হল না। জন্ম নিল কিম্ভূতকিমাকার পদার্থ। গ্রাম ক্ষয়িষ্ণু হয়ে চলল। বৃটিশ যুগে অর্থনৈতিক দিক থেকেও গ্রামীণ শ্রেণীবিন্যাস অন্যদিকে মোড় নিল। মুসলিম আমলে সরকারী তহবিলের একমাত্র সম্বল ছিল ভূমিরাজস্ব। অন্য রাজস্ব থাকলেও তাদের উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা ছিল না। কাজেই ঐ সময় কৃষক সম্প্রদায়ের উপর যতই অত্যাচার অবিচার হয়ে থাকুক না কেন, স্বর্ণডিম্বপ্রসবিনী হংসটিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চলত। এর পরিচয় পাওয়া যায় 'তকশীম' বা চাষী কর্তৃক উৎপন্ন ফসলের উপর রাজস্ব নির্ধারণ এবং হস্তবুদ বা মোটামুটি আন্দাজি আয়ের উপর রাজস্ব নির্ধারণ ব্যবস্থায়। ইংরেজ মুসলমানদের 'হস্তবুদ' ব্যবস্থা তো মানলেনই তার উপর চাপালেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। বিভিন্ন

প্রজাস্বত্ব আইন এমন ভাবে জুড়ে দিলেন যে গ্রামাঞ্চলের চেহারা গেল বদলে। পূর্বে জমির শোষণকারীদের সংখ্যা বেশী ছিল না, ক্রমে বহু শোষক এসে গেল। তাছাড়া খাজনা ইত্যাদি দেবার পরেও যদি চাষী কোথাও লাভবান হতেন তবে সেটুকুও কেড়ে নেবার ব্যবস্থা হল ১৮৫৯ সনের 'রেন্ট এ্যাক্টে'। ফলে গ্রামে নতুন শ্রেণী গড়ে উঠলো। গ্রাম ও শহরের লোকেদের মধ্যে আচার আচরণের তফাত দেখা দিল। সংক্রান্তি, স্নান, উপবাস, অরন্ধনাদির 'প্যাটার্ন' শহরে এক, গ্রামে আর এক। শহরের বিশ্বকর্মা এখন মূর্তির মাধ্যমে পূজিত, গ্রামের অনেক জায়গায় এখনও এ মূর্তি যায় নি। সেখানে দা, কুড়াল, খুন্তী, যন্ত্রসমূহকেই বিশ্বকর্মার প্রতীক হিসাবে পূজো করা হয়। ক্রমে ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে আনন্দানুষ্ঠান যুক্ত হয়ে এক একটি দিন এক এক প্রকার উৎসবের সৃষ্টি করেছে। সে উৎসবের কোথাও আছে ভুরিভোজ, কোথাও আছে অরন্ধন বা বাসি শীতল খাবার খাওয়া, স্বভাবতই তা স্বল্পভোজের আওতায় আসে। কিন্তু কোন ক্রিয়াকর্মেই আনন্দের অভাব বা অসদ্ভাব নেই।

আনন্দের স্বভাবই হচ্ছে ক্রীড়া। আনন্দ স্বতঃই নিজেকে বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে মুক্তিদান করতে থাকে। আনন্দের কর্মের মধ্যেই আমরা মুক্ত। আনন্দের নিষ্ক্রিয়তাই তার বন্ধন। কর্মই তার মুক্তি। কর্মের মুক্তি আনন্দের মধ্যে। আনন্দের লক্ষ্য কর্মের দিকে। কর্মের মধ্যে এই আনন্দের অভাব ঘটলে দেখা দেয় অশান্তি, বিঘ্ন সৃষ্টি হয় কর্মে। এই বিঘ্ন থেকে মুক্তির জন্য, অশান্তি থেকে শান্তির জন্য প্রায়শই আহ্বান দেওয়া হয় ধর্মঘটের।

তাই উনিশ শ পাঁচ সনের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষে আশ্বিন সংক্রান্তি দিবসে (১৬ই অক্টোবর—৩০শে আশ্বিন) ব্রিটিশ সরকার যখন বঙ্গভঙ্গের দিন ঘোষণা করলেন তখন সারা বাঙলার গাঁয়েভুঁয়ে এ দিনটিকে ক্ষোভ ও দুঃখের প্রতীক করে তোলার আয়োজন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গ মিলনের দাবিতে 'রাখীবন্ধন' ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'অরন্ধন' পালন করতে প্রস্তাব আনলেন। রাজনৈতিক সমাজ এ প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করলেন। শোকচিহ্নস্বরূপ আশ্বিন সংক্রান্তি বা ৩০শে আশ্বিন প্রতিপালিত হল অরন্ধন দিবসরূপে। এই অরন্ধনের সঙ্গে ইতিপূর্বে বর্ণিত ধর্মাশ্রিত অরন্ধনের কোন যোগ ছিল না। এই অরন্ধন ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে। তাই বলা হয়েছিল শিশু ও রোগী ব্যতীত এ দিনে কেউই অন্নজল গ্রহণ করবেন না, সকলেই

খালি পায়ে থাকবেন। কোন বাঙালীর ঘরে উনুন ধরবে না। সব বন্ধ। সব ধর্মঘট। এইভাবেই ধর্মাচরণের অঙ্গ অরন্ধন, উপবাস প্রভৃতি কালক্রমে ট্রাডিশন থেকে রাজনৈতিক লড়াই-এর হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। ধর্মীয় উপবাস থেকে এসেছে অনশন। একই সরণি বেয়ে সকলের আনাগোনা, যে সরণী বেয়ে গ্রাম শহরের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে, যে সরণি বেয়ে বিশ্বকর্মার মূর্তি রূপান্তরিত হয়েছে, সেই সরণি বেয়েই ধর্মীয় বন্ধ, উপবাসাদি পরিবর্তিত সমাজ-ব্যবস্থা ও বদলের মধ্য দিয়ে স্ট্রাইক, ধর্ণা, ঘেরাও, অনশনাদিতে পর্যবসিত হয়েছে। লড়াইকে সফল করতে, ন্যায্য দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে ট্রাডিশনাল উপাসনা, আচার-আচরণ, উপবাস ও অরন্ধনের রাজনৈতিক রূপ ধর্মঘট, বন্ধ, অনশনাদি যে কত কার্যকর তা ভুক্তভোগী মাত্রেরই জানা। বলা বাহুল্য এই দুই লড়াইএর পদ্ধতিতে অনেক তফাত। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে উভয়েরই উদ্দেশ্য প্রায় এক। রাজনৈতিক ধর্মঘটে শ্রমিক মালিকের কাছে, সরকারী কর্মচারী সরকারের কাছে নানাবিধ দাবী পেশ করেন, লড়াই করে তা আদায় করেন। ধর্মানুষ্ঠানকারী উপবাস করেন আত্ম-শুদ্ধির জন্য, অরন্ধন পালন করেন শাস্ত্রীয় বিধান বা লোকাচারের জন্য। তথাপি তাঁরা দাবী পেশ করেন মহামহিম পরমেশ্বরের কাছে কিছু একটা পেতে। কিছু পাওয়ার চিন্তা উভয়ের মধ্যেই প্রবল। আর যাঁরা দেবেন তাঁরা মালিক হন, সরকার হন বা দেবতা হন তাঁদের বক্তব্য এক ও স্পষ্ট। তা হচ্ছে হয় আমাতে সমর্পণ নয় সমূলে বিনাশ। দেবদেবীদের ইচ্ছার



বিরুদ্ধে কোন কাজ করলে অথবা দেবদেবীর চরণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ না করার অপরাধে মানুষের যে কত বিপদ হতে পারে তার নানা কাহিনী আমাদের জানা। তেমনি এও আমরা জানি যে মালিকের ইচ্ছা বা সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য শ্রমিক সাধারণকে কি ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়।

লোকসমাজ উপবাস অরন্ধনাদি বা রান্না বন্ধ পালন করেন আত্মশুদ্ধি ও শাস্ত্রীয় বিধান বা লোকাচারানুযায়ী। পরিশুদ্ধ মনে তাঁরা দেবতার কাছে আবেদন জানান নিজ ও নিজ সংসারের সকলের সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য। ভক্ত দেবদেবীর কৃপালাভে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে দেবসেবায় নিযুক্ত করেন। অরন্ধনের মধ্যেও এ ভাবটি স্পষ্ট। স্পষ্ট বংশ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা স্বরূপ ইন্দ্রজালের চর্চা। নারী সন্তান ধারণে সক্ষম অতএব সে উর্বরতার প্রতীক। নারীর প্রজনন ক্ষমতা প্রকৃতির ক্ষেত্রে জনন-ক্ষমতা সঞ্চারিত করবে এ ধারণার বশবর্তী হয়ে বহু প্রাচীন জাতি জননাঙ্গ প্রদর্শনমূলক নানা অনুষ্ঠানও করত ফলকামনার উদ্দেশ্যে। ষষ্ঠীপূজায় পুতা ইত্যাদি জননাঙ্গেরই প্রতীক। জমির উর্বরতা বৃদ্ধি এবং বংশবৃদ্ধিজনিত নানা আচার অনুষ্ঠান নারী সমাজের এক্তিয়ারে।

আমাদের ধারণা একমাত্র পুরুষেরাই মেলার পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। পশ্চিমবঙ্গে এমন কতকগুলি মেলা আছে যার উদ্যোক্তা ও পরিচালক নারীসমাজ। এ ধরণের একটি মেলা হচ্ছে মুর্শিদাবাদ জেলার ভগীরথপুর থানাস্থ ডোমকলের জামাইষষ্ঠী বা দই মেলা উৎসব। চমৎকার এ উৎসবের পৃষ্ঠপোষক ও উদ্যোক্তা স্থানীয় মহিলা সমাজ। পুরুষদের মধ্যে শুধু জামাইদের প্রবেশ অধিকার আছে এ মেলায়।

আমরা জানি জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী দিবসে জামাই ষষ্ঠী উৎসব প্রতি-পালিত হয় সারা বাঙলায়। অবশ্য পূর্ববঙ্গের বরিশাল প্রভৃতি স্থানে জামাই ষষ্ঠীর রেওয়াজ নেই। জামাই-মেয়ের বিশেষ আদর আপ্যায়ন জামাই ষষ্ঠী অনুষ্ঠানের মূল অঙ্গ। যদিও কোন ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে এই উৎসবের প্রত্যক্ষ যোগ নেই তথাপি অরণ্য-ষষ্ঠী ব্রতের সঙ্গে একে একীভূত করা হয়েছে। সেখানে প্রত্যেক সন্তানবতী নারী স্বীয় সন্তান-সন্ততির মঙ্গলের জন্য এ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করেন। মেয়ে-জামাইয়ের মঙ্গল ও শ্রীবৃদ্ধি কামনার সঙ্গে সঙ্গে ব্রতচারিণীরা সন্তানসন্ততিরও দাবী করেন ষষ্ঠী ঠাকুরের কাছে। তিনিই সন্তান উৎপাদনের জাগ্রত দেবতা। এই অনুষ্ঠানে শুধু ষষ্ঠী দেবীরই আরাধনা করা হয় না, আরাধনা করা হয় তাঁর সন্তানসন্ততিদেরও। তাঁর বাহন বিড়ালেরও। বিড়ালকে এদিনে নানাভাবে তোয়াজ করতে দেখা যায়। পাখা দিয়ে বাতাস দেবার জন্য বিড়াল খুঁজে বেড়াতে হয়। সেদিন বিড়ালের দেখা পাওয়া ভার। অন্যান্য গৃহপালিত প্রাণীকেও আরামের ব্যবস্থা করা হয়। ঐ দিনে কোন মানুষ বা গৃহপালিত প্রাণীকে মারা বা আঘাত করা নিষেধ। আঘাত করলে ষষ্ঠীদেবী রুষ্ট হবেন, ব্রতচারিণীর আকাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভে তা

বাধাস্বরূপ। ষষ্ঠীদেবীকে সন্তুষ্ট করতে ব্রতচারিণীর এই পরিশ্রম।

জামাইষষ্ঠীর সকালে মেয়েরা অরণ্যষষ্ঠীর ব্রত করেন। আত্মীয় স্বজন, গৃহদেবতা, গৃহপালিত প্রাণীদের ষাট দেন, ষষ্ঠীদেবীর কাছে সকলের মঙ্গল ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। যাঁরা এ ব্রত পালন করেন তাঁরা স্নানের সময় গায়ে তেল দেবেন না। নিরামিষ আহার খাবেন, সৎচিন্তা ও মানুষের মঙ্গলের কথা ভাববেন। অপরাহ্নে ডোমকলের এই ব্রতচারিণী ও অন্যান্য মেয়েরা পূর্ব আয়োজিত মেলায় যোগদান করেন।

এই মেলা উৎসবটি প্রাচীন। মেলা উৎসবে যোগদানকারী মহিলারা গ্রামের শিবমন্দিরের পাশের পাকুড় গাছের নীচে ষষ্ঠীতলার চারদিক ঘেরাও করা প্রাঙ্গণে মিলিত হন। এখানে প্রথম-সন্তানসম্ভবা মহিলাগণ দধির ভাঁড় নিয়ে উপস্থিত হন দধি বিক্রয়ের জন্য। অপরাপর স্ত্রীলোক তাঁদের নিকট থেকে দধি ক্রয় করেন। নীলামে দই বিক্রী করা হয়। ক্রেতা সাধারণত মহিলারাই তবে জামাইবাবুরাও ক্রেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে দরদাম করার কোন অধিকার তাঁদের থাকে না। স্ব স্ব স্ত্রীদের আদেশ মত দধির দাম পরিশোধ করা এবং দধির মূল্য নির্ধারণের কর্মপদ্ধতি প্রত্যক্ষ করা ছাড়া জামাইবাবুদের আর কোন ভূমিকা থাকে না এ মেলায়। যে জামাই যত বেশী দর দিয়ে এই দই কিনতে পারবেন উদ্যোক্তা মহিলাবৃন্দ ও গ্রামের চোখে সে জামাইয়ের সে বৎসরের জন্য তত বেশী আদর, তত বেশী সম্মান। সাধারণতঃ উপস্থিত প্রত্যেক জামাই-ই এ সুযোগ গ্রহণ করতে সচেষ্ট থাকেন। কিন্তু কার ভাগ্যে শিকা ছিঁড়বে কেউ বলতে পারে না।

পূর্ব নির্ধারিত গাছের তলায় স্থানীয় মহিলাবৃন্দ ও গৃহিণীরা একত্রিত হন। এই জমায়েতের কোন এক কোণ থেকে বয়স্ক মহিলা হাঁক দিতে থাকেন—'কৈ গো দই কি হলো? দৈ কি হলো?' এই ডাক শোনার কিছু পরেই সধবা ও কুমারী মেয়েদের একটি দল প্রথম-সন্তানসম্ভবা মহিলার মাথায় একটি দইয়ের হাঁড়িসহ গুণ গুণ গান করতে করতে এগিয়ে আসেন। এসেই এ দলের একজন মহিলা চীৎকার করে বলেন—'কে দই খোঁজ করছিল? লেবে তো চলে আস, দর দাও'।

যাঁর মাথায় দধির হাঁড়ি থাকবে তিনি অন্তত সাত থেকে আট মাসের গর্ভবতী। গ্রামে এরূপ উৎসবের দিনে এরূপ গর্ভবতী মেয়ে না থাকলে আশে-পাশের গ্রাম থেকে এরূপ একজন মেয়েকে যোগাড় করা হয়। দধির হাঁড়ি নিয়ে আসার পূর্বে জনৈক সধবা শঙ্খ বাজাতে বাজাতে জানান দেন

যে দধি বিক্রেতা এলেন বলে। দধির ক্রেতা জামাই হলে দধি যখন নীলামে চড়ে তখন সে দধির দাম দেবেন ক্রেতার স্ত্রী। ক্রেতার স্ত্রী অবশ্য উপস্থিত স্বীয় বরের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন কি দর দেবেন বা কি দর দেবেন না।

দধি নীলামে চড়াবার পূর্বে কাদা খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ খেলায় একে অপরেব গায়ে কাদা লাগিয়ে দেয়। মেয়েদের এ কাদা খেলায় পুরুষেরা অংশ নিতে পারেন না। তাঁরা শুধুই দর্শক। দোল বা রঙ খেলাকে উপলক্ষ করে যে কাদা খেলা সেখানে পুরুষ সমাজের একাধিপত্য থাকলেও মহিলারাও সে খেলায় অংশ নিতে পারেন। বিশেষত শ্যালিকা, ঠাকুরমা প্রভৃতি সম্পর্কিয়াদের প্রায়শই এ খেলায় জড়িয়ে ফেলা হয়। দুর্গোৎসবের নবমী পূজার দিনে বলির রক্ত ও হাড়িকাঠের মাটি নিয়ে কাদা তৈরী করে সে কাদায় গড়াগড়ি খাওয়া একটি আনুষঙ্গিক আচার। পুরাকালে দেবীর প্রীত্যর্থে ছাগ মহিষের সঙ্গে মনুষ্য বলিরও রেওয়াজ ছিল শত্রুক্ষয় মানসে। বর্তমানে মানুষের বদলে কলার মোচায় পিটুলি দিয়ে মনুষ্য শত্রুর প্রতীক বলিদান করা হয় অনেক স্থানে। বলির পরে পিছনে ফিরে শত্রুকে দু'পায়ের নীচে দিয়ে দূরে ফেলে দেওয়া হয়। শত্রুমূর্তি তৈরি করতে পিটুলী ছাড়া যবচূর্ণ বা মৃত্তিকাও ব্যবহৃত হয় অনেক স্থানে। প্রতিমা বিসর্জনের পরে বদর বদর রবে জলকাদা ছিটিয়ে দেবার রেওয়াজ আছে। তাছাড়া বিবাহের আংটি খেলার মধ্যে, ইদ পূজায় ও নানাবিধ লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানে প্রকৃতির সন্তানদের প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাবার বাসনায় কাদাখেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে সুপ্রাচীনকাল থেকে। এ দিনের দধিকর্দম খেলা অনেকক্ষণ ধরে চলে। নীলামে দধি বিক্রীর সময় কাদা মাখা গায়েই মহিলাবৃন্দ অংশ নেন। কাদা খেলার সময় বাঁশ বা কলাজাতীয় বস্তুর উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। জামাই ষষ্ঠী বা দধিকর্দম ও দধি খেলার সঙ্গে ফার্টিলিটি বা উর্বরতার প্রত্যক্ষ যোগ আছে। পরিশুদ্ধ মন ও প্রাণ নিয়ে নতুনের আহ্বান জানানো হয়। দধি শুদ্ধতার প্রতীক। যে কোন শুভকর্মে দধি অপরিহার্য। জামাই ষষ্ঠীর সঙ্গে দধির সম্পর্কও এখানেই। জামাই ষষ্ঠী দিবসে তাই আম ও অন্যান্য ফলের সঙ্গে সঙ্গে দধির দামও চড়ে যায়। নীলামে দই ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দইয়ের দামও চড়ে। নীলামের এক দুই তিন ডাকের মত, যে মেয়ের বর দামে হেরে যায় অমনি তাকে লক্ষ্য করে ও অপরকে লক্ষ্য করে কাদা ছোঁড়া হয়। এইভাবে কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে কেউ কিছু মনে করে না। সকলেই খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি নিয়ে এবংবিধ আচরণ মেনে নেন বা গ্রহণ করেন। দইয়ের দাম

ক্রমেই চড়ে যায়। যাঁর বর শেষ অবধি দই কেনেন তাঁকে নিয়ে তখন চলে হৈ হুল্লোড়। দধি ক্রেতার সেদিন আনন্দের সীমা থাকে না।

কুমারী মেয়েরা দধি ক্রেতাকে ঘিরে নানা আমোদ-আহ্লাদে মাতেন। সধবারা দধি ক্রেতার বউকে নিয়ে রঙ্গ-রস করেন। আর বর্ষীয়সী মহিলারা যে সব বরেরা দধি কিনতে পারলেন না তাঁদের সান্ত্বনা দেন, হাসি-ঠাট্টা করেন। দই এক হাঁড়িই থাকে। একজনের বেশী সে দই কিনতে পারেন না। যিনি কিনতে পারলেন তাঁর জয় জয়কার। তাঁর সুখ্যাতির অন্ত থাকে না।

দধি ক্রেতা উপস্থিত সকলকে সদ্য কেনা দধি পরিবেশন করেন। দধি বিক্রীর টাকা দিয়ে অনুষ্ঠানকারীরা অন্য খাবার খরিদ করেন এবং সকলে সমানভাবে ভাগ করে খান। দধি ক্রেতার আরও অর্থ আরও সন্তানের কামনা করেন সকলে। এইভাবেই একটি চমৎকার পরিবেশে বৎসরের পর বৎসর এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে চলে মহিলাদের পরিচালনায় ও ব্যবস্থাপনায়। এ অনুষ্ঠান আমাদের কাছে বঙ্গনারীদের নানা কাজে আত্মনিয়োগের কথা ঘোষণা করে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে হয় দধির ব্যবহার হিন্দু সমাজে। বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে যে পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত ও মধুপর্কের প্রয়োজন তার অন্যতম উপকরণ দই। কোন জায়গায় যাবার সময় দই ও ঘি দেখা এবং দই ও ঘির নাম শোনা বা নাম করা প্রশস্ত। যাত্রাকালে দই খাওয়া এবং দইয়ের ছিটা দেওয়ার প্রথা দীর্ঘদিন থেকে হিন্দু সমাজে চলে আসছে। আভ্যুদয়িক বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের সমস্ত উপকরণে দইয়ের ছিটা দেওয়ার রীতি। জন্মাষ্টমীর পরের দিন গোয়ালাদের মধ্যে যে নন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয় সেখানে দইয়ের হাঁড়ি মাথায় করে নাচতে নাচতে ভেঙে ফেলে দই কাদার সৃষ্টি করা হয়। দেবপূজার বিসর্জনের দিন দই খই নিবেদন করা, যজ্ঞ সমাপ্তিতে দই দিয়ে অগ্নিস্থানকে শীতল করা এবং বিবাহাদি অনুষ্ঠানে বর ও কনেকে দই খাওয়ানো সুদীর্ঘ দিন থেকে চলে আসছে বাঙালী সমাজে। বিবাহের দিন সকালে বর ও কনের মাতা বা মাতৃস্থানীয়াদের কেউ স্বস্ব গৃহে দধি-চিড়া খান এবং কনে ও বরের কপালে দধি-চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দেন। অনেক জায়গায় দধিচন্দন মিশ্রিত জলে পান ডুবিয়ে কনে ও বরের গায়ে ছিটা দেওয়া হয়। অনেক জায়গায় কন্যাগৃহে যাত্রা করার সময়ও বরের কপালে দধি ও চন্দনের ফোঁটা দেওয়ার রীতি আছে। অনেক জায়গায় বরের হাত দধি দিয়ে ধুইয়ে দেন কনের মা। বাঙলার দধিমঙ্গলকে অসমীয়ারা বলেন দৈয়ন দিয়া। এই

অনুষ্ঠানে বর ও কনের বাড়ীতে এয়োস্ত্রীরা সমবেত হন। তারপর বর ও কনের সধবা মাতা, সধবা না থাকলে কোন নিকট সম্পর্কিত সধবা মহিলা নববস্ত্রাচ্ছাদিত বর ও কনের নিজ নিজ বাড়ীতে তাদের সম্মুখস্থ উঁচু পিঁড়ির উপর জানু পেতে বসলে সেখানে বর ও কনে বসেন। তারপর বর ও কনের মুখে দধি ভাত দেন ও ভাজা মাছের লেজ থেকে কিছু অংশ খাইয়ে দেন। এই সময় সমবেত এয়োস্ত্রীরা উলুধ্বনি দেন, শাঁখ বাজান। 'জয় রাম জয় রাম বলো, জয় জয় হরি বলো, হর-গৌরী বসতি হউক' বলে চীৎকার করে ওঠেন। পরে গুরুজন সকলে বর ও কনেকে আশীর্বাদ করেন। এ অনুষ্ঠানে সাধারণত কনিষ্ঠদের যোগ দিতে দেওয়া হয় না, কিন্তু অনেক সময় তারা কান্নাকাটি করে অনুষ্ঠানস্থানে দর্শকের ভূমিকা নেয়। এই সময় নানাবিধ গান গাওয়া হয়—যথা 'জয় জয় মঙ্গলময়, যিনি মঙ্গল আধার, অমঙ্গল দূরে যায় লইলে নাম তাঁহার। উড়ায়ে পতাকা সারি, যত পুরবাসী নারী এসো শঙ্খধ্বনি করি। ছাড়াইয়া লাজ ভাব যতেক যুবতীবালা, লয়ে শ্বেত পুষ্পমালা অগুরু চন্দন সার। পূর্ণকুম্ভ সহকার, দূর্বাদলধান্য আর মাঙ্গলিক উপচার' ইত্যাদি। অনুষ্ঠানান্তে পান দিয়ে যে দইয়ের জল ছিটিয়ে দেওয়া হয় তা-ই বিয়ের জল। বিবাহের পূর্বে রুগ্না বালিকা বা অবাড়ন্ত বালিকাকে লক্ষ্য করে প্রায়ই গুরুজন স্থানীয়ারা বলেন—'বিয়ের জল পাবে, গায়ে পুষিয়ে যাবে।' অনেক স্থানে বিয়েবাড়ীর কোনও কোনও লোক আগে থেকে পচা দই যোগাড় করে রাখেন এবং দধিমঙ্গল অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ উপভোগ ও অপরকে হাসাবার জন্য নিদ্রিত পুরুষ ও মহিলাদের মুখে তা মাখিয়ে দেন। আচার ও মঙ্গলানুষ্ঠান ছাড়া দই অনেক রোগেরও পথ্য এবং চিনিপাতা দই বা পয়োধি সকলেরই অতি উপাদেয় খাদ্য। উর্বরতা বৃদ্ধির অন্যতম প্রতীক রূপে বঙ্গদেশে দধির ব্যবহার সুপ্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। জামাইষষ্ঠীর দধিমেলার মধ্যে সে তথ্যই বিদ্যমান।

আর একটি মেয়েলী অনুষ্ঠানের মধ্যে নদীয়ার হরিণঘাটা থানাস্থ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মেলাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কার্তিক মাসের ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে যমুনা নদীতীরে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলার উদ্যোক্তা মহিলাবৃন্দ, কিন্তু সেখানে হিন্দু মুসলমান পুরুষ মহিলা সমস্ত শ্রেণীর অধিবাসীদের যোগদানে কোন আপত্তি নেই। ভাইফোঁটা বাঙালী সমাজে বিশেষ জনপ্রিয় অনুষ্ঠান সমূহের একটি। ভাইয়েদের দীর্ঘজীবন, সুখ, শান্তি ও মঙ্গল কামনার জন্য

বোনেদের অনুষ্ঠান এটি কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ায়। বরিশাল প্রভৃতি স্থানে ফোঁটা দেওয়া হয় প্রতিপদে এবং দ্বিতীয়ায় ছোট বা বড় বোনেরা ভাইয়েদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়। অন্যত্র বোধহয় একই দিনে ফোঁটা ও নিমন্ত্রণ, নতুন কাপড় দেওয়ার ধুম। লোকশ্রুতি অনুসারে এইদিনে যমরাজার বোন যমরাজাকে ফোঁটা দিয়েছিলেন বলে যম অমর হয়ে আছেন। সেই জন্য এই দিনটিকে অনেকে যমদ্বিতীয়াও বলেন। ভাই বোনের গভীর প্রীতির সম্পর্কটি মধুর হয়ে ওঠে বোনের অতি ব্যস্ততায়, নানাবিধ সামগ্রী খাওয়াবার আন্তরিক প্রচেষ্টায়। বোনেরা ভাইয়েদের কপালে ফোঁটা দেবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত অন্ন স্পর্শ করেন না, শুচিশুদ্ধ অন্তরে করেন ভাইয়েদের দীর্ঘ জীবন কামনা, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা। ভাই ফোঁটা দেওয়ার কতকগুলো প্রথা আছে, যেমন সকালে বা প্রদোষে ফোঁটা দেওয়াই অনেকের আচার। অনেকে আবার বার দোষ (শনি-মঙ্গলবার) এড়াবার জন্য আগে বা পিছে ফোঁটা দেয় ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনটি শনি কি মঙ্গলবারে পড়লে। কিন্তু ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে নিমন্ত্রণ খাওয়ায় এবং নতুন জামা কাপড় উপহার দেয়। চন্দন, কাজল ও ঘি দিয়ে ফোঁটা দেওয়া হয় পিঁড়ি বা আসনে বসিয়ে। সম্মুখে থাকে জ্বলন্ত প্রদীপ। বাটায় থাকে ধান, দূর্বাদি। থালায় থাকে মিষ্টি সামগ্রী। অনেক বোন পানের বোঁটায় করে ভাইয়ের চোখে কাজল পরিয়ে দেয় তারপর বাঁ



হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে দেয় ফোঁটা। ফোঁটা দেওয়ার সময় এক এক প্রকার মন্ত্র বলা হয়। উচ্চারণের তারতম্যের দরুণও ফোঁটার একই ছড়ায় বিভিন্নতা ও পাঠান্তর পাওয়া যায়। বরিশালের ছড়ায় বলা হয় —'প্রতিপদে দিয়া ফোঁটা দ্বিতীয়ায় দিয়া নিতা। আইজ হইতে ভাই আমার যমের ঘরে নিমের অধিক তিতা॥ যমুনা দেয় যমরে ফোঁটা, আমি দেই

আমার ভাইরে ফোঁটা। ভাই আমার সোনার কাঠি নিমতিতা॥ ভাইর কপালে দিলাম ফোঁটা। যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা॥ ভাই আমার লক্ষেশ্বর। স্ত্রী-পুত্রে বাড়ুক আমার ভাইয়ের ঘর।' তিনবার এই ধরণের ছড়ার আবৃত্তি ও যথাক্রমে ঘি, চন্দন ও কাজলের ফোঁটা। তারপর জোকার বা উলুধ্বনি। সেই সময় বলবে—'ঢাক বাজে ঢোল বাজে আরও বাজে কাড়া। বুইনের ফোঁটা না নিয়া ও ভাই যাইও না যমপাড়া॥ না যাইও যমের ঘর। আইজ হইতে ভাই আমার রাজরাজেশ্বর॥'

একই উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় বিরহী গ্রামের ভ্রাতৃদ্বিতীয়া মেলা। এই মেলায় আগত ভাইয়েদের ফোঁটা দেয় বোনেরা। এ মেলায় শতাধিক দোকান বসে। স্থানীয় দোকানদার ছাড়া নৈহাটী, কাঁচড়াপাড়া, মদনপুর, কল্যাণী, শিমুরালী, চাকদহ, রাণাঘাট প্রভৃতি স্থান থেকেও বিক্রেতারা আসেন মদনমোহন দেবের মন্দির প্রাঙ্গনে। এইখানেই এই মেলা বসে। যে-বোনেদের ভাই নেই তারা মদনমোহন বিগ্রহের কপালে ফোঁটা দিয়ে প্রার্থনা জানায় ভাইয়ের জন্য। মেলার বা আগত ভাইয়েদের ফোঁটা দেয় তারা মদনমোহনের ফোঁটার পরে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে আর একটি মেয়েলী মেলা, সখির মেলা। সখির মেলায় সই পাতানো হয়, ধর্মবাপ, ধর্মমা, ধর্মভাই প্রভৃতি সম্পর্ক পাতানো হয়। এই পাতান সম্পর্ক অনেক সময় গভীর আত্মীয়তায় রূপ নেয়। মেলা অনুষ্ঠান করে ছাড়া অন্যবিধ অনুষ্ঠান করেও এই সম্পর্ক পাতান যেতে পারে। পাতান সই ও পাতান আত্মীয়দের নানা নামে ডাকা হয়। যেমন—সইদের বলা হয় সাঙ্গাত, বন্ধু, মিত্র, মকর, গঙ্গাজল, সাগরজল, মহাপ্রসাদ, ফুল, তুলসী, আবির প্রভৃতি। মকর সংক্রান্তির স্নানের দিনের সই মকর, গঙ্গাস্নানান্তে যে সই, সে গঙ্গাজল। সেইরূপ মহাপ্রভুর আবির্ভাব দিবসে পাতান সই মহাপ্রসাদ, সখির মেলার স্নানের সই ফুল, পান, ইত্যাদি। এই ভাবেই দোলপূর্ণিমার সই আবির। ধর্মমা, ধর্মবাপ, ধর্মভাই, ধর্মবোনদের মা, বাপ, দাদা, বা ভাই, দিদি বা বোন ইত্যাদি পরিবারিক সম্বোধনেই ডাকা হয়ে থাকে। এই পাতান সম্পর্কের অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন জাতির লোকের সঙ্গে বিভিন্ন জাতির লোকের ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়। ফলে জাতিতে জাতিতে কোন্দল ও হানাহানির তীব্রতা কমে যায়। পাতান সম্পর্ক প্রায়শই নিজ পরিবারের লোকেদের সম্পর্কের মত গড়ে ওঠে। পাতানমা বা পাতানবাবা নিজ সন্তানকে জামা কাপড় ইত্যাদি দেওয়ার সময় তার ধর্মছেলে বা ধর্মমেয়েদেরও দিয়ে থাকে। ধর্ম ছেলে বা মেয়েরাও তাদের ধর্ম মা বা বাবাকে নিজ নিজ পিতা-

মাতার মতই আচরণ ও শ্রদ্ধা করে থাকে। উভয় পরিবারের পারিবারিক অনুষ্ঠানে থাকে উভয়ের অধিকার। ধর্মমা-বাপ মারা গেলে ধর্ম-ছেলে ও মেয়ে আপন ছেলেমেয়ের মতই অশৌচ পালন করে, শ্রাদ্ধকৃত্যাদি অনুষ্ঠান করে। ধর্ম ছেলেমেয়ে আর সৎ-ছেলেমেয়ে এক জিনিস নয়। পোষ্যপুত্র বা দত্তক ছেলেমেয়ের জন্য শাস্ত্রীয় বিধান আছে। প্রাচীনকালের নিয়োগ-সন্তানও শাস্ত্রসম্মত। অবশ্য শাস্ত্রসম্মত হওয়া সত্ত্বেও প্রাচীন নিয়োগপ্রথা উঠে গেছে। পাতানসম্পর্ক সম্বন্ধে যে আচার-অনুষ্ঠান তা লোকধর্মাশ্রিত, লোকাচার মিশ্রিত। সখির মেলায় এই লোকধর্ম ও লোকাচারের বিকাশ। সারা বাঙলায় অনুষ্ঠিত হয় সখির মেলা লোকসমাজের সুযোগ সুবিধা মত। সখির মেলার সঙ্গে কোন ধর্মীয় আচারের যোগ নেই। কেবলমাত্র পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনই এ মেলার উদ্দেশ্য। কুচবিহার জেলার দিনহাটার নগরভাংনীতে বারুণী স্নান উপলক্ষে সখির মেলা বসে প্রতি বৎসর। মেলাস্থানে প্রাচীন শিবমন্দির ও পুকুর আছে। দুই সখি শিবমন্দিরে একত্রে পূজা দিয়ে পুকুরে নামবে এবং সধবা হলে এক হাতে পান, সুপারী, বাতাসা, বেলপাতা, সিঁদুরাদির ডালাসহ পরস্পর পরস্পরের অন্য হাত ধরাধরি করে একসঙ্গে ডুব দেবে। বিধবা ও কুমারীদের ডালায় পান ও সিঁদুর থাকবে না। বাকী সব থাকতে আপত্তি নেই। স্নানান্তে হাতের জিনিস উভয়ে সমান ভাগ করে খেয়ে আজীবন সখিত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এ উৎসব মেয়েলী উৎসব। তথাপি কিছু কিছু পুরুষ একইভাবে বন্ধুত্ব স্থাপন করে থাকেন। যেমন অম্বুবাচী উৎসব মূলত মেয়েদের উৎসব হলেও কিছু কিছু ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ অম্বুবাচী পালন করেন। অম্বুবাচী উপলক্ষেও মেলা হয় সারা বাঙলায়। পশ্চিম দিনাজপুরের ইসলামপুর থানার রহমৎপুর গ্রামের ছেলেরা হাটের রাস্তার পাশে অস্থায়ী কাঁচা ঘর নির্মাণ করে। সে ঘরে কখনও রাখে মাটির মাতৃকামূর্তি কখনও রাখে না। যাতায়াতের পথে দড়ি নিয়ে ছেলেরা পথচারীদের পথ আটকায়। অবরোধের মারফত অর্থাদি আদায় করে। সংগৃহীত অর্থ দিয়ে বনভোজনের আয়োজন করে। নদীয়া জেলার কৃষ্ণপুরস্থ শিবনিবাসের অম্বুবাচী মেলায় ছেলেমেয়ে সকলেই যোগদান করে। অনেকেই এ মেলা থেকে নানাবিধ সামগ্রী কেনে। এই জেলার খাটুয়া গ্রামের অম্বুবাচী মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। এ জেলার কৃষ্ণগঞ্জের ভৈমী মেলাও উল্লেখযোগ্য। এখানে মিষ্টান্ন, তেলেভাজা, বাসনকোসন, মনিহারী দোকান, বইয়ের দোকান, ছবির দোকান, কাপড়-চোপড়, কৃষিসামগ্রী এবং নানাবিধ গ্রাম্যশিল্প সামগ্রীর আমদানী হয় তিন

দিনের কেনাবেচার জন্য। অম্বুবাচী মেলার মত আরও অনেক মেয়েদের মেলা ও অনুষ্ঠানাদি বাঙলায় আছে যেখানে ছেলেদের প্রবেশাধিকার আছে। অবশ্য শুধু মেয়েদের মেলাও আছে। মেয়েলী অনুষ্ঠানের মতই সে মেলার সর্বময় কর্তৃত্ব মেয়েদের হাতে। উদাহরণস্বরূপ কুচবিহারের হুদমাদেওর পূজোর নাম করা যেতে পারে। হুদমাদেও পূজোর জন্য নির্দিষ্ট কোন তারিখ নেই। বৈশাখ থেকে আষাঢ় মাসের মধ্যে যে কোনদিন এ অনুষ্ঠান হতে পারে। রাত্রে, ঝোপ-জঙ্গলে এ পূজো অনুষ্ঠিত হয়। কখন বা কোথায় এ অনুষ্ঠান হবে তা অনুষ্ঠানে অংশ-গ্রহণকারীরা ছাড়া আর কেউই জানতে পারে না। বৈশাখ মাস পড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রাজবংশী গ্রামের নিম্নশ্রেণীর- মেয়েরা কানাকানি করে মেয়েমহলে অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ জানিয়ে দেয়। তারা চাঁদাও সংগ্রহ করে। হুদমা দেবতার প্রতীক হিসাবে কলা পূজো দেওয়া হয়। পুরুষাঙ্গের প্রতীক এই কলা। এ অনুষ্ঠানে পুরুষদের প্রবেশাধিকার নেই। তারা জানতেও পারে না কোথায় অনুষ্ঠান হবে। অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে মেলা তারও উদ্যোক্তা মহিলাবৃন্দ। এ মেলায় পুরুষাঙ্গের বিভিন্ন প্রতীক, পুরুষদের পোষাক-পরিচ্ছদ, মিষ্টি সামগ্রী প্রভৃতি কিনতে পাওয়া যায়। দোকানদার বা বিক্রেতাদের মধ্যেও আছে মেয়েদের স্থান। সন্ধ্যার পরই মেয়েরা অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য যে যার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। পূর্বে থেকে অনুষ্ঠানের স্থান গোপনে জানিয়ে দেওয়া হয় সকলকে। অনুষ্ঠানের যাবার পথে যাতে কোন পুরুষ তাদের অনুসরণ করতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে একে একে মেয়েরা অনুষ্ঠান প্রাঙ্গনে এসে হাজির হয়। কলাগাছ বা শালগাছ জাতীয় লম্বা কোন বৃক্ষের তলায় হয় এ অনুষ্ঠান। প্রথমে তারা হুদমা দেবতার প্রতীক কলা পূজা করে। তারপর সুরু হয় নাচ ও গান। এই নাচ ও গান কামভাবনাচিন্তা-উদ্ভূত। প্রবল আবেগে নাচতে নাচতে ও গাইতে গাইতে অনেকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এ নাচ ও গানের সময় তারা জন্মদিনের পোষাকেই থাকে। অনেকে উত্তেজনা বশে কলাগাছ জড়িয়ে ধরে। কলাগাছকে আলিঙ্গনের পর আলিঙ্গন করে এবং সে আলিঙ্গন ইত্যাদি বিপরীত দিকের উত্তাপ পেতে প্রায়শই মহিলারা মহিলাদের নিয়ে বা সমলিঙ্গালিঙ্গনে মত্ত হয়ে পড়ে। স্বামী-স্ত্রীর অভিনয়ী নাচ, গান চলে সারা রাত্রি ধরে। বলাবাহুল্য, উচ্চশ্রেণীর মহিলারা বর্তমানে এ অনুষ্ঠানে যোগদান না করলেও নিম্নশ্রেণীর মহিলাদের কাছে এ অনুষ্ঠানের উন্মাদনা এখনও কমে নি। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে বর্ষা আহ্বানের যে

হুদমা-নৃত্যানুষ্ঠানের কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে তার সাদৃশ্য থাকলেও এ দুটো আলাদা অনুষ্ঠান। এ প্রসঙ্গে অনুরূপ কামোদ্দীপক একটি পুরুষালী অনুষ্ঠানেরও উল্লেখ করা যেতে পারে। এই অনুষ্ঠান মদনকাম বা চাঁদখেলা উৎসব। এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় কুচবিহার জেলার নানা স্থানে চৈত্র মাসের শুক্লাচতুর্দশী দিবসে। পূজার পূর্বদিনে আখি ত্রয়োদশী তিথিতে একটি লম্বা বড় বাঁশ পুঁতে তার মাথায় চামর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। অনেক জায়গায় দ্বাদশীর দিনে বাঁশ পোতা হয় এবং ঐদিন থেকেই সুরু হয় উৎসব। চামরের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয় এক জোড়া সুপারী ও পান এবং একখানা ছোট আয়না। বাঁশটিকে রঙবেরঙের কাপড় দিয়ে আবৃত করা হয়। তিনদিন ধরে পূজানুষ্ঠান চলে। প্রথমদিন অনুষ্ঠানের পর আতপ চাউলের গুঁড়োর সঙ্গে দুধ ও গুড় মিশিয়ে লাড়ু তৈরী করে ভোগ দেওয়া হয়। পূজোয় অনেকে মানত দেন। প্রধানত একজোড়া পায়রা মানত দেওয়া হয়। মানত দেওয়া পায়রা বলি দেওয়া হয় না, ছেড়ে দেওয়া হয়। ছাড়া পেয়ে পায়রা উড়ে যায়। অনেকে চাল, কলা, দুধ, মিষ্টি প্রভৃতি সামগ্রী মানত করে। মানতের প্রধান উদ্দেশ্য সন্তান। অনেক কন্যার জননী মানত করে ছেলের জন্য। এই পূজো উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলার স্থানের কথা অনুষ্ঠানকারীরা পূর্বাহ্ণেই ঢোল বাজিয়ে জানিয়ে দেয়। এই অনুষ্ঠান বা মেলায় স্ত্রীলোকদের প্রবেশাধিকার থাকে না। মেলায় যোগদান করার জন্য লম্বা লম্বা বড় বাঁশ নিয়ে যুবকেরা সন্ধ্যা হতে না হতে মেলা প্রাঙ্গনে এসে উপস্থিত হয়। নানাবিধ অঙ্গভঙ্গি, নাচ ও গান গায় তারা। নাচ ও গানের সমস্ত কিছুই দেহতত্ত্ব বিষয়ক। মেলায় মাটির তৈরি স্ত্রীলিঙ্গ, বক্ষবন্ধ, শাড়ী, ব্লাউজ প্রভৃতিও বিক্রী হয় অন্যান্য সামগ্রীর সঙ্গে। অনুষ্ঠান-কারী ছেলেরা মেলা থেকে এইসব জিনিষ কিনে নেয় মেয়ে সাজতে। কবচের মত করে মাটির বা কাঠের স্ত্রীলিঙ্গ নিজ লিঙ্গের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেয়, তারপর চলে নাচ ও গান। মেলায় দেশী মদ প্রভৃতিও পাওয়া যায়। বোধহয় পুরুষদের এবম্বিধ আচরণের প্রতিবাদস্বরূপই মেয়েদের হুদমা উৎসব। উভয় উৎসবের লক্ষ্য যৌনবিষয়ক শিক্ষা। হাতে কলমে যৌনশিক্ষা দেবার জন্যই আছে নানা অঙ্গভঙ্গি। কদলী বা শাল বৃক্ষ এবং নারী ও পুরুষবেশী মেয়ে-মেয়ে ছেলে-ছেলে আলিঙ্গন। কামশাস্ত্র অপেক্ষা লৌকিক জ্ঞান লোকসমাজকে বেশী প্রভাবান্বিত করে।

স্মরণীয়, প্রেমিক-প্রেমিকা মিলনের বিভিন্ন স্তর আছে। যথা তাদের সোহাগ, প্রণয়-বচন ইত্যাদি। যখন তারা দৈহিক মিলনের জন্য উন্মুখ

হয়ে ওঠে তখন নায়কের 'প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর'। নায়ক-নায়িকার এই আলিঙ্গন-কালে প্রতি অঙ্গের সঙ্গে প্রতি অঙ্গের স্পর্শে উভয়ের আনন্দ বৃদ্ধি হয়। দাম্পত্য জীবনকে মধুময় ও আনন্দদায়ক করে তোলার জন্য আলিঙ্গনাদির মধ্যেও বৈচিত্র্য প্রয়োজন। হুদমাদেও আদি পূজা ও মেলা উৎসবের আলিঙ্গনাদির মধ্যে একটি আর্ট ও বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে। প্রবীণ-প্রবীণা নবীন-নবীনাদের সুশিক্ষিত করে তোলে সুখী গৃহকোণ স্থাপন করতে। কামশাস্ত্রানুযায়ী আলিঙ্গন দুই প্রকার। আলিঙ্গনাভিজ্ঞ এবং আলিঙ্গনে অনভিজ্ঞ। অনভিজ্ঞা স্পৃষ্টক বা মৃদুস্পর্শ, বিদ্ধক, উদ্ঘৃষ্টক ও পীড়িতকালিঙ্গন করবেন এবং অভিজ্ঞা লতাবেষ্টিক, বৃক্ষাধিরূঢ়ক, তিলতণ্ডুলক ক্ষীরণকালিঙ্গন করবেন। সংবাহনকে অনেকেই আলিঙ্গনের মধ্যে ধরেন না। তাঁরা বলেন সংবাহন আলিঙ্গন হলে চুম্বনও আলিঙ্গন। কামশাস্ত্রে আলিঙ্গনাদিবিধির উল্লেখ আছে বটে কিন্তু তা নিরক্ষর জনতার জানার কথা নয়। তারা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকেই কাজে লাগায়। এবং সে অভিজ্ঞতা সঞ্চারের পূর্বে অভিজ্ঞব্যক্তিদের নিকট থেকে যৌনজ্ঞান লাভ করে হুদমাদেও ও মদনকাম বা বাঁশখেলা জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠানে। তাই এইসব উৎসব ও মেলাদিকে যৌনশিক্ষা বিষয়ক উৎসব বা মেলা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। আলিঙ্গনের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা চুম্বনকেও স্মরণ করি। 'অধর চুমিতে যতদিন আর, চক্ষু দেখিবে যতকাল। কীর্তি তোমার অক্ষয় রবে, মুছিবে না মহাকাল।' ললাট, অলক, কপোল, নয়ন, বক্ষ, ওষ্ঠ প্রভৃতি চুম্বনের স্থান। চুম্বনের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে মুখ-চুম্বনই মুখ্য। মুখ-চুম্বনকে নিমিতক, স্ফুরিতক ও ঘট্টিতক এই তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। পূর্বরাগের প্রথম পর্বে নিমিতক, কামনা এবং লজ্জার দোটানার চুম্বনে মৃদু কম্পিত অধর স্ফুরিতক এবং পরবর্তী ধাপ ঘট্টিতক। আরও নানাপ্রকার চুম্বন আছে। যেমন সম, বক্র, উদ্ভ্রান্ত, অবপীড়িতক, শুদ্ধাবপীড়িতক, গ্রহণ, আকৃষ্ট, হস্তাঙ্গুলী, অভিযোগিক প্রভৃতি। তাছাড়াও আছে প্রীতি চুম্বন। আছে স্নেহচুম্বন। স্নেহচুম্বন দিতে গিয়ে বা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চুম্বন দেবার সময় আদর করে বলা হয় 'এত বলি সোনা মুখে মাতা দেয় চুম্। বিরলে শোয়ায়ে বলে বাছা যাও ঘুম॥' ক্রৌঞ্চ মিথুন দেখে যেমন আদি কবির কাব্যের প্রেরণা, তেমনি পাখিদের মুখ ঠোকরা-ঠুকরি, ঠোঁটে ঠোঁট লাগান (কাকলি করা) এবং কুকুরের মুখ কামড়াকামড়ি (ন্যাকৃরা করা) আচরণাদি মানুষকে চুম্বনে

হাতে খড়ি দিয়েছে বলে প্রাণীবিদ্যা বিশারদদের অনেকে মনে করেন। আমরা সকলেই জানি যে চুম্বন শব্দটি এসেছে তৎসম চুম্ব্‌+অ থেকে। জনৈক ইউরোপীয় দেহতত্ত্ববিদ পণ্ডিত সর্বপ্রথম চুম্বনের ব্যাপারটি লক্ষ্য করেন; পরে তিনি নিজে আচরণটি পরীক্ষা করে দেখে যে আনন্দ পান তার বিবরণ ঘনিষ্ঠ মহলে প্রচার করেন। তারপর থেকেই ব্যাপারটি দ্রুত জানাজানি হয়ে যায়। ক্রমে তাঁরা প্রথাটির নামাকরণ করেন। ব্যাপারটি যখন আবিষ্কৃত হল তখনই চুম্বন, kiss, cyssan, kissen, kys প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি হয় নি। সভ্যতা ও শিক্ষার ক্রমাগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এইসব সুঠাম শব্দের সৃষ্টি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই রীতিটির অর্থ ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রচেষ্টা হয়। এ প্রচেষ্টার সুরু এদেশে নয়। কারণ এদেশে আর্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত চুম্বনের ব্যবহারিক প্রয়োগ ছিল এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। এখানে দেহবিজ্ঞানীরা যে অর্থে চুম্বনকে গ্রহণ করেছেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে: (১) An affectionate salutation by contact of the lips, (২) A gentle touch, (৩) Treat with fondness ইত্যাদি। বাৎস্যায়ণ চুম্বনের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে মুকুলীকৃত মুখের সংযোজনকে চুম্বন বলেছেন। প্রায় একই সঙ্গে kiss বা চুম্বনের কতকগুলো সমার্থক শব্দ রচিত হয়। চুম্ব, চুম্, চুমা, চুম্, আদর, caress, carezza, coddle, embrace, flatter, fondle, pet, pamper ইত্যাদি। এখানেই শেষ নয়, এগুলো আবার নানা অর্থে বিভক্ত। উপরের প্রত্যেকটি শব্দ এক একটি বিশেষ অর্থবহ, যেমন—To caress is less than to embrace; Fondling is always by touch; Caressing may be also by words ইত্যাদি। এখানে জনৈক চুম্বন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির অভিমত উত্থাপন করা যেতে পারে। তাঁর মতে—"Kissing is a culture trait characterestic of European people and their racial ancestors. the Teutons, the Greco-Romans, and the Semites, but unknown to the Celts."…বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা আরও মনে করেন যে অশিক্ষিত, অসংস্কৃত এবং অর্ধশিক্ষিত, অর্ধসংস্কৃত সমাজে চুম্বনের রেওয়াজ ছিল না, আদিম সমাজেও নয়। শিক্ষিত ও সংস্কৃত সমাজের উৎসাহী ব্যক্তিরাই এ প্রথার প্রবর্তক। এবং তাদের কাছ থেকেই এ প্রথাটি লোকসমাজে চলে আসে। বলাবাহুল্য, শিক্ষিত সমাজও নাকি ইতর প্রাণী ও জন্তুদের কাছ থেকে প্রথাটি শিখে নেয়।

সুপ্রাচীন সভ্যদেশ মিশরে চুম্বন প্রথা চালু ছিল এমন কোন প্রমাণ বিশেষজ্ঞেরাও উত্থাপন করতে পারেন নি। ভারতবর্ষের লোকেরা আদিযুগে অর্থাৎ আর্য অধিকৃত হবার পূর্বে পর্যন্ত চুম্বনের প্রতি আসক্ত ছিলেন বলে কোন প্রমাণ আমাদের জানা নেই।

চুম্বনকে এখন অনেকে প্রেমের ব্যায়াম বলে মনে করেন। প্রাচ্যের, বিশেষত ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, চীন ও জাপানের অধিবাসীরা পাশ্চাত্ত্য দম্পতি এবং যুবক-যুবতীদের সর্বজন সমক্ষে সমষ্টি চুম্বনের রীতিতে রীতিমত লজ্জা পায়। অনেক আদিম অধিবাসীদের মধ্যে অপরিচিত কোন ব্যক্তিকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবার পূর্বে গৃহকর্ত্রীর স্তন চুম্বনের প্রথা প্রচলিত আছে। এ প্রথার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, শিশু যেমন স্তন্যপায়ী, অসহায় এবং কারুর কোন অনিষ্টের কথা ভাবতে পারে না, তেমনি অপরিচিত ব্যক্তিটি জননী-স্তন চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে সন্তানরূপে গণ্য হয়। সে শিশুর মত নির্মল মন নিয়ে সমাজে বিচরণ করে, কোন অন্যায় বা দুষ্ট কাজের কথা তার মনে উদিত হয় না। এটা আদিম সমাজের অলিখিত আইন। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রাগ্রসরতার দরুণ বঙ্গ জনজীবনে চুম্বন সম্পর্কে নানাবিধ উচ্ছৃঙ্খলতা অনুপ্রবেশ করেছে। গত শতকের মধ্যভাগে পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসাদি নিজ ভাষায় অনুবাদ করতে গিয়ে চীনা পণ্ডিতগণ সর্বপ্রথম পাশ্চাত্ত্যের চুম্বনের কায়দা নিজ দেশে আমদানী করেন। ভারতবর্ষেও তা-ই হয়েছে। দেশজ আচার-আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের রীতি-নীতি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। ক্রমে ফ্রয়েড ও বিভিন্ন কামশাস্ত্রবিদ পণ্ডিত এবং দেহতত্ত্ববিদদের প্রচেষ্টায় চুম্বন প্রথা সহজ ও সরল রূপে মানব সমাজে প্রসারিত হয়েছে।

সুপ্রাচীন বাঙলার সমাজ ছিল গোষ্ঠী সচেতন। সর্বদাই গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে কলহ, মারামারি লেগে থাকত। গোষ্ঠীর নেতার খেয়াল খুশীমত তখন সমাজ চলত। ব্যক্তিগত ধ্যান ধারণা অনুযায়ী সে যুগের লোক আমোদ-আহ্লাদাদিতে মেতে থাকত। কাজে কাজেই প্রাচীন বঙ্গ সমাজে কি ধরণের চুম্বনরীতি প্রচলিত ছিল, কি ছিল না, তা জানার উপায় নেই। অবশ্য তা জানা না গেলেও বাঙলার শিল্পকলা, ভাস্কর্য, পোড়ামাটির ফলকাদি দেখে এতৎসম্পর্কে কিছু ধারণা করা যেতে পারে। শিল্পকলা ও ভাস্কর্য যে যুগের, সে যুগের বাঙলা ছিল সুসমৃদ্ধ, শিক্ষিত। সুতরাং তখন চুম্বন বা অন্যান্য রীতিনীতি সম্পর্কে ভাবনার অবকাশ ছিল।

নানাদেশে নানাভাবে চুম্বনের প্রকাশ ঘটেছে। আরবীয়েরা ক্রুদ্ধ হলে হস্ত চুম্বনান্তে ক্রোধ প্রকাশ করেন; তুর্কীরা বৃষ্টির জন্য স্বহস্তে চুম্বন দেন ও পরে চুম্বনাহত হস্ত মাথার উপর উপুড় করে রেখে বর্ষার আহ্বান করেন। বাঙালীরা দক্ষিণ হস্তের তালু চুলকালে তালুতে চুম্বন দেন, তাতে নাকি অর্থপ্রাপ্তি হয়। মরক্কোতে সমমানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ হস্ত চুম্বন করেন, পারস্য দেশে সমমর্যাদাধর্মী ব্যক্তি মুখ-চুম্বনের অধিকারী, নিম্ন বা উচ্চ স্তরের লোকেরা হাতের কব্জি বা গালে চুম্বন করতে পারেন। ইউরোপে হস্ত চুম্বনের মারফত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী উপরওয়ালার স্বীকৃতি পান, রাণীর বা রাজার হস্ত চুম্বনে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী বিশেষ মর্যাদা লাভ করেন। লণ্ডনে কোন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করবার সময় বাইবেল বা অনুরূপ ধর্মগ্রন্থ চুম্বনের প্রথা প্রচলিত আছে। এবম্বিধ নানা রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ভাবে দেখা যায় বলে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিমত। ইউরোপে Kiss in the ring নামে একটি প্রাচীন খেলার প্রচলন আছে। এ খেলায় সারি দিয়ে ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়ে যায়, এবং পর পর একে অপরকে চুম্বন দেয়। এ চুম্বনকে সমষ্টি চুম্বন বলা যেতে পারে। এইরূপ আর একটি সমষ্টি-চুম্বন kiss of peace। প্রাচীন আরবীয় ও গ্রীক সমাজে সমষ্টি চুম্বন প্রথাবদ্ধ ছিল যা আমরা হেরডোটাসের বিবরণ থেকে জানতে পারি।

হোমারের মহাকাব্যে (Ullysses) ওডিসিয়াস দীর্ঘ দশ বৎসর পর্যটনান্তে দেশে ফিরলে দেশবাসী বন্ধু ও স্বজনবৃন্দ তার হাত, মাথা, কাঁধ, মুখ, গলা প্রভৃতি চুম্বনান্তে সম্বর্ধনা জানিয়েছিল। ইসাকের জ্যেষ্ঠ পুত্র এসো জ্যাকবের ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে তাঁর গাল, কাঁধ ও মুখ চুম্বন করে। জ্যাকব ছিলেন হিব্রু গোষ্ঠীপতি এবং ইসাকের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি ইসরাইলের বারোটি উপজাতি গোষ্ঠীরও প্রতিষ্ঠাতা। জ্যাকব ও এসোর চুম্বন থেকে যে তথ্যটি বেরিয়ে আসে তা হল তৎকালীন ইসরাইলে নিকটাত্মীয়দের মধ্যে চুম্বন প্রথাসিদ্ধ ছিল। ভাইয়ে ভাইয়ে বা অনুরূপ সম্পর্কিত ব্যক্তিদের মধ্যে চুম্বনের রীতি ভারতীয়দের মধ্যে প্রচলিত না থাকলেও ছোট ভাইবোন বা বাচ্চা ছেলেমেয়েকে চুম্বন ভারতীয় সমাজ স্বীকৃত। যদিও কামশাস্ত্রবিদ পণ্ডিতগণ এই নির্দোষ সামাজিক প্রথার মধ্যেও জৈবিক তৃপ্তির অঙ্কুর দেখতে পান। তাঁদের সে ফতোয়ায় সমাজ বিচলিত নয়। অবশ্য ছায়াছবির চুম্বন তারা বরদাস্ত করে না।

বাঙলার লোকবৃত্তে লোকমানসের অভিব্যক্তি দেখি—'এই গালে দিনু চুমু, দেরে ঐ গাল। ঘুমে ঘোর খোকা মোর, চুমোর মাতাল।' অথবা 'চাঁদ মুখে চুমো, খোকা ঘুমো ঘুমো।' লোকবৃত্ত ব্যতিরেকে সামাজিক বিভিন্ন আচার আচরণাদিতেও চুম্বন নানাভাবে এসেছে। নিম্নে বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরীর "আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ পদ্ধতি" গ্রন্থ থেকে একটি চুম্বনাচারের উল্লেখ করা গেল। আচরণটি অসমীয়াদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

"নিম্ন আসামের উত্তর গৌহাটী হইতে নওগাঁও অঞ্চল পর্যন্ত স্থানবিশেষে কোনও কোনও কলিতা (ইহারা 'বড় কলিতা', 'বেজ কলিতা', 'কঁহার কলিতা', 'সোনারী কলিতা', 'পানি কলিতা', 'নই কলিতা'-আদি বহু শ্রেণীতে বিভক্ত), কেউট ও কোঁচ পরিবারে এরূপ প্রথা আছে যে যদি কোনও কন্যার ২২।২৩ বৎসর বয়সে বিবাহ হয় এবং তাহার কনিষ্ঠ সহোদরার বয়স ২০।২১ বৎসর হইয়া থাকে তাহা হইলে ঐ কনিষ্ঠা ভগিনীকে সমাগতমণ্ডলীর সমক্ষে বরকে চুম্বন করিতে হয়। পাত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনা চুম্বন না করিলে পাত্রপক্ষ হইতে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় না। দেশীয় প্রথা অনুসারে স্ত্রীলোকেরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বরকে চুম্বন করাইয়া লন। যদি কোনও বয়স্থা কন্যা লজ্জাবশতঃ তাহা করিতে অনিচ্ছুক হন তাহা হইলে পাত্রী পক্ষের অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা তাহাকে মিঠেকড়া কথায় তাহা করাইতে বাধ্য করান।" অবশ্য "অধিকাংশ স্থলেই বরকে চুম্বনের জন্য কাহাকেও জোর করিতে হয় না। যদি কন্যার কনিষ্ঠা ভগিনী না থাকে তাহা হইলে কোনও বয়স্থা রমণী বরকে চুম্বন করিয়া গৃহে লইয়া যান।"

কোনও স্থানে যাত্রা করার সময় সন্তান মাকে নমস্কার করলে মা সন্তানের মস্তক চুম্বনান্তে আশীর্বাদ করেন। কোথাও আবার হস্ত চুম্বনের সাহায্যেও সন্তানের কল্যাণ কামনা করা হয়। এ প্রথা রোমান-গ্রীক যুগ থেকে অদ্যাবধি চলে আসছে যার রেশ বাঙলাদেশেও বর্তমান।

প্রাচীন ধর্ম-যাজকেরা খ্রীষ্টানদের ফতোয়া দিয়েছিলেন—চুম্বনের সাহায্যে পরস্পরকে অভিনন্দন জানাতে। এ থেকেই "Kiss of love"-এর উৎপত্তি। সেন্ট কীপরিয়ান জানিয়েছেন যে ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টানদের প্রকাশ্যে সমষ্টি চুম্বনের মারফত সমাজে গ্রহণ করা হত। ক্যাথলিক ধর্মানুষ্ঠানে বিশপ নব নিযুক্ত ধর্মযাজককে চুম্বনের দ্বারা গ্রহণ করেন। মহামান্য পোপের পদ চুম্বন খৃষ্টান ধর্মের একটি অঙ্গ। দীক্ষাগুরু, পূজনীয় ব্যক্তি বা যাজকদের পদাঙ্গুলীচুম্বন ভক্তি ও নম্রতার বিষয়। স্নেহাস্পদদের

ঠোঁট ও থুতনিতে আঙুল ঠেকিয়ে আঙুল চুম্বনে প্রীতির প্রকাশ।

'গুড ফ্রাইডে'তে খ্রীষ্টের ক্ষতস্থান চুম্বনের রেওয়াজ সমগ্র খ্রীষ্টান জগতে সমান জনপ্রিয়। প্রাচীন গ্রীক ও রোমানরা নিজ নিজ গৃহ দেবতাকে দিনান্তে চুম্বন করতেন সুখ ও সমৃদ্ধির জন্যে। আরবীয়েরা কোন কাজে যাবার সময় ঘর থেকে বের হবার পূর্বে ও ফিরে এসেই গৃহদেবতাকে চুম্বন করতেন। গ্রীসের ডিমেটারের অধিবাসীবৃন্দ যে কোন পবিত্র দ্রব্য চুম্বনের মারফত গ্রহণ করতেন। এ ছাড়া অন্যান্য ধর্মীয় চুম্বন এবং মৃত ব্যক্তির আত্মাকে স্পর্শ করার বিশ্বাস নিয়ে শবদেহ চুম্বনেরও রেওয়াজ প্রচলিত আছে। মৃতের আত্মা স্বর্গে চলে যাবার পূর্বেই শবদেহ মারফত তাকে চুম্বন করলে সে আত্মা নাকি ভূত-প্রেত হতে পারে না।

গণ্ডোপরি চুম্বনের রীতি ফরাসী দেশে খুব চালু। রাজা প্রথম এডওয়ার্ড ইংলণ্ডের ইস্টার উৎসবে গণ চুম্বন প্রবর্তন করেন। ঐ চুম্বনকে বলা হত "Heaving"। ইউরোপের সর্বত্র এই সামাজিক চুম্বন নিয়ে নানাবিধ আলাপ আলোচনা হয়েছে। বহু রূপকথা আছে যেখানে বলা হয়েছে যে চুম্বন স্মৃতিশক্তিকে দুর্বল করে চুম্বিতকে অন্য জগতে নিয়ে যেতে পারে। "There are stories of resuscitation by a kiss (E65) transformation by a kiss (D565·5), of lover given rump to kiss (K1225), and tales of witches kissing the Devil's tail (G243. 1. 1.), the latter being euphemistically vague about an act of complete and perverted submission during the Sabbath. A kiss can also bring forgetfulness (D2004·2)."

'The Adventures of the Son of Eochu Muigmedon' গ্রন্থে আছে আয়ার্লাণ্ডের রাজার পাঁচটি পুত্র ছিল। একদিন পাঁচ ভাই শিকারে গেল গভীর বনে। রাত্রে খাবার সময় তাদের পানীয় জলের প্রয়োজন হয়। জ্যেষ্ঠভ্রাতা ফারগুস জলের খোঁজে বের হয়। সে নিকটেই একটি কূপ দেখতে পায়, কিন্তু সেই কূপটিকে কদাকার ও বীভৎস একটি বৃদ্ধা পাহারা দিচ্ছে। বৃদ্ধা জানালে, আগে তাকে চুম্বন করতে হবে তারপর জল নিতে দেওয়া হবে। কিন্তু ফারগুস ঐ বৃদ্ধাকে চুম্বনে অস্বীকৃতি জানায়। একে একে অপর তিন ভাই জল আনতে ঐ কূপের কাছে আসে। কিন্তু কেউই ঐ কিম্ভূতকিমাকার বৃদ্ধাকে চুম্বনে রাজী হয় না। ফলে জলও পায় না। তখন ছোট ভ্রাতা নিয়ল বৃদ্ধাকে

শুধুমাত্র চুম্বনই নয়, বৃদ্ধার সর্ববিধ আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটাতে দ্বিধা করল না। চুম্বনের পরই বৃদ্ধাটি একটি অত্যন্ত সুন্দরী ও ফর্সা তন্বঙ্গীতে রূপান্তরিত হল। তখন নিয়ল বললে, তুমি কি সুন্দরী। বৃদ্ধা বললে— Yes, I am the Sovereignty of Ireland. বৃদ্ধা নিয়লকে জল নিতে দিল এবং বললে যে, নিয়লের বংশধরেরাই আয়ার্লাণ্ডের রাজা হবে। বৃদ্ধার কথা বর্ণে বর্ণে সত্যে পরিণত হল। "The motif of the loathly bridegroom (D 733) is associated with the unpromising hero who wins the princes. and with the whole Beauty and the Beast Cycle." লোকবৃত্তের অভিধানে এ ধরণের নানা উদাহরণ আছে। যদিও দেহতাত্ত্বিকদের মত মেনে চললে অনেক চুম্বন এড়িয়ে চলা উচিত। তাঁরা শিশু চুম্বনের ক্ষেত্রেও এ উপদেশ দিয়ে থাকেন। কারণ জন্মলগ্নে অধর সব মালিন্যমুক্ত থাকে। জন্মের ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে উৎপন্ন হয় কোক্কি। দাঁত ওঠার সময় কোক্কি বেড়ে যায়। দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে চলে ওদের বংশবৃদ্ধি। তাই দরকার নিয়মিত দন্ত মার্জন ওদের হাত থেকে উদ্ধার পেতে। একের মুখের কোক্কি বিশেষত স্টেপ্‌থো কোক্কি যাতে চুম্বনের মারফত অন্যের মুখে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য বিশেষ সাবধানে থাকা দরকার। আলিঙ্গন এবং চুম্বনের সঙ্গে বিবাহের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। বিবাহ-ব্যবস্থা রীতিসিদ্ধ হলে আলিঙ্গন-চুম্বনাদি সম্পর্কেও নানাবিধ রীতিনীতির আমদানী হয়।

বিবাহ ব্যবস্থা চালু হবার পূর্বে মহিলাগণ অনাবৃত ছিলেন। ইচ্ছামত গমন ও বিহার করতে পারতেন। কৌমারাবধি এক পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে আসক্ত হলেও নারী ধর্মচ্যুতা হতেন না। কিন্তু একদা মহর্ষি উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতু ও স্ত্রী-সহ বসে আছেন, এমন সময় জনৈক ব্রাহ্মণ এসে ঋষিপত্নীর হাত ধরে বললেন—'এস আমরা যাই'। ঋষিপুত্র পিতার সমক্ষে মাতাকে এভাবে নিয়ে যাওয়াটাকে মোটেই পছন্দ করলেন না। উদ্দালক পুত্রকে তদবস্থ দেখে বললেন—'বৎস ক্রোধ করো না, এটা নিত্যধর্ম, গাভীগণের ন্যায় স্ত্রীগণ স্বজাতীয় শত সহস্র পুরুষে আসক্ত হলেও তাঁরা ধর্মচ্যুতা হন না।' ঋষিপুত্র পিতার বাক্যে সন্তুষ্ট না হয়ে বিবাহের নিয়ম কানুন বেঁধে দিলেন। আদান-প্রদানের মাধ্যমে এই রীতিই বাঙলার সংস্কৃত, প্রাকৃত, লোক ও ভদ্র-ইতর সমাজে প্রচলিত। হিন্দু বিবাহ সাধারণ মানব জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃত্য যার কিছু অনুষ্ঠান শাস্ত্রীয়, কিছু লৌকিক। বাঙলার প্রায় সর্বত্রই হিন্দু বিবাহের শাস্ত্রীয়

অংশের মোটামুটি মিল আছে কিন্তু লৌকিক অংশে বা স্ত্রীআচারে নানারূপ পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। ধর্মশাস্ত্রে আট প্রকার বিবাহ নির্দিষ্ট আছে যথা ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। ব্রাহ্ম,দৈব, আর্য ও প্রাজাপত্য ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত। এই চার প্রকার এবং আসুর ও গান্ধর্ব বিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ত। বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে কেবল আসুর বিবাহই বিহিত। অষ্ট প্রকার বিবাহে স্বয়ংবর বিবাহের উল্লেখ নেই। বর্তমানে এই স্বয়ংবর বিবাহের আধুনিকই সংস্করণ রেজেষ্ট্রী বা কালীঘাট বিবাহও সমাজে স্বীকৃত। হিন্দুর পত্নী ধর্মপত্নী, অর্ধাঙ্গী। অর্ধাঙ্গী পেতে গিয়ে, খেলায়, গুরুকার্য সাধনে ও প্রাণরক্ষার্থে মিথ্যা বলায় পাপ হয় না। বিবাহে ধর্মসাক্ষী করে পতি-পত্নী উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। দিনের বেলা বিবাহ-সংস্কার শাস্ত্র-সঙ্গত। পূর্বে তাই হত। বর্তমানে বিবাহ হয় শুভদিনে শুভলগ্নে ও সূর্যগতে। লোকধারণানুযায়ী ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ ও চৈত্র এবং জন্মমাসে বিবাহ নিষিদ্ধ। সগোত্র বিবাহ সম্বন্ধেও নানা শ্রেণীর বাধা আছে। বিবাহান্তে পত্নী অবশ্য ভরণীয়া বলে ভার্যা, আত্মা ভার্যার উদরে জন্ম গ্রহণ করে বলে তিনি জায়া, পতি ভার্যার গর্ভে প্রবেশ করে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন তাই জায়ার জায়াত্ব। তিনি ভর্তৃদুঃখে দুঃখিতা তাই বাসিতা, তিনি আদরের পাত্র তাই দারা, তিনি জঠরে ধারণ করেন বলে ধাত্রী, জন্মের কারণ বলে জননী, অন্নাদি পরিবেশন করেন বলে অম্বা এবং প্রসব করেন বলে বীরসূ। স্বামী স্ত্রীকে ভরণপোষণ ও প্রতিপালন করেন বলে ভর্তা ও পতি, স্ত্রী পুত্র প্রদান করেন বলে তিনি বরদ।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে বিবাহে সধবা রমণীরা বিশেষ করে যাঁদের প্রথম সন্তান জীবিত, সেই জিয়ন-পোয়াতীরা মুখ্য অংশ গ্রহণ করেন। অনেক ক্ষেত্রে বিধবাদের উপস্থিতি পর্যন্ত নিষিদ্ধ। প্রতি অনুষ্ঠানে সধবাদের উলুধ্বনি বা জোকার এবং শঙ্খধ্বনি বিশেষ প্রশস্ত। বিয়ের গানও বহুল প্রচলিত। একটি গান—'নাই বিশ্বে এমন মিলন বিয়ের মিলন সম। প্রিয়তমে প্রিয়তমা প্রিয়তম মম॥ নাই বিশ্বে এমন বাড়ী বিয়েবাড়ীর সম। প্রিয়তমে প্রিয়তমা প্রিয়তম মম॥ নাই বিশ্বে এমন ঘর বাসরঘরের সম। প্রিয়তমে প্রিয়তমা প্রিয়তম মম॥ নাই বিশ্বে এমন রঙ্গ বিয়ের রঙ্গ সম। প্রিয়তমে প্রিয়তমা প্রিয়তম মম॥' অনেকে মিলে সমবেত কণ্ঠে বিয়ের গান করেন। পাখির গান, বনের মর্মর, নদীর কলতানের মত সহজাত উৎসারিত এ সঙ্গীত। এ সঙ্গীতে কোন পরিকর্ষণ নেই, কোন পরিমার্জনা নেই, কোন পরিকল্পনা নেই;

আছে শুধু ঘটনা-তাড়নায় মেয়েলী মনের স্মৃতি-আশা-হতাশা। আছে মেয়েলী মনের বৈশিষ্ট্য, সমাজে মেয়েদের অবস্থার এবং আঞ্চলিক ভাষার নির্ভরযোগ্য নিদর্শন। আছে স্বামীগৃহে একাত্ম হয়ে যাবার পরেও বাপের বাড়ীর দিকে টান। দুঃখ হতাশায় মা বাপ ভাই বোনেদের কথাই প্রথম মনে পড়ে নববধূর। আছে অলংকার, প্রসাধন, সিঁদুর, শাড়ীর উল্লেখ, সামাজিক অবস্থার বৈচিত্র্যপূর্ণ ছবি, যৌতুক, কৌতুক, পাড়াপড়শী, আত্মীয়স্বজনাদির কথা। কিন্তু নারীমনের বিস্তারিত ভাবধারা প্রতিফলিত হয় না। বিবাহের গান আন্তর-অনুভূতিতে সংরক্ত। প্রাচীন যুগে গানের সঙ্গে মেয়েদের ধামাইল জাতীয় নৃত্যও অনুষ্ঠিত হত। উচ্চাঙ্গ ধামার বা উল্লাস সঙ্গীত ও নৃত্যের অনুসারী অথবা ধামালী রাগ অনুসারী ধামালী নাচ ও গান বাঙলার নানা স্থানে জনপ্রিয় ছিল। বাঙালী কুলবধূর বেশে অবগুণ্ঠনবর্তী মেয়েরা গোল হয়ে নাচে ও গান গায় বলে এই নাচকে অনেকে বউনাচ বলেন। এ নাচ শান্ত নাচ নয়। জোরাল, পা তুলে, পায়ের বিচিত্র ভঙ্গী করে নাচ ও করতালি, করতালি দিয়ে নাচার সময় কখনও সামনে ঝুঁকে পড়ে, কখনও বাঁ হাত কোমরে দিয়ে ডান হাতের ভঙ্গী করে, কখনও কোঁচড় থেকে কিছু দিচ্ছে এমন ভঙ্গীতে নাচে ওরা। একটি ধামাইল সঙ্গীতের নমুনা—'বন্ধু, রমণীর মনচোর—থাক থাক প্রাণ, দেখমু ভাল, থাকলে ব্রেজপুর। আর কি বুকেরে প্রাণবন্ধু—হায় রে, প্রাণ সঁপিলায় মোরে। ওয়রে, ধর্মাধর্মি কওরে বন্ধু, আছে নি তোর মনে। আর যেই বালা পিরিতি কইলাম, রে বন্ধু—তুমি আর আমি, ওয়রে, আমার ছিল চান্দের দশা, তোমার রাশি শনি। ওরে কৃষ্ণকে দেখিয়া রাধার মন হইল ভারী।' বিয়ের গান বিয়ের প্রতিটি অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিলেমিশে গেছে। গানের সুরুতে থাকে মঙ্গলাচরণ, তারপর সখী সংবাদ, বিরহ প্রভৃতি বিষয়ের গান, পান খিলির গান, নিমন্ত্রণ গান, জোড়নের গান, বর প্রার্থণা, লতা ও আলপনা আঁকার গান, সোহাগমাগা, তুকতাক, ধানভানা, জলভরা প্রভৃতি গানও হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিয়েতেই গান। নব পরিণীতা মুসলমান বধূর ব্যথা গীতির একটি নমুনা—'বার্‌য়্যাবাড়ী ছৈয়োদে ঘিরিলো। আন্দোর বাড়ী মাজান কান্দে, বুবুজান কান্দে। কতোই কান্দন কাঁন্দো মাও হামারি অঞ্চলে ঝোচো পানি। বেটি জাতি অদোম জাতি, যাইবার কালে বাসর খালি। বেটি জাতি অদোম জাতি যাইবার কালে মন্দির খালি'। আরেকটি হিন্দু জোড়নের গান—'রঙ্গ ফুল রুইতে হস্তে লাগিল মাটি রে, (ও) সোনাধন হস্তে লাগাল মাটি। জল আন, গামছা আন রে

ছাওয়াইলা, হস্তখানি পাখালি। হস্তখান পাখালাতে বাছাই আরে সোনাধন, দেখিলা সুন্দরী। দেখিয়া সুন্দরী রূপ রে বাছাধন, কেওর দিলা বারি। রইল মায়ের বাছাই রে সোনাধন, অনুরাগ দিয়া। মাও গেল বইন গেল রে সোনাধন রাগ ভাঙ্গাইবারে। পণ্ডিত পাঠাইয়া দিছি রে সোনাধন, সুন্দরীর উদ্দেশে। শ'লাগে হাজার লাগে রে সোনাধন, তারে দিব আমি। বাছিয়া করাইব বিয়ারে সোনাধন, জমিদারের বেটী। আরদিন তোমার মায়েরে নাগর, গালি দিছিল মোরে। আমার বাপের দেশেগো কন্যা, এই ব্যাভার আছে। শ্বাশুড়ীয়ে পুত্রবধূ গালি দিতে পারে গো কন্যা। গালি দিতে পারে।'

এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি গানের উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। বরের আগমন উপলক্ষে গাওয়া হয়—'বর এলো সাজিয়ে, ঢাক ঢোল বাজিয়ে। এসো বর চলে এসো, চোখ বুঝয়ে হেথায় বসো। বসবে কোথায় পিঁড়ে নাই, বরের মুখে পড়ুক ছাই। শোন বর শোন কথা, রাগলে হবে মাথা ব্যথা। রাগ দেখতে চাইনে, রাগের কামাই খাইনে। বৌ পেয়েছ সোনার বরণ, মেঘের বরণ চুল। কাঁদলে পরে মুক্তো ঝরে, হাসলে ফোটে ফুল। ও বর রাগ করো না, রাগ করো না, করো নাকো রাগ।' বিয়ে হয়ে গেলে বাসরঘরেও গান অনুষ্ঠিত হয়। বাসরঘরে অনুষ্ঠিত নানা প্রকার গানের একটির নমুনা—'পবিত্র প্রেমবন্ধনে বাঁধ হিয়া দুজনে। হৃদয়ে হৃদয়ে প্রাণে প্রাণে জীবনে। উভয়ের প্রেমনদী বহে যেন নিরবধি। সুখেতে অনন্তকাল তব প্রেম সিন্ধুপানে। পবিত্র প্রেমবন্ধনে বাঁধ হিয়া দু'জনে। সুখেতে অনন্তকাল তব প্রেম সিন্ধুপানে। তুমি সিদ্ধিদাতা পিতা মঙ্গলময় বিধাতা। শুভকাজ সম্পাদন কর আশীর্বাদ দানে।' তারপরেও আছে গান। আছে জামাই নিয়ে ঠাট্টা রসিকতা। যেমন—'জামাইর ও নাকো রে, কেয়ার কাঠের বাঁশী রে, আহামরি কাঁচাসোনার জামাইরে। জামাইর ও মুখ রে, নলা মাছের হা রে, আহা মরি কাঁচাসোনার জামাই রে। জামাইর ও দাঁত রে, দয়া কলার ছড়া রে, আহা মরি কাঁচাসোনার জামাই রে। জামাইর ও চুল রে, বট গাছের ঝুরি রে, আহা মরি কাঁচাসোনার জামাই রে। জামাইর ও হাত রে, পিঠে গড়ান বেলন রে, আহা মরি কাঁচাসোনার জামাই রে। জামাইর ও কান রে, বেনেদের পাখা রে, আহা মরি কাঁচাসোনার জামাই রে। জামাইর ও পেট রে, ধান ভিজান কোলা রে, আহা মরি কাঁচাসোনার জামাই রে। জামাইর ও পিঠ রে, ধোপাদের পাট রে, আহা মরি কাঁচাসোনার জামাই

রে। জামাইর ও ঠ্যাং রে, তামুক কাটা কাঠ রে, আহা মরি কাঁচাসোনার জামাই রে।' মেয়ে-জামাইকে নিয়ে আরও বিচিত্র সব গানের মধ্যে বর-কনেকে সাজাবার কথাও ঘোষিত হয়। যেমন বরকে সাজিয়ে দিতে দিতে গাওয়া হয়—'এসো সাজাই হে জানকীর নাথ। সাজের আর বিলম্ব কোরো না। সাজাইলে সাজাতে পারি হে, আমার সুন্দর রামেরে। চন্দন দিয়ে সাজায়েছি হে। আমার কাজল নেই ঘরে। কাজল দিয়ে সাজায়েছি হে। আমার মটুক নেই ঘরে। এসো সাজাই হে তোমায়। মটুক দিয়ে সাজায়েছি হে। আমার বস্ত্র নেই ঘরে। এসো সাজাই হে।' এই ভাবেই আছে কনে সাজাবার গান। কনে সাজাতে সাজাতে কনের সখী ও সঙ্গীরা গান গায়—'প্রাণ সখিরে চললো চললো নিকুঞ্জ কাননে। চন্দনে চন্দনে কি শোভা করেছে কব কি সখিরে। প্রাণ সখিরে চললো চললো নিকুঞ্জ কাননে। কাজলে কাজলে কি শোভা করেছে কব কিরে ঃ প্রাণ সখিরে—। মটুকে মটুকে কি শোভা করেছে কব কিরে—প্রাণ সখিরে। বস্ত্র হাতে নিয়ে এল পুনঃ সখি। মা এসে বলে সরো আমি দেখি। বস্ত্রের কিবা শোভা হেরি মনো-লোভা, ইহা হতে শোভা আছে কি সজনী? কাজল হাতে নিয়ে এলো পুনঃ সখী। পিসী এসে বলে সরো আমি দেখি। কাজলেরি শোভা হেরি মনো-লোভা, ইহা হতে শোভা আছে কি সজনী? চন্দন হাতে নিয়ে এল পুনঃ সখী, কাকি এসে বলে সরো আমি দেখি' এগিয়ে যায় এই গান।

গান ছাড়া মেয়েদের আরেকটি নৈপুণ্যপূর্ণ কাজ হল বরণ। এই বরণ দুটি মত অনুযায়ী হয়, শাস্ত্রমতে এবং স্ত্রী-আচারমতে। বরকে শাস্ত্রীয় মতে বরণ করেন কন্যাদাতা। তারপর এয়োরা স্ত্রী-আচারমতে বর বরণ করেন। পাঁচ কি সাত কি আরও বেশী বা কম একাধিক এবং অভিন্ন সংখ্যক নারী বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হয়ে শঙ্খ ও উলুধ্বনি দিতে দিতে বরকে সাতবার প্রদক্ষিণ করেন এবং বরণডালার দ্রব্যসমূহ একে একে তার শরীরে ছোঁয়ান। ধুতরা-পিদিম জ্বেলেও বরণ করেন তাঁরা বরকে। বধূ বরণের সময় শঙ্খ, উলু, বাদ্য, গান ইত্যাদি বহুল প্রচলিত। গান ও বরণসহ বিবাহের আনুষঙ্গিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এক এক জায়গায় এক এক রকম স্ত্রী-আচারের প্রচলন আছে। এই আচারানুষ্ঠানের মধ্যে নবদম্পতির জীবনযাত্রার গতি নির্দেশ ও ভাগ্য পরীক্ষা অন্যতম। বরকে দিয়ে বধূর হাতে হলুদমাখা চাউল দেওয়া হয়। বধূ তা ফেলে দেয় তিন, পাঁচ কি সাতবার। চালের সঙ্গে থাকে একুশটি কড়ি। বধূর জিত কি বরের জিত বধূর বান্ধবীরা সে রায় দেয়। তারপর উভয়ের মধ্যে চাউল ভাগ

করে দেওয়া হয়। সাধারণত বর পরাজয় স্বীকার করে এ খেলায়। তখন পরাজিত বরের ডানহাত একটি নোড়ার উপর চেপে ধরা হয় এবং বধূর জন্য কোনও উপহারের প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্যন্ত তাকে মুক্তি দেওয়া হয় না। বরের সম্মুখে একটি জ্বলন্ত মাটির প্রদীপ রাখা হয় কুলোয়। বর সেটিকে ঢেকে দেয় এবং বধূ সে ঢাকা খুলে ফেলে। পাঁচ, সাত কি নয়বার এরূপ করার পর বর স্ত্রীর সমস্ত ত্রুটি মানিয়ে নেবে এমন প্রতিশ্রুতি দেয়। তারপর বর ও বধূর টোপর থেকে দুইখণ্ড সোলা জলভরা হাঁড়িতে জল নেড়ে ফেলে দেওয়া হয়। দেখা হয় সোলা দু'খণ্ড মিলে গেল বা একখণ্ড আগে পিছে গেল। এর দ্বারা স্বামী স্ত্রীর ভবিষ্যৎ ঐক্য অনৈক্য ও আনুগত্যের পরীক্ষা করা হয়। অনেক সময় জলে দুটি ফুলও ভাসিয়ে দেওয়া হয় এই পরীক্ষায়। ফুল দুটি মিলে গেলে দাম্পত্য জীবন সুখের হবে বলে বিশ্বাস। বিবাহের প্রথম অনুষ্ঠান অধিবাস। এই উপলক্ষে বরণডালা সাজান হয়, এবং পৃথক একটি থালায় আতপ চাউল ও মাষ কলাইয়ের 'শ্রী' তৈরী করে রাখা হয়। যথা সময় পুরোহিত বরের বাড়ীতে বরকে এবং কনের বাড়ীতে কনেকে চন্দনের টিপ পরান, অধিবাসের দ্রব্য কপালে ছোঁয়ান ও বরণডালা এবং শ্রীর থালা তাদের মাথার উপর তুলে ধরেন। তারপর একগোছা, দূর্বা, তেল, হলুদসিক্ত নতুন বস্ত্রখণ্ড বরের দক্ষিণ ও কনের বাম মণিবন্ধে বেঁধে দেন।

বিবাহের প্রথম অনুষ্ঠান পাত্র-পাত্রী দেখা, কোষ্ঠী-বিচার, পাকা-দেখা বা আশীর্বাদ। তারপর বিবাহের দিনাবধারণ প্রভৃতি।

বিবাহের দু' একদিন পূর্বে হয় গায়েহলুদ বা গাত্রহরিদ্রা, হয় নারকোলভাঙ্গা বা আনন্দনাড়ু করা এবং আইবুড়োভাত। অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, চূড়াকরণ শ্রীপঞ্চমী প্রভৃতি পূজা উপলক্ষেও গায়েহলুদ মাখান হয়। বিয়ের গায়ে হলুদে এয়োস্ত্রীরা বর কি কনেকে নতুন বস্ত্রাচ্ছাদিত করে আলপনাযুক্ত আম-কাঠের পিঁড়িতে বসিয়ে কাঁচাহলুদ বেটে এবং গন্ধতেল মিশিয়ে মাখিয়ে দেন। এই উপলক্ষে বরের বাড়ী থেকে তত্ত্ব আসে কনের বাড়ী। বরের ব্যবহৃত হলুদের অবশিষ্টাংশ কন্যার বাড়ীতে পাঠান হয়। অনেক স্থানে গায়েহলুদের বদলে হলুদ কোটা হয়, এবং অধিবাসের দিন বা বিয়ের দিন বর ও কনেকে হলুদ ও গিলা বাটা দিয়ে এয়োস্ত্রী আনা জলে স্নান করান হয়। শুভদিন দেখে অন্ন-প্রাশন, উপনয়ন ও বিবাহের আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানের উপকরণ প্রস্তুত রাখাকে নারকোলভাঙ্গা বা আনন্দনাড়ু তৈরী করা বলা হয়। গায়ে হলুদের পরে হয় পিতৃগৃহে কন্যার বিবিধ উপকরণ ও পিষ্টকাদিসহ অন্নগ্রহণরূপ সংস্কারানুষ্ঠান।

এই অনুষ্ঠান হচ্ছে অবিবাহিত পাত্র-পাত্রীকে ভোজন করাবার লোকাচার সিদ্ধ অনুষ্ঠান। বিবাহের দিন প্রত্যুষে কন্যার মাতা ও পিতা এক সঙ্গে বস্ত্রাঞ্চলে গিঁট দিয়ে এয়োস্ত্রীদের সহ নিকটবর্তী জলাশয়ে যান জল আনতে। পুরুষের হস্তে থাকে খাঁড়া বা কোন লৌহাস্ত্র এবং মহিলার কক্ষে কলসী। কন্যার মাতা বা পিতার পরিবর্তে মাতৃ-পিতৃস্থানীয়দের কেউ এ অনুষ্ঠানের অধিকারী। জলে নেমে স্বামী খাঁড়া দিয়ে জল কেটে দেন, স্ত্রী সেখান থেকে জল ভরে আনেন কলসীতে এক নিঃশ্বাসে। এই অনুষ্ঠানের একটি গানের নমুনা—'সই লো সই মকর, গঙ্গাজল। আজ হবে কামিনীর বিয়ে, সইতে যাব জল। উলু দিয়ে শাঁখ বাজায়ে বরনডালা মাথায় লয়ে, জলের ধারা হাতে করে জল সইতে চল।' জল নিয়ে ফিরে জলভর্তি কলসীতে পাঁচটি ফল ও একছড়া মালা রাখা হয়। তারপর কাপড় দিয়ে কলসীর মুখ ঢেকে দেওয়া হয়। কলসীটি যে ঘরে থাকে রাত্রে বরকে সে ঘরে নিয়ে আসা হয় নানাবিধ স্ত্রী-আচার পালন করার জন্য।

বিয়ের নিমন্ত্রণ সুরু হয় 'পানখিলি' অনুষ্ঠান দিয়ে। কিছুদিন পূর্বেও পান দিয়ে নিমন্ত্রণের বিধি ছিল। তারই উদ্বোধন পানখিলি অনুষ্ঠানে। অন্ততঃ পাঁচ জন এয়ো আলপনা শোভিত পরিমার্জিত অঙ্গনে বাটাভরা পানের খিলি দিতেন, অনেকে পানখিলির গান করতেন। অবশেষে বরের বা কনের মা বা মাতৃস্থানীয়া কেউ মাথায় পানের বাটা নিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরতেন। সকলে একত্রিত গান গাইতে গাইতে নিমন্ত্রণে চলতেন। দূরদূরান্ত থেকে মহিলারা এসে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন। গান গাইতেন—'সবে দেও গো পানখিলি হইয়া এক মন। সুপারী কাটগো আয়গণ। যার হস্তে সোনার কাটারি। সে আইস্যে কাটো সুপারী। জয় জোকার দ্যাও হইয়া একমন,' ইত্যাদি। বিয়ের পূর্বে অনেক স্থানে গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা হয়। ষোড়শমাতৃকা বা গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, পুষ্টি, শান্তি, ধৃতি, তুষ্টি, বরাহী এবং কৌবেরী পূজা হয়। তারপর চেদিরাজ উপরিচর বসুর পূজা এবং তার প্রীত্যর্থে বসুধারা দেওয়া হয়। ঘরের উত্তরদিকের দেওয়াল বা বেড়ায়, গোবর, তিনটি কুশপত্র, চালগুঁড়ো দিয়ে আঁকা অষ্টদলপদ্মে দই, দূর্বা এবং সিঁদুর দিয়ে পাঁচবার বা সাতবার বসুধারা দান করা হয় চন্দ্র বংশীয় চেদিরাজ উপরিচর বসুকে। বৃদ্ধিরবারা বা আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ বা নান্দীমুখ করা হয় শুভকার্যের পূর্বে পিতৃগণকে সন্তুষ্ট করতে। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের চাউল এয়োস্ত্রীরা ঢেঁকি বা উদূখলে ভানেন। অধিবাসের সময় থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বর ও কন্যার সোলার টোপর পরবার রীতি। বিবাহান্তে বরকে

খেতে দেবার জন্য চাউল তৈরীর একটি অনুষ্ঠান অনেক কন্যাগৃহে দেখা যায়। কন্যার মাতা বা মাতৃস্থানীয়া কেউ ধান সিদ্ধ করেন। শুকিয়ে চাল প্রস্তুত করেন নিজ হাতে। মেয়েকে সাতপাক ঘুরিয়ে পিঁড়িতে বসার পূর্বে পিঁড়ির উপর এই চাউল ছড়িয়ে দেয়। এই চাউল প্রস্তুতের ধান সিদ্ধ করার সময় একটি আখের পাতায় আঠার জন স্ত্রৈণ পুরুষের নাম লিখে হাঁড়ির মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়। আড়াইটি আখের পাতা ও অন্যান্য জ্বালানি দিয়ে ধান সিদ্ধ করা হয়। এই চালের ভাত রান্নার সময় রাঁধুনী মিষ্টি মুখে দিয়ে চুপ করে বসে থাকেন। বিয়ের পর বর এই চাউলের ভাত খাবার ভান করে নববধূকে দিয়ে দেয়। এটা দাঁড়ার ভাত। মনসামঙ্গল, মাঘমণ্ডলব্রত প্রভৃতিতে এর উল্লেখ আছে।

বিবাহের প্রধান কার্য সম্প্রদান, বিবাহের রাত্রির শুভলগ্নে অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবসহ বর কন্যাগৃহে আসেন। কন্যাপক্ষ যথোচিত সম্মান দেখান বর ও বরযাত্রীদের। তাঁরা সালঙ্কারে কন্যা সম্প্রদান করেন। কিছু দিন পূর্বে পর্যন্ত কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে কন্যাকে বরের বাড়ীতে এনে বিয়ে করার রীতি ছিল। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে বরপণের বদলে কন্যাপণ প্রচলিত ছিল। লগ্নকালে বরকে সম্প্রদানক্ষেত্রে আনা হয় এবং আলপনা-চিত্রিত পিঁড়িতে পূর্বমুখে উপবেশন করান হয়। কন্যাকর্তা উত্তরাস্যা হয়ে সম্প্রদান করেন। ছাঁদনাতলায় সাতবার প্রদক্ষিণ ও অন্যান্য স্ত্রী আচার, হস্তবন্ধন, ভ্যাকরণ, হস্তবন্ধনামোচনাদি কার্য সমাপ্ত করার পর বর-কন্যার শুভ-দৃষ্টিকালে নাপিতের গৌরবচন। 'বর তুলেছে বর তুলেছে এয়োতে থই থই। স্ত্রী-আচারের সময় যায় নাপিত ভায়া কই। ভীষণ কষ্টে ভীড় ঠেলিয়ে নাপিত এসে হাজির। কোলে নেও রে কোলে নেও রে হুকুম হলো হাজির। লজ্জায় বর জড়সড় মুখটি করে নত, নাপিত তখন তুললে কোলে বিষম থতমত। নামিয়ে দিলে পিঁড়ির উপর এয়োগণের মাঝে, উলু উলু শুভ ভেরী সঙ্গে সঙ্গে বাজে। লাজেতে বর লাজুক তখন চোখ করে ছল ছল, বরকে দেখে হাসে খিল খিল যত এয়োদল। বেড় চাউলি বরের গায়ে লাগায় ধীরে ধীরে, যত এয়ো ছিল তারা সবাই ধরে ঘিরে। বরণ দিলে শাঁখ বাজায়ে আমোদিত হয়ে, বরকে করলে প্রদক্ষিণ জলের ধারা দিয়ে। বিয়ের কাজের অঙ্গহীন হলো নাকো কিছু, বিশেষ হলো চিমটি চাপড় কানমলাটা পিছু। হাতে মাকু দিল বরের পাশে আছে কনে, শুভদৃষ্টি হচ্ছে এবার লও গো দেখে শুনে। এয়োরা সব মনে মনে আপন আপন ভাবে, হা ভাগ্য এমন পতি কার কপালে হবে। পরক্ষণেই সময় হলো ধর ধর ধর, শাঁখ বাজায়ে উলু

দিয়ে বরকে বরণ কর। খুঁটি খাঁটা ছাড়ো সবে হচ্ছে শুভদৃষ্টি, তা নইলে ভাতার পুতের মাথা খাবে মিষ্টি। মন্দ করলে মন্দ হবে তার ভাতে পড়বে ছাই, মন্দ যেজন করবে তার কাঁচা মাথাটি খাই। বর কনেকে তুলে নে যাই বাজা না ভাই শাঁখ, বাকীটুকু শুনো বাসরঘরে আজ এই পর্যন্ত থাক।'

এই নাপিতকে বলা হয় পরামাণিক, নরসুন্দর ইত্যাদি। পরামাণিক প্রামাণিক শব্দের অপভ্রংশ। বহু ব্রাহ্মণ ও কংসবণিক এবং পূর্ববঙ্গের অনেক মুসলমানের উপাধি পরামাণিক। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের প্রধান ব্যক্তি বা মোড়লের সাধারণ উপাধি প্রামাণিক বা মণ্ডল। সুতরাং পরামাণিক শব্দ জাতিবাচক নয়। হুগলী, কৃষ্ণনগরের খানাকুল অঞ্চলের নাপিতেরা নাই, শ্রীহট্টের নাপিতেরা নাউ, চন্দ্র বা চন্দ্রবৈদ্য উপাধি দ্বারা পরিচিত। যুক্তপ্রদেশের স্থানে স্থানে নাপিতকে 'নাউ ঠাকুর' বলা হয়। ওদের কেউ কেউ মধু নাপিত। অনেকে পৈতা নেয়। নিজেদের ব্রাহ্মণ পর্যায়ের লোক বলে মনে করে ক্ষৌরকার্য, খাদ্যাদিপ্রস্তুত ছাড়া পূর্বে এদের অনেকে রাজপুরুষ ও বিত্তশালী ব্যক্তির ভাঁড়ের কাজ করত অসাধারণ বুদ্ধিগুণ হেতু। বাঙলার লোক-সমাজের অন্যতম প্রিয় পুরুষ গোপাল ভাঁড় জাতিতে নাপিত ছিলেন বলে প্রকাশ। তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অন্যতম পারিষদ ছিলেন। বাঙলার জাতাশৌচ, মৃতাশৌচ, অপগম এবং শুদ্ধিস্নানের পূর্বে, চূড়াকরণে, অন্নপ্রাশনাদিতে ও সংস্কার কার্যে এবং প্রত্যেক উৎসবে ক্ষৌরকর্মের জন্য নাপিত না হলে শুদ্ধ হওয়া যায় না। 'চুপড়ী'ধারী নাপিত হিন্দুর সর্ব কর্মের সহায়, এমন কি মেয়েদের প্রসাধনেও পড়ে তাদের ডাক। স্ত্রী-আচার আচরণ এবং দু'হাত কাঁপিয়ে বরণ করার মধ্যে বশীকরণ অর্থাৎ জামাই বাবাজী যেন চিরকাল তার মেয়ের 'ভেড়া' বা গোলাম হয়ে থাকে। বশীকরণের কথায় কবচ-তাবিজ ধারণ সম্পর্কে আলোচনা প্রাসঙ্গিক। কবচ বা তাবিজের ধারণবিধি আছে। অনেকে কবচ-তাবিজের সঙ্গে কুসংস্কারকে জড়িয়ে ফেলেন। এবং এই কুসংস্কারকে কেন্দ্র করে জ্যোতিষী সম্প্রদায়ের লোকেরা চমৎকার ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন বাঙলায়। বাঙলার সর্বত্র ভাগ্যগণনাকারীদের ভীড়। তাঁরা নিজেদের ভাগ্য ফেরাতে পারেন কি না পারেন, অপরের ভাগ্য ফেরাতে নিশ্চয়ই সিদ্ধহস্ত। তাঁরা বলেন— 'আপনার ভাগ্য আপনার মুঠোর মধ্যে, প্রয়োজন একটি রত্নের, কবচের বা তাবিজের'। দলে দলে লোক ছুটে গিয়ে জ্যোতিষীর কাছে ভীড় জমায়।

জ্যোতিষ একটি শাস্ত্র। শাস্ত্রকারেরা তাঁদের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে এ শাস্ত্র রচনা করেছেন। এটাকে empirical science বা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল বিজ্ঞানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। কিন্তু ভাগ্যগণনাকারীরা এই শাস্ত্রকে অন্য দিকে নিয়ে গেছেন। কি ভাবে নিয়ে গেছেন তার একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হলে কোন কোন জ্যোতিষী মুক্তা ধারণ করতে পরামর্শ দেন—'গুরৌ মুক্তাং'। একই কারণে অন্য কোন জ্যোতিষী ধারণ করতে বলেন পোখরাজ। একই রকম দুর্বিপাক থেকে উদ্ধার পেতে দু'জন জ্যোতিষীর দু'রকম রত্ন ধারণের নির্দেশ।

ইতিপূর্বে ঋতুর আলোচনায় আমরা দেখেছি যে প্রত্যেক গ্রহের এক-জন করে অধিষ্ঠাতা দেবতা আছেন। আছেন অধিদেবতা এবং প্রত্যধি-দেবতা ইত্যাদিও। এবং এই গ্রহ-উপগ্রহ তথা গ্রহদেবতা-অধিদেবতারাই আমাদের নিয়ন্তা। গ্রহ ক্রুদ্ধ হলে জীবনে আসে সর্বনাশ। কোন গ্রহকে তুষ্ট করতে হলে তাই গ্রহদেবতাদেরও তুষ্ট করতে হবে। তাঁদের পূজা করতে হবে। এবং এই গ্রহ-দেবতাদের আশীর্বাদপুষ্ট কবচ, তাবিজ ইত্যাদি ধারণ করতে হবে। ধর্মের আবরণে চমৎকার গল্প ফেঁদে কবচ-তাবিজের ব্যবসা চালু করা হয়েছে অর্থাগমের পথ সুগম করতে। এত সব কাণ্ডের পর যে কবচ বা তাবিজ তৈরী হয় তা প্রচুর দাম দিয়েই কিনতে হয়। অন্যরূপ কবচ বা তাবিজে ফল পাওয়া যায় না এ কথাও বারে বারে বলে দেওয়া হয়। অবশ্য বৈষ্ণব সম্প্রদায় গ্রহাধিপতি দেবতাদের পূজা করতে প্রস্তুত নন। তাঁদের জন্য এলেন এক একজন অবতার। অবতারদের পূজা করলেও চলবে বলে বিধান দিলেন জ্যোতিষী। সে পূজোয়ও খরচা কম নয়। কাজে কাজেই জ্যোতিষীদের কোন অসুবিধা দেখা দিল না। এ ব্যাপারে মুসলমান সমাজও পিছিয়ে নেই। তাঁরা যদিও একেশ্বরবাদী, খোদা বা আল্লাতাল্লাহর উপর আস্থাবান। তবুও হাজীসাহেব, মৌলানা, মৌলবী, গাজী, পীর, ফকিরদের দোয়া তাঁদেরও কাম্য। আর এই দোয়ার সরণী বেয়ে তাঁদের সমাজেও এসে গেছে তাবিজ, তাগা প্রভৃতি। এসে গেছে গণৎকারশ্রেণীর লোক। জনগণের বিশ্বাস ও সংস্কার ভাঙ্গিয়ে তাঁরাও ব্যবসা করে যাচ্ছেন। অবশ্য কবচাদি গ্রহণ হিন্দুধর্ম স্বীকৃত বলে মনে করা যেতে পারে। তাই পরাশর বলেছেন—'ক্রূর গ্রহদশাকালে শান্তিং কুর্যাৎ বিচক্ষণ'। এই শান্তি প্রধানত জপের মারফত করতে বলেছেন তিনি।

সংযমী হয়ে শুদ্ধ চিত্তে জপ করলে ভগবানের কৃপালাভ করা যায়। এবং ভগবৎকৃপায় সব অশুভই শুভ হয়। তবুও এক এক শাস্ত্রকার এক এক প্রকার গ্রহের জন্য এক এক রকম কবচের বিধান দিয়েছেন। এ কবচ ধারণ বিধি সাধারণত গ্রহযামল এবং শক্তিসঙ্গম তন্ত্রের অন্তর্গত। উদাহরণ-স্বরূপ শক্তিসঙ্গম চন্দ্রকবচের মন্ত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে—'সোমবারে মহেশানি কৃত্বোপবসনং মুদা। সাম্বং সোমং সমভ্যর্চ কবচং দ্বি পঠেৎ যদি। মাসমধ্যে মহেশানি পুত্রবান সা ভবেৎ ধ্রুবম'। এখানে বলা হয়েছে যে সোমদেবের কৃপায় মানুষ পুত্রবান হয়। 'এর প্রকৃত অর্থ পরিস্ফুট হয় যদি আমরা আদিম জাতির বিশ্বাসের দিকে লক্ষ্য করি। অনেক আদিম জাতির স্ত্রী-পুরুষ মনে করে যে স্ত্রীলোকের সন্তান লাভের জন্য সর্বদাই পুরুষ-সংসর্গের প্রয়োজন হয় না। কোন স্ত্রীলোক যদি বেশীক্ষণ চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে তবেও সে গর্ভবতী হতে পারে। চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকার এই আচরণ থেকেই বোধহয় চন্দ্রযামিনীযাপনবাসের প্রথা এসেছে। আর একটি আদিম বিশ্বাস—নারীর গায়ের ঘাম গায়ে শুকিয়ে গেলে ঐ ঘাম থেকেও সে গর্ভবতী হয়। কার্তিকের উপাখ্যানেও এ তথ্য বর্তমান। সেখানেও আছে যে, পার্বতী একদিন তাঁর গায়ের ঘাম এবং ময়লা শরবনে নিক্ষেপ করেন। এই থেকেই দেবসেনাপতি কার্তিকের জন্ম। পুরুষের সাহচর্য বিনা নারী সন্তানসম্ভবা হতে পারে এরকম বিশ্বাস শুধুমাত্র হিন্দুসমাজে কেন অপরাপর ধর্মাবলম্বী-দের মধ্যেও আছে। আছে বলেই মেরী কুমারী হয়েও সন্তান প্রসব করতে পেরেছেন। পেরেছেন আরও অনেকে।

রামায়ণ মহাভারতে বর্ণিত আছে নানাভাবে সন্তান সৃষ্টির কাহিনী। লোকসমাজের ব্রতাচারের মধ্যেও এ ধরণের উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। দেবতার প্রসাদ নিয়ে, জলপড়া পানে, পোয়াতীঘাটে স্নান করে, সাধু সন্ন্যাসী-পীর-গাজীদের দেওয়া ফল, চরু, প্রসাদাদি খেয়ে বহু নারীই নাকি সন্তান পেয়েছেন। সন্তান নাকি পেয়েছেন তাঁরা দেব-দেবীর দুয়ারে ধন্না দিয়েও। এ সব কাজের অনেকস্থানেই নারীকে পুরুষ-সংসর্গ করতে হয় না। কোন কিছু ধারণ বা গ্রহণ করলেই হয়। ধারণ করার চিন্তা ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলেও প্রতিফলিত। সেখানে মণি ধারণের উল্লেখ আছে। পরবর্তী বেদে বিভিন্ন প্রকার কবচ ধারণের বিবরণ আছে। আছে বিভিন্ন ধাতু, গাছের টুকরা প্রভৃতি শরীরে ধারণ করার কথা। এবং সেখানে এ সব ধারণ

করার আগে বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মের দ্বারা ধারণীয় সামগ্রী শোধন করার বিধান আছে। এই ভাবে কবচ, তাবিজাদি ধারণ করার মধ্যে দ্রব্য-শক্তিতে বিশ্বাস অতিমাত্রায় প্রতিফলিত। দ্রব্যগুণ, অর্থাৎ এক একটি দ্রব্যের এক একটি গুণ, এবং এক এক উদ্দেশ্যে তা ফলপ্রদ। দ্রব্যগুণের বা শক্তির সঙ্গে প্রয়োজন ঐশীশক্তির। ঐশীশক্তি ছাড়া ধারণীয় দ্রব্যে সাফল্য আসে না। কাজেই ঐ দ্রব্যের মধ্যে যখন ঐশীশক্তির সমাবেশ হয় তখন তা থেকে এমন একটা বিশেষ শক্তি বিচ্ছুরিত হয় যা ধারণকারীকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করে। অর্থাৎ দ্রব্যশক্তি ঐশীশক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে তা মনের ও দেহের সংস্পর্শে এসে আর একটি নতুন শক্তির সৃষ্টি করে। কবচ তাবিজের মধ্যে তাই বহুল পরিমাণে ইন্দ্রজাল ও যাদুর প্রভাব বিদ্যমান। বিদ্যমান এই কবচ-তাবিজাদি তৈরী ও ধারণ প্রণালী মধ্যেও। এ প্রভাব বৈদিক যুগ থেকেই চলে আসছে। তখন কবচ ধারণ করার পূর্বে কবচকে দধি ও মধুর মধ্যে তিন দিন ভিজিয়ে রাখা হত। তারপর তিন দিন ডুবিয়ে রাখা হত ঘিয়ের মধ্যে। এই ঘি থেকে তুলে নিয়ে পুরোহিত কবচের পূজো করতেন। কবচ বা তাবিজের মধ্যে ব্যবহৃত প্রায় সমস্ত সামগ্রীই আসে ভেষজ সামগ্রীর মারফত বা গাছগাছড়া থেকে। এই গাছ গাছড়ায় ধান গাছ থাকবেই। ধান গাছ সরল। এ গাছ দীর্ঘজীবন কামনায় লাগে। কৃমির উপদ্রব থেকে রক্ষা করতে লাগে দুর্বামূল প্রভৃতি। বশীভূত করার জন্য দর্ভের আংটি বা অনেক সময় বিভিন্ন প্রাণীর চামড়া ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় দ্রব্য শোধন করতে। সবচেয়ে বেশী ব্যবহার করা হয় কালো হরিণের লাঙ্গুলের চুল। অনেক তুকতাকেও এ জিনিষটির প্রয়োজন। আদিম সমাজে গাছের পাতা, ফুল অথবা ধাতু এবং বিভিন্ন পাথরের মালা ধারণ করার রীতি প্রচলিত আছে। এগুলো শুধুমাত্র তাদের বেশভূষার অঙ্গ নয়। এগুলোকে তারা রক্ষাকবচ হিসাবে ব্যবহার করে। উপরে বর্ণিত সমস্ত কৃত্যে আদিম সমাজেরই ছায়া দেখা যায়। বাঙালী সধবার লোহার বালা ব্যবহারের মধ্যেও আছে আদিম চিন্তার প্রতিফলন। বাঙালী সধবার সিঁদুর ব্যবহার রীতি সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি খেলাধূলা পর্যায়ে। এই সিঁদুর বিভিন্নভাবে মেয়েদের শোভাবর্ধন করে। সধবা বাঙালী মেয়েরা কেন শাঁখা, সিঁদুর ও লোহা ধারণ করেন তা নিয়ে এ যাবৎ অনেক গবেষণা হয়েছে। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, লোহা ধারণ স্বামীর দাসত্বের পরিচায়ক। যখন

পুরুষ নারীকে জোর করে ধরে এনে বিয়ে করত তখন স্ত্রীকে সে স্ত্রী ও দাসী এই দুভাবেই ব্যবহার করত। সেই দাসত্বের শৃঙ্খল আজ নেই। তার বদলে হাতে উঠেছে লোহা। লোহার শিকল বা বালা দিয়ে স্ত্রীকে নামান হয় দাসীর পর্যায়ে। শাঁখা ও সিঁদুরের ব্যবহার অন্য কারণে। সিঁদুর যে আদিম জাতির বিজয়ের চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে বাঙালী সমাজে তার বিস্তারিত বিবরণ সিঁদুর খেলা অংশে আছে। আদিবাসী সমাজ বিভিন্ন রং-এ দেহ সজ্জিত রাখে মঙ্গলবিধানের জন্য। এই মঙ্গল বিধানের চিন্তা থেকেই বাঙালী রমণী পদযুগল, কপাল, ঠোঁট ও সিঁথিকে রক্তবরণ করে রাখেন আলতা, সিঁদুর ও পান দিয়ে, হস্তকে শোভিত করেন শ্বেতশঙ্খ শাঁখা দিয়ে। মোদ্দাকথায় স্বামীর মঙ্গল কামনা থেকেই এসেছে শঙ্খ পরিধানের রীতি। এসেছে প্রবালেরও ব্যবহার। তাছাড়া, জ্যোতিষশাস্ত্র মতেও লোহা, সিঁদুর ও শঙ্খ ব্যবহারের সার্থকতা বিবৃত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে মেয়েদের বৈধব্য সূচনা করে রবি, মঙ্গল, রাহু, চন্দ্র ইত্যাদি গ্রহ যদি তাঁরা দুঃস্থানে থাকেন। এখন লোহাকে মনে করা হয় শনি। এই লোহা রাহুর প্রতিষেধক। লাল রং রবি ও মঙ্গলের প্রতিষেধক। আর শঙ্খ চন্দ্রের প্রতিষেধক। কাজেই স্বামীর দীর্ঘজীবন কামনার জন্যই যে লোহা, সিঁদুর ও শঙ্খ ব্যবহার করে নারী সমাজ সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। একই চিন্তা থেকে বিভিন্ন রত্নের ব্যবহার চলে আসছে সৌভাগ্যলাভের আশায়।

বিবাহের আলোচনা প্রসঙ্গে ধারণবিধি নিয়েও আলোচনা করা গেল। আপাতত এই আলোচনা এখানে বন্ধ করে বিয়ের সেই পুরাতন আলোচনায়ই ফেরা যাক। বিয়েতে আসল কন্যাদানের কার্য নিতান্ত অনাড়ম্বর ব্যাপার। একটি জলপূর্ণ পাত্রের উপর বরের চিৎ-করা ডান হাতের উপর কন্যার ডানহাত রাখে, তার উপর লাল গামছায় বাঁধা পাঁচটি ফল বা পাঁচটি হরিতকী বা আমলকী, বহেরা, জায়ফল ও সুপারী রেখে হাত দু'খানি কুশ ও ফুলের মালা দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। পরে কন্যাদাতা, বর ও কন্যার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের নাম তিন তিন বার উল্লেখ করে সম্প্রদানকার্য সম্পাদন করেন। তিনি বরকে কনে গ্রহণ করতে বলেন। বলেন 'যদেতদ্ধৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম। যদেতদ্ধৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥' অর্থাৎ তোমার এই হৃদয় আমার হৃদয় হোক, আমার এই হৃদয় তোমার হৃদয় হোক।' সম্প্রদানের পর হাতের বাঁধন খুলে দেওয়া হয় এবং ফল বাঁধা গামছার একপ্রান্ত কন্যার শাড়ীর

আঁচলে আরেকপ্রান্ত বরের চাদরের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়। এটাকে বলে গাঁটছড়া। বিবাহের আট বা দশদিনের দিন ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের মারফত এই বাঁধন খুলে ফেলা হয়। এ কয়দিন বর ও বধূকে একসঙ্গে বা জোড়ে থাকতে হয়। সম্প্রদান পরবর্তী অনুষ্ঠান পাটির উপর বসে তাই 'বেটির সঙ্গে পাটি' দেওয়ার রীতি। বৌদ্ধ বিয়েতেও আছে পাটির স্থান। বৌদ্ধভিক্ষু বর-কনেকে যে আসনে বসিয়ে মঙ্গলাচরণ পাঠ করেন সে আসন পাটি, চাদর ও বালিশ দিয়ে তৈরি। বিবাহ মণ্ডপেও একই বিছানা। ছেলে ও মেয়ে উভয় পক্ষের পাটিই দরকার হয় বিয়েতে। তাদের পিঁড়ির আসনের দরকার হয় না বিয়েতে। দরকার হয় বটবৃক্ষের পল্লব আম্রপল্লবের সঙ্গে।

সম্প্রদানের পরে অনেক জায়গায় হয় আংটিখেলা। বর একটি চাউল পূর্ণ পাত্রে আংটি লুকিয়ে রাখেন এবং কন্যা তা খুঁজে বের করেন। তিন বা বেশী বার এরূপ কার্য করা হয়। প্রত্যেকবার হাত দিয়ে কন্যাকে সে আংটি বের করতে হয়, নইলে তাঁর হার হয়। যিনি খেলায় হেরে যাবেন, তিনি দাম্পত্য জীবনে গৃহের কোন লুক্কায়িত কিংবা হারানো জিনিষ খুঁজে বের করতে পারবেন না। এখানে পাশা ও অন্যান্য খেলা চলে। এ খেলায় গান গাওয়া হয়। নমুনা—'নারীর সঙ্গে কইরো না শ্যাম চাতুরী, পাশাখেলায় বুঝা যাবে বাহাদুরী। নীচে ত চিরকন পাটি উপরে চান্দোয়া টাঙ্গী, তায় বসে খেলবো পাশা নবীনা কিশোরী। সুবর্ণের সরা পাতিল বড়াতের কড়ি, তারে দিয়া খেলবো পাশা নবীনা কিশোরী। যদি হেরে যাই, বিনামূল্যে হব দাসী গোপিনী সবাই। যদি হারে হরি, রাইকে দিবে হস্তের মুরারী। পাশা খেলায় বুঝা যাবে বাহাদুরী।' খেলানুষ্ঠানের পর বর-ভোজন। বিয়ের দিন রাত্রে পূর্ববঙ্গের অনেক জায়গায় বর কনের পিত্রালয়ের অন্ন গ্রহণ করেন না। বরের বাটি থেকে খাবার আসে। বিবাহের পরদিন বর শ্বশুর গৃহে অন্ন গ্রহণ করেন। কোনও কোনও জায়গায় বিয়ের রাত্রে বর বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীদের সঙ্গে পংক্তি ভোজন করেন। তবে অনেক স্থানেই তার আহার্য ফলাহার, ভাতের বদলে লুচি, তরকারী, মিষ্টান্ন ইত্যাদি।

সম্প্রদানের পরেই হয় বিবাহের প্রধান শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের নাম কুশণ্ডিকা বা হোমযজ্ঞ। কুশণ্ডিকা বলতে বিবাহের আনুষঙ্গিক লাজহোম, শিলারোহণ, সপ্তপদীগমন ও পাণিগ্রহণ এবং তাদের অঙ্গীভূত হোমকে বুঝায়। লাজ বা খৈ মাঙ্গলিক দ্রব্য। শিলারোহণে বধূর পা শিলার উপর রেখে তাকে শিলার মত স্থির থাকতে বলা হয়। স্ত্রী-আচারেও

বধূকে শিল ও পাথরের থালার উপর দাঁড় করান হয়। যজ্ঞাগ্নির উত্তর পার্শ্বে সাতটি মঙ্গল বা বৃত্ত আঁকা হয়। সেই বৃত্তের উপর বধূর আলতা মাখান পা রাখা হয়। তারপর বর ও বধূ হাত ধরাধরি করে এক পা এক পা করে সাতটি বৃত্ত অতিক্রম করেন ও মন্ত্র বলেন 'সখে সপ্তপদা ভবসা মামনুব্রতা ভব বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু পুত্রাণ বিন্দারহৈ বহ ৺—স্তে সন্তু জড় জষ্টয়' অর্থাৎ হে সখি এইবার তুমি সাত বার পদক্ষেপ করো। আমার ধর্মের অনুসরণ করো, ভগবান বিষ্ণু তোমাকে আমার সঙ্গে একত্রে ধর্মপথে চালনা করুন। যেন আমরা বহু সংখ্যক দীর্ঘজীবী পুত্র লাভ করি। এক একটি বৃত্ত অতিক্রমণ করা হয় আর বলা হয়—১। ওঁ একমিষে বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু, ২। ওঁ দ্বে উর্জ্জে বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু, ৩। ওঁ ত্রীণি রায়স্পেশায় বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু, ৪। ওঁ চত্বারি ময়োভবায় বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু, ৫। ওঁ পঞ্চ পশুভ্যো বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু, ৬। ওঁ ষড় ঋতুভ্যো বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু, ৭। ওঁ সখে সপ্তপদীভব সা মামনুব্রতা ভব বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু। কন্যাকে আশীর্বাদ জানিয়ে বলা হয়—'স্যোনাভব শ্বশুরেভ্যঃ, স্যোনাপত্যে গৃহেভ্যঃ, স্যোনাস্যৈ সর্বস্যৈ বিশে, স্যোন্যে পুষ্টয়ৈষাং ভব' অর্থাৎ শ্বশুরগণের সুখবিধায়িনী হও, পতির সুখবিধায়িনী হও, পতিগৃহের সুখবিধায়িনী হও, এই সমস্ত লোকের সুখবিধায়িনী হও, সকলের পোষণের জন্য তুমি সুখবিধায়িনী হও।

বিবাহানুষ্ঠানের পরে অর্থাৎ শাস্ত্রীয় ও লৌকিক আচারাদি সমাপ্ত হলে এবং ভোজনান্তে বর ও বধূ বাসর ঘরে আসেন বিশ্রাম নিতে। সেখানে নানা হাস্য-কৌতুক চলে। চলে ঠাট্টা, গান ও ছড়া। বাসরঘরে সারারাত প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হয়। এই প্রদীপকে অনেকে বলেন সোহাগবাতি। বরের শ্যালিকা বা তৎস্থানীয়ারা বরকে লক্ষ্য করে নানাবিধ রঙ্গরস করেন। প্রশ্নের উত্তর চান। যেমন—'ওগো বর কোথা থেকে এলে তুমি উঠানে দিলে পা। উঠোনটা ছিঁড়ে গেলে সেলাই করে যা?' বর উত্তর দেন—'বাটাভরে পান আন গাল ভরে খাই, উঠোনটা তুলে ধর সেলাই করে যাই।' ঠাকুরমা স্থানীয়ারা তখন বলেন—'ওগো বর এলাম তোমার বাসরে একটা গান গাওনা শুনি। যদি না গান গাইতে পারো, মোর নাতিনের পায়ে ধরো, নইলে মিলবে না ও চাঁদ-বদনী'। বর তখন গান ধরতে পারে—'এসো বধূ মুখের কাছে মধু পান করি গুঞ্জনায়। অধরে অধর মিলায়ে বসনা রসনায়। ভুজপাশে বাঁধ মোরে রাখো হৃদয়ের পরে। এসো প্রেমতরী বাহি ধীরে ধীরে প্রাণ যমুনায়'। তারপর হয়ত গায়—'দিদিমা যতই বলুক, বড় দিদিরা যতই চটুক, কৃষ্ণলীলা

চলতে থাকুক, তোমায় আর আমায়।' বর গান না জানলে মুখ বুজে সকলের অত্যাচার সহ্য করে যায়। এইভাবে রাত্রি অবসানের পর হয় শেজতুলনী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে বরপক্ষের নিকট থেকে অর্থ আদায় করা হয়। তারপর বাসি বিবাহ। কন্যার পিত্রালয়ে আঙিনায় চারটি কলাগাছ পুঁতে তৈরী করা হয় ছাঁদনাতলা বা কলাতলা। এই কলাতলায় বাসি বিবাহের লৌকিক অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে সধবা মহিলারা বর ও কনেকে বসিয়ে তাদের অঙ্গে নানা-প্রকার অঙ্গরাগ মাখান, আমোদ, আহ্লাদ, গীত উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি দেন, তারপর কলস-ভরা জল দিয়ে স্নান করান হয়। এই জল সোহাগ জল। তারপর পুনরায় বিবাহবেশে সুসজ্জিতা কন্যা সাতবার বরকে প্রদক্ষিণ করে। এই সময় কন্যাপক্ষীয়েরা বর ও কন্যার কেশাগ্র একত্র করে দুধ ইত্যাদি দিয়ে ধুয়ে দেন। পরে ধানের শীষ, সুতার পাঁজি, তিল, তুলসী, হলুদ ও কুশ উভয়ের কেশাগ্র স্পর্শ করিয়ে দক্ষিণাসহ তা বরের হাতে দেন। বর আবার তা বধূকে দেন। কোনও স্থানে বিবাহের রাত্রে কুশণ্ডিকার পর এই আচার পালিত হয়। অনুষ্ঠানে সূর্যার্ঘ্য দান করা হয়। কোনও স্থানে কলাতলা প্রদক্ষিণ করার সময় কলাতলে খনিত একটি পুকুরে গাড়ু থেকে জল ঢেলে দেবার রীতি আছে। এইভাবে জল দিয়ে পুকুর ভর্তি করিয়ে দেওয়া হলে সেখানে বর-কনের আংটি লুকানো ও খুঁজে বের করানো খেলা চলে। এই অনুষ্ঠানের পর বর বধূকে নিয়ে নিজ ঘরে যাত্রা করেন। সেখানে বউ পরিচয় হয়। উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, বাজনার মধ্যে বধূকে দুধ ঢালা পাথরের উপর দাঁড় করান হয়। তারপর বর-বধূকে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয় নতুন কাপড়ের উপর দিয়ে হাঁটিয়ে। ঘরের এক কোণে সদ্য তৈরী করা কৃত্রিম ধনাধারের মধ্যে কড়ি লুকিয়ে রাখা হয়। বধূ সেই লুক্কায়িত কড়ি বা ধনরাশি উদ্ধার করে। তারপর বধূকে ঘরের নানা সামগ্রী দেখান হয় এবং তার কানে ও মুখে মধু দিয়ে বাসগৃহে তোলা হয়। দিনের বেলা এসব কাজ করতে হয় কারণ এ রাত্রি কালরাত্রি। কালরাত্রে বরবধূ মিলিত হন না। 'কালরাত্রে যে নারীকে করে পরশন, সেই স্ত্রী দুর্ভাগা হয় না হয় খণ্ডন। হেন স্ত্রী দুর্ভাগা হইল রাজার বিষাদ, কালরাত্রে দোষ হইল এতেক প্রাসাদ।' বিবাহের তৃতীয় দিনে হয় ফুলশয্যা। এই দিনে ফুলের সাজে সজ্জিত বধূর সঙ্গে বরের প্রথম বাধাহীন মিলন হয়। এই দিনেই পাকস্পর্শ বা বৌভাত অনুষ্ঠিত হয়। পাকস্পর্শের পূর্বে বর বধূকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম অন্নবস্ত্র প্রদান করেন। তিনি বধূর সমস্ত জীবনের ভার গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানের ভাত রান্না করেন সৌভাগ্যবতী কোন এয়ো। রান্নার বিষয় থেকে মাছ, মাংস, ডিম, দধি, দুগ্ধ,

পিষ্টক কিছুই বাদ যায় না। শুভক্ষণে বধূ শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনির মধ্যে পিঁড়িতে বসেন, তাঁর সামনে থালায় ও বাটিতে সমস্ত খাবার সাজিয়ে রাখা হয়। স্বামী অন্নের থালা, শঙ্খ, সিঁদুর ও শাড়ি প্রভৃতি বধূর হাতে তুলে দেন। স্বামীদত্ত অন্নব্যঞ্জন বধূ উপস্থিত ছেলেমেয়েদের ভাগ করে খেতে দেন ও পরে নিজে খান। এই পাকস্পর্শের মধ্য দিয়ে বধূকে আপন করে নেওয়া হয়। তারপর নববধূর পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন ও সেখান থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পতিগৃহে পুনরাগমন বা দ্বিরাগমন।

তারপর থেকেই পিতৃগৃহের উপর টান কমতে থাকে কন্যার। তিনি স্বামী ও স্বামীর পরিবারের সকলের কুশল চিন্তায়, সকলের সুখ শান্তি বৃদ্ধির কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। ক্রমে তিনি সন্তানসম্ভবা হন। সন্তান উৎপাদন তাঁর বিবাহিত জীবনের অন্যতম পবিত্র কর্তব্য সমূহের একটি। পুত্রসন্তান প্রসব না করলে নারীর জীবন সুখের হয় না। পুত্র বংশরক্ষা করে, পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ড-জলাদি দান করে। পুত্র সুখী সংসারের পক্ষে অপরিহার্য। এই পুত্রকে আবার বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে।

হিন্দুশাস্ত্রে দ্বাদশপ্রকার পুত্র সন্তানের কথা আছে। এরা হচ্ছে ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন, অপবিদ্ধ, কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনভব, স্বয়ংদত্ত ও সৌদ্র ; কিন্তু কলিযুগে কেবল ঔরস এবং দত্তক পুত্র দায়াদিতে অধিকারী। কিছুদিন পূর্বেও বাঙলার সর্বত্র দত্তক বা পোষ্যপুত্রের বিশেষ সমাদর ছিল। একটি প্রথার মাধ্যমে পোষ্যপুত্র বা দত্তক গ্রহণ করা হত। সাধারণত সন্তানহীন দম্পতি দত্তক রাখতেন। অনেক সময় মেয়ের জনক-জননীরাও দত্তক রাখতেন। তাছাড়া পুত্রকন্যা বর্তমানেও দত্তক রাখা যেত। দত্তক পুত্র সাধারণত আত্মীয়স্বজনের মধ্য দিয়েই নেওয়া হত ; অনেক সময় এর অন্যথাও দৃষ্ট হত। দত্তক বা পোষ্যপুত্র ছাড়া পাতান ছেলেমেয়েও ছিল এবং আছে বঙ্গসমাজে। এই পাতান সম্পর্ক সাধারণত অনুষ্ঠিত হয় একজাতের সঙ্গে অন্যজাতের পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে। বহুবিবাহ প্রথা তো ছিলই। বহুবিবাহ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে বাঙলায়। কৌলীন্যপ্রথার সমাদর থাকার জন্য এ দেশের দুর্দশার কথা বহু পণ্ডিত আলোচনা করেছেন। তাই এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার দরকার নেই। তবুও প্রাচীন-পত্র-পত্রিকা থেকে দু'একখানা চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। বিদ্যাদর্শন ১৭৬৪ শক, ভাদ্র, ৩য় সংখ্যায়, জনৈক পত্রলেখক লিখছেন—'আমি যে

গ্রামে বসতি করিতেছি তথায় অনেক বিশিষ্ট লোকের অবস্থিতি আছে। এবং বহুবিবাহ আমাদিগের গ্রাম্যলোকের একপ্রকার ব্যবসায় হইয়াছে। কুলীন সন্তানদিগের একপ্রকার অভিমান আছে যে বিদ্যাভ্যাস না হইলেও তাঁহারা বিবাহদ্বারা সংসার নির্বাহ করিতে পারিবেন।...আটমাস হয় নাই অষ্টাদশ বৎসর বয়স্কা এক যুবতীর বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু অদ্য একমাসের অধিক ঐ রমণী এক কন্যা প্রসব করিয়াছেন। আমরা শ্রুত ছিলাম দশমাস পূর্ণ না হইলে মনুষ্য স্ত্রীর গর্ভ হইতে সন্তান নির্গত হয় না, কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখিলাম, সাতমাস বিবাহের পরেই একটি অপূর্বকন্যা জননীর কোল আলো করিয়াছে।...কোন এক পল্লিগ্রামস্থ কুলীন বিপ্র পথিমধ্যে একটি বালকের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন পরে আলাপাদি দ্বারা ঐ বালক তাঁহার পুত্র হইলেন, অর্থাৎ কুলীন মহাশয় পূর্বে কোন এক গ্রামে বিবাহ করিয়াছিলেন, ঐ সন্তানটি তাঁহার বিবাহিতা ভার্যার সন্তান বটে কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে কুলীন প্রভু বিবাহের পরে একবারও শ্বশুরবাড়ী গমন করেন নাই। ভার্যাকেও নিজের কাছে নিয়া রাখেন নাই।...গ্রাম্যসমাজে যাঁহারা কুলীনরূপে পূজ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের অহঙ্কার দেখিলে বোধহয় তাঁহারাই বল্লাল সেনের রাজ্যভোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন।' বাঙলার কুলীন সমাজের এই দাপটে বহু পরিবারে নেমে এসেছে ভাঙন, নেমে এসেছে অশান্তি। সাহিত্যিক, সমাজ-ঐতিহাসিক, নাট্যকার প্রভৃতির রচনায় বাঙলার এই ভাঙনের কথা নানাভাবে ধরা পড়েছে। কুলীনদের অত্যাচারে অনেক মহিলাকেই প্রাণবিসর্জন দিতে হয়েছে, অনেককে দিতে হয়েছে সম্মান-সম্ভ্রম বিসর্জন। এই ধরণের মহিলাদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পরিবারেও এসেছে ভাঙন। এসেছে ঘনঘোর অন্ধকার দিন। এই প্রসঙ্গেই তাই জনৈকা বারবণিতার চিঠির উল্লেখ করা যেতে পারে 'আমি শান্তিপুর নিবাসী এক কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা ছিলাম, আমার শৈশব বাল্যক্রীড়ায় যাপন হইয়া যৌবনের প্রারম্ভ হইল, তথাপি পিতামাতা বিবাহের উদ্যোগ করেন না। ইহাতে একদিন আমি প্রতিবাসিনী কোন রমণীর নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া অবগত হইলাম যে তিন বৎসর অপেক্ষাও অল্প বয়ঃক্রমকালীন আমার বিবাহ হইয়াছে। এইবাক্য শ্রবণমাত্র আমি একেবারে স্তব্ধ রহিলাম। ...কোন দিবস অপরাহ্ণে পঞ্চাশৎবর্ষবয়স্ক একজন মনুষ্য আমাদিগের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন...তাঁহার কুৎসিৎ আকৃতি, গলিত অঙ্গ, এবং পক্ক-

কেশাদি দর্শন করিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম।...পরদিন প্রাতঃকালে তিনি আমার পিতার নিকট কিঞ্চিৎ ধনসংগ্রহপূর্বক যে প্রস্থান করিলেন, আর দর্শন হয় নাই।...মাসাবধি দিবারাত্রি কেবল ক্রন্দন করিয়াছি। কিন্তু অবশেষে জ্বালাতন হইয়া ব্যভিচারের পথকে অবলম্বন করিয়াছি। কলিকাতায় আগমনপূর্বক মেছোবাজারবাসিনী হইয়াছি।...' সমাজের অত্যাচারে আরও বহু স্ত্রীলোক আরও অনেক বেশী যন্ত্রণা সহ্য করেছেন, জীবন দিয়েও সর্বত্র তাঁরা তাঁদের পরিবার পরিজনদের রক্ষা করতে পারেন নি। বেঁচে থেকে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেছেন অনেক বিধবা। জনৈক বালবিধবা তার মাকে জিজ্ঞেস করছে—'তুই কেন মা কাঁদিস এত, আমার দিকে চেয়ে? কিসের ব্যথা বাজল বুকে, বল না মাগো বল? সকল কথা লুকাস কেন ধরিস কেন ছল। শ্যামলী গায়ের বাছুর, যেদিন গেছেই যদি মারা। তাইতে কি মা ঘরের কোণে কাঁদিস অমন ধারা? পুষিটা হায়! পালিয়ে গেছে, কাঁদিস বুঝি তাই, সেবারে সে পালিয়ে ছিল তুই তো কাঁদিস নাই।..আর কেন মা দিস না আমার সিঁদুর সিঁথির পরে? লালপেড়ে ওই নতুন শাড়ী রাখলি তুলে ঘরে? সেদিন মাগো দুপুর বেলায় দিলি না চুল বেঁধে, হাতের নোয়া খুললি আমার অমন করে কেঁদে। কালকে মাগো 'বকুলফুলের' বাসরঘরের কাছে, যেতেই মোরে দিল নাকো, ছুঁয়েই ফেলি পাছে। বললে সবাই মুখ খিঁচিয়ে 'তুই এখানি কেন?' হাত ধরে মোর তাড়িয়ে দিল শেয়াল কুকুর যেন।' কৃষ্ণধন বর্ণিত এ কাব্যে যে কোন অতিশয়োক্তি নেই তা বাঙলার সমাজ-ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে নতুন করে বলার দাবী রাখে না। বাল-বিধবাদের দুঃসহ যন্ত্রণা বিদূরিত করার ইচ্ছা নিয়ে তাই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সমাজ নেতৃবৃন্দ কনের বিয়ের বয়স বাড়াতে পরামর্শ দিলেন। বিধবা বিবাহের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চললেন। তাঁরা বললেন, পুরুষ যদি স্ত্রীর মরণান্তর পুনর্বিবাহ করতে পারেন, তবে স্বামীর পরলোকগমনে সক্ষমা নারী কেন পুনর্বিবাহে অনুমতি পাবেন না? কারণ আপনার দুঃখের উপর বিধবার হাত নেই। তাঁর দুঃখ দূর করার উপায় তাঁর অজ্ঞাত। ধর্মের কঠোরতা সে পথ বন্ধ করে দিয়েছে। যদিও অনেক বিধবা দুঃখকে দুঃখ বলে মনে করেন না। ত্যাগ তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। প্রাচীনকাল থেকে তাঁরা ত্যাগের জ্বলন্ত আদর্শের কথা আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। স্বামীহীনা নারী মায়ের আদর পান না। শ্বশুরবাড়ীর

সকলের সেবাযত্ন করাই তাঁর একমাত্র ধর্ম। দেবর, ভাসুর, শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি সকলকে সেবা করে যেতে হয় তাঁকে। এই সেবায় তিনি ক্লান্ত হন না, পীড়িতবোধ করেন না। তাই বৈধব্যকে সুরক্ষিত করতে, বৈধব্য-জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য নানাপ্রকার নিয়ম পালন করারও আবেদন জানানো হয়েছে। যেমন—"কোন পিতা ১৫ বৎসরের পূর্বে কন্যার বিবাহ দিবেন না; (২) এ পর্যন্ত যে সব বালিকার বিবাহ ১৫ বৎসরের পূর্বে হইয়াছে এবং যে সব কন্যা ১৫ বৎসরের মধ্যে বিধবা হইয়াছে উহাদের বিবাহের ব্যবস্থা করা পিতার ধর্ম; (৩) ১৫ বৎসরের বালিকা বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে যদি বিধবা হয় তবে তাকে পুনর্বিবাহের জন্য উৎসাহিত করা পিতামাতার উচিত; (৪) বিধবার প্রতি প্রত্যেক আত্মীয়-স্বজনের ষোলআনা আদরভাব রাখা চাই। মাতাপিতা শ্বশুর-শাশুড়ীর কর্তব্য তাহার জ্ঞানবৃদ্ধির বন্দোবস্ত করা।" সমাজসেবক বহুব্যক্তি এতে সন্তুষ্ট হলেন না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেন। কনের বয়স বাড়াতে বা বিধবাদের প্রতি সম্মান দেখাতেও তাঁরা রাজী হলেন। পক্ষে ও বিপক্ষে তুমুল আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। অবশেষে বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের ফলে ১৮৫৬ সনের ১৬ই জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়। এবং ৬ মাসের মধ্যে, ৭ই ডিসেম্বর শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রথম আইনসঙ্গত বিধবা বিবাহ করেন বাঙলায়। এই বিবাহে কমপক্ষে দু'হাজার লোককে ভূরিভোজে আপ্যায়িত করেন শ্রীশচন্দ্রের শাশুড়ী লক্ষ্মীমণি দেবী। বিবাহে যথারীতি স্ত্রী-আচারাদি অনুষ্ঠিত হয়। নৃত্যগীত, বাদ্যাদিরও ব্যবস্থা ছিল। শ্রীশচন্দ্রের মা বিধবা বিবাহের কথা শুনে নাকি ছুরি হাতে করে বসেছিলেন, পুত্র বিধবা বিয়ে করলে সেই ছুরি দিয়ে নিজে নিজেকে খুন করবেন। বিবাহের পর অবশ্য এই অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হয় না দম্পতিকে। ক্রমে অনেক বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু অচিরেই বিধবা বিবাহের নেতৃবৃন্দকে নানাভাবে বিব্রত হতে হয়। শেষ অবধি বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বিরক্ত ও হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তাই তিনি তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন—"আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে, আমি কখনই বিধবা বিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না"। অশিক্ষিত গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অর্থের বিনিময়ে নানাভাবে আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন। এই প্রসঙ্গে ভাস্কর

সম্পাদক ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৮৫৬ সনে লিখেছিছেন—"এদেশে ফোঁটাকাটা ভট্টাচার্য্য অনেক প্রকৃত পণ্ডিত অধিক নাই।" এই কারণেই বিধবা বিবাহ আইনের স্বীকৃতি পেলেও লোক সমাজের স্বীকৃতি পেল না। বিধবা বিবাহকে এখনও স্বাগত জানাতে পারে না লোক সমাজ। তাই বাঙালী হিন্দুসমাজে বিধবাদের অভাব নেই। বয়স্কা বিধবা প্রায় সমস্ত সংসারেই কর্তৃত্ব করে থাকেন, কিন্তু যুবতী বা অপরিণত বয়স্কা বিধবা এখনও অনেকস্থলে সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নানাভাবে তাদের উস্কানো হয়। অনেক ক্ষেত্রে উপপত্নী হিসাবে অনেক বিধবাকেও ব্যবহার করা হয়, ব্যবহার করা হয় স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাকেও। কিন্তু প্রায়শই তাদের প্রথাসিদ্ধ বিবাহের আইনে বেঁধে ফেলা হয় না। স্বামী পরিত্যক্তা বিবাহ বন্ধন ছেড়ে দেন না বা দিতে পারেন না এখনও অনেকক্ষেত্রে; কিন্তু ইচ্ছায় হোক কি অনিচ্ছায় হোক অনেকক্ষেত্রে তাঁদের অনেককে অন্য পুরুষের সান্নিধ্যে আসতে হয়। আসতে হয় বিধবাদেরও। অলিখিত এবং সামাজিক রীতিনীতি বহির্ভূত এই আচরণ বাঙলার বহু গ্রামে এখনও দৃষ্ট হয়। শহরে তাদের আচরিত ঢঙটি স্বভাবতই মার্জিত।

বাল্যবিবাহ প্রথা লুপ্ত হবার ফলে দ্বিতীয় বিবাহ অনুষ্ঠান আর অনুষ্ঠিত হয় না। বাল্যবিবাহে রজোদর্শনের পূর্বেই কন্যার বিবাহ হত। ফলে বিবাহের পর অনুষ্ঠেয়-প্রথম রজোদর্শনের উৎসব বা দ্বিতীয় বিবাহ এখন আর অনুষ্ঠান করার সুযোগ হয় না। কারণ এখন কনের রজোদর্শনের বা বারো বৎসরের অনেক পরেই বিয়ে হয়ে থাকে। দ্বিতীয় বিবাহের একটি অনুষ্ঠানের প্রথা সংগৃহীত হয়েছে চব্বিশ পরগণা জেলার ছোটকালিকাপুর গ্রাম থেকে। এই অনুষ্ঠানে বিজোড় বা তিন, পাঁচ, সাত প্রভৃতি এয়োস্ত্রীরা পাড়া থেকে আতপ চাউল ভিক্ষা করে আনবে ঋতুমতীর খাবার তৈরী করতে। সে খাবার আলুনী ও নিরামিষ। রজোদর্শনের প্রথম চারদিন বধূ একবস্ত্রে অস্নাত অবস্থায় আলাদা ঘরে থাকবে। পঞ্চম দিবসের ভোর থেকে অনুষ্ঠান সুরু। এই উপলক্ষে বাড়ীর উঠোনে একটা বড় গর্ত খোঁড়া হয় কাদামাটি করার জন্য। পাড়ার এয়োস্ত্রীরা ঘাট থেকে জল এনে গর্তে ঢালেন ও কাদামাটি তৈরী করেন। ওদের মধ্য থেকে দু'জন এয়োস্ত্রীর একজনকে রাজা বানান হয়, অপর জনকে রাণী। এই রাজারাণীকে কেন্দ্র করে চলে নানা অশ্লীল ও যৌনবিষয়ক সঙ্গীত। অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ মেয়েলী। এখানে ছেলেদের প্রবেশাধিকার থাকে না। অনুষ্ঠানের উপকরণ দুটি লাল সরাকে চিৎ-ওপর করে

রাখা হবে তার ভিতরে থাকবে অশির ডাব। সেটাকে লাল সুতো দিয়ে বাঁধা হবে। তারপর সেটা ঋতুমতী নারীর কোলে বসিয়ে দেওয়া হবে। সরা দুটি গর্ভের এবং ডাব সন্তানের প্রতীক। এই অনুষ্ঠানে নাচ ও গানের সঙ্গে চরকার কথা জড়িয়ে আছে। চরকা কাটা ও তাঁতবোনা তখন মেয়েদের এক্তিয়ারে ছিল। ছিল চাষের কাজও। কিন্তু চাষের কাজ চলে গেছে পুরুষদের কাছে। মেয়েরা তখন নিল বুননের কাজ। খাওয়ার ও পরার জন্য পুরুষ জোগাচ্ছে ধান, মেয়ে জোগাচ্ছে কাপড়। তাই বিয়ের গানে তাঁতের আমদানী। অবশ্য কাপড়ের মত করে সংসারকে চমৎকার ভাবে বুনে তোলার জন্যও তাঁতের গানের প্রয়োজনীয়তা আছে। এ গানের নমুনা—'চলগো যাই সে মহাজনে, তার নাম সাধু বেনে। তার দোকানের সূতো ভাল। কম দেয় না ওজনে, ও দিদি কাঁদিস নে, কাটিস নে, কাটনা ছাড়িস নে। কাটবি সূতো অবিরত, রবিসূতোর কারণে।' রবিসূতো মানে সূর্য সন্তান। সাজান রাজা ও রাণীকে ঘিরে এই গান। অনেক জায়গায় এসময় নাচও চলে। তারপর শুভদিন দেখে ঋতুমতীর পুনরায় বিয়ে হত দিনের বেলায়। প্রাচীন-কালে বিয়ে দিনেই হত। গর্ভাধান সংস্কার ও নানাবিধ অনুষ্ঠানেও আছে মহিলা সমাজের একাধিপত্য। প্রত্যেকটি সংস্কারেরই কিছু না কিছু উদ্দেশ্য আছে। বিবাহ সংস্কারে এবং তদঙ্গীভূত পতি-পত্নীর একান্ত সংযোগের প্রভাবের ফলে পত্নীর স্বতন্ত্র সত্তা লুপ্ত হয়ে যায়। পত্নী পতির সঙ্গে অর্থাৎ উভয়ের পারিবারিক নাম ও গোত্র এক হয়ে যায়।

প্রাচীনকালে সন্তানসম্ভবা নারী মাথার চুলের মাঝে সিঁথি কাটতেন না। চুলগুলো একত্র করে খোঁপা বাঁধা হত। স্বামী সজারুর কাঁটা এবং বেনামূলের চিরুনী দিয়ে ষষ্ঠ মাসে গর্ভিনী স্ত্রীর চুলে প্রথম সিঁথি কেটে দিতেন। প্রাচীন সংস্কার—গর্ভাধান, পুংসবন এবং সীমন্তোন্নয়ন। এই তিনটিকে বলা হয় গর্ভ-সংস্কার বা গর্ভাবস্থায় আচরিত সংস্কার। জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামন, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ এবং উপনয়ন এই ছয়টি শৈশব এবং বাল্য সংস্কার; এবং গুরুগৃহে বাস, বেদপাঠ, সমাবর্তন, ও গোদান যৌবন সংস্কার; গৃহাশ্রম, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, বৃদ্ধদের সংস্কার। বর্তমান কর্ণভেদ, উপনয়ন, বেদারম্ভ ও সমাবর্তন এই চারটি সংস্কার উপনয়ন সংস্কারের সঙ্গে মিশে গেছে। বিবাহের পরেই গৃহাশ্রম সংস্কারের বিধান। এই সংস্কারের পদ্ধতি আছে। যেমন দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্যাগ্নি, আবহনীয় অগ্নি স্থাপনাদি। প্রাচীন ষোড়শ সংস্কার বহুদিন পূর্বেই দশম সংস্কারে পরিণত হয়েছিল। এখন দশম সংস্কারের মধ্যেও

অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ও বিবাহ ছাড়া অন্যান্য সংস্কার নামমাত্র চালু আছে। তৎকালে চলিত আচারও লৌকিক আচার আচরণের সঙ্গে মিলেমিশে স্থানীয় এবং আঞ্চলিক হয়েছে। তাই প্রাচীন সীমন্তোন্নয়ন এখন সাধ খাওয়ার মধ্যে পরিণত হয়েছে, প্রথম গর্ভবতীর পাঁচ, সাত ও নয় মাসে সাধ ভক্ষণের নিয়ম। মুসলমান সমাজেও এই সংস্কার আছে। তারা একে বলে রসম। তাদের বিয়ে শাদী বা নিকা এবং বিবাহবিচ্ছেদ হচ্ছে তালাক। তাদের মতানুসারেও হায়েজ বা ঋতুমতী নারীর সঙ্গে সহবাস ইসলাম মতে হারাম। এই সময় নারী নামাজ পড়তে পারে না। রোজা রাখতে পারে না। মসজিদে যেতে পারে না। কোরাণশরীফ পাঠ বা স্পর্শ করতেও পারে না। যদি কেউ এই সময় সহবাস করে তবে দরিদ্র হলে তার শাস্তি দিনরাত আস্তাগফার পড়া এবং ধনবান হলে তাকে এক বা অর্ধ দিনার কাফান দিতে হবে। এক শ্রেণীর শাক্ত নাকি এই সময়ই নারীতে লিপ্ত হতে অভিলাষী। প্রসবান্তে রেহেম হতে যে রক্ত নির্গত হয় তা নেফাছ। নেফাছ চল্লিশ দিনও স্থায়ী হতে পারে। হায়েজের জন্য বর্ণিত নিয়ম নেফাছ সম্পর্কে প্রযোজ্য। এই সময় যে নয়টি নিয়ম পালন করতে হয় মুসলমান স্ত্রীলোককে তা হচ্ছে—নামাজ পড়বে না, তারে কাজাও পড়বে না, রোজা রাখা হারাম কিন্তু কাজা করবে, মসজিদে যাওয়া হারাম, কাবা শরীফের তওয়াফ হারাম, কোরাণ পাঠ হারাম, কোরাণ স্পর্শ হারাম, কোরাণশরীফ শিক্ষা হারাম, সহবাস করা হারাম, হায়েজ বা নেফাছ বন্ধ হয়ে গেলে গোসল করা ফরজ। ঋতুমতী সেজদায় আয়েত শুনলে তাকে সেজদা করতে হবে না। তাছাড়া সমস্ত স্ত্রীলোককে তাদের পুরুষ বিয়ে করতে পারে না। শরীয়তে যে যে মেয়ে বিয়ে করা হারাম তারা হচ্ছেন—মা, বোন, দাদি বা ঠাকুরমা, পিসি বা ফুফু, দিদিমা বা নানী, মাসী বা খালা, শাশুড়ী, স্ত্রী বর্তমানে কোন শালী, মেয়ে, ভাই ঝি বা ভাতিজী, ক্রীতদাসী বা বাঁদী, অগ্নি-পূজক, প্রতিমা পূজক, বিবি বর্তমানে বাঁদী, নিজে যাকে তালাক দিয়েছে তহলিল না করে এমন স্ত্রীলোক, অন্যের সধবা স্ত্রী প্রভৃতি। এর অন্যথা শরীয়ত বিরোধী কাজ। কোন ধর্মভীরু মুসলমান শরীয়তী শাসনের বিরুদ্ধে কোন আচরণে উৎসাহ বোধ করেন না।

বাঙালী হিন্দু সমাজ যেমন বিয়ের ব্যাপারে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রাদি থেকে স্থানীয় প্রভাবে দূরে সরে এসেছে তেমনি বাঙালী মুসলমান সমাজ লোকপ্রভাবে কোরাণ শরীয়ত শাসিত বিবাহ রীতির সঙ্গে স্থানীয় রীতি মিশিয়ে ফেলেছে। উর্বরতা বৃদ্ধিকল্পে যাদুবিদ্যার আমদানী সেখানেও হয়েছে। আঁতুড় ঘরের

শিশুর শিয়রে লোহার জিনিস রাখা, গর্ভাবস্থায় আস্ত কুমড়ো না কাটার বিশ্বাসের মধ্যে, নতুন কাপড় পরার আগে সে কাপড়ের সুতো অগ্নিকে নিবেদন করার মধ্যে চুল আঁচড়াবার পর চিরুণীর চুল থুথু দিয়ে ফেলে দেওয়ার মধ্যে যাদুচিন্তা বিদ্যমান। প্রসূতির কষ্ট লাঘব করার জন্য বিড়ালের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা, গর্ভবতী নারীর শ্মশান, গোবস্থান বা বাড়ীর পিছনে না যাওয়া, এবং দুপুরে বা রাত্রে একা না বের হওয়া, বের হলেও চুলের সঙ্গে একটা রক্তজবা, কোন ফুল প্রভৃতি বেঁধে নিতে হয় অমঙ্গল এড়াবার জন্য। সূর্যগ্রহণ-চন্দ্রগ্রহণের সময় কোন জিনিস কাটতে মানা, খেতে মানা, শিলনোড়া, ধামা, ঢেঁকির উপর বসা মানা, ফলবতী গাছ কাটা মানা, তেল সিঁদুর পরে রাস্তায় যাওয়া মানা, গেরো দেওয়া মানা, আঁতুড় ঘরে ঘোমটা দেওয়া মানা, কবর বা শ্মশান ডিঙানো মানা, গরু ডিঙ্গানো মানা, বিড়ালমারা মানা, সকাল-সন্ধ্যায় খালি কলস দেখা মানা, এজাতীয় নানা নিষেধের মধ্যে দিনাতিপাত করতে হয় গর্ভবতীকে। সন্তানবতী কিছু খেতে চাইলে তা খাওয়াতে হবে। রাতে ভাত খাওয়ার পর তিনবার চাঁদের দিকে তাকিয়ে কুলি করলে চাঁদের মত সন্তান হবে। দু মাসের পোয়াতী হাঁসের ডিম খেলে সন্তানের চোখ বড় হবে। প্রসবের পর প্রসূতিকে কুলোর মধ্যে কলা পাতা বিছিয়ে ভাত খেতে দেওয়া হয়। লবণ, গোলমরিচের গুঁড়ো, ঘি প্রভৃতিও দেওয়া হয় খেতে। রসুনের কোয়া, পেঁয়াজ পোড়াও খাওয়ার নিয়ম। আঁতুড় ঘরে ঢুকতে হলে আগুনে হাত পা সেঁকে ঢুকতে হয়। আঁতুড় ঘরে শিশু জন্মের পর অনেকে সেই ঘরে বা বাইরের দিকে গোমুণ্ড রাখেন। এই গোমুণ্ড ষষ্ঠীর প্রতীক। তৃতীয় দিনে প্রসূতি স্নান করে, পঞ্চম দিনে আবার তাকে স্নান ও নখ কাটাতে হয়। পাঁচ ঠাকুরের হাত থেকে নবজাতককে রক্ষা করার জন্যই পঞ্চবৃত্ত, ষষ্ঠ দিবস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দিনে মা ষষ্ঠীর পূজা দিতে হয়, ষষ্ঠী শিশুর রক্ষক। এই দিনে বিধাতা পুরুষ শিশুর কপালে অদৃষ্টলিপি লিখে দিয়ে যান। বিধাতা পুরুষ কালি-কলম সঙ্গে আনেন না তাই আঁতুড় ঘরের প্রবেশ পথে দোয়াত ও খাগের কলম রাখতে হয়। শিশুর আট দিন বয়সে আটকৌড়িয়া উৎসব। এই উৎসবে গাঁয়ের বালক বালিকারা কুলো ঘুরাতে ঘুরাতেও হাততালি দিতে দিতে বলে 'আটকৌড়ি বাটকৌড়ি, খোকা কি ভাল আছে?' ছেলেমেয়েদের ধামাভর্তি মুড়ির মোয়া খেতে দেওয়া হয়। কে আগে মোয়া নেবে তার জন্য হুড়াহুড়ি কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। এই মোয়া খেতে খেতে তারা অনেকক্ষণ আঁতুড় ঘরের চারিদিক প্রদক্ষিণ করে আর পাহারা দেয় যাতে কোন অমঙ্গলদেবতা শিশুর ঘরে ঢুকতে না পারে।

গ্রামের আলোচনায় এ সম্পর্কে আরও বিস্তৃত বিবরণ আছে। গো-মুণ্ড-প্রতীক ষষ্ঠীকে পুজো দেওয়া হয়। অনেক স্থানে সপ্তম দিবসে সপ্তঋষির পূজা দেওয়া হয়। আটকৌড়ি উৎসবের একটি বিবরণ আছে চৈতন্য-চরিতামৃতে—'আটকলাই আটকলাই নিমাঞি আছ ভালে। মাএর কোল জুড়াইয়া রহ বাপের কোলে। কহি কহি শিশুগণ ঘন আইসে জাএ। কোলে করে শচীদেবী নিমাঞি আনিল। আনন্দে আকুল শিশু নিমাঞি দেখিল। ভাজাভুজা দিয়া সব শিশু-মন পূরে। প্রতিজনে কপর্দক দিল ত প্রচুরে।' আটকৌড়ির পরের দিন বা নবম দিবসে হয় নব্যনপ্ত্য। পরে একুশ দিনের দিন অশৌচ দূর হয়। অনেকে একমাস অশৌচ পালন করেন। অশৌচ কালে নারী অপবিত্রতা হেতু কোন ধর্মকর্ম সম্পাদন করতে পারেন না। ক্রমে সন্তান বড় হয়। সন্তান ছেলে হলে অন্নপ্রাশন হয়, মেয়েদের বেলায় বড় একটা অন্নপ্রাশন হয় না। অন্নপ্রাশন মানে আনুষ্ঠানিক মুখে ভাত, সাধারণত মাতুল ভাগ্নের মুখে ভাত দিয়ে থাকেন।

অন্নপ্রাশনের পরেই উপবীত ধারণ করেন ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। এ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণভাবেই শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান। দুষ্ট প্রকৃতির লোকেদের দমন করার উদ্দেশে পরিকল্পিত আরেকটি অনুষ্ঠান বলিদান প্রথা। তরি-তরকারী, ছাগ-মহিষাদি বলির প্রথা এখনও আমাদের সমাজে চালু আছে। হিন্দুর বলি আর মুসলমানদের কোরবানী জীব উৎসর্গ জাতীয় আচরণ। কোরবাণীর কতগুলো নিয়ম আছে। যেমন দোম্বা উট, গরু, মহিষ কিংবা ভেড়া, বকরী প্রভৃতি কোরবানী করা সিদ্ধ। দোম্বা ছ' মাসের কম না হয়, ছাগল, ভেড়া এক বৎসরের কম না হয় তা দেখা উচিত। কোরবানী পশুর শিঙ না থাকলে চলবে কিন্তু শিঙ ভাঙ্গা হলে চলবে না। অন্ধ বা খোঁড়া পশুও চলবে না। রাতে কোরবানী দেওয়া মকরুহ। সম্ভব হলে কোরবানী যিনি দিচ্ছেন তিনি নিজ হাতে জবেহ করবেন। কোরবানীর মাংস তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজে, এক ভাগ আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ও অবশিষ্ট ভাগ দীনদরিদ্রের মধ্যে বণ্টন করতে হয়। হিন্দুর বলি এবং মুসলমানের কোরবানীর মধ্যে মৌল তফাৎ আছে। কিন্তু বলির হত্যায় যে পাপ হয় না এ সম্পর্কে উভয় সম্প্রদায়ই বোধহয় একমত পোষণ করেন। পোষণ করেন বলেই নির্বিচারে বলি বা কোরবানী দিয়ে যান তাঁরা। ছাগ-মহিষাদি বলি প্রসঙ্গে নরবলির কথাও এসে পড়ে। পুণ্য অর্জনের জন্য নরবলি প্রথা চালু ছিল প্রাচীন ভারতে। বহুদিন পূর্বে এ প্রথা রদ হয়ে যায়, তথাপি মাঝে মাঝে ভারতের নানাস্থান থেকে নর-

বলির সংবাদ পাওয়া যায়। কিছুদিন পূর্বেও রাজস্থানে একটি নরবলি অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে বলে সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তারও আগে মধ্যপ্রদেশের বাস্তার অঞ্চল থেকে নরবলির সংবাদ এসেছে। ঐতিহাসিকেরা আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে বৈদিকযুগে এ দেশে নর-বলি প্রথা ছিল না, যজুর্বেদ ও পরবর্তী ব্রাহ্মণ গ্রন্থে যে পুরুষমেধ যজ্ঞের উল্লেখ আছে তা ছিল এক এক দেবতার নামে এক একজন পুরুষকে উৎসর্গ করে ছেড়ে দেওয়া। প্রাচীন শাস্ত্রে বিভিন্ন দেবতাকে আহ্বান করে তাদের প্রত্যেকের জন্য এক একটি বলির বিধান আছে। যেমন ব্রহ্মার জন্য পুরোহিত, নদী দেবতার জন্য ধীবর প্রভৃতি। এই বলির অর্থ যজ্ঞের উৎসর্গ, শিরোচ্ছেদ নয়। বেদপরবর্তী যুগে নরবলি হিন্দুধর্মের একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। জৈন ও বৌদ্ধধর্ম এই প্রথার বিরোধিতা করে। ভগবান তথাগত একবার নৃপতি বিম্বিসারকে বুঝিয়ে বলেছিলেন যে শত শত মূক পশুকে দেবতার নামে বলি দিলে পুণ্য অর্জন হয় না। বিম্বিসার নাকি তথাগতের অহিংসার বাণী গ্রহণ করেছিলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞের প্রাক্কালে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন, জরাসন্ধ শত শত নৃপতিকে ধরে এনে বন্দী করে রেখেছে পশুপতির মন্দিরে বলি দেবার জন্য। পরে ভীম জরাসন্ধকে হত্যা করেন এবং কারারুদ্ধ নৃপতিদের উদ্ধার করেন বলে উল্লেখ আছে।

ক্রমে ক্রমে নরবলি ধর্মের একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। চণ্ডিকা এবং কালীর কাছে নরবলি দিয়ে পূজা হত তখন যখন নরবলি প্রচলিত ছিল। কালিকাপুরাণে বলা হয়েছে যে নরবলি পেলে মহাদেবী সহস্র বৎসর তুষ্টা থাকেন। কালিকাপুরাণে এও বলা হয়েছে যে সংসারের কেউ পীড়িত বা ব্যাধিগ্রস্ত হলে, অবিবাহিত পীড়িতের মাতা ও বিবাহিতের স্ত্রী নিজের রক্ত দিয়ে দেবীকে তুষ্টা করলে রোগ নির্মূল হয়। শৈব অঘোরীরাও কোন কোন ক্ষেত্রে শিবকে তুষ্ট করতে নরবলি দিতেন। বাঙলাদেশের নানাস্থানে স্বামীর বা সন্তানের মঙ্গলের জন্য জননীর রক্ত নিবেদনের প্রথা চালু আছে। রোগীর মাতা অথবা স্ত্রী পুত্র বা স্বামীর রোগমুক্তির জন্য, মঙ্গল কামনার জন্য দুর্গা-মহাষ্টমী বা কালী পূজোর দিনে দেবীকে খুশী করতে বুক চিরে রক্ত দেন নারী। রক্তদাত্রী ভক্তিগতচিত্তে প্রতিমার সামনে বসেন, তখন নাপিত এসে নরুণ দিয়ে গলার নীচে চিরে রক্ত বের করে একটি বিল্বপত্রে উপহার দেয়। পুরোহিত সরক্তবিল্বপত্র মাতৃকার উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন। দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য বলির ব্যবস্থা। আর তুষ্ট করা

মানেই হল যে পূর্বে তিনি রুষ্ট হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'দেবতার গ্রাস' কবিতায় রাখালকে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিয়েছেন তার মায়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। একের পাপের প্রায়শ্চিত্ত অপরকে করতে হয়েছে এমন অনেক উদাহরণ ছড়িয়ে আছে বাঙলার ঘরে ঘরে। মানুষ জীবনের বিপর্যয়কে দেবতার অভিশাপ বলে গ্রহণ করে তাই এই ধর্মান্ধতার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। এ ভাবে জড়িয়ে ফেলার মধ্যে প্রকাশিত হয় চাওয়া এবং পাওয়া। নরবলি থেকে এসেছে নারী বলি। নারী বলি বলতে আমরা সতীদাহকে বোঝাতে চেয়েছি। সতীদাহও একপ্রকার বলি। এ প্রথায় জীবন্ত মানুষকে তার ইচ্ছানুসারে বা অনিচ্ছায় পুড়িয়ে মারা হত। আমরা যতই নারী স্বাধীনতার কথা বলি না কেন, এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে নারী কোনদিনই পুরুষের কাছে তার যোগ্য মর্যাদা পায় নি। চিরদিনই নানা কৌশলে পুরুষ নারীকে দমিয়ে রেখেছে। অবশ্য এ মতের বিরোধীরা বলতে পারেন, পুরুষের প্রতীক শিব শক্তির পায়ের তলায় বুক পেতে দিয়েছেন, নিজের শক্তি খর্ব করে দেবীর শক্তির প্রমাণ দিয়েছেন। কুমারী পূজার মধ্যেও নারীকে উচ্চাসনে বসাবার কথা ঘোষিত। কিন্তু এই গৌরী পূজা গ্রহণের পর বাড়ী ফিরতে দেরী করলে কুমারী শুনবে অশালীন কথা। শুনবে— 'বুড়োধাড়ী মেয়ে, আক্কেল নেই। আজ বাদে কাল শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে না, ধেই ধেই করে এ বাড়ী ও বাড়ী নেচে বেড়াচ্ছিস। আর তোকে বের হতে দেওয়া হবে না'। আরও কত কি! এ ছাড়াও নারীর আছে বৈধব্যের অভিশাপ, সন্তানহীনার যন্ত্রণা। প্রাচীনযুগে বিধবা সমস্যা সমাধান হত সতীপ্রথায়, স্ত্রীকে স্বামীর সঙ্গে সহমরণ। এই সেদিন অবধি অর্থাৎ ১৮২৯ পর্যন্ত এই প্রথা চালু ছিল বাঙলায়। স্বামীর অপমানে দক্ষকন্যা, শিবপত্নী সতী দেহত্যাগ করেন। স্বামীর জন্য দেহত্যাগের নাম তাই সতীপ্রথা। অবশ্য সতীর দেহত্যাগ হয়েছিল স্বামীর জীবিত অবস্থায় এবং সতীপ্রথায় স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রীকে সহমরণে যেতে হত। মৃত্যু প্রাণী জগতের চিরবিভীষিকাময়। মৃত্যুতে কামনা বাসনার সব শেষ! কামনা-বাসনার দ্বার রুদ্ধ করে যে মৃত্যু দাঁড়িয়ে আছে, তাকে ডিঙ্গিয়ে আরেকটা কামনা-বাসনার রাজ্য তৈরী করতে হলেই এসে পড়ে ধর্ম, এবং এই ধর্মকে ঘিরে সংস্কার, কুসংস্কার, আচার, আচরণ। জনৈক আইনজ্ঞ আচারকে মেঠো পথের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

তিনি বলেছেন, মাঠের মাঝে পায়ে চলার পথ কার দ্বারা কখন কি ভাবে তৈরী হল কেউই বলতে পারে না। অনেকদিন চলতে চলতে মানুষ দেখতে পায় সুন্দর একটা পথ সৃষ্টি হয়ে গেছে। এমনি করেই একদিন বঙ্গসমাজে এল নারীহনন প্রথা সতীদাহ। ঋগ্বেদে এ প্রথার উল্লেখ নেই। পরন্তু গৃহ্য-সূত্রে আছে চিতার উপরে শায়িতা বিধবাকে তার দেবর ধর্মপালন এবং পুত্র উৎপাদনের জন্য হাত ধরে তুলে এনে বৌদিকে বিয়ে করত, অথবা পুত্রদান করত নিয়োগ প্রথা মারফত। আমরা এও জানি যে পাণ্ডু যখন মারা যান তখন কুন্তী ও মাদ্রীর মধ্যে নানা যুক্তিতর্ক চলে ছিল। পাণ্ডুরাজার উপর অভিশাপ ছিল যে তিনি নারী-সংসর্গ করতে গেলেই মারা যাবেন। এদিকে তিনি মাদ্রীর রূপে এতই আকৃষ্ট হয়ে পড়েন যে সংযম রক্ষার্থে ব্যর্থ হন। মাদ্রী-রমনে পাণ্ডুরাজের মৃত্যু হয়। তখন কুন্তী ও মাদ্রীর মধ্যে কথোপকথন হয় কে সহমরণে যাবেন। কুন্তী বললেন—'অহং জ্যেষ্ঠা ধর্মপত্নী জ্যেষ্ঠং ধর্মফলং মম ; অবশ্যং ভাবিনো ভাবাত্মা মাং মাদ্রি নিবর্তয়' ইত্যাদি। আর মাদ্রী বললেন—'অহমেবানুযাস্যামি ভর্তারমপলায়িনম। নহি তৃপ্তাস্মি কাম্যমাং জ্যৈষ্ঠা মামনুমন্যতাম। মাং চাভিগম্য ক্ষীণোঽয়ং কামান্তরতসত্তমঃ। তমুচ্ছিন্দ্যামস্য কামং কথং নু যমসদনে', অর্থাৎ যম-লোকে গিয়েও স্বামী তার স্ত্রীকে সম্ভোগ করতে পারে এমত আশা এখানে প্রকাশ পেয়েছে। মহাভারত ও রামায়ণে এই ধরণের যে সব সতীপ্রথার উল্লেখ আছে পণ্ডিতেরা প্রমাণ করেছেন সে সব প্রক্ষিপ্ত। মনুসংহিতায়ও সতীপ্রথার উল্লেখ নেই। কিন্তু মনুসংহিতা রচনার তিনশত বৎসরের মধ্যেই সতীপ্রথা ধীরে ধীরে তার শিকড় সমাজের স্তরে স্তরে চালিয়ে দিতে থাকে। যখন সতীপ্রথা চালু হল তার পূর্বেই 'নিয়োগ' প্রথা বন্ধ হয়ে পড়ে। দেবরেরা বৌদিকে নিয়ে সুখী হত না, বৌদি-সতীনকে ঘিরে সংসারে দারুণ অশান্তি দেখা যেত। নানাকারণে ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে সতী-প্রথার জয়গান গাওয়া হয়। মুসলমান আমলে এ প্রথা খুবই বিস্তার লাভ করে। নবাবেরা এ প্রথায় বিরক্তি প্রকাশ করতেন কিন্তু অন্যের ধর্মের ব্যাপারে সোজাসুজি হস্তক্ষেপ করতে রাজী হতেন না। আকবর ও জাহাঙ্গীর এ প্রথা নিবারণের জন্য তৎপর হন। পর্তুগীজরা আইন করে এ প্রথা বন্ধ করে দেন ১৫১০ সনে। এবং ১৮২৯ সনে লর্ড বেণ্টিঙ্ক এদেশ থেকে সতীপ্রথা উঠিয়ে দেন আইন করে।

নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে জীবন এগিয়ে চলে। ক্রমে আসে জরা,

আসে মৃত্যু। এই মৃত্যুর পরেও আছে কৃত্য। মৃত্যুর পর হিন্দুর শবদেহ দাহ করা হয়। মুসলমানরা কবরে গোর দেন।

ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান মৃত্যুর সংবাদ শোনামাত্র উচ্চারণ করবেন 'ইন্না লিল্লাহে-অ-ইন্না এলাই হে রাজেউন' অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমরা সকলে আল্লাহরই জন্য। এবং আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করব। এই সময় হিন্দু হরিবোল হরিবোল প্রভৃতি বোল দেওয়া ছাড়া কীর্তনাদি করতে পারেন। গোরস্থানে গিয়েও মুসলমান দোয়া পড়েন। বলেন— 'আচ্ছালামো আলায়কুম ইয়া আহলাল কুবুরে ইয়াগ ফেরুল্লাহো লানা অলাকুম আনতুম ছালাকুনা অনাহ্‌নো বিল আছরে' অর্থাৎ হে কবর-বাসীগণ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। আল্লাহ তোমাদের ও আমাদের ক্ষমা করুন। তোমরা আমাদের অগ্রগামী, আমরা তোমাদের পশ্চাৎগামী। মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য মুসলমান সমাজে রুকুসেহদা ও তকবিরে নামাজ বা জানাহ নামাজ পাঠের ব্যবস্থা আছে। এমাম ও মোক্তাদিগণ সালাম উচ্চারণ করেন। মোরাদকে কবরের মধ্যে ঢোকাবার আগে খাট কবরের পশ্চিম দিকে নামিয়ে রাখতে হয়। মোরাদ স্ত্রী হলে তাকে কবরে ঢোকাবার আগে পরদা করতে হয়। মেয়েদের কবরে মাথার দিকের বিছানা ভাল ও ছেলেদের কবরে পায়ের দিকের বিছানা ভাল হওয়া দরকার। স্ত্রীলোকদের কবরে ঢোকাবেন এমন পুরুষ যাদের সঙ্গে তার বিবাহ হারাম। এ ধরণের কোন আত্মীয়ের অভাবে কোন বৃদ্ধ তাকে কবরে নামাবেন। কোন অবস্থায়ই স্বামী স্ত্রীর শবদেহ ছুঁতে পারেন না। শবের কপালে কিম্বা কাফনে কিছু খোদাই করা যাবে না। কিন্তু 'বিসমিল্লাহে ওয়া আয়া ঝিল্লাতে রাছু-লিল্লাহে' ধ্বনিযুক্ত দোয়া পাঠ করা যায়। মৃতের শান্তির জন্য কবর জেয়ারত করতে দোষ নেই। তবে জুম্মাবারে, শবেবরাত রাত্রে, ঈদল ফেতরের দিনে, ঈদুজ্জোহার দিনে কবর জিয়াত করা পুণ্যের। হিন্দু সমাজেও আছে সংকারের নানা আচরণ, আছে শ্রাদ্ধ। হিন্দু সমাজে শ্রাদ্ধ বিশেষ জনপ্রিয়।

প্রাচীনকালে নানা সময় নানা শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের নিয়ম ছিল। মরণোত্তর শ্রাদ্ধ, সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধ, তীর্থযাত্রা, গৃহপ্রবেশ, নবান্ন, সন্তানোৎসব প্রভৃতি উপলক্ষে শ্রাদ্ধ শাস্ত্রবিহিত ছিল। বর্তমানে মৃত্যুর পরের শ্রাদ্ধই জনপ্রিয়। তথাপি বিবাহ, নবান্ন, মহালয়া উৎসবেও শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে হিন্দু

সমাজে। মৃতাশৌচ সমাপ্তির দিনের শ্রাদ্ধ আদ্যশ্রাদ্ধ বা মৃতের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ শ্রাদ্ধ।

মৃতের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাপূর্বক দান থেকে শ্রাদ্ধ শব্দের উৎপত্তি। পিতৃপুরুষের প্রতিনিধি হিসাবে তাই ব্রাহ্মণ-দানের ব্যবস্থা। এই প্রতিনিধি মারফত পিতৃগণ দেয় বস্তুসমূহ গ্রহণ করে তৃপ্তি পান। আদ্যশ্রাদ্ধের সঙ্গে আমিষান্ন প্রদান করা হয় পুরুষ ও সধবা নারীর ক্ষেত্রে। বিধবাদের ক্ষেত্রে কাঁচাকলা পোড়া দেবার রীতি আছে। ভূমি, আসন, জল, বস্ত্র, প্রদীপ, অন্ন, পান, গন্ধদ্রব্য, মালা, ফল, শয্যা, পাদুকা, গরু, স্বর্ণ, রৌপ্য, কলস প্রভৃতি দেবার নিয়ম বা যথাক্রমে ষোড়শদান, ছয়দান ও তিনদানের বিধান আছে। মৃতের প্রেতত্ব মোচনের জন্য আদ্যশ্রাদ্ধের পর এক বৎসর পর্যন্ত প্রতিমাসে মৃত্যু তিথিতে বা কৃষ্ণা একাদশীতে কি অমাবস্যায় মাসিক, ষাণ্মাসিক, বৎসরান্ত, দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক ও সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করণীয়। সপিণ্ডীকরণ পূর্বপুরুষদের সঙ্গে পিণ্ডের সমন্বয় সাধন করে। প্রেতত্ব ও তাদের মোচনের ব্যবস্থা করে। এ সব শ্রাদ্ধই জ্যেষ্ঠপুত্র, তদভাবে দ্বিতীয় পুত্র বা পরবর্তী মুখ্যাধিকারীর কর্তব্য। আভ্যুদয়িক বা নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ হয় গৃহপ্রবেশ, তীর্থযাত্রা, পুত্রকন্যাদির বিবাহ সংস্কার প্রভৃতি উপলক্ষে। সেই সঙ্গে অনেক স্থলে ষোড়শ মাতৃকা পূজা, বসুধারা দান প্রভৃতিও অনুষ্ঠান হয়। নবান্নের পার্বণশ্রাদ্ধে ও মহালয়ার পিতৃশ্রাদ্ধে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ এই ছয় পুরুষের শ্রাদ্ধ করা হয়। অন্নদান, জলদান. মধুদান, পিণ্ডদান শ্রাদ্ধের বিশিষ্ট অঙ্গ।

যদিও অপঘাত মৃত্যুর বেলায়, অপরিণত মৃত্যুর বেলায় কৃত্যাদি পাল্টায়। সাধারণত গর্ভবতী মহিলাকে দাহ করা হয় না। তাদের কপালে সিঁদুর, পায়ে আলতা মেখে লালপেড়ে শাড়ী পড়িয়ে মাটির ভিতরে গর্ত করে পুঁতে রাখা হয়। সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তিদের অনেক জায়গায় দাহও করা হয় না, মাটিতেও পুঁতে রাখা হয় না, জলের স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। মৃত শিশুকেও অনেক জায়গায় দাহ করা হয় না। দাহ সম্পর্কে যেমন নানা বিধি ও পার্থক্য আছে তেমন শ্রাদ্ধবিধিতে নানারকম পার্থক্য দৃষ্ট হয়। শ্রাদ্ধের অধিকারী-ভেদও আছে। অনেক ক্ষেত্রে ষোড়শপিণ্ড দানের ব্যবস্থা আছে। পিতৃকুলে, মাতৃকুলে ও বন্ধুকুলে মৃতব্যক্তিগণ যারা অপঘাতে, দাবদাহে, সিংহ ব্যাঘ্রাঘাতে বা অন্য জন্তুর আঘাতে মৃত, যারা উদ্বন্ধনে, বিষাহত হয়ে, আত্মঘাতে, দাঙ্গায়, শত্রুতায়, অরণ্যে, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মৃত, যারা অনেক যাতনার মধ্যে প্রেতলোকে অবস্থিত, যমকিঙ্কর দ্বারা নীত, যারা পশু, বৃক্ষ, সরীসৃপাশ্রিত, যারা কর্মফলে

জন্মান্তর সহস্রের মধ্যে ভ্রমণশীল, মনুষ্য জন্ম যাদের কাছে দুর্লভ, বংশের পুত্রহীন ব্যক্তিগণ, পিতৃকুল ও মাতৃকুলের ভৃত্য, আশ্রিত ও সেবক বন্ধু, পশু, পক্ষী, কীট, তৃণ, দৃষ্ট, অদৃষ্ট, উপকারী, অপকারী এবং জন্মান্তরে দাসদাসীগণ সকলকে ষোড়শপিণ্ড দান করা হয় হিন্দুমতে। মুসলমানদের মধ্যেও এ ধরণের আচরণ আছে। মৃতকে গোসল দেওয়া ফরজে কেফায়া এবং গোসল না দিয়ে দাফন প্রণালীর মারফত তাদের আচরণীয় রীতি জানা যায়।

শ্রাদ্ধ অধিকারীদের কৃত্যে যতই ব্যবধান থাকুক না কেন পিতৃতর্পণের অধিকারী সকলেই। জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে পিতৃপুরুষ ও দেবতাদের উদ্দেশ্যে তাদের তৃপ্তিবিধায়ক অনুষ্ঠান এটি। এ অনুষ্ঠান হয় শারদীয় মহালয়ায় ও ভীমাষ্টমীতে। ভীমাষ্টমী তর্পণে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলে অপুত্রক ভীষ্মের তর্পণ করতে পারে। তান্ত্রিক উপাসনার তর্পণ আলাদা। মহালয়া নামে পরিচিত আশ্বিনের অমাবস্যায় পার্বণশ্রাদ্ধ প্রত্যেক বাঙালী হিন্দুর অবশ্য কৃত্য।

মহালয় [মহান + আলয় (+ আ)] শব্দ থেকে মহালয়া শব্দের উদ্ভব বলে গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'শব্দসার' গ্রন্থে উল্লেখ আছে। হিন্দুদের পিতৃতর্পণের জন্য নির্দিষ্ট শারদীয় দুর্গাপূজার অব্যবহিত পূর্ববর্তী এই তিথিটি পিতৃপুরুষের উৎসবের আধার। সারা বাঙলায় এ দিন ছুটি। পক্ষব্যাপী পিতৃযজ্ঞ বা তর্পণ করার রীতি। ডঃ দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী তাঁর "অরিজিন অ্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অব্ দি রিচুয়ালস্ অব্ অ্যানসেস্টার ওয়ারশিপ ইন ইণ্ডিয়া" গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।



দেবীপক্ষের অপরপক্ষ বা আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিদিনই শ্রাদ্ধ করার বিধান থাকলেও অনেকের পক্ষেই তা মেনে চলা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই বহুলোক তর্পণানুষ্ঠানের মারফত নিয়ম রক্ষা করেন। মহালয়ায় কোন কারণে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা না গেলে দীপান্বিতা অমাবস্যা বা কার্তিক কৃষ্ণপক্ষেও পিতৃশ্রাদ্ধ করা যেতে পারে। আকাশ প্রদীপ বা দীপের

আলোকে অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার থেকে পিতৃগণকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসা হয়, যাতে অন্ধকারে তাঁরা হারিয়ে না যান। দীপাবলীর আলো জ্বালানো এবং মিষ্টান্ন বিতরণ ইত্যাদি পিতৃযজ্ঞ বা পিতৃ-তর্পণেরই কৃত্যাংশ বলে বহু পণ্ডিত মনে করেন।

মৃত পূর্বপুরুষের প্রীতির জন্য জীবিত বংশধরদের জলদান, পিণ্ড-দানাদিকে পিতৃশ্রাদ্ধ বা পিতৃযজ্ঞ বলা হয়। এই পিতৃ মানে পিতা নন, মৃত পূর্বপুরুষদের সকলে। সময় সময় পিতৃগণের বিদেহী আত্মা তাঁদের বংশধরদের নিকট জল-পিণ্ডাদি পেতে চান। বংশধরেরাও তা দিয়ে থাকেন। এই দেওয়ার রীতিই মহালয়ার পিতৃ-তর্পণ। তৃপ+অন (ণ) যোগে তর্পণ শব্দের উদ্ভব। ধর্মীয় আচরণের দ্বারা পিতৃপুরুষের তৃপ্তি বিধান করা হয়ে থাকে বা তাঁদের তোষণ করা হয়ে থাকে বলেই আচরিত অনুষ্ঠানটি তর্পণ। এই তর্পণ প্রধানত দুই প্রকারের। প্রধান তর্পণ বা অঙ্গ তর্পণ অথবা নিত্য তর্পণ বা স্নানাঙ্গ তর্পণ। পিতৃযজ্ঞের তর্পণকে প্রধান তর্পণ বলা হয়। এ তর্পণে সকলের সমান অধিকার। ছোটজাত বড়জাতের ভেদাভেদ এ তর্পণের মধ্যে দৃষ্ট হয় না।

তর্পণের সঙ্গে স্নানের যোগ আছে। তর্পণস্নান সাধারণত তিন-প্রকারের। নিত্যস্নান, নৈমিত্তিকস্নান ও কাম্যস্নান। প্রাতঃ বা অপরাহ্ন স্নানের সঙ্গে নিত্য তর্পণ অনুষ্ঠিত হয়। অমাবস্যা, পূর্ণিমাদির সঙ্গে যুক্ত স্নানকে বলা হয় নৈমিত্তিকস্নান। গঙ্গাস্নান, পার্বণস্নান, জগন্নাথদেবেরস্নান প্রভৃতি কাম্যস্নান। এই তিনপ্রকার স্নানেই তর্পণ করার রীতি। ক্ষৌরকর্ম, অশৌচ, অস্পৃশ্য ছোঁয়াজনিত স্নানের সঙ্গে তর্পণের কোন যোগ নেই। অপরাহ্ন স্নানের সঙ্গে পিতৃ-তর্পণ অনুষ্ঠিতব্য।

স্নানান্তে মানুষ পঙ্কিলতা থেকে মুক্তি পায়, সমস্ত অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতা দূরীভূত হয়। তাই স্নানান্তে শুচিশুদ্ধ হয়ে তর্পণের বিধান, হিন্দুসমাজের মত মুসলমানদেরও গোসল বা স্নানের নানা বিধান আছে। শরীয়ত মতে গোসল চার প্রকার—ফরজ, ওয়াজের, সুন্নত এবং মোস্তাহাব। যেমন স্ত্রীলোকদের বেলায় আরও কিছু নিয়ম প্রতিপালন করার বিধান আছে। স্ত্রীলোক এমন পর্দাযুক্ত হয়ে গোসল করবেন যেখানে তাঁদের শরীর বেগানা পুরুষ বা বেগানা স্ত্রীলোক দেখতে না পায়। প্রথমে গোসলের নিয়েত করতে হয়, তারপর কজা পর্যন্ত হাত ডুবিয়ে বিসমিল্লা পড়তে হয়। গোসল সম্পর্কে শরীয়তে আছে আটটি সুন্নত, দশটি মকরূহ এবং বাইশটি মোস্তাহাব। জল বা পানিতে স্নান বা

গোসল করলেই দেহ শুদ্ধ হয় না। যে যে দোষে গোসল অশুদ্ধ তা হচ্ছে, গোসলের সময় কোন পুরুষের মাথার ঝুঁটি বা বিনানি থাকলে তা খুলে না নিয়ে স্নান, অবশ্য স্ত্রীলোকদের বেলায় বিনানী খুলতে হয় না। স্ত্রীলোক গোসলের সময় নাক, নখ, কান, প্রভৃতি ভাল করে ধুয়ে ফেলবেন। গোসলের পরে নামাজ পরার বিধান আছে। এই নামাজের দ্বারা তাঁরা নিজের ও অপরের কল্যাণ করেন, মৃত আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদেরও শান্তি প্রার্থনা করেন।

পিতৃ তর্পণে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্র প্রভৃতি দেবতা, সনক-সনন্দ প্রভৃতি বিশিষ্ট পুরুষ, মরীচি প্রভৃতি সপ্তঋষি, চতুর্দশ যম, পিতামহাদি দ্বাদশ পুরুষ (পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী) ও ত্রিভুবনের উদ্দেশ্যে দুই হাতের অঞ্জলি বা কোশাকুশি ভরে জল দেবার রীতি। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তিল-তর্পণ বা তিলমিশ্রিত জলের তর্পণ প্রশস্ত। পিতৃ-তর্পণে তিল-তর্পণই করা হয়।

পূর্ব বা উত্তরমুখী হয়ে দুবার আচমন এবং বাম কাঁধে পৈতা বা যজ্ঞোপবীত রেখে ভিজা কাপড়ে জলের উপর নতজানু হয়ে দাঁড়িয়ে অথবা শুকনো কাপড়ে এক পা জলে আরেক পা স্থলে রেখে পিতৃ তর্পণকারী দুই হাতে সতিল জল ও পিণ্ডার্পণের সময় বলবেন—ওঁং ব্রহ্মা তৃপ্যতাম্, (শূদ্র ওঁং স্থলে নমঃ এবং ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ তৃপ্যতাম্ স্থলে তৃপ্যতু বলবেন) ওঁং বিষ্ণু তৃপ্যতাম্, ওঁং রুদ্র তৃপ্যতাম্' ইত্যাদি। ত্রিভুবনের দেব-দেবী, দক্ষযক্ষ, কিন্নর, প্রেত, পিশাচ, মিত্র, অমিত্র, বৃক্ষ, পশুপক্ষী, তৃণ দূর্বাদি সকলকে জল দেবার রীতি এই তর্পণে।

দুপুর বেলা পিতৃযজ্ঞের উপযুক্ত সময়। যাঁরা সন্ধ্যানুষ্ঠানের সঙ্গে তর্পণ করে থাকেন তাঁরা প্রথমে পিতৃ-তর্পণ করবেন ও পরে সন্ধ্যানুষ্ঠান করবেন পিতৃপক্ষে। প্রাতঃস্নানকে অঙ্গস্নান বলা হয়। এই স্নানে পিতৃ-তর্পণের অবকাশ নেই। কাজে কাজেই দ্বিজাতি ব্রাহ্মণ সন্ধ্যায় পিতৃ-তর্পণ ও সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রাতঃস্নান করেন। যাঁরা প্রাতঃ বা অঙ্গ স্নান করেন না তাঁরা দ্বিপ্রাহরিক স্নানের সঙ্গে তর্পণানুষ্ঠান করেন। যথারীতি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্র, প্রজাপতি, মুনি, ঋষি, বেদ, চন্দ্র, আচার্য, গান্ধর্ব, দৈত্য, দানব, দেবদেবী, নাগ, সমুদ্র, পাহাড়পর্বত, নদী, আদিত্য, দক্ষযক্ষ, রাক্ষস খোক্কস, সুপর্ণা, পিশাচ, পৃথিবী, উদ্ভিদ্, ওষধি, পশুপক্ষী, লতাপাতা, ত্রিভুবনের জীবন্ত, মৃত, পার্থিব, অপার্থিব সকলকে, দুষ্ট ও

অসৎপ্রকৃতির লোক, বাতাসাশ্রয়ী জীব, জল, আকাশ, আশ্রয়হীন, গৃহহারা, সর্বহারা ও অপরাধী সকলের সুখের জন্য, সকলের তৃপ্তির জন্য জল ও পিণ্ডাদি অর্পণ করা হয় এই দিনে।

তর্পণ সর্বদা জলে অনুষ্ঠিত হবে এমন কোন বিধান নেই। ব্যাসদেব বলেছেন যে একপ্রকার তর্পণ জলে আরেক প্রকার তর্পণ স্থলে অনুষ্ঠিত হবে। এটি প্রতিদিনকার কর্তব্যের মধ্যে একটি—'তর্পণং প্রত্যহম্ কার্য্যম্'। স্নানাঙ্গ তর্পণ জলে এবং অন্য তর্পণ স্থলে অনুষ্ঠিতব্য। স্থলে অনুষ্ঠিত নিত্য তর্পণে তিল ব্যবহার নিষিদ্ধ। সপ্তমী তিথি, রবিবার, জন্মদিন ও রাত্রেও তিল-তর্পণ রীতি-বিরুদ্ধ। তাছাড়া ত্রয়োদশীর দিনে ও পিতৃদেবের বিদেশগমনের দিনেও তিল-তর্পণ নিষিদ্ধ। যদিও ধর্মস্থানে, গঙ্গাসঙ্গমে ও প্রেতপক্ষের যে কোন দিনে তিল-তর্পণে বাধা নেই হিন্দু মতে।

বাম পা নতজানু হয়ে বা বাঁকিয়ে তর্পণ করা হয়ে থাকে। এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে শতপথব্রাহ্মণ বলেছেন যে পিতৃগণ ঐভাবে প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে করুণা ও খাদ্য ভিক্ষা করেছিলেন। পিতৃগণের উদ্দেশ্যে জলপিণ্ডাদি দেবার বিস্তৃত কারণ ব্যাখ্যা করেছেন হিমাদ্রী তাঁর শ্রাদ্ধকল্পে। স্মরণীয়, মৃত পিতৃপুরুষের কেউ কেউ কর্মগুণে চলে যান স্বর্গে। স্বর্গারোহণকারী এই পিতৃগণ অমৃতের অধিকারী। আবার কেউ কেউ কর্মদোষে পতিত হয়ে নরকে আশ্রয় পান। পূর্ব পাপ মোচন করতে নানাবিধ কৃচ্ছ্র তার শিকার হন। খাদ্যের মধ্যে ঘাস খান। তর্পণের মাধ্যমে এই পিতৃগণকেই জলপিণ্ডাদি অর্পণ করা হয়ে থাকে। ঠিকমত তর্পণে পিতৃগণ সন্তুষ্ট হয়ে জীবিত বংশধরদের আশীর্বাদ করেন। পিতৃতর্পণের আদর্শ বৌদ্ধদের মিত্তভাবনার সঙ্গে তুলনীয়। বিশ্বভাবনা, বিশ্বের সমস্ত জীবজন্তু, সমস্ত পার্থিব অপার্থিব পদার্থকে একান্ত আপনার করে দেখার এ আদর্শ ভারতীয় সাধনা ও ধ্যান ধারণার অমূল্য সম্পদ। সারা বিশ্বের সর্বোচ্চ শিখরে অনুষ্ঠিত লোক থেকে সর্বনিম্নে বিরাজিত ব্যক্তিগণ, দেবর্ষিগণ, মাতা ও পিতার দিকের পিতৃগণ সকলকে তিলোদক অর্পণ করা হয়ে থাকে। এই তর্পণে সপ্তপৃথিবীর সমস্ত জীবজন্তু, গাছপালা, লতাপাতা, কীটপতঙ্গ লাভবান হন, সকলের সমৃদ্ধি ঘটে। প্রাচীন ভারতে এ তর্পণ খুবই জনপ্রিয় ছিল কিন্তু দিনবদলের সঙ্গে সঙ্গে এর জনপ্রিয়তা কিছুটা হ্রাসপ্রাপ্ত হলেও একেবারেই যে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি তার মস্ত প্রমাণ মহালয়ার পিতৃ-তর্পণ।

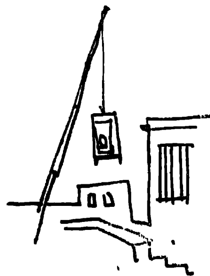
কৃষ্ণপক্ষের যে কোনদিন শ্রাদ্ধের পক্ষে উপযুক্ত। কেউ কেউ মনে করেন আশ্বিন কৃষ্ণপক্ষের প্রতিদিনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা উচিত। অপরে মনে করেন যে শ্রাদ্ধ অবশ্য-কৃত্য হলেও শ্রাদ্ধকারীর ক্ষমতানুযায়ী শ্রাদ্ধের দিন নির্দিষ্ট করা যুক্তিযুক্ত। মার্কণ্ডেয় পুরাণ বিভিন্ন তিথির বিভিন্ন শ্রাদ্ধকে বিভিন্ন ভাবে ব্যক্ত করেছেন। পক্ষব্যাপী শ্রাদ্ধানুষ্ঠান না করে যদি এই পক্ষের কোন একদিনে পিতৃযজ্ঞ করা হয় তবে সে দিনটি অমাবস্যা না হওয়াই বিধেয়। যাজ্ঞবল্ক্য মনে করেন শ্রাদ্ধ ও অমাবস্যা শ্রাদ্ধ এক জিনিষ নহে। পৃথিবীর পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে তিথি ও নক্ষত্রের স্থান পরিবর্তন হেতু অমাবস্যা শ্রাদ্ধের তারিখও পরিবর্তিত হয়। কিন্তু অশৌচ শ্রাদ্ধের দিন কোন অবস্থাতেই পরিবর্তিত হতে পারে না।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, দক্ষিণ ভারতের জনগণ দিন গণনা করেন পূর্ণিমার প্রথম দিন থেকে অমাবস্যা অবধি। উত্তরভারতীয়েরা দিন গণনা করেন অমাবস্যা থেকে পূর্ণমাসী পর্যন্ত। ফলে দক্ষিণ ভারতের মাসের গণনা অনুযায়ী ভাদ্র মাস ভাদ্রপূর্ণিমায় সমাপ্ত হয় না। পরবর্তী অমাবস্যা অবধি ভাদ্রের জের চলে। অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতে পূর্ণিমার পরবর্তী অমাবস্যাও যখন ভাদ্রমাস উত্তর ভারতে তখন আশ্বিন অমাবস্যা। এই আশ্বিন অমাবস্যায়ই অনুষ্ঠিত হয় মহালয়ার পিতৃ-তর্পণ।

আরও স্মরণীয়, যমদেব এই সময় বা বর্ষাকালে প্রেত ও পিতৃগণকে তাঁদের স্ব স্ব আবাস থেকে মুক্তি দেন। গৃহহীন প্রেত ও পিতৃগণ তখন যমপুরীর খাবার থেকেও বঞ্চিত থাকেন, ফলে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর থাকেন। ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত এই সব প্রেত ও পিতৃগণ তখন তাঁদের জীবিত বংশধরদের কাছে আসেন বাতাস হয়ে। দরজার চারপাশে তাঁরা বিচরণ করে বেড়ান যতদিন না যমরাজ তাঁদের নিজ নিজ প্রকোষ্ঠে নিয়ে ঢোকান। এই সময় তাঁরা তাঁদের বংশধরদের কাছে পায়স, পিণ্ডজলাদি পেতে চান। আর বংশধরেরাও পিতৃপুরুষের দুর্দশার কথা বিবেচনা করে প্রতি বৎসর পায়স, ঘি, মধু, তিল, জলাদি অর্পণ করেন মহালয়ার পুণ্য দিবসে। এই সময় সূর্যদেব কন্যারাশিতে অনুষ্ঠান করেন।

কন্যারাশি থেকে সূর্য ক্রমে বৃশ্চিক রাশিতে আসেন। দশভুজা দুর্গা সিংহবাহিনী হয়ে এই সময়েই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা হন মর্ত্যবাসীর পূজা গ্রহণ করতে। সিংহবাহিনী দুর্গার মর্ত্যে আগমনের সঙ্গে সূর্যদেবের কন্যা-রাশিতে গমনের কিছু যোগ আছে বলে যুবক বঙ্কিমচন্দ্র একদা মনে

করেছিলেন। এ সম্পর্কে বেথুন সোসাইটী আয়োজিত ১৮৬৯ সনের ২৬শে জানুয়ারীর এক আলোচনা সভায় তিনি বলেছিলেন, "আমাদের সকল উৎসবের মধ্যে দুর্গোৎসবই শ্রেষ্ঠ। এই দুর্গোৎসবের ব্যাখ্যা এইভাবে করা যাইতে পারে। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে বর্ষের দ্বাদশ মাস দ্বাদশ সংক্রমণ অনুসারে আখ্যাত করা হয়। অর্থাৎ সূর্য যে মাসে যে রাশিতে সংক্রমিত হন, সেই রাশি অনুসারে সেই মাসের নামকরণ করা হয়। যেমন বৈশাখ মাসে মেষ রাশি, মেষ রাশিস্থ ভাস্কর বলিলেই বৈশাখ মাস বুঝায়। তেমনি জ্যৈষ্ঠ মাষে বৃষরাশি। তেমনি আবার আশ্বিনে কন্যারাশি। দুর্গা সিংহবাহিনী, কন্যারাশি সিংহের পৃষ্ঠেই আসেন। তবে দুর্গা কন্যা নহেন; পুরাণে তাঁহাকে বিবাহিতা দেবী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; তিনি শিবানী ও গণেশ জননী। কিন্তু কথা এই যে, বর্তমান দুর্গোৎসবের দুর্গা প্রতিমা কন্যার প্রতিমা না হইলেও মূল উৎসবে যে কন্যার বা কুমারীর পূজা হইত, যুক্তি হিসাবে এইটুকু বলা যাইতে পারে। এমন কি গোড়ায় বোধহয় কন্যারাশিরই পূজা হইত। এই অনুমান অসঙ্গত হইবে না। বিশেষত যে দুর্গার পূজা হইয়া থাকে সাধারণত লোকে তাহাকে ষোড়শী বলে। কন্যা, কুমারী, ষোড়শী এক ভাবের পরিচায়ক নহে কি? অথবা যেমন পুরাতন অপ্রচলিত মদন দেবতার স্থানে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া মদনোৎসবকে দোলযাত্রায় পরিণত করিয়াছেন, তেমনি ইহাও সম্ভবপর যে, কন্যারাশির পূজার পরিবর্তে লোকপূজ্যা দুর্গারই উৎসব এদেশে প্রচলিত



হইয়াছে।" এ প্রসঙ্গে আরও স্মরণ রাখতে হবে যে সূর্যদেব যখন কন্যাদি-রাশি পরিক্রমায় রত তখন প্রেত ও পিতৃগণ আশ্রয়হীন, গৃহহারা। প্রায় দুই মাস তাঁদের এ ভাবে কাটে। এবং এই সময় তাঁরা তাঁদের জীবিত বংশধরদের কাছে জলপিণ্ডাদি পাবার জন্য কাতর প্রার্থনা জানান। চাতক পাখী যেমন করে বর্ষার জলের জন্য উদগ্রীব থাকে, বা কাঠফাটা রৌদ্রে

চৌচির মাঠ দেখে কৃষক যেমন বরুণদেবের কাছে বর্ষার জন্য প্রার্থনা করেন, পিতৃগণও তেমনি বাতাস হয়ে দরজামুখে অবস্থান করেন জল ও পিণ্ডের জন্য। তর্পণের জন্য। এতদিনেও যদি বংশধরেরা তর্পণাদি না করেন তবে ভগ্নমনোরথ, ক্ষুৎকাতর পিতৃগণ জীবিত বংশধরদের অভিশাপ দিয়ে যে যাঁর ঘরে ফিরে যান যমের আদেশে। এক বৎসরের জন্য তাঁরা আবার বন্দী হয়ে পড়েন পূর্বজন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বা খণ্ডন করতে।

ম্যাক্স্‌মুলার মনে করেন, মহালয়াশ্রাদ্ধ হিন্দুদের পঞ্চযজ্ঞের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। এই যজ্ঞের দিন আশ্বিন চান্দ্রায়ণকে ভিত্তি করে নির্ধারিত। এই মাস বিক্রমশতাব্দীর শেষতম মাস। বৈদিক পণ্ডিতদের মতে প্রাচীন-কালে বৎসরকে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন এই দুই ভাগে ভাগ করা হত। শ্রাদ্ধকর্মের জন্য দক্ষিণায়নকে উত্তরায়ণের চেয়ে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়। বালগঙ্গাধর তিলক বিস্তৃত আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে আশ্বিন কৃষ্ণপক্ষ বা পিতৃপক্ষ পিতৃযজ্ঞের জন্য উপযুক্ত। এই সময় সূর্য দক্ষিণায়নে থাকেন এবং দেবী দুর্গাও মর্ত্যে আগমনের জন্য তৈরী হন তাঁর বাহন সিংহ সহ। হিমালয় দুহিতা, দক্ষকন্যা উমা পিতৃ-তর্পণের সাতদিনের মধ্যেই দেবীপক্ষে আবির্ভূতা হন। পিতৃ-তর্পণের পুণ্য সঞ্চয়ান্তে অকালবোধনে আমরাও দেবীকে আরাধনা করি। অল্প কয়েকদিনের জন্য হলেও তাঁকে আমাদের মধ্যে পেয়ে সুখী হই। পিতৃতর্পণানুষ্ঠানের সঙ্গে আকাশপ্রদীপ বা দীপাবলীর বাতি ও উল্কা উৎসবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আশ্বিন সংক্রান্তি থেকে কার্তিক সংক্রান্তি অবধি প্রতি সন্ধ্যায় বাঁশের বা কাঠের খুঁটির আগায় প্রদীপ জ্বালিয়ে পিতৃগণকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে আকাশবাতি জ্বালানো হয়। একই কারণে হয় দীপাবলী উৎসব।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের উল্কা উৎসবকেও আমরা আকাশবাতি বলতে পারি। আকাশবাতি বা আকাশ-প্রদীপ জ্বালানো হয় আশ্বিন সংক্রান্তি থেকে সারা কার্তিক মাস। সন্ধ্যায় লক্ষ্মীনারায়ণের উদ্দেশ্যে তিল তৈল বা ঘৃতাদি দিয়ে আকাশে বা বিষ্ণুর মন্দিরে দীপদান করা হয়। অনেক জায়গায় স্তম্ভ স্থাপন করে তার অগ্রভাগে প্রদীপ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে তুলসীতলায়ও দীপ দেওয়া হয়। পশ্চিম দিনাজপুরের ইসলামপুর থানার রহমৎপুর গ্রামে যে উল্কা উৎসব হয় তার সুরু আশ্বিন-সংক্রান্তি দিবসে। সন্ধ্যায় গ্রামবাসী নিজ নিজ বাড়ীতে ও ধানের ক্ষেতে প্রদীপ জ্বেলে দেন। ধান ক্ষেতের উপর একটি অস্থায়ী চালাঘর নির্মাণ করেন। লক্ষ্মীপূজা করেন।

লক্ষ্মী পূজাকে বলেন নিশিপূজা। এই উপলক্ষে প্রত্যেকের ঘরে প্যাকাটির গোছা দিয়ে উল্কা তৈরী করে রাখা হয়। সন্ধ্যায় গোয়ালের সমস্ত গরুকে চুমানো বা সিঁদুর পরান হয়। আদর আপ্যায়ন করা হয়। তারপর রাখালকে চুমানো হয়। চুমানো অনুষ্ঠান হয়ে গেলে উল্কাগুলোতে অগ্নিসংযোগ করে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে উপরের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। পরের দিন সকালে আবার হয় গরু আপ্যায়ন। তারপর রাখাল গরু চরাতে যায়। এক মাস ধরে প্রতিদিন চলে এ কৃত্য উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে।

আকাশপ্রদীপ উপলক্ষে বাঁকুড়া বরজোড়া থানার বেলুট গ্রামের মেয়েরা যে গান গায় তার একটি নমুনা—'সন্ধ্যাবেলা সন্ধ্যা দিলুম। বেল্বিতলে গন্ধ দিলুম। বামে ভূমের ডালি। দক্ষিণে ঠেলাঠেলি। ভাই ঠেলাঠেলি। সাততপ পিদ্দিম জ্বলে। সাতমুখে বেল পুরে। বেল পুষ্পের ধ্বনি। শিবায় দুর্গায় নমঃ পুষ্পের ছাউনি। তপবতী তপমান। সন্ধ্যাবেলা লউ মা, লক্ষ্মী নারায়ণ। নারায়ণের সলিতা। সব সলিতা লাউ মা লক্ষ্মী সরস্বতী। লক্ষ্মী রমঝম। তপ লীলাবতী গো। হেথায় আজ থাক কনে বরেরা। কাল যেও তুলসীর বনে। কাল তোমাকে নিয়ে যাব। ফের এতক্ষণে। তুলসী তুলসী মাধবীলতা। কও তুলসীর গুরুর কথা। গুরু বৈষ্ণব পড়লুম চরণে। কোটি কোটি দণ্ডবত গুরুর চরণে।'

ঋতু-প্রকৃতি জীবজন্তু সকলকে ভালবাসা সকলকে শ্রদ্ধা করা থেকে এসেছে শ্রাদ্ধাদি কৃত্য। সৃষ্টি হয়েছে নানা ধর্মকর্ম। আচার ও অনুষ্ঠান। সুরু

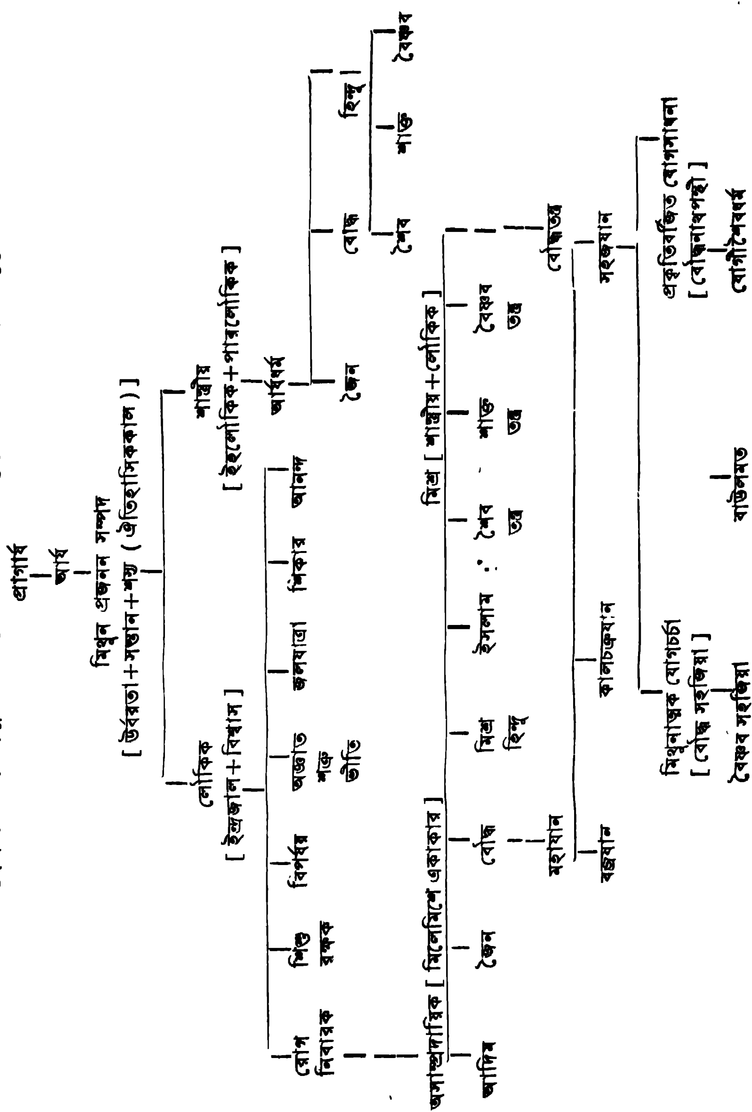


হয়েছে গো-পূজা, সর্পপূজা প্রভৃতি এবং পাহাড়-পর্বত-বৃক্ষ, নদীনালা পূজা। নানা ভাবে নানা ঢঙে এ পূজা হয়ে চলেছে। গ্রাম্য দেবদেবীর ভাগ্যে মন্দির প্রায়ই জোটে না। থানে, বৃক্ষতলে, বারোয়ারী তলায়, গাঁয়ের কিনারে, ফাঁকা মাঠে হয়েছে তাদের অধিষ্ঠান। অবশ্য কোন কোন গ্রাম্য দেবদেবী মন্দির বা চণ্ডীমণ্ডপেতে স্থান পান নি এমন নয়। তারা স্ব-মহিমায় বসে আছেন সেখানে

শাস্ত্রীয় দেবদেবীর সঙ্গে। ঋতু ও নৈসর্গিক পরিবর্তনের উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও পূজিত হয়ে চলেছেন। কিন্তু এই রকম ভাগ্যবান্ দেবদেবীর সংখ্যা যথেষ্ট নয়। ধর্মঠাকুর, ওলাইচণ্ডী, নারায়ণী, দক্ষিণরায়, মনসা, বড়াখাঁগাজী, পীরগাজী ইসমাইল, পীর গোরাচাঁদ, বনবিবি, ফতিমা বিবি, পীর খকুকর সাহেব, শীতলা, প্রকারভেদে কালী, লৌকিক শিব প্রভৃতি বিভিন্ন মন্দির ও দরগায় ঢুকতে পারলেও অনেকস্থলে সমজাতীয় দেবদেবী মানুষ-দেবতারা, মাকাল ঠাকুর, বারাঠাকুর, সিনিদেবী, বারাম, ক্ষেত্রপাল, অলক্ষ্মী, বনদুর্গা প্রভৃতির থানে, গাছে, মাঠে, বনে, জঙ্গলে, নদীনালায়, পোড়ামাটির ফলকে, পাথরে, শিলায় আটকে আছেন। এই দেবদেবীদের প্রায় সকলেই মিথুন, প্রজনন ও ঋদ্ধির সহায়ক। লোকধর্মের দেবদেবী ছাড়া যে সব সনাতনী, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, জৈন ও প্রাকৃতজনেদের দেবদেবী আছেন তাঁদের মোটামুটি পর পৃষ্ঠার ছকে বিধৃত করার প্রয়াস পাওয়া যেতে পারে।

হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোক ছাড়াও অন্যান্য আর্যধর্ম এবং আর্যবহির্ভূত বাঙলার মানুষ লোকসমাজে বসবাস করছেন। শাস্ত্রীয় ধর্মাশ্রয়ী সমাজ স্ব স্ব ধর্ম-আচার ও আচরণে যতই গোঁড়া হউন না কেন লৌকিক ধর্মাচরণে সকলেই বেশ উদার। গোঁড়ামির কোঁদল, অসহিষ্ণু মনোভাব ও রেষারেষি এখানে তেমন নেই বললেই হয়। বাঙলাদেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামেই গ্রাম্য দেবদেবীরা সশ্রদ্ধায় বিরাজ করছেন। গ্রামবাসীরা একটা স্থান নির্দিষ্ট রেখেছেন এঁদের জন্য। সাধারণত গাছতলায়, প্রাচীন ঢিবিতে, বিশেষ বিশেষ রাস্তার সঙ্গমস্থলে বা পোড়ো জমিতে, জলার ধারে এই 'থান' বা গ্রাম্য দেবদেবীর পূজাস্থল। প্রকৃতির ঝড়জল উপেক্ষা করে এঁদের এই অবস্থান, নিঃসন্দেহে সমাজের নিম্নতমস্তরে বিশেষ ভরসার কারণ। হিন্দুদের দেবদেবীর পাশে পীর গাজী ও বিবি সাহেবারা সমানভাবে সমস্ত সম্প্রদায়ের দরিদ্র জনসাধারণের বেঁচে থাকার প্রেরণা জুগিয়ে যাচ্ছেন মধ্যযুগ থেকে।

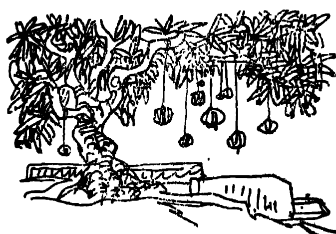
তুর্কী আক্রমণের পরবর্তীস্তরে ধর্মীয় ব্যাপারে পীর-গাজীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বড় বড় মঠমন্দির ধূলিসাৎ হওয়ার পরও দেখা গেছে, গাছ-তলায় দেবদেবীরা সমান গৌরবে বিরাজ করছেন। এঁদের কেউ হয়ত জীবজন্তুর হাত থেকে বাঁচাবার দেবদেবী, কেউ হয়ত চাষবাসের মালিক, কেউ বা মহামারীর, কেউ ভূতপ্রেতের, কেউ যাবতীয় কল্যাণের একচেটিয়া অধিকার নিয়ে আছেন। মধ্যযুগের অলৌকিকতা যুক্ত হয়ে এঁদের অনেকেরই মহিমা বহুগুণ বর্ধিত হয়েছে। মুসলমান সন্তদের ক্ষেত্রে যখন এদেশে বসবাস



একরকম স্থায়ী হয়ে গেল তখন থেকেই যেন এঁদের দেবত্বপ্রাপ্তির সুরু। সেই দেবত্বে পৌঁছতে অন্য প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর পন্থাই অনুসৃত হয়েছে। তাই দেখতে দেখতে পীর-গাজী বিবিসাহেবারা বাংলার গ্রাম্য দেবদেবীদের চিরন্তন পথে দেবত্বপ্রাপ্তির জন্য গাছতলাকেও ত্যাজ্য মনে করলেন না। হিন্দু গৃহস্থের

ভাঙ্গা বিগ্রহ, মানতকরা প্রতীকী পুতুল, সিঁদুর-ফুলপাতা জমা গাছতলায় সমানভাবে সেজে আছেন পীর, গাজী, বিবিসাহেবারা। এখানে আর ধর্মীয় ভেদাভেদের প্রসঙ্গ নেই। শুধু একটি ভাবই এখানে বিরাজিত। তা হল লৌকিক দেবভাব। এই খোলা আকাশের তলায় অনেকক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্য-দেবদেবীও এসে বসেছেন। পাষাণী তারা, ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তি, পার্শ্বনাথ, শীতলা, বাসুলী থেকে বনদেবদেবী, বৃক্ষদেবদেবী, সবাই একাকার হয়ে বসেছেন। এই সব গ্রাম্য দেবদেবীর কেউ বা সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে বন্দিত ও পূজিত হন, আবার বছরের হয়ত বিশেষ কোনও দিনে এঁদের কেন্দ্র করে সামাজিক পরব ও মেলা হয়। স্থানীয় লোকসমাজের আর্থিক কাঠামোর সঙ্গে এঁদের বাহ্যিক শ্রীবৃদ্ধি বা হানি ঘটে থাকে। এ পথেই দেখেছি কত গ্রাম্য দেবদেবী, পীর-গাজী অলঙ্কৃত পাকা দালানে গিয়ে উঠেছেন। আবার অনেকক্ষেত্রে শুধু ভক্তি দিয়েই লোকসমাজ তাদের প্রিয় দেবদেবীকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে তাঁদের পূজা ও আরাধনায় মেতে আছেন।

আসানসোলের সেই ঘাগরবুড়ীকে ধরা যাক। নুনিয়ার জল নিয়ে অনেক কাহিনী যাঁর নামে প্রচলিত। যাঁর এক বোন কল্যাণেশ্বরী। যাঁকে আগে বারোটা মাস এক বিচিত্র নাম-না-জানা গাছতলায় অবহেলার মধ্যে থাকতে হতো— সেই ঘাগরবুড়ীরও শেষপর্যন্ত একটা পাকা 'থান' হয়েছে। আজও অন্তিমশয়ানে পড়ে আছেন মুর্শিদাবাদের মিঞাপাড়ায় পীর করিম শাহ। মুসলমান হয়েও যিনি ইষ্টমন্ত্র হিসাবে 'রামনাম' গ্রহণ করেছিলেন। এখনও মধ্যরাত্রে খড়মের



শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেলে গ্রামবাসী বলে ওঠেন 'পীরসাহেব রামনাম।' মুসলমান তাঁর সমাধিতে মুরগি মানত করেন, নামাজ পড়েন ; হিন্দু করেন হরিনাম কীর্তন আর মিষ্টান্ন উৎসর্গ দেন। হাজার হাজার ভক্তের কল্যাণে যিনি রত তাঁর আশ্রয়স্থল বোধহয় আরেকটু ঐশ্বর্যময় হওয়া উচিত ছিল।

দাসেরচকের আর একজন ফকির মস্তরাম আউলিয়া। এঁর অবশ্য রবরবা

অনেক বেশী। আপামর জনসাধারণের বিশ্বাস এঁর 'দাঁড়ায়' মানত করলে দুরারোগ্য ব্যাধি সেরে যায়, অপুত্রকের সন্তান জন্মে। তাই মস্তরামের 'দাঁড়া'র পাশে প্রাচীন বটগাছে আজও অজস্র ইট ঝোলে নানা কামনা বাসনার প্রতীক হিসাবে। বৈশাখের মঙ্গলবার মানেই মস্তরামে'র 'দাঁড়া' লোকে লোকারণ্য। এই মুর্শিদাবাদে দেবত্বপ্রাপ্ত আরেক সাধকের নাম প্রসঙ্গত স্মরণে আসে। হিন্দুমুসলমান মিলিত সাধনার রাজসাক্ষী সৈয়দ মুর্তুজা হিন্দ পীর। পীরের নামের মাঝে হিন্দ শব্দ থেকে যে অনুমান স্বতঃই উৎসারিত তার ভিত্তি লোককথায় দৃঢ়মূল হয়। শোনা যায় শক্তি সাধনায় এই পীর আনন্দময়ী নাম্নী এক হিন্দু ব্রাহ্মণ ভৈরবীর সাহায্যে উর্ধ্বরেতা হয়েছিলেন।

প্রায় সারা পশ্চিম বাঙলায়, বিশেষ করে মুর্শিদাবাদের অংশবিশেষ, বীরভূমের উত্তর সীমান্ত, দক্ষিণবঙ্গের ২৪ পরগণা ও মেদিনীপুরের মধ্যাংশ পর্যন্ত, সাঁওতাল পরগণার পূর্বাংশ, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি জুড়ে যে গণদেবতা আজও দেবরাজরূপে বন্দিত তিনি নিঃসন্দেহে ধর্মরাজ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এঁর বাৎসরিক পূজা বুদ্ধপূর্ণিমার দিনেই অনুষ্ঠিত হয়।

ধর্মঠাকুর প্রথমাবধি সমাজের নিম্নতমস্তরের পূজ্য হয়ে ক্রমে ক্রমে বর্ণাশ্রমের বাইরের মানুষকে, লোকসমাজকে এক করছিলেন। বাইরের থেকে আমদানি ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি আপামর জনসাধারণের মানসপটে দৃঢ়মূল হতে পারে না, অপরপক্ষে ধর্মরাজ হলেন স্থানীয় সনাতন গুরুজন। এঁর নিয়মবাঁধনও ঢিলেঢালা, তবে 'সমর্পণ' যথাযথ হওয়া চাই। জনপ্রিয়তার দিক থেকে এঁর কাছাকাছিও কোন দেবদেবী ছিলেন না। তবে শেষপর্যন্ত এই প্রচণ্ড লোকপ্রিয়তা ধর্মরাজের পক্ষে বোধহয় কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ধর্ম-মঙ্গলের কাহিনীতেও এ ইঙ্গিত অস্পষ্ট নয়।

সেনরাজাদের হিন্দুকৌলীন্যের দাপটের মধ্যেও দেখা গেছে আদিম সমাজ থেকে দেবদেবীরা সুবিধামত পৌরাণিক দেবদেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। বয়োবৃদ্ধ ধর্মরাজ এই প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে আরো কয়েকশো বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। ইতিমধ্যে বুদ্ধাবতারের ভক্তবৃন্দ তাঁকে আরেক বিশেষ মহিমায় মহিমান্বিত করেছেন। তবু আজও লোকসমাজের সব থেকে তলার স্তর থেকে ওপরের স্তর পর্যন্ত সংকীর্ণতার সব রকম বাধা অতিক্রম করে, সর্বস্তরের মানুষকে আশ্বাস ও সান্ত্বনা জুগিয়ে এই গণদেবতা যেন নিজ কর্তব্য পথে অটল রয়েছেন। তথাপি রাঢ়বঙ্গের তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের লোকপ্রিয় লোকদেবতা যেন বিজয় অভিযান শেষে আজ কিছু পরিমাণে রণক্লান্ত। তাই

এখন বছরে একবার ধর্মরাজের দরবার বসে। এই সময় প্রজাবৃন্দ রাজার নির্দেশবিধি পালন করেন। পীতবস্ত্র পরিহিত ভক্তবৃন্দ রাজার জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখর করে তোলেন। ধর্মরাজের এই বিপুলসংখ্যক প্রজা তথা ভক্তবাহিনী দেখলে যেকোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি অনায়াসে অনুমান করতে পারেন অতীতে এই দেবরাজের দরবার বসত কি ধরণের আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সঙ্গে।

এই দেবরাজ অঞ্চলবিশেষে এক এক নামে পরিচিত হয়েছেন। তবে 'রাজ' বা 'রায়' উপাধি ইনি কোন স্থানেই ছাড়েন নি। এইভাবেই ইনি কোথাও হয়েছেন মতি রায়, কোথাও যাত্রাসিদ্ধ রায় আবার কোথাও বাঁকা রায় বা দক্ষিণ রায়। এঁরা সকলেই ধর্মরাজ বা ধর্মঠাকুর।

এই গ্রামদেবতাদের ভক্তরাও তাদের উপাস্যদের মতোই যেন উদারতায় ভরা। শাস্ত্রীয় দেবদেবীর ভক্তরা তাদের নিজস্ব দেবতার একান্ত উপাসক এবং বহুক্ষেত্রেই সংকীর্ণতা দুষ্ট। লৌকিক ও গ্রাম্যদেবদেবীর ভক্তরা আদৌ সেরকম নয়। তারা আঞ্চলিক দেবদেবীর মহিমাকীর্তন ছাড়াও অন্য মহিমাময় দেবত্বকে মেনে নিতে যেন প্রস্তুত। এমনকি লৌকিকদেবদেবীর অর্চনা ছাড়া শাস্ত্রীয় দেবদেবীর বন্দনাতেও তাঁরা পিছু হটেন না। এই নিয়মে কোন হিন্দুর পক্ষে মুসলমানের দরগায় ধর্না দিতে আটকায় না, তেমনি যে কোন মুসলমানও অনায়াসে হিন্দুদেবতাদের কাছে শ্রদ্ধা আরোপ করতে পারেন। গ্রামবাঙলার আপামর জনসাধারণের কাছে তাই 'দেবত্ব' অভিধাটি শহরাঞ্চল থেকে একটু পৃথকভাবেই গ্রাহ্য হয়ে থাকে। প্রকৃতির চাক্রিক আবর্তনের সঙ্গে যেন এই দেবদেবীরা গুরুত্ব পেয়ে থাকেন। বিশেষ করে যাঁরা মহামারী নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিয়ে আছেন তাঁদের প্রচণ্ড কাজের চাপ পড়ে সেইসব সময়ে যে সময়ে বা ঋতুতে বিভিন্ন ব্যাধি অঞ্চল বিশেষের সামগ্রিক অকল্যাণের কারণ হয়। গ্রাম্য দেবদেবীরা তাই গ্রামজীবনে প্রকৃতির ঋতুবদলের ঘোষণা নিয়ে যেন বিরাজিত। সাধারণত শীত ঋতুতেই গ্রাম্য-দেবদেবীর পূজা, শিরণি, মানত ইত্যাদি অধিক পরিমাণে অনুষ্ঠিত হয়।

শীতের ফসল কাটার পর চাষীদের মনে যখন আর আনন্দ ধরে না, তখন রাখাল বালকেরাও এক নতুন খেলায় মাতে। সে শিরণী উৎসবের আয়োজন করে। রাখাল বালকেরা দল বেঁধে বাড়ী বাড়ী গিয়ে গান গায়, পারিশ্রমিক হিসাবে চাল-ডাল-সবজি পায়, কোথাও পায় ধান। এইরকম একটি গানের নমুনা—'যে বাড়ী আইলাম সে বড় ভাগ্যবান, ধান মাগনের বাড়ীতে

দেখি রে ত্যা-মাল্লাইয়া দালান। ত্যা-মাল্লাইয়া দালানের উপর সাত কুইল্যা ধান। সাত কুইল্যা ধান পাইয়া সব রাখাল বলে, এই বাড়ীর গাইর‍্যাস্তের সোনারচান কোলে। সোনারচান চাকরি কইরবে কৈলকাত্তার শহরে, কত টাকা আনবে রে ঘুড়া আর গাড়ীতে।' এখানে ভিক্ষা বা মাগনের সময় পুত্রের জন্যও প্রার্থনা জানান হয়। ওদের অনেক চাষীর কাছেই চাষীজীবন ভাল লাগে না। তাই গৃহস্থের যে সোনারচাঁদ ছেলে জন্মাবে তাকে কলকাতায় চাকরী করতে পাঠানো হবে এমন বাসনা প্রকাশ পায়। এই গানে কৃষিজীবন থেকে চাকুরীয়া জীবনে উত্তরণের আর্তি স্পষ্ট। অন্য সব গানেও আছে এবম্বিধ চিন্তা। অধিক সন্তানের কথা তো আছেই। যেমন—'হুট্রের বাঁশের পাতা, মিয়াসাবের সাত বেটা। আইলো মিয়া সদাগর, সুনার টুপী মাথায় ধর। সুনার গুইলাইল বাঁশ, দুই দুয়ারে দুইটি হাঁস। হাঁস দেইখ্যে দিলাম নুড়, কৈত্তর পাইল্যাম বত্রিশ কুড়। কৈত্তরের নামডাক শুইন্যা, বট পাড়ারা খায় গুইয়া। গুইয়া খাইতে কিবা গুণ, পান্তাভাতে ছটাক নুন। পান্তাভাত ছলাবলা, দুই দাঁত তার নলবলা।' অন্য ধরণের মাগনের গানও আছে। যেমন—'আইলাম রে হরিয়া হস্তির পিঠে চড়িয়া, হস্তির পিঠ দুল দুল করে স্বর্গে উইঠ্যা নাচ করে। স্বর্গে অইল হিজুলী, বাপমা তার বিজুলী, বাপ মা আনেথানে বুড়ী গেল বৈগুন পালানে। বুড়ীর পায় বেন্দিল কাঁটা, বুহরার গলায় সোনার পাটা, সোনার পাটা সামছে, সোনা বান্দা ঘামছে, সোনা হে রূপারই ফালা, এই ঘরখানা দেখতে ভালা। ঘর তো ছাটুন্নী, গিন্নি বড় খাটুন্নী, সেও গিন্নি মা ধন, আমাগো দিব্যান কত ধন। দেও ধান চলিয়া যাই, আর বাড়ীতে পাইবার চাই। আর বাড়ী মতুইড়্যার ফুল। আইসতে যাইতে সমুদ্দ্র, সমুদ্দ্রে দিলাম তাটা, ধান দিবান চাইর কাঠা'। একে একে অনুষ্ঠিত হয়ে চলে বিভিন্ন আচার, আচরণ, পূজা, পার্বণাদি। অনুষ্ঠিত হয় রাসযাত্রা, দোলযাত্রা, ঝুলনযাত্রা প্রভৃতি। মণ্ডলাকারে নরনারী নৃত্যের নাম রাস। এ ধরণের নৃত্য সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীদের মধ্যে এখনও প্রচলিত। প্রাচীনকালে গোপগোপীগণের মধ্যেও এই নৃত্য জনপ্রিয় ছিল। এই অনুষ্ঠানের সময় সূর্য থাকেন বিশাখা নক্ষত্রে। এই নক্ষত্রের প্রাচীন নাম রাধা, রাধার পরবর্তী নক্ষত্র অনুরাধা। রাধা নামের অর্থ লক্ষ্মীও। এদিনে লক্ষ্মীপূজা হয়। রাধামাধবের মিলন হয় রাসে। ঝুলনে। কার্তিক-পূর্ণিমায় যেমন শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা, কার্তিক-অমাবস্যায় তেমন আলোর উৎসব, আলোর মেলা। প্রাচীন বিশ্বাস, মৃত্যুর পরেই পিতৃগণ স্বর্গে দেবতাদের সঙ্গে

গিয়ে বসবাস করেন, কিন্তু যাঁরা কর্মফলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য হন তাঁরা দেবলোকে যেতে পারেন না, তাঁরা দক্ষিণে যমলোকে যান অন্ধকারময় স্থানে। কার্তিক অমাবস্যায় এই পিতৃগণকে পিণ্ডজলাদি দান করা হয় মহালয়ার পিতৃতর্পণের দিবস থেকে। এ কথা মহালয়ার আলোচনায় আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। দক্ষিণদিকে পিতৃগণ আবদ্ধাবস্থায় থাকেন বলে দক্ষিণদিকে পা রেখে শোওয়া নিষেধ। দীপাবলীর দিনেও হয় লক্ষ্মীপুজা। হয় ভোজ। এই ভোজের উদ্দেশ্য বর্ণন প্রসঙ্গে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। একটি কাহিনীতে জানা যায় যে জনৈক রাজজ্যোতিষী রাজাকে বললেন, কার্তিক অমাবস্যায় কালরূপী সাপ তাঁর জীবন হরণ করবে। মহারাণী যদি সঙ্গীত শুনিয়ে সাপের মন জয় করতে পারেন তবে সাপ হয়ত রাজার আয়ু বাড়িয়ে দিতে পারে। ঘন অন্ধকার থেকে সাপকে দেখার জন্য সারা রাজবাড়ী, সারা রাজ্য আলোয় আলোকিত রাখার আদেশ দিলেন রাজা। রাজা, রাণী সকলে জেগে বসে আছেন, কালরূপী সাপকে পাহারা দিতে। সাপের উপস্থিতি লক্ষ্য করার সঙ্গে সঙ্গে মহারাণী তাঁর জীবনের সমস্ত আবেগ ও সাধনা দিয়ে গান গেয়ে সাপের মনোরঞ্জন করলেন। সাপ কৌশল করে রাজার জীবনের মেয়াদ বাড়িয়ে দিলেন যমরাজকে দিয়ে। সেই থেকেই চলছে দীপাবলী উৎসবের ঘটা। চলছে দীপাবলীর আলোর উৎসবের সঙ্গে ভোজ। পিতৃগণকে পথ দেখিয়ে নিয়ে



আসার উদ্দেশ্য নিয়ে হউক, অথবা, রাজার আয়ু বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই হউক, দীপাবলীর আলো যে অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার বিদূরিত করে আলোর বন্যা নিয়ে আসে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এই আলোর আলোকে আমরাও আমাদের মনের অন্ধকার বিদূরিত করি, আমরা আলোকিত হই, উদ্ভাসিত হই।

॥ ১৩ ॥

দধিমুখোর রমন মুখুজ্যোকে পেতে হলে বাঁকুড়া থেকে বাসে কয়েক মাইল উত্তরে বহড়াকুলায় নেমে যাকে জিজ্ঞেস করা যাবে সেই বলবে ক্যাপ্টেন মুখার্জী তো, ঐ পথে চলে যান। কেউ বলবে, বামুনঠাকুর তো, ঐ খালের ধারের পথ ধরে একটু এগুলেই পেয়ে যাবেন। কেউ বলবে, ওস্তাদকে চাইছেন, আসুন দেখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে একটা সাইনবোর্ডের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বলবে, ঐ যে সাইনবোর্ড দেখছেন তার অনতিদূরেই ওস্তাদকে পেয়ে যাবেন ডিসপেন্সারীতে। সাইনবোর্ডে লেখা আছে ডাক্তার রমানাথ মুখোপাধ্যায়, এম.বি. হোমিওঅ্যালো, সুবর্ণপদকপ্রাপ্ত। এ ধরণের একজন উচ্চ শিক্ষিত চিকিৎসক সহর ছেড়ে গাঁয়ে পড়ে আছেন দেখে ভাল লাগল। খালি গায়ে, পৈতা গলায়, টিকিযুক্ত, খর্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণের মানুষটিকে মেজাজী মানুষ বলে বোধ হলো। নইলে এভাবে এত বিদ্যা নিয়ে কেউ গ্রামে পড়ে থাকে না।

অমায়িক এই চিকিৎসকটি ডিসপেন্সারী করেছেন একটি ছোট্ট খোড়ো চালাঘরে। ডিসপেন্সারীর আসবাব হচ্ছে একটি কাঠের বাক্স, গণ্ডা কুড়ি পুরান রোগধরা শিশি। তাতে আছে ছাতুর গুঁড়ো, পুরনো ঘি, পুরনো গুড়, একটি কুম্ভপাত্র আছে জল ভর্তি। জলের নীচে নানাবিধ গাছগাছড়ার ভেজানো শিকড়, বীজ, ছাল, পাতা, ফুল ও ফল। কয়েকটা শিশিতে নানা জাতীয় সিরাপ, ছোট্ট দরজাহীন ভাঙা আলমারীর মধ্যে নানা ধরণের শিশিতে নানা-জাতীয় বড়ি। সকাল আটটা থেকে বারোটা সাড়েবারোটা অবধি ডাক্তারখানা লোকে গমগম করে। বিকেল চারটা-পাঁচটা নাগাদও বৈকালিক রুগী আসে, থাকে রাত আটটা পর্যন্ত। রুগীরা চলে গেলেও ডাক্তারখানা স্তব্ধ হয়ে যায় না। সেখানে নিত্য এসে জড়ো হয় হাতেগোনা কয়েকজন লোক যারা সিদ্ধি গাঁজা ইত্যাদির সেবার দ্বারা ডিসপেন্সারীর রূপ বদলায়।

গাঁয়ের সব লোক, আশেপাশের সব লোক একথা জানেন। এও জানেন যে রমন মুখুজ্যে ইস্কুলের চৌকাঠও পার হন নি, অথচ জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য সাইনবোর্ড ঝুলিয়েছেন শশি মুখুজ্যের এই ছেলেটি। যে সাইনবোর্ড দেখলে মনে হয় রমন মুখুজ্যে যেন কত বিদ্বান, যেন কত বড় চিকিৎসক। এই

ছেলের জন্য বাবা রেখে গেছেন অনেক সম্পত্তি নেউলের ব্যবসা করে। ছেলে পোষেণ পাখি, নানাজাতের পাখি। এই ছেলে চৌদ্দ বছর বয়সে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে হয়েছিলেন নিখোঁজ। তারপর যখন গাঁয়ে ফিরে আসেন তখন ডাক্তার, কবিরাজ, ওঝা, ওস্তাদ, ছড়াকাটাবদ্যি প্রভৃতি নানাভাবে নিজেকে পরিচিত করে ফেললেন, সাইনবোর্ড লাগালেন। সকলেই এসব জানে। কিন্তু তাতে গ্রামবাসীর কিছু আসে যায় না। রমন মুখুজ্যে রোগ সারাতে পারেন। সারা সকাল-বিকাল লোক গিজগিজ করে তাঁর ডিসপেন্সারীতে। সকলের মাইডিয়ার লোক তিনি। বাপ, ছেলে, ছেলের মা, ছেলের বউ সকলের কাছে সমান জনপ্রিয়। জনপ্রিয়তার জন্যই রুগীর অভাব নেই তাঁর। নানা জায়গা থেকে রুগী আসে তাঁর কাছে। অনেকেরই রোগ সেরে যায় তাঁর প্রেসক্রিপশনহীন ভেষজ চিকিৎসায়। ওষুধ দিতে দিতে সকলকেই তিনি এক কথা বলেন—'চিন্তার কিছুই নেই, ভগবানের নাম রাখবেন আর এই ওষুধ খাওয়াবেন, ব্যাস।' ওষুধ দিতে দিতেই ছড়া বলেন—'বাঙালীর ঘরের মেয়েরা যদি রাখেন একটু খোঁজ। ' দেখতে পাবেন কত ওষুধ নাড়েন হররোজ। পানের সাজা ডাবরের মাঝে চূণ ভাঁড় আর মশলার হাড়ি। রান্নাঘরের কুলুঙ্গিতে কত ওষুধ ছড়াছড়ি। সে খবর রাখেন নাকো আজ-কালকার কুলবধূ। কথায় কথায় ডাক্তার আনো নিজে পড়ো নভেল শুধু।' ওঁর কাছে এলেই এ ধরণের ছড়া শুনতে পায় রোগী রোগিনীরা। শুনতে



পায়—'কি বলে কে প্রেমের চিঠি লিখেছিল কবে কাকে, নভেল পড়া বধূ-দিগের সেগুলো সব মনে থাকে। কিন্তু খোকার সর্দি হলে কি হবে তাই ভেবেই খুন। দুঃখ হয় জানে নাকো তুলসীপাতার এমন গুণ।' এরূপ ছড়া বলতে বলতে তিনি জেনে নেন রোগ ও রুগী সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য। জেনে নেন রুগীর বাড়ীতে গাছপালা, পুরাতন বাসন-কোসন, তুলসীমঞ্চ, ফুলের

চাষ ইত্যাদি আছে কি না। ওষুধ দিতে দিতে তিনি আবার বলেন—'নিম বেল তুলসী আর সূর্যমুখী তরু, বাড়ীতে থাকলে পরে রোগে কেন হবেন ভীরু ? চুন, কর্পূর, মৌরী, খয়ের, যৈত্রী, এলাচ, পান-সুপারী, লবণ জিরা হলদিগুঁড়া সবই রোগের উপকারী। উঠোন পাশে দূর্বাগুলো খিড়কী পাশে শিউলি আছে, বাগানের ঐ বেলের পাতা তুলসী আছে হাতের কাছে। ভাঙ্গা বাসন ছেঁড়া কাপড় ঘর ঝেটানো আবর্জনা, কাপড়ের পাড় টুকরো সুতো অকেজো তার একটিও না। জামের কালে জামের বিচি আমের কালে আমের আঁটি, না ফেলে রাখিও ঘরে ধৌত করে পরিপাটি। নারকেলের শাঁসটি নিয়ে ছোবড়া মালা রেখো তুলে, নিজের কিম্বা অপর কারুর আসবে কাজে কোনকালে। ফেলিবার জিনিষ নয় কমলালেবুর খোসাগুলো, অজীর্ণ পেট ফাঁপার ওষুধ পানে খাবার মশলা ভালো। বেদানা ডালিমের খোসা শুখায়ে রাখিও ঘরে, রক্তামাশায় সারে খেলে কুড়চি সনে সিদ্ধ করে। হিং কর্পূর দারুচিনি পুরান সিদ্ধি দূর্বামূল। ঋতুর পূর্বে বেটে খেলে শীঘ্র যাবে বাধক শূল। গোলমরিচ উনুনের মাটি বেল পাতা আর ধুতরা পাতা, জলে বেটে গরম করে লাগালে যায় বাতের ব্যথা। চাপা আর আনারস পাতা রস করে এক কাচ্চা। চূণের জলে গুলিয়ে খেলে মরে কৃমির ডাগর বাচ্চা। নিমপাতা আর হলুদের গুঁড়ো ঘরের ঝুল আর তেল লাগালে, সেরে যায় খোস পাঁচড়া মৌরী জলের সাথে খাওয়ালে। অজীর্ণ দুধ তোলা বমি ও শিশুদের রোগের বেলায়। সারবেই বীট লবণ মরিচের গুঁড়ো কর্পূর আর সুপারী পোড়ায়। তামাক খেয়ে গোলটি নিয়ে দাঁত মাজিলে। দাঁতের রোগ সেরে যাবে রোগ থাকবে না কোনকালে'। এই ভাবে আনন্দ হুল্লোড়ের মধ্যেই চলে তাঁর চিকিৎসা। তাঁর ডাক্তারী।

সকলেই জানেন যে নানাভাবে নানা রোগের উৎপত্তি। আধুনিক পরীক্ষানিরীক্ষায় জানা গেছে, বেশ কিছু রোগের উৎপত্তি বংশগত ভাবে। অর্থাৎ পরিবারের কোন একজনের কোন একটি বিশেষ রোগ থাকলে বংশপরম্পরাগত ভাবে তার প্রকাশ পায়। শরীরবিজ্ঞানীরা বলেন রোগবাহক ব্যক্তির সন্তানদের শতকরা পঞ্চাশজনের পিতৃরোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। যদি কোন লোক পিতামাতার কাছ থেকে বংশানুসরণে অ্যালেলি পায় তবে সেই ব্যক্তিকে বলা হয় ওই জিনের সমপ্রকৃতি বা 'হোমো জাইগাস', এবং সে যদি ভিন্ন ভিন্ন অ্যালেলি পায় তবে তাকে বলা হয় সে জিনের ভিন্নপ্রকৃতি বা 'হেটেরোজাইগাস'। এই জিন হচ্ছে একটি সুবৃহৎ

অনুর অংশ। প্রজাতি চরিত সম্পাদনের একক হল এক একটি জিন। যদি কেউ তার পিতার কাছ থেকে দশটি জিন এবং মাতার কাছ থেকে দশটি জিন, মোট কুড়িটি জিন পায় তবে তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থায় কুড়িটি চরিত্র প্রকাশ পাবে। এই জিনের জন্যই নবজাতক শিশুর চোখ অনেক সময় মায়ের মত, মুখ বাবার মত ইত্যাদি হয়ে থাকে। চুল কটা বা কালো থেকে সুরু করে লম্বা, বেঁটে ইত্যাদি সব কিছুই জিনের সাহায্যে প্রস্তুত ও আরোপিত হয়। প্রতিটি কোষের নিউক্লিয়াসে এই জিন সুতোর বলের আকারে অবস্থান করে। কোষ-বিভাজনে এই সুতোর পাক খুলে যায় তখন সূত্রগুলোকে আলাদা আলাদা দেখা যায়। এই সুতোগুলো ক্রমসূত্র। জন্মসময়ে ভ্রূণ মা বাবার নিকট থেকে এক প্রস্থ করে ক্রমসূত্র পায়। ক্রমসূত্রগুলোব বিন্যাসের দ্বারা ভ্রূণের জন্মলগ্ন থেকেই তার প্রজাতিগত চরিত্র নির্ধারিত হয়ে যায়। এই সূত্রেই হয় বংশগত রোগের আক্রমণ। অনেক সময় প্রকট বংশগত রোগের বহনকারী রোগ সংক্রমণে সমর্থ হয় না। রোগ বহনকারীর সঙ্গে নিরোগদেহীর বিবাহে শতকরা পঞ্চাশজনের রোগাক্রান্ত হওয়া সম্ভব বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। এবং অপর পঞ্চাশভাগের সন্তানদের কোন রোগ থাকারই সম্ভাবনা। তবে এটা তো সত্যই যে, যে-কোন লোককে যে-কোন সময় যে-কোন রোগে আক্রান্ত করতে পারে। বেশীর ভাগ যৌনসম্বন্ধীয় উত্তরলব্ধি-জনিত বা ইনহেরিটরী রোগের জন্য এক্স-ক্রোমসোম দায়ী। এ রোগ নারী বহন করলেও সে নিজে প্রায়শই থাকে রোগমুক্ত। অনেক বংশগত রোগের উপলব্ধি হয় অংশত অথবা জটিল। জন্মগত দৈহিক বিকৃতি এই পর্যায়ে পড়ে। মানসিক ব্যাধিতেও অনেকে ভোগে। মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির ভ্রাতা, ভগ্নী, সন্তানদের এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ হলে প্রচ্ছন্ন উত্তর-লব্ধি সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত। কারণ, সন্তানদের এই ধরণের রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। শরীর বিজ্ঞানীদের এই পরামর্শ মনে রেখে আমরা দেশজ চিকিৎসা বা আয়ুর্বেদ ও প্রাকৃতিক চিকিৎসার দিকে নজর দিতে পারি। লোক সমাজ আয়ুর্বেদের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত।

আয়ুর্বেদ মতে ব্যাধি হচ্ছে রোগ 'রুজতীতি ইতি রোগম'—যা কিছু পীড়াদায়ক বা যন্ত্রণাদায়ক তা-ই রোগ। এই রোগভয় যে দূর করে সে ভেষক—'ভেষং রোগভয়ং জয়তীতি ভেষজম।' এক এক ভেষজের এক একপ্রকার

স্বতন্ত্র রোগনাশক ক্ষমতা। ভেষজ প্রস্তুত কার্যে কোন দ্রব্য কতটুকু গ্রহণ করতে হবে তার পরিমাণ নির্ধারণে সূক্ষ্ম মানদণ্ড আছে। রুদ্ধ জানলার রন্ধ্রপথে অনুপ্রবিষ্ট সূর্যকিরণ পথে যে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণিকা দৃষ্ট হয় তার এক একটিকে বলে 'বংশী', ছয় বংশীতে এক 'মরীচ', ছয় মরীচে এক 'রাজিকা', তিন রাজিকায় এক 'সর্ষপ', আট সর্ষপে এক 'যব', চার যবে এক এক 'রতি', ছয় রতিতে এক 'মাষা', আট মাষায় এক 'তোলা'। এই বংশী-মূলক মানদণ্ডের উপর নির্ভর করে ভেষজ ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী।

ভেষজের মূলাধার দ্রব্য পার্থিব দ্রব্য নামে পরিচিত। প্রাণী ও জড় জগৎ থেকে ভেষজ চিকিৎসক স্থাবর ও জঙ্গম ওষধি সংগ্রহ করেন। স্থাবর ওষধি চার প্রকার—বনস্পতি, বৃক্ষ, বীরুদ্ধ ও প্রকৃত ওষধি। ওষধি বৃক্ষে ফুল ফোটে না শুধু ফল হয়, যেমন ডুমুর। যে গাছে ফুল ফোটে ও ফল হয়, তা বৃক্ষ। গুল্মজাতীয় ও লতানেগাছ বীরুদ্ধ, যেমন পান। এবং ফল পাকলেই যে গাছ মরে যায় তা প্রকৃত ওষধি, যেমন ধান, বা কলা গাছ। প্রাণীজগতের জঙ্গম ওষধিকেও চারশ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন—গর্ভজ, যথা গরু, হরিণ প্রভৃতি; অণ্ডজ, যথা পাখী, সাপ, ইত্যাদি; স্বেদজ, যথা পিঁপড়ে কীট, ইত্যাদি এবং পচনশীল যথা মাংস, ফল ইত্যাদি।

ভেষজ নির্মাণের জন্য বল্কল, পত্র, ফুল, ফল, মূল, কন্দ, শিকড়, গাছের রস, প্রভৃতি দরকার হয়। ওষধির জন্য দেবালয়, উইটিবি, কূপমধ্যেজাত এবং শ্মশানে ও বৃক্ষমূলে উৎপাদিত দ্রব্য ব্যবহৃত হয় না। ঋতুভেদে ওষধি আহরণ-প্রথা লক্ষ্যণীয় ব্যাপার। শীতে বৃক্ষের মূল, গ্রীষ্মে পাতা, বর্ষায় বল্কল, বসন্তে কন্দ, শরতে নির্যাস ও হেমন্তে সার সংগ্রহ করে রাখতে হয়। অর্থাৎ যে বৃক্ষের ফুল ও ফল যে ঋতুতে জন্মে সেই ঋতুতে তা সংগ্রহ করে রাখতে হবে। যথানিয়মে আহৃত ভেষজ-বৃক্ষ-লতা-গুল্ম সযত্নে সংরক্ষণ করতে হবে। ভাণ্ডার ঘরের দুয়ার পূর্ব বা উত্তরমুখে অবস্থিত হবে, এবং সে ঘরকে জল, আগুন, ধোঁয়া ও ধুলোবালি প্রভৃতির হাত থেকে বাঁচাতে হবে। জান্তব প্রাণীজগৎ থেকে আহৃত হয় চর্মত্বক, লোম, রক্ত, মাংস, চর্বি, তৈল, অস্থি প্রভৃতি। হরিণের নাভিদেশ থেকে সংগ্রহ করতে হয় কস্তুরী। ধাতু এবং খনিজপদার্থ সংগ্রহেরও নিয়ম আছে। এবং এইসব নিয়মকানুন পর্যালোচনায় বোঝা যায় যে একাজে সতর্ক ও একনিষ্ঠ দৃষ্টিশক্তি ও নিরীক্ষণ নিপুণতা কাজ করছে। রমন মুখুজ্যে নিপুণ নিরীক্ষক। তিনি রোগীর চোখ-মুখ দেখেই রোগ ঠাওর করতে পারেন, তার সংগৃহীত গাছগাছড়া ও ভেষজ

ওষধির সাহায্যে রোগীর রোগও নিরাময় করতে পারেন।

টাকা পয়সার প্রতি তাঁর খুব ঝোঁক নেই। আছে সকলকে জ্ঞান দেবার নেশা। আছে বন্ধুপ্রীতি। বন্ধুপ্রীতি বশত তিনি তাঁর ডিসপেন্সারীকে সন্ধ্যায় নেশাখোরদের আড্ডাখানায় পরিণত করেন। নেশা ভাঙের লোভে বহুলোক এসে সমবেত হয়। সকালের ডিসপেন্সারীর চেহারা রাত্রে অন্যরূপ। সকালের রমন মুখুজ্যে পরোপকারী, রাত্রে নেশার ভিখারী। সকালে-বিকালে তিনি তাঁর সমস্ত রুগীকে প্রাকৃতিক চিকিৎসার প্রাথমিক খুঁটিনাটি জানিয়ে দেন। তাঁর আক্ষেপ, আজকালকার লোকেরা আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি পছন্দ করে কেন তিনি বুঝতে পারেন না। তাঁর ধারণা যে দেশের যা রোগ সেই দেশেই তার চিকিৎসার উপাদান রয়ে গেছে। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া মাত্রই এ ধরণের নানা কথা তিনি শুনিয়ে দিলেন। বললেন, 'লিখবেন নাকি কিছু ? লিখুন লিখুন, সব লিখলে মহাভারত হয়ে যাবে।' তিনি টোটকা ও প্রাকৃতিক চিকিৎসার হিসাব দিচ্ছিলেন। বলছিলেন, নাক দিয়ে রক্ত পড়লে রোগীকে ভাল করে জানালার কাছে যেদিকে হাওয়া বইছে সেই হাওয়ার মুখোমুখি একটু সামনের দিকে ঝুঁকে বসিয়ে রোগীর জামা খুলে ফেলতে হবে। রোগী নাক দিয়ে নিশ্বাস নেবে না। নাক ঝাড়বে না। নাকের শক্ত জায়গার নীচে চেপে ধরে রাখতে হবে। পরে আস্তে আস্তে হাত খুলে বা সরিয়ে ফেলতে হবে। গলায় ফাঁস লাগলে যার দ্বারা গলায় ফাঁস লেগেছে সেটাকেই খুলে ফেলতে হবে। গলায় দড়ি দিয়ে কোন লোক ঝুললে তাকে উঁচু করে ধরে গলার ফাঁস খুলে ফেলতে হবে। ধোঁয়ায় দম বন্ধ হলে রুমাল বা যে কোন পরিষ্কার কাপড়ের টুকরো ভিজিয়ে নিয়ে নাকের উপর জড়িয়ে দিতে হবে। বিষাক্ত গ্যাসাহত রোগী যে ঘরে আছে সেই ঘরের জানালা সঙ্গে সঙ্গে খুলে দিতে হবে। যেখানে জানালা নেই সেই ঘরে যতদূর সম্ভব দম বন্ধ করে ঘরে ঢুকে রোগীকে খোলা জায়গায় বার করে আনতে হবে। তেমন প্রয়োজনে মুখোস ব্যবহার করা যেতে পারে। ইলেকট্রিক শক বা ইলেকট্রিক কারেন্ট মানুষের দেহের ভিতর দিয়ে মাটিতে চলে যায়। আস্তে আস্তে বুকের ভিতর দিয়ে কারেন্ট গেলে ভয় বেশী। এই সময় হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যায় মনে হলেও হৃদযন্ত্র ঠিকই চলতে থাকে। এই সময় কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস অব্যাহত রাখতে হয়। হৃদযন্ত্র অব্যাহত থাকলে রোগীও বেঁচে থাকবে। ইলেকট্রিক শক খেলে সঙ্গে সঙ্গে সুইচ বন্ধ করতে হবে। সে সুযোগ না থাকলে বৈদ্যুতিক তার টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করতে হবে।

কোন রকম লোহার ছুরি বা কাঁচি দিয়ে তার কাটতে গেলে বিপদ হবে। কাপড়ে আগুন লাগলে কম্বল, মোটা চাদর, কাঁথা, চট বা টেবিল ক্লথ জাতীয় যে কোন আবরণ সামনে রেখে সেটা দিয়েই জড়িয়ে রুগীকে তাড়াতাড়ি চিত করে মাটিতে শুইয়ে ফেলতে হবে। অগ্নিলাগা ব্যক্তি একা হলে সে সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে শুয়ে গড়িয়ে যাবে, সামনে যা পাবে সেই আচ্ছাদন দিয়েই আগুন নিভিয়ে ফেলার চেষ্টা করবে। তারপর চেঁচিয়ে লোক ডাকবে। মৃগী রোগ দুই ধরনের। সামান্য মৃগী রোগ ও গুরুতর মৃগী রোগ। হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, বেশ কয়েক সেকেণ্ড শক্ত হয়ে যাওয়া, মুখের ভাব লাল হওয়া ও মুখ দিয়ে ফেনা বেরোনা ইত্যাদি মৃগী রুগীর লক্ষণ। এই সময় রোগীকে স্থানান্তরিত করতে নেই। রোগী যাতে জিভে কামড় না খায় তার জন্য একটি শক্ত জিনিস রুমাল দিয়ে দাঁতের পাটির মধ্যে ঢুকিয়ে মুখের ফেনা পরিষ্কার করে দিতে হবে। পরে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে হবে। রোগী স্বাভাবিক হ'লে অল্প চা বা গরম দুধ খাওয়াতে হবে। মূর্ছা যাওয়ার কারণ মনের আবেগ এবং মানসিক অবস্থা। এই রোগীকে বিশেষ সহানুভূতি দেখাতে নেই। মনকে দৃঢ় রেখে তার সঙ্গে কথা বলতে হবে এবং যতক্ষণ না রোগী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছে ততক্ষণ তাকে চোখে চোখে রাখতে হবে। অনেক সময়ই গরমে যখন ক্লান্তি আসে তখন মাথা ঝিম ঝিম করে, মাথা ধরে, গা বমি বমি করে। পেটেও ব্যথা ব্যথা মনে হয় এবং সারা শরীরে এক অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। কিছু চিন্তা করা যায় না। মুখের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। এ অবস্থায় রোগীকে ঠাণ্ডা, খোলা-মেলা-ছাওয়া জায়গায় বা গাছের তলায় নিয়ে যাওয়া উচিত। পরে একগ্লাস ঠাণ্ডা জলে আধ-চামচ নুন মিশিয়ে খেতে দিতে হবে। যখন রোগীর শীত শীত করবে তখন গা গরম কাপড়ে ঢাকতে হবে। গরম কাপড় চাপা দিতে দেরী করলে সর্দিগর্মী হতে পারে। সর্দিগর্মীর উপসর্গ প্রথম প্রথম মাথা ধরা, গা বমি বমি করা, মুখ লাল হয়ে ওঠা। এই সময় গায়ের উপরের চামড়া খুব গরম ও খসখসে মনে হয়। নাড়ীও খুব জোরে চলে, শরীরের তাপ বাড়তে বাড়তে অনেকক্ষেত্রে ১০৭ ডিগ্রীরও উপরে চলে যেতে দেখা যায়। এই রোগীকে ঠাণ্ডা, খোলামেলা জায়গায় নিয়ে গা থেকে কাপড় খুলে দেবে। গায়ের উপর কিছু কিছু জল ছিটাবে, কিংবা ভিজে কোন কাপড় দিয়ে মুড়ে হাওয়া করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে শরীরের উত্তাপ কতখানি কমলো। উত্তাপ স্বাভাবিক হলে শুকনো কাপড় দিয়ে জড়িয়ে দিতে হবে।

যে কোন পদার্থ বেশী পরিমাণে শরীরে গেলে বিষক্রিয়া আরম্ভ হয়। বিষাক্ত গ্যাসে, মটরের ধোঁয়ায়, বিস্ফোরণে, গ্যাস উনানে, এবং স্টোভ-এর গ্যাস শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসের মধ্যে গেলে বিষের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। বিষ গিলে খেলে খাবারের রাস্তা দিয়ে বিষ যখন প্রবেশ করে তখন হেঁচকি হয়, গা বমি বমি করে, পেট খারাপ হয়। বিষাক্ত গ্যাস ছাড়া, অনেক সময় পচা খাবার এবং আফিম জাতীয় খাবার সরাসরি পেটে গিয়ে দারুণ যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। পেটে ও মুখে ইন্‌জেকসন থেকেও অনেক সময় বিষক্রিয়া হয়। সাপ জাতীয় প্রাণীর এবং পোকামাকড় ও কোন খ্যাপা জন্তু, যেমন পাগলা কুকুর, কামড় দিলে দেহ বিষাক্ত হয়। বিষ খেলে সঙ্গে সঙ্গে যে বিষ খেয়েছে সেই বিষের অবশিষ্ট অংশ সন্ধান করা অত্যন্ত আবশ্যক কোন্ ধরণের বিষ খেয়েছে তা জানার জন্য। রোগী বমি করলে বমির অংশ বিশেষ পরীক্ষার জন্য রেখে দিতে হয়। রোগী সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে উপুড় করে তাকে শোয়াতে হয়, তার শিয়রে বালিশ দিতে নেই। শ্বাসপ্রশ্বাস ক্ষীণ হলে কৃত্রিমভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস আনবার বা চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে। বিষ গিলে খেয়েছে জানলে রোগীকে বমি করাতে হয়। এই কাজে চামচ অথবা গলায় আঙ্গুল দিয়ে কিংবা পালকের সুড়সুড়ী দিয়ে করতে পারা যায়। এতে কাজ না হলে সামান্য গরম এক গ্লাস জলে দু এক চামচ নুন মিশিয়ে সেই জল খাইয়ে দিলে বমি হবেই। রোগী অচৈতন্য থাকলে বমন করানো উচিত নয়। ঠোঁট, মুখ ও গা পুড়ে গেলেও বমন করানো উচিত নয়। এ ক্ষেত্রে বিষঘ্ন ওষুধ ব্যবহার করে বিষের ক্ষমতাকে নিষ্ক্রিয় করতে হয়; যেমন এসিড গলাধঃকরণ করলে চুণ জাতীয় কিংবা মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া দেওয়া যেতে পারে। মাঝে মাঝে জল খাইয়ে বিষকে তরল রাখা যেতে পারে। তজ্জন্য ঠাণ্ডা জল, দুধ, বার্লি ইত্যাদি দেওয়া যেতে পারে। কানে কিছু ঢুকলে অর্থাৎ কোন পোকা-মাকড় যদি কানে ঢোকে তাহলে কিছুটা অলিভ-অয়েল বা স্যালাড-ওয়েল, কিংবা দুচার ফোঁটা সারজিক্যাল স্পিরিট ঢেলে দিতে হয় কানে, এর ফলে পোকা-মাকড় উপরে ভেসে উঠে বেরিয়ে যাবে। নাসিকার মধ্যে কিছু ঢুকলে মুখ দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে হবে। গলায় মাছের কাঁটা আটকালে প্রথমে কয়েক দলা ভাত গোল গোল করে গিলে খেতে হবে। চোখে কিছু পড়লে চোখ রগড়ানো উচিত নয়। চোখে যদি কিছু বিঁধে না থাকে কিন্তু ময়লা পড়ে তবে বাড়ীতে এসে সে ময়লা বের করার চেষ্টা করতে হয়। যদি কিছু বিঁধে থাকে তাহলে রোগীর চোখের

পাতা বন্ধ করে ও তার উপর তুলোর প্যাড দিয়ে চোখ বন্ধ করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে আসতে হবে। কুকুরে কামড়ালে সাধারণত পরিষ্কার শুকনো ড্রেসিং বেঁধে দিয়ে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। কীট-পতঙ্গ হুল ফোটালে এবং যদি সে হুলের কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে ছুঁচ পুড়িয়ে স্পিরিট দিয়ে পুঁছে আস্তে আস্তে হুল তুলে ফেলা উচিত। তবে মুখে হুল ফুটলে বাই-কার্বনেট অব সোডা দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে (এক চামচে বাই-কার্বনেট অব সোডা এক গ্লাস জলে ব্যবহার করা যেতে পারে)। খিল ধরা বা কনকনে শীতে স্নান করার সময়, ভীষণ পেট খারাপ হলে এবং বমি করার ফলে শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় পদার্থ বেরিয়ে গেলে শরীরে খিল ধরে। তখন দু গ্লাস জলে আধ চামচ নুন মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়। সাপে কামড়ালে গাঁয়ের লোক সাধারণত ওঝা ডাকে। সাপেকাটার নানাবিধ চিকিৎসা আছে। সাধারণত দু ধরনের সাপ দেখা যায়। যেমন বিষধর ও বিষ-হীন। অনেক সময় বিষহীন সাপ কামড়ালেও মানুষ ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। কিন্তু রোগী যাতে ভীত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যদি সাপ দেখতে পাওয়া যায় তাহলে সর্পদংশন প্রতিষেধক সেরাম লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য যাঁরা ঐ সেরাম ব্যবহারে পটু তাঁরাই তা ব্যবহার করতে পারেন। যাতে বিষ ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্য ক্ষত স্থানের দু দিকে শক্ত করে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিতে হয় এবং আধ ঘণ্টা পরে আলগা করে দিতে হয় মাত্র আধ মিনিটের জন্য। তিন ঘণ্টা ঐরূপ বাঁধা অবস্থায় রাখার পর যদি রোগীর বিষ আক্রমণের কোন লক্ষণ দেখা না যায় তাহলে বাঁধন খুলে দিয়ে ক্ষতস্থান পটাস পারম্যাঙ্গানেট জল দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে। তারপর ব্লেড বা ধারাল ছুরি (আগুনে একটু পুড়িয়ে) দিয়ে ক্ষতস্থান চিরে দিতে হবে। পরে চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হবে। এই আপৎকালীন অবস্থায় যখন কোন ব্যবস্থাই কার্যকরী হয় না তখন দংশিত স্থান থেকে বিষ চুষে ফেলে দেবার নিয়ম। এই ব্যবস্থায় যে চুষবে তার বিপদ আছে। সেজন্য সম্ভবমত সরু রবার বা পলিথিন শীটের মধ্যে দিয়ে চুষতে হয়। তারপর রোগীকে বমন করাতে হবে। পরে গরম ঘি কিংবা ডিমের সাদা অংশ খেতে দিতে হবে। সাপের বিষ ছাড়াও আর্সেনিক বা শেঁকো বিষেও অনেকে আক্রান্ত হয়। এই বিষ সাধারণত সাদা মাটির মত দেখায়। চামড়া বা কাঠের তৈয়ারী জিনিস-পত্র যাতে রক্ষা করা যায় তার জন্য নানা প্রকার ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয় শেঁকোবিষ। এর কোন স্বাদ নেই বলে খুবই সহজেই একে মিষ্টিদ্রব্যের সঙ্গে

মিশানো যায়। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া খুবই মারাত্মক, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। অন্যান্য বিষ খেলে যা করা হয় এক্ষেত্রেও তাই করতে হবে। বমি করানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সম্মোহন অবস্থা দূর করার জন্য মুখে তোয়ালে বা ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিতে হবে। গরম কফি এবং বড় চামচের এক চামচ ব্রাণ্ডি উত্তেজক হিসাবে খাওয়ানো যেতে পারে। প্রয়োজন হলে গরম কাপড় দিয়ে গা ঢেকে রেখে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখতে হবে। তাছাড়া, বিষফল বা ধুতুরার বিষও অনেকে খেয়ে বসে। ধুতুরার গুঁড়ো খুব মারাত্মক নয়, তবুও এটা খাবার পরই স্বরনালী শুকিয়ে যায়, মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে, গায়ের চামড়া গরম এবং শুষ্ক বোধ হয়। এমন কি কোন কিছু খেতে গেলেও অস্বস্তি বোধ হয়। তার ফলে মানুষের শেষ পর্যন্ত মৃত্যুও হতে পারে। নিরাময়ের জন্য প্রথমে বমির চেষ্টা করাতে হবে এবং চোখ ও মুখে জলের ঝাপটা দিতে হবে। তারপর গরম চা এবং এক বড় চামচ ব্রাণ্ডি খাইয়ে দিতে হবে। প্রসূতি ব্যবস্থায় স্ত্রীলোক যখন প্রসব যন্ত্রণায় কষ্ট পান তখন কোন ডাক্তার বা ধাত্রীকে ডাকা উচিত এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো উচিত। এই সময় রোগীনীর পিছনে বালিশ দিয়ে যথাসম্ভব আরামে রাখার চেষ্টা করতে হবে। তাকে গরম চা বা গরম দুধ প্রভৃতি খাওয়াতে হবে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেবার পরামর্শও দিতে হবে।

ডাক্তার বা ধাত্রী আসবার আগে যদি শিশু জন্মগ্রহণ করে তবে শিশুকে এমন জায়গায় রাখতে হবে যাতে শিশুর নাড়ির সঙ্গে মায়ের নাড়ির টান না পড়ে। নবজাত শিশুকে যথাসম্ভব গরম রাখা দরকার। জোঁক ও কীটও মানুষকে কাবু করে দংশন মারফত। এদের কামড় মানুষ সহজে বুঝতে পারে না। কামড়ে ধরলে সহজে ছাড়ে না। তখন জ্বলন্ত দেশলাই, সিগারেট, কিম্বা জ্বলন্ত কাঠির অংশ তার শরীরে লাগালে হয়তো ছেড়ে দিতে পারে। লবণ, পেট্রোল অথবা প্যারাফিন দিলেও ওরা ছেড়ে যায়। কামড়ের পর পরিষ্কার তুলোতে স্পিরিট লাগিয়ে ঐ স্থানটি পরিষ্কার করতে হয়। জ্বালা ধরলে বাই-কারবনেট অব সোডা, ও পাতলা এমোনিয়া দিয়ে জ্বালা দূর করতে হবে। এবং শুধু কাপড় দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করতে হবে। জলাতঙ্ক রোগ সাধারণত কুকুর, শিয়াল, বাঁদর, ঘোড়াদের এক প্রকার সংক্রামক রোগ। এই রোগগ্রস্ত যে কোন জন্তু মানুষকে কামড়ালে, আঁচড়ালে বা চাটলে মানুষেরও এই রোগ হয়। আক্রমণের অবস্থা তিনভাবে দেখা যায়। কামড়ানোর পর জ্বালা বাড়তেও পারে, নাও বাড়তে পারে। কামড়ানোর দুই একদিন পরে উত্তেজনা

দেখা দেয় এবং দু'একদিন থাকেও। এই রোগাক্রান্ত মানুষ কোনরকম আলো বা গোলমাল সহ্য করতে পারে না। রোগী অস্বাভাবিকভাবে কাতর হয়ে পড়ে। রোগীর কণ্ঠনালীর, মাংসপেশীর ও শ্বাসযন্ত্রের ভীষণ যন্ত্রণা হয়। তবে এ অবস্থায়ও সে জ্ঞান হারায় না। এই রোগীর অবসাদ ভাল নয় তা পক্ষাঘাতের কারণ হয়। এই রোগ একবার পুরোপুরি বেড়ে গেলে আর সারান যায় না। কুকুরকে যদি অসুস্থ মনে হয় সে যদি খেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে এবং নাসিকা যদি তার উত্তপ্ত হয় তখনই কুকুরকে বেঁধে রাখতে হবে এবং কুকুরের চিকিৎসা করতে হবে। এই সময় জল বা খাবার কোন পাত্রে দিয়ে নাগালের বাইরে থেকে ছড়ি দিয়ে এগিয়ে দিতে হবে। যদি কুকুর ভাল হয়ে যায় তবেই তাকে ছাড়তে শৃঙ্খলমুক্ত করতে হবে। যে স্থানে কামড়েছে বা আঁচড়েছে সাবান দিয়ে সে সব স্থান ধুয়ে ফেলতে হয়। তীব্র কার্বলিক এসিড পাওয়া গেলে দেশলাইয়ের কাঠি বা চ্যাঁচাড়ী ঐ এ্যাসিডে ডুবিয়ে ক্ষতস্থানের চারদিকে বুলিয়ে দিতে হবে। ক্ষত গভীর হ'লে গভীরেই ঔষধ বুলিয়ে দিতে হবে। এই এ্যাসিড প্রথমে একটু জ্বলে বটে পরে জায়গাটা অসাড় হয়ে যায়। কার্বলিক এ্যাসিড না থাকলে ছাতার সিকের মতন সলাকা পুড়িয়ে ছেঁকা দিয়ে ওই জায়গাটা পুড়িয়া ফেলা যায়। প্যারমাঙ্গানেট অব পটাস-এর গুঁড়ো ভাল করে জলে গুলে সে জল লাগান যেতে পারে। সিলভার নাইট্রেট বা উগ্র নাইট্রিক এ্যাসিডও ব্যবহার করা চলে। এ ধরনের নানাবিধ টোটকা ও গৃহচিকিৎসার পরামর্শ দেন রমন মুখুজ্যে যাকে পান তাকেই। রমন মুখুজ্যের কথা থুথুর রেঞ্জে এসে গেলে একথা শুনতে হবেই। তাই এখন আমরা তাঁকে ছেড়ে হুগলীর জনৈক ডাক্তারের কাছে যাব, তাঁর বক্তব্য শুনতে।

হুগলী গজিনাদাসপুরের ডাক্তার শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিঙ্গাপুরে যুদ্ধের ডাক্তার ছিলেন। দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে দেশে ফিরে নিজের গাঁয়েই নিজে ডিসপেনসারী খুলে বসেছেন। তাঁরই চেষ্টায় গ্রামের স্কুল হয়েছে, সরকারী স্বাস্থ্যনিবাস হয়েছে। তিনি আধুনিক চিকিৎসায় বিশ্বাসী। এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। কিন্তু সময় মত ওষুধ পান না। দূরে গ্রামে থাকেন বলে নতুন নতুন ওষুধের খোঁজ-খবরও পান না সর্বদা। তাছাড়া, গ্রামবাসীও সর্বদা এ্যালোপ্যাথি ওষুধ কেনার টাকা জোগাড় করতে পারে না। তাই তাঁকেও অনেক সময় টোটকা চিকিৎসার আশ্রয় নিতে হয়। অবশ্য তিনি শিশুবিশেষজ্ঞ, আমরা তাঁর কাছে যেতেই তিনি আমাদের শোনালেন শিশু কাঁদে কেন

সে সম্পর্কে অনেক কথা। তিনি বললেন শিশুর কথা বলার কথা। তিনি বললেন ঃ

শিশুর কান্না বা তার অস্ফুটভাষ (ব্যাবলিং) কিন্তু কথা বলা নয়। অস্ফুট ভাষ বা মা-মা-মা শব্দ শিশুর খেলার ভাষা। এতে উচ্চারণের আনন্দেই শিশু ভরপুর। শিশু কথা বলার আগে নানাভাবে অঙ্গভঙ্গি মারফত মনের ভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করে। এ ক্ষেত্রে শিশুর সারা দেহ কথা বলে। এই সময় শিশু অঙ্গভঙ্গি সঞ্চালন করে বা 'ব্যাবলিং' করে। যা প্রকাশ করতে চাইছে তার উত্তর দিতে হবে তাকে স্পষ্ট উচ্চারণে বারে বারে। সাধারণত এক দেড় বছরের মধ্যে শিশু কথা বলতে আরম্ভ করে। তার এই বাকশক্তি বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি নির্ভরশীল। এই বিষয়সমূহ হচ্ছে— শ্রবণইন্দ্রিয়, পরিবেশ ও বুদ্ধিমত্তা। কথা বলার জন্য নানাভাবে শিশুকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। এই উৎসাহের অভাবে তার বাকশক্তি বিলম্বিত হতে পারে। কথা বলতে এসে শিশু ভুল করবেই। ভুল বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজেই ভুল শুধরে নেয়। দৈহিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভুল ও ভুল শুধরানোর পথে এবং প্রত্যক্ষভাবে সে শব্দের অর্থ শেখে। আছাড় খেতে খেতে যেমন হাঁটা শেখে, তেমনি ভুল-শুদ্ধের মধ্য দিয়ে সে কথা বলতে শেখে। বহু বিজ্ঞানী মনে করেন শিশুর বাকশক্তি যত তাড়াতাড়ি ঘটে তত হয় তার বুদ্ধির মান উন্নত। তাঁদের মতে বুদ্ধি ও বাকশক্তির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। অবশ্য বিজ্ঞানীরা বলেন, বিলম্বিত বাকশক্তি সর্বদা অল্পবুদ্ধির নির্দেশ করে না। কোন শিশুর পক্ষেই সর্বদা কাঁদা ভাল নয়। যদিও কান্নার নানা কারণ। যেমন ক্ষুধা, পেটের ব্যথা, ভয় প্রভৃতি। বেশী কান্না শরীর ও মনের পক্ষে ক্ষতিকারক। মা-দিদিমারা এ কথা জানেন। জানেন বলেই যখন শিশু কোন কারণে কান্না সুরু করে তখন তাকে কোলে তুলে নিয়ে নানাভাবে সে কান্না থামাবার চেষ্টা করে থাকেন তাঁরা। বলেন—'কে মেরেছে কে ধরেছে কে দিয়েছে গাল। খোকার গুণের বালাই নিয়ে মরে যেন সে কাল।' অথবা 'কাঁদুনে রে কাঁদুনে কুলতলাতে বাসা। পরের ছেলে কাঁদবে বলে মনে করেছ আশা॥ হাত ভাঙব পা ভাঙব করব নদীপার। সারারাত কেঁদোনারে জাদু ঘুমও এবার।' এতেও কাজ না হলে সুর দিয়ে তাঁরা বলতে সুরু করেন—'বুড়া আমায় মারিছে, আঙুল আমার ভাঙ্গিছে, ভাঙ্গা আঙুলে আমার আংটি পরাইছে। তোমরা হাইস্য না গো বাবুরা, বুড়া আমায় মারিছে। বুড়া

আমায় মারিছে, হাত আমার ভাঙ্গিছে, দেখ আমার ভাঙ্গা হাতে চুরি পরাইছে ॥ তোমরা হাইস্য না গো বাবুরা, বুড়া আমায় মারিছে। বুড়া আমায় মারিছে, পাও আমার ভাঙ্গিছে, দেখ আমার ভাঙ্গা পায়ে নূপুর পরাইছে ॥ তোমরা হাইস্য না গো বাবুরা, বুড়া আমায় মারিছে। বুড়া আমায় মারিছে। কোমর আমার ভাঙ্গিছে, ভাঙ্গা কোমরে আমার বিছা পরাইছে ॥ তোমরা হাইস্য না গো বাবুরা বুড়া আমায় মারিছে। বুড়া আমায় মারিছে, চুল আমার কাটিছে, কাটা চুলে দেখো আমায় ঝুমকা পরাইছে ॥ তোমরা হাইস্য না গো বাবুরা, বুড়া আমায় মারিছে। বুড়া আমায় মারিছে, গলা আমার কাটিছে, দেখ আমার কাটা গলায় হার পরাইছে ॥ তোমরা হাইস্য না গো বাবুরা বুড়া আমায় মারিছে'। 'বুড়া আমায় মারিছে' ধ্বনি শোনার সঙ্গে সঙ্গে শিশু হেসে ফেটে পড়ে। তার কান্না চলে যায়। এইভাবেই মা-দিদিমারা ছোট থেকেই শিশুদের কথা বলতে শেখায়। কান্না থামায়। শচীনবাবু তাঁর চিকিৎসারও দু' একটা নমুনা দিলেন। যেমন :

শিশুর সর্দিজ্বরে তিনি একটি মুসুর ডাল পরিমাণ রসাসিঁদুর মধু অথবা তুলসী পাতার রস বা পানের রসের সঙ্গে দিনে দু তিন বার খাওয়াতে পরামর্শ দেন। অনেক সময় মুথা (এক রকম ঘাস), পিপুল, আতইচ ও কাঁকড়াশৃঙ্গি চূর্ণ করে দুধ বা মধুর সঙ্গে খেতে দেন জ্বর, কাশি, অতিসার ও বমির জন্য। তাঁর অবর্তমানে তাঁর সহকারী কম্পাউণ্ডার দিব্যি চিকিৎসা চালিয়ে যেতে পারেন। পূর্বে ভদ্রলোক গুণিন্ ছিলেন। এখন আর গুনিনের ব্যবসা ভাল লাগছে না তাঁর। তাই ডাক্তারবাবুর কাছে চাকরি নিয়েছেন। প্রাকৃতিক ও টোট্‌কা চিকিৎসায় তিনি ডাক্তারবাবু অপেক্ষা বেশী পটু। ডাক্তার বাবু প্রত্যেক দ্রব্যের বৈজ্ঞানিক কারণ খুঁজতে চান, কিন্তু তাঁর সহকারী রাধিকা সর্দারের অত সব চিন্তার সময় নেই। তিনি বলেন, প্রতিদিন তলপেটে তিন চার বার করে তেল মালিশ করলে দুধ তোলা বন্ধ হয়, তাছাড়া, আতপ চালের জলে মুথার রস এবং মাতৃদুগ্ধ আধ কাচ্চা পরিমাণ খাওয়ালেও দুধ তোলা বন্ধ হয়। পেট ফাঁপা ভাল করবার জন্য তাঁর বিধান—নারকেল তেলে সাবান ঘষে তলপেটে প্রলেপ অথবা টোপাকুলের কচিপাতা ও মুথা একত্রে বেটে একরত্তি পরিমাণ কর্পূর মিশিয়ে খাওয়ালে ভেদবমি ও পেটফাঁপা আরোগ্য হয়। ২।৩ ফোঁটা চুনের স্বচ্ছ জল কিংবা মৌরী ভিজান জলের সঙ্গে গরুর দুধ মিশিয়ে খেলে পেটফাঁপা বা অজীর্ণ দূর হয়। রাধিকা সর্দার বলেন,

'কেন যে লোক বিলাতী ওষুধের বিষ গায়ে সিঁধচ্ছে বুঝি না বাবু, আমাদের দেশে ও সব ইনজেকশন ফিনজেকশনের দরকার নেই। আমরা কি রোগী সারাই না?' গাছ গাছড়া দিয়ে অসুখ সারাতে তিনি সিদ্ধহস্ত। তিনি বলেন, মরিচ চূর্ণ, চিনি ও মধু ছোলঙ্গ লেবুর রসের সঙ্গে খেলে বমন ও হিক্কা রোগ সারে। কচি জামপাতার রসের সঙ্গে ছাগলের দুধ মিশিয়ে খেলে অতিসার রোগ ভাল হয়। সোডা ভিজান জলে নেকড়া ভিজিয়ে তলপেটে পট্টি দিলে শিশুদের প্রস্রাব সাফ হয়। যষ্টিমধু, দৈ, চিনি, মধু এবং আলোচালের জল মিশিয়ে খাওয়ালে আমাশয় আরোগ্য হয়। কণ্টিকারী ফল, চাকুলে, গজপিপ্পলী, বৃহতী, দারুহরিদ্রা, সরলকাষ্ঠের খুলফা, সমপরিমাণ তকতাতে পেষণ করে মধু ও গব্যঘৃতের সঙ্গে সামান্যমাত্রায় প্রতিদিন খাওয়ালে দেহের শক্তিবৃদ্ধি হয়। হরিদ্রা, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু গুঁড়া করে শিশুদের নাভিপাকায় দিলে নাভি পাকা রোগ সারে। ঘামাচির জন্য শ্বেতচন্দন গায়ে লাগান যেতে পারে। আগুনে পোড়ার পরে নারকেল তেলের সঙ্গে চুনের জল মিশিয়ে লাগান যেতে পারে, অথবা পুঁই পাতার রস কিম্বা দই-এর জল বা গোল আলু বাটাও লাগান হয়। হাত-পা কেটে গেলে পাথর-কুঁচি পাতা বাটা বা দূর্বা ঘাস চিবিয়ে কাটা স্থানটিতে দিতে হয়। তুলসী, শিউলি, কালমেঘ, বেলপাতার যে কোন একটির রস পিপুলচূর্ণ ও মধুসহ খেলে প্লীহা রোগের উপকার হয়। শ্বেতজয়ন্তীর মূল মাথার চুলে বেঁধে রাখলে অজীর্ণ ও জ্বর আরোগ্য হয়। বাসক পাতা থেতো করে জলে ভিজিয়ে সেই জল খাওয়ালে অথবা বাসক পাতার রসকে লোহা গরম করে লোহার উপর ঢেলে দিয়ে শোধিত উত্তপ্ত রস খাওয়ালে জ্বরজ্বর জনিত পিপাসা ও সর্দি কাসিতে উপকার হয়। এক তোলা মত চিরতার জল সেবন করলে যকৃত ও জ্বর আরোগ্য হয় এবং কৃমি বিনাশ হয়। সর্দিজ্বরে নিসিন্দা পাতার রস এক তোলা খাওয়া যেতে পারে। শুকনা আমলকী বেটে নাভির চারিধারে প্রলেপ দিলে পেটের বেদনা ও অতিসার রোগ ভাল হয়। ডালিম ছাল, পদ্মকেশর, নীলসুদিফুল সমপরিমাণে চূর্ণ করে আলোচালের জলের সঙ্গে খাওয়ালে জ্বর ও অতিসার ভাল হয়। কচি তেঁতুল পাতা সিদ্ধ করে সিদ্ধ জল খাওয়ালে অতিসার রোগ সারে। হরিতকী সৈন্ধব ও শুঁঠ সমভাবে জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ালে অজীর্ণ দূর হয়। সমভাগে হরিতকী, আখের গুড় ও মধু সেবন করলে মন্দাগ্নি ও অজীর্ণ বিনষ্ট হয়। রোজ সকালে পলাশ বীজ চারআনি পরিমাণ নিয়ে ঘোলের সঙ্গে খেলে কৃমিরোগ আরোগ্য হয়, আনারস পাতার রস আধছটাক আন্দাজ

রোজ খেলেও কৃমিরোগ সারে। স্ত্রীলোকের স্তনের দুধের জন্য ভুঁই কুমড়ার চূর্ণ গো-দুগ্ধের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে হয়, আমলকী বীজ জলে বেটে চিনি বা মধু সহ খেলে শ্বেতপ্রদরের উপশম হয়। কাঁটা নটের শিকড় বেটে মধুসহ খেলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়। অকাল প্রসব বেদনায় সাদা আপাং গাছের টাটকা শিকড় গর্ভিনীর কোমরে এলো সাদা সূতো দিয়ে বেঁধে দিতে হয়। চুন, হলুদ ও ধুতরা পাতার রস মিশিয়ে স্তনে মালিশ করলে স্তন-ঠুনকের বেদনা নাশ পায়। পানশিউলির মূল বেটে খেলে বাধক দোষ নষ্ট হয়। মনসা সিজ বা আকন্দের আঠার সঙ্গে পিপ্পল, সৈন্ধব, কুঁড়, শিরিষফল চূর্ণ করে বলির মুখে প্রলেপ দিলে বলি খসে পড়ে। বাবুই তুলসী পাতার রস চার তোলা সৈন্ধব লবণ চার আনা মিশিয়ে দাদে লাগালে দাদ ভাল হয়। জলের সঙ্গে কাঁচা নিমপাতার প্রলেপ দিলে অথবা রাখাল শসার বীজ জলে বেটে ফোড়ায় প্রলেপ দিলে ফোড়া পাকে, পায়রার টাটকা বিষ্ঠা অল্প গরম করে লাগালে বা এলাচের খোসা গুঁড়া করে ফোড়ায় লাগালে বা কৃষ্ণকলি গাছের পাতা বেটে কাঁচা দুধের সঙ্গে ফোড়ায় লাগালে ফোড়া ফেটে যায়। আতপ চাউল, আদা, হিং বেটে গরম করে বাত-বেদনাস্থলে প্রলেপ দিয়ে কিছুক্ষণ রোদে বসলে বাত ভাল হয়। বাসি হুঁকোর জল দিয়ে কুলকুচো করলে যাবতীয় দন্তরোগ সারে। ভীমরুল, বোলতা ও মৌমাছি কামড়ালে পুঁই পাতার রস কিম্বা হাতী শুঁড়ের পাতার রস দংষ্ট্রস্থানে মর্দন করলে যন্ত্রণা নিবারণ হয়, গোময় চুনে মিশিয়েও লাগান যায়। বোলতার কামড়ে এবং ভীমরুলের কামড়ে ঘেঁটু মূলের রস লাগান যায়। শুঁয়োপোকা গায়ে লাগলে শুঁয়ো তুলে ফেলে চুন বা আধপাকা চালতা বেটে লাগান উচিত। এইভাবে সমস্ত রোগেরই প্রাকৃতিক চিকিৎসার বিধান আছে। আগুনে পোড়া ঘায়ে লাগাতে হয় মাতৃস্তন্যামৃত। তাঁর কাছে এমন কি বাণমারা, ভূতে ধরার চিকিৎসাও সব জানা। বাণ-মারার হাত থেকে উদ্ধার পেতে—লজ্জাবতীলতার মূল আড়াইটা গোলমরিচসহ গলদেশে বেঁধে রাখা যেতে পারে। শনিবার কালো কেওরিয়ার রসে সাদা অপরাজিতার শিকড় বেটে মেটে সিঁদুরের সঙ্গে মিশিয়ে বাঁ-হাতের কনিষ্ঠ আঙুল দিয়ে আপন কপালে তিলক ধারণ করলে সে ফোঁটা দিয়ে উৎকৃষ্ট বশীকরণ করা যায়। বোঁটাসমেত পান তলপেটে বেঁধে রাখলে তার সঙ্গে বাণ লাগে না। শুক্লপক্ষে পুষ্যানক্ষত্রে কুঁচের মূল এনে নিজের মস্তকে ধারণ করলে নাকি চোর ডাকাতের ভয় থাকে না। সাপ কামড়াতে এলে সোজাভাবে না চলে ইতস্তত হাতে তালি দিতে দিতে পালানো উচিত।

শিংওয়ালা কোন জন্তু ঢু দিতে এলে সজোরে তাকে ধমকালে সে পালিয়ে যাবে। হঠাৎ ডাকাতদের সম্মুখে পড়লে একমুঠো ধুলো কিম্বা ঘাস ছিঁড়ে তিনবার দেহাই শিব বলে উড়িয়ে দিলে ডাকাতেরা স্তম্ভিত হবে। ভূত 'ঝাড়ার মন্ত্র তাঁর মুখস্থ। দু' একটি মন্ত্র তিনি আমাদের শুনিয়েও দিলেন। তিনি সাপের বিষ নামাতে গিয়ে মন্ত্র পড়েন—

'হুঙ্কারে খাইলাম, ঝঙ্কার ধাইলাম। পর্বতের মাথায় লাথি, হাতীর কান্ধে রামদা ধারাই। আমি বাঙ্গারামের নাতি'। সাপের বিষ নামাতে ও সাপ তাড়াতে আরও নানা প্রকার মন্ত্র, আছে। যেমন—'হাতে বাটা মুখে গোটা মরুবকেরবাণ। শিষ আকন্দের মূলে আছে কাল নাগিনীর প্রাণ॥ কণ্টিকারী, কাঁচড়া, হিজর, শাঁইবাবলার কাঁটা। নাগকেশরের পায়ে লোটে চৌসাপেরই বেটা॥ সাপার বেটা মাথা মোটা ঢোঁরার পিসা বোরা। ঘলঘলিয়ার পাতায় করে হরিণ বোরার খোঁড়া॥ মেষশৃঙ্গীর মূলে আছে চন্দ্রবোড়ার জান। ভুঁই খাকসার পুষ্পে আছে নাগবাসুকির মান॥' আরও নানাপ্রকার মন্ত্র শোনালেন তিনি। যেমন—'উঙ্কুর শুংকুর ডোসখোর ভাই। কোন সাপে মারিছে কামুড় কও আমার ঠাঁই॥ উত্তম পর্বত শিরাইছে যে। সকল গরল বিষ শিরাইছে সে। টেপাটেপী লাউয়া টেপী। চতুর্দিগে দোমের আগায়। গেলে বিষ সিংতলীয়ায় খায়। রব্বে রহিম খাড়া। আকাশের বিষ পাতাল যা। যদি বিষ ভাটি ছাইড়া উজান যাস্। তবে পদ্মা দেবীর মাথা খাস্।' অথবা, 'চিতি চিতি চিতি কল্লো শৃঙ্গার ঘরে যা। সাত সমুদ্রে পা-পড়িছে টুমুস করে যা। নামরে মান কুটরীর বিষ শুনরে বহালী। অগা চলতে বগা চলে সাত দরিয়ার কুলে। উঠ উঠ পুত্র ঘরকে যাবা তোর অঙ্গে নাই বিষ। নিত্য ধোবানী কাপড় কাচে চৌদিকে পড়ে শিষ॥' চিকিৎসকের দেয়া ঔষধ সেবন করার পূর্বে গ্রামের সরল রোগী প্রথমেই বলে—'ধন্বন্তরী বৈদ্যনাথ, এ ওষুধে রোগ নাশ'। বিশ্বাস, এভাবে ঔষধ সেবন করলে সে ঔষধে কাজ হবেই। অর্শ নিরাময়ের আশায় গ্রাম্য রোগী ওষুধ খাবার সময় বলে—'জুলি মুনি করক্ষণ, বলে গেল দুরজন' ইত্যাদি। অনেক সময় আরোগ্য দেবদেবীকেও নানাস্থানে চালান দেওয়া হয় মন্ত্রের সাহায্যে। যেমন 'যাওরে শীতলা সইরা যাও। উত্তরে যাও—দক্ষিণে যাও। কামিখ্যার পর্বতে যাও। যদি না যাও—তবে মহাদেব আর পার্বতীর মাথা খাও।' ইত্যাদি। এ সব মন্ত্র শুধু রোগ সারাবার চেষ্টাই করে না—অনেক সময় রোগের আক্রমণকেও প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করে। তাই গ্রামে কলেরা বা বসন্ত দেখা দিলে ওঝারা

হাতে ধূলি নিয়ে সমগ্র গ্রাম 'বন্ধন' করেন যাতে কলেরা দেবী বা বসন্ত দেবী গ্রামে ঢুকতে না পারেন। আবার অনেক সময় শত্রুপক্ষের বাড়ীতেও রোগ চালান দেওয়া হয়। তাছাড়া কোন শত্রুর যদি কোন ফোড়া বা ঘা হয় তবে নিচের মন্ত্রটি বললে সে নাকি খুব কষ্ট পাবে— উঠ ফোট চোট, পাকিস না গলিস না, দোম্বল বাইন্ধা উঠ।' গ্রাম্য চিকিৎসকদের দেখে ছেলেমেয়েরা ছড়াও কাটে। যেমন—'ডাক্তারবাবু জলসাবু পাতিলেবু, আর খাব না জলসাবু, আইন্যে দাও কমলালেবু'।

রাধিকা সরদার বলেন যে, আমাদের দেশের ওঝা—বৈদ্যেরা এবম্বিধ নানা প্রকার মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে সুরের চর্চা করে থাকেন। ভূতেধরা, নিশি ধরা প্রভৃতি বিষয়েও নানা প্রকার মন্ত্র চর্চা লোকসমাজের মুখস্থ। এখানে ভূত বা অপদেবতার 'আছর' বা তাড়াবার একটি মন্ত্র দেওয়া যেতে পারে। 'আমার নাম দিদার বকস শুইন্য মন দিয়া। আমার নামে ভূত-পেত্নী সবাইর কাঁপে হিয়া॥ শেখ ফরিদের নাম লইয়া যদি মন্তর ঝাড়ি। হাজার গণ্ডা ভূত-পেত্নী ভেল্টাইবার পারি। হ্যাঁরে হাঁই—হুম হাঁই—হুম হাঁই। তোমার লেইগ্যা বইস্যা আছি কও তোমার নাম। কিবা জাত, কিবা গোত, কোনখানেতে ধাম? হ্যাঁরে হাই—হুম হাঁই—হুম হাঁই'। ইত্যাদি। এই মন্ত্রের পাঠ সমাপ্ত হলে ভূত-পেত্নীর পক্ষে নাকি না পালিয়ে উপায় থাকে না।

কলেরা, বসন্ত, কালাজ্বর, পাঁচড়া প্রভৃতি রোগ নিরাময়কারী দেবদেবী-গণকে পূজা অর্চনা করার সময়ও এবম্বিধ আচরণ প্রতিপালন করা হয়। যেমন—'এবার যাওরে তুমি ফোট পাঁচড়া নিয়ে। আবার এসো যে ঠাকুর শঙ্খ শাড়ি নিয়ে। হ্যাচরা মাগীর প্যাঁচড়া চুল, তাইতে লাগে বইন্যার ফুল। বইন্যার ফুল না লো ধুতুরার ফুল, ধুতুরার ফুল না লো কুমড়ার ফুল। কুমড়ার ফুল না লো লাউয়ের ফুল, লাউয়ের ফুল না লো বাসী আঁখার ছাই। বাসী আঁখার ছাই না লো ইঁদুরের মাটি, ইঁদুরের মাটি না লো ভাঙ্গা চাড়া, হিজল গাছে দিয়া সাড়া, পাঁচড়া মাগীরে কর গেরাম ছাড়া।'

জীবনের বন্ধুর যাত্রাপথে আশা, আনন্দ ও দুঃখের বিচিত্র অনুভূতি লোক-বিশ্বাস মন্ত্র ও ছড়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়ে থাকে। তাই মুস্কিল আসানের গান উপভোগ্য—'কলকাতায় খিদিরপুরে সত্যপীরের থান, হিন্দুমুসলমানে মিলি কর সিন্নি দান। হিন্দু বলে নারায়ণ মোল্লা বলে পীর, জাতের বিচার নাই করে খায় সিন্নি ক্ষীর। কৃষ্ণ যে সবাইকে চেনে, কৃষ্ণকে চেনে কে? মরিয়া হইয়া তেনার নাম জপে যে। যেই আশাটি করে আপনি পীরকে দেছেন দান, সেই আশাটি পূরণ করেন সত্যনারায়ণ।'

॥ ১১ ॥

ইতিহাসে বাঙালী প্রবাসী। বহুযুগ থেকে সমুদ্রপথে সে নানাদেশে বাণিজ্য করেছে, যুগ পরম্পরাগত সাধনায় ব্যক্তিত্ব গড়েছে। এই ধারা একদিকে ঔপনিবেশিক জীবন প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়েছে, অন্যদিকে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার প্রশ্রয় দিয়েছে। এবং এই ধারাই ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে, জাগ্রত রেখেছে গ্রাম-জীবনকে সুন্দরতর করে গড়ে তোলার কর্তব্যে। একদা গ্রাম্যজীবন ছিল স্বয়ম্ভর। গ্রামের উৎপাদিত সম্পদ ও বয়নে গ্রামবাসী খাওয়াপরার চিন্তায় উদ্বিগ্ন থাকত না। হিন্দু-মুসলমানযুগে রাজনৈতিক তরঙ্গের আঘাতে অথবা রাষ্ট্রিক বিপর্যয় সত্ত্বেও গ্রাম্য মানুষের শান্তি বিঘ্নিত হয় নি।

সেকালের রাজা আর বর্তমানের রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী এক নন। তখন রাজা ছিলেন অনেকটা ঈশ্বরের মতো। রাজাই পরমেশ্বর, রাজাহি পরমেশ্বরঃ। প্রজার ও রাজার মধ্যে ছিল দুস্তর ব্যবধান। গ্রামে রাজার প্রতিনিধি জমিদার। স্থানীয় রাজা। তিনিও প্রজাদের কাছ থেকে দূরে বাস করতেন। তাঁর কর্মচারী প্রজা ও জমিদারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। মধ্যে মধ্যে খাজনা আদায় বা বিশেষ কোন উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে জমিদারবাবু প্রজাদের দর্শন দিতেন। তাঁর দর্শনে প্রজাবৃন্দ কৃতার্থবোধ করতেন। এই রাজা-জমিদারের হাতে যখন গ্রামশাসন ব্যবস্থা ছিল তখন গ্রাম্য সমাজের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিত্তনির্ভর ছিল না। ছিল কুলবৃত্তি নির্ভর। ব্রাহ্মণ তাঁর কুলবৃত্তির জন্য প্রতাপশালী। অন্য বর্ণের লোকেরাও তাঁদের নিজ নিজ বৃত্তি অনুযায়ী প্রাপ্য মর্যাদা পেতেন। সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে আমাদের আবহমানকাল-লালিত গ্রাম বাঙলার অর্থনৈতিক বনিয়াদ বিধ্বস্ত হতে শুরু করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুণ বাঙলাদেশে যে নতুন জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয় তাঁরা বাঙলার গ্রামকে পরিবর্তনের মধ্যে নিয়ে এলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩ খৃঃ) প্রবর্তিত হবার আগে বাঙলার বনেদী জমিদার ভূসম্পত্তি বংশানুক্রমে উপভোগ করতে পারতেন কিনা তা এখনও নিশ্চিত করে জানা যায় নি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে চাষীর সর্বনাশ হয়েছে, চাষের অবনতি

হয়েছে, গ্রাম ও গ্রাম-সমাজ ধ্বংসের পথে এগিয়ে গেছে। ফলে গ্রামের মানুষ অসৎ হয়ে চলেছে। বনেদী জমিদা না পেরে জমিদারীকে লাটে তুললেন, নিলামে যাঁরা জমিদা তাঁরা কলকাতার সাহেবদের বেনিয়ানী-মুচ্ছুদিগিরী করে, হাটবাজা নিয়ে, নতুন বড়লোক সম্প্রদায়—রামদুলাল দে, মতিলাল শীল, লাহা মল্লিকেরা, পাইকপাড়ার সিংহরা, হাটখোলা ও রামবাগানের দত্তরা, লালগোলার রায়েরা, কাসিম বাজারের নন্দীরা এবং তজ্জাতীয় সম্প্রদায়। এককথায় নাগরিক ও গ্রাম্য ভূমিসম্পত্তির মালিক হয়ে তাঁরা আরও মুনাফা, আরও লাভের আশায় গ্রামের অর্থনীতিকে পঙ্গু এবং পুরোপুরি বিপর্যস্ত করে তোলেন। এরই ফলে প্রচণ্ড আঘাত আসে গ্রাম্য শিল্পকলায়। আসে আহার-বিহার, পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতিতেও। মৌর্যযুগ থেকে প্রাক-গুপ্ত, আদি-মধ্য এবং শেষ দিককার গুপ্তযুগের শিল্পসম্ভার পাল-সেন যুগের কলাকর্ম এবং আদি-পাঠান ও মোগল যুগের শিল্পাচরণের যোগ্য উত্তরাধিকারী গ্রাম্য বাঙালী এই বিপর্যয়কে মাথা পেতে নিয়ে চিরাচরিত কাজকর্ম চালিয়ে যেতে লাগলেন। ইতিমধ্যে বিদেশী শাসক তার শোষণের সুবিধার জন্য কতগুলো অঞ্চলকে মহাকর্ষণকেন্দ্র রূপে গড়ে তুললেন। গ্রাম বাঙলার খেটে-খাওয়া মানুষকে শোষণের সামগ্রী মনে করে তাদের অর্থনীতিকে কখনও প্রত্যক্ষ কখনও অপ্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি করে ভঙ্গ বা তছনছ করে দিলেন।

কৃষক ও জমিদার শ্রেণীর মধ্যে থেকেই মধ্যস্বত্বভোগীর দল বা শ্রেণীর উদ্ভব হয়। গ্রাম পরিবর্তনের ব্যাপারে এই মধ্যস্বত্বভোগীদের অবদানও কম নয়। নতুন বিচার ব্যবস্থার ফলেও এক শ্রেণীর দালাল ও টাউট জাতীয় গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। শুধু টাকা আর টাকা,শুধু আয়ের চিন্তায় বাঙালীকে সর্ববিধ ন্যায়বোধ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টার পর চেষ্টা চলতে থাকে এই সময় থেকে।

চিরস্থায়ী জমিদার-পত্তনদার-তালুকদার ও বিদেশী নীলকর বাঙলার গ্রাম সমাজের শান্তি, শৃঙ্খলা, ন্যায়বোধ ও মনুষ্যত্ব ধ্বংস করে। ওদের প্রভাবে গ্রামের মানুষ বুঝতে সুরু করে, টাকা সত্য, টাকা ধর্ম, টাকাই পরম জ্ঞান। অবশ্য বাঙলায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বা মহামারীর প্রাদুর্ভাব না ঘটলে গ্রাম-জীবনের বিপর্যয় এত শীঘ্র হয়ত আসত না। ১৭৭০-এর মহামারীতে বাঙলাদেশ প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। সরকারী হিসাব অনুযায়ী কৃষিজীবীদের শতকরা পঞ্চাশজন মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে, উনিশশতকের প্রথম দশকে, বাঙলার জনসংখ্যা প্রাক-দুর্ভিক্ষ অবস্থায়

ফিরে আসে। তারপর থেকে গ্রামে জনসংখ্যা বাড়তে বাড়তে যুগ্ম বাঙলার কিঞ্চিদধিক এক তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সাড়ে চার কোটি এবং ওপার বাঙলায় প্রায় সাতকোটি, দু' বাঙলা মিলিয়ে মোট প্রায় বারো কোটি বাঙালী জনগণনায় তালিকাভুক্ত হয় ১৯৬১ সনে। ফলে অরণ্যাচ্ছাদিত অঞ্চল অরণ্যমুক্ত করে ধানের জমিতে পরিণত করার দরকার হয়। আরও ধান, অধিক ধান ফলাবার প্রচেষ্টায় উভয় বাঙলায়ই ধানের চাষ বিস্তর বেড়ে যায়। রেলওয়ের বাঁধের দরুণ জলনিকাশের পথ বন্ধ হয়ে জলাসৃষ্টি এবং তার ফলে আর্দ্রতাবৃদ্ধিহেতু ম্যালেরিয়ায় বা বর্ধমান জ্বরে ১৮৬২-১৯২১ সন পর্যন্ত বহু লোকক্ষয় হয়েছে। অনাবাদী জমি কর্ষণযোগ্য হলে নতুন লোকের জন্য আর জমি থাকল না। জমির অভাবে কৃষক পরিবারে অভাব বেড়ে চলে। ঋণের দায়ে মালিক-চাষী ভাগ-চাষীতে পরিণত হল। এই সময় থেকে সরিকের কোন্দলে জমিও খণ্ডিত হতে আরম্ভ করে। দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি, প্লাবন, ঝড়, যুদ্ধ-বিগ্রহ, বাঙালীর স্বাভাবিক গতি ব্যাহত করে চলেছে। অজন্মা না হলেও দ্রব্য-মূল্যবৃদ্ধিহেতু অনেকের পক্ষেই খাদ্যশস্য ক্রয় ও মজুত করার ক্ষমতা থাকে না। অর্ধাহার, অনাহার অর্থাভাবের ফল। বলিষ্ঠ ও সবল মানুষ দুর্বল ও কৃশ হয়ে চলল। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হলে জনগণের গমনাগমন বৃদ্ধি পায় এবং দুরধিগম্য অঞ্চলে লোক-বসতি বাড়ে। রেলপথ ও বড় বড় সড়কের ধারে ধারে নতুন বসতি স্থাপিত হয়, পথের ধারের বাজার, গঞ্জ প্রভৃতি স্থাপিত হয় এবং এদের সঙ্গে সঙ্গে সেসব স্থান জনবহুল হয়ে ওঠে। কৃষিপ্রধান অঞ্চলে রেল, বাস ইত্যাদির সম্প্রসারণের ফলে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের সুবিধা ঘটে। কৃষিজীবী ও শ্রমিক সাধারণ কর্মের সন্ধানে নতুন নতুন ক্ষেত্রে দ্রুত উপস্থিত হতে থাকে। তারা স্থায়ী বাসিন্দাদের অনেকের কাছে অনেক সময় বিরক্তির কারণ হয়েও দাঁড়ায়। শহরে এসে গ্রামের ওরা নানাভাবে পরিবর্তিত অবস্থায় নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়ে জীবনধারণ প্রণালীর পরিবর্তন ঘটায়। কিন্তু তাদের প্রভাবে স্থায়ী বাসিন্দাদের জীবনে প্রত্যক্ষ কোন পরিবর্তন ঘটে না।

এখন ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন কৃষকের জীবনীশক্তি কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থারও কিছু উন্নতি হয়েছে। পূর্বাপেক্ষা অল্প সময়ে এখন সংক্রামক ব্যাধির বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা নেয়া যায়। সামাজিক সংস্কারের শিথিলতায় কোন কোন গ্রামবাসীর আর্থিক সচ্ছলতা এসেছে। পূর্বে জাতীয় বা কুলগত বৃত্তি পরিত্যাগ করে অন্য বৃত্তি গ্রহণ অপেক্ষা অনাহারে মৃত্যু শ্রেয় মনে করা হত। এখন যে-কেউ যে-কোন বৃত্তি অবলম্বন করতে পারে। শ্রমিকেরা এখন আর

নিজ গ্রামের সীমায় রুদ্ধ থাকে না। যেখানে যে-কাজ জোটে তা-ই সে করতে রাজী। খাদ্যাভাব অনুভব করলেই গ্রামের মানুষ তাই ঘর ছেড়ে বাইরে আসে। দূর দেশে গিয়ে অর্থ উপার্জন করে পরিবার প্রতিপালনের জন্য টাকা পাঠায় দেশে। শহরের সংস্পর্শে এসে ওরাও অনেকটা বদলে যায়।

জাত ও সমাজের বিধিনিষেধ অতিক্রম করে বাঙালী এখন কায়িকশ্রমের মর্যাদা দিতে আরম্ভ করেছে। এক জেলা থেকে আরেক জেলা, এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে গমনাগমন বেড়ে চলেছে। তাই আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে এই আসা যাওয়ায় একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। এখনও বর-কনের আদানপ্রদান অনেকক্ষেত্রেই পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পূর্বকালে অন্নসমস্যা সমাধানের দায়িত্ব ছিল ব্যক্তির, এখন সে দায়িত্ব বহুল পরিমাণে রাষ্ট্রের। তাই অন্নাভাবে এখন কোন লোক মারা গেলে তার জন্য রাষ্ট্রকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়।

এই ধরণের পরিবর্তন ও অদলবদলের সিঁড়ি বেয়ে বাঙালীর শিল্পকলা, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং আহার-বিহারাদিতে নানা পরিবর্তন এসেছে। আহার-বিহার তথা রন্ধনশিল্পের পরিবর্তনের পথেই বাঙালীর প্রধান খাদ্য ভাত। ভাত রান্নার প্রধান উপায় চালকে জলে সিদ্ধ করা। কোনও জায়গায় ভাত বেশী জল দিয়ে রান্না করা হয় যাতে ফেন গালা যায়, ভাত ঝরঝরে হয়। আবার কোথাও মাপসই জল দেওয়া হয় তাতে আর ফেন গালতে হয় না। ভাতের ফেন গরু-বাছুরের জন্য রাখা হয়। এই ফেন দিয়ে জামা কাপড়ে মাড় দেওয়াও হয়। অনেকে ফেন ফেলে দেয়। ধান থেকে চিড়া তৈরী করে ভারতের অনেক রাজ্যের অধিবাসী। এই চিড়া, মুড়ি ও খইয়ের ব্যবহারে আছে বাঙলার প্রাধান্য। অন্যত্র মুড়ি ও খইয়ের বদলে চাউল ভাজা জনপ্রিয়। বাঙলায় যেমন চালের গুঁড়ো দিয়ে পিঠে রাঁধা হয়, দক্ষিণ ভারতের সর্বত্রই তেমনি চালের পিঠার কদর। অবশ্য ভাত, চিড়া, মুড়ি, খই বা পিঠা খাওয়ার ধরণধারনে নানাস্থানে নানা প্রভেদ আছে। বাঙালী পূজা-পার্বণ তথা পৌষপার্বণ জাতীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে চিতৈ পিঠা খায়, দক্ষিণ ভারতের অনেক স্থানেই সেরূপ পিঠার নাম 'ইড্‌লী'। এবং এই 'ইড্‌লী' দক্ষিণভারতীয়দের প্রাতঃ ও মধ্যাহ্নের আহার। আমরা চালের যে সরুচাকলি পিঠা খাই অনেকটা সেরূপ পিঠাই দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় খাবার 'ধোসে'। শুধু 'ইড্‌লী' 'ধোসে' বা 'ভাত' খেয়ে জীবনধারণ সম্ভব নয়। জীবনধারণের জন্য আরও নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন। প্রয়োজন প্রোটিন জাতীয় খাবারের। কারণ ঃ

জীবদেহ গঠন ও পোষণে প্রোটিনের ভূমিকা মুখ্য। আমাদের শরীরে মাত্র ১৭·৭ অংশ প্রোটিন ; চর্বি, শর্করা জাতীয় পদার্থ এবং নানা ধরনের ধাতব লবণ যথাক্রমে ১৩·৮, ০·৮ ও ৬·১ ভাগ। এবং বাকী অংশ সবই জল। শারীরবিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে প্রতি গ্রাম প্রোটিনের জন্য শরীরের ওজন বাড়ে প্রায় ছয় গুণ। বৃক্ষ লতাপাতা নিজ দেহের প্রোটিন নিজেরাই তৈরী করে নিতে পারে। কিন্তু প্রাণীরা এ ব্যাপারে পর-নির্ভর। খাদ্য থেকে প্রাণী প্রোটিন আহরণ করে। প্রোটিনের অভাবে প্রাণীদেহ অপুষ্ট এবং রোগাক্রান্ত হয়। খাদ্য-প্রোটিনের দুটি কাজ ঃ দেহের বৃদ্ধি ও তার ক্ষয়ক্ষতির মেরামতি। যতদিন দেহ বাড়ে ততদিন একাজ দুটি এক সঙ্গে চলে। এই সময় দেহের ওজনের অনুপাতে খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ বেশী হওয়া প্রয়োজন। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির অর্থাৎ দেহ বাড়বার পদ্ধতি সমাপ্ত হলে খাদ্যে প্রোটিন কেবলমাত্র দেহের ক্ষয়ক্ষতি মেরামত করার কাজই করে। অন্তঃসত্ত্বা নারী এবং যে মেয়েদের বুকের দুধ সন্তানকে খাওয়াতে হয়, তাদের বেশী প্রোটিন খাওয়া দরকার। মাতৃদুগ্ধ ছেড়ে দেবার পর সন্তানের খাবারে প্রোটিন কম হলে দেহের বৃদ্ধি সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়ে থাকে। দেহের ক্ষয়ক্ষতি মেরামতের প্রয়োজন দেহবৃদ্ধির প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক। খাদ্যে প্রোটিনের অ্যামিনা অ্যাসিড সাজিয়ে নিয়ে শরীরের দরকার মত প্রোটিন তৈরী করা দেহের কাজ। সব কাজেই যেমন মজুরির দরকার প্রোটিন তৈরী করতেও তেমন মজুরি বা ক্যালরির দরকার। তাই শিশু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যে যেমন প্রোটিন বাড়াতে হয় তেমনি খাদ্যের ক্যালরির মূল্যও বাড়াতে হয়। খাদ্যে যদি ক্যালরির ঘাটতি থাকে তবে খাদ্যে যথেষ্ট প্রোটিন থাকলেও প্রোটিন-অপুষ্টিতে ভোগা আশ্চর্য নয়। খাদ্যে ক্যালরির দাবি প্রোটিনের চেয়ে বেশী।

আমাদের খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ কম। সামাজিক এবং ধর্মাচারের প্রভাবেও আমাদের অনেকের খাদ্যে জান্তব প্রোটিনের অভাব ঘটে থাকে। অর্থনৈতিক অসুবিধার জন্য আমরা প্রয়োজনীয় খাদ্য-প্রোটিন ও ক্যালরি পাই না। এ কথা সকলেই জানেন যে আমাদের খাদ্য উৎপাদনের জন্য মাথা পিছু যতটা জমি আছে তা আমাদের পক্ষে যথেষ্টই। এই জমিতে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন উৎপাদিত হচ্ছে। কিন্তু শুধু মাত্র উদ্ভিজ্জ প্রোটিনই শরীরকে সুস্থ রাখতে পারে না, শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য জান্তব-প্রোটিনেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু এক একর জমিতে যতটা উদ্ভিজ্জ প্রোটিন উৎপন্ন

হয় তার প্রায় চার গুণ জমির প্রয়োজন জান্তব-প্রোটিন উৎপাদনে। এই জন্যই জান্তব প্রোটিনের মূল্য সব দেশেই উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের চেয়ে বেশী। আমাদের গৃহিণীরা তাঁদের সীমাবদ্ধ সাধের মধ্যে যথাসাধ্য প্রোটিন-খাদ্য আমাদের সরবরাহ করে থাকেন। তাঁদের সুবিবেচনা ও পুষ্টিজ্ঞান আমাদের বিশেষ উপকারে আসে। তাই কি ভাবে রাঁধলে রান্না সুস্বাদু হয় তা জানার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের জানতে হয় কি ভাবে খাদ্যের পুষ্টিকারিতা বাড়ে, অথচ তাতে খরচ একই থাকে। তাই রন্ধন একাধারে শিল্প ও বিজ্ঞান। এ দুয়ের মণিকাঞ্চন যোগে সামান্য খাদ্যও অসামান্য হয়ে ওঠে। নিকৃষ্ট প্রোটিনও পুষ্টিকর হয়ে জাতে ওঠে।

বাঙালীর অবনতির মূলে অপুষ্টিকর খাদ্য। তাছাড়া দুর্ভিক্ষ, ম্যালেরিয়া, মহামারী, প্লাবন, জলবায়ু ইত্যাদিও বাঙালীকে ক্লিষ্ট করে চলেছে। বাঙালীর শিল্প-বাণিজ্যের প্রতি অনীহা, তার অলস-প্রবণতা, তার শ্রমকাতরতা বাঙলার রাষ্ট্রীয় জীবনে মুসলমানদের প্রভাব, বাঙলার বিদ্রোহ প্রভৃতি নানা কারণে বাঙলা ও বাঙালীর বর্তমান দুর্দশা বলে বহু ব্যক্তি অভিমত প্রকাশ করেছেন। যদিও কোন জাতির দুর্দশার কারণ এত সহজে নির্ণয় করা যায় না।

উনিশ শতকের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষায় নতুন সভ্যতা ও নব নাগরিকদের উদ্ভব হয়েছে। উদ্ভব হয়েছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। এই নাগরিক-মধ্যবিত্ত সমাজের সঙ্গে গ্রামের কৃষক সমাজের, প্রাকৃত ও শিল্পী সমাজের সঙ্গে ভাবের বিনিময় ঘটে নি। পল্লীসভ্যতার বিপর্যয় ও বিলোপই যে বাঙালীর বৈষয়িক বিপর্যয়ের কারণ তা বহুজন সমর্থিত। আমরা শহর বা গ্রামকে অতি সরলীকরণ পদ্ধতি দ্বারা ব্যাখ্যা করে নিচ্ছি এই ভাবে ঃ শহর মানে কয়েকটি সুবিধার সমাহার এবং গ্রাম সেই সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত স্থান। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলার আপামর লোকসমাজের সৌন্দর্যপ্রীতি, রূপচর্চা, কারণ-অকারণ বিনোদন, আহার-বিহার, কর্মসংস্থান অর্থাৎ অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ জীবনবেদের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারি। দৃষ্টি দিতে পারি গ্রাম সমাজের সমন্বয়ের প্রতি। এই দৃষ্টিতে হয়ত আমরা গ্রামের হিন্দু সমাজের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ছি প্রাসঙ্গিক ভাবে। যদিও গ্রাম বাঙলার হিন্দু ও মুসলমানদের জীবনধারণ প্রণালীর মধ্যে ভয়ঙ্কর কোন তফাৎ বা পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। ধর্মীয় আচার-আচরণের কোন কোন স্তরে উভয় সম্প্রদায়ের লোক উভয় থেকে স্বতন্ত্র ; আবার কোন কোন স্তরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন প্রভেদই দৃষ্ট হয় না। যেখানে প্রভেদ সেখানে হয় হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র বা শরীয়তের বিধান আছে। এই বিভাগ

উপলব্ধি করার জন্য ইসলাম ধর্মের মৌল বিষয়ের দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে ঃ

ইসলামের মূল স্তম্ভ পাঁচটি—কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও জাকাত। এর মধ্যে কলেমা, নামাজ ও রোজা সকলের পালনীয়। অপর দুটি, অর্থাৎ হজ্জ বা জাকাত ধনী ব্যক্তিদের ফরজ। কলেমা পাঁচটি, যেমন তৈয়ব, শাহাদাত, তৌহিদ, তমজিদ ও কুফর। এই কলেমা উচ্চারণ ও বিশ্বাস হচ্ছে ঈমান। যাঁর ঈমান আছে তিনি মোমেন অর্থাৎ মুসলমান। 'আমান্তা বিল্লাহে কামা-হুয়া বে-আছমায়েহী অয়া ছেফাতেহী অয়া কাবেলতু জামিয়া আর কানেহী অয়া আহকামেহী' এবং 'আমান্তে বিল্লাহে অ-মালা-য়েকাতেহী অ-কোতোবেহী অ-রোছোলেহী অল্ হয়্যাওমেল আখেরে অল্ ক্বাদ্রে খায়রেহী অ-সর্রেহী মেনাল্লা-হে তায়া-লা ওয়াল বা'ছে বাদল মাওত' অর্থাৎ সর্বপ্রকার নাম ও গুণবিশিষ্ট আল্লার উপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং তাঁর সমস্ত আদেশ ও বিধান মেনে নিলাম। তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর বাণী সমন্বিত কেতাবসকল, তাঁর প্রেরিত রসুলগণ, কেয়ামত, তকদির এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন লাভ প্রভৃতির উপর আমি ঈমান আনলাম, বা বিশ্বাস স্থাপন করলাম। বাঙলার মুসলমান লোকসমাজ এই বিশ্বাসের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত। তাঁরা মোজাম্মেল ও মোফাজ্জেল দোয়া না করে কোন কাজে হাত দেন না। ওজু করে নামাজ পড়ে শুদ্ধ হন তাঁরা। এভাবে তাঁরা আল্লাহতায়ালার নিকটে আসেন। ওজু এবং নামাজের জন্য নানা বিধান আছে। গ্রামের মৌলানা, মৌলবী, হাজী সাহেবেরা গ্রামবাসীদিগকে এই সব বিধান জানিয়ে দেন। ইসলাম ধর্মের শিক্ষাও তাঁরাই গ্রামবাসীদের দিয়ে থাকেন।

নামাজের পূর্বে আজান দেওয়া হয়। 'আল্লাহো আকবর', 'অসহাদো আল্লা এলাহা ইল্লাল্লাহ', 'অসহাদো আল্লা মোহাম্মদের রাছুলুল্লাহ', 'হাইয়া আলাছ ছালাহ্', 'হাইয়া আলাল ফালাহ্', 'আল্লাহো আকবর', 'লাএলাহা ইল্লাল্লাহ্' এই বাক্য সমূহ যথাক্রমে চারবার, দু'বার, দু'বার, দু'বার, দু'বার, দু'বার ও একবার উচ্চারণ করতে হয়। এই বাক্যের অর্থ—আল্লাহ সর্বশক্তিমান। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত মাবুদ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রসুল। নামাজে উপস্থিত হও, মুক্তিলাভের জন্য নামাজে উপস্থিত হও, ইত্যাদি। সকলে আজান দিতে পারেন না। আজান দিতে তিনিই পারেন যিনি বুদ্ধিমান, ধার্মিক, পরহেজগার, হাদিসপারদর্শী, সুন্দর,

অনুভবপ্রবণ, সজাগ, এবং যিনি নামাজের সময় সম্পর্কে অবগত আছেন। আল্লাহর নির্দেশ পালন না করলে বেহেস্তে বা নরকে যেতে হয়। নামাজের দশটি গুণ আছে। এই গুণগুলোই হচ্ছে—মুখের সৌন্দর্য, হৃদয়ের জ্যোতি, দেহের আরাম, কবরের সুখ, অনুগ্রহের পাত্র, স্বর্গের কুঞ্জি, গায়ের বাতি, পালনকর্তার অনুমোদিত, স্বর্গের মূল্য ও নরকের পর্দা। ফরজ, ওয়াজেব সুন্নত ও নফল এই চার প্রকার নামাজের দ্বারা উপরিউক্ত গুণ আহ্বান করতে হয়। এই নামাজের কতগুলো সর্ত আছে। যেমন শরীর শুদ্ধ হওয়া, বস্ত্র শুদ্ধ হওয়া, ছতর ঢাকা অর্থাৎ পুরুষের নাভি থেকে উরু পর্যন্ত এবং মেয়েদের মুখ হাত-পা ব্যতীত সমুদয় শরীর ঢাকা, ফরজ, নামাজ পড়ার স্থান শুদ্ধ হওয়া, কাবাভিমুখ হওয়া, নামাজের নিয়েত করা। সমস্ত নামাজেই আজান বা আকামত দিতে হয় না। স্ত্রীলোকের নামাজের জন্য আছে পৃথক নিয়ম। যেমন স্ত্রীলোক দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবেন, দু' আস্তিন থেকে হাত বের করবেন না, তহরিমা স্তনের নীচে বুকের উপর রাখবেন, সেজদার সময় বগল চেপে রাখবেন, পুরুষের সঙ্গে নামাজ পড়তে হলে স্ত্রীলোক পুরুষের পশ্চাতে থেকে নামাজ পড়বেন। যে নামাজে পুরুষের জন্য আওয়াজের বিধি আছে, সেখানে নামাজে স্ত্রীলোক চুপে-চাপে পড়বেন। ইত্যাদি প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত বালক-বালিকা থেকে যুবক-যুবকী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সকলেরই নামাজ পড়া একান্ত ফরজ। যে নামাজ পড়তে অস্বীকার করে সে শরীয়ত মতে কাফের এবং কোন কোন হানিফী এমামের মতে ফাছেক বা মহাপাপী।

পাপের উপর গ্রাম্য মানুষের সাঙ্ঘাতিক ভয়। তাই তাঁরা ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, মৌলানা, মৌলবী, হাজী সাহেবদের বিধান মানেন শুধু ধর্মাচরণের সময় টুকুতেই, তারপরই তাঁরা স্বাধীন। তাই গ্রামে এখনও অনেক মুসলমান পরিবারে হিন্দু-রীতিতে বিবাহ অনুষ্ঠান হয়। বিবাহিতা স্ত্রীলোক সিঁথিতে সিঁদুর পরেন। কোন কোন স্থানের মুসলমান বিষহরি, লতার পূজো করেন, হিন্দু দেবতার অনুরূপ নাম রাখেন। বাঙলায় মুসলমানের সংখ্যাধিক্য পাঠানমোগলের রক্তের আমদানীর ফসল নয়, পল্লীসমাজের ধর্ম পরিবর্তনের ফলে বাঙলায় মুসলমানের সংখ্যাধিক্য। এই মুসলমানেরা হিন্দুর সঙ্গে একত্রে ধর্মপূজায় যোগদান করেন। হিন্দুও মুসলমানের দরগায় সিন্নি দেন। গ্রাম্য-দেবতা, বৃক্ষপূজায়ও হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে এক হয়ে অংশ নেন। সামাজিক ভাববিনিময়ের দ্বারা মহরম, জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠান, সত্যপীর, শীতলা, মনসার

পূজায় জাতিধর্ম নির্বিশেষে যোগদান করে। হিন্দু বাঙালীর সঙ্গে মুসলমান বাঙালীর যোগ বহু শতাব্দীর। সে যোগ ভাষার, সাহিত্যের, পোষাক-পরিচ্ছদের শিক্ষাদীক্ষার, রুচি-রুজির—এক কথায় মনের ও সংস্কৃতির। অমিল শুধুমাত্র শাস্ত্রীয় ধর্মাচরণে। লৌকিকধর্মের আচরণে আজও এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিল বর্তমান। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায়, অনুসৃত অর্থনৈতিক কর্মপ্রবাহে, রুচি ও পছন্দে এপার বাঙলার মধ্যবিত্তের সঙ্গে ওপার বাঙলার মধ্যবিত্তের, দরিদ্রের সঙ্গে দরিদ্রের, কৃষকের সঙ্গে কৃষকের, ব্যবসায়ীর সঙ্গে ব্যবসায়ীর, শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষকের, গায়কের সঙ্গে গায়কের কোন প্রভেদ নেই। বরং উভয় বাঙলার মধ্যবিত্তের সঙ্গে বিত্তহীনের, ব্যবসায়ীর সঙ্গে শিক্ষকের, দরিদ্রের সঙ্গে বিত্তবানের ব্যবধান ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা চিরকালই ছিল, আজও আছে। সংস্কৃতির এই বাস্তবতা উপেক্ষা করে ধর্মীয় কারণে সাংস্কৃতিক অনৈক্য আবিষ্কারের ফলে বাঙালী পঙ্গু হয়েছে, বাঙালী মুসলমান দুর্বল হয়েছে, বাঙালী শোষিত হয়েছে। কারণ, হিন্দু-মুসলমান ক্রমশঃ যখন রাষ্ট্রীয় ঐক্যের পথে অগ্রসর হচ্ছিল হঠাৎ তখন এই ঐক্য বাধাপ্রাপ্ত হয় ধর্মের গোঁড়ামিতে, বাধাপ্রাপ্ত হয় কিছু সংখ্যক সুবিধাবাদী আত্মসর্বস্ব ব্যক্তির প্ররোচনায়, যখন ঐক্যভাব জাগরিত হচ্ছিল তখন রাজনৈতিক ও শোষক সম্প্রদায়ের এজেন্ট বা পাণ্ডারা জাগরিত করেছে ভীষণ অসদ্ভাব, কুটিল রাজনীতি ও চরম স্বার্থপরতা এই অসদ্ভাবের ইন্ধন জুগিয়েছে। শিক্ষিত সমাজ, সাময়িক লাভের আশায় মিলিত হতে দেয় নি এই দুই সম্প্রদায়ের বৃহৎ জন সমষ্টিকে। তাঁরা বিভেদের বাণী, সাম্প্রদায়িক জিগীর জাইয়ে রেখেছেন নিজ নিজ ক্ষমতা ও শোষণ কায়েম রাখতে। ক্রমে বাঙালী সাম্প্রদায়িক হয়েছে। ভেদবোধ ও অশালীন প্রচারের শিকার হয়েছে। মুক্তবুদ্ধি বাঙালী অচিরেই এই সর্বনাশা ক্রিয়াকর্ম ধরে ফেলল। তাই এখন ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িকতার কুয়াশা কেটে যাচ্ছে। বাঙালী এগিয়ে চলেছে অসাম্প্রদায়িক মুক্তবুদ্ধির পথে। সেভাবে এগুতে গিয়েও বাঙালীকে অনেক দাম দিতে হয়েছে ও হচ্ছে। অনেক রক্ত দিতে হয়েছে ও হচ্ছে।

বাঙলার হিন্দু ও মুসলমান বাঙালী। এক এক যুগে এই দুই সম্প্রদায়ের রক্তের সংমিশ্রণ খুবই হয়েছে। চতুর্দশ শতকে হয়েছিল চমৎকার মেলামেশা। নবাব আলিবর্দি হিন্দুদের সর্বাপেক্ষা উচ্চপদ দিয়েছিলেন তাঁর নবাবীতে। তখন সৈয়দেরা সিরনি বিলোতো, সকলের ঝুঠা সকলে খেতো। দোয়া দিয়ে দিয়ে কিছু না পেলে দরবেশ গালি দিয়ে চলে যেতো—'সঅদ সেরণী বিলই সককো

জুঠ সব্বে খাই, দোআ দে দরবেশ পাব নহি গারি পারি জাই।' নবাব আলিবর্দি হিন্দুর পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করতেন না। তখন পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সামাজিক সদ্ভাব ছিল। আলিবর্দির ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় সহমৎ ও মৌলৎ জঙ এবং সিরাজ ও মীরজাফর সকলে হিন্দুদের সঙ্গে আবির মেখে দোল খেলতেন। মীরজাফর মরণাপন্ন অবস্থায় নন্দকুমারের পরামর্শে কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, মধ্যযুগে পূর্ববঙ্গে অনেক বৌদ্ধ মুসলমান হয়। ইংরেজ আমলে 'মৌলানা ও মোল্লাদের ধর্মপ্রচারের ফলে অনেক নিম্নবর্ণের হিন্দুও মুসলমান হয়, এবং অনেকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। ধর্মান্তরিত মুসলমানদের আচার ব্যবহারের সঙ্গে হিন্দুদের খুব তফাৎ দৃষ্ট হয় না। ব্যাধির বা উপদ্রবের হাত থেকে উদ্ধার পেতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে করত সিননি দান। মানত, ঘোড়ার পুতুল ইত্যাদি উপঢৌকন এখনও দেখা যায়। মুসলমান পাঁচ পীরের মধ্যে দুই পীর হিন্দু—রামগাজি ও মাছন্দনাথ। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে বাঙালীর আচার-আচরণ, আহার্য পানীয় ও নানা শিল্পচেতনা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।' অতি দ্রুত গতিতে আমরা বাঙলা ও বাঙালী সম্পর্কে উপরিউক্ত তথ্য নিবেদনান্তে বাঙালীর শিল্প সচেতনার দিকে নজর দেব। তা দিতে এসে সর্বপ্রথমে দেব রন্ধনশিল্পের উপর নজর। জীবনধারণের পক্ষে এ শিল্প অপরিহার্য। পূর্বেই বলা হয়েছে যে ধান্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ভাত বাঙালীর প্রধান খাদ্যে পরিণত হয়। এই ভাত রান্নার মধ্যে নানারকম তারতম্য আছে। শুধু রান্নাই নয়, খাওয়ার ব্যাপারেও আছে তারতম্য। সাধারণত শাক ও অন্যান্য ব্যঞ্জনসহযোগে ভাত খাওয়া হত আদিতে। নানাবিধ শাকও খাওয়ার উল্লেখ আছে বাঙলার আদিতম সাহিত্যে। নানা শাকের মধ্যে নালিতা বা পাটশাকের উল্লেখ আছে প্রাকৃত-পৈঙ্গলে। বাঙালী যে সব শাক খায় তার মধ্যে আছে কলমীশাক, পুঁইশাক, লুণেশাক, পালঙশাক, হিঞ্চেশাক, বেতোশাক, পুদিনা, সুষুনী, শাঞ্চেশাক, নটেশাক, কচুশাক, ঢেঁকিশাক, পলতা, যোয়ানশাক, মুলাশাক, কলাইশাক, মটরশাক, লাউশাক, কুমড়াশাক, চালকুমড়াশাক, শশাশাক, পেঁয়াজশাক, লালশাক, ডাঁটাশাক প্রভৃতি খুল্লনার "ঘৃতে নালিতারশাক। তৈলেতে বেথুয়াপাক॥ বোদালি হিলঞ্চ কাটিয়া করিলা পাক॥" এবং চাঁদ সদাগরের পত্নী সনকার—"পাটায় ছেঁচিয়া নেয় পলতার পাতা। 'রান্ধেন বেগুন দিয়া ধনিয়া পলতা॥...জবানী

খুড়িয়া ঘৃতে করিল ঘন পাক। সাজ ঘৃত দিয়া রান্ধে গিমা তিতা শাক॥ কোমল বেথয়া শাক করিয়া কেচা কেচা। নাড়িয়া চাড়িয়া রান্ধে দিয়া আদা ছেঁচা॥ নারিকেল দিয়া রান্ধে কুমড়ার শাক। একে একে দশ শাক করিলেন পাক॥" এ বস্তু সর্বজনবিদিত। তৎকালে বাঙালী রমণী নানাপ্রকার শাক রেঁধে সুখ্যাতি অর্জন করতেন। তাই তখন 'শাকান্ন', শাকভাত ছিল বাঙালীর পরম আদরের। এই শাকভাতেরই আর একটি অভিব্যক্তি বিদুরের খুদকুড়ো।

বৈদিক ক্রিয়াকর্মে তৈলের ব্যবহার নেই। তিলের ব্যবহার আছে। তিল থেকেই নাকি তৈল শব্দ এসেছে। বাঙলায় খাওয়া, রাঁধা, গায়ে-মাথায় দেওয়া সবকাজেই সরষের তৈল বা অন্যান্য তৈল। মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়ফুঁকেও সরষে এবং সরষের তৈলের ব্যবহার হয়ে আসছে সুপ্রাচীনকাল থেকে। স্ত্রী-আচারেও 'ধুতরাপিদ্দিম' দিয়ে বরকে বরণ করার সময় তেলের প্রদীপ জ্বালাতে হয়। বাঙলায় সরষের তেল বিশেষ জনপ্রিয়। কোথাও কোথাও নারকেল তেল, কোথাও বাদাম তেল, আবার কোথাও তিলের তেলেরও ব্যবহার আছে। গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি স্থানে তিল তেলের খুবই প্রচলন ছিল একদা। কিছুদিন থেকে তৈলজাতীয় পদার্থ বনস্পতিও খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বাঙলায়ও যখন সরষের তেলের অভাব দেখা দেয় তখন অনেকে বাদাম তেল ব্যবহার করে থাকেন। কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীবৃন্দ ব্যবহার করে তিসির তেল। রাজস্থান পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থান ঘিয়ের দেশ। সেখানকার অধিবাসী তাই তেলের বদলে ঘি খান। এই ঘি স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার ঃ

> শরীরের শক্তি উৎপাদনের জন্য দুটি জিনিষের প্রয়োজন। খাদ্যবস্তু এবং অক্সিজেন। খাদ্যবস্তু আমরা পাই হাটে, বাজারে, মাঠে ও জলে। আমাদের বিভিন্ন খাদ্যবস্তু বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করে এনে আমরা সুপাচ্য ও আহার-উপযোগী করে তুলে থাকি। তারপর রাসায়নিক পাকে রস মিশিয়ে ও দাঁতের সাহায্যে পাকস্থলীতে পাঠাই। এই খাদ্য থেকে শরীর তার প্রয়োজনীয় পদার্থ শোষণ করে নেয়। পদার্থগুলো হচ্ছে শর্করা জাতীয়, স্নেহ পদার্থ, প্রোটিন, খনিজ লবণ, ভিটামিন ও জল। রক্তে প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু শোষিত হবার পর সেগুলোকে দেহের নানাস্থানে বিতরণের জন্য শরীরে অসংখ্য ছোটবড় প্রণালী আছে। গুণগত বিচারে এদের ধমনী ও শিরা এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এদের মধ্য দিয়ে রক্ত শরীরের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে সুতরাং খাদ্যাখাদ্যের উপর যে কোন

শারীরিক উন্নতি ও বল নির্ভরশীল। শাক বা বৃক্ষজাতীয় খাদ্য থেকে আমরা উদ্ভিজ্জ প্রোটিন গ্রহণ করি।

তাই শাক ভোজন সম্পর্কে নানা নিয়ম-কানুন ও বাধা-নিষেধ আছে। যেমন আষাঢ় থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত কলমীশাক খাওয়া উচিত নয়। বাসী কলমী না খাওয়াই উচিত। এই শাক প্লীহা, রক্তপিত্ত ও অর্শরোগে উপকারী। স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধির জন্য কলমীর ঝোল, বসন্ত রোগে কলমীর রস, হিস্টিরিয়া, মস্তিষ্ক-বিকারে, ফোড়া ফাটাতেও কলমীশাক উপকারী। পুঁইশাকও বিশেষ উপকারী শাক। হিন্দু বিধবাদের পক্ষে পুঁইশাক নিষিদ্ধ। কারণ এ শাক কামোদ্দীপক। এই পুঁই নানাপ্রকার—যেমন সাধারণ, বনজ ও ক্ষুদ্রপত্র। লালচে পুঁই অপেক্ষা সাধারণ পুঁই বেশী উপকারী। তিল দিয়ে পুঁই শাক রান্না উচিত নয়। লুণেশাক পুঁইশাকের মত শীতবীর্য, শুক্রবর্ধক, বলকারক এবং রক্তপিত্ত নিবারক না হলেও কফ, পিত্ত, চর্মরোগ, ব্রণ, শ্বাস, কাস ও প্রমেহ রোগে উপকারী। পালঙশাক দু প্রকার। মিষ্টি পালঙ ও টক বা চুকা পালঙ। মিষ্টি পালঙ বাত, শ্লেষ্মা, ভেদবমি, রক্তপিত্ত এবং বিষদোষ নষ্ট করে। টক পালঙ অতিশয় মধুর, রুচিপ্রদ ও লঘুপাক। হিঞ্চেশাক শোথ, কুষ্ঠ, কফ ও পিত্ত নাশ করে। পুকুর বা জলাভূমিতে এ শাকের জন্ম। গায়ের দুর্গন্ধ দূর করতে হিঞ্চের রস সমুদ্রের ফেনার সঙ্গে মিশিয়ে গায়ে মাখা যায়। বসন্ত রোগের প্রারম্ভে শ্বেত চন্দন চূর্ণসহ হিঞ্চের রস সেবনে তাড়াতাড়ি বসন্তের গুটি বেরিয়ে আসে। বেতো বা বেতুয়াশাককে অনেকে শাকরাজ বা শাকশ্রেষ্ঠ বলেন। এই শাক শ্বেত ও রক্তবর্ণ এবং রুচিপ্রদ ও বলকারক। রক্তপিত্ত, অর্শ, ক্রিমি ও প্লীহাদিরোগে এ শাক বিশেষ-উপকারী। মহাপ্রভু নিজেও এই শাকের ভক্ত ছিলেন। পুদিনা শাককে রোচনীয় বলা হয়। এই শাকও অগ্নি-দীপক। মুখের জড়তা নাশ, কফ ও বায়ু রোগে এবং বল ও অরুচির জন্য এই শাক জনপ্রিয়। বন্য, পার্বতীয় ও বালুজ এই তিনপ্রকার পুদিনাশাকই হিক্কা ও বমি নিবারণ করে। সুষনী শাক মেদ রোগ, জ্বর, শ্বাস, মেহ, কুষ্ঠ, দাহ প্রভৃতিতে উপকারী। এ শাকে নিদ্রা বাড়ায়, তাই উন্মাদাদি রোগে এই শাককে পথ্যস্বরূপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নটেশাক, পলতা, মূলো কলাই প্রভৃতি শাকেরও অনেক গুণ। নালতে শাক পিত্তদোষ দমন করে ও খাদ্যে রুচি বাড়ায়। তাই ব্যঞ্জনের পূর্বে নালতের শুক্তো অনেকের কাছেই উপাদেয়। শুলফাশাকও তিক্ত। এ শাক নটেশাকের সঙ্গে একত্রে মিশ্রিত করে রান্না করা হয় অনেক স্থানে। অনেকে এ শাকের চাটনী খান। গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোক শুলফার

ক্কাথ খান হৃদয়ের বলবৃদ্ধির জন্য। সর্ষেশাকের কোন উপকার নেই।

বাঙালীর খাদ্যের উপরই বাঙালীর স্বাস্থ্য নির্ভরশীল। রাখালের গানে, কৃষকের সারি বা জারি গানে, গ্রাম-গীতিতে, মেয়েলী কথায়, ডাক-খানার বচনে, দিদিমার ভাঙা হাঁড়িঝুড়িতে সর্বত্রই তার প্রমাণ। স্বাস্থ্যরক্ষার নানা নিয়ম প্রতিপালন করার আহ্বান দেওয়া হয়ে থাকে নানান ধরণের গান, ছড়া, ধাঁধা প্রবাদ, প্রবচনাদির মাধ্যমে। যেমন—'কাকের সান্না কথার ভার, কুকুর ঘুম অল্পাহার, ঘরের দুধ গাছের ফল, তাতেই বাড়ে গায়ের বল'। অর্থাৎ, সকালে ওঠা, বাক সংযম, গাঢ় নিদ্রা অথচ সহজেই জেগে ওঠা, ক্ষুধা রেখে খাওয়া, বিশুদ্ধ দুধ ও সুপক্ক ফলাদি আহার দেহের পুষ্টিবিধান করে।

আহারের কতগুলো নিয়মও আছে। যেমন খাদ্যারম্ভে তিতা, আহারান্তে একটু লবণ দিয়ে দাঁত ঘষা, কালকচুর ডাঁটা দিয়ে কান চুলকান, নাভিতে তৈলমর্দন প্রভৃতি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। 'আতে তিক্ত দাঁতে নুন, পেটের ভর তিনগুণ, কানে কচু, নাইয়ে তেল, তার বাড়ী বৈদ্য না গেল।' এ ছাড়াও নানাবিধ উপদেশ আছে, যেমন—'চাইরবার খায়, দুইবার নায়, তার কাছে বদ্যি না ধায়।' অর্থাৎ সকালে জলযোগ, মধ্যাহ্নে পূর্ণাহার, বৈকালে জলযোগ ও ফলাদি আহার, রাতে ক্ষুধা রেখে অল্পাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। তাছাড়া 'খায় বসে না কোমর কাছে, মরণ যায় তার পাছে পাছে।' অর্থাৎ আহারের পর বিশ্রাম না করে কাজে গমন করলে নানা রোগের উৎপত্তি হয়।

গবেষণালব্ধজ্ঞানের ভিত্তিতে বিভিন্ন খাদ্যে অবস্থিত ক্যালরি ও প্রোটিন সম্বন্ধে নানা নির্দেশনামা প্রচারিত রয়েছে। ভারতীয় চিকিৎসক সংসদ নির্ধারিত এ ধরণের একটি নির্দেশনামায় জানা যায় যে শৈশবে অর্থাৎ ৬ মাস, ৭-১২ মাস, ১-৩ বৎসর, এবং ৪-৬ বৎসর পর্যন্ত শিশুর যথাক্রমে ১২০, ২০০, ১২০০ এবং ১৫০০ ক্যালরিযুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন। এই সময় ৩.৫ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন। কৈশোরে বা ৭-৯ বছর বয়সে এবং ১০-১২ বছর বয়সে ক্যালরি ১৮০০ এবং ২১০০ ও প্রোটিন যথাক্রমে ৩ এবং ২·৫০ গ্রাম প্রয়োজন। বারো বৎসর বয়সের পর ছেলেদের এবং মেয়েদের একই ক্যালরি ও প্রোটিনে শরীর রক্ষা হয় না। উভয়ের জন্য তখন থেকেই ভিন্ন ভিন্ন ক্যালরি ও প্রোটিনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যেমন ১০-১৫ বৎসরের মেয়ে ও ছেলের জন্য যথাক্রমে ২১০০ ও ২৫০০ ক্যালরি এবং ২·৫ গ্রাম প্রোটিন প্রয়োজন। যৌবনেও আছে এই পার্থক্য। ১৬-১৯ বৎসরের যুবতীর এবং ঐ বয়সের যুবকের জন্য দরকার যথাক্রমে ক্যালরি

২১০০ এবং ৩১৫০ এবং প্রোটিন ২ গ্রাম। পূর্ণবয়স্ক লোকেদের যাঁরা হাল্কা কাজ করেন তাঁদের জন্য ক্যালরি ২৪০০, এবং যাঁরা শ্রমসাধ্য কাজ করে তাঁদের জন্য ক্যালরি ২৮০০ ও যাঁরা কঠিন কাজ করেন তাঁদের ৩৯০০ অন্তত ক্যালরি দরকার। সকলের জন্যই প্রোটিন দরকার ৫৫ গ্রাম। গর্ভবতী নারীর শেষ কয় মাস এবং স্তন্যদাত্রী নারীর দৈহিক শ্রম অনুযায়ী ক্যালরির পরিমাণ বাড়ানো বা কমানো উচিত। নিম্নের নকশাটিতে প্রতি কিলোগ্রাম খাদ্যের মোটামুটি ক্যালরিমূল্য এবং প্রতি গ্রাম প্রোটিন থেকে এক একটি বিশেষ খাদ্যে কতটা ক্যালরি পাওয়া যেতে পারে তার হিসাব দেওয়া যেতে পারে—

খাদ্যের প্রোটিন ক্যালরি নক্সা নং ১৫

খাদ্যের পরিমাণ	খাদ্যের নাম	প্রোটিন (গ্রাম)	খাদ্যমূল্য (ক্যালরি)	প্রোটিনের গ্রাম প্রতি ক্যালরির পরিমাণ
১ কিলোগ্রাম	চাল	৭৫	৩৫০০	৪৬
১ "	আটা	১২০	৩৩৪০	৩৭
১ "	মুসুরডাল	২৫০	৩৫৭০	১২
১ "	মুগডাল	২৪৫	৩৫৭০	১৪
১ "	ছোলাডাল	২১০	৩৫৭০	১৭
১ "	কলাইডাল	২৪০	৩৫৭০	১৫
১ "	মটরডাল	২৫০	৩৫৭০	১২
১ "	চীনেবাদাম	২৬৭	৫৫০০	২০
১ "	দুধ	৩৫	৬৯০	১৭
১ "	মাছ (মিঠেজলের)	১৬৫	৮০০	৫
১ "	ছাগমাংস	১৮০	২৩০০	১২

বিভিন্নপ্রকার শাকে নানাবিধ ক্যালরি ও প্রোটিন আছে। তাই নিরামিষাশী ব্যক্তি বিভিন্নপ্রকার শাক খেয়ে আমিষ জাতীয় প্রোটিনের অভাব দূর করে থাকেন। বাঙলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছে ভোজ্যদ্রব্য হিসাবে শাকের একটি বিশেষ মূল্য আছে। এই মূল্যবোধ থেকেই 'বাঙালীর শাকভাত' কথাটা এসেছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, ডিম, দুধ প্রভৃতি জান্তব প্রোটিনের বায়োলজিক্যাল ভ্যালু বেশী। একমাত্র চাল ব্যতীত অন্যান্য শস্য থেকে পাওয়া উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের পুষ্টিকারিতা জান্তব প্রোটিন থেকে কম। কারণ, এই প্রোটিনে একাধিক অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিডের ঘাটতি থাকে। একটি শস্যের প্রোটিনে যে অ্যামিনো অ্যাসিডের ঘাটতি সেই অ্যামিনো অ্যাসিডটি যদি অন্য কোন একটি

প্রোটিনে কিছু বেশী থাকে তবে এ দুয়ের মিশ্রণে একের ঘাটতি অন্যের দ্বারা পূরণ হয়। এই ভাবে দুটি অপকৃষ্ট প্রোটিনের যোগে একটি উৎকৃষ্ট প্রোটিন সৃষ্টি হতে পারে। যেমন মাখন তোলা গুঁড়ো দুধ, গম, আর তৈল নিষ্কাসনের পর চীনাবাদাম থেকে পাওয়া প্রোটিনের পোষণ সামর্থ্য অনুপাত যথাক্রমে ২·৭, ২·৩০, ১·৮ মাত্র। গম আর গুঁড়ো দুধের প্রোটিন ৭০ : ৩০ অনুপাতে যে খাদ্য তৈরী করা যাবে তার পোষণ সামর্থ্য অনুপাত দুধের প্রোটিনের সমান, অর্থাৎ ২·৭। আবার ৭০ : ৩০ অনুপাতে গম আর চীনাবাদামের ছিবড়া মিশ্রিত করলে প্রোটিন পাওয়া যায় ২·১ মাত্র। অনেকদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত একটি গবেষণার ফলে জানা গেছে যে ডাল ভাত খাবার পরে সামান্য দুধ খেলে ডাল-ভাতের মধ্যে ডালের পুষ্টিমূল্য অনেক বেড়ে যায়। এ ভাবে ভিটামিনের মূল্যও বৃদ্ধিকরা যেতে পারে। এই ভিটামিন-এর অভাবে শরীরের বৃদ্ধি হয় না। বয়স্কদের দৈনিক ৫০০০ আন্তর্জাতিক মাত্রায় এবং শিশুদের ১৫০০-৫০০০ ভিটামিন 'এ' খাওয়া উচিত। ডিম, দুধ, পনীর, কড্‌লিভার অয়েল ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন 'এ' আছে। তাছাড়া গাজর, ভুট্টা প্রভৃতি হলুদবর্ণের খাদ্যে এবং শাকসবজিতে 'কারোটিন' নামে একটি রঞ্জকদ্রব্য আছে। এটিও ভিটামিন 'এ'তে রূপান্তরিত হতে পারে। ভিটামিন 'এ' শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী। প্রতিদিনের খাদ্যে কমপক্ষে ১২ মিলিগ্রাম লোহা থাকা প্রয়োজন। গর্ভবতী ও স্তনদাত্রী মায়েদের জন্য আরও বেশী লোহার



দরকার অন্তত ১৫-২০ মিলিগ্রাম। খাদ্যে লোহার অভাবে রক্তাল্পতা রোগ হয়। দুধে লোহার অভাব আছে। যে সব খাদ্যে লোহা আছে তা মাংস, ডিম, মাছ, মটর, মুসুর ডাল ও শাকসবজি।

এ ধরণের উপদেশাদি অহরহ পাওয়া যায় বাঙালীদের কাছে। আসলে যে কোন তিনজন বাঙালী মিলিত হয়ে কোন অসুখবিসুখ বা স্বাস্থ্যরক্ষা

সম্পর্কিত আলোচনা করেন তার মধ্যে অন্তত দুজন বাঙালী কোন না কোন ওষুধ বা পথ্যের ব্যবস্থা দেবেনই। চিকিৎসার পরামর্শ দেওয়াটা যেন বাঙালীর রক্তমাংসের সঙ্গে মিশে গেছে। তথাপি বাঙালীকে চিকিৎসার জন্য শিক্ষিত ডাক্তার কবিরাজদের উপর ভরসা করতে হয়ই। বাঙলার লোকবৃত্তের সর্বত্রও আছে এর চিহ্ন। উদাহরণস্বরূপ আমরা কবিরাজ বিষয়ক একটি গাথার কিছু অংশ উদ্ধৃত করতে পারি। "হাঁক ছাড়িয়া ডাকে বাসু, কবিরাজ মশয়। আমার মা যে অখনতখন তোমাকে যাইতে হয়। তিনকড়ি কবিরাজ ডাক শুইন্যা ধুতিচাদর লইল। চাদরের খুটির মধ্যে দাওয়াই বান্ধিয়া লইল॥ হাতে নিল বাখা লাঠি কাঁধে লইল ছাতি। তুলসীতলায় যাইয়া বৈদ্য ঠেকাইল তার মাথি॥ কিষ্টবর্ণ দেহখানি তেলতেলা গা। খাটোখুটো লাফাগোফা ফাটাফাটা পা॥ কুতকুতিয়া চায় কবিরাজ গুরগুরিয়া যায়। পাছে পাছে বাসুনাপিত উল্টা হোঁচট খায়॥ বাসুরবাড়ী যাইয়া বলে বৈদ্য তিনকড়ি। তোমার মা যে ভাল হইবে খাইলে তিন বড়ি॥ আইজকা দিও বেলের ছাল ও নিমের পাতার ঝোল। কাইলকা দিও গরম কৈরা সজ ভিজান জল॥ পরশু দিবা লাল বড়িটা কাঞ্জি দিয়া গুইলা। তশু দিবা নীল বড়িটা কুয়ার পানি তুইলা॥ শেষাশেষি দিবা বাসু এইনা ধলা বড়ি। তারপর তোমার মায়ের আর থাকবে না জ্বরজ্বরি॥ কবিরাজের কথা শুইনা বাসু হাতে নিল বড়ি। 'বিদায় হবার সময় হয় যে' কইল তিনকড়ি॥ এক কুলা চাউল দিল ডাইল এক ডালা। গাছের থাইকা তুইলা দিল বেগুন লঙ্কা কলা॥ হলদি দিল লবণ দিল পেটি ভইরা তেল। বিদায় পাইয়া কবিরাজ হাসতে হাসতে গেল॥' কিন্তু বাসু কবিরাজের দাওয়াইয়ে তার মাকে বাঁচাতে পারে না। তখন কবিরাজ মশায় বলেন, 'ডাক এসে গেলে কোন ওষুধের বাবার সাধ্য নেই যে রোগী ধরে রাখে'। গ্রামের মানুষেরও সেই বিশ্বাস। এই বিশ্বাস থেকেই নানাবিধ গাছগাছড়া ব্যবহার করে বাঙালী রোগ সারাতে। আদিবাসী উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই প্রবণতা লক্ষণীয়। বাঙালী কবিরাজ সম্পর্কে নানা কাহিনী চালু আছে লোক-সমাজে। তাঁরা বলেন সুশ্রুত মতে চন্দ্র যেমন তার শীতল কিরণের সাহায্যে পৃথিবীকে আর্দ্র করে, শোষণ শক্তিদ্বারা শুষ্ক করে এবং বায়ু এই দুই প্রকার গুণদ্বারা সঞ্চালিত হয়ে ভূমণ্ডলকে পালন করে, তেমনি কফ, পিত্ত ও বায়ু জীব-দেহকে যথাক্রমে আর্দ্র, শুষ্ক ও সঞ্চালিত করে। বায়ু, পিত্ত ও কফ শরীরকে ধারণ করে বলে তাদের বলা হয় ধাতু। চরকমতে বায়ু, পিত্ত ও কফের গতি ত্রিবিধ—

ক্ষয়, সমতা ও বৃদ্ধি। আয়ুর্বেদ মতে পিত্ত ও কফ পঙ্গু, কেবলমাত্র বায়ুরই গতিবেগ আছে। এই বায়ু পাঁচ প্রকার—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যাণ। প্রাণবায়ু শরীরের রক্তসঞ্চার ও দেহধারণের কাজ করে। আপানবায়ু প্রয়োজন মত বাত, পুরীষ, শুক্র, গর্ভ ও আর্তব অধোদেশে নিয়ে যায়। সমান বায়ু আহার্য পরিপাক এবং রস, রক্ত, মল, মূত্রাদি পৃথক করে, উদান বায়ু বাক্য ও গীতাদি ধ্বনির সহায়ক এবং ব্যাণবায়ু সর্বদেহে ব্যাপ্ত থাকায় তা স্বেদ ও রক্তে স্রাবিত হয়। বায়ু কুপিত হয়েই হয় যত রোগ। বায়ু কুপিত হবার নানা কারণ আছে। আহার বিহারাদি দ্বারা নানাভাবে বায়ু প্রকুপিত হয়। স্নিগ্ধোষ্ণ, তেজস্কর দ্রব্য, স্বাদু ও অম্লরসযুক্ত ভোজন এবং তৈলাদি সেবনে বায়ু কুপিত হয়। তাই আয়ুর্বেদ মতে চাউল, নতুন মাষকলাইডাল, গোধূম, যব, তিল, কাঁজি, দুধ, মাংস, বেগুন, পটোল, আলু, সজনাডাঁটা, দ্রাক্ষা, আম, আমড়া, দধি, ছানা, ক্ষীর, লবণাক্তদ্রব্য মিষ্টদ্রব্য তৈলমর্দন স্নিগ্ধকর দ্রব্য ও গন্ধ দ্রব্য অনুলিপণ বিশুদ্ধ আমোদসম্ভোগ চিন্তাত্যাগ ও শীতলজলে স্নান প্রভৃতি থেকে বায়ুর প্রকোপ দমন করতে হলে নানাপ্রকার শাক খাওয়া উচিত। বায়ুপ্রধান রোগীর পক্ষে চিন্তা, রাত্রি জাগরণ অতিবাক্যকথন, উপবাস, বমন অধিক পরিশ্রম ইত্যাদি নিষেধ। তিক্তদ্রব্য ভক্ষণ অহিতকর। স্মরণীয়, মাছ বা মাংস জাতীয় খাদ্য থেকে অম্লজলবণ সঞ্চারিত হয়, শাক-সবজি থেকে ক্ষারলবণ সঞ্চারিত হয়। এই উভয় প্রকার খাদ্যেরই প্রয়োজন আছে দেহের পুষ্টির জন্য। মানব দেহ ঈশ্বরের মন্দির। ঈশ্বরের অনুগ্রহে যে দেহ তাকে শুদ্ধ ও পবিত্র রাখার জন্য আত্মসংযমী হবার প্রয়োজন আছে।

আহার-বিহারাদির অনিয়মে অনেক সময়েই বায়ু প্রকুপিত হয়। তাই বায়ু কুপিত শিরঃপীড়ায় সুষুনী, বেতুই ও কলমীশাক ব্যবহার করা হয়। পুঁইশাকও বায়ু নাশ করে। শাক সম্পূর্ণরূপে পেট পরিষ্কার রাখে, এবং পেট পরিষ্কার থাকলে সহসা রোগাক্রান্ত হবার ভয় থাকে না। পলতার সুক্তো, মুগ ডাল দিয়ে পলতার বড়া মুখরোচক ও উপকারী। ভূতচতুর্দশী ব্রতে চৌদ্দ শাকের বিধান। এই চৌদ্দ শাক—'ওল, কচু, সরিষা, হিঞ্চে। নিম, নিসিন্দা, শুলফা, সাঞ্চে ॥ বেতো, ভাটি, কেউজয়ন্তী শাক। শুলতে, পলতা করগে পাক ॥' এই তালিকায় পুঁই ও কলমী বাদ পড়েছে। কারণ চতুর্দশী তিথিতে শরীরে যে দোষের সঞ্চার হয় ও ঋতুভেদে যে সকল বিকারপ্রাপ্ত হয়, তার জন্যই ঐদিনে এই দুই শাক খেতে মানা। ফাল্গুন কৃষ্ণাষ্টমীতে শাকাষ্টশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা

আছে। পিতৃগণকে তুষ্ট করার জন্য পৌষের কৃষ্ণাষ্টমীতে পূপাষ্টকাশ্রাদ্ধ এবং মাঘ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে মাংসষ্টকাশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানেরও বিধান আছে। নানা ব্রতাদি ও অনুষ্ঠানে শাকাদির ব্যবস্থা আছে। যমপুকুর ব্রতে কুমারী ব্রতিনী বলে, এত প্রকার উপাদেয় শাক রয়েছে অথচ রাজার বেটা পোড়া পেটের জন্য পক্ষী মারছেন কেন। আমরা শাকান্ন ভোজন করে ধর্মকর্ম করতে অভিলাষ করি। পাখী মারতে গেলে ছড় লাগবেই লাগবেই তাই—'শুষনী কলমী ল-ল করে রাজার বেটা পক্ষী মারে। মারণ পক্ষী সুকোর বিল, সোনার কৌটা রূপোর খিল॥ খিল খুলতে লাগল ছড়, আমার বাপ ভাই হোক লক্ষেশ্বর।' এভাবে নানাবিধ শাকের কথা বলা হয়েছে। পুণ্যিপুকুর ব্রতেও শাকের উল্লেখ আছে। যদিও কলিকাতা সন্নিকটস্থ স্থানের ব্রতকথায় শাকাদির উল্লেখ নেই কিন্তু গ্রামদেশে আছে। যেমন—'নমঃ নমঃ শিব মহেশ্বর। তোমার বরে হে ঠাকুর॥ আমার এই পুণ্যিপুকুর। জলে হোক টুইটুম্বুর॥ মাছ করবে কিলবিল। আসবে বক আসবে চিল॥ আসবে কত ছেলেমেয়ে। হাসিমুখে যাবে নেয়ে॥ আমার পুকুরের জল নেবে। আমার বাগানের ফুল নেবে॥ শিবের মাথায় দিয়ে জল। পূজবে শিবের পদতল॥ বলবে মুখে ববম্ ব্যোম। অমনি ছুটে পালাবে যম॥ শুষনী কচু কলমী শাক। দিনের দিন বাড়তে থাক॥ পাড়ার ছেলে পাড়ার মেয়ে। যত ইচ্ছা যাক না নিয়ে॥ এ যে আমার পুণ্যিপুকুর। বর দিয়েছে শিবঠাকুর॥' ইত্যাদি। এ শাকে শুধু রমণীরা তৃপ্ত হন না নানাবিধ রোগেরও আরোগ্য হয়। প্রসঙ্গত এই শাকের গুণাবলী ও রন্ধন প্রণালীর দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে, অন্যান্য রন্ধন প্রণালীর দিকেও।

গাঁদাল পাতা আমাশয়াদি রোগের মহৌষধ। এ পাতা বাটাও খাওয়া যায়, আবার ঝোল রেঁধেও খাওয়া যায়। গাঁদালের ঝোল রাঁধতে আলু, পটল, ডুমুর, কাঁচকলা খোসা ছাড়িয়ে ডুমো করে কেটে ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে। তারপর উনুনে কড়াই চাপিয়ে পরিমাণ মত তেলে পাতা ভেজে আনাজ সাঁতলাতে হবে। এ সব আধভাজা হলে জিরে হলুদ মরিচ নুন ও পরিমাণ মত জল দিয়ে কড়াইয়ের মুখে একটি পাত্র ঢাকা দিতে হয়। আন্দাজ মত ঝোল নিয়ে কড়া নামালেই ঝোল হয়ে গেল।

পলতার ডালনা তিতো। থানকুনি পাতা যে কোন পেটের রোগে অব্যর্থ। আমিষ ও নিরামিষ দু ভাবেই থানকুনি পাতার ব্যবহার হয়। থানকুনি পাতা বাঁটাও খাওয়া যেতে পারে। এপাতার আমিষ ঝোলে শিঙ, কই, মাগুর,

ন্যাটা প্রভৃতি মাছ হামেশাই দেওয়া হয়। আলু কাঁচকলা পটল ডুমুর কচি বেগুনও দেওয়া যেতে পারে। পলতার ডালনায় পলতা পাতা কাঁচাকলা আলু ডুমুর লালআলু বেগুন প্রভৃতি আনাজ, বড়ি তেল ঘি ধনে সরষে জিরে মরিচ আদা প্রভৃতির প্রয়োজন। আনাজ কুটে ধুয়ে হলুদ মাখিয়ে রাখা হয় প্রথমে, গাঁজলা মরলে সাঁতলাতে হবে, পরে হলুদ সরষে বাটা জলে গুলে কড়াতে দিতে হয়। এগুলো ফুটলে বড়ি দিতে হয়। কিছু পরে জিরে মরিচ বাটা নুন ও সামান্য চিনি দেওয়া হয়। সিদ্ধ হয়ে গেলে নামিয়ে তেজপাতা ও সরষে দিয়ে সম্বরা দেবার সময় পরিমাণ মত আদা বাটা দিলে সুস্বাদু হয়। ভাজা হিসাবেও নানাপ্রকারের শাক খাওয়া হয়।

সব রকম শাকই ভাজা খাওয়া চলে। প্রথমে শাকগুলো ভাল ভাবে জঞ্জালমুক্ত করে বেছে ধুয়ে নিতে হয়। তারপর সামান্য নুন দিয়ে শুকনো কড়াইয়ে শাকগুলো ঢেলে দিয়ে একটা পাত্র দিয়ে চাপা দিতে হয়। শাক ভাজায় জল দিতে হয় না। নিজের জলেই নিজে সিদ্ধ হয়। শাকগুলো সিদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে জলও শুকিয়ে যায়। তখন সিদ্ধ শাক নামিয়ে রেখে কড়াইয়ে তেল দিয়ে লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে শাকগুলো আবার কড়াইয়ে ঢেলে দিতে হবে। তারপর একটু নুন দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতেই শাক ভাজা হয়ে যায়।

শাক ও থোরের ছেঁচকিও হয়। কচি মূলো শাককে কুচি কুচি করে কেটে ধুয়ে, কড়াইয়ে তেল দিয়ে শাকের গাঁজলা মরলে সরষে, লঙ্কা ফোড়নের সম্বরা দিয়ে শাক কড়াইয়ে দিতে হবে। পরে পরিমাণ মত নুন ও সরষে বাটা দিয়ে ঝরঝরে হয়ে এলে অল্প একটু মিষ্টি দিয়ে নামিয়ে নিতে হয়। থোর ছেঁচকিতে সাধারণত লঙ্কা ও সরষে বাটা নুন নারকেল কোড়া এবং অল্প মিষ্টি লাগে। থোর চাকা চাকা করে কাটার সময় আঙ্গুলের ডগায় জড়িয়ে জড়িয়ে সরু সরু আঁশ ফেলে দিতে হয়। থোর ছেঁচকি করার আগে সিদ্ধ করে নিতে হয়। ছেঁচকি নানাজনে নানাভাবে রান্না করে থাকে। তবে ছেঁচকির জিনিস কচি হওয়া চাই। লাউ ছেঁচকি, ইঁচরছেঁককি, ডুমুর ছেঁচকি, বড়ির ছেঁচকি, সজিনা ফুলের ছেঁচকি, নিমবেগুনের ছেঁচকি প্রভৃতিও গ্রামবাঙলার নিত্যদিনের খাবার।

সুক্তোতেও নানাবিধ শাকের প্রয়োজন। শীত ঋতু ছাড়া অন্য সব ঋতুতে সুক্তো বিশেষ উপকারী। বসন্তকালে নিমপাতার, বর্ষায় পলতার, অন্য সময়ে হিংচে, করলা, উচ্ছের সুক্তো বাঙলার খুবই জনপ্রিয়। সুক্তোতে সরষে হলুদ আদা তেজপাতা পাঁচফোড়ন পোস্ত বড়ি নারকেল কোড়া প্রভৃতি লাগে। সুক্তোতে কাঁচকলা আলু বেগুন পটল ঢেঁরস মূলো সজনেডাঁটা রাঙা আলু প্রভৃতি

দেওয়া হয়। হিংচের সুক্তোতেও এই সব আনাজ ভাজা ভাজা করে নিতে হয়। তারপর হলুদ ও সরষে বাটা গুলে ঢেলে দিতে হয়। এদিকে হিংচেতে নুন মাখিয়ে জল বের করে নিতে হয়। তারপর আনাজে হিংচে দিয়ে সাঁতলাতে হয়। নামাবার আগে তেজপাতা ও পাঁচফোড়ন সম্বরা দিতে হয়। নিম পাতার সুক্তোতে বড়ি ভাজা দেয়া হয়। করলার সুক্তো, মূলোর সুক্তো, ছাঁচি কুমড়োর সুক্তো ছাড়াও থোর, আলু, লাউ, কুমড়া প্রভৃতির খোসা দিয়ে সুস্বাদু সুক্তো রান্না করে থাকেন বাঙালী রমণী। অনেক সুক্তোতে ডালের বড়া ভেজে বা ডাল সিদ্ধ করে দেয়া হয়।

শাকের নানাবিধ ঘন্টও তৈরী হয়। যেমন পালঙশাকের ঘন্ট। এ শাকের ঘন্ট রাঁধতে প্রথমে শাক বেছে কুচি কুচি করে কেটে ধুয়ে নিতে হয়। সাধ্য অনুযায়ী আনাজ দেয়া যেতে পারে। সাধারণত আলু, লাল আলু, মূলো, বেগুন, বড়ি, নারকেল প্রভৃতি ঘন্টের উপাদান। মসলার মধ্যে আদা, ধনে, জিরা, মরিচ, লঙ্কা, হলুদ ইত্যাদি। আনাজ কেটে বেগুন বাদে সব ভেজে নিতে হয়। কড়াইয়ে তেল দিয়ে লঙ্কা, তেজপাতা, জিরে ফোড়ণ দিয়ে সিদ্ধ শাক ও আনাজ এক সঙ্গে ঢেলে পরিমাণ মত নুন ও জল দিতে হয়। জল কমে এলে আদা, ধনে, জিরে, মরিচ বেটে গুলে দিতে হয়। থকথকে হলে বড়ি ভাজা, নারকেল কোড়া ও সামান্য মিষ্টি দিয়ে নামিয়ে নিতে হয়। এই ভাবে কচুডাঁটার ঘন্ট, মানকচুর ঘন্ট, মোচার ঘন্ট, থোর ঘন্ট, লাউ ঘন্ট, মূলো ঘন্ট, কড়াইশুটি ঘন্ট, ফুলকপির ঘন্ট প্রভৃতি রান্না করা হয়ে থাকে।

শাকান্ন বা খুদকুঁড়ো বহুল জনপ্রিয় হলেও বাঙালী শুধু এতেই সন্তুষ্ট থাকে নি কোনদিন। নানাবিধ ব্যঞ্জন, মৎস্য, মাংস, সুমিষ্ট পিষ্টক ও দুগ্ধ জাতীয় দ্রব্যাদির সঙ্গে নানা মশলাযুক্ত খাদ্যসামগ্রী বাঙালী সুপ্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহার করে আসছে। মাংসের মধ্যে হরিণের মাংস প্রাচীন বাঙলায় খুবই জনপ্রিয় ছিল, বিশেষত শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি শিকারজীবী লোকেদের মধ্যে। ছাগ মাংসও বহুল প্রচলিত ছিল। কোন কোন আদিবাসী সমাজ শুকনো মাংস খেত। শূকরের মাংস হিন্দুদের খাদ্য হলেও মুসলমানের 'হারাম'। তেমনি বৈদিক যুগে গোমাংস ভক্ষণের রেওয়াজ থাকলেও গোমাংস খেলে হিন্দু জাতিচ্যুত হয়। মুরগীর মাংসের ব্যাপারেও তাই। মুরগী গোঁড়া হিন্দুর খাদ্য নয়। গোঁড়া হিন্দুর কাছে পেঁয়াজও গোমাংসবৎ।

অতিথি সৎকারেও বাঙালী সবিশেষ পটু। তাই বাঙালী হীরাধর মোড়লের বাড়ী যখন বিনোদ এল তখন সে দেখল মোড়লের বাড়ীর পাঁচ বউকে 'পরম

র"াধুনী'। তাঁরা মান কচু ভাজা, লাউতার অম্বল, কৈমাছের চড়চড়ি ও নানা-প্রকার মাছের ব্যঞ্জন কালজিরার সম্বরা দিয়ে রেঁধে পাঁচ ভাই ও অতিথি বিনোদকে খেতে দিয়েছেন—'পাঁচ ভাই-এর সঙ্গে বিনোদ পিড়াতে বস্যা খায়। এমন ভোজন বিনোদ জন্মে না সে খায়। শুকতা খাইল, বেছন খাইল, আর ভাজা বড়া। পুলি পিঠা খাইল বিনোদ, দুধের সিরায় ভরা॥ পাত পিঠা, বরা পিঠা, চিতই চন্দ্রপুলি। মালপোয়া খাইল কত রসে ঢলিঢলি॥'

বিয়ের খাবারেরও আছে নানান বিবরণ। রামনারায়ণ তর্করত্ন ১৮৫৪ সনে লিখেছেন—'ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি, দুচারি আদার কুচি, কচুরি তাহাতে খান দুই। ছকা আর শাক ভাজা, মতিচুর বোঁদে খাজা, ফলারের যোগাড় বড়ই। নিখুঁতি জিলাপি গজা, ছানাবড়া বড় মজা, শুনে সক্‌সক্‌ করে নোলা। হরেক রকম মণ্ডা, যদি দেয় গণ্ডা গণ্ডা, যত খাই তত হয় তোলা। খুরী পুরী ক্ষীর তায়, চাহিলে অধিক পায়, কাতারি কাটিয়ে সুখো দই।' তাছাড়াও আছে 'সরু চিড়ে সুখো দই, মর্তমান ফাকা খই, খামা মণ্ডা পাত পোরা হয়।' এবং 'গুমো চিড়ে জলো দই, তিত গুড় ধেনো খই, পেট ভরা যদি নাই হয়।' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন—'এমন পাঁঠার নাম যে রেখেছে বোকা, নিজে সেই বোকা নয়, ঝাড়েবংশে বোকা।' অন্যত্র তিনি রন্ধনশিল্পী মেয়েদের রান্নার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—'তাজা তাজা ভাজা পুলি, ভেজে ভেজে তোলে। সারি সারি হাঁড়ি হাঁড়ি কাঁড়ি করে তোলে।...আলু তিল গুড় ক্ষীর নারিকেল আর, গড়িতেছে পিটেপুলি অশেষ প্রকার।' তপসে মাছ দেখে গুপ্ত কবি বলেছেন—'অপরূপ হেরে রূপ, পুত্র শোক হরে। মুখে দেওয়া দূরে থাক, গন্ধে পেট ভরে।...তোমার ডিমের স্বাদ সুধার সমান, গণ্ডা গণ্ডা এণ্ডা খেয়ে, ঠাণ্ডা করি প্রাণ। প্রসব করিবে যত তবু রবে তাজা। আমাদেব আশীর্বাদে হবে নাকো বাঁজা।' আনারস সম্পর্কে তিনি বলেছেন—'আনা রস হোলে কেন, জানা রস হয়? পরে তার জানা যায়, রস ষোল আনা। অরসিক লোক তবু বলে তারে আনা। ফেলিয়া পনের আনা এক আনা রাখে। এই হেতু 'আনারস' বলে লোকে তাকে।'

বাঙালীর মৎস্যপ্রীতি, আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির অবজ্ঞার বিষয় ছিল। 'মছলী খাতা' বাঙালীকে নিরামিষাশী মানুষ প্রীতির চোখে দেখে না। প্রীতির চোখে দেখে না বাঙালীর মাংস ভক্ষণকে। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতক থেকেই খাদ্যের জন্য প্রাণীহত্যা নিন্দার কারণ হয়ে দাঁড়ায় আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্মে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে। বাঙালী নিরামিষাহারকে কোনদিন বরদাস্ত করে

নি। ভট্টভবদেব সুদীর্ঘ যুক্তিতর্ক উপস্থিত করে বাঙলীর আমিষাহার সমর্থন করেন। শ্রীনাথাচার্যও মৎস্য-মাংসাদির খাবার পক্ষে রায় দেন। বৃহদ্ধর্মপুরাণের মতে রোহিত, পুঁটি, শোল প্রভৃতি শ্বেতবর্ণ মাছ এবং আঁশযুক্ত মাছই ব্রাহ্মণদের ভক্ষ্য। সব মাছ ব্রাহ্মণ খেতে পারে না। যেমন বান বা বান জাতীয় মাছ। ইলিশ মাছ সমস্ত বাঙালীর অন্যতম প্রিয় খাদ্য।

শামুক, কাঁকড়া, হাঁস, মোরগ, পচা ও শুকনো মাছ, গরু, শূকর, পক্ষী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাসিত সমাজে অভক্ষ্য। তবে নিম্নতর সমাজস্তরে ও আদিবাসী সমাজে শামুক, কাঁকড়া, মোরগ, বান মাছ, শশক, সজারু, কচ্ছপ প্রভৃতি খাওয়ার রেওয়াজ ছিল ও আছে। শুটকী মাছও অনেক বাঙালী খান। বাঙালীর মৎস্যপ্রীতির কিছু পরিচয় পাওয়া যায় ময়নামতীর পোড়ামাটির ফলকগুলোতে। মাছ কোটা, মাছ বিক্রী করতে যাওয়ার কিছু পুতুল পাওয়া গেছে পুরা-আবিষ্কারের মারফৎ। আমরা নিজেরাও এর কিছু নিদর্শন পেয়েছি হরিনারায়ণপুরের কাছে, ডায়মণ্ডহারবারের নিকটে। একেবারে নদীর তীরে প্রাচীন হরিনারায়ণপুরের ধ্বংসাবশেষ রয়ে গেছে। সেখানে স্বল্প সময়ের জন্য ঘুরতে গিয়ে কয়েকটি পোড়ামাটির মাল্যদানা পেয়েছিলাম। বলাবাহুল্য, ওখানে প্রাপ্ত প্রায় সবকটি পুরাসামগ্রী সৌসাদৃশ্যের দিক থেকে শুঙ্গযুগের, অর্থাৎ খৃষ্ট জন্মের অন্তত দুশো বছর আগেকার। ঐ মাল্যদানার মধ্যে আকারে যেগুলো বড় তা নিঃসন্দেহে মাছের জালে ব্যবহৃত হত। প্রসঙ্গত ঐ অঞ্চলে এবং পরিপার্শ্বে আজও বিপুলসংখ্যক মৎস্যজীবী বসবাস করেন। পুরারসিক স্বর্গীয় কালিদাস দত্ত এদেরকে এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসী বলে আখ্যাত করেছেন।

নানারকম সরঞ্জাম দিয়ে মাছ ধরা হয়। এই সরঞ্জামের মধ্যে আছে বাঁশের তৈরী আওড়া, আটর, আটশ, খাদুল, খুলি, চুঁই, জলঙ্গা, ঝকারা পোলো, ঠুসি, ভগি, হোচা, লোহার শলাকাযুক্ত কোঁচ, পাতলা কাপড়ের ছাবি বা খুইচা, বরশী; বিভিন্ন ধরনের জাল—যেমন উড়া বা খেপ্‌লা জাল, কইয়া জাল, কনুই জাল, কুঁড়া জাল, কোনা-জাল, খড়কি জাল, পোনার জাল, গগন-বেড় বা বেড় জাল, গাঁতি জাল, গোবাল জাল, চণ্ডী জাল, ছাঁকনি জাল, ছুপনি জাল, ফেটা জাল, ঝাঁকি জাল, টগে জাল, দাঁড়া জাল, ধর্ম জাল, পাতন জাল, ফাঁসি জাল, বাচাড়ি জাল, বেউতি জাল, ভেসাল জাল, সারণী জাল, সালাং জাল প্রভৃতি। এই সব জাল শুধুমাত্র ধীবর বা জেলেরাই ব্যবহার করেন এমন নয়। অনেক গৃহস্থ বাড়ীতেও নানাবিধ জাল ও মাছ ধরার সরঞ্জাম

মজুত থাকে। কিছুদিন আগেও অনেক গাঁয়ের ছোট ছোট পুকুর যৎসামান্য টাকায় 'জমা' নিয়ে নিতেন জেলে। সেখানে তাঁরা মাছ চাষ করতেন। মাছের চাষ ও মাছ বিক্রীর টাকায় সংসার চালাতেন তাঁরা। আর্থিক দৈন্যহেতু অনেকেই পিতা পিতামহদের এই কাজ থেকে দূরে সরে গেছেন। সেখানে এসেছেন ঠিকাদার ও ফড়েশ্রেণীর লোক। কিন্তু তাঁরা অনেকেই মাছের চাষ হাতেকলমে জানেন না। অনেক সময় তাঁরা স্থানীয় জেলেদের সাহায্য নেন। এই জেলেদের অনেকে অবশ্য এখনও দুস্থাবস্থার মধ্যে থেকেও পিতৃ-পিতামহদের ন্যায়ই কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁরা খাল, বিল, হাওর, বাওর, ঘেরি, ভেরি থেকে মাছ ধরেন। চব্বিশপরগণা জেলার বাটানগরের কাছে ছোটকালিকাপুরে এই ধরণের কিছু ধীবর আছেন যাঁরা চাষও করেন মাছও ধরেন। তাঁদের অনেকেই ভাগচাষী। চাষের কাজ যখন থাকে না তখন মাছ ধরে উপরি আয়ের চেষ্টা করেন।

বর্ষার সূচনা থেকে শীতের মাঝামাঝি সময় অবধি গাঁয়ের পুকুর, খানা, ডোবা, জলা জায়গা থেকে মাছ ধরে বেড়ান এই সম্প্রদায়। জমির মালিকের সঙ্গে ভাগাভাগি করে মাছের যে অংশ পান তা বিক্রী করে ওঁদের সংসার চলে। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় থেকে প্রায় অগ্রহায়ণ-পৌষ অবধি তাঁরা মাছ ধরেন। তারপর জল শুকিয়ে যায়। মাছেরাও যেন কোথায় চলে যায়। মাঠের পাশে পাশে খানাডোবার মত ছোট ছোট জলাশয় তখনও একদম মজে যায় না। এই সব জলাশয়ের মালিক জলাশয়গুলোকে ফেরিওয়ালাদের ইজারা দিয়ে দেন ভাগে। ওঁরা সেখান থেকে মাছ ধরেন। এই মাছ মেছো-মেছুনী বিক্রী করেন। এই জলাশয়ের মাছ ছাড়া অনেক সময় মেছুনী খুব ভোরে মহাজনদের কাছ থেকে মাছ কেনেন। পাঁচ সাত মাইল হেঁটে বাজার বা হাটে গিয়ে মাছ বিক্রী করেন। অনেকে মাছ বাড়ী বাড়ী ফেরি করেন। এই মেছুনীদের অধিকাংশই বেওরা বা বিধবা। অক্লান্ত পরিশ্রমী। সকলেরই কিছু কিছু জমিজমা আছে। মাঘ-চৈত্র মাসে ওঁদের মাছের বজরা নিয়ে দেখা যায়। অন্য সময় ওঁদের নিয়মিত পাওয়া যায় না। অনেক সময় মাছের অভাবে কাঁচা আনাজও বিক্রী করেন ওদের অনেকে। ওঁরা ছাড়া আরও এক শ্রেণীর জেলে আছেন এই অঞ্চলে যাঁরা এক সঙ্গে দুই তিন চারজন মিলে জাল কাঁধে করে গৃহস্থ বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ান। পুকুরে জাল দেবার পরিবর্তে কিছু মাছ বা দু তিন টাকা মজুরী উপায় করেন। এই ভাবে তিন চারটা পুকুরে জাল নামিয়ে ভাগ হিসাবে যে মাছ পান তা বিক্রী করে সংসার চালান। অবসর সময়ে জাল বোনেন। ক্ষেতমজুরের কাজ

করেন, ও জন খাটেন। পুকুরে জাল ফেললে সর্বদাই মাছ পাওয়া যায় এমন নয়। যে দিনে মাছ জোটে না সে দিনটিকে ওরা বলে অপয়া। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা সর্বদা গামছা বা একটুকরা কাপড়ের ফেট্টি মাথায় বেঁধে হাঁটুর অনেক উপরে মালকোচা মেরে আটহাতী কাপড় পরে ওঁরা গাঁয়ের পথ অতিক্রম করেন। কখনও ছিপ, হাতছিপ, হুইল ; কখনও মহাজাল, খ্যাপলা, ফাঁদি, মেরিলা, পোনার জাল, নদীর জাল, বিলাস জাল, ইলসে জাল ; কখনও ঝুপি, কখনও কোঁচ, চৌকিছর বর্শা প্রভৃতি ছুঁড়ে মাছ ধরেন। তাছাড়া কেঁয়াগাছের কাটায় কেঁচো গেঁথে সুতোর সঙ্গে ঝুলিয়েও মাছ ধরতে পারেন এই মেছোরা।

মৎস্যপ্রিয়তা থেকেই নানাভাবে মাছ ধরার কলাকৌশল আবিষ্কার করেছে বাঙালী। রন্ধন প্রণালীর নানাপদ্ধতি আবিষ্কারের দ্বারা মৎস্যকে সুস্বাদু খাবারে পরিণত করছেন। মাছ দিয়ে নানাবিধ ব্যঞ্জন তৈরী করে চলেছেন। মাছেরঘন্ট, মাছভাতে, মাছপোড়া, মাছভাজা মাছেরঝোল প্রভৃতি মৎস্য সামগ্রী বাঙালীর প্রিয় খাদ্য। ইলিশমাছ ভাতে খুবই সুস্বাদু। এ মাছ ভাতে দেবার সময় বড় বড় করে কুটতে হয়। তারপর সেগুলো ধুয়ে নুন হলুদ মেখে পাতায় রেখে জল ঝরিয়ে নিতে হয়। সদ্য ফেনগালা ভাতের মধ্যে জলঝরা মাছ কচি কলাপাতার উপর বিছিয়ে পর পর সাজিয়ে দিতে হয়। তার উপর নুন, সরষের তেল, সরষে বাটা, হলুদ বাটা দিয়ে আরেকখানা কলাপাতা দিয়ে চাপা দিতে হয়। ভাতের ভাপে মাছ সিদ্ধ হয়। এ মাছ খেতে খুবই উপাদেয়।

মাছেরঘন্টে আলু ও বেগুন ছোট ছোট করে কেটে মাছের সঙ্গে ওদের সাতলাতে হয় হলুদ বাটা, লঙ্কা বাটা, পেঁয়াজ বাটা প্রভৃতি দিয়ে। মাছ দিতে হয় শেষে। নামাবার আগে আদা বাটা ও দই এবং সামান্য মিষ্টি দিতে হয় আন্দাজ মত। ডালমাছও খাওয়া হয়। মাছের মাথা দিয়ে মুগডাল উপাদেয় খাদ্যবস্তু। গলদা চিংড়ি দিয়েও ডাল রাঁধেন বঙ্গরমণী। ডাল ফুটে উঠলে লঙ্কা হলুদ জিরে মরিচ বাটা মিষ্টি ও নুন দিতে হয়। ডাল সুসিদ্ধ হলে ভাজা মাছ ঢেলে নাড়তে হবে। পরে ঘি তেজপাতা গোটা লঙ্কার ফোরণ দিয়ে সাতলে সে মাছ উনুন থেকে নামিয়ে গরমমশলা বাটা দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখতে হয় কিছুক্ষণের জন্য। মাছের পোলাও খায় বাঙালী। মাছের পোলাও-এ আদা ধনে মরিচ বাটা নুন প্রভৃতি মেখে উপযুক্ত পরিমাণ জল সহ মাছ উনুনে চাপাতে হয়। যে হাঁড়িতে মাছের পোলাও চাপান হয়, তার উপরে আর একটা ছোট্ট হাঁড়িতে থাকে জল। পরে হাঁড়িতে ঘি দিয়ে উনুনে চাপাবার পর লবঙ্গ তেজপাতা ফোরণ দিয়ে আখনির জল দিতে হবে। জল ফুটে উঠলে একটি পাত্রে সে জল ঢেলে রেখে

মাছ সাতলাতে হয়। তারপর থেতো গরম মশলা ও অর্ধেক মাছ ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হয়। ডেকচিতে অল্প গরম ঘি ও তেজপাতা সাজিয়ে এক থাক মাছ, মাছের পরে ভাত, তারপর এক থাক মাছ ও পরে ভাত সাজিয়ে আখনির জল নুন ও ঘি ঢেলে পরিষ্কার ন্যাকড়া ঢাকা দিয়ে বা সরা চাপা দিয়ে রাখতে হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাছের পোলাও তৈরী যায়।

মাছ দিয়ে বাঙালী নানাবিধ ব্যঞ্জন ও তৈরী করেন। মাছের ঝোল সব মাছ দিয়েই রান্না করা যায়। অনেক মাছের ঝোলে আলু প্রভৃতি তরকারী দেওয়া হয়, অনেক মাছে তরকারী দেয়া হয় না। মাছভেদে তরকারীর ব্যবহার হয়। যেমন ইলিশ মাছের তরকারী হচ্ছে সাধারণত বেগুন, পোনা মাছের আলু, কই মাছের ফুলকপি ইত্যাদি। এই মাছের ঝোলে অনেকে আবার ডালের বড়িও খান। অনেকে ধনে পাতা, কালোজিরা ফোরণ দিয়ে থাকেন। রামছোর বা তপছে মাছের ঝোলে কোন তরকারী না দিলে কোন ক্ষতি নেই।

মাছ ভাতে দেবার মতই করেই মাছের পাতুরি তৈরী করেন বঙ্গরমণী। ইলিশ মাছের পাতুরি খুবই সুস্বাদু। এ পাতুরি তৈরী করতে মাছে সরষে, লঙ্কা, হলুদবাটা, কাচালঙ্কা, নুন মাখিয়ে মানপাতায় করে তপ্ত খোলায় সেঁকতে হয়। মালাইকারিও রান্না হয় মাছের। বাগদা চিংড়ীর মালাইকারিতে মাছের মাথা বাদ দিতে হয়। এতে পিঁয়াজবাটা, আদা, চিনি বা গুড়, রসুন, লঙ্কাবাটা, নারকেল, গরমমশলা, নুন ও তেজপাতার প্রয়োজন। ডেকচিতে চাপিয়ে গাঁদলা মরলে এলাচ বাদে বাকী সব মশলাবাটা দিয়ে নাড়তে হয়। মশলা ভাজা হলে মাছ দিতে হয়। মাছ বাদামী রঙ হলে নারকেলের দুধ চিনি বা গুড় দিয়ে নাড়তে হয়। মাছ সুসিদ্ধ হলে ঝোল অবস্থায় নামাতে হবে। মাছ সিদ্ধ হবে নারকেলের দুধে। গরম জলে নারকেল কোড়া ভিজিয়ে ন্যাকড়া দিয়ে চেপে নারকেলের দুধ বের করে নিতে হয়।

শুধু শাক বা মাছই নয়। মাংসও বাঙালীর অন্যতম প্রধান খাদ্য। প্রাচীন সাহিত্যে হরিণ শিকারের সুন্দর বর্ণনা আছে। হরিণের মাংস ছাড়াও বাঙালী নানাজাতীয় পাখির মাংস, পায়রা, হাঁস, মুরগী, কচ্ছপ, কেঠো, ভেড়া, পাঁঠা প্রভৃতির মাংস খান। শূকরের মাংসও অনেকের প্রিয়। মুসলমানদের প্রিয় গো-মাংস। মুরগীর মাংস শহরের হিন্দু-মুসলমানদের কাছে সমান প্রিয়। অবশ্য গ্রামের অনেক হিন্দুর কাছে মুরগী অখাদ্য। যে হিন্দু মুরগী খান মুরগীর মাংস তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রিয়। কিন্তু গ্রাম বাঙালার বহু হিন্দু এখনও মুরগীকে যবনের আহার্য বলে মনে করেন।

মুঘল আমলের পর থেকে মাংসের নানা ভ্যারাইটি বা রকমফের হয়ে আসছে। মাংসের কালিয়া, কোপ্তা ও নানাবিধ নামের আমদানী হয়েছে। আমদানী হয়েছে মোগলাই খানা। মাংসের সঙ্গে সঙ্গে ডিমেরও ভক্ত বাঙালী। হাঁস ও মুরগীর ডিম ছাড়া অনেক পাখির ডিম; মাছের ডিমও বাঙালী খান। এবং প্রত্যেক ডিমের জন্য আছে আলাদা আলাদা পাক-প্রণালী। ডিমের ঝোল, ডিমের কালিয়ার সঙ্গে বাঙালী রমণী রান্না করেন ডিমের অম্বল। অনেক স্থলে মাছের ডিম দিয়ে অম্বল রান্না হয়।

বাঙালী নানাবিধ সবজি তরকারী ফল, আচার, চাটনী প্রভৃতি তৈরী করে খান। শবজির মধ্যে বেগুন, লাউ, কুমড়ো, কাকরোল, কচু প্রভৃতি আদি-অস্ট্রালয়েড মানুষের তরকারী। এবং এরা অদ্যাপি সমান জনপ্রিয় বঙ্গ সমাজে। তা-ছাড়া কলা, তাল, আম, কাঁঠাল, নারকেল, আখ প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রীও ওদের কাছ থেকে এসেছে আমাদের কাছে। মাছ, মাংস খাওয়া এমনকি ওদের পাকপ্রণালীর মধ্যেও আদিম চিন্তা পরিস্ফুট। লোধা সম্প্রদায়ের মাংস রান্নার মধ্যে তা জানতে পারি। মেদিনীপুরের লোধারা আকর্ষণীয় উপায়ে মাংস রান্না করেন। একটি শাল গাছের কাঁচা ডাল ভেতরের অংশ বাদ দিয়ে ফাঁপা করে নেন। পরে ফাঁপা অংশে মাংস পুরে দেন। কোন মশলা ব্যবহার করেন না। তারপর উপরে ও নীচে কাঠ সাজিয়ে সে কাঠে আগুন জ্বালান। এই আগুনে ডালটি পোড়ে না কিন্তু কাঁচা ডালের রসের ভাপে মাংস সুসিদ্ধ হয়। সময় মত এই মাংস নুন লঙ্কা মেখে খাওয়া হয়। এ মাংস খেতে বেশ সুস্বাদু।

নানাবিধ পিঠা তৈরীর মধ্যেও আছে আদিম চিন্তা, আছে আদিম মানুষের প্রজনন চেতনার কথা। বাঙালীর নানা পিঠের পরব আছে। পৌষ উৎসব, আখান যাত্রা ইত্যাদি পিঠের পরব। মিষ্টি পিঠে ছাড়াও এই সময় শিম পিঠে, বেগুন পিঠে জাতীয় নোনতা পিঠে তৈরী করেন বাঙলার প্রাকৃতজন। শিম ও বেগুন পিঠে দুটি পরম আহ্লাদ ভরে খান মাহাতো সম্প্রদায়। সাঁওতালেরা তৈরী করেন জেল পিঠে, মাংস পিঠে, খাপড়া পিঠে প্রভৃতি। চালের গুঁড়ো, ব্যাঙের ছাতা দিয়েও তৈরী হয় পিঠে। পুলি পিঠাকে অনেক পুরুষ জননাঙ্গ এবং চিতই পিঠেকে যোনিরূপে কল্পনা করেন। এই চিন্তায় বিশ্বাসী লোকেরা বলেন যে পাটিসাপ্টা পিঠেকে গর্ভবতী নারী বলতে বাধা কোথায়? কোথায় বাধা চুষি পিঠেকে সন্তানসন্ততির সঙ্গে তুলনা করতে? বাঙালীর সব পিঠে তৈরীর মধ্যেই দৃষ্ট হয় আদিমতা। তালের ফোঁপল বা আঁটির শাঁস বেটে পিঠে তৈরীর মধ্যেও আছে আদিমতা। এই ফোঁপল যেমন কাঁচা খাওয়া যায়, তেমনি

ভাজা ও ডালনা করেও খাওয়া যায়। জল-বিষুব সংক্রান্তি বা আশ্বিন সংক্রান্তি দিবসে মেদিনীপুরাদি স্থানে যে উৎসব প্রতিপালিত হয় সেখানে এক রকম পিঠে খাওয়ার রেওয়াজ আছে। চালের গুড়ো গরম জলে মেখে নারকেল, আদা, গুড় প্রভৃতি দিয়ে পিঠে পোড়ান বা তৈরি হয় এখানে এই সময়। হাওড়া প্রভৃতি স্থানে এ দিনে সাধ দেওয়া হয় ধানকে। মানকচু, ওল প্রভৃতি ঢেঁকিতে কুটে নিয়ে তার সঙ্গে ঘি, মধু প্রভৃতি মিশিয়ে বরি গাছের পাতায় সে সব বাধতে হয় পাটের দড়ি দিয়ে। তারপর তা নল গাছের ডগার সঙ্গে বেঁধে ধানক্ষেতে পুঁতে দিতে দিতে বলা হয়—'আশ্বিন গেল কার্তিক এল, ছোট বড় ধান সব সমান হল। নৈবেদ্যে আছে ঘি, সাধ খাবে লক্ষ্মীর ঝি। নৈবেদ্যে আছে মৌ, সাধ খাবে লক্ষ্মীর বৌ। নৈবেদ্যে আছে ঝোট-পাট, সব পোকা-মাকড়ের মাথা কাট' প্রভৃতি। হিন্দুদের সঙ্গে এ উৎসবে মুসলমানেরাও যোগদান করেন। অনেক জায়গায় এই দিনে নানা প্রকার শাক খাওয়ার নিয়ম। বাঙালীর শাকপ্রিয়তা সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এই শাকপ্রিয়তা থেকেই বিবাহাদি নিমন্ত্রণপত্রে বাঙালী অনুরোধ জানান 'মদীয় ভবনে শুভাগমন করতঃ শাকান্ন ভোজনে বাধিত করিবেন।' ডাক-সংক্রান্তিতে সাতপ্রকার এবং দীপান্বিতার দিন চৌদ্দপ্রকার শাক খাওয়ার রেওয়াজ আছে অনেক স্থানে। এই রেওয়াজ থেকেই বিবাহাদি ভোজনের সময় অনেকেই সর্বপ্রথম শাকভাজা খেতে দিয়ে থাকেন। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় বোন যখন ভাইকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান সেখানেও শাকভাজা চাই-ই। মহাভারতের বনপর্বে তাই বলা হয়েছে যে শাকরস, রক্ত, ছাই প্রভৃতির সহায়তায়ই মনুষ্য শরীর সৃষ্টি হয়েছে। মাসে মাসে শাকাহার করে সুব্রতা দেবী সহস্র বৎসর বেঁচেছিলেন শাকম্ভরী তীর্থে। এই তীর্থে শাকের দ্বারাই মহর্ষিদের আতিথেয়তা করা হত। কেউ ত্রিরাত্র শাকান্ন করে এ তীর্থে বাস করলে তিনি বারো বৎসর শাকভোজনের ফললাভ করতেন। নবান্ন উৎসবেও শাকভোজনের বিধান আছে। ইতিপূর্বে শাকভোজন সম্পর্কে যে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে শাকের পিঠের কথা বলা হয় নি। অনেকে শাক দিয়ে পিঠে তৈরী করে খান। পিঠে তৈরীর জন্য প্রথমে শাক জলে সিদ্ধ করে জল ফেলে দিতে হয়। তারপর সে শাক বেটে, নুন, লঙ্কা, ডাল ইত্যাদি মিশিয়ে চমৎকার একপ্রকার নোনতা পিঠে তৈরী করেন বাঙলার প্রাকৃতজন এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকেরা। টুসু উৎসবেও পিঠে খাওয়ার রেওয়াজ আছে। যেমন—'তোষলা লো রাই, তোমার দৌলতে মোরা ছ'বুড়ি পিঠে খাই।'

এই টুসু ঘরোয়া দেবতা। তাই টুসু পুতুল নিয়েও চলে সরিকী ঝগড়া। বলা হয়—'হামাদের টুসু হলুদ বাটে, যেমন মেচা মেচা লো, তোদের টুসু বসে আছে যেমন ঢুটু পেঁচা লো।' অথবা 'আমাদের টুসু মুড়ি ভাজে সাত কবাটের ভিতরে, তোদের টুসু জেংলি মাসী আচল পেতে লেয় মুড়ি, ছি ছি লাজ লাগে না। ছোটমুখে তোর বড় কথা সাজে না,' ভাদু উৎসবেও আছে নানাপ্রকার খাবারের বাহার। আছে সাজপোষাকের বাহার। ভাদুর সাজসজ্জার মারফৎ গ্রাম্য মানুষের শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—'ভাদু আমার চলেছেন লাচ্যে লাচ্যে, পায়ে ঝুমঝুম নেপুর বাজে। ভাদুর চোখে কাজল দিব ঘি দপ-দপ পঞ্চদীপ, ঘরের কোণে সপ্তদিন, জ্বালিয়ে সোনার কাজললতায় কাল কাজল ভরে লিব। কয়লা কালো কোকিল কালো তমাল কালো কানাই কালো, মেঘের কাজল সেটাও ভালো, সব কাজলটো মেগে এনে ভাদুর চোখে পরিয়ে দেব। হীরা হীরা মোতি পুঁতির গহনা কুথকে পাবে রে, খেলকদম্ব চাঁপার মালা ভাদুর গলায় দিব রে। তুলসীকাঠের কণ্ঠী দিব, গালার চুড়ি ঘুনসি দিব, ইলমিল ঝিলমিল শাড়ীর আচলে ভাদুর রূপের পিদিম জ্বালিব রে।' অন্যত্র—'ও সোহাগী ননদিনী লীলাম্বরী পরবি, খোঁপায় সাধের গোদা ফুলে পেরজাপতি ধরবি। হায় হায় হায় রে পরনে নাই তেনা, ভাসুরঠাকুর আঙ্গনেতে ছিঁড়া কাঁথাটা দেনা।' এই কাঁথা লোকজীবনের পরম আদরের সামগ্রী। কাঁথা শিল্পে বঙ্গনারীর শিল্প এবং রূপবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। জীবন ধারণের প্রয়োজনে বঙ্গরমণী কাঁথা তৈরী করেন।

নবান্নের দিনে নতুন হাঁড়িতে নতুন চাউলের ভাত রান্না করা হয়। অনেকে নবান্ন দিবসে নয় প্রকার তরকারী খান। শাকভাজা তো খানই। গ্রামবাসী সাধ্যমত এ দিবসে আত্মীয় স্বজনদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান। ভোজনরসিক বাঙালী যথাসাধ্য চেষ্টা করেন এ দিনের ভোজকে ভুরিভোজে পরিণত করতে। এই প্রসঙ্গে একটি ভোজনের বারোমাসীর উদ্ধৃতি প্রাসঙ্গিক। এই বারোমাসীটির সুরু মাঘ থেকে এবং শেষ পৌষে। বারোমাসীটি নিম্নরূপ—'মাঘেতে মকর পিঠা কটুতেলে সিম, ফাল্গুনে দ্বিগুন মিঠা কার্তিকেতে নিম। চৈতে শ্রীফল মিঠা খেয়েছিলেন রাম, বৈশাখেতে শশা মিঠা শওল মাছে আম। জ্যৈষ্ঠেতে পাকা আম, আষাঢ়ে কাঁঠাল, শ্রাবণে খইদই, ভাদ্রে পাকা তাল। আশ্বিনেতে নারিকেল কার্তিকেতে ওল, অগ্রানে নতুন অন্ন চিংড়িমাছের ঝোল। পৌষে মূলা-মুড়ি খেতে লাগে মিঠা, ঘন আউটা গরমদুধ বাসিপোড়া পিঠা।

বারো মাসে তেরো পর্ব আর বলব কি? পান্তাভাতে বেগুণ পোড়া গরম ভাতে ঘি'। সঙ্গে কাঁচালঙ্কা উপাদেয় খাদ্য অনেকের কাছেই। বাঙালী নানা শবজি ভাতেও খান। খান নানাবিধ ডালনা। তরকারীর মত করেই রান্না হয় ডালনা। বাঁশের তেউড়ের ডালনাও অনেকে খান। বাঁশের চারা বের হবার মুখে কোন্ গামলা বা সাজি চাপা দিয়ে রাখা হয়। কিছুদিন পরে সেটাকে কেটে নিয়ে প্রথম খণ্ড খণ্ড করে কুটে গরম জলে সিদ্ধ করা হয়। তারপর ওগুলো সরষের তেলে ভেজে ডালনা পাক করা হয়। তেউড়ের ডালনা খেতে নাকি সুস্বাদু। ব্যাঙের ছাতাও আরেকটি সুস্বাদু খাদ্য বহু গ্রামে। ব্যাঙের ছাতার ডালনা উপকারীও বটে। ব্যাঙের ছাতা আপনাআপনিই জন্মে। গেঁড়ি বা গুগলি পশ্চিম বাঙলার প্রাকৃতজনদের আহ্লাদের সামগ্রী। মাংসের মত করে রান্না করে গুগলি খাওয়া হয়।



ঋতু-প্রকৃতির দেওয়া অন্ন-ব্যঞ্জনাদিই বাঙালীকে দুধে ভাতে রেখেছিল একদা। কারণ তখন লোক সংখ্যা ছিল কম, জমি ইত্যাদির ছিল প্রাচুর্য, অভাববোধ প্রায় ছিলই না। বাঙালীর খাদ্য পানীয়ের অধিকাংশই তাই প্রকৃতি প্রদত্ত। দুধ, নারকেলের জল, আখের রস, খেজুরের রস, তালের রস, ছাড়া মদ্য জাতীয় নানাবিধ পানীয় প্রাচীন বাঙলায় সুপ্রচলিত ছিল।

পানীয় প্রস্তুতে আদিবাসী ও গ্রামীণ মানুষ বিশেষ দক্ষ ও ওস্তাদ। হাড়িয়া, মহুয়া, তাড়ি, পচাই প্রভৃতি প্রাকৃত ও লোক সমাজের আদর্শ পানীয়। খেজুর, তাল, মহুয়া ইত্যাদি গাছকে কেন্দ্র করে বাঙলার গ্রাম কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে। রস যাঁরা সংগ্রহ করেন তাঁরা অর্থাৎ শিউলিরা বুঝতে পারেন গাছের কথা, গাছের ভাষা। কোন গাছের চেহারা খারাপ হলে তারজন্যও আক্ষেপের শেষ থাকে না তাঁদের। খেজুরগাছের রস ভাগ বাঁটোয়ারার সময় গাছের মালিক খুবই তৎপর, কিন্তু এ গাছের যত্নআত্তি করতে মোটেই রাজী নন তাঁরা। অনেক শিউলিই তাই বলেন—'বাবুরা গাছ লাগায় না, গাছের যত্ন নেয় না, শিয়াল কুকুরের থেকে এ গাছ জন্মে, কিন্তু যেমনি রসের সময়। অমনি হাফাহাফি। মাঠের সিকিটাক লজড় ইদিকপানে দাও দিকি। হাঁ, দাও। ঝনঝন টঙ্কা লও। রস খাও, শ্বশুরবাড়ী যাও। তা না শুধু হাফ মাল দাও। ধুত্তোর যত্ম সব বাজে কাজ। একাজ আবার কেউ করে নাকি! ছ্যাচড়া কাজ।' তবুও তাঁরা এ কাজ করে যান। করে যান বলেই প্রাচীনকাল থেকে এখনও তাড়ি, পচাই, মহুয়ার রস প্রাকৃতজনকে আনন্দ দেয়। শহর ও গ্রামবাসীকে গুড়ের যোগান দেন। নানা কাজকর্মে স্পৃহা জাগান। গুড় থেকে তৈরি হয় গৌড়ীয় মদ। ভাত, গম, আখ, তালরস খেজুররস গেঁজিয়ে যে নানাপ্রকার হেশীয় মদ তেরী হয় বাঙলার গ্রামেতা একদিকে পানীয় অপরদিকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

সুপ্রাচীনকাল থেকেই বাঙালীর খাদ্য ও পানীয় অবাঙালীদের রুচি ও রসনায় অশ্রদ্ধেয় ছিল, আছে। কিন্তু তাতে বাঙালী পরোয়া করে নি। রসনার পরিতৃপ্তির জন্য বাঙালী শিউলি রস কাটেন, গুড় জ্বাল দেন। খেজুরী গুড়, নলেন গুড়, পাটালী গুড়, তালের গুড, আখের গুড় তৈরী করেন। নদীয়ার শিবু শেখ পঁয়শট্টী বছর বয়স পার করে এখনও বছরের পাঁচ মাস গাছে গাছে ঘুরে বেড়ান খেজুর রস সংগ্রহ করতে। খেজুরের গুড় তৈরী করতে। তাড়ি বানাতে। তিনি বলেন—'যদ্দিন ঘরে থাকি তদ্দিন গাছের ডাক শুনে শুনে ভয়ে কালাচাঁদ সাজি, আর এই যেদি এলুম তো চাঁদি লাগল। ঘরে শুয়ে বসে থাকতে দেয় না বামুনবাড়ী, বসাকবাড়ী, মাঝেরবাড়ীর গাছগুলো। নাইন দিয়ে দুলে দুলে ডাকবে, বলবে ও শিবু তোর ভয় কিসের, আমি জিন লয়, আয়, শিবু আয়।' শিবু শেখের খুব উৎসাহ তাঁর রসের কারবার দেখাতে। গুড় তৈরীর বৃত্তান্ত শোনাতে। বলবেন, 'এই হচ্ছে আমার নতুন পালার নলি রস। হাঁ, এর গুড়ে একটু নোনা ছাড়বে বটে, তবে খুশবু দেখবেন স্যার,

দেখবেন সেই মাজদে পর্যন্ত। এই গুড় খেয়েই কলকাতার বাবুরা বলে, নদের রাধাফুট, কেষ্টফুট, শিবু শিউলি ভেরী গুড। আসলে কলকাতার বাবুরা তো এক লম্বর গুড় পায় না বাবু। এখন বসে দেখুন ক্যামনে রাধেফুট কেষ্টফুট তৈরী হয়, হাঁ দেখুন। ওরং মেরে মেরে তাঁত, সরষে গড়ফুট পার করে দেবো। পদ্ম-কাটা বন্ধ হলেই শোনা যাবে কেষ্টর বাঁশী। সবাই সে বাঁশীর সুর শুনতে পায় না বাবু, শিবু শোনে কেষ্টর বাঁশী। কলকাতার বাবুরা নাগরি ভরা গ্যাবগেবে ফুলো খায় তাই খেয়েই বলে শিবু শিউলি ভেরী গুড'। শিবু শিউলির কেষ্ট-ফুটের মিষ্টান্ন যে খেয়েছে সে ভুলতে পারবে না। মিষ্টান্ন ভোজন বা আহারান্তে পান বা মুখশুদ্ধি বাঙালী সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ। নানা ভাবে পান সাজাবার বর্ণনা আছে বাঙলার লোকবৃত্তে। পানে প্রয়োজন হয় নানা মশলা। দোক্তা, তামাকপাতা, জর্দা প্রভৃতির উপরও লোককবির বর্ণনা চমৎকার। পানের সঙ্গে আছে তামাকু। বর্তমানে তামাকুর প্রচলন অনেক জায়গা থেকে উঠে গেছে বিড়ি সিগারেট চুরুট ইত্যাদির প্রচলনে। কিন্তু পান সেই প্রাচীন আমল থেকে আজও জনপ্রিয়। এ পানকে নিয়ে নানাবিধ লোকগীতি রচিত হয়েছে। এরূপ একটি গানের উদাহরণ— 'রুইলু রুইলুরে পান, পারে আর পর্বতে পান, সেই না পানে না লয় সমান। পাড়ো পাড়ো রে পান, সোনার কুটায় পান, সেই না পানে না লয় সমান। থুবাও থুবাও রে পান সোনার খারায়ে পান, সেই না পানে না লয় সমান। ধলাও ধলাও রে পান সোনার খারায়ে পান, সেই না পানে না লয় সমান। চিরো চিরো রে পান ইরার কাটাইলে পান, সেই না পানে না লয় সমান। সাজাও সাজাও রোন সোনার বাটায়ে পান, সেই না পানে না লয় সমান। খিলাও খিলাও রে প্যান পীর-মুরশিদের আগে পান, সেই না পানে না লয় সমান।' পান চাষ করেন বারুজীবী সম্প্রদায়ের লোকেরা।

বাঙালী তার নানা খাদ্যের ব্যাপারে বনের উপর নির্ভরশীল। বাঙলার বন বনজসম্পদ প্রদান ছাড়াও আমাদের অশেষ উপকার সাধন করে। উনিশ-শতকের শেষেও দার্জিলিঙ, তরাই ও ডুয়ার্সে, কোচবিহারের দিনহাটা ও সদর মহকুমায়, পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জে, মালদহের ভালুয়া রাতুয়া ও মানিকচকে, বীরভূমের নলহাটী রাজনগর মহম্মদবাজার ও দুবরাজপুর থানায়, বর্ধমানের আসানসোল মহকুমায়, বাঁকুড়ার পশ্চিমার্ধে, মেদিনীপুরের কাঁসাই নদীর পশ্চিমে ও চব্বিশ পরগণার সুন্দরবনে নিবিড় অরণ্য ছিল। তাছাড়া নদীসঙ্গমের নিকটস্থ বিল ও জলাভূমি ঘিরে বেশ ঘন বন ছিল। চাষের জমি

বৃদ্ধি কল্পে বিগত শতাধিক বৎসর ধরে বাঙলার বন ধ্বংস হয়ে চলেছে। লোকবৃদ্ধি, সভ্যতা প্রসার এবং বঙ্গবিভাগহেতু বনাঞ্চল ক্রমশ সংকুচিত হয়ে চলেছে। পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গের সহস্রাধিক বনাঞ্চল ও অরণ্যযুক্ত অনাবাদি জমিকে আবাদযোগ্য করে চলেছে। তরাই ও ডুয়ার্সের বন কেটে চা বাগানের বৃদ্ধিতে বন্যার সংখ্যা ও বেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃক্ষ বিনাশের দরুণ বৃষ্টিপাতের চিরন্তন ধারার পরিবর্তন ঘটেছে। কৃষিক্ষেত্রের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে গোচারণের ভূমি লোপ পেয়েছে, লোপ পেয়েছে পোড়ো মাঠের, খেলার মাঠের, ধূ-ধূ মাঠের। নির্বিচারে বৃক্ষ বিনাশ ও অনাবাদি জমি দখল লোক সমাজের পক্ষে সর্বদা হিতকারী হয় নি।

কৃষিকার্যে প্রয়োজনীয় এবং গৃহনির্মাণ ও আসবাবের উপযোগী নানাবিধ কাঠ বাঙলায় উৎপন্ন হয়। বাবুল, হলদু, শিরিশ, কদম, চাপলাস, শিমুল, দেবদারু, শিশু, গর্জন, গাব, জারুল, গামারি এবং নানাবিধ জ্বালানি ও প্রয়োজনীয় কাঠও এখানে উৎপন্ন হয়। নানাজাতীয় বেত, খাগ, নল, শীতল-পাটির গাছও এখানে পাওয়া যায়। পাওয়া যায় নানাবিধ ওষধিবৃক্ষ নানাস্থানে। জলপাইগুড়ির বনে পাওয়া যায় চিরতা, মুর্শিদাবাদে শতমূলী ও অনন্তমূল, দার্জিলিঙে সিঙ্কোনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ওষধিগাছ। এখানকার সজিত ও হলদুগাছ থেকে লাল রঙ উৎপন্ন হয়। গরান গাছের বাকল থেকেও রঙ পাওয়া যায়। চামড়া পাকা করার জন্য গরান গাছের বাকল কাজে লাগে। মেদিনীপুরেও নানা রঙের গাছ পাওয়া যায়। প্রাকৃতজন এইসব গাছের রঙ সংগ্রহ করে চিত্র আঁকে। পটশিল্পে পটুয়াগণ এই দেশীয় রঙই ব্যবহার করেন।

পটচিত্র বাঙলার লোকশিল্পের অন্যতম একটি বিশেষ আকর্ষণ। আকৃতি ও প্রকৃতি অনুসারে পটচিত্রকে নানাভাবে ভাগ করে দেখানো যেতে পারে। আকৃতিতে চৌকশ, লাটাই ; আড়ে লাটাই, প্রকৃতি অনুসারে ধর্মীয় অর্থাৎ হিন্দুর দেবদেবী, লৌকিক দেবদেবী, মুসলমানের পীর, গাজী, খৃষ্টপট, আদিবাসী ও সাঁওতাল পট এবং ধর্মনিরপেক্ষ এবং আখ্যানমূলক পট। অতি সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়েও কিছু কিছু পট তৈরী হচ্ছে এখন। যেমন পরিবার পরিকল্পনা পট, সর্বাধুনিক জয় বাঙলা পট। গৌতম বুদ্ধেরও বহু আগে থেকে এই পট বাঙলাদেশে চলে আসছে। গৌতম বুদ্ধ চরণচিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। বুদ্ধঘোষ এই চিত্রকে সে-যুগের সমস্ত চিত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে আখ্যায়িত করেছেন। পট কাপড়ে, কাগজে ও মাটির সরায় চিত্রিত হয়। খনিজ পদার্থ এবং বনরাজি থেকে নিজেরা নিজেদের মত করে রঙ

তৈরী করেন পটুয়া। তাঁরা ছবির সাদা অংশের সাদার জন্য ব্যবহার করেন চক, খড়িমাটি অথবা শঙ্খের গুঁড়ো। লাল রঙের জন্য ব্যবহার করেন গেরু মাটি অথবা লাল শিকড় ও লাল ফুলের রস। নীলরঙের জন্য ব্যবহার করেন নীল গাছের কষ, হলুদ রঙের জন্য হলুদ গাছের ছালের রস অথবা এলা মাটির সঙ্গে দেশজ হলুদের •মিশ্রন করে হলুদ রঙ উৎপাদন করেন। কালো রঙের জন্য সাধারণত লক্ষের কালি ব্যবহৃত হয়। আলতা, বেলের আঠা, শিমূল গাছের ছাল, ছাগলের দুধ, ধুনো, তিল, ত্রিফলা, হরিতাল, চাচ গলা, প্রভৃতি উপকরণের সঙ্গে তেঁতুল বিচির কষ মেশান হয়। অনেক সময় গাবের কষ বা বার্লিও লাগান হয়। এই কষ বা বার্লি বার্নিশের কাজ করে। অনেক সময় সোনালী বর্ণের বা রূপালী বর্ণের পাতার রস অথবা ধূলো ইত্যাদি মেশানো হয় একটি রঙের সঙ্গে সেই রঙের বাহার সৃষ্টি করতে। পশুর লোম দিয়ে হাতে তৈরী তুলি তাঁরা ব্যবহার করেন।

নানাবিধ পট আছে বাঙলায় যেমন মনসামঙ্গল, সিংহলপতির দেবীদর্শন, ধনপতির কারাবাস, পিতার অনুসন্ধানে পুত্রের আগমন, শিবকাহিনী, চৈতন্য-মঙ্গল, নরমেধযজ্ঞ, স্বর্গলাভ, দাতাকর্ণ, গোবিন্দমঙ্গল, কমলেকামিনী, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা, জটায়ুবধ, সাঁওতালপট, নিমাই সন্ন্যাস, পার্বতীর শাঁখাপরা, মহাদেবের চাষবাস, দশাবতার, পাপের পরিণতি মৃত্যু, গোমঙ্গল, গাজীপট। পটুয়ারা এই সব পট আঁকেন ও আঁকা দেখিয়ে গান করেন। নীতি-শিক্ষা পটের অন্যতম গুণ। যেমন—'রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজায় কষ্ট পায়, গিন্নীর পাপে গৃহস্থ নষ্ট ঘরের লক্ষ্মী উড়ে যায়।' লক্ষ্মী উড়ে গেলে আসে অশান্তি, আসে বিরোধ। অশান্তি ও বিরোধ এড়াবার জন্য সকলেই তাই চেষ্টা করে সৎপথে থাকতে, পাপের হাত থেকে দূরে থাকতে। পাপ অর্থাৎ 'গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা সুরাপান যে জন করে, চার পাপের পাপী তারা তাদের পাপের পরিত্রাণ নাই।' সাঁওতাল সমাজের মধ্যে এক শ্রেণীর পেশাদার পটুয়া আছেন যাঁরা চক্ষুদান পটে সিদ্ধহস্ত। এই পটুয়ারা কোন পরিবারে কোন ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদ জানতে পারলেই সেখানে চলে যান। সদ্যমৃত লোকটির একটি ছবি আঁকেন, চক্ষুদান করেন না। তিনি চক্ষুছাড়া পট নিয়ে তখন শবদেহের কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন—পরলোকে মৃতব্যক্তি চক্ষুর অভাবে কষ্ট পাচ্ছে, পরিবারের লোকের উপযুক্ত পারিশ্রমিক না দিলে তিনি চক্ষুও আঁকতে রাজী হন না। তারপর যখন উপযুক্ত দক্ষিণা পান তখন তিনি পটে চক্ষুদান করেন এবং সেই পট মৃতব্যক্তির পরিবারে দান করেন।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে যে, রক্ষণশীলতা সমগ্র বাঙলার চারিত্র। বাঙলার আদিম অধিবাসী প্রত্নতম প্রাচীনকে জীইয়ে রাখতে সচেষ্ট। সুতরাং যখন নগর ও গ্রামের মৃত্তিকাকে ইতিহাস প্রত্যেক মুহূর্তে পদপিষ্ট করে এগিয়ে গেছে তখন সাধারণ মানুষ ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। এই ক্ষোভের একটি প্রমাণ আছে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর আত্মপরিচয়ে। এই ক্ষোভেরই প্রকাশ গাঁয়ের কোন বৃদ্ধ পোটোর কাছে 'টকি' বা সিনেমার কথা বলে তাকে রাগিয়ে দেওয়ার মধ্যে। সিনেমার কথা শুনলেই তিনি বলে উঠবেন—'টকির কথা আর বলবেন না বাবু, 'টকি'—এই 'টকির' জন্য আজ আমাদের এই হতদশা। এখন আর আমাদের কোন দাম নেই, কেউ আর আমাদের গান শুনতে চায় না।' এই রক্ষণশীলতার জন্যই গ্রামের জনৈক চাষীকে দেখলাম গালি দিচ্ছে বাসকে। দূরগ্রামে এখন বাস চলাচল করে। গাঁয়ের মধ্য দিয়ে যখন বাস চলে যাচ্ছে তখন বাসের রাস্তার উপর বসে জনা দু'তিনেক কৃষক মজলিশ করে তামুক টানছেন, দীর্ঘ সময় হল চালনার পর নিজেরা বিশ্রাম নিচ্ছেন এবং বলদ দুটোকে বিশ্রাম নিতে দিচ্ছেন ক্ষণিকের জন্য, এমন সময় বাসের ঘর্ঘর, পত্‌পত্‌ শব্দ তাঁদের ভাল লাগতে পারে না। তাই তাঁরা নির্বিচারে বাসটিকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে গেলেন। গতির বেগে উদ্বিগ্ন রক্ষণশীল সমাজ তবুও গতিকে মানিয়ে নেন, কিন্তু অশান্তিতে ভোগেন। পোটোরা চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে গান বাঁধেন। সেই চিত্র দেখিয়েও গান শুনিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন বা করতেন একদা। এই পোটোদের গানের দু' একটি নমুনা দেওয়া যেতে পারে। প্রথম গানটি বেহুলা পালার। গানের সুরু—'মনসা জগদ্ গৌরী জয় বিষহরি, অষ্টমনাগের মাতা পরম সুন্দরী। নাগের হ'ল খাট পালঙ্ক নাগের সিংহাসন, মঙ্গলা বড়ার পিষ্টে দেবীর আসন। তরজে গরজে চেনে মোচড়ায় দাড়ী, কান্ধেতে তুলিয়া নাচে হেঁতালের বাড়ি। যদি বেটি চ্যাংমুড়ির নাগাল আমি পাই, মাটির হেঁতালের বাড়ি কম্বল বুড়াই। সেই গান বিষহরি আপনি শুনিল, ক্রোধ করে চান্দবেনের ছয় বেটা খেল।... মা বাপের ঘর দাদা আর নাইক সাজে, কুঁদিলা ভাজের সঙ্গে সদাই দ্বন্দ্ব বাজে। অল্প বয়সে দাদা হলাম কড়ে রাঁড়ি, কতনা ফেলাব দাদা নিরামিষ্যের হাঁড়ি। ভায়ের পরিবত দিয়া ভাসিয়ে চলিল, গদাঘাটে মড়া নিয়া উপনীত হইল।... গদাঘাট বৈদ্যঘাট আড়াইয়ে গেল, চিংড়ি দ' বুয়াল দ' আড়াইয়ে গেল। শৃগালে কুকুরে ন' আড়াইয়ে গেল, হাঙর কুমীর দ' আড়াইয়ে গেল। চাঁপাতলার ঘাট গিয়ে ভার গেঁড়েছিল, তমলুকের ঘাটে গিয়া উপনীত হল।'

এই ভাবে গানের সঙ্গে সঙ্গে চলে চিত্রের বর্ণনা, চিত্রের প্রকাশভঙ্গি। গোবিন্দমঙ্গল গীতেও আছে একই ভঙ্গিমা। যেমন—'কৃষ্ণ কৃষ্ণ যেবা নর অনুক্ষণ বলে, বনমালা হয়ে কৃষ্ণ তার কণ্ঠে দোলে।...বৃষেতে মহাদেব এল পঞ্চমুখ ধরি, পঞ্চ দিকে পঞ্চানন জপেন হরি হরি। চন্দ্র সূর্য উদয় রাজা কংসের মন্দিরে, জন্ম নিতে গেল কৃষ্ণ দৈবকীর উদরে।...কোথায় ছিল কংসের চর শুনিবারে পেল, কেড়ে লয়ে শিলার পাটে আছাড় মারিল। হাত পিছলা নবীদুর্গা স্বর্গে উঠে গেল। স্বর্গের হিমলে কন্যে কহিতে লাগিল। যারে যারে কংসের চর তুই বধিলি মোরে, তোরে যে বধিবে সেই নন্দালয়ে বাড়ে। আকাশবাণী শুনতে পেয়ে পুতনা আইল, রাজার ভগ্নী বলে যশোদা খাট ফেলে দিল। অবুঝ গোয়ালার মেয়ে কিছু না বুঝিল, আপনার কোলের হরি রাক্ষসীরে দিল। এক চমক মারে কৃষ্ণ করে দুগ্ধ পান, দোসরা চমকে ছিঁড়ে পুতনার প্রাণ।...অমারাত্র পোহাইল প্রশস্ত বিহান, যতগুলি সখি যায় যমুনা সিনান। সকল সখীদের বস্ত্র গোবিন্দ হরিয়া, আড় মুরলী বাজায় কৃষ্ণ কদমগাছে লৈয়া। ওগো সখি বিধুমুখী কহি যে তোমারে, দুই হাত তুলিয়া বস্ত্র মাগো না আমারে। সখীদের মন্দাবস্থা কৃষ্ণ যে দেখিয়া, হাতে হাতে বস্ত্রগুলি দিল ফেলাইয়া। নৌকা সৃজন করিয়া রাধিকা কৈল পার। তুমিত সুন্দর কৃষ্ণ তোমার ভাঙা নাও। কোথায় রাখবো দধির পসরা কোথায় রাখবো পাও। ভাঙা নৌকা রাধে হাতে সারথির কাঁড়ি, হস্তি ঘোড়া পার করি তোমরা কত ভারী। সব সখিকে পার করতে নুব আনা আনা, রাধিকাকে পার করতে নুব কানের সোনা। সব সখিকে পার করতে নুব বুড়ি বুড়ি, রাধিকাকে পার করতে নুব পাটের শাড়ী।...মথুরায় রাজা হয়ে বসিলেন শ্রীহরি, পাটরাণী সাজিলেন তার শ্রীকুব্জা সুন্দরী। এই প্রভু গোবিন্দমঙ্গল হইল সায়। ধনে পুত্রে লক্ষ্মী হয় যে জন গাওয়ায়।' পোটোদের এই গান সারা বাঙলায় শ্রুত হলেও তাঁদের পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানেই বেশী সংখ্যায় দেখা যায়। বর্তমানে তাঁদের সংখ্যা ক্রমশই কমতির দিকে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণে অনেক পোটোকেই জাতিগত বৃত্তি পরিত্যাগ করতে হয়েছে। ওঁদের কেউ কৃষিজীবী, কেউ চাকুরিজীবী, কেউ বংশগত পেশাকে ধিকি ধিকি করে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। 'টকি' বা সিনেমা নাকি পোটোদের জাতিগত পেশা থেকে তাঁদের বঞ্চিত করেছে, তাই 'টকি'র উপর বয়স্ক বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অনেকেরই রাগ। 'টকি'-র আমদানীতে এবং প্রসারে এখন নাকি বড় কেউ আর পটুয়া সঙ্গীতে উৎসাহ

দেখাচ্ছেন না। যদিও যে ভক্তিরসাত্মক কাব্যকাহিনী নিয়ে পটুয়া রঙ ও রেখায় শিল্প সৃষ্টি করেন শিল্পবস্তু হিসাবে তা অতুলনীয়। অতুলনীয় বলেই কিছু কিছু ব্যক্তি পোটোদের সম্পর্কে উৎসাহ দেখাতে সুরু করেছেন।

অর্থাৎ দেশের দেশজ এই শিল্পের প্রতি শহরের বাবুসমাজ দীর্ঘদিন বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ এখন অনেকের দৃষ্টি এদিকে পড়েছে। তথাপি এখনও পটুয়ারা অচ্ছ্যুৎ। এখনও তাঁরা বিচিত্র জীবন যাপনে অভ্যস্ত। বর্ণ-হিন্দুদের ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা থেকে আত্মরক্ষা করতে এই সমাজের একটা বৃহৎ অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁরা মসজিদে যান, নামাজ পড়েন। হিন্দুর দেবদেবী চিত্রিত করেন ও হিন্দু ধর্মকর্ম জীবনের গান গান। লোকজীবনের সুখদুঃখের কথাও তাঁরা প্রকাশ করেন কথায় ও রেখায়। বাঙলার বিভিন্ন জেলায় ওঁরা বাস করেন। এঁদের অনেকে এখন চাষ-বাস জানেন, সুতো কাটতে জানেন, জানেন কাপড় বুনতেও। চাষবাসের ফাঁকে ফাঁকে পট আঁকেন, হাটে বাজারে মেলায় সে পট বিক্রী করেন। ব্রিটিশ শাসনের সুরুতে এঁদের অনেকেই ভূমিহীন ক্ষেত মজুরে পরিণত হন। গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ওঁদের অনেকে গ্রাম ছেড়ে শহরে আসেন। একদল কলকাতার কালিঘাটে ও অন্যান্য তীর্থস্থানে আশ্রয় নেন। সমকালীন সমাজ জীবনের বাহুল্যবর্জিত সহজ সরল অঙ্কনরীতির মাধ্যমে নিজেদের সুপরিচিত করেন। এবং লোকজীবন ও গণচিত্তকে অভিব্যক্ত করেন।

আবহমানকাল ধরে পটচিত্রণ আমাদের দেশে চলে আসছে। ধাতু ঢালাই বা পাষাণে ক্ষোদিত চিত্রকলার তুলনায় রঙ তুলির শিল্পসম্ভারের আয়ু যেহেতু কম এবং রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণে বিনাশ হেতু প্রাচীন চিত্রিত পট দেখার আশা আমাদের ত্যাগ করতে হয়েছে। অবশ্য দশম শতাব্দীর পরে অর্থাৎ পাল এবং পালোত্তর যুগের চিত্রনমুনা দেশে ও বিদেশে কিছু কিছু সংরক্ষণ সম্ভব হয়েছে। পাহাড়ের গুহায় আঁকা মহাদেব, সিঙ্গনপুরের চিত্রকলা, উজ্জয়িনীর কাছে নতুন পাওয়া কিছু কিছু গুহাচিত্র, অজন্তা, এলোরা, বাগ, তাঞ্জোর, তিরুকুলম ও তিরুমালাইয়ের মত কিছু কিছু নিদর্শন আজও অতর্কিতে আমাদের নজরে আসে। বলাই বাহুল্য, বয়ে নেওয়ার সুবিধা আছে এমন মাধ্যমে চিত্রান্বিত কিছুর নমুনা খুঁজতে গেলে তা পাল যুগ থেকে সুরু করাই নিরাপদ।

পাল-পূর্ব যুগের চিত্র সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্টত দুটি জিনিসের ওপর নির্ভরশীল। প্রথমত, পুরাতাত্ত্বিক খনন এবং দ্বিতীয়ত, লিখিত সাহিত্য। খৃঃ পূঃ পালি সাহিত্য সংযুক্ত নিকায় থেকে সুরু করে হরিবংশ,

মালবিকাগ্নিমিত্র, অভিজ্ঞানশকুন্তলম, মুদ্রারাক্ষস, হর্ষচরিত, উত্তররামচরিত প্রভৃতি প্রায় অনেকগুলি প্রাচীন সাহিত্য নমুনায় চিত্রায়িত পটের উল্লেখ বর্তমান। এ থেকে নিঃসন্দেহে শিল্পপ্রকাশ হিসাবে পটের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। ওদিকে প্রাক-বৈদিক যুগের শীলমোহর ও অন্যান্য পুরাসামগ্রীতেও পটচিত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার দৃঢ়ভিত্তিক কারণ রয়েছে।

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত কয়েকটি বৌদ্ধগ্রন্থে চিত্রপ্রাচুর্য উল্লেখযোগ্য। বস্তুত প্রাচীন বাঙলা চিত্রের প্রামাণিক নমুনাও ঐগুলি। রামপালদেবের রাজত্বের ৩৯শ বছরে ও হরিবর্মার ১৯শ বছরে লেখা দুটি অষ্টসাহস্রিকা এবং হরিবর্মার ৮ম বছরে লেখা একটি পঞ্চবিংশতি সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথি—এই হল আমাদের বাঙলা ছবির ধারাবাহিকতা আলোচনার প্রাথমিক অবলম্বন।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে গুজরাটেও মধ্যযুগে পটচিত্রের আবির্ভাব ঘটেছিল। সেখানেও বাঙলার পটুয়ার মতো আসর জাঁকিয়েছিলেন চিত্রকথীর দল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজ-অমাত্য কুমারপাল বহু জৈন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি চিত্রিত করাবার বন্দোবস্ত করেন। মহাবীর-মাতার স্বপ্ন থেকে সুরু করে তীর্থঙ্করদের ছবি আঁকানো, কল্পসূত্রের আংশিক চিত্রায়ণ কুমারপাল করিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে 'চোরপঞ্চাশিকা লোরচন্দ্রাণী' প্রভৃতি ভ্রাম্যমান গল্পাংশ গুজরাটের পটচিত্রের অবলম্বন হয়েছে। গুজরাটী পটকে নিন্দা করে শিল্পশাস্ত্রীরা যে ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন, মজার ব্যাপার, আজকের চোখে তা আর মোটেও নিন্দনীয় নয়, পরন্তু গুণ বিশেষ। দ্রুত অঙ্কন ও ডাইমেনশানাল প্রভাব আনা বর্তমান যুগে স্বীকৃত দক্ষতা—আর এ দুটি ব্যাপারেই গুজরাটের পটকে আগে নিন্দিত হতে হয়েছে। কালীঘাটের পটেই এই দ্রুতঅঙ্কন এক বিশেষ শৈলী বলে পরিগণিত হয়েছে। পোষাক ও আঞ্চলিক অলঙ্কারের ক্ষেত্রেও গুজরাটের পট বিশেষ কৃতিত্ব দাবী করতে পারে।

পালযুগের বা পরবর্তী সময়ের শিল্পীদের আলাদা করে পরিচয় পাওয়া আমাদের হাজারো ইচ্ছা সত্ত্বেও সম্ভব নয়। তবু যে কয়টি নাম পরোক্ষভাবে আমাদের হাতে আসে তাতে জানা যায় বাঙলায় তখনকার দিনে বিজয় সেনের এক প্রশস্তির শিল্পী ছিলেন রাণক শূলপাণি। এ ছাড়া শুভদাসের ছেলে মন্মদাস, তার ছেলে বিমলদাস, বিষ্ণুভদ্র, মহীধর এবং তার ছেলে শশী,

কর্ণভদ্র ও তথাগতসার শিল্পী হিসাবে তৎকালে বন্দিত হয়েছিলেন।

গুজরাটের সমসাময়িক কালে রাজপুতানায় পটচিত্রের ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল। পরবর্তীকালে রাজপুত চিত্র মোগল চিত্রকলার দরবারী দক্ষতায় মনোনিবেশ করে পটচিত্রের ঐতিহ্য অনেকখানি হারিয়ে ফেলে।

তুর্কী আক্রমণের আগে ও পরে ভারতের কাছাকাছি অনেকগুলি দেশে বিভিন্ন পথ ধরে আমাদের চিত্রকলা চলে গেছে। আজও সেই সব দেশের চিত্রের মাধ্যমে মধ্যযুগের সেই প্রলয়ঙ্কর বিপর্যয় ও চিত্রশৈলীর স্থানান্তরের সম্পর্কে আমরা কিঞ্চিৎ অবহিত হই।

এতক্ষণ আমরা 'পট' বলে যে বস্তুকে অভিহিত করেছি তার প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা কিছুটা স্বচ্ছ করা যেতে পারে। চিত্র পরিকল্পনার দিক দিয়ে বাঙলা-দেশে অঙ্কিতচিত্র ও মণ্ডিত এবং উৎকীর্ণমূর্তির মধ্যে কোন ভেদরেখা টানা হয়নি। পোড়ামাটির আলেখ্যমণ্ডন ও তক্ষণে যে রীতি, অঙ্কন ও দেব-অধিষ্ঠান এবং নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীতে সেই একই রীতি ও শৈলী অবলম্বিত। যদিও পণ্ডিতবর্গ 'পট্ট' বা পট বলতে কাপড়ে আঁকা এবং পরবর্তীকালে কাগজে আঁকা ছবিকে বুঝেছেন, তবু এ সত্য কোন গরিষ্ঠ-দাপটে অস্বীকার করা যাবে না যে আমাদের দেশে চিরকাল আলেখ্যমাত্র পট নামে আখ্যাত। জৈনদের ধাতুনির্মিত উৎসর্গপট 'আয়েগা পট্ট' নামে অভিহিত। পুতুলনাচের চামড়ায় আঁকা সছিদ্র বস্তুটির নাম চর্মপট্ট, উত্তরপ্রদেশে চিত্রিত জড়ানো ঠিকুজীকে রাশিপট্ট বলা হয়। পাষাণফলকে ক্ষোদিত বিষ্ণু অবতার এবং তার উল্টো-দিকের দশাবতারের আলেখ্যকে বিষ্ণুপট্ট বলা হয়ে থাকে। পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলককে মৃণ্ময়পট বলা হয়েছে। 'পাট' কথাটিও বৈষ্ণবদের কাছে ও পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে কোন নতুন শব্দ নয়। নীলের পাট গোঁসাঞী হচ্ছেন শিবের প্রতীক।

পাঠান সুলতানেরা ছবি নিয়ে তেমন মাতামাতি করেন নি। চিত্রপ্রিয় সুলতানেরা পারস্য থেকে চিত্র আমদানী করে নিজেদের সখ মিটিয়েছেন, কিন্তু দেশীয় পটশিল্পকে উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নি। ফলে পটুয়ারা ইচ্ছে থাকলেও দরবারের ধারেপাশে আসতে পারেন নি।

মুঘল আমলের সুরু থেকেই আমাদের যাবতীয় চিত্রশিল্প আন্দোলিত হয়ে ওঠে। বাদশাহরা প্রথমদিকে আমদানী ছবির প্রতি টান রেখেছিলেন। বাবর করলেন সমরখন্দ থেকে ছবি আমদানী, আর তাঁরই ছেলে হুমায়ুন দুই পারসিক কলাকোবিদকে সোজা দিল্লীতে এনে বসালেন। ষোড়শ শতক

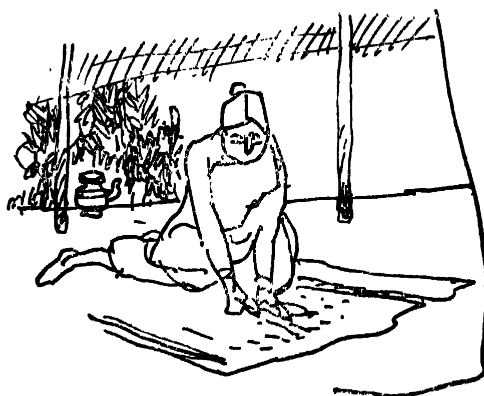
থেকেই মুঘল কলম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে দেখা দিল। প্রসঙ্গত, ঐ বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ মিশ্রণজাত। আমাদের চিরাচরিত চিত্রবিষয়ের সঙ্গে মুঘল কলমের তেমন সদ্ভাব দেখা গেল না। ব্যক্তি ও ঘটনা মুঘল চিত্রকলায় প্রাধান্য লাভ করায় দেশীয় শিল্পীদের পুনর্বার একটি দ্বন্দ্বে পড়তে হয়েছিল। স্বভাবতঃই এই পরিস্থিতিতে শিল্পীর শিল্পাচরণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে দাঁড়ালো। মুঘল কলম অনুসারীরা তাঁদের সৃষ্টিতে নিজ নাম সই করে দিতে লাগলেন। সুর ও কাব্যগুণ যা এই কলমে প্রথমদিকে সোচ্চার ছিল, আকবরের পরে তা অন্তর্হিত হল। কিন্তু (ক) কোমলকান্ত চরিত্র, (খ) অনন্য পরিবেশ, (গ) ধৈর্য-ধারী এবং স্বল্পভাষী বহিঃরেখা, (ঘ) আলোছায়া বা শেডপ্রয়োগ এবং সর্বোপরি কালানুপাতে, (ঙ) আধুনিক চরিত্রের হওয়ায়, মুঘল কলম যথার্থ শিল্প-রসিকদের মুগ্ধ এবং মোহাবিষ্ট করেছিল।

ভারতের চিরন্তন ধারার সঙ্গে মুঘল আমলেও এক ধরনের ম্যুরাল চালু হয়েছিল। আওরঙ্গজেবের মতো কেউ কেউ শিল্পীকে বাধ্য করেছেন ফুল-লতা-পাতার অঙ্গবল্লী এবং জ্যামিতিক অলঙ্করণ সৃষ্টিতে। মানুষ ও প্রাণী-জগতের চিত্রায়ণে নিষেধাজ্ঞা এইভাবে অনেকগুলি মধ্যযুগীয় মটিফের জন্ম দিয়েছিল। বর্ণবৈচিত্র্যও এতে কম আসে নি।

এদিকে রাজপুত শিল্প রাজস্থানী ও পাহাড়ী এই দুই মূলধারায় অগ্রসর হচ্ছিল। এইবারে ভেঙ্গে ভেঙ্গে অনেকগুলি নতুন কলম দেখা দিল। অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় দশকে মুঘলধারা যখন প্রায়-নিঃশেষিত তখন দেখা গেল আশপাশের ছোটখাটো রাজারা মোগলাই কায়দায় দরবারে শিল্পী পোষা একটা ইজ্জতের ব্যাপার বলে গণ্য করলেন। এর মধ্যে আবার দেশীয় ধারা বজায় রাখার চেষ্টা করলেন বাশোলীর রাজা কৃপালসিংহ। বাশোলী ছবি গুজরাটী পটের খুবই কাছাকাছি। মজার ব্যাপার, এই বাশোলী কলম আবার প্রভাবিত করেছে কাংড়া, গুলের এবং চম্বা কলমকে। অর্থাৎ মুঘল কলমের সঙ্গে আমাদের চিরাচরিত ভাবধারার বিবাহসূত্রে যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হল তারই নাম পাহাড়ী কলম। বিষয়বস্তু এবং রঙ ব্যবহারে সর্বোপরি রূপারোপে পাহাড়ী কলমকে ঐ দুইধারার বৈধ সন্তান বলা যায়।

অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় দশকের শেষাশেষি নাদিরশাহের আক্রমণে মুঘল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেল। দরবারী শিল্পীরা এখানে ওখানে ছুটলেন, এবং তাঁরা যে যেখানে আশ্রয় পেলেন সেখানেই তাঁদের শিল্পে গড়ে উঠল এক একটি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য। এবং অবশ্যই তা মুঘল ধারার।

বাঙলাদেশের চিত্রের ধারা ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের বিভিন্ন যুগসন্ধি দ্বারা বারে বারে প্রভাবিত হয়েছে। লোকপ্রিয় লোককলা পটচিত্রও তার ধারাকে যুগযুগান্ত ধরে অটুট রাখতে পারে নি। নানা রাজ্যের চিত্রশৈলীর প্রভাব যেমন তার ওপর পড়েছে তেমনি অন্যান্য রাজ্যও বঙ্গীয় চিত্রশৈলী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। পরে এই রাজ্যের মধ্যেই আবার বিভিন্ন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে। আঞ্চলিক এই বিশিষ্টতার পেছনে সম্ভবত লিপিশৈলী, মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্য, নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী এবং ধর্মীয় শিল্প-কর্মের অবদান অনেকখানি। নিসর্গচিত্রের ক্ষেত্রে যেমন আঞ্চলিক পরিবেশ কাজ করেছে তেমনি পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারেও এর প্রভাব স্পষ্ট। বস্তুত লোক-শিল্পের প্রতিটি শাখাই পরস্পর প্রভাবিত এবং আঞ্চলিকতা এই শিল্প-মাধ্যমের মূল আকর্ষণ। কখনো হয়তো পট সরাকে, সরা ঘটকে, ঘট কাঁথাকে কিংবা যাত্রার দৃশ্য কাঁথাকে প্রভাবিত করেছে। চিত্রধর্মের দিক থেকে সবচাইতে পটের কাছাকাছি বলা যায় সনাতন ধারার পুতুল নাচকে। অঙ্কনপদ্ধতি ও শৈলী এ দুয়ের একই রকম। তাছাড়া পটের সর্বভারতীয় সব কটি ধারাতেই অঙ্কনপদ্ধতিতে চরিত্রগুলির আবির্ভাব, আঙ্গিক, অভিনয় পুতুলনাচের সঙ্গে অভিন্ন। পুঁথির অঙ্কনে, পাটায় সর্বত্র এই ধারাটির সাক্ষাৎ মেলে। প্রতিমার



মূর্তি অঙ্কনে এই ধারাটিকে আমরা বাঙলা ধারা বলে থাকি।

বাঙলাদেশের পটচিত্র লোকশিল্পের এই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আজকের দিনেও কোনরকমে বেঁচে আছে। দিদিমাদের আমলে সুরু হয়ে মায়েদের আমলে শেষ করা কাঁথা আজকের গতিবেগের দিনে উদ্বৃত্ত ঘোষিত হয়েছে। গৃহশিল্পের এই বিচিত্র শাখা আজ হয় মৃত না হয় মৃত্যুর মুখোমুখি। যাঁরা

এখনও এ ধরণের শিল্প বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁরা পুরানো ধুতি শাড়ী দিয়ে কাঁথা সেলাই করেন। নক্সা ফুটিয়ে তোলেন সাদা জমির উপর নানাবর্ণের সুতো দিয়ে। সহস্রদল পদ্ম, পদ্মের চারদিকে ফুললতাপাতা, হাতীঘোড়া, নৌকা, ঘোড়সওয়ার, রেলগাড়ী, হুঁকো, ঢেঁকি, সাংসারিক তৈজসপত্র, পানের ডিব্বা, ময়ূর, পাল্কী, জাঁতি, লোকলস্কর প্রভৃতির নক্সা দেখা যায় কাঁথায়। আলপনার নক্সার সঙ্গে কাঁথার নক্সার মিল লক্ষ্যণীয়। এই সাদৃশ্য শুধু আকৃতি-গতই নয় মনস্তত্ত্বগতও বটে।

এই প্রসঙ্গে আমরা মূর্তিশিল্পীর কথা একটু বলে নিতে চাই। পুজোর হিড়িকে দারুণ ব্যস্ততার মধ্যে মূর্তি গড়তে হয় শিল্পীকে। ধীর স্থির শান্ত স্বভাবের শিল্পী একাগ্র চিত্তে কাজ করে যান। বাঙালীর জীবনে কয়েকটা পূজোপার্বণ ছিল বলেই বেঁচে আছেন অনেক শিল্পী এখনও। তবুও অনেকেই জাত ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছেন। এ কাজে অনেকেরই এখন পোষায় না। যাঁরা জাত ব্যবসা নিয়ে আছেন তাঁরা সারা বছরে মাত্র তিনমাস কাজের মূল্য পান, অন্য সময়ে কিছু করার থাকে না তাঁদের। অনেকেরই পূজোর মূর্তি গড়তে ভাল লাগে না। কারণ, 'শিল্প যখন নিজের রুচির তাগিদে সৃষ্ট হয় ততক্ষণই তা আনন্দ দেয়, রুজি-রোজগারের সৃষ্টি আনন্দের বদলে বেদনা আনে' জানালেন কুমারটুলীর মধুসূদন পালের স্ত্রী বিমলাদেবী। তিনি বললেন, 'কুমোরবাড়ীর মেয়ে আমি, মূর্তি গড়তে স্বাভাবিক ভাবেই আমি চাইব। কিন্তু মনের চাহিদার সঙ্গে যা গড়ছি তার যেন মিল নেই। পেটের ক্ষুধা মিটাতে গিয়ে কলের মত তুলি ঘোরাচ্ছি।' মূর্তি গড়ে যখন সময় থাকে তখন নানা প্রকার পুতুল গড়েন মূর্তি শিল্পীদের অনেকে। কিন্তু পুতুল গড়ে অভাব মেটান যায় না। জাত ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে অনেক কুমোর এখন আর্ট কলেজে ঢোকার চেষ্টায় হন্যে হয়ে ঘুরছেন। সাবেক দিনে আদান-প্রদানের ওপরেই ওদের চলতে হত। যেমন কাউকে গণেশের মূর্তি দিলে তিনি বিনিময়ে মূর্তির পেটে যত চাউল ধরে তত চাউল দিতেন শিল্পীকে। আজ শিল্পীর পেটমাপা চাল জোটে না। জোটে কিছু নগদ মূল্য। সৌন্দর্যবোধ তথা শিল্পের নানামুখী প্রকাশ লোকজীবনের সর্বত্র। অঙ্গনপ্রাঙ্গণ, গৃহসজ্জা, মন্ডন-অলঙ্করণ, বেশভূষা ও বহুবিধ আচার-আচরণের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। আবার আমরা কাঁথার কথায় ফিরে আসি।

শীতে তুলোর লেপের বদলে কাঁথার ব্যবহার এখনও গ্রামদেশ থেকে উঠে

যায় নি। শীতের সুরুতে যখন লেপ গায়ে রাখা যায় না আবার খালি গায়েও শীত শীত লাগে তখন কাঁথা সকলকেই আরাম দেয়। কাঁথা হেমন্ত ঋতুতে গায়ে দেবার জন্য ব্যবহৃত হয় বর্ধিষ্ণু পরিবারেও। গ্রামের দুঃস্থ জনতা কাঁথাকে দিয়েই শীত পাড়ি দেন। বর্ষিয়সী মহিলাগণ বিশ্রামে সময় নষ্ট না করে কাঁথা সেলাই বা আনন্দের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। শুধু কাঁথা সেলাই-ই নয়, মিষ্টান্ন প্রস্তুতের ক্ষেত্রেও আছে বঙ্গরমণীর শিল্পচেতনা। প্রস্তুত মিষ্টান্ন যাতে সুদর্শন হয় তার জন্য বঙ্গললনাজগতে নানাবিধ ছাঁচ প্রচলিত ছিল ও আছে। ছাঁচ নির্মাণ করেন পরিবারের প্রাচীনাগণ। অবসর সময় কাঁচামাটির ফলকের উপর নরুন দিয়ে তাঁরা খোদাই করেন ফুল, লতাপাতা, প্রজাপতি, ময়ূর, নানাপ্রকার পাখী, মাছ, প্রভৃতি, তারপর সেগুলো আগুনে পুড়িয়ে নেন। এ ছাড়া কাঠের উপর রাখা ভাঙাপাথরের থালার নক্সা দিয়েও ছাঁচ তৈরী করেন তাঁরা। এ ছাঁচ দিয়ে সন্দেশ আদি মিষ্টান্ন ছাড়া আমসত্ত্ব, কাঁঠালসত্ত্ব প্রভৃতি প্রস্তুত করেন। বনেদী পরিবারের অনেকে আবার সূত্রধরদের দিয়েও ছাঁচ বানিয়ে নেন। এই ছাঁচের সঙ্গে বালুচরের শাড়ী এবং নক্সী কাঁথার অনেক নক্সার মিল দেখা যায় ছাঁচের নক্সায়। কাঁথা সেলাই হয়ে তা কোন প্রিয়পাত্রকেই উপহার দেওয়া হয়। বড়দের গায়ে দেবার কাঁথা, ছোটদের কাঁথা, বাক্স, বই, আয়না ইত্যাদির ঢাকনা দেওয়ার কাঁথা, বিছানার চাদর হিসাবে কাঁথা—নানা কাঁথার নানা নাম। কাঁথার পদ্ম, লতাগুল্মাদির সঙ্গে প্রাচীন মন্দির চিত্রেরও মিল বর্তমান। কাঁথা শিল্পের সঙ্গে মিল আছে অলঙ্কার শিল্পেরও। কাঁথার নক্সায় হামেশাই নানাবিধ অলঙ্কার দৃষ্ট হয়, দৃষ্ট হয় পশুপক্ষীদের এবং পৌরাণিক কাহিনীর বা রামকাহিনী কৃষ্ণকাহিনী, ইত্যাদি। অনেক কাঁথায় আবার কৃষ্ণনাম থাকে নামাবলীর মত। সুফি আউল বাউলদের পোষাককেও কাঁথাই বলা যায়। বালাপোষেও এক ধরণের সূচীকর্ম দেখা যায়। অনুরূপ এ্যাপলিক কাজও দেখতে পাওয়া যায় গরীব মানুষের গায়ে।

বিবাহ, ব্রতপার্বণ, পূজা বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে আলপনা অপরিহার্য। রামের বিবাহে, দৌপদীর স্বয়ম্বর সভায়, সুভদ্রার বিবাহে, শ্রীকৃষ্ণের বিবাহে, শিবের বিবাহেও আলপনার উল্লেখ আছে। ঋষি আশ্রমের আলপনা বা কামনা বাসনার ব্রতানুষ্ঠানের আলপনার সঙ্গে বিবাহের আলপনার ঢঙ আলাদা। বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভাঙাতে মেনকা আলপনা নৃত্য করেছিলেন। আশ্রম বালিকাদের বালুর উপরে চিত্রাঙ্কণ, ফসলের বার্তাবাহক বর্ষাঋতুর আগমনের

জন্য, সূর্যের আলোর জন্য, হিংস্র বন্যজন্তুজানোয়ারদের হাত থেকে পরমাত্মীয়দের রক্ষা করার জন্যও আলপনা। রামপ্রসাদ নিজহস্তে কালীর আলপনা আঁকতেন, রামকৃষ্ণও অবসর সময়ে আলপনার চর্চা করতেন। অঙ্গণপ্রাঙ্গণে, দেবগৃহে, বাসগৃহে, ধানের গোলায়, ধনভাণ্ডারে, গোয়ালঘরে সর্বত্রই আলপনা দেওয়া হয় আতপচালের গুঁড়ো জলে মিশিয়ে। চকখড়ি দিয়েও অনেকে আলপনা দেন। আলপনা দিতে দিতে নানা ছড়া ও গানও গান মেয়েরা। লক্ষ্মীর পা আঁকতে গিয়ে বলেন—'আঁকিলাম পদদুটি, তাই মাগো নিই লুটি। দিবারাত পা দুটি ধরি, বন্দনা করি। আঁকি মাগো আলপনা, এই পূজা এই বন্দনা। ক্ষমো দোষ, দাও সান্ত্বনা। তুমি জায়া তুমি ভর্তা তুমি স্বর্গবাসী, তোমায় জানিমা আমি তোমায় ভালবাসি। তুমি মাগো এসো হেথা ঘুচাও মোদের মনোব্যথা, সংসার করো মাগো শুভ। আমি কিছু জানি না মা এ মুখে কি কব। আমি যে মা অধম দাসী, তুমি মা মহিয়সী। ভয়াতুরা আমি যে গো, দাও গো সান্ত্বনা। আঁকিলাম আলিপনা, দূরে ফেলি আবর্জনা। শুভ্র শুদ্ধ মন নিয়ে করি তব আরাধনা। তোমার আশিষে মা যে, সুখে থাকে যত জনগণ।' ধনদৌলত ও শস্যের দেবী লক্ষ্মীর আহ্বানে লক্ষ্মীর পা, ধানের মরাই, ঢেঁকি, কুলো ইত্যাদির নকশা আঁকা হয়। সেঁজুতি ব্রতে চন্দ্র-সূর্য-তারা, হাটবাজার, গোয়াল, ঢেঁকিঘর, রান্নাঘর, খাট, পালঙ, পিঁড়ি, বেলচা আয়না, চিরুণী, গয়না, বেড়ি, হাতা, হাঁড়ি, দোলা, নানা পাতাগাছ, ধানের মরাই নদনদী পাখি পুতুল ঘটি বাটি প্রভৃতি আঁকা হয়। নিত্যব্যবহারের নানা জিনিষের নক্সা কাঁথা ও আলপনায় দেখা যায়। পূজাপার্বণের আলপনা আর পুতুলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত চিত্রিত ঘট, পট, সরা আর কুলো। পূর্ণতার প্রতীক মঙ্গলসূচক ঘট। বাঙলার ঘটে বিশেষ করে মনসার ঘটে ধর্মচিন্তা ও চিত্রের সমন্বয় ঘটেছে। মাটির সরাঙ্কণের মধ্যেও আছে মুন্সীয়ানা। দুই হাত অঙ্গুলীবদ্ধ করে গ্রহণের ইঙ্গিত সরার আকৃতিতে বিধৃত। বিবাহে শুধু ভূমিতেই আলপনা আঁকা হয় না; হাঁড়ি, সরা, কুলো, পিঁড়ি প্রভৃতিতেও আলপনা আঁকা হয়। বিবাহের আলপনায় বহুদল পদ্ম, শঙ্খলতা ও জ্যামিতিক রেখার প্রাধান্য লক্ষিত হয়। মিঠাইয়ের আকৃতি, মিঠাই গড়বার ছাঁচ, জিনিষ পত্তর গুছিয়ে রাখার জন্য সিকা, বটুয়া প্রভৃতিতেও বঙ্গ রমণীর রূপদৃষ্টি ও সৃষ্টি কৌশলের ছাপ স্পষ্ট।

কাঁথার উপকরণ পরিত্যক্ত ছেঁড়া কাপড়। সেলাইয়ের জন্য যে সুতোর ব্যবহার করা হয় তাও সংগ্রহ করা হয় পুরানো কাপড়ের পাড় থেকে।

সূঁইয়ের ফোঁড়ে নকশা সৃষ্টির প্রবণতা পৃথিবীর তাবৎ দেশে প্রচলিত থাকলেও নিতান্ত অবহেলার জিনিষ ছেঁড়া কাপড় দিয়ে এমন চমৎকার নকশা রচনার মধ্যে বাঙালীর বৈশিষ্ট্যের ছাপ সুস্পষ্ট। প্রথমে সমস্ত কাপড়ের টুকরোগুলোকে সমান করে সাজিয়ে ঘন টানা সুঁইয়ের আড়াআড়ি ফোঁড়ে চৌকো চৌকো একটার ভিতর আরেকটা ক্রমে ছোট হয়ে যাওয়া খোপ কেটে কাঁথা সেলাই করা হয়। তারপর রঙিন সুতোয় ফুটিয়ে তোলা হয় নকশার সমারোহ। মোটামুটি লাল কালো আর হলুদ এই তিন রঙের সুতোর ব্যবহারই বেশী। তাছাড়া সবুজ, খয়ের, গোলাপী সুতোরও ব্যবহার হয় কাঁথায়। এই কাঁথাশিল্প বর্তমানে মৃতপ্রায়। নানা শিল্পকেন্দ্রে উৎসাহী মহিলাবৃন্দ নুতন করে কাঁথা-শিল্পের প্রবর্তন করতে চাইছেন। কিন্তু মা-দিদিমাদের নৈপুণ্য দেখাতে প্রায়শই হিমসিম খাচ্ছেন শিল্পীবৃন্দ। যে সামাজিক পরিবেশ, যে অসীম ধৈর্য, যে অশিক্ষিত পটুতা, যে অপরিসীম দরদ ও ভালবাসা এই শিল্পের মাধ্যমে সজীব ছিল এখন তার সন্ধান পাওয়া কষ্টকর। অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বহু ঘরোয়া শিল্পের মত কাঁথা-শিল্পেরও অবনতি ঘটেছে। কিছুদিন পূর্বেও এ শিল্প বাঙলার সর্বত্র জনপ্রিয় ছিল। ওপার বাঙলার শিল্পীবৃন্দ বিশেষ পটু ছিলেন কাঁথাশিল্পে। অবসর সময়ের এ শিল্পে প্রায়শই একজনের পক্ষে একখানা কাঁথা সমাপ্ত করা সম্ভব হয় না। পর পর কয়েকজন মিলে কাঁথা শেষ করতেন। সেলাই ও নকশার মূল সূত্রগুলো পরম্পরাগত হয়ে বাঙলার নারী সমাজের নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হয়। এই কাঁথার প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় বৌদ্ধপালি সাহিত্য এবং পানিনির অষ্টাধ্যায়ীতে। ভগবান বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যেরা যে বস্ত্র পরিধান করতেন তা তৈরী হত জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের সমষ্টি থেকে। নতুন একদা জীর্ণ হয়। এই জীর্ণ দ্রব্য অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানে পরিপূরক। জ্ঞান উন্মেষিত হলে নতুন ও জীর্ণের পার্থক্য মনে হয় না। জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পরিধানের মধ্যে এই জ্ঞানের কথা জানা যায়। বৌদ্ধদের কাছ থেকে সেলাই করা বস্ত্রখণ্ড পরিধানের শিক্ষা পায় আউল-বাউল বৈরাগী-ফকির গাজী সম্প্রদায়ের লোকেরা। উপনিষদে তাঁতবোনা বস্ত্র-খণ্ডের টানা-পোড়ানোর উল্লেখ আছে। ব্যবহারের বিভিন্নতায় নানাবিধ দৈর্ঘ্য প্রস্থ নিয়ে কাঁথার সৃষ্টি। দেহাবরণের কাঁথা দৈর্ঘ্যে চার-পাঁচ হাত ও প্রস্থে তিন-চার হাত। আর্শীলতা, চিরুণীর প্রচ্ছদ, তোরঙ্গ-পেঁটরা ঢাকনা প্রভৃতি কাজে ঐ সব জিনিষের মাপ অনুযায়ী কাঁথা তৈরী হত। মুতো কাঁথা খুবই ছোট, অনেকটা তোয়ালের মত। কচি বাচ্চাদের বিছানায় মুতো

কাঁথা না হলেই নয় গ্রাম-বাঙলায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাঁথা যাঁরা তৈরী করতেন তাঁরা তা করতেন আত্মীয় ও প্রিয়জনদের উপহার দিতে। তাই সেখানে অসীম ধৈর্য্য, আন্তরিকতা, কামনা-বাসনার রূপকল্প ফুটে উঠত। নকশাগুলো ঠিকমতো আঁকা হলেই শিল্পীর কামনা বাসনার তাৎক্ষণিক পূর্ণতা লাভ করত।

এই ধরণের বিশ্বাস থেকেই আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক সচেতনতা এসেছে। বর্তমান মানুষ এই সচেতনতা অস্বীকার করতে চাইলেও তার উন্নতির মূলে যে জ্ঞান তার অন্বেষণে আদিমকাল থেকে দেখা যায় যাদুর উপস্থিতি। হয়ত যাদুক্রীড়ার মূলে কোন যুক্তি নেই। যাদু মানুষের ইচ্ছাশক্তির প্রকাশিত রূপ। যাদুক্রীড়ায় হয় অজ্ঞেয় শক্তির সচেতন প্রয়াস। অতিপ্রাকৃতের এই বিশ্বাস থেকে ব্রত-পার্বন পূজা-অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়েছিল। ক্রমশ প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দলবদ্ধ মানুষ এখন অতি-প্রকৃতির উপর আস্থা হারালেও ব্যক্তিগত জীবনে এর প্রভাব এখনও যথেষ্ট। নারী সমাজের কল্প জগতের সব আকাঙ্ক্ষার সামগ্রীই কাঁথার নকশায় রূপায়িত হয়েছে। কাঁথা বা আলপনার সগোত্র না হলেও তাঁতের শাড়ীর পাড় পরিশীলিত অভিজ্ঞতার দ্বারাই সৃষ্ট। তাঁতও ঋকবেদের যুগ থেকে চলে আসছে। মহেঞ্জোদারোর প্রত্নতাত্ত্বিক খননেও কার্পাস বস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। পরবর্তী মুঘল দরবারে বাঙলার তাঁত অতিশয় আদরের সামগ্রীতে পরিণত হয়েছিল। ঢাকার তাঁতিদের মসলিনের খ্যাতি বহির্ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। অনুরাগীরা এই শাড়ির নাম দিয়েছিলেন 'সব্‌নম'। জামদানী নকশা মূলত রেখাভিত্তিক। কোথাও জ্যামিতিক, কোথাও গাছ লতাপাতাকে সংক্ষিপ্ত আর বাহুল্যহীন করে সাজাবার প্রচেষ্টা আছে এখানে। ঢাকার বুটিদার আঁচলাওয়ালা কাপড় বাঙলার তাঁতশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। ঢাকাই শাড়ীর সুখ্যাতি এখনও অম্লান, তাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাঙলাদেশ ভ্রমণে গেলে বাঙলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর তাঁকে ঢাকাই শাড়ী উপহার দিয়েছেন শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানাতে গিয়ে। টাঙ্গাইল, বিষ্ণুপুর, শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা, ধনেখালি প্রভৃতি অঞ্চলের তাঁত বস্ত্রাদিও সর্বজন পরিচিত।

লোকশিল্পের নিদর্শন হিসাবে তাঁতের শাড়ির নকশা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নয়, কিন্তু মুর্শিদাবাদের বালুচর-শাড়ির অনন্যতা আছে। রেশমের সুতোর এই শাড়ির আঁচলার বিন্যাস চতুষ্কোণ ক্ষেতের মত, ক্ষেতের মাঝে কল্কা, চারিদিকে খোপে খোপে সাজান বিচিত্র নকশা। হাতী, ঘোড়া, শূকর, তাম্রকূট সেবনরত পুরুষ

ও মহিলা, রেলগাড়ি, জাহাজ প্রভৃতি চিত্রের সঙ্গে নানা দরবারী ছবি শাড়ির আঁচলায় স্থান পায়। অননুকরণীয় কৌশলে তাঁতিরা নকশা বোনেন। বস্ত্রশিল্পে বাঙালী তাঁতির নৈপুণ্য প্রকাশ পায় মুঘল সম্রাট কর্তৃক তাঁর মেয়েকে ভর্ৎসনার মধ্যে। বাদশা-কন্যা ঢাকাই মসলিন শাড়ির সাত পরতায় দেহাবৃত করে পিতার সম্মুখে উপস্থিত হলে পিতা কন্যার নগ্ন রূপ দেখে ভর্ৎসনা করেন। সাধারণত আঠার থেকে ত্রিশ বছরের হিন্দু মেয়েরা এই শাড়ি বোনাতে নিপুণ ছিলেন। ত্রিশ বছরের পরের মেয়েদের বোনা কাপড়ের মান ঠিক থাকত না, এবং চল্লিশ বছরের পরের মেয়েদের প্রায়ই 'চালশা' বা চোখের শক্তি কমে আসাতে তাঁরা মসলিন বুনতে পারতেন না। তাঁত বোনার কাজ হত প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে। নূরজাহান যে মসলিন ব্যবহার করতেন সেই সময় তার এক একখানার মূল্য চারশতাধিক টাকা এবং একখানা জামদানী শাড়িব মূল্য ছিল আড়াইশ টাকা।

যোগী শ্রেণীর লোকেরা আটপৌরে কাপড় বুনতেন। মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা মোটা কাপড়, লুঙ্গি ইত্যাদি বোনেন তাঁরা জোলা সম্প্রদায়ের লোক। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে তাঁত শিল্পের প্রতি দেশীয় জনগণের দৃষ্টি পড়ে এবং যোগী জাতি আর্থিক অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা দেখতে পান। এই সম্প্রদায় নাথযোগী গোরক্ষনাথ থেকে উদ্ভূত বলে প্রকাশ। বাঙলার সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজ ওঁদের 'সদ্ব্যবহার'যুক্ত বলে বর্ণনা করেছেন। উনিশ শ' একুশ সনের লোকগণনার সময় যোগীজাতির ব্রাহ্মণগণ তাঁদের ব্রাহ্মণ বলে লিপিবদ্ধ করার দাবি জানান এবং পরবর্তী লোকগণনায় অর্থাৎ উনিশ শ' একত্রিশ সালে সমগ্র যোগী জাতি একত্রিত কণ্ঠে ব্রাহ্মণত্বের দাবী পেশ করেন। সামাজিক মর্যাদার দাবির সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ সংস্কারের চেষ্টা করেন এবং ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের জাতিসমূহ যে পথে এগিয়ে চলেছিলেন তাঁদের অনেকে সেই পথেই অগ্রসর হলেন। ফলতঃ তাঁদের বৃত্তি বা বয়ন শিল্প তথা বস্ত্রশিল্প উন্নত হতে পারল না। স্ববৃত্তিতে অনেকে নিয়োজিত থাকলেও আরও উন্নতির আশায় এবং সামাজিক মর্যাদার উৎকর্ষের জন্য এই শিল্পী জাতটি ক্রমশ মধ্যবিত্ত চাকুরী-জীবী ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ সমাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চললেন। শুধু যোগীরাই নন, আরও অনেক লোক তাঁদের জাতীয় বৃত্তি পরিহার করে ভদ্র সাজতে চাইছেন। বহু চিত্রকর, মালাকর, কুম্ভকার তাঁদের জাতীয় বৃত্তি ভুলেই গেছেন। অনেকে আবার পদবীও পালটিয়ে চলেছেন। তপশীলী ও উপজাতির লোকদের সঙ্গে এই পদবী পালটাবার ব্যাপারে তাঁদের মিল কৌতুকপ্রদ।

লোকশিল্পের ব্যাপক নিদর্শন বাঁশ, কাঠ ও মাটির তৈরী 'বাঙলো' ও 'চালাঘর'গুলো। এদেরই অনুকরণে রচিত বাঙলো, চালা ও রত্নমন্দির। মন্দিরের গাত্রে পোড়ামাটির ফলক গ্রামীণ শিল্পাদর্শের রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই শিল্পে লোকসমাজের দৈনন্দিন জীবন ও কর্ম থেকে নগর সমাজের জীবন-যাত্রার কথাও উৎকীর্ণ করে রেখেছে নাম না জানা শিল্পীবৃন্দ। আবার এই সব মন্দিরের উৎকীর্ণ মৃৎফলকে পৌরাণিক, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির কাহিনী, শিকার, কীর্তনের আসর, পুলিস, সাহেব এবং সমাজচিত্রের নানা তথ্য লোকশিক্ষার পরিপূরক হিসাবে কাজ করেছে। ছাঁচে ঢালাই এই মৃৎফলক ভাস্কর্যের অনুসৃতি বলে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। বাঙলার সুপ্রাচীন পাথরের বহু মন্দির মুসলমান আমলে বিনষ্ট হয়েছে। তারপর বাঙালী স্থপতি ইঁটের তৈরী মন্দির গঠনে তৎপর হন। ইঁটের তৈরী মন্দির নির্মাণকলার চর্চাও বাঙলায় বহু শতাব্দীর প্রাচীন। একই উপায়ে মসজিদ নির্মিত হয়েছে। পাল-সেনযুগের পরে বাঙলায় নানাবিধ দেবগৃহ রচনার নতুন ধুম পড়ে যায়। এর ফলে সূত্রধর সম্প্রদায় নতুন উৎসাহ পায়। দারুশিল্প, চিত্রাঙ্কন, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে এই সূত্রধর সম্প্রদায়ের অপরিমেয় অবদান আছে। এঁরা আগে বাঁশ ও খড়ের কুড়েঘর তৈরীতে কুশলী ছিলেন এবং একদা কাঠ, মাটি, পাথর ও চিত্রের মাধ্যমে যুগপৎ শিল্পচর্চা করতেন। কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন 'থাক'-এ বিভক্ত হয়ে ওঁরা কাজ করেন। বর্ধমান থাক, অষ্টকুল থাক প্রভৃতি বাঙলায় সমধিক জনপ্রিয়। 'থাক'কে 'স্কুল' বা নির্মাণরীতি বলা যেতে পারে। ব্রিটিশ



অধিকারের অব্যবহিত কাল পরে সূত্রধরদের শিল্পকাজে ভাঁটা পড়ে। পোড়া-মাটির কাজ প্রায় অবলুপ্ত হয়। বাবুযুগের বাইজী নাচ, সাহেববিবির নাচ, মনিয়া পায়রা বুলবুলির লড়াই ; বারোইয়ারী পূজোয় সংস্কৃতি ক্ষেত্র সরগরম হয়ে ওঠে, সংস্কৃতির এই সংকটের যুগে জীবন-সংগ্রামে পরাজিত হন সূত্রধর সমাজ ও অন্যান্য লোকশিল্পী। তাঁরা আধমরা হয়ে কোন রকমে বেঁচে রইলেন।

সূত্রধরদের বলা হয়েছে অধম সংকর বর্ণ, বা অসৎ শূদ্রের তালিকায় তাঁদের স্থান। সূত্রধরদের মত তক্ষণশিল্পী ও স্থপতিদেরও উচ্চাসন দেন নি ব্রাহ্মণ্য সমাজ। যে সব সূত্রধর, তক্ষণশিল্পী ও স্থপতি অপূর্ব শিল্প সৃষ্টি করে গেছেন তাঁদের বংশধরদের অনেককেই পৈতৃক ব্যবসা ছেড়ে দিতে হয়েছে অর্থনৈতিক কারণে। একই কারণে স্বনির্ভর গ্রাম পরনির্ভর হয়ে চলেছে। গ্রাম শহর-নির্ভর হয়ে পড়ায় গ্রামীন শিল্পে নিযুক্ত শিল্পীরা মার খাচ্ছেন। এ কথা সকলেই জানেন যে ইংরেজ আমলে অবস্থাসম্পন্ন গ্রামবাসী শহরে এসে বাসা বাঁধলেন। কৃষিজীবী সম্প্রদায় পড়ে রইলেন গ্রামে। ধনী সম্প্রদায় গ্রামের টাকা নিয়ে শহরকে সমৃদ্ধ করেছে। জমিদারদের অর্থ গ্রাম থেকে শহরে চলে আসার দরুন গ্রাম্যশিল্প অবহেলায় ধীরে ধীরে বন্ধ হতে লাগল। কেবল গ্রামবাসীর প্রয়োজন মেটানোর জন্য যতটুকু দরকার—যেমন তাঁত, কুমোরদের মাটির বাসনকোসন, হাঁড়ি কড়াই, তসর, কাঁসা প্রভৃতি কোন রকমে বেঁচে রইল।

টেরাকোটা এবং গালার কাজে বীরভূম একদা বিখ্যাত ছিল যার চিহ্ন এখনও বীরভূমে দেখা যায়। মাটির ও কাঠের পুতুলের কারিগরদের অবস্থাও অনেকটা অনুরূপ। পুতুল তৈরীর প্রয়োজনীয় রঙ ও তুলি নিজেরাই বানায় শিল্পী দেশজ উপায়ে। এই সব পুতুল মেলা, হাট ও বাজারে বিক্রী হয়। নানা দেবদেবী, গৌরাঙ্গ, ভাদুর মূর্তি এখনও বানায় বীরভূমের লোকশিল্পী। বীরভূমে অনেক পটুয়া আছেন. তাঁদের অনেকেই এখনও কোন প্রকারে জাত-শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। বাঁকুড়ার লোকশিল্পীও কোন রকমে সে জেলার লোকশিল্প বাঁচিয়ে রেখেছেন। বাঁকুড়ার মল্লরাজদের নির্মিত মন্দিরসমূহের গায়ে যে পোড়ামাটির চিত্রসারি দেখতে পাওয়া যায় সেখানে বাঙালী শিল্পীর মুন্সীয়ানার পরিচয় আছে। ছাঁচে ঢালাই পোড়ামাটির এই পুতুল ভাস্কর্যের অনুসৃতি বললে বোধ হয় ভুল হবে না। মল্লরাজারা উত্তর ভারতীয় হিন্দু স্থাপত্যরীতির অনুসরণ করেছেন, অর্থাৎ পীঢ়া ও শিখর রীতির সঙ্গে বাঙলা রীতি বা দো-চালা, চারচালা মিশিয়ে মন্দির নির্মাণ করেছেন। তাঁরা মন্দির ও গাত্রাঙ্গ শোভায় মূল্যবান ও মজবুত পাথরের পরিবর্তে ব্যবহার করেছেন পোড়া এঁটেল মাটি ও ল্যাটেরাইট পাথর। বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দির বা সোমাতোপলের শূন্যগর্ভ মন্দিরের শিল্পকলায় মুসলমান পূর্বযুগের স্পর্শ বিদ্যমান। সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দিরকে ভিত্তি করে তার চার পাশের মন্দির ও দেবস্থান সমূহে ব্রাহ্মণ্য, জৈন, বৌদ্ধ ও নিষাদ সংস্কৃতির সমন্বয় দেখা যায়। মন্দিরকে কেন্দ্র করে মন্দিরের চৌহদ্দি বিস্তার পেয়েছে। আরণ্যক দেবদেবীর

প্রতীক তেলসিঁদুর মাখানো সারিবদ্ধ হাতি ঘোড়া দেখতে পাওয়া যায় গ্রাম বাঙলার সর্বত্র। লোকসমাজের কাছে এরা নানা নামে পরিচিত। আদিম সমাজের প্রতীক চেতনা থেকে এদের উৎপত্তি। পরবর্তী স্তরে সুকুমার কবিকল্পনা ও আবেগে উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। সকলেই জানেন যে সুরুতে মাটি, পিতল ও কাঠের পুতুল নির্মাণ টোটেম অনুযায়ী হত। অদেখা শক্তি ও যাদুক্রিয়াকর্মে এই পুতুলের আবশ্যক। জনমনের অভিব্যক্তি প্রকাশ হয় এদের মাধ্যমে। তাই হাতি, ঘোড়া প্রভৃতি পুতুল নানাভাবে পূজিত। বৃক্ষের তলে হাতি ঘোড়ার সমারোহের কথা সকলেরই জানা। বিভিন্ন শিল্পী বিভিন্ন প্রকার পুতুল তৈরী করেন। কুচল শিল্পীদের মহিলারা সাধারণত ছোট ছোট পুতুল ও খেলার পুতুল তৈরী করেন। এই সব পুতুল হাতেই তৈরী হয়। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প অনুপম সৌন্দর্যের মূর্ত বিগ্রহ। রঙের বিন্যাস, কারিগরী দক্ষতা, বাস্তবধর্মী আঙ্গিক, সৌম্যের ও সূক্ষ্মভাবের ব্যঞ্জনা গুণে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীরা বন্দিত। কলকাতার কুমারটুলী অঞ্চলের মৃৎশিল্পীরাও চমৎকার প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছেন নানা মূর্তি গড়তে। পোড়ামাটির নানাবিধ কাজ, গৃহস্থালীর নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি, পুতুল, খেলনা, প্রতিমা, প্রতিকৃতি প্রভৃতি অসংখ্য মাটির জিনিষ আজও কুমারশালায় তৈরী হয়ে ক্রেতাদের চাহিদা মেটাচ্ছে। জয়নগর-মজিলপুরের পুতুল বিভিন্ন বর্ণে পাওয়া-যায়। এখানকার কুমোরেরাও নানাপ্রকার প্রতিমা তৈরী করেন। বীরভূমের রাজনগরে নানাবিধ পুতুল পাওয়া যায়। পুতুল পাওয়া যায় মেদিনীপুরের নাড়াজোলেও। ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা প্রভৃতি স্থানের কুমোরেরা এখন উদ্বাস্তু হয়ে কলকাতার আশেপাশে বসবাস করছেন। তাঁরাও নানাপ্রকার পুতুল উপহার দিচ্ছেন।

মাটির পুতুল ছাড়া বর্ধমান, হাওড়া, নদীয়া, মেদিনীপুর, বীরভূম প্রভৃতি স্থানে উৎপন্ন হয় কাঠের সুদৃশ্য পুতুল। নতুন গাঁয়ের পুতুল প্রস্তুতকারকেরা কালিঘাটের পুতুল তৈরীতে দক্ষ। বাল গোপাল, পেঁচা, আহ্লাদী, গৌর-নিতাই, বুড়াবুড়ী, নানাবিধ পশুপাখী, চমৎকার রূপ নেয় পুতুল শিল্পীদের হাতে। শোলা, আলু, বাঁশের পুতুল প্রভৃতিও তৈরী হচ্ছে এখন। মালাকরেরা শোলার কাজে বিশেষ পারদর্শী। বিভিন্ন পাখী, কদমফুল এমন কি দুর্গা প্রতিমা পর্যন্ত তৈরী হচ্ছে এখন শোলা দিয়ে। গত বছর দক্ষিণ কলকাতার একটি পূজামণ্ডপে বাঁশের দুর্গার প্রতিমা পূজিত হতে দেখা গেছে। গোবরের পুতুলও কম জনপ্রিয় নয়। ক্ষীরের পুতুল, সরের পুতুল, পিটুলীর পুতুলও

বাঙালীর ব্রতে দরকার হয় এবং সেসব উৎপাদিত হয় বাঙালীর ঘরে। পিতলের পুতুল তৈরী করে ঢোকরারা। নানাবিধ পাখী দেবদেবী তাদের পুতুলের বিষয়। বর্ধমানের দরিয়াপুর এবং বাঁকুড়ার রামপুরেই ঢোকরাদের বেশী দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার ঢোকরা বা ঢেপ্পো সম্প্রদায় এখনও প্রাচীন ও আদিম ধাতুশিল্প বা যে উপায়ে মূর্তি বা তৈজসপত্র নির্মাণ করে থাকেন তা 'সিরে পার্দ্যু' পদ্ধতি বলে পরিচিত। শিল্পশাস্ত্রে এই পদ্ধতিকে বলা হয়েছে 'মধুচ্ছিষ্টবিধানম'। ছাঁচে তৈরী হয় মূর্তি এবং তৈজসপত্রাদি। মোম বা ধুলোর আঠা দিয়ে প্রথমে তৈরী করতে হয় ছাঁচ, তারপর সে ছাঁচকে নরম মাটি দিয়ে আবৃত করে কোন একটি নির্দিষ্ট ছিদ্রের মধ্যে গলানো পিতল ঢেলে দেওয়া হয়। আগুনের তাপে মোম বা আঠা গলে বের হয়ে আসে। স্থান পূরণ করে গলিত পিতল। এই পদ্ধতিতে নির্মিত বহু প্রাচীন মূর্তি ও তৈজসপত্রাদি পাওয়া গেছে বিভিন্ন পত্নতাত্ত্বিক খনন ও আবিষ্কারে।

মেদিনীপুরের খাঞ্জাপুর গ্রামে বদনা বা গাড়ু শিল্প প্রসার লাভ করেছে। পূর্বে এখান থেকে বদনা বিহার, উড়িষ্যা এবং বাঙলার বিভিন্ন স্থানে চালান যেতো। মুসলমান যুগে বদনা শিল্পের বিস্তার লাভ হলেও বাঙালী হিন্দুর নিত্যকর্মেও বদনার উপস্থিতি আছে। যেমন – কৃষক পরিবারে কোন অতিথি এলে প্রথমেই তাঁকে গাড়ু-গামছা দিয়ে অভ্যর্থনা করেন গৃহস্থ। এ বদনার উপর অনেক সময় নকশা খোদিত থাকে। নকশার জন্য মাটির তৈরী দুখোল ছাঁচের মধ্যে পুরানো কুঁচো পিতল বা নতুন পিতল পরিমাপ মত দিয়ে ছাঁচ আগুনে পোড়ানো হয়। গলিত পিতল বদনা-কৃতি ছাঁচের মধ্যে গিয়ে পূর্ণরূপ লাভ করে। গলান পিতলের এবম্বিধ নানা সামগ্রী বাঙলার সর্বত্র পাওয়া যায়।

শিঙের কাজে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন মেদিনীপুরের লোক-শিল্পীবৃন্দ। তাঁদের নানা নকশা ও বিভিন্ন প্রকার শিল্পের কাজে সজীবতা ফুটে উঠেছে। মেদিনীপুর জেলায় এ কাজে প্রায় তিন সহস্র লোক নিযুক্ত আছেন। পূর্বে শিঙ দিয়ে শিল্পীরা শুধুমাত্র চিরুণী তৈরী করতে পারতেন, এখন চিরুনীর সঙ্গে সঙ্গে তৈরী করে যাচ্ছেন নানাবিধ পুতুল ও খেলনা। সেলুলয়েড দিয়েও পুতুল তৈরী হচ্ছে এখন। যশোরের চিরুনী প্রস্তুতকারকেরা কলকাতায় এসে চিরুনী শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে সেলুলয়েডের আয়নার খোপ, সিঁদুরের বাক্স, ছোট ট্রে, পুতুল ইত্যাদি তৈরী করে যাচ্ছেন।

তালপাতা, খেজুরপাতা দিয়েও নানা প্রকার শিল্প সৃষ্টি করেন লোকশিল্পী বাঁশের টুনি ও দেশী আমড়ার আঁটিও তাঁদের শিল্প সৃষ্টির প্রেরণা জোগায়।

প্রাচীন যুগ থেকেই পুতুল মানুষের খেলার সঙ্গী। জীবনের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতে শিশুমনকে কল্পনার রাজ্যে নিয়ে যেতে পুতুল ও পুতুল খেলার তুলনা নেই। পুতুলের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বহু যুগের শিল্পধারা। বাঙলার কাঠের পুতুল, চোকরাদের পিতলের পুতুল, মৃৎশিল্পীর মাটির পুতুল, গৃহস্থ বধূর গোবরের, ক্ষীরের সরের পিটুলীর পুতুল ইত্যাদি আবহমানকালের বাঙালীর সম্পত্তি। প্রায় অর্ধলক্ষ লোক আজ এই সব শিল্পের উপর নির্ভরশীল। রাজ্য সরকার তাই নানা শিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র খুলেছেন। বহু শিল্পী এই সব কেন্দ্রে শিক্ষা পাচ্ছেন, বহু শিল্পী নিজ নিজ ঐতিহ্য অনুযায়ী শিল্পের সেবা করে যাচ্ছেন।

বিচ্ছিন্নভাবে বহু গ্রামে ও গৃহে বেত ও বাঁশের কাজ হয়। সাধারণ ঝুড়ি থেকে আরম্ভ করে নানারকম সৌখিন জিনিষ ও নিত্যব্যবহার্য জিনিষ বাঁশ ও বেত শিল্পের অন্তর্গত। বাক্স, চেয়ার, টেবিল, আলো, প্রভৃতিও তৈরী হচ্ছে বাঁশ ও বেত দিয়ে। মাদুরশিল্প অন্যতম একটি উল্লেখযোগ্য লোক শিল্প। মেদিনীপুরের সবঙের মাদুর শিল্প সর্বত্র সমাদৃত। এ শিল্পের উৎপত্তি হয়েছে মুসলমান আমলে। রেশমী সুতোর টানায় অতিসূক্ষ্ম কারুকার্যময় মাদুর বাঙলার পরম আদরের। অপরূপ নকশায়, উচ্চাঙ্গের কারিগরী নৈপুণ্যে ও নিখুঁত বয়নচাতুর্যে বাঙলার মাদুর সুবিখ্যাত। পঞ্চাশ হাজারের অধিক লোক এ শিল্পে নিযুক্ত আছেন পশ্চিমবঙ্গে। ছয় রকম মাদুর তৈরী হয় পশ্চিমবঙ্গে।

মাদুর শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় পাটি ও হোগলা শিল্পের কথা। সারা বাঙলায় হোগলা ও মাদুর উৎপন্ন হলেও ওপার বাঙলা বা বাঙলাদেশে এই শিল্প বিশেষ জনপ্রিয়। মাদুর, পাটি, হোগলা বাঙলার লোকজীবনের আবাল্য সঙ্গী। বিছানায় চাদরের বদলে, সতরঞ্চির বদলে এদের ব্যবহার হামেশাই হয় লোকসমাজে। আব্রু দিতে হোগলার ব্যবহার দেখা যায় অনেক স্থানে। বাঁশের চাচ দিয়ে ঘরের বেড়া দেওয়া গ্রাম বাঙলার বহুদৃষ্ট ব্যাপার। হাতেছাপা রেশম ও সুতিকাপড় বাঙলার পুরাতন কারুশিল্পের অন্যতম। মনোরম নকশার অনুপম প্রকাশ ও বহু বিচিত্র রঙের অভিনব সংমিশ্রণ এ শিল্পের বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন বাঙলার ঐতিহ্যময় নকশা এ শিল্পের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। শ্রীরামপুর, কলকাতা ও শহরতলীতে এ শিল্পে নিযুক্ত আছে প্রায় দু হাজার শিল্পী। হাতে-ছাপা কাপড়ের জনপ্রিয়তা বেড়ে

যাওয়াতে এ শিল্পের প্রতি ক্রমশ বেশী লোক আকৃষ্ট হচ্ছে। সরকারও এ শিল্পে উৎসাহ জোগাচ্ছেন শিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র তৈরী করে। আমাদের হস্তকলার মধ্যে হাতেবোনা নকশা রেশম ও কারুকার্যময় সুতী বস্ত্রই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদে যে বালুচর শাড়ী আত্মপ্রকাশ করেছিল তা দুবরাজ দাস ও হেম ভট্টাচার্যের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নষ্ট হয়ে যায়। এ শিল্পের কেন্দ্র ছিল মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে। মুর্শিদাবাদ জেলার রেশম শিল্পও উল্লেখের দাবী রাখে।

শঙ্খশিল্প বাঙলার একটি প্রাচীন কারুশিল্প। সধবার হাতে শাঁখা পরাতে প্রাচীন কাল থেকেই গড়ে উঠেছে শঙ্খবণিক ও শঙ্খশিল্প। পশ্চিমবঙ্গে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, চব্বিশপরগনা, কলকাতা, পূর্ববঙ্গের ঢাকা, বরিশাল, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, বগুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে এ শিল্প গড়ে উঠেছে। শঙ্খশিল্পীরা নবশাখশ্রেণীর লোক। অগস্ত্য মুনি তাঁদের আরাধ্য দেবতা। শঙ্খশিল্পীরা বা শঙ্খ বণিকেরা ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভে জন্মলাভ করেন। 'কংসকার শঙ্খকারেন ব্রাহ্মণাৎ সংবভূবতঃ' বলে উল্লেখ আছে। কথায় আছে যে একদা দুর্গা শিবের কাছে একজোড়া শাঁখা চাইলেন। শিব বললেন—'সোনা রূপার গহনা পর, অকালে বিক্রয় করা যাবে, রাঙা শঙ্খ পরে কি হবে!' গৌরী বললেন—'সোনা রূপা পরিলে গায়ে ব্যথা হয়, রাঙা শঙ্খ পরিতে আমার বড় ইচ্ছা হয়।' শিব তখন গৌরীকে বললেন যে তাঁর পিতা দক্ষরাজ, ধনী। শঙ্খ পরবার ইচ্ছা থাকলে তিনি সেখানে যেতে পারেন। এরূপ ব্যবহারে গৌরী চটে যান এবং গ্রাম্যনারীর ন্যায় শিবকে অকথ্য গালিগালাজ দিয়ে গণেশের হাত ধরে বাপের বাড়ী চলে আসেন। তারপর নারদ শিবকে শাঁখারী সাজবার বুদ্ধি দিলেন। শিব গরুড়পক্ষীকে শঙ্খ আনতে আদেশ দিলেন। বিশ্বকর্মাকে শাঁখা নির্মাণ করতে বললেন। শাঁখা তৈরী হলে—'শাঁখার গুঁড়িগুলি মহাদেব গায়েতে মাখিল। শাঁখা-ঘষা কড়িখানি ডানবগলে নিল॥ সিদ্ধির ঝোলা গাঁজার কলকে বাঁ বগলে নিল। শঙ্খের পসরা মহাদেব মাথায় তুলে নিল॥ এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দিল। শিবের খুড়শাশুড়ী ঘরের বাহির হইল॥ শঙ্খ পরাবার লেগে শিবের খুড় শাশুড়ী করে তাড়াতাড়ি। মাথায় বসন দেয় না তারা করচে হুড়াহুড়ি॥' তারপর গৌরী আসে। সেও শিবকে চিনতে পারে না। 'সোনার খাটে বসে গৌরী রূপার খাটে পা। শঙ্খ পরতে বসল কার্তিক-গণেশের মা॥' শিব শঙ্খ পরাতে গিয়ে মন্ত্র বললেন—'যাবার সময়

যাবি শঙ্খ নড়িয়ে চড়িয়ে। আসবার সময় আসবি না শঙ্খ বজ্রাঘাত পড়িলে ॥' তারপর শিব নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন—'সূর্যপুরে থাকি আমি ইন্দ্রপুরে ঘর। আমার নাম দেব শাঁখারী পিতা সদাগর ॥' তারপরও কথা কাটাকাটি। কারণ—দুর্গার হাতে কোন শাঁখা পরানো যায় না। পরাতে গেলেই মট করে শাঁখা ভেঙ্গে যায়। শাঁখারী তখন রুষ্ট হয়ে বললেন, নিশ্চয়ই দুর্গা স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাবান নন্, তাই তাঁর হাতে শাঁখা পরানো যাচ্ছে না। এ কথায় দুর্গা ক্রুদ্ধ হয়ে কিছু বলতে পাবেন এরই ফাঁকে শাঁখারী অদৃশ্য হলেন। অবশেষে দুর্গা নিজেই আবিষ্কার করেন যে শাঁখারীই স্বয়ং শিব। পরিচয় পেয়ে গৌরী শিবের কাছে চলে আসেন। এবং তারপর উভয়ে পরমশান্তিতে বসবাস করতে থাকেন। সেই থেকে হিন্দু রমণী পরম ভক্তিভরে শাঁখা ব্যবহার করে আসছেন। রাজরাজেশ্বরীর পূজা ও মেলারও কারণ এই শাঁখা। রাজুয়ার ঘাটে ভবানন্দের কাছে এলেন শাঁখারী কারণ এই ঘাট থেকে যে মেয়েটি শাঁখা পরেছে তার দাম আদায় করতে। ভবানন্দ বিস্মিত। এখানে তো মেয়ে নেই শাঁখা পড়বে কে! শাঁখারী কান্নায় ভেঙে পড়ে। ভবানন্দ মিথ্যেবাদী প্রতিপন্ন হবেন এই দুর্ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়েন। তখন পুকুরে দু'খানি হাত দেখা দিল। সে হাতের শোভা বর্ধন করছে শাঁখা। ভবানন্দ বুঝতে পারেন দেবীর ছলনা। তিনি শাঁখারীকে দাম দিয়ে বিদায় দিলেন। তিনি সে রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন তাঁকে দেবীপূজার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেই থেকে মকর সংক্রান্তির দিনে হয়ে আসছে রাজরাজেশ্বরী পূজা।

শাঁখারী বা শঙ্খবণিকেরা বিশ্বকর্মার চেয়েও বেশী শ্রদ্ধা করেন অগস্ত্য মুনিকে। কারণ শাঁখা তৈরীর জন্য যে করাতের দরকার তার আবিষ্কারক নাকি অগস্ত্যমুনি। মহাধূমধাম করে শাঁখারী সমাজ অগস্ত্যমুনির পূজা দেন। শাঁখার সঙ্গে সঙ্গেই আরেকটি সামগ্রীর নাম করতে হয়। তা লাক্ষা শিল্প। লাক্ষার চুড়ি, পুঁতির মালা আংটি বাঙালীর অজানা নয়। এর প্রস্তুতকারকেরা গোপ সম্প্রদায় ভুক্ত। লহেরা ও ছত্রী সমাজের লোকও এ কাজ করেন। ওঁরা বছরে দুবার বিশ্বকর্মার পূজা করেন। একবার দুর্গানবমী পূজার দিনে ও আরেকবার সরস্বতীপূজার দিনে। পূজায় মূর্তির বদলে যন্ত্রপাতির পূজা হয়। চাল ও চিনি নৈবেদ্য হিসাবে উপহার দেওয়া হয়। লাক্ষার রুলি, বালা, মালা, হার, লাল ও সবুজ রঙের এই সব জিনিষ প্রাকৃত ও লোক সমাজের খুবই প্রিয়।

লাক্ষা ছাড়া, গো-মহিষাদি পশুর চর্ম, কুমির, হরিণ, সাপ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রাণীর চর্ম দিয়েও নানাবিধ টেকসই ও সুদর্শন সামগ্রী তৈরি হয়। পাদুকা

ছাড়া, বাঙলার বাক্স, ব্যাগ, স্যুটকেশ, বুক কভার, প্রভৃতি নয়নাভিরাম শিল্প-দ্রব্য দেশে ও বিদেশে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। অসাধারণ দক্ষতা অপূর্ব তক্ষণকৌশল ও অনুপম কারুকার্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের গজদন্ত শিল্প। এই শিল্পের কারিগর ও ভাস্করগণ নিষ্ঠা ও উৎসাহের সঙ্গে রক্ষা করে চলেছেন এই শিল্পকে। ব্যয়সাধ্য হলেও এ শিল্প অনুপম সৌন্দর্যের জন্য উপহার ও স্মারক রূপে অদ্বিতীয়। মুর্শিদাবাদ জেলার ভাস্কররা এ শিল্পে বিশেষ পারদর্শী।

বাঙলার অন্যতম প্রাচীন শিল্প পাথর-শিল্প। পাথর বাঙলার হিন্দু বিধবাদের পরম আদরের সামগ্রী। দেব পূজার বাসন, বিয়ের পর বধূকে পাথরের উপর দাঁড় করান প্রভৃতি কাজে পাথর হিন্দুর কাছে অপরিহার্য। পাথরের মূর্তি, পাথরের সেতু, ঘরবাড়ি তো আছেই। পাথরের শিল্পীরাও তাঁদের বিশ্বকর্মার জাত বলে মনে করেন। ভাদ্রসংক্রান্তি দিবসে বিশ্বকর্মার পূজাও করেন। তাঁরা থালা, বাটি, রেকাব, গেলাশ, প্লেট, ছাইদানি, প্রভৃতি তৈরী করেন। নকশার ব্যাপারে শিল্পীরা প্রায়শই প্রাচীনপন্থী, ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। হিন্দু সধবা পাথরের বাসন ব্যবহার করেন না, এড়িয়ে চলেন। পাথরের বাসন ভাঙলে পাপ হয়। সে পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য নির্দিষ্ট দিনে পাথরের সমান ওজনের চিনি বা গুড় দেবতার কাছে নৈবেদ্য দিতে হয়। যে কোন দেবতার কাছেই এ নৈবেদ্য দেওয়া যায়। পাথরের থালা সম্পর্কে একটি লোকবচনে প্রকাশ—'ভেজিতে পাথর ভাল, ভেজাইতে থালা'। কবিরাজের খল বা উদুখলও পাথরের তৈরী। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া অঞ্চলে প্রভৃতি পাথর শিল্পীদের দেখা যায়। কঠোর পরিশ্রমী বাঁকুড়ার পাথর শিল্পীগণ।

বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে দশাবতার তাসখেলার প্রথম প্রচলন হয়। এই তাস পশ্চিম বাঙলার আরেকটি উল্লেখযোগ্য লোক শিল্প। জয়দেবের গীতগোবিন্দের মধ্যেও শ্লোকবদ্ধ এই দশ অবতারকে পাওয়া যায়। এই অবতারবৃন্দকে হাতের তাস করে খেলা সুরু হয় বোধহয় সপ্তম-অষ্টম শতকে। এই খেলার মধ্যে ধর্মকে কর্ম এবং কর্মকে নর্ম অথবা খেলার ছলে আনন্দ, আনন্দের ছলে শিক্ষাদানের বাঙালী দার্শনিকতা পরিস্ফুট। এ খেলায় প্রয়োজন একশো কুড়িখানা তাস ও পাঁচজন খেলোয়াড়। এই খেলা থেকেই পরবর্তীকালে বাহান্ন তাস, আট তাস, তিন তাসের খেলাও চলে আসছে।

তাস শিল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা একটা নৃত্যশিল্পের কথাও বলতে চাই। বলাবাহুল্য, সম্প্রতি ছো নাচ নিয়ে খুব আলোচনা হচ্ছে। এটি পুরুলিয়ায়

সর্বাধিক জনপ্রিয় নাচ। সেরাইকেলা, ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি স্থানে ছো পরিচিত হচ্ছে ছউ নামে। ধলভূম, মানভূম, ঝাড়গ্রামের সাধারণ মানুষ এ নাচকে ছো নাচ বলেই জানেন। পুরুলিয়া এবং সীমান্ত বাঙলার সর্বত্রই নাকি এ নাচের সমাদর আছে প্রাকৃতজনের মধ্যে। শিবের গাজন উপলক্ষে ছো-নাচের উদ্ভব বলে অনেকে মনে করেন। ডক্টর সুধীর করণ জানিয়েছেন যে, 'সাধারণতঃ ছো-নাচকে লোকনৃত্য নামেই অভিহিত করা হয় বোধহয় এই কারণেই যে এ নাচ নগরে প্রতিষ্ঠিত নয় এবং জনসাধারণই এ নৃত্যে অংশ গ্রহণ করে থাকে। ...এ নাচ সাঁওতালী নাচের মত আদিম প্রথাসিদ্ধ নাচ নয়। ছন্দ ও রীতির বৈচিত্র্য এ ক্ষেত্রে স্পষ্টতই পরিলক্ষিত হয়। অনেকক্ষেত্রেই উচ্চমার্গীয় তালমানযুক্ত পদক্ষেপে এই নৃত্যকে লোকনৃত্যের আবেষ্টনী অতিক্রম করতে সাহায্য করে। ...ছো নাচ, সাধারণতঃ মুখোশ নাচ, কিন্তু মুখোশহীন নৃত্যও এর অঙ্গীভূত। যৌথ পাইক নাচ বা সৈনিক নৃত্যও এর অংশ বিশেষ'। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন ছৌনাচ মার্গ-নৃত্যের অন্তর্ভুক্ত। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক শ্রীসোমেন বসু এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেন বলে আমাদের জানিয়েছেন। তাঁর মতে 'ছো নাচ মার্গ নৃত্যের অন্তর্গত'—এ দাবী ভ্রান্ত। ছো-নাচের মুখোশ তৈরী করতে মুখোশ শিল্পীকে রীতিমত দক্ষতা অর্জন করতে হয়। মুখোশের কৃতকার্যতার উপর এ নাচের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। এবং সেকারণেই লোক-শিল্পের আলোচনায় ছো-নাচের কথা প্রাসঙ্গিক ভাবে এসে গেছে।

বাঙলার গ্রাম জীবনের প্রতি যে কোন চক্ষুষ্মান দর্শক যদি দৃষ্টি দেন তবে সন্ধ্যার মঙ্গলধ্বনি থেকে তুলসীমঞ্চের প্রদীপ দান ও গৃহস্থের গৃহকর্মের সর্বত্রই দেখতে পারেন শ্রী রা সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার সাধনা। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ব্যবহারিক সামগ্রীতে সৌন্দর্য সাধনা প্রতিফলিত। ব্যক্তিগত রূপচর্চা থেকে আনুষ্ঠানিক অঙ্গসজ্জা সর্বত্রই আছে সুন্দরের সাধনা। সুন্দরের সাধনার ফলশ্রুতি হিসাবেই এগিয়ে চলে শিল্পকর্ম। এই শিল্পকর্মে নর ও নারী উভয়েরই স্থান আছে। তবে তাঁদের কর্মচঞ্চলতার ক্ষেত্র প্রায়শই এক নয়। নর যদি প্রাঙ্গণে নারী শোভাবৃদ্ধি করেন অঙ্গনে। কৃষিজীবী মানুষেরা যখন কৃষির কাজ পান না অথবা যখন তাঁদের কৃষির কাজ থাকে না তখন তাঁরা বিশ্বকর্মার দরবারে যান। গ্রামবাঙলার অর্থনীতি শিল্পায়নের দিক থেকে কুটির শিল্প নির্ভর। এই কুটিরশিল্পের উপকরণের জন্য কুটির শিল্পীকে বাইরে হাতড়াতে হয় না। গ্রামদেশের সহজলভ্য দ্রব্য সামগ্রী নিয়েই হয় তার অনবদ্য সৃষ্টি।

শিল্পের জন্য শিল্পচর্চা ছাড়াও ব্যবহারিক জগতকে সচল রাখার জন্য গ্রাম বাঙলায় সর্বদাই নানা সৌন্দর্য সামগ্রী ও দেশজ শিল্পের সৃষ্টি হয়ে আসছে। যেমন আলপনা। ইতিপূর্বে আলপনা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। এবং এ কথাও বোধহয় বলেছি যে আলপনা দেওয়ার স্থানটিকে প্রথমে পরিষ্কার করে নিতে হয়। পরে আতপ চালের পিটুলি দিয়ে একটা ন্যাকড়া ভিজিয়ে আলপনার রেখা টানতে হয়। সাধারণত মোটা দাগ কাটার সময় বুড়ো আঙুলের ডগা দিয়ে তা টানতে হয়। অনেক শিল্পী ন্যাকড়ার বদলে তুলো ব্যবহার করেন। আজকাল আবার অনেক জায়গায় তুলি দিয়ে আলপনা দেওয়া হয়। তুলির আলপনায় আধুনিক রঙও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কোন ঐতিহ্যপূর্ণ অনুষ্ঠানে বা দেবপূজা ও শুদ্ধ আচরণে ঐ আলপনা প্রায়শই অচল। সকলে তুলি দিয়ে আলপনা দিতে পারেন না। তুলির আলপনায় শিক্ষিত পটুত্বের এবং অনুশীলিত দক্ষতার প্রয়োজন।

ঘরোয়া আলপনা দিতে শিক্ষানবিশীর দরকার নেই। আলপনা হচ্ছে মনের কামনাকে রূপ দেবার বাহ্যিক আকৃতি। স্বচ্ছন্দে বাঙালীর মেয়ে মনের চিন্তাকে আলপনায় রূপ দেন। বিন্দু থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। আলপনারও সৃষ্টি এই বিন্দুকে কেন্দ্র করেই। আলপনার বৃত্ত এই বিন্দুরই বৃহৎ রূপ। অবশ্য আলপনা শুধু বৃত্তাকারেই দেওয়া হয় না। বৃত্তাকার, চৌকো, ত্রিকোণ, প্রভৃতি অবয়ব তার। আজকাল অনেক বিত্তবান ব্যক্তি বসবার ঘরে, ফুলদানির চারপাশে, সিঁড়ির কোনে কোনে আলপনা দিচ্ছেন। আধুনিক আলপনা শিল্পীদের অনেকেই আলপনার পুরানো ঢঙকে হুবহু নকল করতে রাজী হন না। তবে বিয়ে ও পুজোপার্বণের শঙ্খপদ্ম, মঙ্গলপদ্ম, চরণপদ্ম, শতদলপদ্ম, অষ্টদলপদ্ম, মীনপদ্ম, অষ্টকলসী, মঙ্গলকলসী, প্রভৃতি আলপনাঙ্কণে এখনও আধুনিক শিল্পীরা তেমন মাথা গলাতে পারছেন না। তথাপি জনচাহিদা মেটাতে গিয়ে অঙ্গনের শিল্পটি এখন প্রাঙ্গণে আসতে চাইছে। প্রাঙ্গণের নানাবিধ শিল্পের মধ্যে এখন আলপনা শিল্পও নিজেকে যুক্ত করে নিয়েছে।

বাঙলার নানাপ্রকার লোকশিল্পের মধ্যে আছে পোড়ামাটির অলঙ্কার, তুলসীর মালা, রুদ্রাক্ষের মালা প্রভৃতিও। নারকেলের ছোবড়ার ও শোলার সামগ্রী এবং পাপোষ, খসখস, ঝাঁটা নানাবিধ ধাতুশিল্প, লেপ, তোষক, বালাপোষ, ফুলকারী, গন্ধশিল্প, গৃহনির্মাণ ও তৎ সম্পর্কিত শিল্পাদি ছাতার বাট, বেত ও বাঁশের কাজ, টালি ইট প্রভৃতির প্রস্তুত কর্মেও লোক-শিল্পীর শ্রম আছে। সারা বাঙলায় ছড়িয়ে আছে আরও নানা লোকশিল্প কলা।

আদিবাসী, উপজাতি সমাজের মধ্যেও নানা শিল্পকলার চলন আছে। মাটির দেওয়ালে আলপনা দেওয়া আদিবাসী সমাজের অবশ্য কৃত্যের মধ্যে পড়ে। স্মরণীয়, আদিবাসী ও উপজাতি সমাজ ঐতিহ্যানুসারী হলেও একটু লক্ষ্য করলে বাঙলার প্রায় সমস্ত আদিবাসীর মধ্যে নাগরিকতার ছাপ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তাই দেখা যায় অরণ্যবাসী আদিম মানুষেরাও জামা জুতো পরেন। মেয়েরা অন্তর্বাস ব্যবহার করেন। টাবুর নিষেধে ওঁদের অনেকে অনেক কাজ থেকে এখন আর প্রতিহত হন না। সুতরাং, আমরা যাঁদের আদিবাসী বা উপজাতি বলেছি তাঁরা এ দেশের মৃত্তিকার সমবয়সী এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই। বর্তমান আদিবাসী, উপজাতি ও তপশীলীজাতি সমূহের মধ্যে নাগরিকতার ছোঁয়া লেগেছে। তাই অনেকে উপজাতীয়তা সত্ত্বেও উপজাতীয়ত্ব স্বীকার করতে চান না সরকারী দাক্ষিণ্য নেওয়ার সময়টুকু ছাড়া। এই আদিবাসীদের অনেকেই সরল গ্রাম্যসমাজের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করে একটি মিশ্র সমাজ গড়ে তুলেছেন।

যেমন লোকসমাজের মধ্যে তেমন আদিবাসীদের মধ্যেও একাধারে কেউ কৃষক। কেউ জমির মালিক। কেউ কৃষিজমির মালিক হয়েও নিজে চাষ করেন না। তাঁরা জোতদার। মধ্যস্বত্বভোগী, ভাগচাষী বা লাগাড়ে মুনিষ দিয়ে জমি চাষ করান। অনেক জোতদার আছেন যাঁরা নিজেরা চাষ না করলেও সরেজমিনে থেকে চাষবাসের তদারক করেন। আমাদের অধিকাংশ চাষীরই জমি নেই। থাকলেও তার পরিমাণ যৎসামান্য। তাঁদের কেউ বর্গাদার। কেউ ক্ষেত মজুর। বর্গাদার বলতে আমরা তাঁদের বোঝাতে চেয়েছি যাঁরা অপরের জমিতে চাষ করেন উৎপন্ন ফসলের ভাগ নেন। এই সম্প্রদায়কে কেউ বলেন বর্গাদার কেউ বলেন ভাগচাষী বা আধিয়ার। ক্ষেত মজুরদের মধ্যে যাঁরা ধানদাওয়া, ধানকাটার কাজ করেন তাঁরা দাওয়াল। যাঁরা ক্ষেতের ঘাস বাছাই বা নিড়ানের কাজ করেন তাঁরা বাছাউল। যাঁরা রোয়া লাগান তাঁরা বইটাল। মুনিষকে চাষবাস গোসেবা ছাড়াও মনিবের হাটবাজার ও অন্যান্য কাজ করতে হয়। সে বেতন খোরাকি ও পোষাক পায় মনিবের কাছে। যাঁরা রোজ হিসাবে কাজ করেন তাঁরা জন বা বদলা। শ্রম বিনিময়ের বদলে শুধুমাত্র ভুখ নিবারনের চেষ্টাই করেন না এঁরা, সময় সুযোগমত শিল্পের চর্চা করেন। চাষবাসের কাজ যখন থাকে না তখন দারু-কারুশিল্পের কাজে মত্ত হয়ে পড়েন।

বাঙলার বিভিন্ন শ্রেণীর লোকশিল্প এবং শিল্পীদের কথা প্রসঙ্গে আমরা একটু পিছনের দিকে তাকাব। খৃষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে বাঙলায় ব্রাহ্মণের সংখ্যা

বেড়ে যায়। তারপর থেকে তাঁরা বেড়েই চলেন। ব্রাহ্মণদের আগে থেকেই নানা বর্ণের মানুষ বাঙলায় বসবাস করতেন। বিভিন্ন বর্ণের নরনারীর মিলনে মিশ্রবর্ণের উৎপত্তি হয়েছে। বৃহদ্ধর্মপুরাণে উল্লেখ আছে ব্রাহ্মণ ছাড়া বাঙলার অন্যান্য বর্ণের লোকেরা সংকর। অবশ্য এখানে ব্রাহ্মণের আমিষ খাওয়ার বিধান আছে। আর্যাবর্তের অন্যত্র ব্রাহ্মণ নিরামিষাশী। বাঙলায় চতুর্বর্ণের বদলে ছত্রিশ জাতির কথা আছে। এবং ব্রাহ্মণেতর সমুদয় লোককে ছত্রিশটি শূদ্র জাতিতে বিভক্ত করা হয়েছে। এই ছত্রিশ জাতির লোকেরা হচ্ছেন—করণ, অম্বষ্ঠ, উগ্র, মাগধ, তন্তুবায়, গান্ধিকবণিক, নাপিত, গোপ, (লেখক), কর্মকার, তৌলিক, (সুপারী ব্যবসায়ী), কুম্ভকার, কংসকার, শঙ্খিক, দাস (কৃষিজীবী), বারুজীবী, মোদক, মালাকর, সূত, রাজপুত্র ও তাম্বুলী (উত্তম সংকর); তক্ষণ, রজক, স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, আভির, তৈলকার, ধীবর, শৌণ্ডিক, নট, শাবাক, শেখর, জালিক, (মধ্যম সংকর); ও মলেগ্রহি, কুড়ব, চণ্ডাল, বরুড়, তক্ষ, চর্মকার, ঘট্টজীবী, ডোলাবাহী, ও মল্ল (অধম সংকর)। এদের কেউই বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত নয়। লক্ষণীয়, গ্রন্থে ছত্রিশ জাতির কথা বলা হয়েছে কিন্তু তালিকায় পাঁচটি নাম বেশী আছে। সম্ভবত তা পরবর্তী কালের সংযোজন। উপরের উত্তম, মধ্যম ও অধম সংকরভুক্ত বর্ণের অধিকাংশই এখন বাঙলায় সুপরিচিত জাতি। বৃহদ্ধর্মপুরাণ মতে করণ ও অম্বষ্ঠ সংকর বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অম্বষ্ঠগণ চিকিৎসা ব্যবসা করতেন এবং করণগণ করতেন লিপিকরের কাজ। এই করণই পরে কায়স্থ জাতিতে পরিণত হয়েছে বাঙলায়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে মিশ্রবর্ণের যে তালিকা আছে তার সঙ্গে বৃহদ্ধর্মের তালিকার প্রভেদ খুব সামান্য। ব্রহ্মবৈবর্তে প্রথমে গোপ, নাপিত, ভিল্ল, মোদক, কূবর, স্বর্ণকার, ও তাম্বুলী জাতীয়দের সৎশূদ্র বলে অভিহিত করা হয়েছে। তারপর করণ ও অম্বষ্ঠ। এবং তারও পর নবশাখ সম্প্রদায়। নবশাখ সম্প্রদায়ের মধ্যে মালাকর, কর্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দক (তন্তুবায়), কুম্ভকার ও কংসকার—এই ছয়টি সম্প্রদায় উত্তম শিল্পী জাত। কিন্তু স্বর্ণচুরির জন্য স্বর্ণকার ও কর্তব্যে অবহেলার জন্য সূত্রধর ও চিত্রকর ব্রহ্মশাপে পতিত হয়েছেন। নবশাখ সম্প্রদায় পরে আরও পাঁচটি অর্থাৎ চৌদ্দটি সম্প্রদায়কে আশ্রয় দেয়। এরা তেলী, নাপিত, বারুই, গন্ধবণিক ও তাঁতী। কোন কোন তালিকায় সুবর্ণবণিকদের বাদ দেওয়া হয়েছে, বদলে এসেছে কুড়িময়রা। কোন কোন তালিকায় সাহা সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে নাপিতকে নেওয়া হয়েছে। যদিও নাপিত 'সৎশূদ্র' তালিকাভুক্ত নয় অথবা বাণিজ্যিক জাতিও নয়। পূর্ববঙ্গে যাঁরা সাহা পশ্চিমবঙ্গে তাঁরাই

শুঁড়ি। বাঙলায় মিশ্রবর্ণের সংখ্যা এত অধিক যে তার সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা অতিশয় কষ্টসাধ্য। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, কিছু কিছু ব্যক্তি আছেন যাঁরা পদবীকে সম্প্রদায় হিসাবে ব্যবহার করেন। যেমন প্রামাণিক,পোদ্দার প্রভৃতি। ব্রাহ্মণেতর, সংকর তথা অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে ব্যাধ, ভড়, কোল, কোঞ্চ, হড্ডি, ডোম, জোলা, চণ্ডাল,বাগদি প্রভৃতি নীচুজাতির সব লোকেরাই আছেন। এঁরা বাঙলারই বাসিন্দা। বাঙলায় প্রত্যেকটি জাতির নির্দিষ্ট বৃত্তি, ও নির্দিষ্ট শিল্প চর্চার বিধান ছিল বা আছে। যদিও তা কঠোরভাবে মানা হত বা হয় এমন মনে করার কারণ নেই। কারণ অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজনযাজন ব্রাহ্মণদের নির্দিষ্ট কর্ম। কিন্তু সমসাময়িক লিপিতে জানা যায় যে ব্রাহ্মণেরা প্রাচীনকালে রাজ্য শাসন ও যুদ্ধ-বিভাগে কাজ করতেন। অপরাপর জাতির ব্যক্তিরাও তাঁদের বৃত্তি বহির্ভূত কাজ করতেন। অবসর সময়ে অনেকেই কোন না কোন শিল্পের সাধনায় সময় ব্যয় করতেন। শিল্প বলতে আমরা শিল্প ও কলার সমস্ত বিভাগকেই বোঝাতে চেয়েছি। বাঙালীর শিল্পকর্ম ও শিল্প সচেতনতার কথা বলতে এসে বাঙালী জাতি সম্পর্কিত কিছু আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। বাঙালী জাতি সম্পর্কিত যে কোন আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য যদি বাঙালীর বিন্যাস আলোচনায় বাঙালী মুসলমানের কথা না থাকে। সকলেই জানেন যে বাঙালী মুসলমানদের প্রায় সকলেই হিন্দুদের বংশধর। অনেকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য মুসলমান হয়েছেন। অনেকে হিন্দু অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে মুসলমান হয়েছেন। যেসব আফগান, আরব, ইরানি ও তুর্কী এদেশে বিজেতারূপে এসেছিলেন এক পাঞ্জাব ভিন্ন অন্যত্র তাঁদের বংশধরের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। পাঞ্জাবেও বিদেশীর বংশধরদের সংখ্যা শতকরা পনের জনের বেশী হবে না। বাঙালী মুসলমানদের অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর হিন্দু কৃষিজীবী। সামাজিক অনুদারতা ও নিপীড়নে মধ্যম ও অধম সংকর জাতির অধিকাংশই মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছেন। শেখ মুসলমানগণ সকলকে নমঃশূদ্র ও পোদ এই দুই জাতির বংশধর বলে মনে করা হয়। মধ্যযুগে হিন্দুগণ দলে দলে মুসলমান হয়েছেন। উভয়ের ধমনীতে তাই একই রক্ত প্রবাহিত। নৃতাত্ত্বিক গবেষকদের গবেষণায়ও সে তথ্য স্পষ্ট। কি ভাবে মিশ্রবর্ণের বাঙালীর সৃষ্টি হয়েছে, কি ভাবে একই রক্ত শিরায় উপশিরায় প্রবাহিত হওয়া সত্ত্বেও দ্বিজাতিতত্ত্বের তাড়নায় বাঙালী জাতি দুটো পৃথক জাতিতে, পৃথক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে মারামারি, রেষারেষি করে চলেছে তা জানা যাবে রক্তের আলোচনায়। তাই এখানে আমরা বাঙালীর রক্ত সম্পর্কিত

কিছু তথ্য পেশ করতে চাই, বাঙালী সম্পর্কিত অন্যান্য বৃত্তান্ত, বাঙালীর লোক শিল্প এবং পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কিত আলোচনার পূর্বে। বাঙালীর জাতিতত্ত্বের আলোচনায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পণ্ডিত ও গবেষক তাঁদের নিপুণ গবেষণা ও প্রজ্ঞা দ্বারা নানা তথ্য আমাদের কাছে পূর্ণরূপে উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু বাঙালীর রক্ত বিষয়ক আলোচনায় এ যাবৎ সে পূর্ণতা আসে নি, যা এসেছে সমাজ বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে। নৃ-বিজ্ঞানীরা রক্ত সম্পর্কিত আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠিকে প্রধানত চারটি রক্তদল বা Blood group এ বিভক্ত করেছেন। এই দল বা গ্রুপগুলো যথাক্রমে 'ও', 'এ' 'বি' এবং 'এবি' নামে পরিচিত এবং এক কথায় বলা হয় 'এবিও'। নৃ-বিজ্ঞানীরা অধিকাংশ জাতি-উপজাতি ভিত্তিক রক্ত সম্পর্কিত আলোচনা 'এবিও' রক্তদলের পরিপ্রেক্ষিতেই করেছেন। নৃ-বিজ্ঞানের প্রসারে 'এবিও' দলের মধ্যে আবার উপদলের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন $এ_১$ ও $এ_২$, তাছাড়া 'এম.', 'এন', 'এমএন', 'আরএইচ' প্রভৃতি এই সমস্ত রক্তদল ও উপদলের উপর বর্তমানে নানাপ্রকার গবেষণা হয়ে চলেছে। জাতির উৎপত্তি ও গঠনপ্রণালী এবং প্রজননে এই সকল রক্তের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এখন। বাঙালী জাতির কাঠামো নির্ধারণে বা বিন্যাসে এই রক্ত-সমীক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। বাঙালীর রক্ত সম্পর্কিত অথবা নৃ-ভিত্তিক আলোচনায় রিজলে সাহেব ছিলেন পুরোভাগে। তাঁর অনুসন্ধান শারীরিক গঠন এবং বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকার-আকৃতির উপর কেন্দ্রীভূত ছিল। বাঙালীর জাতিতত্ত্বের গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে রক্তবিষয়ক বিভিন্ন সম্পর্কের অবতারণা সেদিন হতে চলে আসছে। তবে সেসব আলোচনায় রক্তদল বা রক্ত বিষয়ের উপর কোন বিজ্ঞানভিত্তিক সারস্বতচর্চা সম্ভব হয়নি। অনেক সময় বাঙালীর মধ্যে মঙ্গোলীয় রক্ত, ভেড্ডিড রক্ত প্রভৃতির প্রভাবের বিষয় আলোচিত হয়েছে। কিন্তু এই রক্তের ধারা ও প্রকৃতি অন্বেষণ এবং বাঙালী জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে তার ক্রিয়া-বিক্রিয়ার উপর আলোকপাত করা সম্ভব হয়নি। শারীর বিজ্ঞানের অনুসন্ধানমূলক তথ্যাবলীর মূল্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল জাতি-উপজাতির সমূহের দৈহিক আকৃতি-প্রকৃতির সঙ্গে রক্তদলের কিছু সম্পর্ক বিদ্যমান। বাঙালীদের উপর এই রক্তদল বিষয়ক অনুসন্ধান খুব কমই হয়েছে। বর্তমানে কিছু কিছু হচ্ছে। ১৯৪৫ সনে বঙ্গদেশ নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষায় অবিভক্ত বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ডঃ ডি. এন. মজুমদারের নেতৃত্বে যে সমীক্ষা চলেছিল তাতে বাঙালীর রক্তদল সম্পর্কিত কিছু তথ্য অবগত হওয়া গেছে। এই রক্তদল

আলোচনা ABO সংক্রান্ত দল বা গ্রুপের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সর্ব মোট ২১১৪ জন বাঙালীর রক্ত পরীক্ষা হয় এবং তার সাহায্যে বিভিন্ন জাতি, বর্ণ, উপজাতির পারস্পরিক সম্পর্কের ধারার প্রতি আলোচনা করা হয়। মোট ১০টি জাতির মধ্যে এই সমীক্ষা চালান হয় এবং তাদের বিভিন্ন রক্তদলের শতাংশের উপস্থিতি আলোচিত হয়। নিম্নলিখিত তালিকায় সমীক্ষার ফলাফল দেওয়া হল :

বাঙালীর রক্ত বিষয়ক নক্সা নং—১৬

জাতিগোষ্ঠীর বিবরণ	সমীক্ষিত জনগণ	'ও' রক্তদল	'এ' রক্তদল	'বি' রক্তদল	'এ বি' রক্তদল
১। কায়স্থ	৪০২	৩২·৪২	২৬·১০	৩৩·২৪	৮·২৪
২। ব্রাহ্মণ	৩৫৮	৩৪·১৮	২১·১০	৩৪·৪৪	৯·২৮
৩। মুসলমান	১৯৫	৩৩·৪৬	২৬·৯২	৩০·৩৮	৯·২৩
৪। নমশূদ্র	২০৮	৩৫·২৫	২২·৪৫	৩১·৮৫	১০·৪৪
৫। শিল্পগোষ্ঠী	২৪৬	৩৫·৯৭	২০·১৪	৩৩·৮১	১০·০৭
৬। বৈদ্য	২০৫	৩৩·৬৮	২৮·৪২	২৭·৩৭	১০·৫৩
৭। বণিক	১৬০	২৮·৮৪	২৫·০০	২৮·৮৫	১৭·৩১
৮। রিসি	১৩৬	২৩·৬১	২৫·০০	৪০·২৮	১১·১১
৯। গারো	১১৬	২৬·৭৬	২৩·৯৪	৩৮·০৩	১১·২৭
১০। শঙ্খবণিক	৮৮	১৯·৫৯	৩৯·১৮	২৮·৮৭	১২·৩৭

এই রক্তদল সম্পর্কিত সমীক্ষায় লক্ষ্য করা হয়েছে যে বাঙলার অনুন্নত জাতি সমূহের মধ্যে 'বি' দলের রক্তের উপস্থিতি খুবই বেশী। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও এই 'বি' দলের প্রাধান্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বাঙালী মুসলমানদের রক্তদল বিভিন্নরূপী। এই সম্প্রদায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুন্নত জাতি উপজাতি গোষ্ঠী থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। সারা বাঙলায় রক্তদলের সমীক্ষার পর ডঃ মজুমদার মন্তব্য করেছেন যে যদিও তাঁরা জাতি উপজাতি গোষ্ঠীভিত্তিক রক্তদল সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছেন তবুও দেখা গেছে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে, বিশেষ করে উচ্চবর্ণের ক্ষেত্রে, পদবীর মধ্যে সকল সময়ে জাতির উৎপত্তি সম্পর্কিত বিষয়ের সূত্র পাওয়া যায় না। পরে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

এই ABO ব্যতীত ডঃ দিলীপকুমার সেন আরও বিভিন্ন প্রকার রক্তদল দিয়ে কিছু অনুসন্ধান করেছিলেন। তাঁর অনুসন্ধান বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী এবং

সম্প্রদায়ের মধ্যে বংশ ও জাতিতাত্ত্বিক সম্পর্কের ধারার প্রতি আলোকপাত করে। এ ছাড়া ইউরোপে বসবাসকারী বাঙালী ব্রাহ্মণ কায়স্থ এবং বৈদ্য সমাজের লোকদের সম্পর্কে তাঁর আলোচনাটিও উল্লেখযোগ্য। সর্বমোট ৫৪৫ জনের রক্ত পরীক্ষা করার পর তিনি নিম্নলিখিত ফলাফল প্রকাশ করেন :

· বাঙালীর রক্তদল নক্সা—১৭

জাতিগোষ্ঠী—	'ও' দল	এ১ দল	এ২ দল	বি দল	এ১ বি দল	এ২ বি দল	মোট
ব্রাহ্মণ	৩৮'৩০	২০'২১	২'১৩	৩২'৯৮	৫'৮৫	০'৫৩	১৮৮
কায়স্থ	৩৭'১৭	২৪'১৬	২.৯৭	২৯'৩৭	৪'০৯	২'২৩	২৬৯
বৈদ্য	৩১'৪২	২৫'০০	৬'৪২	২৫'০০	: ১'৩৬	—	৮৮
অন্যান্য	১৯'১৩	২৬'৩১	১'৭৫	৪২'১১	৮'৭৭	১'৭৫	৫৭

বাঙালীর রক্ত সমীক্ষায় নৃ-বিজ্ঞানীরা নানা গবেষণা করে চলেছেন। তাঁদের সর্বাধুনিক গবেষণার ফলাফল যতদিন পর্যন্ত আমরা জানতে না পারছি ততদিন পর্যন্ত বাঙালী জাতি গঠনের ভিত্তি হিসাবে রক্তদলের এই পর্যন্তই আমাদের জ্ঞান। কোন জাতিকে সম্যকরূপে জানতে গেলে তার রক্তদল সম্পর্কিত জ্ঞান আবশ্যিক। রক্ত, মাংস, অস্থি ও মজ্জা নিয়ে যে মানুষ তার গোটা জীবন রক্তদল নিয়ন্ত্রিত। তাই কোন ব্যক্তি অপরাধমূলক বা অন্যায় কাজ করলে লোকসমাজের সকলেই তাকে লক্ষ্য করে বলেন যে লোকটার রক্তের দোষ আছে। এবং শিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁদের ধারণা, সৎ বংশের রক্ত প্রবাহিত ধমণীতে সৎ বংশের বংশধরেরা সৎ না হয়ে পারেন না। এই ধারণা থেকেই ঐতিহ্যবান কোন শিল্পী বা বৃত্তিধারী ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য : রক্তের সঙ্গে বৃত্তি বা শিল্পসচেতনতা মিশে আছে। এই ধারণা কতটা বিজ্ঞানসিদ্ধ তা জানতে হলে নৃ-বিজ্ঞানী ও রক্তের গবেষকদের দ্বারস্থ না হয়ে উপায় নেই। রক্তদলের সঙ্গে সমাজ সচেতনতা আহার-বিহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, শিল্পকলা ইত্যাদির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এই রক্তমিশ্রণের ফলেই বাঙলায় মিশ্রবর্ণ এবং মিশ্রজাতির উৎপত্তি হয়েছে। সকলেই জানেন যে বহির্ভারতের মুঘলেরা পূর্বে বৌদ্ধ ছিলেন (Ross—*Islam* p.53)। চেঙ্গিস খাঁ মুসলমান ছিলেন না। মুঘল সম্রাটদের কুবলাই খাঁ চীনে বৌদ্ধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন (Browne—*Literary History of Persia*, vol. II) কুবলাইয়ের ভ্রাতা হলাকু খাঁ ১২৮৫ খৃষ্টাব্দে বাগদাদ লুণ্ঠন করেন (প্রাগুক্ত গ্রন্থ)। পারস্য দেশ জয় করার পর মুঘলেরা ইসলামধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং হলাকু খাঁর প্র-পৌত্র গজন খাঁই প্রথমে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন

(Levy—Persian literature p. 53)। ভারতবর্ষের মুঘলেরা মুসলমানই ছিলেন। কিন্তু মৌলিক বৌদ্ধধর্মের প্রতি দীর্ঘদিন তাঁরা আকৃষ্ট ছিলেন। হুমায়ুন নিরামিষাহার অবলম্বন করেছিলেন। আকবর নাকি যজ্ঞ করতেন ও গোহত্যা নিষেধ করে দিয়েছিলেন। দারাশিকো নিরন্তর বেদান্ত পাঠে মগ্ন থাকতেন। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে দারাশিকোর প্রচেষ্টায় পঞ্চাশখানি উপনিষদ সংস্কৃত থেকে পারসিক ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। (চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন, রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্র)। মুর্শিদকুলি খাঁ ব্রাহ্মণ ছিলেন পরে মুসলমান হন (মৈত্রেয় অক্ষয়কুমার, "মীরকাশিম")। মৌলবী সেরাজ-উল হক বলেছেন—"বাঙলার মুসলমানদিগের মধ্যে সামান্য সংখ্যক মোগল, পাঠান ও খাঁটি সৈয়দের সন্তান ব্যতীত আর কারো মনে স্বাধীনতার ভাব, আত্মমর্যাদা, আত্মগৌরব, আত্মসম্ভ্রম-শীলতা নেই। অথচ বাঙলার লক্ষ লক্ষ নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের ভিতর সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, জাঠ, রাজপুতের রক্তপ্রবাহ বিদ্যমান। সুতরাং তাদের সম্মুখে প্রাচীন হিন্দুর বেদ বেদান্ত উপনিষদ আয়ুর্বেদ জ্যোতিষ কাব্য মহাকাব্য দর্শন এবং বিজ্ঞান রচনার জ্ঞানের যে গৌরব সে গৌরবের কাছে প্রাচীন গ্রীক ব্যতীত প্রাচীন ফিনিসিয়া মিডিয়া জুডিয়া বাকট্রিয়া কার্থেজ রোম মিশর কালডিয়া ট্রয় ব্যাবিলনিয়া ও পার্থিয়া প্রভৃতি সকলেরই মাথা নত। অথচ সেই প্রাচীন ভারতের সেই গৌরবের মহাজ্যোতি হইতে দেশীয় মুসলমানদিগকে বঞ্চিত করলে মুসলমান কখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না"। মৌলানা আকরম খাঁ বলেছেন—"এই ভারতবর্ষ হিন্দুর ন্যায় মুছলমানেরও মাতৃভূমি। যুগ যুগ অতিবাহিত করে এ দেশের সুখদুঃখ হাসিকান্নার সঙ্গে আমরা নিজেদিগকে মিশিয়ে দিয়েছি। দুনিয়ার অন্য সমস্ত দেশে আমরা বিদেশী। একমাত্র এই ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে আমি জোর করে বলি—এই আমার দেশ, এই ভূমি আমার মাতৃভূমি"। হিন্দু-বৌদ্ধ ও মুসলমানদের রক্তের মিশ্রণে গঠিত ভারতীয় মুসলমান জাতিভেদে বিভক্ত। স্যার এডওয়ার্ড গেইট মুসলমানদের ভিতর ৫৫টি বিভিন্ন জাতির নাম উল্লেখ করেছেন। ১৩৩৪ (১৯২৭) সনে মোহম্মদ ইয়াকুব আলীর "মুসলমানের জাতিভেদ" গ্রন্থে জানা যায় যে তাদের মধ্যে অন্তত ৮০ প্রকার জাত আছে। তিনি লিখেছেন: "১৯১১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারী বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বঙ্গদেশীয় কর্তৃপক্ষ মুসলমানদিগকে শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ ৮০ প্রকার জাতিতে বিভক্ত করিয়া ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকসংখ্যা ও তাঁহাদের জাতি নির্ধারণ করিয়াছেন⋯ মুসলমানগণের

মধ্যে বিশ্বাস মণ্ডল প্রামাণিক প্রভৃতি হিন্দু আখ্যারও প্রচলন রহিয়াছে… জোলা, কলু, চাষা প্রভৃতি ব্যবসামূলক আখ্যাও বিধর্মীর হীন জাত্যার্থে মুসলমান সমাজে ব্যবহৃত হইতেছে, …কোন কোন স্থলে ইহাও পরিলক্ষিত হয় যে, বংশাভিমানী মুসলমানগণ বিদ্যাশিক্ষার্থী মুসলমান ছাত্রদিগকে জায়গীর দান করিয়া কালক্রমে তাহাদিগকে চাষা, নিকারী, কলু বা জোলার সন্তান জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া আপন আপন বংশগৌরব বা শরিয়ত রক্ষা করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, যে আলেমগণ নবি করিমের খলিফা বলিয়া হাদিস শরীফে বর্ণিত হইয়াছেন সেই আলেমগণ কৃষি শিল্প ব্যবসায়জীবীর বংশসম্ভূত হওয়ায় তাহারা তাঁহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়িতেও অসম্মত হয়।'' এই ভেদবোধ ইসলামের সমন্বয় সাধনাকেও পঙ্গু করেছে। পঙ্গু করেছে হিন্দুর সার্বজনীন বোধশক্তিকে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ের প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন। তা হচ্ছে বাঙালীর পদবী ব্যবহার। রক্তের সঙ্গে পদবীর সম্পর্ক আছে। মুসলমান আমলে হিন্দু মুসলমানের চাকুরীর পদ অনুযায়ী অনেক পদবী সৃষ্টি হয়, এই পদবী দেখে পদবীধারী হিন্দু না মুসলমান তা চেনা মুশকিল। যেমন খাসনবিশ, সরকার প্রভৃতি। বাঙলার বহু উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক গোত্র অনুযায়ী পদবী ঠিক করেন। ওদের মধ্যে সর্দার শব্দটি বিশেষ জনপ্রিয়। সাঁওতাল সর্দারকে বলা হয় মাঝি। অতীতের চিহ্ন হিসাবে আজও বাঙলার উপজাতিদের মধ্যে ঘোড়া, হাতি, বাগ (বাঘ) নাগ, আটা, আলু, মূলো, পান, কলা, গুড়, মেটে, মাঝি, কাঁঠাল প্রভৃতি পদবী চালু আছে। বর্তমান বাঙলার তপশীলী ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে পদবী বদলানো একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা পূর্ব পদবী বদল করে প্রায়ই রায়, বিশ্বাস, দাস, সরকার, মণ্ডল প্রভৃতি পদবী গ্রহণ করছেন কোর্টে এফিডেবিট করে। অনেক সময় পদবী অপেক্ষা পেশা বেশী জনপ্রিয় হয়। তাই উমাপদ সেন উমাপদ কবিরাজ নামেই সমধিক পরিচিত। তেমনি হরিপদ দত্ত হরিপদ উকিল হিসাবে হয়ত অধিক জনপ্রিয়। বাঙালীর বিভিন্ন পদবী দেওয়ান, তালুকদার, মহলানবিশ, পত্রনবিশ, বক্সি, তফাদার, চৌকিদার তরফদার, দস্তিদার, কানুনগো, জোয়ারদার, মুস্তাফী, সরখেল, মুন্সি খাঁ, কয়াল, মোক্তায়েক চাকলাদার প্রভৃতি। তা ছাড়া জাতিগত পেশা ও জীবিকার পন্থাও ব্যক্তিবিশেষের নিজ নিজ পদবী গ্রহণের নিয়ামক। যেমন কর্মকার, ঢালী ঢুলী, বণিক, ব্যাপারী, মিস্ত্রী, ঘটক, মালাকর, চিত্রকর, স্বর্ণকর, করণ, রণিক,

খাঁমি, দালাল, ঢোল প্রভৃতি। এই সব পদবীযুক্ত ব্যক্তিদের অনেকেই এখন পদবী পরিবর্তন করছেন। যেমন সরদার হচ্ছেন সরকার, মিস্ত্রী হচ্ছেন মিত্র, মাল হচ্ছেন মল্লিক প্রভৃতি। বাঙলায় প্রচলিত অনেক পদবী পাশাপাশি রাজ্য থেকেও এসেছে। যেমন উড়িষ্যা থেকে এসেছে পাণ্ডা, রথ, মহান্তি, তলাপাত্র, মহাপাত্র নায়ক, ভক্ত প্রভৃতি; তেমনি বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছে, মিশ্র, ঝা, দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, চতুর্বেদী, খাটুয়া, শেঠ, গিরিধারী প্রভৃতি; আসাম থেকে এসেছে বড়ুয়া, দলুই, শর্মা; গুজরাট-রাজস্থান থেকে এসেছে রাউত, নাহার, সানি (সাহানি) প্রভৃতি। পাঞ্জাব থেকে এসেছে সিং, বাজাজ প্রভৃতি। উপরের পদবীগুলো বাঙলার নিজস্ব পদবী নয়। কিন্তু মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় গঙ্গোপাধ্যায়, মৈত্র, লাহিড়ী, বাগচী, গোস্বামী, চক্রবর্তী, বন্দ্যোপাধ্যায়, ঘোষ, বসু, দত্ত, মিত্র, পাল, সেন, বর্মন নন্দী, দাস, ভদ্র, দেব, কুণ্ডু, সাহা, আঢ্য, পালিত, চন্দ্র, দাঁ, গুপ্ত, রুদ্র, শীল, ধর, কর, দে প্রভৃতি বাঙলার নিজস্ব পদবী। পূর্বে ব্রাহ্মণেরা কোন পদবী ব্যবহার করতেন না। তাঁরা স্বামী, ভট্ট, চট্ট, বন্দ্যো প্রভৃতি গাঁয়ের নাম অনুযায়ী চিহ্নিত হতেন। ক্রমে ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেক পদবীর আমদানী হয়। তাঁদের পদবীর কতকগুলো রাজা বা রাজস্থানীয় ব্যক্তিদের দেওয়া। যেমন 'ভারতী, শাস্ত্রী, আচার্য, ব্রহ্মচারী, বাচস্পতি, দৈবজ্ঞ, প্রভৃতি। বাঙালী সমাজের প্রচলিত আরও কতগুলি পদবী হচ্ছে—নাহা, রাহা, বসাক, ভাদুড়ী, হোড়, ভড়, বিশী, সুর, পাড়ুই, শ্রীমানী, নস্কর, শী, কুলে, গোল, বারিক, কুশারী, মাইতি, নাথ, দেবনাথ, বেরা, আইচ, ভঞ্জ, মল্লিক, গুঁই, সাঁই, সাপুঁই, সাঁপুরা, আদক, কোলে, খাড়া, ধাড়া, চক্রবর্তী, প্রভৃতি। বাঙলার নগর, শহর, মহকুমা, থানা, গ্রাম সর্বত্রই এই সব পদবীধারী বাঙালীর ভীড়। সর্বত্রই এই বৃহৎ বাঙালী সমাজ নানাভাবে বাঙলার শিল্পের পৃষ্ঠ-পোষকতা করে চলেছেন। বাঙলা ও বাঙালীর বিন্যাস, রক্ত দল, জাতিতত্ত্ব ও বহুমুখী কর্মচাঞ্চল্য, সংস্কৃতি, শিল্পসচেতনতা এবং সভ্যতার কথা বলতে গিয়ে আমরা অনেক কথাই বলে ফেলেছি। তাই বাহুল্য মনে হলেও, সমাজ বিজ্ঞানীরা সংস্কৃতির অপরাপর দিক যেমন পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি নিয়ে যে গবেষণা করে যাচ্ছেন, সমাজ ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে, দেশজ সাহিত্য থেকে সে সম্পর্কে আরও কিছু বিবরণ পাঠকদের কাছে পেশ করা যেতে পারে। পেশ করা যায় কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকে বিবাহ-উৎসবে মেয়েদের সাজ-সজ্জার বর্ণনা—'কর্ণমূলে পড়িল সুবর্ণকাণবালা।...শ্রবণ যুগলে দোলে কাহার কুণ্ডল, হেরি শোভা চমকিত যুবক মণ্ডল। ভালেতে শোভিছে ভাল কারো স্বর্ণস্মিতি, যাহা হেরি যুবজনগণের বিস্মৃতি। মুক্তাফলে শোভা পায় যাহার নাসিকা,

বোধ হয় সেই নারী নিতান্ত রসিকা। কেহ করে পরে দিব্য সুবর্ণ বলয়, তড়িতে জড়িত যেন নব কিশলয়। বাহুতে ধারণ করে কেহ বা কেয়ূর, হেরি সৌদামিনী বোধে হর্ষিত ময়ূর। কেহ কণ্ঠে পরে ডায়মোনকাটা চিক, দেখিতে অপূর্ব যাহা করে চিক চিক। পরিল গলেতে কেহ মণিময় হার, অম্বরে সম্বৃত তবু বাহিরে বাহার। রত্নের অঙ্গুরী কেহ যত্ন করে পরে, আপন সম্পদ কিছু দেখাইতে পারে। কোন নারী নিতম্বে ধরিল চন্দ্রহার, বিরহি যুবার মন করিতে সংহার। কাহার চরণে ঢেউতরঙ্গের মল, রজত নির্মিত যাহা অতি সুনির্মল। কেহ বা খোঁপার মাঝে গুঁজিয়া গোলাপ, কোকিল কুণ্ঠিত কণ্ঠে করিছে আলাপ।' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন—'নারীর কোমলগাত্র, মদনের সুরাপাত্র, তাহার উপর মাত্র নয়নের তাক। বসনে বিচিত্র সাজ, কাবায় রঙ্গিল কাজ, শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ, ঢেকে রাখ টাক্।'

বাঙালী নর ধুতি পরিধান করেন। নারীর পরিধেয় শাড়ি। প্রাচীনকালে ধুতি বা শাড়ি পরিধানের নিমিত্তে যত সরলতা থেকে থাকুক না কেন, ক্রমে ধুতি ও শাড়ি নানা ফ্যাসনের সামগ্রী হয়ে দাঁড়ায়। পোষাকের বিচিত্র জগতে বিচিত্র পরিবর্তন প্রায় রূপকথার সামিল। সোনার কাঠির ছোঁয়ায় ঘুমন্ত রাজকুমারী জেগে ওঠে তার শিয়রের পাশে। অচিনদেশের রাজকুমারকে দেখে যত না অবাক হয়েছিল আমাদের আজকের বিস্ময় তার চেয়েও বেশী। মানুষ হরবখত রূপ বদলাচ্ছে। চলেছে মনমজানোর অবিরাম প্রয়াস। সর্বত্রই রূপ-রস-বৈচিত্র্যের অজস্র সম্ভার। ছালবাকলের দিন সুদূর অতীত। এখন ফ্যাসানের পাল্লা। জীবনের মান উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে আসে জামা কাপড় সম্পর্কে নানারূপ শিল্পবোধ। একটি লৌকিক অর্থাৎ লোক সমাজের বিয়ে উপলক্ষে কনেকে সাজাবার ব্যাপারেও তা লক্ষ্য করা যায়। যেমন—"পরথমে পৈরাইল শাড়ি নাম গঙ্গাজল। নউখের উপর তুললে শাড়ি করে টলমল। সেই শাড়ি পইর‍্যা কন্যা শাড়ির পানে চায়। অইল না তার মনের মত দাসীরে পৈরায়। তারপর পৈরাইল শাড়ি নাম 'মুক্তামণি', সাত রাজার ধন লাগ্‌গ্যাছে শাড়ির গাঁথুনি। সেই শাড়ি পৈরাইয়া কন্যা শাড়ির প্যানে চায়, দিল-মন না খুশী হইল খুলাইয়া ফালায়। তারপর পৈরাইল শাড়ি তার নাম কেঁও। শাড়ির মধ্যে আঁক্‌কিয়া থুইছে বিয়াল্লিশ গণ্ডা গাঁও। চাঁটগাঁও, সোনার গাঁও, হরিপুর মধুপুর লিখছে থরে থরে, কত পক্ষির নাম লেইখ্‌খ্যাছে শাড়ির কিনারে। দুইগল খঞ্জন লেইখখ্যা থইছে যার বুক কালা। কুসুমপক্ষী লেখ্‌খ্যা থইছে রাও শুনিতে ভালা। কুঁড়া পক্ষী লেইখ্যা থইছে টুল্লুর টুল্লুর করে। কানীবগা থইছে আঁইক্যা গাল

ফুলাইয়া মরে। শাড়ির মধ্যে লেইখখ্যা থইছে ভালা ভালা গাঁও। শাড়ির মধ্যে লেইখখ্যা থইছে সাউধে ভরা নাও। আর এক শাড়ি তুল্ল্যা রাখছে 'আছমান-তারা' নাম। লতাপাতা আঁকছে কত নবিসিন্দা কাম। সাতিয়া পরিয়া কইন্যা রূপের পানে চায়। চান সুরুজ লইজ্যা পাইয়া আবের নীচে যায়। এর পরে আইন্যা বাটা কন্যা মুখে দিল পান। ঘর তনে বাইর অইল পুণ্যিমায়ের চান। কন্যার রূপে চুনইয়াই আলো আন্ধাইর গেল দূরে। ফুল ফইট্যাছে লাখে লাখে মন-ভমরা উড়ে' ইত্যাদি। মনোরম দেশজ বর্ণনায় সাজ-পোষাকের বিবরণ।

বাঙালীর ছেলেদের পোষাকেও এখন বিপ্লব এসেছে। কাউবয় প্যান্ট আর পয়েন্টেড স্যুতে ছেলেরা গটগটিয়ে এগিয়ে চলেছে। সব কিছুতেই আজকাল ছিমছাম থাকতে হবে। পোষাকের ব্যাপারে একথা সর্বাগ্রে প্রযোজ্য। অনেকেই চায় মেয়েরা সাজগোজ করুক। তাদের দেহ সৌন্দর্য প্রকাশ পাক। এবং হাল্কা চালে চলতে অভ্যস্ত হোক। তাই নতুনের ফ্যাসানে যে-ই বরতনুশোভিত হয় অমনি সে সকলের মন কেড়ে নেয়। তাই এখন 'টপলেস' আর 'লোকাট' বঙ্গললনাদের অনেকেরই কাছেই পরমপ্রিয়। শহরের অনেক বাঙালীর ঘরেই আজ ফুলস্লীভ ব্লাউজ বাক্স প্যাটারায় বন্দী। উৎসব অনুষ্ঠানে তাদের সাক্ষ্য মেলে। স্লীভ বাদ দিলে আর সবই নবীকরণ। বরং 'থ্রিকোয়ার্টার্স' ব্লাউজ এদিক থেকে অনেকখানি মহিমান্বিত। 'লোকাটে'র ব্লাউজের দিকে আজকাল অনেকেই ঝুঁকেছেন। যদিও স্বীকার করতেই হবে যে ফ্যাসানের রাজ্যে কারো কায়েমী স্বত্ব নেই। দেহ-সৌন্দর্য প্রকাশে রুচিশীল মেয়েদের আগ্রহ এত বেশী যে প্রচণ্ড শীতেও তাঁরা গা-ঢাকা জামা পড়তে রাজী নন। নানা পোষাকে মেয়েরা নিজেদের সাজচ্ছেন, কোনটাতে ভাল মানায় তা নিয়ে রীতিমত চিন্তা ভাবনা ও চর্চা করে চলেছেন তাঁরা। বৈচিত্র্য অঢেল। ফ্যাসান এখন দেশ বিদেশের সীমারেখাকে একাকার করে দিয়েছে। পশ্চিমে মিনি মিনি রব উঠল, আমরাও এগিয়ে এলাম। ইদানীং এর কদর নেই। এখন চলছে বেলবটম। এতদিন যারা 'স্ল্যাকস' শোভিত হয়ে ঘুরে বেড়াতেন তাঁরাই এই ফ্যাসানে বেশী মজেছেন। বিদেশী পোষাকের মধ্যে বোধহয় স্লাক্সই দীর্ঘদিন টিকে গেল। মেয়েদের ফ্যাসানের নতুন সংযোজন লুঙ্গি ও কামিজ। মেয়েদের আকর্ষণীয় করে সাজিয়ে পণ্যের আকর্ষণ বৃদ্ধি করাবার জন্যও চলেছে এখন প্রচেষ্টা। তাই বিজ্ঞাপনের মডেল হতে বহু নারীই এখন উৎসাহী। দীর্ঘদিন এ কাজে বঙ্গীয় মেয়েদের উৎসাহ ছিল না। এখন অবস্থা বদলেছে। প্রায়শই দেশী মেয়ে দেখা যায় বিজ্ঞাপনে। দেখা যায় শাড়ি, তোয়ালে, পেস্ট, আরামের

সামগ্রীর বিজ্ঞাপনে, ফ্যাসান প্যারেড, সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায়। সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতার ব্যাপারে এদেশ ঐতিহ্যবান। রাজপ্রাসাদ থেকে পর্ণকুটীর সর্বত্র সৌন্দর্য চর্চা। যার যেমন সাধ্য সে তেমন সেজেছে। যে কোন উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে নি সেই আদিবাসী রমণী মাথায় ফুল গুঁজে, নিটোল দেহবল্লরী ও অপরূপ কবরী নিয়ে সুশোভিতা তরুণীকে লজ্জা দিচ্ছে। সরু কোমর নারী সৌন্দর্যের অন্যতম একটি দিক। প্রাচীনা তাই কিশোরী যুবতীদের কলসী কাঁকে জল আনতে পাঠান কোমর সরু করতে। কোনকালেই স্থূলাঙ্গীদের কদর ছিল না। তাই আদিতে নাকি 'অনেক রূপসী কোমর মোটা হইলে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইতেন'। এখনকার মতই প্রাচীন বঙ্গনারী শাড়ির রং ও বুনোট সম্পর্কে ঔৎসুক ছিলেন। তখন পিঁয়াজি, হলুদ ও লাল বর্ণের বিশেষ সমাদর ছিল। নীলাম্বরী শাড়ির খুব নামডাক ছিল। 'শান্তিপুরের ডুরে শাড়ি সরমের অরি, নীলাম্বরী, উলঙ্গিনী, সর্বাঙ্গসুন্দরী' শাড়িসমূহের আদর ছিল। এই শাড়ি পরে অনেকে সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। সৌন্দর্য প্রতিযোগীদের মধ্য থেকেই মডেল গার্ল গড়ে ওঠে। তাঁরাই আবার বিজ্ঞাপনে অংশ নেন। ফ্যাসন প্যারেডে নিত্য নতুন পোষাকে হাজির হয়ে দর্শকদের সঙ্গে মিতালী পাতান। এ প্রতিযোগিতায় অরণ্যের সন্তানেরাও যোগ দিতে সুরু করেছে। এ বছর রাজস্থানের আদিবাসী তরুণী শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। হালফ্যাসান নিয়ে শহর এবং গ্রামের সবাই এখন ব্যস্ত।

একদা লম্বা চুলই ছিল ফ্যাসান। নিজের চুল না থাকলে 'উইগ' চাপিয়েও বেড়ান এখন মেয়েরা। কিছুদিন আগেও চুল বব ছাঁট করা হত। একদা খোলা চুলে রাস্তায় বের হওয়া নিষেধ ছিল। খোলা চুল ও লম্বা এলো চুল ছিল অশালীন। কিন্তু এখন ফ্যাসান বদলে গেছে। আজ 'মিনি' কাল 'ম্যাক্সি'। বেশবাসে চোখের ভাল লাগাই বড় কথা। নীবিবন্ধ নাভিপদ্মের নীচে নামিয়ে পথচারীর নাভিশ্বাস ওঠাতে ওঠাতে চলেন এখনকার তন্বী। তাঁকে দেখে বিগতাযৌবনা স্থূলাঙ্গীর ঐ পোষাকের অনুকরণে দর্শকের চোখ ভরে না। দেহের কতটা প্রকাশ্যে রাখা সঙ্গত বা সৌখিন তা শোভনতায় বিচার্য। বেল-বটম বা চুড়িদার শহরের বাঙালী মেয়েদের ঘরের জিনিস হয়ে উঠলেও তা এখনও অনেককে তৃপ্তি দেয় না। গত কয়েকবছর থেকে চুড়িদার বাঙালী মেয়েদের নিজস্ব পোষাকে পরিণত হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। কলেজগামী কিশোরী তরুণীদের আঁটোসাঁটো পোষাক, শাড়ীর লীলায়িত বিস্তার নিয়েও আলোচনা হচ্ছে নারী-সমাজে। এলিফ্যান্ট

প্যাণ্টও এখন পরছেন অনেক বাঙালী মেয়ে। (ঢোলা পাজামার মত) গারারা, ঘাঘরা, এবং লুঙ্গি পড়তে অভ্যস্ত হচ্ছেন বঙ্গললনা। লুঙ্গি চুড়িদারের মতই দ্রুত প্রসার লাভ করছে। মেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী পুরুষদের ফ্যাসানও যে পাল্টাচ্ছে সে কথাও মনে রাখতে হবে। পুরুষেরা দীর্ঘদিন থেকে লুঙ্গি পরছেন ঘরে। বাঙালী মুসলমান সর্বদাই লুঙ্গির ব্যবহার করেন। মেয়েরা মোটা লুঙ্গির উপর হাতের কাজ করা বাহারে জামায় গলা থেকে কোমরের তলা পর্যন্ত ঢেকে রাখেন এবং 'চোলি'র মত পিঠ, কোমর খুলে রাখেন।

সেলাই-করা ও সেলাই-না-করা উভয় প্রকার পোশাকই বাঙালীদের মধ্যে প্রচলিত। ব্রাহ্মণদের মধ্যে পূর্বে সেলাই করা বস্ত্রের চলন ছিল না। মন্দির শিল্পে সেলাই-না-করা বস্ত্রখণ্ডের ব্যবহারের নানা নিদর্শন দেখতে পাওয়া গেছে। বাঙালী হিন্দু সর্বদাই কাছা দিয়ে কাপড় পড়েন। বাঙালী ছাড়া আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহীশূর, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানেও কাছা দেওয়া হয়। অনেক জায়গায় কোঁচা ঝুলিয়ে বা কোমরে বিভিন্নভাবে ধুতির অর্ধাংশ জড়িয়ে রাখা হয়। মুসলমানেরা পায়জামা ও কাছা-কোঁচাবিহীন লুঙ্গি ব্যবহার করেন। লুঙ্গি শব্দ নাকি বর্মী 'লউঙ্গী' শব্দ থেকে এসেছে। বৈষ্ণবদের বহির্বাস লুঙ্গির মত। বিবাহিত তামিল ব্রাহ্মণকে কাছা দিতে হয়। কিন্তু অবিবাহিত ব্রাহ্মণের কাছা দেওয়া নিষেধ তামিলনাদে। বিশেষ বিশেষ ব্রত, সংস্কার আচরণে কোঁচা দিয়ে ধুতি পরার চলন আছে। "লুঙ্গি বেষ্টি বা বহির্বাসের ইতিহাস কত প্রাচীন তা বলা কঠিন। প্রাচীন শিল্পে ইহা দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তবে কোনারকের মন্দিরে (আনুমানিক খৃঃ ১২৫০) কাছা দিয়া এবং কাছা ব্যতিরেকে ধুতি পরিধানের চিত্র আছে। আবার সেলাই করা পুরাহাতা জামা ও পুরুষের ঘাগরার মত পরিচ্ছেদও দেখিতে পাওয়া যায়," জানিয়েছেন অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু।

সর্বত্রই এখন ইংরেজ-ধরণের শার্ট ও গেঞ্জীর চলন হয়ে গেছে। বাঙালীর পাঞ্জাবীও জনপ্রিয়। সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয় হয়েছে প্যাণ্ট ও সার্ট। প্যাণ্ট ও সার্টের ব্যাপারে সর্বভারতে লক্ষিত হয় পোষাকের একীকরণ।

বঙ্গ-দেশীয়দের পোষাক-পরিচ্ছদের আলোচনার সময় মনে রাখতে হবে যে নৃতত্ত্ববিদগণ ভারতীয় নারীর পোষাক-পরিচ্ছদকে নানাশ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যেমন জম্মু-কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হিমাচলপ্রদেশ প্রভৃতি স্থান প্রথম শ্রেণী। এই শ্রেণীর পোষাকের তিনটি অঙ্গ। প্রথম, পায়জামা, সালওয়ার বা সুত্থন, ঢিলা ধরণের জিনিস। দ্বিতীয় মাথা ঢাকার জন্য, 'কালপুশ' বা টুপি বা

দোপাট্টা এবং 'ভুজ' বা উড়ানি। এগুলো হচ্ছে প্রাচীনপন্থী পোষাক। বর্তমানে এইসব পোষাকের জায়গায় শাড়ি ও ব্লাউজের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দোপাট্টার পরিবর্তে শাড়ির আঁচল মাথার কাপড় হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পুরাতন বর্জন এবং নতুন গ্রহণের ঢেউয়ে সালোয়ার ও কামিজের আমদানী হয়েছে বাঙলার শহরে, নগরে, এমন কি গ্রামেও। সাজ-পোষাকে এসেছে পরিবর্তন। বিবর্তন। লহঙ্গা বা ঘাঘরার প্রচলন রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশের মধ্যে থাকলেও বাঙলায় তাও এসে গেছে। ঘাগরা তৈরী করতে ছয় থেকে কুড়ি গজ কাপড় লাগে। একদিকে কুঁচি সেলাই বা সরু ত্রি-কোণা কৃতি খণ্ড খণ্ড কাপড় জুড়ে ঘাঘরা তৈরী করা হয়। ঘাঘরার সঙ্গে কাঁচুলী বা কুর্তা পরার বিধি। বাঙালী সমাজে ঘাঘরার খুব একটা প্রচলন নেই। অনেকে ঘাগরার সঙ্গে শাড়ি পরিধান করেন। এই শাড়ি হচ্ছে সেলাই না করা পোষাক। দৈর্ঘ্যে বা রঙের তারতম্য অনুসারে শাড়ি বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। বাঙালী মেয়েদের পরিধেয় শাড়ি বস্ত্র সম্পর্কে অনেকেই আলোচনা করেছেন। সায়া সেমিজ-ব্লাউজের আমদানী খুব বেশী দিনের কথা নয়। অনেক শুদ্ধ আচার-আচরণে—এমন কি রান্নাঘরে অবধি অনেক বাঙালী সেলাই করা জামা পরে কাজ করতে চান না এখনও। এখনও বাঙলার অনেক গ্রামের বৃদ্ধারা কাপড়ের খোট গায়ে দিয়ে রান্না করেন। অনেকে সেমিজ ব্যবহার করেন। সেমিজও হাল আমলেরই আমদানী। বাঙালী মহিলা কাছাছাড়া শাড়ি পড়েন। বাঙলার বাইরে মহারাষ্ট্র প্রভৃতি স্থানে ও দক্ষিণভারতে কাছা দিয়ে শাড়ি পড়ার রীতি চালু আছে মহিলাদের মধ্যে। নির্মলকুমার বসু বলেছেন, "দাক্ষিণাত্যের যে সকল স্থানে কাছার চলন আছে তাহার সম্বন্ধে একটি বিষয় বলিয়া রাখা প্রয়োজন। তামিলে এই ভাবে শাড়ি পরাকে 'মডিসারু' বলা হয়। কানাড়ী ও তেলেগু ভাষায় 'কাছা' শব্দের চলন আছে। কিন্তু কানাড়ীতে 'মডিসীরে' শব্দ শুদ্ধ বস্ত্রের বিষয়ে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। দক্ষিণের শহরবাসী ব্রাহ্মণ রমণীদের মধ্যে নিম্নলিখিত শুদ্ধ অবস্থায় কাছা দিয়া শাড়ী পরিতেই হয়। অন্য সময় না পরিলেও চলে ; কিন্তু রজঃস্বলা অবস্থায় কাছা দিতে নাই। (১) বিবাহের সময়ে। (২) বিবাহ উপলক্ষ্যে বর বা কন্যার মাতাকে পরিতেই হয়। (৩) শ্রাদ্ধবাসরে বা পিতৃ-পুরুষের নিকট উৎসর্গের জন্য রন্ধনের সময়ে। (৪) ব্রত বা পূজাদি কালে। (৫) স্মার্ত আয়ার ব্রাহ্মণেরা যখন শ্রীশঙ্করাচার্যের নিকট আশীর্বাদের জন্য উপস্থিত হন, অথবা বৈষ্ণব আয়েঙ্গারগণ যখন স্বীয় গুরু 'জিয়ার' নিকট আশীর্বাদপ্রার্থী হন।

সেলাই করা জামা পরিধানের রীতি আদিম বাঙালী সমাজে ছিল না। সেলাইবিহীন একবস্ত্র পরিধানই ছিল পুরারীতি। উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে সেলাই করা জামা বাঙলায় আসে। উত্তর-পশ্চিম ভারতীয়দের নিকট থেকে সেলাইকরা জামা গ্রহণ করলেও অধোবাসের ক্ষেত্রে বাঙালী ঢিলা বা চুড়িদার পাজামা গ্রহণ করেন নি। পুরুষের অধোবাস যেমন ধুতি, মেয়েদের তেমন শাড়ি। ধুতি ও শাড়ি বাঙালী স্ত্রী-পুরুষের প্রধান পরিধেয়। একটু সঙ্গতি সম্পন্ন পুরুষ উত্তরীয় ব্যবহার করতেন, নারী ওড়না ব্যবহার করতেন প্রাচীনকালে। ওড়নাকে প্রয়োজন মত অনুষ্ঠানের কাজে লাগান হত। দরিদ্র জনসাধারণ ও লোকসমাজের নারী সাধারণত একবস্ত্রই পরিধান করেন। সেই বস্ত্রের অঞ্চল টেনেই অবগুণ্ঠন বা ঘোমটা দিয়ে থাকেন তিনি। আজকাল বাঙালী পুরুষ যে ভাবে পায়ের কণ্ঠা পর্যন্ত ঝুলিয়ে কাপড় পরেন—প্রাচীন বাঙালী তা করতেন না। তখনকার ধুতি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ছোট ছিল। হাঁটুর নীচে কাপড় পরার রেওয়াজ ছিল না। মালকোঁচা দিয়ে বা বর্তমানের গামছা পরার মতন করে প্রাচীন বাঙালী ধুতি পরিধান করতেন। নারীদের শাড়িও ছিল ছোট। তবে বর্তমানে তাঁরা যে ভাবে কোমরে এক বা একাধিক প্যাঁচ দিয়ে অধোবাস রচনা করেন—প্রাচীন পদ্ধতিও তদনুরূপ। তখন শাড়ির সাহায্যে উত্তরবাস রচনা করে দেহ আবৃত করা হত না। তখন নারী উত্তর-দেহাংশ অনাবৃত রাখতেন। কোন কোন স্তরে উত্তরী অথবা ওড়নার সাহায্যে উত্তরার্ধের কিছু অংশ ঢেকে রাখতেন। স্তন যুগলকে রক্ষা করতে অনেকে ব্যবহার করতেন চোলি বা স্তনপট্ট। স্তনপট্ট বা কাঁচুলী বা বক্ষাবরণের ব্যবহার অবশ্য বাঙলার নারী প্রাচীনকাল থেকেই করে আসছেন। এই কাঁচুলী সাধারণত দুই রকমের। প্রথম প্রকার খুব ছোট যা স্তনকে আবৃত করে ও দ্বিতীয় প্রকার বেশ লম্বা যা কোমর পর্যন্ত নেমে যায়। নানা চিত্র সম্বলিত কাঁচুলী সূচীশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আধুনিক মেয়েরা অপরিসর আড়ম্বরহীন কাঁচুলী ব্যবহার করেন। সেকালের মেয়েরা সাদামাঠা কাঁচুলী ব্যবহার করলেও কারুকার্যখচিত কাঁচুলী পছন্দ করতেন। দ্বিজ বংশীদাসের শ্রীশ্রীপদ্মাপুরাণের 'কাঁচুলি পরিল তাহে ঢাকিয়া কুমকুমে। কনক কুঠরী যেন ঢাকিয়াছে হিমে', অথবা ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে 'পীনোন্নত পয়োধরে বাঁধিল কাচলি' বা মুকুন্দরামের 'বসনে তুলিয়া রামা বান্ধে পয়োধর। বিনোদ কাচলী পরে তাহার উপর।' এইসব কাঁচুলি আড়ম্বরহীন। কিন্তু নারায়ণদেবের বেহুলার বিবাহে ব্যবহৃত কাঁচুলি কারুকার্যখচিত। বেহুলার বামপার্শ্বের কারুকার্যময়

কাঁচুলির বর্ণনা দিতে গিয়ে নারায়ণদেব বলেছেন যে সে কাঁচুলি ছিল দশ অবতার চিত্রাঙ্কিত। অবশ্য বেশীর ভাগ কাঁচুলিতে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার চিত্র অঙ্কিত। অনেক কাঁচুলি ফুলফল পশুপক্ষী বৃক্ষলতা উৎকীর্ণ। এই সব কাঁচুলির মূল্যও যথেষ্ট। ঘনরাম বলেছেন—'লক্ষ টাকার কাঁচুলি করিল পরিধান। বিচিত্র লিখিল তায় ভারত পুরাণ।' কাঁচুলি ব্যবহার থেকে জানা যায় যে প্রাচীন আমল থেকেই বাঙালী মেয়ে সূচীশিল্পে বিশেষ অভিজ্ঞা ছিলেন। এবং কাঁচুলীর ব্যাপারে আড়ম্বর পছন্দ তাঁরা করতেন। তাই 'কিবা তায় কাঁচলি করিল অনুপাম। দুসারি কদম্বগাছ ফুলের বাগান। ষড়ঋতু সাক্ষাৎ সকল শাখা লয়ে। ভ্রমর-ভ্রমরী ভুলে ভ্রম করিয়ে।' বাঙালী মেয়েদের কাঁচুলী ব্যবহারের কথা জানাতে গিয়ে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—'কাঁচুলী ছাড়া বাঙালী মেয়েরা প্রায়ই ঘরের বাহির হইত না। সেকালে কাঁচুলীর দাম ছিল। দুই টাকার কম একজোড়া কাঁচুলী হইত না ; পঞ্চাশ টাকার অধিক কাঁচুলীর মূল্য নির্ণীত ছিল, হাজার টাকা মূল্যের কাঁচুলীও ব্যবহৃত হইত।... একটা ঠাট্টার কথা প্রচলিত আছে যে বাঙলায় পীনোন্নত পয়োধরা দেখিয়া এবং কাঁচুলীর অপূর্ব নির্মাণ কৌশল দেখিয়া রাজা মানসিংহ মেয়েদের দেহ হইতে কাঁচুলী কাড়িয়া লইয়াছিলেন ' চীনা লেখকেরা পঞ্চদশ শতকে বাঙলার মহিলাদের বসন আভরণের পরিচয় দিতে গিয়ে জানিয়েছেন যে মেয়েরা নাতিদীর্ঘ কামিজ পরে ও শরীরে এক টুকরো কার্পাস অথবা রেশম বস্ত্র জড়িয়ে নেয়। তারা গৌরবর্ণ বলে প্রসাধন করে না। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা প্রয়োজন, বঙ্গনারী প্রাচীন আমল থেকেই প্রসাধনের ভক্ত। সিন্দুর, কুমকুম, চন্দন, কাজল, কর্পূর আর ঠোঁট রাঙ্গাতে তাম্বুল প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে বঙ্গসমাজে। তাছাড়া নখে মেহেন্দী পাতার রস লাগাতেন। গায়ে মাখতেন সরমাটা, ডাবের জল, তেল প্রভৃতি। চীনা পরিব্রাজকদের বিবরণীতে আরও জানা যায় যে বাঙালী মেয়েরা কর্ণে সোনা মোড়ানো পাথরের কর্ণভূষণ, গলায় মালা, হাতে ও পায়ে সোনার বালা এবং আঙ্গুলে অঙ্গুরীয় ব্যবহার করতেন। কেশরাশি খোঁপা করে বাঁধতেন। মনসামঙ্গলেও নানা ধরণের পোষাকের উল্লেখ আছে। যেমন—'কহিতে না পারি পদ্মা যত কর বেশ। ধুপের ধোঁয়া দিয়া রে বাঁধিত তার কেশ॥ সুবর্ণের কর্ণফুল কর্ণে আনি দিল। নাকেতে বেশর দিল করে দুল দুল॥ গলায় হার দিল সুবর্ণের পাঁতি। মধ্যে লাগাইছে সুবর্ণের তথি॥ দুই হাতে তার দিল দেখিতে শোভন। শঙ্খের সম্মুখে দিল সুবর্ণের কঙ্কন॥ পায়ে খারু দিল আঙ্গুলে

পাশুলি। পরম সুন্দরী যেন সোনার পুত্তলি ॥ চক্ষুতে কাজল দিল যেন নীলোৎপল। নাসিকা নির্মাণ যেন দেখিতে তিলফুল ॥ মৃগমদ মিশাইয়া চন্দন দিল গায়। কনক নূপুর দেবী তুলিয়া দিল পায় ॥' কৃত্তিবাসের সীতার বিয়েতে এবং চৈতন্যমঙ্গলে চৈতন্যের বিয়েতে এই একই ধরণের বর্ণনা পাওয়া যায়। ঘনরামের ধর্মমঙ্গলেও অনেক বিবরণ আছে। যেমন—'রতনমুকুরে রাণী দেখে মুখ ছবি, কপালে সিন্দুর শোভা প্রভাতের রবি। চন্দন চন্দ্রমা কোলে কজ্জলের বিন্দু, ভুরুযুগ উপরে উদয় অর্ধ-ইন্দু। বিন্দু বিন্দু গোরচনা শোভে তায় অতি, অলকামণ্ডিত মণিমুক্তার পাঁতি'। পুরুষদের পোষাক সম্পর্কে চৈনিক পরিব্রাজক লিখেছেন—রাজসভায় মুসলমান প্রভাব বেশী। সুলতান ও তাঁর কর্মচারীগণ মুসলমানী কায়দায় টুপী ও পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করেন। তাঁদের মুণ্ডিত মস্তক। অনেকের মাথায় পাগড়ী। পরনে লম্বা আলখাল্লা। পায়ে চামড়ার জুতো। যাঁরা বিলাসপ্রবণ তাঁদের জুতোয় সোনালী ফিতে ও সুন্দর কারুকার্য।

সেকালের সাধারণ মহিলারা এবং নিম্নসমাজের লোকেরা যে একবস্ত্রে থাকতেন এবং মাথায় ঘোমটা দিতেন একথা পূর্বেও বলা হয়েছে। লক্ষ্মীধরের কবিতায়ও প্রমাণ মেলে। তিনি বঙ্গনারীর পোষাক সম্পর্কে চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। 'শিরোযদরগুণ্ঠিতং সহজরূঢ়লজ্জানিতং, গতঃ চ পরিমন্থরং চরণ-কোটিলগ্নেদৃশৌ। বচঃ পরিমিতং চ যন্মধুরমন্দমন্দাক্ষরং, নিজং তদিয়মঙ্গনা বদতি ন্যূনমুচ্চৈঃ কুলম ॥ অর্থাৎ ঘোমটা-ঘেরা মাথা স্বতই লজ্জাবনত, চলন ধীর, চোখ পায়ের দিকে নিবদ্ধ, বাক্য স্বল্প এবং মৃদু মধুর—এই দিয়ে যেন



এই মহিলা উচ্চৈস্বরে নিজের কুলমর্যাদা প্রকাশ করছেন। বিবাহিত মেয়েদের সীমন্তে সিঁদুর তখনো প্রচলিত ছিল। গোবর্ধন আচার্য লিখেছেন যে কবরীবন্ধনমুক্ত-স্নাত নারীর কেশপাশ ও সিঁথির সিঁদুরের জৌলুষে নায়কের বিদীর্ণ হৃদয়। তিনি শহরের মেয়েদের সঙ্গে তুলনা করেছেন পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের—'মুক্তা কার্পাসবীজৈর্মরকতসকলং শকপত্রৈরলাবুপুষ্পৈ রূপ্যাণি

রত্নং পরিণতিভিন্নৈঃ কুক্ষিভির্দাড়িমীণাম ; কুষ্মাণ্ডীবল্লরীণাং বিকশিতকুসুমৈঃ কাঞ্চনং নাগরীভিঃ,- শিক্ষন্তে তৎপ্রসাদাদ্ বহুবিভবজুষাং যোষিত শ্রোত্রিয়াণাম', অর্থাৎ, মহারাজ তোমার প্রসাদে বহুবিভবশালী শ্রোত্রিয় রমণী নগরবাসিনীদের কাছ থেকে মুক্তা কার্পাসবীজের মত, মরকত শাকপাতার মত, রূপা লাউফুলের মত, রত্ন পাকা ডালিমের বীজের মত, সোনা কুমড়া লতার ফোটাফুলের মত, এইরূপ শিক্ষালাভ করে। বাঙলা দেশের মেয়েদের পোষাকের বর্ণনা প্রসঙ্গে অপর একজন কবি বলেছেন—দেহে সূক্ষ্ম বসন, বাহুতে সোনার তাগা, মাথার উপরে গন্ধতৈল-সিক্ত কেশজাল মসৃণ করে আঁচড়ানো এবং চূড়ার মত খোঁপা বাঁধা। এই খোঁপার আছে নানান নাম। যেমন—বিনোদ, মনভোলান, ভুবনমোহন, অলকা, বিবিয়ানা, পতিপ্রিয় প্রভৃতি। খোঁপার চারদিকে ফুলের মালা জড়ানো। কানে চন্দ্র-লেখার মত নির্মল কচি তালপাতার দুল। রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে ভাষায় উপমা-উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কার ব্যবহারে মধ্যযুগের মুসলমান কবিগণও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের সুস্পষ্ট ছাপ রেখেছেন। যেমন ইউসুফ জোলেখার রূপবর্ণনা—'মুখ নিরমল যেন পূর্ণিমার শশী। ভ্রমর গুঞ্জরে যেন দুই চক্ষে বসি॥ ভুরু দুটি জোড়া যেন কামের কামান। স্থলপথ যিনি তার হয় দুটি কান॥…অতি ক্ষীণ মাজাখানি শিকারী বাঘিনী। চলনে খঞ্জনে হেরে ভুলে সব মুনি।' ইত্যাদি। অথবা 'আমীর হামজা' (প্রথম পর্ব) কাব্যে মেহের নেগারের সৌন্দর্য বর্ণনা—'মাথায় চাচর কেশ, শির পরি দেখায় বেশ, মুখে শোভা চান্দের সমান। চাহনি মদন বলে, দেখিলে হারায় প্রাণ, ভুরু দুটি যেমন কামান॥ গলায় সোনার হার, কাঙ্গনের শোভার তার, আগুপিছু শোভা করে ঝাপা। হেন নথ নাক মাঝে, গজমতি তাহে সাজে, ছেড়ে শোভা কনকের চাঁপা॥ কপালে মাণিক পটি, গাঁথিয়া বান্ধেন ঝুটি, যেন শোভা আকাশের তারা। তিলক কপালে পরে, চন্দ্র যেন শোভা করে, বক্ষবন্ধে সোনারূপার ডোরা॥ পায়েতে নূপুর দিল, আন্ধার উজালা হৈল, বেশ যৈন জিনিয়া পুতলি, ছিরি তার উঠে ভাল, আন্ধারেতে হইল আলো, বিজলি সমান ঝিলিমিলি।' অথবা ফকীর গরীবুল্লাহের—'জোলেখা আগে আইল হাসিয়া হাসিয়া। পরিয়া পাটের শাড়ী পানগুয়া খাইয়া॥ তাড়বালা বাজুবন্দ হৃদয় কাবুলী, হাতেতে করে চুবিচুড়ি পায়েতে পাশলি॥'

সভা-সমিতি বা অনুষ্ঠান উপলক্ষে জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকের ব্যবস্থা প্রাচীন ও মধ্যযুগেও ছিল। এখনও আছে, জীমূতবাহন দায়ভাগ গ্রন্থেও সভা-

সমিতির জন্য পৃথক পোশাকের কথা বলেছেন। নর্তকীদের পরনে কণ্ঠ পর্যন্ত আটো-সাঁটো পাজামা, উত্তরার্ধে ওড়না, সন্ন্যাসীদের ল্যাঙোটি, সৈনিক ও মল্লবীরদের জন্য উরু পর্যন্ত খাটো পাজামা, অনেকটা বর্তমান হাফপ্যাণ্টের মত। শিশুদের হাঁটু অবধি ধুতি। মজুর ও কৃষদের জন্যও ছিল ছোট-পাজামা বা ছোট ধুতি। বঙ্গনারী ছাপাশাড়ি ব্যবহার করছেন প্রাচীনযুগ থেকে। শিউলি ফুল, শিমপাতার রস প্রভৃতি দিয়ে তখন শাড়ি ছাপানো হত ঘরে ঘরে। প্রাচীনকালে বাঙালী ব্যবহার করতেন কাষ্ঠপাদুকা বা খড়ম। মধ্যযুগে চামড়ার জুতোর উল্লেখ পাওয়া যায়। পাঞ্জাবী ও ধুতি উনিশ শতকের আমদানী। সাহেবদের সঙ্গে সঙ্গে প্যান্টসার্টেরও আমদানী হয়। মুসলমানী পা-জামা এবং লুঙ্গি পূর্ব থেকেই চলছিল। মেয়েদের সায়া, সেমিজও উনিশ শতকের দান। ব্লাউজের আমদানী হয়েছে অতি সাম্প্রতিক যুগে। এখন ছোট ছোট শিশু ও কিশোরদের জন্যও সৃষ্টি হয়েছে নানা প্রকার পোষাক পরিচ্ছদ। বাঙালীর বর্তমান পোষাকে পশ্চিমা গন্ধ আছে। অবশ্য শাড়ি ও ধুতি পরার মধ্যে এখনও বাঙালী তাঁদের প্রাচীন পরিধানের চিহ্ন বজায় রেখেছেন। বাঙালী মুসলমান ধুতি অপেক্ষা লুঙ্গি এবং পা-জামা অধিক পছন্দ করেন। নিমা বা কামিজ হিন্দুদের মতই তাঁরা ব্যবহার করেন। প্যান্ট পরিধানের বেলায়ও তাঁরা পটু। মাথায় মুসলমানী টুপী অনেকেই ব্যবহার করেন। কিন্তু দরিদ্র গ্রামবাসী এখনও গামছা পরিধান করেন। পরিধান করেন সেই প্রাচীন আমলের ছোট ধুতি। পাদুকা প্রায়শই ব্যবহার করেন না তাঁরা। অনেকে সুপারীর খোল দিয়ে নিজ তৈরী পাদুকা ব্যবহার করেন। চামড়ার, রবারের, কাঠের পাদুকা সবই গ্রামবাসীদের ব্যবহারে আসে। সহরের প্রভাবে গ্রামে বিভিন্ন প্রকারের জুতোর আমদানী হয়েছে। বাঙলার গ্রামাঞ্চলে মহিলাদের মধ্যে জুতো পরিধানের রেওয়াজ নেই। কোথাও কোথাও ধনী বা উচ্চবর্ণের মধ্যে জুতোর প্রচলন আছে। সাধারণ গ্রামবাসীদের কাছে এখনও খড়ম বহুল প্রচলিত। কাঠের দ্বারা নির্মিত খড়ম বগুলাযুক্ত হতে পারে অথবা মাথায় বেল্ট লাগানও থাকতে পারে। এই খড়ম খাঁটি 'স্বদেশী প্রোডাক্ট'। চটি বা চপ্পলকে অনেকে স্বদেশী জুতো বলেন। একপ্রকার ঘাড়-তোলা জুতো বা যাতে গোড়ালির পিছনে আচ্ছাদন থাকে তাও স্বদেশী জুতো। স্বদেশী ঘাড়-তোলা জুতোয় ফিতা বাঁধার ব্যবস্থা নেই। বাঙালী বিভিন্ন প্রকারের চপ্পল ব্যবহার করেন। চটি জুতো নাকি বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ। এই চটি জুতোকে নাগরাই ধরণের

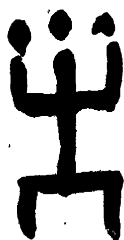
ছুঁচালো এবং বটা মাথাওয়ালায় পরিণত করে তৈরী হয়েছে বিদ্যাসাগরী চটি। বাঙলার খাস চটি নাকি দক্ষিণীরীতির পাদুকার জাতি। বাঙলার চটিতে চামড়ার পটির পরিবর্তে একটি আস্ত নাগরা বা বিলাতী জুতোর সম্মুখভাগ সেলাই করে দেওয়া হয় অর্থাৎ তা ইংরেজী সু-জুতার অনুকরণে তৈরী। অনেকটা বাঙলার চটির মত এক্প্রকার জুতো ব্যবহার করেন উচ্চশ্রেণীর মুসলমান রমণী।

মেয়েদের অলঙ্কারপ্রিয়তা সুপ্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে বাঙলায়। প্রাচীনকালে ফুলের অলঙ্কার, মাটির অলঙ্কার প্রভৃতি ব্যবহার করতেন বঙ্গনারী। কাচের অলঙ্কার, রেশমী চুড়ি, পুঁথির মালা, রুদ্রাক্ষের মালা প্রভৃতিও জনপ্রিয় বাঙলায়। লোহার অলঙ্কার, রূপার অলঙ্কার এখনও অপ্রচলিত নয়। সচ্ছল অবস্থায় বাঙালীরাই সোনা, মনিমুক্তা হীরার অলঙ্কার ব্যবহার করতে পারেন।

ইতিমধ্যে আমরা বিভিন্ন আলোচনা ও তথ্যাদির সহায়তায় বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছি যে গ্রামবাঙলার অর্থনীতি শিল্পায়নের দিক থেকে দেখতে গেলে কুটিরশিল্প-নির্ভর। কোন কৃষিকাজ বা শিল্পকর্মের সঙ্গে যুক্ত নন এমন ব্যক্তির সংখ্যাও কম নয় গ্রামদেশে। তাঁদের সম্মুখে অর্থোপার্জনের একটি রাস্তাই খোলা, তা হল কৌলিক কর্ম কৃত্যাদির চর্চা, অথবা অনুরূপ কোন কাজকর্মের মধ্যে নিজেদের নিয়োজিত রাখা। সবদিক থেকে প্রকৃতির আশ্রয়ে থাকার দরুন এদের অনেকেই অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রথম সূত্র হিসাবে প্রকৃতিকেই গ্রহণ করেছেন। তাই গাছকাটা থেকে শুরু করে মাটিকাটা, মাছধরা, গাছের রসকাটা, গুড় জ্বালদেওয়া, পশুপালন ঘরসারা প্রভৃতি কর্মে নিজেদের ব্যাপৃত রাখেন তাঁরা। পুরুষেরা যখন এইসব কাজে ব্যস্ত তখন মেয়েরা মুড়িভাজা, চিড়াকোটা, কাসন্দ-আচার তৈরী, আমসত্ত্ব বানানো প্রভৃতি কাজ থেকে সেলাই. বোনা, আলপনা, গান, বাজনা, প্রাঙ্গণের খেলা, ঘরলেপা প্রভৃতি কর্মে নিজেদের সর্বক্ষণের জন্য ব্যস্ত রাখেন। কুমোর মেয়েরা হাঁড়ি কলসী, পুতুল, খেলনা ইত্যাদি তৈরীর বিভিন্ন কাজে ছেলেদের সঙ্গে হাত লাগান। ঘরামির কাজে ব্যাপৃত হন ছেলেরা। মেয়েরা স্বল্প সঞ্চয়ের জন্য নানা প্রকার কৃচ্ছ্র সাধনে মাতেন। এইভাবে বর্ষাবাদলা দিনগুলোকে ঠেকা দিয়ে শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্তে চলে আসেন, ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাজ বিন্যাসেরও রূপ বদলায়।

প্রকৃতির সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে বাঙালী তার আহার-বিহার সৃষ্টি করেছে. শিখেছে নিজেকে সাজাতে। ক্রমে তার ব্যক্তিগত রূপচর্চা সামগ্রিক

রূপচর্চায় পর্যবেশিত হয়েছে। সে রূপসাধনা চতুষ্পার্শ্বকে সুন্দর করে দেখতে চেয়েছে। তাই যুগ যুগ ধরে সমাজের সর্বস্তরে আপন বিত্তানুযায়ী রন্ধন পারিপাট্য, রূপসাধনা এবং সৌন্দর্যচর্চা ব্যক্তিগত ও জাতিগতক্ষেত্রে চলে আসছে। অর্থকরী কারুশিল্প এবং কুটিরশিল্পেও এই মানসিকতার ছায়াপাত ঘটেছে। হয়েছে তার মানস-সংস্কৃতির বিকাশ, হয়েছে মুক্তবুদ্ধির প্রকাশ। এই মুক্তবুদ্ধির আলোকে আমরা বাঙালীর সমাজ বিন্যাস, রক্তদল, আহার-বিহার, বসনভূষণ, দারু-কারু-চারু শিল্পের ধারার দিকে নজর দিতে পেরেছি। বাঙালী ও বাঙলাকে যেমনটি বুঝেছি তেমন করে পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করেছি। এবং তা করতে এসে বারে বারে হোঁচট খেয়েছি, অনেক কথা একনিশ্বাসে বলতে গিয়ে অনেক স্থানে হয়তো সহজ হওয়া সম্ভব হয় নি। এ সব ত্রুটি স্বীকার করে নিয়েই গ্রন্থের উপসংহার অংশে চলে যাব কিছু ঋণের স্বীকৃতিতে, কিছু তথ্য, কিছু অগ্রজ চিন্তাভাবনার সঙ্গে সুপরিচিত হতে।



উপসংহার

এ গ্রন্থের অবতরণিকায় কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। গ্রন্থারম্ভেও বঙ্কিম রচিত প্রশ্নাবলী রাখা হয়েছে, বলা হয়েছে সুদীর্ঘকাল ধরে আমাদের জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর পাইনি। উত্তরের প্রত্যাশায় লোকবৃত্তের দ্বারস্থ হতে, লোকবৃত্তকে কষ্টিপাথর করে প্রশ্নোত্তরের চেষ্টা করতে বলা হয়েছে।

লোকবৃত্ত তত্ত্বপ্রচার বা নীতিপ্রচার না করেও লোকস্মৃতিতে সুদীর্ঘকাল প্রবাহিত। এ প্রবাহের উৎস গ্রাম, গ্রামের সাধারণ মানুষ, তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অনুভূতি ও সাধারণ বুদ্ধির বহুদর্শিতা। যা গ্রামের তাই গ্রাম্য নয়, গ্রামকে ভালবেসেও আমরা গ্রাম্য হতে লজ্জা পাই, গ্রাম্যতা পরিহার করতে সদা সচেষ্ট থাকি। জাতির মনস্তত্ত্ব, আচার ব্যবহার ধর্মকর্মের ও জীবনাচরণের সঠিক তথ্য অবগত হতে গ্রামীণ মানুষের অসাধারণ ভূমিকা। তাদের সাংসারিক জ্ঞান, বাস্তব ঘেঁষা জীবনের অনুভূতি, দৈনন্দিন ক্রিয়া ধর্ম কর্ম সহজ ও সমগ্র-ভাবে লোকবৃত্তে পরিবেশিত বলে তা লোকপ্রত্যয়ের ক্ষিপ্র অস্ত্র। তথাপি নিছক মনোবিলাসের মোহে, মার্জিত রুচির শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে বিদেশী কালচারের উত্তাপে আমরা উৎকট রুচিবাগীশ হয়ে পড়েছি। লোকবৃত্তের মধ্যেও তাই প্রাণখোলা কথাবার্তা ও জীবনযাত্রার অনাড়ম্বর প্রণালীর বদলে শিষ্টাচারের খোঁজ করি। জীবনের সনাতন সংস্কার ও সংস্কৃতির, বাঙালীর বাঙালীয়ানার, বাঙালীর সহজ জ্ঞানের পরিবর্তে আভিজাত্যের, ফিটফাট চাকচিক্যের সন্ধান করি, লোকবৃত্তকে গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট মনে করি, মনে করি এর কোন আভিজাত্য নেই। কারণ লোকবৃত্তের আভিজাত্য পরমুখাপেক্ষী নয়, জাতির প্রাণের পরম্পরাগত সম্পদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বাঙলার লোকবৃত্তের চরিত্র, কাঠামো, রূপ ও রসের সামান্য আভাস ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু বাঙলার লোকবৃত্তের ব্যাপকতার বিবরণ আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়নি, বর্তমান গ্রন্থনায় তা সম্ভবপরও নয়। যদিও অবতরণিকায় উচ্ছ্বাসপূর্ণ কিছু বাক্য এবং কিঞ্চিৎ পুনরুক্তি প্রশ্রয় পেয়েছে। এই উচ্ছ্বাসপূর্ণ বাক্য ও পুনরুক্তির অধিকাংশ কোন না কোন প্রাক্তন মহাজনের উচ্ছিষ্ট, প্রসাদমাত্র; অকপট বিনয়ে সেকথা জানানো প্রয়োজন।

লোকবৃত্তের চর্চা ও লোকজীবন চিত্রনের মাধ্যমে বাঙলার চিরায়ত ইতিহাস-আত্মাকে স্পর্শ করার উচ্চাশায় যখন এই গ্রন্থ প্রণয়নে অগ্রসর হলাম, তখন, স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, নিজেই দেখতে পেলাম জন্মভূমি বাঙলা

ও তার লোকসমাজ প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাইলে পূর্বসূরীদের উচ্চারিত বহু শব্দ নির্দেশক-নিয়ন্তা হিসাবে সামনে এসে দাঁড়ায়। আরও একটু খুলে বলি, আমি কোন নতুন উপাদান বা তত্ত্ব-তথ্য হাজির করি নি, পূর্বসূরীদের ব্যবহৃত বহু শব্দ ও বাক্য আমার কাছে মন্ত্রের মতন প্রভাব রেখেছে। এই সব বাক্যের কোন একটি কিম্বা হয়ত কোন টুকরো শব্দ শৈশব-বাল্য-কৈশোরে বারবার অবধারিত সত্য হিসাবে আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছে। আজ মধ্য যৌবনে সেই মন্ত্রপ্রায় বাক্যগুলিকে নির্বাসন দেওয়া বোধ করি অসম্ভব। কাজেই পূর্ববর্তী সমস্ত প্রত্ন-নৃ-ঐতিহাসিক লোকবৃত্ত-গবেষকদের সকলের কাছেই আমি ঋণী, সকলের অল্পবিস্তর পরিচিত, এমন কি আলোচিত গ্রন্থাদি থেকেও নানা তথ্য ও উপকরণ আহরণ করেছি।

স্বীকার করে রাখি, মন্ত্রপ্রায় বাক্যের কোন কোন অংশ সুদীর্ঘদিন মনের কারখানায় লালিত পালিত হয়ে কোথাও কোথাও অদলবদলের সিঁড়ি ভেঙ্গে নতুন চেহারা নেবার চেষ্টাও সম্ভবত করেছে। আসলে অযতনে রক্ষিত স্মৃতির ভাঁড়ারে তোলপাড় শুরু হতেই আপ্তবাক্যের মত সনাতন পুঁজিগুলো যেন সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে নিজেরাই নিজেদের স্থান করে নিয়েছে, আমি বাঙালীর লোকজীবনের যুক্তিপরম্পরার একটি ইতিবৃত্ত নতুন দৃষ্টিভঙ্গির ভিতর দিয়ে সহৃদয় পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করতে চেয়েছি। এই দৃষ্টিভঙ্গি সমাজবিজ্ঞান নিয়মাধীন বলেই আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে করি। এ কাজে পূর্বসূরীদের ঋণ সগৌরবে ও সশ্রদ্ধায় ঘোষণা করতে দ্বিধা নেই। অভিযোগ উঠতে পারে, সকলের কাছ থেকে নিয়ে বাঙলার লোকজীবনের প্রবহমান ধারাস্রোতের গতি-প্রকৃতি ইঙ্গিতের মৌলতা বা ইতিহাসের সজীব মুখরতা পরিস্ফুট হয় কি। যদি না হয় তবে লেখক মহাজন-প্রসাদ গ্রহণ পদ্ধতিতে কেন সজ্ঞানে বাধা দিলেন না। উত্তর একেবারে সরাসরি, বাধা দেওয়া উচিত কাজ হবে না মনে করি, তাই বাধা দিই নি, বরং প্রশ্রয় দিয়েছি। এই প্রক্রিয়ায় যুক্তির চেয়ে উক্তির প্রাধান্য ঘটাও বিচিত্র নয়। তাই শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম, মন্ত্র-কথা বা প্রসাদের উৎস সন্ধানের প্রয়াস পাওয়া যেতে পারে এই উপসংহার পর্যায়ে। অর্থাৎ নিজের রচিত অবতরণিকার যাথার্থ্য-বিচারের সুযোগ পাওয়া যাবে, সুযোগ পাওয়া যাবে শৈশব-বাল্য-কৈশোরের অযতনে-রক্ষিত মণিরত্নের আকরিক মূল্য যাচাইয়ের, সুযোগ পাওয়া যাবে কোন্ তথ্যের পশ্চাতে বাঙলার লোকজীবনের কোন্ রূপটি আমি মনন-কল্পনার মধ্যে ধরতে চেষ্টা করেছি।

লেখক

জননী বঙ্গভূমিকে আশৈশব সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছি, যৌবনের সকল চেষ্টার মধ্যে আমার সকল দৈন্য, সকল অযোগ্যতা অক্ষমতা সত্ত্বেও বঙ্গ জননীর যে মূর্তি আমার মানস-মন্দিরে জাগ্রত ও জীবন্ত রেখেছি, লোক-মানুষের প্রতি আশৈশব ও আজীবন শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম ও ভালবাসার সে অভিমান ও অহমিকাই আমাকে লোকবৃত্তের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। জীবনের সমস্ত কর্ম ও অভিজ্ঞতার মধ্যে লোক-জীবনের সমস্যার উপলব্ধি করার চেষ্টাকে জীবনের ধ্যান ধারণার বিষয় করেছি। বাঙালীর নিজস্ব সাধনা, শাস্ত্র, দর্শন, কর্ম, ধর্ম, বীরত্ব, ইতিহাস, ভবিষ্যৎ জানতে অগণিত বাঙালীর, দেশের আপামর সাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছি, চলব। জাতীয় ইতিহাসের ইঙ্গিতকে উপেক্ষা করে বিদেশী ইতিহাস বিদেশী জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চিন্তাভাবনার দিকে অসংযতভাবে ঝুঁকে পড়ে বিজ্ঞানের তূর্যধ্বনি করতে সাড়া দেয় না মন। কারণ বাঙলার যে জীবন্ত প্রাণ, বাঙলার প্রাণে প্রাণে আবহমান যে সভ্যতা ও সাধনার স্রোত, ইতিহাসের যে ধারা তা লোকজীবনের সঙ্গেই সম্পৃক্ত বলে তা 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল'। বিশ্ববিধাতার অনন্ত সৃষ্টি-স্রোতের লীলাধারের রূপবৈচিত্র্যে বাঙালী একটি বিশিষ্ট ধারা। আসলে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা এই বাঙালী সংস্কৃতি। তার অনেক বৈশিষ্ট্য ছিল, এখনো আছে, নিজস্ব রূপ ছিল, এখনো আছে। তথাপি ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে আলাদা করে তাকে দেখা চলে না। বাঙালী জাতিকে যেমন ভারতের মহান্ অধিবাসীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়, বাঙলার সংস্কৃতি, বাঙলার লোকজীবনকেও তেমনি ভারতীয় জনজীবন ও সংস্কৃতির জগৎ থেকে পৃথক করে দেখানো যায় না। আসলে একতার মধ্যে বৈচিত্র্য বা বৈচিত্র্যের মধ্যে একতার একটি মধুর সম্পর্কে পরস্পরে সম্পর্কান্বিত, ভারতীয় ও বঙ্গ-সংস্কৃতি। তাই এটি অমোঘ সত্য যে বাঙালীর একটা সুনিশ্চিত রূপ আছে, বিশিষ্ট ভাষা আছে, বিশিষ্ট লোকধর্ম আছে।

১. কিন্তু কোন সমন্বয় ও বিবর্তনে বাঙালীর আজ এই হতদশা লোকবৃত্ত চর্চার মারফত অর্থাৎ লোকবৃত্তকে কষ্টিপাথর হিসাবে ধরে নিয়ে বিচার করে দেখতে চেষ্টা করতে হবে এই কথা ও কাহিনীর কতটা সত্য কতটা বাঙলা ও বাঙালীর পক্ষে প্রযোজ্য (অবতরণিকা পৃ. ৪৩)

"জনসাধারণ যাহারা উচ্চ বর্ণসমাজের বাহিরে, পৌরাণিক ও স্মৃতি

শাসিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাহিরে, যাহারা রাষ্ট্রের দরিদ্র ভূমিহীন বা স্বল্পভূমিবান প্রজা বা সমাজ-শ্রমিক তারাই এই ইতিকথার 'নায়ক'…অর্থাৎ বাঙালী জাতি কি করিয়া ক্রমে ক্রমে আজিকার বাঙালীতে বিবর্তিত হইয়াছে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা…" (যদুনাথ সরকার, "বাঙালীর ইতিহাস" আদিপর্ব, পৃ. ৮০)

২. সাগর থেকে সাগরান্তরে যাদের অর্ণবপোততরঙ্গ লীলা-বিভঙ্গে নৃত্যায়িত ছিল (পৃ. ১৭)

"বিজয় সিংহের কাল্পনিক বিজয় কাহিনীই বাঙালীর সাহস ও বীরত্বের একমাত্র নিদর্শন ছিল বলিয়া এতদিন গণ্য ছিল। আজ আমরা জানিতে পারিয়াছি যে বাঙালীর বাহুবল সত্য সত্যই একদিন তাহার গর্বের বিষয় ছিল। বাঙালী শশাঙ্ক কান্যকুব্জ হইতে কলিঙ্গ পর্যন্ত বিজয়াভিযানে যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, বাঙালী ধর্মপাল ও দেবপাল তাহার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিয়া সুদূর পঞ্চনদ অবধি বাহুবলে বাঙালীর রাজশক্তি দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বাঙালী ধর্মপাল কান্যকুব্জের রাজসভায় সম্রাটের আসনে বসিতেন, আর সমগ্র আর্যাবর্তের রাজন্যবর্গ প্রণত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিতেন।…ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া বৌদ্ধধর্ম বাঙালীর রাজ্যেই শেষ আশ্রয়লাভ করিয়া চারিশত বৎসর টিকিয়া ছিল।…তাম্রলিপ্ত হইতে তাহার বাণিজ্যপোত সমুদ্র পার হইয়া দূর দূরান্তরে যাইত। বাঙলার সূক্ষ্মবস্ত্রশিল্প সমুদয় জগতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল…যতদিন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা থাকিবে ততদিন গৌড়ীরীতি এবং বল্লালসেন, হলায়ুধ, ভবদেব ভট্ট, সর্বানন্দ, চন্দ্রগোমিন, গৌড়পাদ, শ্রীধর ভট্ট, চক্রপানি দত্ত, জীমূতবাহন, অভিনন্দন, সন্ধ্যাকর নন্দী, ধোয়ী, গোবর্ধনাচার্য ও উমাপতি ধর প্রভৃতির রচনা সমগ্র ভারতে আদৃত হইবে…সোমপুরে বাঙালী যে বিহার ও মন্দির নির্মাণ করিয়াছিল সমগ্র ভারতে তাহার তুলনা মেলে না। বাঙলার স্থপতিশিল্প ও ভাস্কর্য সমগ্র পূর্ব এশিয়ায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে…" (ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, "বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ", পরিবর্তিত ৪র্থ সং, জেনারেল প্রিন্টার্স, কলিকাতা, ১৩৭৩, পৃ. ২৩৫-৩৮)

৩. এ দেশ সেই দেশ যে দেশ সর্বদাই আনন্দমুখর হাস্যলহরীপূর্ণ ছিল বলে শুনি। কিন্তু সে দেশ কোথায়? (পৃ. ৪২)

"বঙ্গভূমি যে বহু যুগের বহুবিধ শিক্ষা-দীক্ষার মিলনভূমি; আপাত-প্রতীয়মান যত পার্থক্যের সমন্বয়ভূমি, অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র্যলিপ্সার কৌতূহল

পূর্ণ সাধনভূমি—তাহার নানা পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই ভূমিকে স্বতন্ত্র কেন্দ্র করিয়া ভারতীয় শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতা ভারতবর্ষের বাহিরেও নানা দিগ্দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল কারণে বাঙ্গালীর ইতিহাসকে বঙ্গভূমির চতুঃসীমাভুক্ত সঙ্কীর্ণক্ষেত্রের ইতিহাস বলিয়া বিচ্ছিন্ন-ভাবে অধ্যয়ন করিবার উপায় নাই। তাহা একদিকে যেমন বাঙ্গালীর ইতিহাস, অন্যদিকে সেইরূপ মানবইতিহাসেরও একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় বলিয়া পরিচিত হইতে পারে। মানব-প্রতিভা, দেশ-কাল-পাত্রের প্রভাবে কিয়ৎপরিমাণে বিভিন্ন পন্থায় অগ্রসর হইয়া বিভিন্ন শ্রেণীর পরিণতি লাভের চেষ্টা করিলেও, তাহার অভ্যন্তরে সমগ্র মানব সমাজের অস্ফুট আকাঙ্ক্ষার পরিচয় প্রদান করে। বাঙ্গালীর ইতিহাসেও তাহার সন্ধান লাভের সম্ভাবনা আছে। সে ইতিহাস সন তারিখের তালিকায় ভারাক্রান্ত না হইয়াও অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যের সন্ধান প্রদান করিতে পারে"। ("গৌড়রাজমালা," বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি)। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা যখন বাঙলার লোকবৃত্ত তথা লোকগাথার দিকে নজর দিই তখন লক্ষ্মীমন্ত এক সোনার বাঙলা আমাদের নয়ন সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। যেখানে—

"সোনার কলস, সোনার পালঙ্ক, সোনার ঝারির তো কথাই নাই; ধনীর গৃহে পরিবেশনের সময় সোনার থালা এবং সোনার বাটীর ছড়াছড়ি হইত। ধনবান গৃহস্থের ঘরের মেয়েরা বহু সংখ্যক সহচরীর সঙ্গে নদীর ঘাটে স্নান করিতে যাইতেন। তাহাদের কাহারও মাথায় স্বর্ণকুম্ভ, কাহারও মাথায় সোনার থালায় নীলাম্বরী, অগ্নিপাটের শাড়ী বা মেঘডুম্বর বস্ত্র, কাহারও হাতে নানারূপ গন্ধ তৈল ও প্রসাধনের দ্রব্য।...পাঁচশত টাকার হাতীর দাঁতের শীতল পাটির উল্লেখ অনেক গীতি কবিতায়ই পাওয়া যায়... সোনার বাটায় কেয়া খয়ের, চুয়া ও এলাচি দেওয়া পানের খিলি লইয়া তরুণীরা বাসর ঘরে প্রবেশ করিতেন। গ্রীষ্ম কালে নানারূপ আসবাবে সজ্জিত জলটুঙ্গী ঘর, দীঘির জলে অবস্থিত থাকিত। দম্পতি নানা রহস্য ও মধুর আলাপে রজনী কাটাইয়া দিতেন, দীঘির জলের প্রস্ফুট পদ্মের সুরভি লইয়া বসন্তানিল মাঝে মাঝে সেই ঘরে ঢুকিয়া তাহা সুবাসিত করিয়া দিত। গজমতির মালা, হীরার হার, সোনার দাঁত খোঁচানী কাঠি প্রভৃতি অলঙ্কার পত্র ও বিলাসের সামগ্রী যে কত ছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। 'লক্ষের শাড়ী' তো কথায় কথায় পাওয়া যায়। স্নানের সময় মেয়েরা গলার হীরার হার এবং সোনা ও জহরতের অলঙ্কার খুলিয়া রাখিতেন, পাছে তৈলসিক্ত দেহের

স্পর্শে তাহারা মলিন হয়। সাধারণ রূপ ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে লড়াই করিবার জন্য আটটা, দশটা ষাঁড় থাকিত, 'লড়াই করিতে আছে আট গোটা ষাঁড়' (মলুয়া) এবং প্রত্যেক গৃহস্থের ঘাটেই 'বাইচ' খেলিবার জন্য দীর্ঘ সুদর্শন ডিঙ্গি বাঁধা থাকিত।...এই পল্লী গাথাগুলিতে যে দেশ দেখিতে পাই তাহাই খাঁটি বঙ্গদেশ"। (দীনেশচন্দ্র সেন, "বাংলার পুরনারী", ভূমিকা, ন্যাশনাল লিটারেচার কোম্পানী, ১৯৩৯, পৃ. ২৸০-২৸/০)

ছড়া, প্রবাদ, প্রবচনেও বাঙলার এ চরিত্র দেখতে পাওয়া যেত। প্রাকৃত-জন কোন আব্রু মানত না, সহজ, সরল, স্পষ্ট, স্বাভাবিক জীবনে "এমন দিন ছিল, যখন আমাদের দেশের মেয়েরা কথায় কথায় ছড়া কাটিত; এবং কথায় কথায় প্রবাদের অবতারণা পুরুষের রসিকতার অঙ্গ ছিল·· যাঁহারা এগুলি বাস্তব জীবনে অনুভব করিয়াছিলেন, তাঁহারা এ কালের নন, সেকালেরও নন, সর্বকালের বাঙালী···কিন্তু বাঙালী জীবনের এই সনাতন সংস্কার ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক হারাইয়া, বর্তমান শিক্ষিতমনা বাঙালী তাহার বাঙালীত্বটুকুও হারাইয়াছে, সস্তায় পরের ধনে বড়মানুষি করিতে গিয়া নিজের ঘরের পুঁজির কথা ভুলিয়া গিয়াছে...ইহা ভাবের সৃষ্টি নয়, আদর্শের কথা নয়, একান্ত ঘরের কথা। সাংসারিক ঘটনা, প্রত্যক্ষ অনুভূতির অকৃত্রিম প্রকাশ। প্রায় প্রত্যেক ছড়ার টুকরায়, প্রায় প্রত্যেক তুচ্ছ কথায়, বাঙালী ঘরের বহু বিচিত্র বিস্মৃত সুখদুঃখ ও হাস্যকৌতুকের কণা শতধা বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু ইহাতে বাংলাদেশের প্রাত্যহিক গৃহস্থালীর দ্বন্দ্ব কলহ, দ্বেষ হিংসা, উত্তেজনা অবসাদ, দৈন্য সঙ্কীর্ণতা, অক্ষমতা, অসহিষ্ণুতা, পানাপুকুরের ঘাট হইতে পিছনের আঁস্তাকুড় পর্যন্ত কোন কিছুই বাদ পড়ে নাই। এখানে মানুষ দেবতা নয়, তাহার ভালমন্দ লইয়া রক্ত-মাংসে গড়া"। (ডঃ সুশীল-কুমার দে, "বাংলা প্রবাদ", ১ম সং ভূমিকা, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, পৃ. ১৯-২৭)

রক্তে মাংসে গড়া এই মানুষের সমাজে শ্রেণীভেদ আছে, শাসক ও শাসিত আছে, শোষক ও শোষিত আছে। শাসক ও শোষকেরা চায় কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখতে। শোষিত চায় কায়েমী স্বার্থ ভেঙে ফেলতে। জীবনকে শ্রীমণ্ডিত করতে উন্মুক্ত হয় নতুন স্রোত। দুর্বার বলে শক্তিশালী বাঙালী নতুনের ডাক দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববর্তী যুগের সংস্কৃতির কালগত, বস্তুগত ও গুণগত পার্থক্য দেখা দেয়। নতুন বনিয়াদ, রূপ ও ধর্ম একেবারে আলাদা না হলেও নতুন স্বরূপে এসে হাজিরা দিল।

৫. কালে এই বিজয়ী বাঙালী এমন সমাজ গঠন করল যেখানে শিশু থেকে যুবক, চণ্ডাল থেকে ব্রাহ্মণ সকলের সমন্বয় সাধিত হয়েছিল (পৃঃ ১৭)

বাঙলার সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে অভাবনীয় রূপান্তর আনলেন শ্রীচৈতন্য। বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রীকৃষ্ণ, বৈষ্ণবদের শ্রীরাধিকা জীবনের প্রাণের মর্মে শতদলের উপর প্রতিষ্ঠিত হল। তাঁর লীলার মধ্য দিয়ে যুগল-রূপের মধ্যে বাঙলার শিক্ষাদীক্ষা সাধনা বিচিত্ররূপে প্রকাশ লাভ করল। "শ্রীকৃষ্ণের সময়ে শ্রীকৃষ্ণে ভাগবত্ত্ব, গোপীগণেতে ভক্তত্ব, এইরূপ ভিন্নতা ছিল। প্রেমপূর্ণ্য শ্রীচৈতন্যে এ দুইয়ের মিলন হইয়াছে।...এরূপ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের এই বিষয় পার্থক্য রহিল যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মসহ যে নিত্য অভিন্নতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্য প্রকাশ করেন নাই।...শ্রীচৈতন্য বিশ্বাস করিতেন, আনন্দঘন ঈশ্বর আপনার আনন্দ ও চিৎস্বরূপের সারভূত যে প্রেম, তৎসম্ভূত ভাবনিচয় সহকারে নিত্যকাল বিহার করেন, এই সকল ভাব তাঁহারই স্বরূপশক্তি, ভক্তজনে সামান্যতঃ ভক্তিরূপে প্রকাশ পায়।...শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ সময়ে তাঁহার সঙ্গে বৃন্দাবনে, মথুরায় এবং দ্বারকাতে ভিন্ন ভিন্ন ভাব গোপকন্যা ও মহিষীগণেতে অবতীর্ণ হইয়াছিল। মহিষীগণও গোপকন্যাগণের আবির্ভাব। গোপী বৈষ্ণবমতে প্রকৃতি। ঈশ্বরের স্বরূপশক্তি আনন্দ ও চিৎস্বরূপের সারভূত প্রেম। যদিও সুকোমলা ভক্তি নারীস্বরূপা, তথাপি পুরুষগণেতেও উহা আবির্ভূত হইয়া থাকে।...শ্রীচৈতন্যের আগমনের পূর্বে ভক্ত, ভাগবত, বৈষ্ণব, পাঞ্চরাত্র, বৈখানস ও কর্মহীন, এই ষড়বিধ বৈষ্ণব সম্প্রদায় ছিল ; কিন্তু সে সকলেতে এরূপ উচ্চমত দৃষ্ট হয় না। এক শ্রীচৈতন্য এই অভূতপূর্ব মত প্রকাশ করিয়া, ভক্তি পথের পূর্ণতা সাধন করিয়াছেন" (উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, "শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম", নববিধান প্রেস, কলিকাতা, ১৯৪০, পৃ. ২৮২-৮৪)। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, "গুপ্ত সম্রাটদের অধিকারকালে ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বীরা প্রধানত ও তাঁর বিভিন্ন অবতার মূর্তি এবং শিবলিঙ্গ ও শিবমূর্তি (একক অথবা অর্ধনারীশ্বর বা উমা মহেশ্বর) প্রতিষ্ঠা করে পূজা করত। সূর্য প্রতিমা পূজা এবং সূর্য পূজাও প্রচলিত ছিল। দেবী (চণ্ডী)-প্রতিমা নির্মাণ ও পূজাও অজ্ঞাত ছিল না। বাংলাদেশে যে বৌদ্ধধর্ম মত চলিত ছিল তা মহাযান সম্প্রদায়ের। তান্ত্রিকমহাযান মতে বহু দেবদেবীর ও উপদেবতার উপাসনা চলত। এই সব দেবতার সৌম্য অথবা বীভৎস মূর্তিও

তৈরী হত। পালবংশ অধিকারের শেষভাগ থেকেই এই সব দেবদেবী ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ্যমতের মধ্যে ঢুকতে থাকে। তারা, চামুণ্ডা, বাসলী, ভৈরব, ক্ষেত্রপাল, গণেশ ইত্যাদি দেবতার পূজা এই ভাবেই এসে গেছে। বিশেষ বিশেষ জাতি বা সঙ্ঘ বিশেষ বিশেষ দেবতার পূজা প্রচলনে অগ্রণী হয়েছিল। গণেশের পূজা বোধ হয় বণিকদের দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল। বাংলাদেশে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী বহুকাল থেকে প্রচলিত থাকলেও এই কাহিনীকে অবলম্বন করে তত সহজে ভক্তিধর্মের বিকাশ হয় নি যত সহজে হয়েছিল অবলোকিতেশ্বর লোকনাথকে আশ্রয় করে। অবশ্য রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর সঙ্গে ভক্তিধর্মের সংস্রব যে ছিল না তা বলি না কেননা সদুক্তিকর্ণামৃতের একটি শ্লোকে (১.৫৮.৫) তার বিরুদ্ধ প্রমাণ আছে। কুলশেখরের শ্লোক চারটিও (১.৬৪.১-৪) এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য" (ডঃ সুকুমার সেন, "প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী", বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, বিশ্বভারতী, ২য় সং, ১৩৫৩, পৃ. ৩১-৩২)। বিস্তারিত তথ্যের জন্য "খৃষ্টাব্দ সপ্তম শতাব্দীর গোড়া হইতে একাদশ শতাব্দীর শেষ এবং দ্বাদশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত প্রায় পাঁচশত বর্ষ কালের বাঙলার সামাজিক ও ধর্মমতের ইতিহাস না জানিলে পরবর্তী বাঙলার প্রকৃত পরিচয় আমরা পাইতেই পারিব না। কারণ, এই পাঁচশত বৎসরে বাঙলার সমাজে যে ছাপ পড়িয়াছিল, তাহা এখনও অনেকটা বজায় আছে। এই ছাপের কৃষ্ণানন্দ, পূর্ণানন্দ, ত্রিপুরানন্দ প্রভৃতি তান্ত্রিক মহামহোপাধ্যায় সিদ্ধসাধুগণ নূতন রং ফলাইয়া গিয়াছেন; এই ছাপের উপর অদ্বৈতাচার্য, শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ আরেক রং ফলাইয়াছেন। এই দুই রঙের সামঞ্জস্য ঘটাইবার উদ্দেশ্যে হলায়ুধ, জীমূতবাহন, শূলপাণি হইতে রঘুনন্দন পর্যন্ত স্মার্ত ভট্টাচার্যগণ আরও কারচুপী করিয়াছেন। এই তিনের সমবায়ে বর্তমান হিন্দু সমাজ। এই তিনের মহিমা বুঝিতে পারিলে বর্তমান হিন্দু সমাজের প্রভাব ও বিন্যাস বুঝা যাইবে" (পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য, কার্তিক, ১৩১৯)। বোঝা যাবে লোক-সমাজকে, বাঙলার আপামর জনসাধারণকে, শাসককে, শাসিতকে, রাজসভাকে। রাজসভার পোষকতায়ই বাংলাদেশে সংস্কৃত ও লৌকিক পুরাণ এবং সাধারণ সাহিত্যের চর্চা চলতে থাকে। কিন্তু বাঙলার জমিদার থাকতেন পল্লীতে, জমিদার পোষিত বাঙালী শিল্পীদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ নিকটতর ছিল। বাঙলার মুসলমানও প্রধানত শহরবাসী নন, পল্লীবাসী। পল্লীকে কেন্দ্র করেই তাই বাঙালীর সভ্যতা, বাঙালীর সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। সে সভ্যতা ও সংস্কৃতি শাসক ও শাসিতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি হলেও

অন্যান্য দেশের তুলনায় শাসক ও শাসিতের জীবন এখানে বহুলাংশে ছিল তফাৎহীন। তাই "সংস্কৃতির দিক দিয়ে শ্রীচৈতন্য প্রান্তীয় বাংলাদেশকে ভারতবর্ষের সঙ্গে জুড়ে দিলেন আর আকবর বাংলাদেশকে জয় করে তাকে মোগল সাম্রাজ্যের অংশ বিশেষে পরিণত করলেন।...শ্রীচৈতন্যের ধর্মের প্রভাবে শক্তি উপাসনাতেও অচিরে ভক্তি রসের সঞ্চার হল। তান্ত্রিকতা লুপ্ত হল না বটে কিন্তু তার বিষদাঁত গেল ভেঙ্গে। অর্থাৎ উপাস্য-উপাসকের সম্পর্কের ভয় ভক্তির স্থানে বাৎসল্য প্রীতির হৃদয় সম্পর্ক স্থাপিত হল। প্রাচীন পাঠান সেনাপতিরা যুদ্ধে মারা গেলে গাজী-পীররূপে পূজা পেতেন মুসলমান সাধুরা তো সম্মান পেতেনই। ক্রমশ: এইসব পীরস্থানের মাহাত্ম্য সর্বসাধারণের মধ্যে স্বীকৃত হল"। (ডঃ সুকুমার সেন, "মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী", বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, শ্রাবণ, ১৩৫২)

মুসলমান যুগ অবধি এই ভাবেই বাঙলার পল্লী তথা লোকজীবন এগিয়ে যাচ্ছিল। ইংরেজ আমলে এর রূপ গেল পাল্টে। ফলে লোকজীবনের সঙ্গে শিক্ষিত তথা বাবুজীবনের তফাৎ বেড়ে চলল। শরিয়তী ইসলামের প্রসারে গ্রামীণ মানুষ বা লোক সমাজের মধ্যেও তফাৎ চিহ্নিত করণের প্রয়াস দেখা দিল। জমিদারী আমলে পল্লী বাঙলার হিন্দু-মুসলমান প্রায় একই স্তরে বিচরণ করছিল। পার্থক্য ছিল ধর্মীয় আচার আচরণে। ইংরেজ প্রবর্তিত নব জমিদারতন্ত্র একই স্তরের জীবনযাত্রার মধ্যে বেড়া খাড়া করে দেয়। ফলে লোকবৃত্তের অখণ্ড সত্তা ভেঙ্গে যায়। এবং লোকজীবন খণ্ডিত হয়ে পড়ে। নতুন সমাজের নতুন লোকেরা প্রাচীনকে বর্জন করে আধুনিক হতে চাইল, তাদের সে দাবী মেটাতে প্রায়শই অক্ষম হয় লোক-সমাজ। ফলে বাঙলার জীবন সুস্পষ্ট দুটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি লোক-সংস্কৃতি অপরটি শহুরে ভদ্র-সংস্কৃতি। প্রথমটি মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে। দ্বিতীয়টির মূল মাটিতে নেই। মাটি আঁকড়ে যাঁরা পড়ে আছেন তাঁরা খাঁটি বাঙালী, তাঁরা গ্রামের প্রকৃত জন, তাঁরা লোকসমাজভুক্ত, তাঁরা ঐতিহ্যে অটল।

৫: বাঙালীর অন্যতম গর্ব বাঙলার লোক-সমাজ (পৃ. ১৮)

"বিচিত্র জনগোষ্ঠীর লোক লইয়াই বৃহত্তর বাঙালীজনের গঠন...ফলে বাংলাদেশের সর্বত্র এবং সমগ্র বাঙালী জীবন ব্যাপিয়া সভ্যতা ও সংস্কৃতি একই স্তর বা ক্রমবিস্তৃত নয়। এমন কি একই সভ্যতা ও সংস্কৃতিও নয়—আজও নয়, প্রাচীনকালেও ছিল না।...তাহার ফলে আমাদের সমাজের ও জীবনের নানাস্থানে অসমতা, অসংগতি; কোথাও গতি একেবারে স্তব্ধ ও নিরস্ত,

কোথাও খুব দ্রুত ও চঞ্চল। কোথাও আমরা চলিয়াছি সাম্প্রতিক প্রাগ্রসর পৃথিবীর সঙ্গে সমতালে, কোথাও পড়িয়া আছি প্রাগৈতিহাসিক বর্বরতার মধ্যে...শুধু আদিপর্বেই নয়, সমস্ত মধ্যযুগ ব্যাপিয়া এবং বহুলাংশে এখনও বাঙালী জীবন প্রধানত গ্রাম-কেন্দ্রিক, এবং বাঙালী সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রামীণ। গ্রামকে কেন্দ্র করিয়াই সাধারণ বাঙালীর দৈনন্দিন জীবন এবং তাহার সমস্ত ভাবকল্পনা আবর্তিত হইত।...বাংলার যে সব নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল সেগুলিকেও আকৃতি-প্রকৃতিতে বৃহত্তর ও সমৃদ্ধতর গ্রাম ছাড়া আর কিছু বলা চলে কিনা সন্দেহ।...ইহাদের অশন-বসন, বিলাস-আরাম, সুখসুবিধা, দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র কর্তব্য প্রভৃতি সম্পাদনার জন্য প্রয়োজন হইত নানা শ্রেণীর নানাবৃত্তির সমাজ সেবক ও সমাজ শ্রমিক শ্রেণীর অসংখ্যতর 'ইতর' জনের—প্রাচীন লিপিমালায় যাঁহাদের বলা হইয়াছে 'অকীর্তিত' বা অনুল্লিখিত জনসাধারণ। ইঁহাদের ছাড়াও সমাজ চলিত না; এই অকীর্তিত জনসাধারণও সমাজের অঙ্গ বিশেষ, এবং সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে ইঁহাদেরও স্থান ছিল, ইঁহাদেরও ধর্মবিশ্বাস ছিল, দেবদেবী ছিল, পূজানুষ্ঠান ছিল, সংস্কৃতির একটা ধারা ছিল।...সুপ্রাচীন বাংলার শ্রেণী-বিন্যাস সম্বন্ধে পঞ্চম শতকের আগে উপাদানের অভাবে কিছু বলা কঠিন।...পঞ্চম শতকের গোড়া হইতে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত...বাঙালী সমাজ প্রধানত শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্য নির্ভর...ষষ্ঠ-শতকেই সামন্তপ্রথা স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে... সপ্তম-শতকের শেষার্ধে ও অষ্টম শতকের প্রায় সবই জুড়িয়া রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আবর্ত...অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত অর্থাৎ আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত বাঙালী সমাজ প্রধানত ও প্রথমত কৃষি-নির্ভর। সামন্তপ্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত, ভূমিই সমাজের প্রধান সম্পদ...।" (ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, "বাঙালীর ইতিহাস", আদি পর্ব, বুক এম্পোরিয়াম কলিকাতা, ১৩৫৬) ভূমি নির্ভর মানুষ সহজ সরল।

এই সরল বা লোকসমাজের সামাজিক শ্রেণীরূপ সেদিন অবধি ছিল স্তরবদ্ধ। তাঁরা থাকতেন খড়পাতার কুটিরে, চাষআবাদ করতেন, এবং যাজন-ভজন-উৎসব-পার্বণে দিন কাটাতেন। উনিশ শতকের ব্রিটিশ শাসন-নীতির সংঘাতে গ্রামীণ বা লোকসমাজের পরস্পরবিচ্ছিন্ন খণ্ডরূপ ধূলিসাৎ হয়ে যায়। সামাজিক গতিশীলতার উত্থান-পতন এবং জোয়ার-ভাঁটার মধ্যেও লোকসমাজ বাঙালীয়ানা, প্রাচীন ঐতিহ্য বজায় রাখলেন আর শহুরেসমাজ পাশ্চাত্যানু-করণের মোহে বিজাতীয় ভাবধারায় আক্রান্ত হলেন। সেই থেকেই লোকসমাজ আমাদের নির্ভেজাল অতীত বহন করে গর্বের বিষয়ে পরিণত হয়েছেন। অবশ্য

৬. অহঙ্কার করার মত শ্লাঘনীয় জিনিষের অভাব নেই বাঙালীর (পৃ. ১৯)

"দেড়শত বছর পূর্বে একজন সাহেব বলিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালার জমি এত উর্ব্বরা, বাঙ্গালায় এত শস্য উৎপন্ন হয়, বাঙ্গালায় এত বড় বড় নদী আছে, নৌকাযোগে বাঙ্গালার এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত এত সহজে যাওয়া যায়, ইহার জঙ্গলে এত অদ্ভুত পদার্থের উৎপত্তি হয়, ইহাতে এত লোক আছে, তাহারা এইরূপ পরিশ্রমী ও মিতাচারী যে বোধ হয়, বাঙ্গালা অতি প্রাচীনকালে সভ্যতার অতি উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। যে কেহ মন দিয়া বাঙ্গালার কথা ভাবিয়াছে, বাঙ্গালাকে ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহাকেই বলিতে হইবে বাঙ্গালা একটি অতিপ্রাচীন সভ্যদেশ…বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা জলে ও স্থলে এত প্রবল হইয়াছিল যে, বঙ্গরাজের একটী ত্যাজ্যপুত্র সাতশত লোক লইয়া নৌকাযোগে লঙ্কাদ্বীপ দখল করিয়াছিলেন।…বঙ্গদেশের শ্রীবৃদ্ধি রাজার জন্য নহে, রাজনীতিতে বঙ্গ কখনই তত প্রবল হয় নাই।…বাঙ্গালার গৌরব শিল্পে, বাণিজ্যে, কৃষিকার্য্যে এবং উপনিবেশ সংস্থাপনে। যখন লোকে লোহার ব্যবহার করিতে জানিত না, তখন বেতে বাঁধা নৌকায় চড়িয়া বাঙ্গালীরা নানাদেশে ধান চাউল বিক্রয় করিতে যাইত। সে নৌকার নাম 'বালাম নৌকা'।… তমলুক হইতে জাহাজসকল নানা দেশে যাইত। ফা হিয়েন তমলুক হইতেই গিয়াছিলেন … বহু প্রাচীন সাহিত্যে উহার নাম দামলিপ্তী অর্থাৎ উহা দামাল জাতির একটি প্রধান নগর। বাঙ্গালায় যে এককালে দামল বা তামল জাতির প্রাধান্য ছিল, ইহা হইতে তাহাই কতক বুঝা যায়…প্রাচীন কালে কৃষি বিষয়ে বাঙ্গালীর কৃতিত্বের কথা সকলেই জানেন…কার্পাস তুলা চাষের জন্য বঙ্গদেশ বহুকাল হইতেই প্রসিদ্ধ। তুঁতের চাষ ভিন্ন রেশম হয় না। তুঁতের চাষ প্রভূত পরিমাণে না থাকিলে বাঙ্গালাদেশ রেশম শিল্পে এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিত না। শণ, পাট, ধঞ্চে এখনও বাঙ্গালার একচেটিয়া, চিরদিনই একচেটিয়া ছিল।…" (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, "হরপ্রসাদ রচনাবলী," সম্পাদক —শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঅনিল কাঞ্জিলাল, ইস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানী, কলিকাতা, ১৩৬৩ (?), পৃ.২৩৩-২৩৭)। স্ব-শাসিত গ্রামনির্ভর জীবনে

৭. রাষ্ট্র কাঠামোর পরিবর্তন বা অদলবদলে লোকজীবনে খুব একটা চাঞ্চল্য দৃষ্ট হয় না। (পৃ. ২০)

"গ্রামের আর্থিক জীবন পরিচালনা করিবার ভার কারিগর, শিল্পী, চাষী, জাতিবৃন্দের উপর ন্যস্ত ছিল। গ্রামের প্রয়োজন অনুযায়ী সকলে উৎপাদন করিত। পরস্পরের মধ্যে প্রাপ্য, অর্থ বা শস্যের সহায়তায় মেটানো হইত। সকলেই পরস্পরের উপর নির্ভর করিয়া চলিত। এমনও দেখা গিয়াছে, যদি কোন কারিগরের সহিত এক গৃহস্থের বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন গ্রামের আর পাঁচজন মিলিয়া সেই বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা করে। আর্থিক ব্যাপারের জন্য ব্যবসা পরিবর্তন করিবার স্বাধীনতা যেমন স্বীকৃত হইত না, সকলেই কৌলিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া চলিত, তেমনই আবার গ্রামের কোন কারিগর অন্নাভাবে কষ্ট না পায় ইহাও গ্রামের পাঁচজন দেখিবার চেষ্টা করিত।...বিভিন্ন জাতি পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার বন্ধন বহু শতাব্দী ধরিয়া অক্ষত অবস্থায় টিকাইয়া রাখিয়াছিল। রাজনৈতিক গগনে শাসকের পর শাসক উদয় হইয়াছে। দেশে বিদ্রোহ, বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ, মহামারী বারংবার দেখা দিয়াছে তবু জীবনের ভারকেন্দ্র গ্রাম্য সমাজের অর্থনীতি ও সমাজনীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া মানুষ গ্রামের শাসন এবং কৌলিক বা জাতিগত আইনের শৃঙ্খলার জোরে এই সকল আগন্তুক আঘাতকে বার বার উপেক্ষা করিয়া জীবনের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে" (নির্মলকুমার বসু, "হিন্দু সমাজের গড়ন," বিশ্বভারতী, কলিকাতা, পৃ. ৯১-৯২)। তাই প্রাচীন সমাজে রাষ্ট্রিক বিপর্যয়ের ঝড়ঝঞ্ঝায় গ্রাম্য সমাজের শান্তি বিঘ্নিত হয়নি। যদিও সেখানে রাজা ও প্রজার মধ্যে দূরত্ব ছিল অনেক। অদৃশ্য দেবতার মত ছিল রাজার আসন।

৮. প্রাচীন বাঙলায় রাজা ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব ছিল সমাজ ব্যবস্থাকে রক্ষণ ও পালন করা (পৃঃ ২৩)

ইংরেজ আগমনে আমাদের জীবনের মূল্যবোধ গেল পালটে। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সংঘাতে আমাদের কৃষিপ্রধান সমাজ গেল ভেঙে। ধ্বংস হল কুটীর-শিল্প। রাজা সমাজ ব্যবস্থা রক্ষা না করে শোষণ করে চললেন। ভূমিরাজস্বের ব্যাপারেও দেখা দিল ধনতান্ত্রিক ব্যবসাবুদ্ধি। কুটীরশিল্প ধ্বংস হলে আমরা একদম ভূমিনির্ভর হয়ে পড়লাম। অত্যধিক শোষণের ফলে সেখানেও এল দুর্গতি। আমরা এতকাল চরমার্থ ও পরমার্থ ভেবে জমি আঁকড়ে ছিলাম, এক মুহূর্তে গেল ভেসে। জনবৃদ্ধি ও জমির অভাবে দীনতা বেড়ে চলল।

৯. বৌদ্ধধর্মমতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েও বাঙালী বৌদ্ধ মহাযান-মতকে বজ্রযান সহজযান ও তন্ত্রসাধনার পথে বিবর্তিত করতে পেরেছে (পৃ. ২৬)

"বহু বৎসর ধরিয়া তন্ত্র চর্চার ফলে দিন দিন এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছে যে, তন্ত্রশাস্ত্রকে বাঙালীরাই পূর্বকালে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। পুস্তকের দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা, মূর্তির দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা, যোগের দ্বারা এবং সাধনার দ্বারা প্রতিনিয়ত বাঙালীরা বজ্রযানকে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ দেবসঙ্ঘকে সমৃদ্ধ ও মহিমান্বিত করিয়াছিলেন। তন্ত্রের ভিতর দিয়া আত্মোন্নতি করিবার মার্গ আর কোন দেশে সৃষ্ট হয় নাই। এই আধ্যাত্মিক সাধনার সফলতার জন্যই ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত। আধ্যাত্মিক উন্নতির এই অপরূপ এবং অভিনব মার্গ বাঙালীরই একটা বড় অবদান, এবং পৃথিবীর সংস্কৃতিতে ভারতের শ্রেষ্ঠ উপঢৌকন। তিব্বতীরা মনে করেন যে তন্ত্রের উৎপত্তি বাংলা দেশের উড্ডিয়ান নামক স্থান হইতে। এই স্থানে যে যোগী বা সিদ্ধাচার্য ছিলেন, এবং শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক ছিলেন তাঁহাদের বসবাস ছিল বাংলাদেশে। তন্ত্রের আদিপীঠ ছিল উড্ডিয়ানে, এবং অপরগুলি ছিল কামাখ্যা, শ্রীহট্ট ও পূর্ণগিরিতে। সব পীঠগুলি বাংলাদেশে ছিল বলিলে একটু অব্যাপ্তি ঘটে, তাই বলিতে হয় এই পীঠগুলি ছিল বৃহত্তর বাংলায়। তন্ত্র উড্ডিয়ান হইতে উৎপন্ন হইয়া অপর তিনটি পীঠে অর্থাৎ শ্রীহট্ট, কামাখ্যা ও পূর্ণগিরিতে বিস্তৃত হয়। তথা হইতে বৃহত্তর বাংলায় এবং বাংলার বাহিরে বিহার কাশী ও উড়িষ্যায় বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বজ্রযান তন্ত্রমার্গ বাঙ্গালীদের নিজস্ব সম্পত্তি। এই আধ্যাত্মিক সাধনার পথ বাঙ্গালী আজ ভুলিয়াছে। আবার যখন ইহাকে জানিবে, নূতন উদ্যমে আবার ইহাকে সমৃদ্ধ করিবে সন্দেহ নাই।" (শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য, "বৌদ্ধদের দেবদেবী", কলিকাতা, পৃ. ১২৯-৩০), "বাংলা সাহিত্যে শতবর্ষের বৌদ্ধ অবদানকে 'গুরুঠাকুরী', 'বিদ্যাসাগরী', 'নবীনসেনী', 'নবং' এবং 'পাশ্চাত্য'—প্রধানত এই পাঁচ যুগপর্যায়ে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক যুগপর্যায়ে আদি অন্ত ও মধ্য এই তিন যুগ কল্পনা করা চলে। ...সম্ভবতঃ পার্বত্য চাকমা জাতির মধ্যে প্রচলিত ও সমাদৃত সাতটি 'গোজেলের লামা'ই আধুনিক যুগে বাংলায় বৌদ্ধ সমাজের প্রথম উপাদেয় পালাগান, যাহাতে পুরাতন 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা'র ধারার কিছু না কিছু রক্ষিত আছে বলিয়া মনে হয়" (ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া "বাংলা-সাহিত্যে শতবর্ষের বৌদ্ধ-অবদান", সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫২শ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৫২, পৃ. ৫০-৫১)

১০. জাতীয় জাগরণ ও রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে বিষয় অধ্যয়নেরও রূপান্তর ঘটেছে (পৃ. ২৫)

"বাঙালীই হিন্দু, অথচ হিন্দু নয়; সে যেমন সনাতনী, তেমনই যুগ-বিপ্লবের পতাকাধারী; সে বেদান্তী নয়। সে শাক্ত—মহামায়ার উপাসক। সে জীবনকে ত্যাগ করিতেও যেমন জানে, ভোগ করিতেই তেমনই উৎসুক; সে চরকা ঘুরাইতে পারে না—ঘুমাইয়া পড়ে, কিন্তু ভিন্নতর কর্মের আহ্বানে সে নিশীথ-নিদ্রা হইতেও জাগিয়া উঠে; সে Soul-force-এর উপবাস সহ্য করিতে পারেনা, এবং বুদ্ধের অহিংসার পরিবর্তে গীতার অহিংসাকে অধিকতর সত্য বলিয়া মানে। এই বাঙালীই নবযুগের উদ্বোধন করিয়াছিল, এই বাঙালীই আজ এই চরম দুর্দশার দিনেও, জাতীয়তার সেই তান্ত্রিক আদর্শকে যেরূপ অবয়বী করিয়া তুলিয়াছে, তাহারই ইঙ্গিতে অন্ধকারেও পথ মিলিতে পারে..." (মোহিতলাল মজুমদার, "বাঙলার নবযুগ," বিদ্যোদয়, ১৯৬৫, ভূমিকা পৃ. ১৭-১৮) প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে "উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙলা গদ্যের ইতিহাস নিতান্ত হাঁটি-হাঁটি-পা-পা অবস্থার ইতিহাস, বাংলা গদ্যের ভাষা তখন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের বাহন হইয়া উঠিবার সামর্থ্য অর্জন করে নাই; যে অবসর এবং মনের উদ্বৃত্ত শক্তি মানুষের শিল্প ও সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা দান করে এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সামান্যতাকে অতিক্রম করিয়া অসামান্য কল্পলোকে বিহার করিবার অবকাশ ও উপাদান যোগাইয়া তাহাকে মহত্তর জীবনের পথে লইয়া যায়, বাঙালী মঙ্গলকাব্য, টপ্পা, পাঁচালী ও কবিগান রচনায় সেই অবসর ও শক্তি নিয়োগ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছিল।...যে যুগে প্রাকৃত ও অপভ্রংশের খোলস সদ্য পরিত্যাগ করিয়া দুর্বোধ্য সন্ধ্যাভাষায় বৌদ্ধ চর্যাপদ রচিত হইয়াছিল, সে যুগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা কোন ভাষায় পরস্পর মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন, অনুমান করা ছাড়া তাহা জানিবার আজ উপায় নাই।...বাঙলা অক্ষরের মুদ্রিত প্রতিলিপির আদিতম নিদর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন ফাদার এইচ হস্টেন। ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত একটি পুস্তকে বাংলা অক্ষরের প্রতিলিপি সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়।...এখন পর্যন্ত যতদূর জানা যায়, ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ছাপাখানার প্রবর্তন করেন পোর্তুগীসেরা...১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী শহরে ছেনি-কাটা বাংলা হরফে মুদ্রণ আরম্ভ হয়...এক হিসাবে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে যে ভাষার প্রামাণিক আত্মপ্রকাশ দেখিতেছি, তাহা বাংলা দেশে মুসলমান-প্রভাবের ফল।...অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে বাঙালীর দান নাই বলিলেই হয়। যে একজন মাত্র বাঙালীর নাম অষ্টাদশ শতকের শেষ ভগে পাই, তিনিও ইহাদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, ইহাদের উৎসাহ ও অন্নে প্রতিপালিত; স্বাধীনভাবে

বাংলাসাহিত্য সম্পর্কে ইঁহার কোন কীর্তিই নাই। এই একক বাঙালীর নাম রামরাম বসু।...একটি বৃহৎ জাতির অন্তরের সর্ববিধ ভাব প্রকাশের পক্ষে বাংলা ভাষাই যথেষ্ট, মাতা সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোন ভাষার উপর নির্ভর না করিলেও তাহার চলিতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বৈদেশিক কেরী যাহা বুঝিয়াছিলেন, বাঙালী প্রধানদের তাহা সম্যক প্রণিধান করিতে আরও শতাব্দীকাল সময় লাগিয়াছিল। কিন্তু কেরীর সেদিনকার চিন্তা ও ভাবনার ফসল আমরাই পাইয়াছি এবং পাইয়া লাভবান হইয়াছি।...১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে বাংলা সাহিত্যের উপর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ তথা মিশনারীদের প্রভাব স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে এবং রামমোহন রায়, রামকমল সেন, তারিণীচরণ মিত্র, গৌরাঙ্গমোহন বিদ্যালঙ্কার, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে ··১৮১১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বাংলা গদ্য সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ আরম্ভ হইয়াছে," (সজনীকান্ত দাস, "বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস" মিত্রালয়, পরিবর্ধিত সং ১৩৬৯)। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, "প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন বাঙ্গালী অধ্যাপক মতির মালা গলায় ও জরির জুতা পায়ে দিয়া বসিয়া পড়াইতেছেন, কি চমৎকার বোধ হয়।...সর্বপ্রথমে লোকের ইংরেজী পড়িতে হইলে টামস্ ডিস্ প্রণীত স্পেলিং বুক, স্কুল মাষ্টর, কামরাপা ও তুতিনামা এই সকল পুস্তক পাঠ করিতে হইত।...তখন লোকে ডিকসনরি মুখস্থ করিত।...তখন ঘোষাণোর রীতি ছিল। ঘোষাণোর অর্থ পয়ারছন্দে গ্রথিত কোন দ্রব্য-শ্রেণীর অন্তর্গত সমস্ত দ্রব্যের ইংরেজী নাম সুর করিয়া মুখস্থ বলা। আপনি এক স্কুল দেখিতে গেলেন, স্কুল মাষ্টার আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কি ঘোষাব? গ্যার্ডেন (Garden) ঘোষাব, না স্পাইস (spice) ঘোষাব?···যদি স্থির হইল গ্যার্ডেন ঘোষাও, অমনি··· পামকিন লাউকুমড়া, কোকোম্বর শসা। ব্রিঞ্জেল বার্তাকু, প্লোমেন চাষা।" (রাজনারায়ণ বসু, "সেকাল আর একাল," শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৬৩, ২য় সং পৃ. ২৪-২৫)। ক্রমে স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্তন হয়। ১৮৫৬ সনের ২৪শে ডিসেম্বর কলিকাতা বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা (বিদ্যাসাগর), সম্পাদক এবং সিসিল বিডন, সভাপতি, এবং সদস্যবৃন্দ রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সিংহ, শ্রীরামপ্রসাদ রায়, শ্রীকালীপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করে বলেন—"ভদ্র জাতি এবং ভদ্র বংশের বালিকারা এই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে, তদ্ব্যতীত আর কেহই পারে না। যাবৎ

কমিটির অধ্যক্ষদের প্রতীতি না জন্মে অমুক বালিকা সদ্বংশজাতা, এবং যাবৎ তাঁহারা নিযুক্ত করিবার অনুমতি না দেন, তাবৎ কোন বালিকাই ছাত্ররূপে পরিগৃহীত হইবে না। পুস্তক পাঠ, হাতের খেলা, পাটীগণিত, পদার্থ বিজ্ঞান, ভূগোল ও সূচিকর্ম, এই সকল বিষয়ে বালিকারা শিক্ষা পাইয়া থাকে। সকল বালিকাই বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করে। আর যাহাদের কর্তৃপক্ষীয়েরা ইঙ্গরেজী শিখাইতে ইচ্ছা করেন তাহারা ইঙ্গরেজীও শিখে। বালিকাদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা ও বিনা মূল্যে পুস্তক দেওয়া হইয়া থাকে। আর যাহাদের দূরে বাড়ী এবং স্বয়ং গাড়ী অথবা পাল্কী করিয়া আসিতে অসমর্থ, তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে আনিবার ও বিদ্যালয় হইতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত গাড়ী ও পাল্কী নিযুক্ত আছে।" ("সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র," প্রথম খণ্ড, সম্পাদক, শ্রীবিনয় ঘোষ, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৬২, পৃ. ৩৬৫)। এই প্রসঙ্গে সেকালের শিশু শিক্ষার নমুনাস্বরূপ শিবনাথ শাস্ত্রীর অভিজ্ঞতা স্মরণ করি। তিনি জনৈক শিক্ষার্থীর সম্মুখে বই খুলে রেখে বললেন, "'দেখো, তুমি খারাপ ছেলে, আর আমি ভাল ছেলে'। সে জিজ্ঞাসা করিল 'কেন?' আমি উত্তর করিলাম, 'আমি পড়তে পারি, তুমি পড়তে পার না। এই দেখো আমি পড়ি।' এই বলিয়া ক খ গ ঘ পড়িয়া চলিলাম। সে আমাকে পড়িতে দেয় না, বলিল 'আমিও পড়িতে পারি।' আমি বলিলাম, 'আচ্ছা পড়।'... চাকরকে বলিলাম, 'একটা মাদুর পেতে দে, আমাদের একটা খেলা হবে।' অমনি ক্লাশশুদ্ধ ছেলে আমাকে ঘেরিয়া ফেলিল, 'দেখান, কি খেলা হবে? আমি—রোসো না, দেখবে এখন, খুব মজার খেলা হবে।...খেলা আরম্ভ হইল। আমি শ্লেটে লুকাইয়া একটি ঘোড়া আঁকিলাম। তাহার জিভ বাহির হইয়া আছে। শেষে তাহার জিভে 'ক' লেজের আগায় 'খ', পায়ের খুরে 'গ' এইরূপে বর্ণমালার অক্ষরগুলি লিখিলাম। শেষে সেই ঘোড়া যখন সকলের সম্মুখে বাহির করিলাম, তখন মহা হাস্যের রোল উঠিল। যাহাদের কিছু কিছু অক্ষর পরিচয় হইয়াছিল, তাহারা চীৎকার করিতে লাগিল, 'ঘোড়ার জিভে 'ক', ল্যাজে 'খ' ইত্যাদি। আর যাহাদের বর্ণপরিচয় হয় নাই, তাহারা ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 'কই ভাই, দেখি কেমন জিভে 'ক' ইত্যাদি"। (শিবনাথ শাস্ত্রী, "আত্মচরিত," সিগনেট প্রেস, কলিকাতা, ১৩৫৯, পৃ. ২৫২-৫৩) এখানে স্মরণ করি "স্যার উইলিয়ম জোন্স-এর পাণ্ডিত্য ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ। কেরী, মার্শমান ও ওয়ার্ডের শ্রীরামপুর ক্রিশ্চিয়ান বারাণসীর

কল্পনা এবং গবর্ণমেন্টের ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ চেষ্টা বাংলার নবজাগরণে সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে এই সত্যই প্রমাণিত হয় যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বতঃপ্রণোদিত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা বিশেষভাবে এই নবজাগরণের উৎস ছিল।" (শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, "সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র," ভূমিকা, পৃ. ৮-৯)। ইংরেজ পূর্ববর্তী বাঙলা ও বিহারের ১,৫৫,৭৪৮ গ্রামে এক লক্ষ পাঠশালা ছিল বলে অ্যাডাম তাঁর প্রতিবেদনে জানিয়েছেন। এই পাঠশালাগুলো ছিল লোকজীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। ইংরেজী সভ্যতার ঢেউ আসার সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয়ে যায় পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার অনুশীলন। মফঃস্বলেও এর ঢেউ গিয়ে পৌঁছেছিল। ১৮৩৫ সন থেকে ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষার সূত্রপাত। সেই থেকেই সংস্কৃত পাঠশালা বা টোলের দৈন্যদশা, এবং ইংরেজী বিদ্যালয়ের রবরবা আরম্ভ হয়।

১১. সদা সম্প্রসারিত বাঙালী তার বাঙালীয়ানাকে প্রাণের সমস্ত দরদ দিয়ে ভালবাসে (পৃ. ২৬)

"বহুদিন হইতে বাঙলাদেশ হিন্দু-মুসলমানের জন্মভূমি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে; গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে বহু দিন হইতে হিন্দু-মুসলমান বাহুতে বাহুতে মিলিত হইয়া জীবন সংগ্রামে জন্মভূমির রণপতাকা বহন করিতেছে। দিল্লীর বাদশাহ নামমাত্র বাদশাহ; বাঙলার নবাবই বাঙলাদেশের প্রকৃত মা-বাপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই নবাব-দরবারে হিন্দু-মুসলমানের কোন রূপ আসনগত পার্থক্য বা ক্ষমতাগত তারতম্য ছিল না। বরং অনেকাংশে হিন্দুদিগেরই বিশেষ প্রাধান্য জন্মিয়াছিল। মুসলমান নবাব আপনাকে বাঙালী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিতেন না। বাঙলাদেশই তাঁহার স্বদেশ এবং বাঙালী জাতিই তাঁহার স্বজাতি হইয়া উঠিয়াছিল। রাজকোষের ধনরত্ন বাঙলাদেশেই সঞ্চিত থাকিত; যাহা ব্যয় হইত, তাহাও বাঙালীগণ কেহ দ্রব্য বিনিময়ে, কেহ শ্রম বিনিময়ে কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে পারিত। দেশের টাকা দেশেই থাকিত, তাহা সাত সমুদ্র তের নদীর পারে চির নির্বাসিত হইত না। সেই একদিন, আর এই একদিন।" (অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, "সিরাজদ্দৌল্লা," পৃ. ৩-৪)

১২. আপন মনে আপনার খেয়ালখুশীতে নদী নিজের পথ নিয়ন্ত্রিত করে বাধাবন্ধ গ্রাহ্য না করে মুক্তধারায় মনের আনন্দে

অবারিত গতিতে আপনার খেয়ালে তার গতিপথ ঠিক করে নেয় কারো শাসন মানে না কারও অনুরোধে কর্ণপাত করে না (পৃ. ২৭)।

"বাঙ্গালী চিরকাল দুর্বল, চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্ত্রী-স্বভাব, চিরকাল ঘুষি দেখিলেই পলাইয়া যায়।...বাঙ্গালীর চিরদুর্বলতা এবং চির-ভীরুতার আমরা কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু বাঙ্গালী যে পূর্বকালে বহুবলশালী, তেজস্বী, বিজয়ী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাই। অধিক নয়, আমরা একশত বৎসর পূর্বের বাঙ্গালী পালোয়ানের, বাঙ্গালী লাঠি-শড়কিওয়ালার যে সকল বলবীর্যের কথা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, তাহা শুনিয়া মনে সন্দেহ হয় যে সে কি এই বাঙ্গালী জাতি ?...বাঙ্গালীদিগকে অপেক্ষাকৃত হীনবীর্য মনে করিবার একমাত্র কারণ এই যে, মুসলমানেরা অতি সহজে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বস্তুতঃ মুসলমানেরা সহজে বাঙ্গালা জয় করে নাই—কেবল লক্ষণাবতীই সহজে জয় করিয়াছিল। তাহারা তিনশত বৎসরেও সমস্ত বাঙ্গলা জয় করিতে পারে নাই।...বখতিয়ার খিলজি কতটুকু বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল ? অবশিষ্ট অংশের কি প্রকারে স্বাধীনতা লুপ্ত হইল ? কবে লুপ্ত হইল ? বখতিয়ার খিলজির পর সেনবংশীয় রাজগণ পূর্ববাঙ্গালায় বিরাজ করিয়া অর্ধেক বাঙ্গালা শাসন করিয়া আসিলেন ; তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। দক্ষিণ বাঙ্গালার কোন অংশই বখতিয়ার খিলজি জয় করিতে পারেন নাই,... পলাশীতে প্রকৃত যুদ্ধ হয় নাই। একটা রঙ-তামাসা হইয়াছিল।...ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় পর্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজাগণ বাঙ্গালাদেশ অধিকার করিত। যেমন বিষ্ণুপুরের রাজা, বর্ধমানের রাজা, বীরভূমের রাজা ইত্যাদি। ইঁহারাই দীনদুনিয়ার মালিক ছিলেন, ইঁহারাই রাজস্ব আদায় করিতেন, শান্তিরক্ষা করিতেন, দণ্ডবিধান করিতেন, এবং সর্বপ্রকার রাজ্যশাসন করিতেন। মুসলমান সম্রাটেরা বড় বড় লড়াই পড়িলে লড়াই করিতেন অথবা করিতেন না। অধীনস্থ রাজাদের নিকট কর লইতেন বা পাইতেন।" (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "বঙ্কিম রচনাবলী," তৃতীয় ভাগ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা)

১৩. বাঙালী একটি মূল ধর্মমতের প্রশাখা পল্লব উপপল্লব কিংবা ছায়া-প্রচ্ছায়ার ধারক ও বাহক (পৃ. ২৯)

"বহুযুগ ধরিয়া বাঙলার সংস্কৃতি ও সাহিত্য মগধের নির্বাপিত শলাকা হইতে প্রদীপ জ্বালাইয়া সমগ্র পূর্বভারতে সংস্কৃতির প্রভা উজ্জ্বল রাখিয়াছিল। এমন কি পূর্ব ভারত অতিক্রম করিয়া ঐ সংস্কৃতি পৌঁছিয়াছিল তিব্বত-ও

চীনে—দীপঙ্কর ও শ্রীজ্ঞানের ভিতর দিয়ে সমগ্র বৌদ্ধ-জগৎ বাঙলার অলৌকিক প্রতিভা ও সৎ-সাহসের পরিচয় পাইয়াছেন, ঐ দীপ্তিতে আলোকিত হইয়াছিল যেমন ভুবনেশ্বর ও কোনার্ক, তেমনি হইয়াছিল ত্রিপুরা, মণিপুর ও কামরূপ এবং সাগরপারে যব, বালি ও নারিকেল দ্বীপপুঞ্জ। রাজনৈতিক বিপর্যয়ের প্রদেশ—ভাঙা-গড়া, রাষ্ট্রিয় সীমানার নিত্যনতুন পরিবর্তন সত্ত্বেও বারানসী হইতে আরাকানের গিরিপ্রান্তর, গয়াপীঠ হইতে কামাখ্যা, চম্পা ভাগলপুর হইতে জগন্নাথ তীর্থ পর্যন্ত বাংলার সংস্কৃতি যে সীমা আঁকিয়া দিয়াছে…তাহা এখনও চলমান, ধারা স্রোতে এগিয়ে চলেছে।

বারশতবর্ষ পূর্বে পালরাজাগণের সময় বাঙলা যেমন বৌদ্ধধর্মকে আশ্রয় করিয়া তিব্বত, চীন, বর্মা ও দ্বীপময় ভারতে অনার্য ও বিদেশীদের মধ্যে আর্য-সভ্যতার উজ্জ্বল আলোক বিস্তার করিয়াছিল, তেমনি তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব ধর্মকে অবলম্বন করিয়া বাঙলা সমাজ নানা অশিক্ষিত ও আরণ্য জাতিকে হিন্দুধর্ম ও বর্ণবিভাগের সূত্রে আজও এই বিংশ শতাব্দীতে গাঁথিয়া লইতেছে। আসামের কামাখ্যা শক্তিপীঠে যেমন মহাদেবী কিছু বাঙালী, কিছু চীনা, কিছু দেশাচারে পূজিত, তেমনি মানভূম, সিংভূম ও ছোটনাগপুরে কত রক্ষাকালী আরণ্যজাতির নিকট সুলভ মুরগী ও মহিষ বলি ও পচাইয়ের নৈবেদ্য পাইয়া হিন্দু সমাজের বিরাট অঙ্কে তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়া লইতেছেন। আবার আসামের গ্রামে যেমন গোস্বামীর আশ্রম ও সামাজিক নেতৃত্বে অসমীয়াকে বাঙলার নিমাইয়ের সঙ্গে যুক্ত করিতেছে, তেমনি দূর ময়ূরভঞ্জ, পঞ্চকোট ও ছোটনাগপুরের গিরিপ্রান্তরে হরিসভা ও সংকীর্তন কত কোল, দ্রাবিড় জাতিকে মাংসভক্ষণ হইতে বিরত করিয়া তাহাদিগের বিবাহ-নীতি সংস্কৃত করিয়া অবশেষে হিন্দুর জাতি বিন্যাসে তাহাদিগের একটা স্থান নির্ণয় করিয়া সুসভ্য করিতেছে। নদীয়া হইতে গোস্বামীরা সুদূর কটক ও বালেশ্বরে বৎসর বৎসর উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের মহালে-মহালে ছড়িদারের সাহায্যে আজও ধর্মশাসন চালাইতেছেন। তখন উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে ভাগবত পাঠ ও হরিসংকীর্তনের ধূম পড়িয়া যায়। এই উপায়ে সংস্কৃতি পর্বত, অরণ্য, নদী অতিক্রম করিয়া প্রকৃতিজাত বিচিত্র মশাল নিয়া আপনাকে সমৃদ্ধ করিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অসভ্য অশিক্ষিতের আর্থিক উন্নতি ও সামাজিক সংস্কার সাধন করিতেছে। ("বাঙলা ও বাঙালী" শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, রসচক্র সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৩৪৭, পৃ. ২৫৪-২৫৭)।

১৪. দেবীপূজায় নববস্ত্রাচ্ছাদিত বাঙালীর মণ্ডপাগমন প্রসাদ গ্রহণ আরতিআদির স্মৃতিতে মধুর রূপসী বাঙলা (পৃ. ৩০)

"উৎসবের আরম্ভে দেবার্চনা, অন্তে ভূরি-ভোজন।…গ্রামে উৎসবের সকল অঙ্গ বিদ্যমান ছিল। লোকে আনন্দ উপভোগ করিতে পারিত। এখন সেদিন নাই। কিছুকাল তাহার স্মৃতি থাকিবে, পরে তাহাও লুপ্ত হইবে।…

তৎকালে সভ্যতার আলোক গ্রামে প্রবেশ করে নাই। চা, বিড়ি, সিগারেট, কেহ এসব নামও শুনে নাই। কিন্তু তামাক অপর্যাপ্ত পুড়িত। হাট হইতে ভাল তামাকপাতা ও তামাকের মশলা আনিয়া চিটাগুড়ের সহিত ঢেঁকিতে কুটিয়া-তামাক তৈয়ার হইত। সে তামাক গুড়ের নাদায় (গুড়ের পুরু কলসী) পূর্ণ করিয়া রাখা হইত। বিশ পঁচিশ দিন সে তামাকের সুগন্ধ বাহির হইত। মালসায় আগুন থাকিত। আর, যে আসিত, যে কাজের জন্যই হউক, দুই এক সিলিম তামাক না পোড়াইয়া যাইত না।…

গ্রামের কুমার যাবতীয় মাটির বাসন আনিয়া দিত। সে বাসন অল্প নয়। বড় হাঁড়ি, মাঝারি, ছোট খুরি হাঁড়ি, তিজেল, জলের কলসী, পূজোর ঘট, ভাঁড়, মুড়িভাজা খাপড়ী ও খোলা, মালসা, হাতসরা, বুটিসরা, ছোট বড় খুরী, টাঁটি, কলিকা, ধুনাচুর, ভাতের ফেনপাড়া সরা, ডাবা, ডাইল রাখা ডাবা।

ডোমনী, নূতন ধুচনী, কুলা, চালনী, খইচালনী, চাঙ্গারী, নানাপ্রকারের চুপরি ও পেতে, ঝোড়া ও অনেক তালাই (তালপাতার চাটাই) যোগাইত। …হাড়িনী খেজুর চাটাই বুনিয়া দিত…গ্রামের জেলে বড় পুকুরে মাছ ধরিয়া দুই সেরী আড়াই সেরী মাছ ছোট পুকুরে আনিয়া ফেলিত। প্রত্যহ বড় জাল ভিজাইত না। একখানা ছোট জাল দিয়া আবশ্যক মাছ ধরিয়া দিত ও তেলজলপান লইয়া ঘরে যাইত। মাছ ধরা হইলে বাগদী-বউ মাছ কুটিয়া দিত। নিকটবর্তী গ্রামের সূত্রধর প্রতিমা নির্মাণ করিত, মালাকর ডাক সাজাইত। গ্রামের মুচি ঢাক বাজাইত…আটচালার বাহিরে চাঁদোয়া টাঙ্গানো হইত। অনেক লোক বসিতে পারিত। দুলে বউ চণ্ডীমণ্ডপ টাটকা গোবর ও পলিমাটি দিয়া নাতা দিত, আটচালায় ও চাঁদোয়ার নীচে গোবর মাটি দিয়া ঝাঁটা দিত।…

চাঁড়াল বউ প্রত্যহ নৈবেদ্যের পানিফল, পূজার পদ্মফুল ও পদ্মপাতা আনিয়া দিত…কেহ বিল্বপত্র আনিত, কেহ নৈবেদ্য সাজাইত। গ্রামের মালাকর প্রত্যহ মালা যোগাইত। গ্রামের কামার বলিচ্ছেদ করিত।

সাড়ে ছয় হাজার বৎসর ধরিয়া এই উৎসব চলিয়া আসিতেছে। দুর্গোৎসব নয়,

শারদোৎসব ; শরৎ ঋতুর প্রবেশ জনিত উৎসব।" ("পূজা-পার্বণ," যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বিশ্বভারতী, ১৩৫৮, পৃ. ১০-২৩)। বাঙালীর প্রধান উৎসব।

১৫: ঐতিহ্যপূর্ণ উপাদান সমূহ থেকে জানতে পারি এক প্রাণোচ্ছল জাতির কীর্তিকথা বাঙালীর সামগ্রিক লোকজীবনের মৌলতা (পৃ. ৩৩)

"এক দেশের নিন্দনীয় আচার অপর প্রান্তে সাদরে প্রতিপালিত হইতেছে। অথচ দুই প্রান্তের লোকই নিজ নিজ আচারের অনুকূলে সর্ববাদীসম্মত শাস্ত্রের প্রমাণ দেখাইতেছেন। কোন শাস্ত্রই কেহ অগ্রাহ্য করেন না, তবে উহার তাৎপর্য ব্যাখ্যায় মতদ্বৈধের ফলেই পরস্পরবিরোধী আচার সমর্থন লাভ করিতে পারে। তাই বাংলাদেশে মৎস্যভক্ষণ বিহিত—বাংলার বাহিরে উহা নিষিদ্ধ ; কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও কোন আনুষ্ঠানিক বাঙালী হিন্দু পেঁয়াজ খাওয়ার কথা কল্পনা করিতেও পারেন নাই, অথচ দাক্ষিণাত্যের অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহা নিষিদ্ধ নহে। বাংলাদেশের উচ্ছিষ্টের এঁটো, সকড়ির কঠোরতা অন্য প্রদেশে নাই। বাংলাদেশে বিবাহ রাত্রেই সম্পন্ন হয়—দিবা বিবাহ বাংলাদেশে সর্বথা নিষিদ্ধ—বাংলার বাহিরে কোথাও কোথাও ইহা অবাধে প্রচলিত। বিবাহকালীন ও বিবাহোত্তর আচার-ব্যবহারে বিশেষ করিয়া সধবা ও বিধবার চালচলনে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যে বিপুল পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সত্যই বিস্ময়কর। বাংলার মত অন্য প্রদেশে শাঁখা সিঁদুরকে সধবার অপরিহার্য ভূষণ মনে করা হয় না—বিধবারাও সমস্ত ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনীর রূপ ধারণ করেন না। নিষ্ঠাবান বাঙালীর পক্ষে এক আসনে বসিয়া অনেকের ভোজন নিষিদ্ধ, অবাঙালী সমাজে কিন্তু ইহাতে কোন দোষত্রুটি নাই।' ("হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান," শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, লেখক সমবায়, ১৩৭৭, পৃ. ১০)।" বাঙালীর এই স্বাতন্ত্র্য থেকেই

১৬ দশভুজা দুর্গা বাঙালী কন্যা উমা এবং হর আর গৌরী বাঙালী স্বামী-স্ত্রী রাম-সীতাও বাঙলার নিজস্ব ভাবধারায় রূপলাভ করেছে (পৃ. ৩৪)

"যেখানে মানুষের গভীর স্নেহ অকৃত্রিম প্রীতি সেইখানেই তাহার দেব-পূজা। যেখানে আমরা মানুষকে ভালবাসি সেইখানেই আমরা দেবতাকে উপলব্ধি করি। ঐ যে বলা হইয়াছে—'নিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি' ইহা দেবতারই ধ্যান।...সেই জন্য ছড়ার মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়

নিজের পুত্রের সহিত দেবকীর পুত্রকে অনেক স্থলেই মিশাইয়া ফেলা হইয়াছে। অন্য দেশের মনুষ্য দেবতায় এরূপ মিলাইয়া দেওয়া দেবাপমান বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু আমার বিবেচনায় মনুষ্যের উচ্চতম মধুরতম গভীরতম সম্বন্ধ সকল হইতে দেবতাকে সুদূরে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলে মনুষ্যত্বকেও অপমান করা হয়। এবং দেবত্বকেও আদর করা হয় না।...সেইজন্যই বাঙালির কাছে ইহার একটি বিশেষ রস আছে। বৈষ্ণবী যখন 'জয় রাধে' বলিয়া ভিক্ষা করিতে অন্তঃপুরের আঙিনায় আসিয়া দাঁড়ায় তখন কুতূহলী গৃহকর্ত্রী এবং অবগুণ্ঠিত বধূগণ তাহা শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া আসেন...হরগৌরী প্রসঙ্গে আমাদের একান্ন পারিবারিক সমাজের মর্মরূপিণী রমণীর এক সজীব আদর্শ গঠিত হইয়াছে। স্বামী দীন দরিদ্র বৃদ্ধ বিরূপ যেমনই হউক, স্ত্রী রূপযৌবন-ভক্তি-প্রীতি-ক্ষমাধৈর্য-তেজগর্বে সমুজ্জ্বলা। স্ত্রীই দরিদ্রের ধন, ভিখারীর অন্নপূর্ণা, রিক্ত গৃহের সম্মানলক্ষ্মী।

হরগৌরীর গান যেমন সমাজের গান, রাধাকৃষ্ণের গান তেমনি সৌন্দর্যের গান।...সৌন্দর্যসূত্রে নরনারীর প্রেমের আকর্ষণ সকল দেশের সাহিত্যেই প্রচারিত। কেবল সামাজিক কর্তব্যবন্ধনে ইহাকে সম্পূর্ণ কুলাইয়া পায় না। সমাজের বাহিরেও ইহার শাসন বিস্তৃত। পঞ্চশরের গতিবিধি সর্বত্রই। এবং সমস্ত বসন্ত অর্থাৎ জগতের যৌবন এবং সৌন্দর্য তাঁহার নিত্য-সহচর।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্র রচনাবলী', বিশ্বভারতী, ১ম সং ১৩৪৭, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৭৯)। দুটি বাউল সঙ্গীত উদ্ধৃত করে বক্তব্যকে আরও একটু স্পষ্ট করা যেতে পারে—

"মানুষে মানুষ বিরাজে খুঁজে নেওয়া বড় দায়,
মাণিক চিনে দু'একজনে শ্রীমহাজনের কৃপায়।
মানুষ আছে প্রতিঘটে, দূরে নয় নিকটে,
ফুলের কলি আপনি ফুটে, ভ্রমর ছুটে কাছে যায়।
সময়ে ফুল ফুটে সত্য, কিন্তু যারা জানে তত্ত্ব,
গোড়ায় জল ঢালে নিত্য, ফুল ফুটে গাছের আগায়।
দেখিলে সেরূপ জ্যোতি, থাকেনা কুল মান জাতি,
তুল্য সুখ্যাতি অখ্যাতি, ছাই মাটি মাখে গায়।
তখন সে নয় উতলা, মনে নাই সংসারের জ্বালা,
ভাই বলুক আর বলুক শালা, উত্তর নাই কোন কথায়।"

ইত্যাদি, অথবা ঈশ্বর-মানুষ সম্পর্কিত গান—

"আমি বিনে তোমার কি আর বড়াই।
কেবা ছোট কেবা বড় বিচারকর বিচার চাই॥
যদ্যপি না থাকি আমি, কে বলে তোমায় তুমি।
কিসের তুমি কিসের আমি, আমি গেলে তুমি নাই।
যদি বল তুমি যে মূল, আমি ব'লি নিতান্ত ভুল।
বৃক্ষ থাকলে থাকে তার ফুল, আগুন থাকলে থাকে ছাই।
একদিন যদি আমায় ছাড়, দেখি কেমন থাকতে পার,
ছাড়াতে চাই বোড় ধর, দায়ে ঠেকেছি আমি তাঁই।
কখনো কি ভাল লোকে, লোক দেখিলে লুকায়ে থাকে।
পালাও কেন আমার দেখে, ডাকলে কেন কথা নাই॥
অনেক মোটা শরীর বলে, যায়গা নাই আকাশ পাতালে,
তাইত দ্বিজদাস পাগলে হৃদয়ে দিয়েছে ঠাঁই।"

স্মরণীয়,—

"বাউলেরা মনের মানুষের সন্ধানে ঘুরিতেছে। মনকে ইহাদের পারিভাষিক শব্দে মগজ বলিয়া ধারণা করা হয়। মগজই আমাদের জীবনের নিয়ামক। মগজ যাহা ভালবাসে তাহাই আমাদের প্রিয় ও ভালবাসার ধন।...বাউলেরা দেহভাণ্ডকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলিয়া ধারণা করে। এইজন্য বোধ হয় বাউল গানকে দেহতত্ত্ব গান বলা যাইতে পারে ...বাউল, তন্ত্র ও নাম সাধনায় মগজের স্থান সর্বশ্রেষ্ঠ। এই মগজ আমাদের সু ও কু কর্মের একমাত্র যন্ত্র। এই মগজকে সকলেই সহস্রবার বা দশমী দুয়ার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের সকল বাসনা-কামনা, ধ্যান-ধারণা—নদীর জল যেমন সমুদ্রগামী—তেমনি মগজ অভিমুখী। সুতরাং সাধু দরবেশ সুফী-সন্তদের সাধনা যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়াছে এই মূল উৎসের সন্ধানে।...মগজের সঙ্গে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভাবে দেশস্থ প্রধান প্রধান যন্ত্রের নিরন্তর যোগাযোগ রহিয়াছে; যেমন হৃদপিণ্ড, পাকযন্ত্র ও জননযন্ত্র প্রভৃতি। যোগীরা শরীরকে নানাখণ্ডে ভাগ করিয়াছে। প্রধানতঃ অধঃ ও উর্ধ্ব: একটি অংশ আকাশের দিকে উর্ধ্ববাহু, অপরটি মাটির দিকে সম্প্রসারিত। এই দুই ভাগকে আবার নানা ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—মোট ছয় ভাগ...অনার্য সভ্যতা তুচ্ছ করিবার মত সভ্যতা নয়। তবে এককালে আর্য-অনার্য সভ্যতার সমঝোতা হইয়াছিল। আমার মনে হয় তখন হইতেই বাউল সাধনার বীজ উপ্ত হইয়াছিল। তবে

আশ্চর্যের ব্যাপার পাক-ভারতের লোকসভ্যতার ইতিহাস অলিখিত। পুথি-পুস্তকে এই সম্পর্কে কিছুই পাওয়া যায় না; আমার মনে হয়, এখনও পাহাড়ে পর্বতে, বনে জঙ্গলে এই লোকসভ্যতার ইতিহাস ও মালমশলা ইতস্ততঃ ছড়াইয়া রহিয়াছে"। (মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, "হারামণি" ৭ম, বাঙলা একাডেমী, ১৩৭১, ভূমিকা)। ছড়িয়ে আছে লৌকিক দেবদেবী ও পীর গাজীরা।

১৭. সত্যপীর মানিকপীর দক্ষিণরায় ধর্মঠাকুর ষষ্ঠী শীতলা চণ্ডী প্রভৃতি বাঙলার ছেলেমেয়ে (পৃ. ৩৪)

"সত্যপীর কাহিনীতে মূলতঃ হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মিলন প্রয়াস সুস্পষ্ট হলেও হিন্দু ধর্মের প্রতিমাপূজা ইত্যাদির অসারত্বের প্রতি কটাক্ষপাতের কথাও এখানে সহজেই মনে আসে। সত্যপীর কাহিনীর মূলে কোন মুসলীম পীর বা ওলী আল্লাহর বাস্তব ধর্মপ্রচার কাহিনী রসসিঞ্চন করেছে কিনা, গবেষণার বিষয়; তবে অসত্য বা ভণ্ডপীরের পরিবর্তে সত্যপীর (পীর বরহক) বা সাচ্চা পীরের আশ্রয়লাভ করা কি অধিকতর কাম্য নয়? সত্যপীর নামটিও এদিকে ঈশারা দেয়।

হিন্দুদেরকে খুশী করবার জন্য সত্যপীরকে 'সত্যনারায়ণ' এবং তাঁকে অবতার রূপে চিত্রিত করা হলেও মুসলিম কবিরা সত্যপীরকে পয়গম্বর বলেন নি। কারণ হয়ত এই যে, হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর পর আর কোন নবী আসবেন না বলে নবীর অনুসারী সত্যপীরের আবির্ভাবের কথাও এখানে স্মরণযোগ্য। বলা বাহুল্য, সত্যপীরকে নাকি আল্লাহ্ হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর পরামর্শ অনুসারেই পাঠিয়েছেন। ইতিহাস পাঠকদের অবিদিত নাই যে, এদেশে বহু কামিল পীরের বা সত্যপীরের আবির্ভাব হয়েছে এবং নিঃস্বার্থ ধর্মপ্রচারের ফলে জাতিধর্ম নির্বিশেষে তাঁরা সকলের শ্রদ্ধা ও পূজার পাত্র হয়েছেন।...সত্যপীরের কাহিনী এই সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের মর্মমূল থেকে উদ্ভূত বলে মনে করি।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে রামানন্দ, কবীর, কামাল, দাদু, শঙ্কর, নানক ও চৈতন্য যে সাধনা করেছেন, বাংলার তথাকথিত বাউল সম্প্রদায় ও সত্যপীর কাহিনীর স্রষ্টারা তারই উত্তরাধিকার বহন করে এনেছেন।

বলা বাহুল্য, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে দিল্লীর সম্রাট আকবর ও বাংলার আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ প্রমুখ শাসকদের আনুকূল্য এই সব সংস্কৃতি-সাধকদের সাধনাকে আরও এগিয়ে দিয়েছে। কবি শঙ্করাচার্য তো সত্যপীরকে আলা বাদশা্র কানীন পুত্র বলে কল্পনাও করেছেন। এই আলা বাদশাহ আলাউদ্দীন

হুসাইন শাহ্ নামের অপভ্রংশ বলে মনে হয়। আরিফের কাব্যের নায়কই হলেন 'হোসেন শাহ'। তাই এ সিদ্ধান্ত করা নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না যে সত্যপীর কাহিনী হিন্দু কবিদের সত্যনারায়ণের বিবর্তিত রূপ নয়, এ কাহিনী মুসলীম কবিদেরই স্বকপোল কল্পিত এবং এ কাহিনীর আদি লেখকও মুসলমান। হিন্দু কবিদের হাতে পড়ে কাহিনীতে হিন্দুয়ানীতে পরিবর্তিত হয়েছে।...

অবতারবাদী হিন্দু কবি সত্যপীরকে অবতার হিসাবে পূজা দিতে পারেন এবং মুসলিম কবির কাব্যে সত্যপীর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে অভ্যস্ত হতে পারেন, তবে সে ক্রিয়াকলাপ কিরামতির অতিরিক্ত কিছু হতে পারে না। লক্ষ্যণীয় যে, মুসলিম কবি রচিত সত্যপীর কাহিনীর অলৌকিকত্ব সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সত্যপীর মানবই আছেন।...

হযরত ঈসা (আঃ) এর অলৌকিক জন্ম ও জীবন কাহিনী থেকে মুসলিম কবিরা সত্যপীর কাহিনীর কল্পনা করেছেন। তেমনি করে 'বনবীবী' কাহিনীরও কল্পনা করা হয়েছে ,হযরত ইব্রাহীম হাথিরার কাহিনী থেকে। সন্ধ্যাবতীর বনবাসে হাথিরার বনবাসের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। এই ভাবে ইব্রাহীম বলূপীর কাহিনীও বরেন্দ্রভূমিতে 'মোনাইযাত্রা'-এর কাহিনীরও সৃষ্টি হয়েছিল।" ("অষ্টাদশ শতকের কবি", মুহম্মদ আবু তালিব 'বাঙলা একাডেমী পত্রিকা', শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬৯, পৃ. ৪৯-৫১)। এ প্রসঙ্গে আরও একটি বক্তব্য উচ্চারণ করা যেতে পারে—"হিন্দু দেবদেবীদের মাহাত্ম্য কাহিনীকে পীরমাহাত্ম্য কাহিনীতে ঢালাই করবার চেষ্টা করেছিলেন অনেকে, যেমন পীর মছন্দলা, বড়খাঁ গাজী পীর কালু শাহ এবং পীর গোরাচাঁদ। হিন্দুদের অধিকাংশ লৌকিক দেবদেবীই এই সমস্ত পীরে পরিণত হয়েছেন। যেমন মাণিক পীর হচ্ছেন ছদ্মবেশী শিব, পীর মছন্দলী হচ্ছেন মৎস্যেন্দ্রনাথের প্রতিরূপ। পীরকাহিনী বিষয়ক পুথির রচয়িতা হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই আছেন", (সৈয়দ আলী আহ্সান, "মধ্যযুগের কাব্যসংগ্রহ", ভূমিকা, পৃ. ১০ আহম্মদ শরীফ সম্পাদিত, বাঙলা একাডেমী. ঢাকা, ১৩৬৯)।

১৮. সহজসাধনা বাঙালীর নিজস্ব মন্ত্রের মধ্যে সে আবিষ্কার করেছে তন্ত্র দক্ষিণাচার সাধনার মধ্যে তার অবদান বামাচার সাধনা (পৃ. ৩৪)

"দেহের জাত কিংবা ধর্ম নেই, সেজন্য দেহাত্মবাদী চেতনা মানবিক বোধের প্রকাশমাত্র। ঐ দেহাত্মবাদী মানবিকবোধ অন্য ধর্ম দর্শনের সঙ্গে

মানবিকতাবাদী দিকটির সঙ্গে একাত্মবোধ করেছে, কিন্তু ঐ একাত্মবোধ বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য কিম্বা ইসলাম সম্পূর্ণ দর্শনের সঙ্গে নয়। পালপর্বে বৌদ্ধধর্ম, সেনপর্বে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও মুসলিমপর্বে ইসলাম ধর্ম বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ছিল। রাষ্ট্রধর্মের পাশাপাশি লোকজ মতবাদ কিংবা বাউল ধ্যান-ধারণা স্বতন্ত্র দর্শনের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তার কারণ বাউল মতবাদের উৎস কৃষি-অতীতে। অন্যপক্ষে বিভিন্ন রাষ্ট্রধর্মগুলোর বিস্তৃতি অপেক্ষাকৃত উন্নত পর্যায়ের শ্রেণীবিভক্ত কৃষি-সমাজে।... বাউল মতবাদে নারীপ্রাধান্য, তার জন্য বাউল মতবাদকে বামাচার বলা যেতে পারে। নারী প্রাধান্যমূলক ধ্যানধারণা কিংবা বামাচার বাংলা-দেশের নানান ব্রতকথায়, দেবীমাহাত্ম্যে টিকে আছে। ঐ বামাচার, ঐ ব্রতকথা, ঐ দেবীমাহাত্ম্যের মানে কি? অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রতকথার স্বরূপ সম্পর্কে বলেছেন: 'ব্রত হলো মনস্কামনার স্বরূপটি। আলপনায় তার প্রতিচ্ছবি, গীতে বা ছড়ায় তার প্রতিধ্বনি এবং প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার নাট্যে-নৃত্যে: এক কথায়, ব্রতগুলি মানুষের গীত কামনা, চিত্রিত বা গঠিত কামনা, সচল জীবন্ত কামনা' (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর: "বাংলার ব্রত," পৃ. ৫৮)। এই কামনার অন্তঃসার বিশ্বাসের পরীক্ষা, প্রকৃতিকে প্রভাবিত করার কৌশল।...প্রকৃতির উর্বরাশক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে মেয়েদের যোগাযোগ অস্বাভাবিক নয়। মেয়েরা কৃষিকার্য আবিষ্কার করেছে, তাই কৃষিকর্মের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক পুরুষদের থেকে ভিন্ন। তাছাড়া মেয়েদের ঋতুমতী হওয়া ও সন্তান প্রজননের সঙ্গে প্রকৃতির ফলপ্রসূতার মিল আছে, তাই মেয়েদের পক্ষে যেমন প্রকৃতিকে প্রভাবিত করা সম্ভব, তেমনি প্রকৃতির পক্ষে মেয়েদের প্রভাবিত করা সম্ভব।" ("বাউল গান ও দুদ্দুশাহ", বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর সম্পাদিত। বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৭১, ভূমিকা)

১৯. ভূমির উর্বরতা মৎস্যের প্রাচুর্য পশুপক্ষীর বিস্তার বাঙালীকে মাছ মাংস দুধ ভাতে রেখেছে (পৃ ৩৫)

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে বাঙালীর আহারের উৎকৃষ্ট নিদর্শন বর্তমান। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যের দিকে এক লহমা নজর দেওয়া যেতে পারে—

"রসভরা রসময়, রসের ছাগল।
তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল॥
স্বর্ণকুকী রত্নগর্ভা, জননী তোমার।
উদরে তোমায় ধরে, ধন্যগুণ তার॥

ইচ্ছা করে কাঁচা খাই, সমুদয় লোয়ে।
হাড়শুদ্ধ গিলে ফেলি, হাড়গিলে হোয়ে॥
মজ্জাদাতা অজা তোর কি লিখিব যশ।
যত চুষি তত খুসি হাড়ে হাড়ে রস॥

... ...

এমন পাঁঠার নাম যে রেখেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নয়, ঝাড়ে বংশে বোকা॥

... ...

সাবকাশ নাই মাত্র, এলোচুল বাঁধে।
ডাল ঝোল মাচ ভাত রাশি রাশি রাঁধে॥
কত তার কাঁচা থাকে, কত যায় পুড়ে।
সাধে রাঁধে পরমান্ন নলেনের গুড়ে॥
বধূর রন্ধনে যদি, যায় তাহা এঁকে।
শাশুড়ী ননদ কত, কথা কয় বেঁকে॥

... ...

হ্যাগা দিমি এই শাত, রাঁধিয়াছি রেতে।
মাথা খাও সত্যি বল, ভাল লাগে খেতে॥
পুরুষেরা ভাল সব বলিয়াছে খেয়ে।
ভাল রাঁধা রেঁধেছিস, ধন্য তুই মেয়ে॥

... ...

আলু তিল গুড় ক্ষীর নারিকেল আর।
গড়িতেছে পিটে পুলি, অশেষ প্রকার॥

... ...

মাথা খাও, খাও বলি পাতে দেয় পিটে।
না খাইলে বাঁকা মুখে পিটে দেয় পিটে॥

... ...

ধন্য ধন্য পল্লীগ্রাম, ধন্য সব লোক।
কাহনের হিসাবেতে আহারের ঝোঁক॥

... ...

তরুণী রমণী যত, একত্র হইয়া।
তামাসা করিতেছে সুখে, জামাই লইয়া॥

আহারের দ্রব্য লয়ে, কৌশলে কৌতুক।
মাজে মাজে হাস্যরবে, সুখের যৌতুক॥"

("কবিতা সংগ্রহ" বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, ১২৯১ সাল, শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত)

প্রাসঙ্গিক কারণে স্মরণ করা যেতে পারে: "যে বাটীর রান্না ভাল নয়, সে বাটীও ভাল নয়। অর্থাৎ সে বাটীর স্ত্রী পুরুষদিগের যত্ন করা অভ্যস্ত হয় নাই—তাহারা অলসপ্রকৃতিক। কিছু অযত্নপর, কিছু সুখ্যাতি-বিমুখ এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সুখদুঃখবোধে অনুভূতিশূন্য হইয়া থাকে...রান্না ভাল করিবার উপায় গৃহস্বামীর শিক্ষাদানে প্রবণতা।... যে বাটীর কর্তা বাটীর রন্ধনকার্য্যের প্রতি মনোযোগী, কিরূপে নূতন নূতন ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিতে হয়, বলিয়া দিতে পারেন, সে বাটীর স্ত্রীলোকেরা রন্ধনকার্য্যটিকে গৌরবসূচক মনে করেন, এবং তাহার উৎকর্ষ এবং পারিপাট্য সাধন করিতে পারেন। দেশাচার এই যে, রন্ধনকার্য্য শুচি হইয়া করিতে হয়। যজ্ঞীয় দ্রব্য শুচি হইয়া প্রস্তুত করা শাস্ত্রের আদেশ। স্নান করিয়া অথবা হাত পা মুখ ধুইয়া এবং কাপড় ছাড়িয়া রন্ধনশালায় যাইতে হয়। ইহাতে রন্ধনকার্য্যের প্রতি বিশেষ একটি শ্রদ্ধা জন্মে, এবং রন্ধনও ভাল হয়।...ভোজনকালে বাটীর স্ত্রীলোকেরা নিকটে বসিয়া খাওয়াইবেন, এবং বাটীর স্ত্রীলোকেরাই পরিবেশন করিবেন। পরিবেশন হাতে করিয়া করিতে নাই। যজ্ঞীয় হোমাদি যেমন স্রুবের দ্বারা প্রদান করিবার বিধি পরিবেশনও সেইরূপ চামচ, হাতা, বাটী প্রভৃতি দ্বারা করিতে হয়। শিশুগণ মা-জননীদের নিকটে বসিয়া খাইবে। নিত্যভোজনের এইরূপ ব্যবস্থা হইলে খাওয়া তাড়াতাড়ি হয় না, খাওয়ার মধ্যে অনেক কথাবার্তা, গল্পগুজব হয়, হাসি তামাসাও আইসে। রাক্ষসভাব থাকে না, মুখের বিকৃতি এবং শব্দ হয় না। ভোজনপাত্র নোঙরা হয় না, অঙ্গুলীর দুই পর্বের অধিক খাদ্যসামগ্রীতে সংলগ্ন হয় না।

...দৈহিক কার্য্যমাত্রেরই সময় নির্দিষ্ট থাকা আবশ্যক। আহার গ্রহণের পক্ষেও সেই নিয়ম। ব্রতচারীদিগের কথা ভিন্ন। কিন্তু সাধারণতঃ গৃহস্থ-লোকের ভোজনকাল চারিটি। এক প্রাতে, দ্বিতীয় মধ্যাহ্নে, তৃতীয় সায়ংকালে, এবং চতুর্থ রাত্রি একপ্রহরের পর। কিন্তু চাকুরীর দায়ে আর ইস্কুলের দায়ে আজিকালি ঐ সকল সময়ের খুব গোলমাল হইয়া গিয়াছে। প্রাতরাশ আর মধ্যাহ্নিক ভোজন মিলিয়া গিয়া সহর অঞ্চলে বেলা নয়টায় ভাত খাওয়া হইয়া চলিয়াছে।"—(ভূদেব মুখোপাধ্যায়, "পারিবারিক প্রবন্ধ",

বিশ্বনাথ ট্রাস্ট। চুঁচুড়া, ১৩৫৬। পৃ. ২৩০-২৩৮)। আহার-বিহারে বাঙালীর পরিবর্তন লক্ষণীয়। কিছুদিন পূর্বেও বাঙালীর প্রধান খাদ্য ছিল ভাত, শাক, মাছ, দুধ প্রভৃতি। ভাত এখন রুটির সামিল হয়েছে। শাক-শবজি সহজ লভ্য জিনিষ নয়। দুগ্ধ, মাছ প্রায় দুর্লভ। খাদ্যে এপার বাঙলার বাঙালীরা ক্রমশই পশ্চিমাঘেঁষা হয়ে পড়ছে। ওপার বাঙলায় দুধ, মাছ ইত্যাদি সহজলভ্য হওয়ায় প্রাচীন বাঙালীর খাদ্যাভ্যাস তাঁদের মধ্যে অনেকটা পূর্বের মতই রয়ে গেছে। খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-সংস্কৃতি ও মননের ক্ষেত্রেও এসেছে তফাৎ। এসেছে পরিবর্তন। এ সত্য অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে।

২০. দ্বিবিধ ভাবধারায় দুটি পথ দেখা দিলেও বাঙালীয়ানায় আঘাত আসেনি (পৃঃ ৩৭)

"মুঘল শাসকেরা (ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দী) হুসেনশাহী সুলতানীদের মত মনেপ্রাণে বাংলা ভাষা ও বাঙালীর আদর্শ গ্রহণ করেন নি। তাঁরা বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন বলেও তেমন কোন প্রমাণাদি পাওয়া যায় না। তাছাড়া, সেসময় এ দেশে উচ্চশ্রেণীর বাঙালী মুসলমানও বাংলা ভাষাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন না।...মধ্যযুগে মুসলমান কবিগণ প্রধানতঃ অন্য ভাষায় রচিত গ্রন্থের তর্জমা করে বাংলা কাব্যাদি প্রণয়ন করেছিলেন; তবে হিন্দু কবিগণ বাংলা সাহিত্যের পরিপুষ্টি ঘটিয়েছিলেন সংস্কৃত সাহিত্য থেকে ধর্মোপাখ্যান প্রভৃতি অনুবাদ করে।...হিন্দু কবি যে ক্ষেত্রে ধর্মীয় আবেগ এবং নিবেদিত চিত্ততাকে কাব্যের উপজীব্য সম্পদ ভেবেছিলেন সেক্ষেত্রে মুসলমান কবি প্রধানতঃ জীবন এবং আনন্দকে অবলম্বন করেছিলেন। ...তাছাড়া, ফারসী উরদূ মিশ্রিত কাব্য রচনার মারফৎ মুসলমানী কবিগণ দেশের অগণিত মুসলমানের সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্ম ও ঐতিহ্যের সঙ্গে বিজড়িত প্রাত্যহিক জীবনের নানা উপকরণের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ রক্ষার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন।...এই ভাষাই 'দোভাষী বাংলা' বা 'মুসলমানী বাংলা' নামে পরিচিত। পাদ্রী লং বলেছেন যে এই ভাষা নগরের অধিবাসী ও মাঝি মাল্লাদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। মুঘল আমলে বাংলাদেশে সুফী-দরবেশ ও পীর-ফকিরদের প্রভাব লক্ষিত হয়। তাঁদের প্রভাবে বাংলার লোকসঙ্গীত যেমন পুনর্জীবন লাভ করলো, তেমনি পীরবাদের মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত হল পূর্ববঙ্গের মুর্শিদীগানে।...ধীরে ধীরে দেশের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটতে থাকে, এবং বাঙালী হিন্দুর ও

বাঙালী মুসলমানের জীবনে এক অনিশ্চিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়; সৌভাগ্যক্রমে এর মধ্যেও জনসাধারণের রস পিপাসা একেবারে নির্মূল হয় নি।...সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা হারিয়ে দেশের মানুষ যে সময় একান্তভাবে নিঃস্ব হয়ে পড়ে, সেই সময় একদিকে হিন্দু কবিগণ তরজা, খেউর, আখড়াই, হাফআখড়াই, টপ্পা ও কবিগান রচনায় মনোনিবেশ করেন, তেমনি অন্যদিকে গরীবুল্লাহ প্রমুখ মুসলমান কবি মুসলিম ঐতিহ্যমূলক কাব্য প্রণয়নে তৎপর হন।" ("ফকীর গরীবুল্লাহ", গোলাম সাকলায়েম, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৬৮ পৃঃ ১-৬৪)। এখনও ঐতিহ্যচেতনা খাঁটি বাঙালীর রচনায় দৃষ্ট হয়। এখনও খাঁটি বাঙালী পিতৃ-পিতামহদের আচার-আচরণে বিশ্বাসী ও অনুরক্ত।

২১. পরিবর্তিত অবস্থায়ও পুরাতনকে আশ্রয় করে মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে পিতৃ-পিতামহদের ভিটেমাটি সামলাতে (পৃঃ ৩৭)

"এই যে মাটি—এই যে মিঠা—এই যে চির চমৎকার,—
চরণে লীন এই যে মলিন—এই যে আধার নিরাধার—
এই মাটি গো এই পৃথিবী—এই যে তৃণ গুল্মময়—
ধরার হাটে মাটির ভাঁটা—তাই বলে এ তুচ্ছ নয়।
মাটি তো নয়—জীবন কাঠি,—কানায় কানায় জীবন তার,—
মাটির মাঝে প্রাণের খেলা,—মাটিই প্রাণের পারাবার!
মাটি তো নয়—মায়ামুকুর—এক পিঠে তার লীলার খেল,
আরেকটি দিক অন্ধ—অসাড়, রশ্মিঘাতে অনুদ্বেল!
মাটিই আমার মরণ কাঠি, মাটির কোলে উদয় লয়,
যে মাটিতে ভাঁড় গড়ে রে তাতেই মানুষ মানুষ হয়।
মাটির মাঝে যা আছে গো সূর্যেও তার অধিক নাই,
তড়িৎ-সূতোর লাটাই মাটি, জীবন-ধারার আধার সেই।"

(সত্যেনাথ দত্ত "কুহু-ও-কেকা" ৪র্থ সং ১৯২৯, পৃ. ৮৯-৯০)

এই মাটিকে বাদ দিয়ে ও বঙ্গভূমিকে উপেক্ষা করে বাঙালীয়ানার জয়গান গাওয়া যায় না, এবং বাঙালীকে জানা যায় না, বাঙলাকেও চেনা যায় না।

২২. বাঙালী সমাজকে এক সূত্রে বিধৃত করেছে বাঙালীর ধর্মবিশ্বাস সংস্কার লৌকিক আচার ও ঐতিহ্য সংশ্লেষ (পৃ. ৩৭)

"গ্রামের ভিতর গিয়া অনুসন্ধান করিলেই আমার কথা যে সত্য তাহা প্রমাণীকৃত হইবে। আমি দেখিয়াছি মুসলমান ও হিন্দু চাষীদিগের মধ্যে

একটা সম্বন্ধ আছে। দাদা চাচা মামু বলিয়া তাহারা পরস্পর পরস্পরকে সম্বন্ধসূত্রে বাঁধিয়া লইয়াছে। তাহারা একই রকম কাজ করে, একই ভাষায় কথা বলে এবং তাহাদের আচার-ব্যবহার অনেকটা একই রকম। নিজ নিজ বিশিষ্ট ধর্মের একটা পার্থক্য আছে কিন্তু সে পার্থক্য শুধু বাহিরের দিকে, তাহাদের জাতিগত যে ঐক্য তাহাতে তাহার অন্তরায় হয় নাই। সুতরাং এই যে বর্ণগত ও ধর্মগত পার্থক্য তাহা আমাদের একত্র হইয়া কাজ করিবার কোন বাধা জন্মাইবে না। বরং একত্র হইয়া কাজ করিলেই বাহ্যিক পার্থক্য ক্রমে ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আন্তরিক মিলন আরও সত্য আরও জীবন্ত হইয়া উঠিবে। (চিত্তরঞ্জন দাস, ১৯১৭ খ্রী ভবানীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ)। হিন্দু ও মুসলমান বাঙালীর এই একাত্মবোধ সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাবে বাঙালীতে বাঙালীতে যে দুঃখজনক সংঘর্ষ হয়ে গেছে তা রোধ করা যায় নি। হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ফল বঙ্গ বিভাগ।

২৩. বাঙালীর সমাজ বিন্যাসের উপর লোক বিশ্বাস ও লোকানুষ্ঠানের প্রভাব জ্বলন্ত (পৃ. ৩৫)

"হিন্দু ধর্মাবলম্বী বহু জাতির মধ্যে বিবাহের সময়ে প্রচলিত স্ত্রী-আচারের বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের পূর্বে বিবাহের যে অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল তাহা আজ স্ত্রী আচারের আকারে পর্যবসিত হইয়াছে। এই সকল সামাজিক রীতিনীতি বা আচার-ব্যবহার, দেশাচার এবং লোকাচার নামে ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণের নিকট মর্যাদালাভ করিয়া থাকে। নানাজাতি যখন ব্রাহ্মণের অধীনতা স্বীকার করিয়া বৃহত্তর হিন্দু সমাজ গঠন করিতে লাগিল, তখন কাহারও আচার-অনুষ্ঠানকে অকারণে নষ্ট করা হয় নাই। কেবল ব্রাহ্মণ্যনীতির পরিপন্থী কোনও আচার বা অনুষ্ঠান থাকিলে তাহাকে পরিমার্জিত ও সংশোধিত করিয়া লওয়া হইত।...ব্রাহ্মণ্য সমাজের শীর্ষস্থানীয় মুনিঋষিগণ স্বীকার করিতেন যে, সকল মানুষের মন সমান স্তরের নয়। অতএব সকলের পক্ষে মানসিক বিকাশের জন্য একই ভাবধারার আশ্রয়ের প্রয়োজন হয় না। সমাজে যখন নানা স্তরের মানুষ বসবাস করে, তখন ধর্মের মধ্যেও সকলের সুবিধার জন্য নানাপথ ও নানামতের স্থান থাকা উচিত।..." তাই হিন্দুধর্মে 'যত পথ তত মতে'র জয়গান গাওয়া হয়েছে। এই নানাপথের একটি পথ – পূজা-পার্বণ মেলা। পূজা-পার্বণ মেলায় চাষী নতুন জীবনের স্বাদ পায়। "চাষীর দেশে সকল সময়ে ক্ষেতে ভারী কাজ থাকে না। যে সময় ফসল কাটা শেষ হইয়া যায়, শস্য বিক্রয়ের পর চাষীর হাতে কিছু পয়সা আসে, সেই

সময় ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে মেলা বসে। ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত নানা জায়গায় কোনও ঠাকুর দেবতার পূজাপার্বণ উপলক্ষে মেলা বসার রীতি প্রচলিত আছে।...এই সকল মেলার মধ্যে, সকল মেলায় না হইলেও অন্তত অনেক মেলাতে, কেনা-বেচার কাজ হয়। বিশেষ বিশেষ মেলায় বিশেষ বিশেষ জিনিষ খরিদ ও বিক্রয়ের প্রথা প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। তাহার ফলে গৃহস্থ বুঝিয়া-সুঝিয়া নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্য মেলা হইতে সংগ্রহ করিয়া আনে। সারা বৎসর কাজের পর সে যে কেবল মেলায় একটু আনন্দ উৎসব করিতেই যায় তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে বৈষয়িক ব্যাপারও কিছু সারিয়া আসে" (নির্মলকুমার বসু, "হিন্দু সমাজের গড়ন")

২৪. কৃষিকার্যের সুবিধার জন্যই বোধ হয় বহু-বিবাহের সৃষ্টি যা বাঙালী কুলীন সমাজের অনেকের মধ্যে ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছিল (পৃঃ ৩৮)

"অনেক কুলীনের ৫০/৬০ বা তাহারও অধিক স্ত্রী থাকিত।...অনেক ব্রাহ্মণের পেশাই ছিল বিবাহ করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করা।...এরূপ অনেক ঘটনা শোনা যায় যে এক মুমূর্ষু কুলীনের সঙ্গে দিদি, পিসি, ভাইজী প্রভৃতি সম্পর্কের একই পরিবারস্থ ১০৷১২টি কন্যার বিবাহ হইয়াছে—এবং ১০ হইতে ৫০ বা তদূর্ধ্ব বয়সের সকল স্ত্রী কয়েকদিনের মধ্যেই একসঙ্গে বিধবা হইয়াছে... কুলীনদের বিবাহের সংখ্যা প্রায়ই এত অধিক হইত যে তাঁহারা একটি খাতাতে বিবাহিতা স্ত্রীগণের নাম ও পরিচয় লিখিয়া রাখিতেন।" (রমেশচন্দ্র মজুমদার, "বিদ্যাসাগর—বাংলাগদ্যের সূচনা ও ভারতের নারী প্রগতি" : শঙ্কর সেনগুপ্তের 'এ স্টাডি অব উইমেন অব বেঙ্গল' গ্রন্থের পৃঃ ১৭, নির্দেশপঞ্জী থেকে)। যদিও "হিন্দু বিবাহে পতি ও পত্নীর মূলভাবকে মূর্তি দেওয়া হইয়াছে অর্ধনারীশ্বরের চিত্রে। কেবল ঈশ্বর বা হর অথবা কেবল নারী বা গৌরী নিজে নিজে সম্পূর্ণ নহেন—উভয়ের মিলনেই সম্পূর্ণতা আসিয়াছে। বাড়ী ঘর দুয়ার করিয়া ছেলে-মেয়ে-পরিবারের সঙ্গে বসবাস করিলেই কেহ গৃহস্থ হয় না। হিন্দুদের নিকট গৃহস্থ হওয়া একটি অতি-উচ্চ অতি পবিত্রভাব। (বিধুশেখর ভট্টাচার্য, "বিবাহ-মঙ্গল," জেনারেল প্রিন্টার্স, কলিকাতা ৩য় সং ১৩৬৩)। এই পবিত্র বিবাহ যখন বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ ব্যবস্থায় পঙ্কিল আবর্তের সৃষ্টি করেছিল তখন বিদ্যাসাগর কেশব প্রমুখ ব্যক্তিগণ তা প্রতিবিধানে এগিয়ে এলেন। বিদ্যাসাগর বললেন—"বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান

সংকর্ম। এ জন্মে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোন সংকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই" (ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা, "বিধবা-বিবাহ বিষয়ক নিবন্ধাবলী)। এই প্রসঙ্গে আরও স্মরণ করি, "যে জাতির প্রকৃতিতে কোনরূপ অতিপথ্য নেই, যার অন্তর একেবারে সাংসারিক সীমাবদ্ধ, সে জাতির কাছ থেকে কেউ কখনো বড় জিনিষের প্রত্যাশা করতে পারে না। এই সীমা অতিক্রম করার প্রবৃত্তি ও শক্তি ব্যক্তি বিশেষ ও জাতিবিশেষের মহত্ত্বের পরিচায়ক" (প্রমথ চৌধুরী, "দি ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেট," সি. আর. দাশ বার্থ সেন্টিনারী ভলিউম, ১৮৭০-১৯৭০, পৃঃ বাইশ)। বাঙালী তার মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে কোন বাঁধাধরা পথে অগ্রসর হয় নি। আপন মনে, নিজের খেয়ালখুশীতে সে মেতেছে। এভাবে মাততে গিয়ে যে বাধা পেয়েছে তা অগ্রাহ্য করেছে।

২৫. সংস্কৃতের আইন কানুন বা ব্যাকরণের মধ্যে বাঙালী আত্মসমর্পণ করে নি (পৃঃ ৪২)

"বাঙালী জাতির আর বাংলাভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা বিভিন্ন মত পোষণ করি। আমি আমার প্রবন্ধে বলেছি, বাঙালী জাতি হচ্ছে মূলত মিশ্র অন্-আর্য জাতি, আর্যভাষা আর আর্যসভ্যতা নিয়েছে মাত্র, তাও খুব প্রাচীন কালে নয়। বাঙলা ভাষার রীতিনীতি হচ্ছে আর্যের উপাদান অর্থাৎ ধাতু শব্দ প্রভৃতি, আর্যভাষার কাঠামো বা রূপ হচ্ছে অনার্য। বাঙলা-ভাষার ঠিক ইতিহাসটি বার হলে যে-জাতের মধ্যে এ ভাষার উদ্ভব, সেই বাঙালী জাতের সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত রহস্য প্রকাশিত হবে। বাঙলার অনার্য ভাষীর মুখে মাগধী অপভ্রংশ বদলে বাঙলা ভাষায় পরিবর্তিত হয়েছে। বাঙলা ভাষার চর্চায় প্রাকৃত সংস্কৃত পড়া দরকার, কিন্তু কোল দ্রাবিড়-বোরোর বাঙালীর ভাষার আর জাতীয় উৎপত্তির আলোচনার পক্ষে খুব বিশেষভাবে উপযোগী, এই হচ্ছে আমার মূল বক্তব্য" (শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, "সবুজপত্র", বৈশাখ ১৩২৭) ডঃ চট্টোপাধ্যায় সমালোচিত হলেন ডঃ রমাপ্রসাদ চন্দ্র প্রমুখ বিদ্বৎ সমাজের কাছে তাঁর বক্তব্যের জন্য। কিন্তু তিনি সমস্ত বিরোধিতা উপেক্ষা করলেন। তাঁর স্বপক্ষে এলেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তিনি বললেন—"ভদ্র হইবার অন্ধমোহ আমাদিগকে এমনই পাইয়া বসিয়াছে, যে হালেই আমরা অনেক খাঁটি বাংলা শব্দের জায়গায় সংস্কৃত শব্দ বসাইতে আরম্ভ করিয়াছি। সংস্কৃতের ভক্তেরা ইহাতে আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই ; কিন্তু বাংলার ভক্তেরা ইহাতে খুশী হইতে

পারেন না। যেমন দেখুন মিঠে, মউ, ভোগ, নাওয়া, পড়ুয়া, রসুই, পরখ, মিছা, উনই, শিরদাঁড়া, বুলি, ভুঁই, সাথী, পিয়াস, কলিজা প্রভৃতি শব্দগুলি আজকাল প্রায় শোনা যায় না। স্বদেশী বিদেশী ধার যত বাড়িয়া চলিয়াছে ততই বাংলাভাষা আপন পুঁজি হারাইতে বসিয়াছে" (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন, বিংশ অধিবেশনের স্মারক গ্রন্থ)। বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাঙলাকে আর্য রুধিরে মেশানো যায় নি। কারণ, "যুক্তিতর্কের উপর বিচার করে যা সম্ভবপর বলে মনে হয় সেই মত সকলের নেওয়া উচিত। আর্যামি বা দ্রাবিড়ামি বা অন্য কোন গোঁড়ামির বশীভূত হয়ে বিশেষ এক মত খাড়া করার চেষ্টা টিঁকবে না। আমাদের দেশের একটি বিশিষ্ট মত যা শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত অধিকাংশ লোককে অভিভূত করে আছে, সেটার নাম দেওয়া হয়েছে 'আর্যামি'; এই জিনিষটি অতি হালের, গত শতাব্দীর ভাষাতত্ত্ব আর প্রত্নতত্ত্ব আলোচনায় এর উদ্ভব। রাজার জাতের সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব কল্পনার পুলকে, পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে সাকুল্য লাভের আশায় এর প্রসার"। (ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ঐ একই প্রবন্ধ)। বলাবাহুল্য, ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত এখন বহুজন সমর্থিত। বাঙালী যে মিশ্র জাতি তা এখন স্বীকৃত।

১৬. রাজানুগ্রহ-প্রাপ্ত মানুষ থেকে সমাজের নিম্নতমকোটির মানুষটিকে তার তাবৎ কর্মকাণ্ডকে বিধৃত করে হয়তো স্বপ্রকাশ কোন রূপ পরিস্ফুট হতে পারে সেই ভরসায় রঙ্গভরা ভঙ্গবঙ্গের ধূসর অতীত অনাগত ভবিষ্যৎ ও সমকালের ধারা বিবরণী লিপিবদ্ধ করার দুর্বিনীত এই প্রয়াস। (পৃ. ৪২)

বাংলা একটি বিশিষ্ট ভূমি। এই ভূমির জলে স্থলে আকাশে বাতাসে একটি বিশিষ্ট ছন্দধারা আবহমানকাল থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছে।...এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে আমরা বিভিন্ন কথায় বলি—বাংলার ভাষার ধারা, বাংলার নৃত্যের ধারা, বাংলার চরিত্রের ধারা, বাংলার ভাবধারা। এই সব ধারার যোগেতে একটা মহাধারা গঠন—সেই মহাধারাকে এক কথায় আমরা বলি 'বাংলা' বা 'বাঙ্গালী'।

...বাংলার এই স্ব-ছন্দধারার মধ্যে নিহিত আছে বাংলার ও বাঙালীর স্ব-ভাব; সুতরাং এই স্ব-ছন্দ ধারাগুলোকে কি বাঙ্গালী ছেলে, কি বাঙ্গালী মেয়ে, কি বাঙ্গালী যুবক, কি বাঙ্গালী যুবতী, কি বাঙ্গালী প্রৌঢ়, কি বাঙ্গালী প্রৌঢ়া যখন আপনার জীবনে জাগ্রত ও প্রবাহিত করতে পারে, যখন সে এই

জাতীয় বৈশিষ্ট্য ধারার সঙ্গে নিজের জীবনের সংযোগ স্থাপন করতে পারে; তখনই সে হয় 'স্ব-স্থ', তখনই সে হয় 'আত্ম-স্থ'। তখনই সে হয় 'প্রকৃতি-স্থ', তখনই সে হয় 'আত্ম-প্রকৃতিস্থ', তখনই সে হয় 'স্বাস্থ্যবান', তখনই সে হয় 'স্ব-ভাব-সম্পন্ন', তখনই সে হয় 'স্বচ্ছন্দ', তখনই সে হয় 'স্ব-অধীন', অর্থাৎ স্বাধীন, তখনই সে হয় বাধাশূন্য, তখনই সে হয় 'সুস্থ,' তখনই সে হয় 'স্বাভাবিক,' তখনই সে হয় সহ-জ অর্থাৎ সহজ, তখনই সে হয় 'স্বাভাবিপ্রায়-যুক্ত,' তখনই সে হয় অন্যান্য জাতির সহিত তুলনায় 'স্ব-তন্ত্র'।...বাংলার স্ব-ছন্দ বা সচ্ছন্দ এবং স্ব-ধারা যদি বাঙালী হারায়, তাহলে বিশ্বে দান করার মত তার অবদান আর কিছু থাকবে না।...তা-হলে আমাদের রক্ষা করতে হবে বাংলার আত্মার বৈশিষ্ট্যময় ধারাপ্রবাহকে, প্রয়োজন সেই সাধনার যে সাধনা দ্বারা আমরা বাঙালীর স্বরূপকে পারব চিনতে, এবং বাঙালীর আত্মাকে করতে পারব আত্মস্থ, স্ব-ছন্দ সম্পন্ন...বাঙ্গালী নরনারীর সঙ্গে বাঙ্গালীর দেখা হলে বুক ফুলিয়ে সগর্ব্বে উচ্চকণ্ঠে বলতে হবে—অভিভাষণ করতে হবে—জয় সোনার বাংলার—'জ-সো-বা,' " (গুরুসদয় দত্ত, "ব্রতচারী পরিচয়"। বাংলার ব্রতচারী সমিতি, ১৩৪৭, পৃ. ১৪-২৫) এই বাঙলার

২৭. ব্রাহ্মণ-আত্মা ও ব্রাহ্মণ-হৃদয় এবং উপবীত শোভিত বক্ষঃস্থল একই বস্তু তা স্বীকার করা যায় না বাঙলার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আধিপত্যের তপ্ত মদিরার মোহে অনেকে সময় বিকৃত হয়েছেন কারণ ঐ মদিরায় মস্তিষ্ক যতটা বিকৃত হয় বোতল-গর্ভস্থ সুরার তারল্যে ততটা তীব্রতা নেই (পৃ. ২৮)

পৌরোহিত্য শক্তির ভিত্তি বুদ্ধিবলের উপর, বাহুবলের উপর নহে; এজন্য পুরোহিতদিগের প্রাধান্যের সঙ্গে বিদ্যাচর্চার আবির্ভাব। অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জগতের বার্তা ও সহায়তার জন্য সর্বমানবপ্রাণ সদাই ব্যাকুল। সাধারণের যেথায় প্রবেশ অসম্ভব; জড়ব্যূহ ভেদ করিয়া ইন্দ্রিয়সংযমী, অতীন্দ্রিয়দর্শী; সত্ত্বগুণপ্রধান পুরুষেরাই সে রাজ্যে গতিবিধি রাখেন, সংবাদ আনেন এবং অন্যকে পথ প্রদর্শন করেন। ইঁহারাই পুরোহিত,...কাজেই পুরোহিত চিন্তাশীল হয়েন, এবং তজ্জন্যই পুরোহিত প্রাধান্যে প্রথম বিদ্যার উন্মেষ।... পুরোহিত জড়-চৈতন্যের প্রথম বিভাজক, ইহ-পরলোকের সংযোগ সহায়, দেব-মানুষের বার্তাবহ, রাজা-প্রজার মধ্যবর্তী সেতু।... কিন্তু যেখানে শক্তির আধার ও বিকাশ কেন্দ্র কেবল মানসিক, যেখানে বল কেবল শব্দবিশেষে,

উচ্চারণ বিশেষে, সেথায় আলোয় আঁধার মিশিয়া আছে…ইহার পরিণাম অসরলতা—হৃদয়ের অতি সঙ্কীর্ণ অতি অনুদার ভাব; আর সর্বাপেক্ষা মারাত্মক, নিদারুণ ঈর্ষাপ্রসূত অপরাসহিষ্ণুতা।…তাহার পর বিদ্যাহীন, পুরুষকারহীন, পূর্বপুরুষদের নামমাত্রধারী পুরোহিতকুল, পৈতৃক অধিকার, পৈতৃক সম্মান, পৈতৃক আধিপত্য অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য যেনতেনপ্রকারেন চেষ্টা করেন; অন্যান্য জাতির সহিত কাজেই আসে বিষম সঙ্ঘর্ষ।…উন্নতির সময় পুরোহিতের যে তপস্যা, যে সংযম, যে ত্যাগ ও সত্যের অনুসন্ধানে সম্যক প্রযুক্ত ছিল, অবনতির পূর্বকালে তাহাই আবার কেবলমাত্র ভোগ্য সংগ্রহে বা আধিপত্য বিস্তারে সম্পূর্ণ ব্যয়িত।…যে সকল পুঙ্খানুপুঙ্খ বহিঃশুদ্ধির আচার জাল সমাজকে বজ্রবন্ধনে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহারই তন্তুরাশিদ্বারা আপাদমস্তক-বিজড়িত পৌরোহিত্যশক্তি হতাশ হইয়া নিদ্রিত। আর উপায় নাই, এ জাল ছিঁড়িলে আর পুরোহিতের পৌরোহিত্য থাকে না। (স্বামী বিবেকানন্দ "বর্তমান ভারত", শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ৮ম সং, ১৩৪৮, পৃ. ১৮-২২) যখনই ব্রাহ্মণ ঔদ্ধাচার, বিদ্যাচর্চা ও জনহিতকর কার্যের বদলে স্বার্থসিদ্ধি ও নিজ প্রতিষ্ঠা এবং প্রতাপ প্রতিপত্তি বাড়াবার দিকে ঝুঁকলেন তখনই ব্রাহ্মণ হারালেন তাঁর ব্রাহ্মণ হৃদয়, তাঁর দ্বিজত্ব।

২৮. খাঁটি বাঙালী অপরের মর্জির তাঁবেদারী করে নি কোনদিন (পৃ. ২৭)

'খাঁটি বাঙালী' বাঙালীর পক্ষে একটি গৌরববাচক বিশেষণ। কিন্তু জাতি হিসাবে অর্থাৎ বাঙালী জাতি হিসাবে 'খাঁটি' কি? বাঙালীর খাঁটিত্বের প্রাগৈতিহাসিক কোন নজির আমাদের কাছে নেই। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে নানা শ্রেণীবিভাগ আছে। কোন শ্রেণীর কোন বাঙালী খাঁটি? বাঙালীর মধ্যে যারা গুরুগিরি ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত, যারা বৈষয়িক, অবস্থাপন্ন এবং শিষ্যের মাথায় পদযুগল তুলে দেবার সময় দেবত্বের পর্যায়ে উঠে যায় ও দক্ষিণাদি নিয়ে তৃপ্তি পায় তারা কি খাঁটি বাঙালী? পুরোহিত বাঙালী গুরুদের মত পূজনীয় নন, যজমানদের আদেশ প্রতিপালন করতে হয় তাঁদের, কিছু টাকা পেলেই পুরোহিত গৃহস্থের সঙ্গে গৃহদেবতার যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন। এরা কি খাঁটি বাঙালী? আরেকদল আছেন ধার্মিক, দিবারাত্র ধর্মাচার পালন তাঁদের প্রধান কাজ। তাঁরা সংসার বিষয়ে প্রায় উদাসীন। পৃথিবী তাঁদের কাছে কয়েদখানা। এই সম্প্রদায়ের একদল ভণ্ড। চুরি, জুয়াচুরি, লাম্পট্য সর্বপ্রকার কুবিদ্যায় পারদর্শী—হরিনাম তাঁদের আবরণ,

তাঁরা আত্মকেন্দ্রিক, নিজের সুবিধার জন্য ব্যস্ত। তাঁরা কি খাঁটি বাঙালী? যারা কেরাণী, যারা বড়বাবু জীবনে কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা যাদের নেই, উর্ধ্বতন সাহেবদের কাছে যারা জোড়হস্ত, নিম্নস্থ দেশী কর্মচারীর উপর অকারণ অত্যাচারী, তারা কি খাঁটি বাঙালী? বাঙালীর মধ্যে যারা ঘুষ খায়, যারা বিশ্বাসঘাতক, যারা ছিঁচকে চোর, যারা উঠতি গুণ্ডা, যারা বনেদি গুণ্ডা, যারা নানা অপরাধপ্রবণ, যারা দাঙ্গাবাজ, যারা মামলাবাজ, যারা বারোয়ারী পূজার পাণ্ডা, যারা পতিতাদের দালাল, যারা খুচরা দোকানদার, যারা ঘরামি, যারা ছুতার মিস্ত্রী, যারা পুরাণ কাগজ ও বই বিক্রেতা, যারা মিষ্টান্ন বিক্রেতা, যারা দুধ বিক্রেতা, যারা পাট বিক্রেতা, যারা চা-বাগানের কুলি, যারা যাদুকর, যারা আড্ডাবাজ, যারা নেশাখোর, তারা কি খাঁটি বাঙালী? বাঙালীর মধ্যে যারা শিক্ষক অথচ লেখাপড়া করে না অথচ 'অ্যাকাডেমিক ওয়ার্ল্ডে'র লোক হিসাবে বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন দাবী করে এবং সর্বপ্রকার হিংসা, ঈর্ষা, দ্বেষ ও কুবিদ্যায় পারদর্শী, তারা কি খাঁটি বাঙালী? যারা ব্যবসায়ী, যারা খাদ্যে ভেজাল মিশায়, যারা ক্রেতার সর্বনাশ ঘটিয়ে নিজেরা মুনাফা লুটে নেয়, তারা কি খাঁটি বাঙালী? যারা চাষী, যারা কুটিরশিল্প অনুসারী, যাদের সরলতা গরীবদের আর্থিক অসাম্যের সুযোগ নিয়ে ব্যবসায়ী বাঙালী, ধনী বাঙালী বা জমিদার বাঙালী সহজে গরীবদের ফাঁকি দেয়, তারা কি খাঁটি বাঙালী? যারা লেখক, যারা প্রকাশক, যারা উভয়ে উভয়কে ফাঁকি দেবার জন্য ওৎ পেতে বসে আছে, তারা কি খাঁটি বাঙালী? সত্য বটে, একদিন বাঙালী এদেশে রাজ্য-শাসন করেছিল, সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল, নানা দিকে উন্নতিবিধান করেছিল, বিশ্বাসঘাতকতাও করেছিল, কিন্তু খাঁটি বাঙালী বলতে এই সব গুণের কোনটাই তো আমাদের মনে উদিত হয় না। নানাচরিত্রের ইংরেজ আগমনের পূর্বে ছিল না। বাঙালী জনসেবক ইউরোপীয় আদর্শে জনসেবায় মেতেছেন, তাঁরাও খাঁটিত্ব হারিয়েছেন। বাঙালী রাজনীতিবিদও বিদেশী ভাবধারার আদর্শে রাজনৈতিক আন্দোলনে নেমেছেন, সুতরাং তাঁরাও খাঁটিত্ব হারিয়েছেন, তবে খাঁটি বাঙালী কে বা কারা? যারা টিকি রাখে, খালিগায়ে, খড়ম পায়ে, সংস্কৃত বচন আওড়ায়, তারা? না যারা অরণ্যের-সন্তান, অরণ্যকে ঘিরে যাদের জীবন তারা? অথবা যারা কৃষিজীবী শ্রমজীবী, তারা? আসলে খাঁটি বাঙালী কথাটিই অর্থহীন, নির্ভেজাল বাঙালী কথাটি অস্পষ্ট। যাঁরা অপরের তাঁবেদারী করতে লজ্জা পান, যাঁরা অনুকরণপ্রিয়, যাঁরা অতি কথনের শিকার হন তাঁরা বাঙালী। আধুনিক বাঙালী প্রাচীন বাঙালীর খাঁটিত্ব ত্যাগ করার

চেষ্টা করছেন, প্রবাসী বাঙালী দেশী বাঙালী অপেক্ষা কম খাঁটি। আসলে খাঁটি বাঙালী হচ্ছেন তিনি বা তাঁরা, যাঁরা বাঙলার মাটি, জলবায়ু, প্রকৃতি ও প্রাকৃতজনকে ভালবাসেন, বাঙলা ভাষার উপর যাঁদের শ্রদ্ধা আছে, বাঙালীর অহং ও জাত্যাভিমান যাঁদের মধ্যে আছে এবং যাঁরা হিন্দু-মুসলমানে ভেদ করেন না, যাঁরা সর্বপ্রকার শোষণের বিরুদ্ধে, যাঁরা সরব বাঙলার গ্রামে, মাঠে, মঠে, মসজিদে। যাঁরা সরল, যাঁরা ঐতিহ্যানুসারী।

২৯. বাঙালীর প্রেম ভালবাসার গতি চির দুর্বার সে অলঙ্কার শাস্ত্র হাতে নিয়ে সেই ছাঁচে প্রেম ভালবাসার আদর্শ গড়ে তোলেনি (পৃ. ৪১)

"বাঙলাদেশের বিশেষ একটি জীবনধারা ছিল—এবং সেই বিশেষ জীবনে প্রেমেরও একটি বিশেষ ধারা ছিল,...বৈষ্ণব-সাহিত্যে যেমন দেখিতে পাই, কৃষ্ণ রাধিকাকে জলের ঘাটে আসিবার জন্য বাঁশিতে সঙ্কেত করিয়াছেন, তেমনই...নদ্যার ঠাকুর ও মহুয়ার গোপন সাক্ষাৎ ও কথোপকথন : 'জল ভর সুন্দরী কন্যা জলে দিছ মন, কাইল যে কইছিলাম কথা আছে নি স্মরণ।'...কৃষ্ণ পথিমধ্যে সহসা রাধিকাকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিয়াছে, লজ্জায় ও ভয়ে রাধা নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য কত মিনতি জানাইয়াছে। 'ধোপার পাট' গীতিকাটিতেও দেখিতে পাই, জলের ঘাটে কাঞ্চনমালার সেই মিনতি—'পুষ্করিণীর চাইর পারে রে ফুটল চাম্পা ফুল, ছাইরা দে রে চেংরা বন্ধু ঝাইড়া বানতাম চুল...দুষমন পাড়ার লোক দুষমণি করিবে, এমনকালে দেখলে বন্ধু কলঙ্ক রটাবে।' রাত্রি ও নিশাকালে, মিলনের সঙ্কেত শুনিয়া রাধাও যেমন ঘরের বাহির হইতে না পারিয়া সারারাত মনস্তাপে কাটাইয়াছে, তেমনই—'পারলাম না পারলাম না বন্ধু মইলাম মাথার বিষে, সত্যভঙ্গ হইল রে কুমার পারলাম না আসিতে। মাও বাপ জাইগ্যা আছে আসিতাম কেমনে, ঘর কইলাম বাহির রে বন্ধু পর কইলাম আপন, অবলার কুলভয় হইল দুষমণ। কিসের কুল কিসের মান আর না বাজাও বাঁশী, মনেপ্রাণে হইয়াছি তোমার শ্রীচরণ দাসী।'...কাঞ্চনমালার আক্ষেপোক্তি আমাদিগকে চণ্ডীদাসের পদাবলীর বহু কথা স্পষ্ট ও অস্পষ্টভাবে স্মরণ করাইয়া দেয়—'তোমার লাগিয়া আমি জীয়ন্তে যে মরা, কর্ম্ম দোষেতে আমি হইলাম কপালপোড়া।' 'শ্যামরায় পালায়' দেখি—'সুখেরে কইরাছি বৈরী রে বন্ধু দুঃখেরে দোসর, তুই বন্ধের পিরীতে মজ্যা আপন কইলাম পর।

…যে জন খাইয়াছে বন্ধু পিরীত গাছের ফল, কলঙ্ক মরণ দূর বন্ধু জীবন সফল।' …বাঙলাদেশের আকাশে বাতাসে 'পীরিতি'র এই যে কাব্যরূপ টুকরা টুকরা হইয়া ভাসিয়া বেড়াইত তাহার সুবিন্যস্ত গ্রথিত রূপই প্রচলিত চণ্ডীদাসের রাধাপ্রেমের পদাবলী। ..ঘাটে জল আনিতে গিয়া 'কন্যা' মাঠের রাখাল 'মইষাল' বন্ধুর বাঁশী শুনিয়াছে। তখন—'সুতেতে ভাসায়ে কলসী শুনে বাঁশীর গান, বাঁশীর সুরে হরে নিল অবলার প্রাণ।'…অবলানারীর প্রাণ লইতে বৃন্দাবনেই যে শুধু বাঁশি বাজিয়া ছিল তাহা নহে, বাঙলাদেশের ঘাটে মাঠেও বাজিয়াছে, আজও বাজে।…বাঙালীর পল্লীর জীবনযাত্রা, সেই বিশেষ জীবন যাত্রার ভিতর হইতে উৎসারিত প্রেম—বাঙলাদেশের বিচিত্র প্রেম—সেই প্রেমকে প্রকাশ করিবার বাঙালীর যে নিজস্ব ভঙ্গি…প্রাকৃত রূপের ভিতরেই দিব্যজ্যোতিতে অপ্রাকৃতির মহিমা লাভ করিয়াছে (শশিভূষণ দাশগুপ্ত, "শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, দর্শনে ও সাহিত্যে" এ. মুখার্জি শ্রাবণ ১৩৫৯, পৃ. ৩০৯)

৩০. লোকজীবনের সর্বত্রই বাঙলার পুণ্যতীর্থের মাটির সোদা গন্ধ শহরের পাথরের বন্দীশালায় আবদ্ধ বা পিঞ্জরাবদ্ধ পাখি যূথি বেলী কুন্দ করবী সন্ধ্যামালতী নবমল্লিকা চম্পা জবা কদম্বের ঘ্রাণ পেতে পারে না। (পৃ. ১৩)

"বাঙ্গালা সাহিত্যকে জাতীয় সাহিত্য নামের উপযুক্ত করিতে হইলে, সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীর কথা লিখিতে হইবে। এমন অনেক শব্দের প্রয়োগ করা চাই যাহা লিখিত বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গীভূত নয়।…চাষা, গাড়োয়ান, ছুতার, কামার, নৌকার মাঝি, মুচি, রাখাল, রাজমিস্ত্রী, কুম্ভকার, সহিস, দোকানদার, তাঁতি, ঘরামী, ময়রা, দরজি, কাঁসারি, শাঁখারি, পোদ্দার, কলু, গোয়ালা, মুদি, তাম্বুলি প্রভৃতি স্ব স্ব ব্যবসায়ে শব্দ ব্যবহার করে তৎসমুদয় এবং তাহারা যে সকল যন্ত্র ও হাতিয়ারাদি লইয়া কার্য করে তাহাদের নাম অধিকাংশ স্থলেই 'সাধুভাষার' বহির্ভূত। তাহারা যে সকল ক্রীড়া ও আমোদ প্রমোদে লিপ্ত হয়, তাহারও অনেক পারিভাষিকশব্দ পুস্তকের ভাষায় অপ্রচলিত। তাহাদের নানাবিধ পরিচ্ছদ, অলঙ্কার খাদ্যদ্রব্যাদির সমুদায় নামও লিখিত বাঙলায় পাওয়া যায় না; এই সকল শব্দ কথিত বাঙ্গলার অন্তর্গত। তাহাদের অনেক ধর্মানুষ্ঠান শাস্ত্রবহির্ভূত, সুতরাং কথিত বাঙ্গলার সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল সাধুভাষায় অবর্ণনীয়। তাহাদের স্বভাব চরিত্র বুঝিতে হইলে বঙ্গদেশের উপকথা ও মেয়েলী ছড়া রূপ যে অলিখিত

সাহিত্য আছে, তাহার অনুশীলন করা আবশ্যক।...বঙ্গদেশে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে এই সকল কার্যের বিবিধ প্রক্রিয়ার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। উদ্ভিদবিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি সাধন করিতে হইলে নানাবিধ কৃষিজাত ও স্বভাবজ গাছ-গাছড়ার নানাজেলায় প্রচলিত নাম জানা দরকার... প্রাণীবিদ্যার উন্নতি বিধান করিতে হইলে সর্বপ্রকার পশু পক্ষ্যাদির স্থানভেদে বিভিন্ন প্রকার বহুবিধনাম সংগৃহীত হওয়া দরকার।...কথিত বাঙ্গলা শব্দ এক জেলায় শ্লীল অপর জেলায় হয়ত অতি অশ্লীল, ইহাতে অনেক সময় অনেককে পুরুষ এবং মহিলা উভয় সমাজেই বড় অপ্রতিভ হইতে হয়। প্রাদেশিক বাঙ্গলার অভিধান থাকিলে এরূপ লজ্জিত হইতে হয় না। আমাদের সাহিত্যে প্রাকৃতিক শোভার বর্ণন, ঋতুবর্ণন, নরনারীর রূপবর্ণন প্রভৃতি বড় একঘেয়ে ও পুঁথিগত হইয়া পড়িয়াছে। যেন পূর্ব কবিগণ সমস্ত সৌন্দর্য নিঃশেষরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, এবং উপমারও আর নতুন বস্তু রাখিয়া যান নাই।...কিন্তু প্রত্যেক কবিকে যদি স্বানুভূত সৌন্দর্যের কথাই বলিতে হয়, তাহা হইলে অনেক সময় সাধুভাষায় কুলায় না ; তাঁহাকে প্রাদেশিক কথিত ভাষার আশ্রয় লইতে হয়।" (রামানন্দ চট্টপাধ্যায়, "দাসী", জুন, ১৮৯৫ থেকে "কল্যাণী", আষাঢ় ১৩৭২ পুনর্মুদ্রিত)

৩১. একে পুরাতনকে ঐতিহ্যকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরল অপরে প্রাচীন ঐতিহ্যের কিছু নিয়েও বৈদেশিক আমদানীর কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে নতুন দৃষ্টিকোণে নিজেকে ঢেলে সাজাতে চাইল। (পৃ. ৩৭)

"ঐতিহ্যের পটভূমির সহিত যাহাদের যোগ নাই, তরুলতার ক্ষেত্রে যেমন পরভোজী শব্দ ব্যবহার করা হয়—এখানে ঐ জাতীয় ব্যক্তিদের জন্য তেমন বিশেষণই আরোপ করা চলে।...ঐতিহ্য হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ার অর্থ... মৃত্যু ..ইহার শক্তিকে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু স্বীকার করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।...ঐতিহ্যকে স্বীকারের পর তার প্রবাহকে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতে হইবে।" (মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মেলনের ভাষণ, ১৯৫১)। ঐতিহ্যানুসারী সাহিত্যসেবী কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের ব্যাপারে তত আন্তরিক নন যত তাঁরা কথার মায়াজাল রচনায় পটু। একাজে অন্ধ ধর্মীয় গোঁড়ামী থেকে দূরে থাকতেই হবে। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সৃষ্টির মূলভিত্তি অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, আঞ্চলিক, প্রাকৃতিক ও ঋতুর প্রভাব। সমাজ সচেতন দৃষ্টি দিয়ে, দরদী অন্তর দিয়ে

তাই বাঙলা ও বাঙালীর ঐতিহ্যকে সমগ্র বাঙালীর কাছে তুলে ধরতে হবে। এ কাজে "আমাদের অনেক সাহিত্যিক বর্তমানে ভাষার কথ্যরূপ ব্যবহার করতে প্রলুব্ধ হচ্ছেন। কিন্তু এটা যে কত বড় কঠিন কাজ, সে সম্বন্ধে তাঁদের স্পষ্ট ধারণা আছে বলে মনে হয় না। পূর্ব বাঙলায় বলা যায়, ভাষার এমন কোন কথ্যরূপ এখনো আবিষ্কৃত হয় নি। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের আদর্শ কথ্য ভাষার আদর্শ রূপ গ্রহণ করেই আপাতত আমাদের কাজ চালানো ছাড়া উপায়ান্তর নেই।...অনেকের ভাষাতেই কথ্য ও লেখ্য ভাষার জগা-খিচুরী তৈরী হচ্ছে এবং অন্যভাবেও কথ্যভাষার আদর্শ ভেঙ্গে পড়ছে। একে কিছুতেই একটি সুলক্ষণ বলে মনে করা যায় না।" (ওয়াজেদ আলি "সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা", সওগাত, পৌষ, ১৩৫৯)। বাঙলা ভাষা পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় বাঙলারই অন্তরের জিনিষ। এখানে ভেদাভেদ সৃষ্টির যে কোন রকম প্রচেষ্টা নিন্দনীয়। বাঙলা ভাষাকে বিভক্ত করার, উচ্চারণ বিকৃত করার প্রচেষ্টার প্রতিবাদ উত্থাপিত হয়েছে ওপার-এপার বাঙলার শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে দীর্ঘদিন থেকেই—"পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আমাদের সংস্কৃতির কেন্দ্র কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়েছে, এতে ...ঢাকা বা ঢাকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপভাষা কি আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির একটি আদর্শ ভাষার রূপ নেবে? ..কিছুদিন পূর্বে কুমিল্লার কিছু ছাত্রের মুখে রবীন্দ্রনাথের 'দুঃসময়' কবিতার আবৃত্তি শুনছিলাম, তাদের প্রায় সকলেই 'মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন অন্তরে' পংক্তিটি পড়লে—মহা আশঙ্ক্কা জঅপিছে মৌন অন্তরে।' পরে জানতে পারলাম এ অঞ্চলে আকাঙ্ক্ষার সাদৃশ্য আশঙ্কা হয়েছে আশঙ্ক্কা।...আজাদী উত্তর যুগের কলকাতা ভিত্তিক উচ্চারণকে হুবহু গ্রহণ করতে আমাদের আত্মসম্মানে বাধছে বলে আমরা উচ্চারণ নিয়ে ছিনি-মিনি খেলছি...এ থেকে মুক্তির পথ আছে। এ পথ বেছে নিতে হলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন চাই, চলিত উচ্চারণকে যাঁরা কলকাতা শান্তিনিকেতন তথা পশ্চিম বাংলাভিত্তিক বলে বর্জন করতে চান, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই।" (ডক্টর আবদুল হাই, "বাঙলা একাডেমী পত্রিকা", বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৬৫)

৩১. শুনছি যে রূপসী বাঙলার হৃত ঐশ্বর্য পুনরুদ্ধার করা হবে এই মর্মে চমৎকৃত ঘোষণা শুনছি বাঙালীর অতীত কীর্তিগাথা যশ ও মহিমার অনেক কথা অনেক ভাবে। (পৃ. ৪৩)

এ মাটিতে জন্মগ্রহণ করতে পেরেছে বলেই বাঙালী ধন্য। বাঙালী

কৃতার্থ। বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথ কৃতকৃতার্থ এইসব বাঙালীর মনের কথা, প্রাণের কথা ভাষায় রূপ দিয়ে বলেছেন—

"সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এইদেশে।
সার্থক জনম মাগো,
তোমায় ভালবেসে ॥
আঁখি মেলে তোমার আলো,
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে,
মুদব নয়ন শেষে ॥"

তিনি সমগ্র বাঙালীকে ডাক দিয়ে বললেন, আজ—"হৃদয়কে একবার আমাদের এই বাঙলা দেশের সর্বত্র প্রেরণ কর। উত্তরে হিমাচলের পাদমূল হইতে দক্ষিণে তরঙ্গমুখর সমুদ্রকূল পর্যন্ত, নদীজলে জড়িত পূর্ব সীমান্ত হইতে শৈলমালাবন্ধুর পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত চিত্তকে প্রসারিত কর—যে চাষী চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর—যে রাখাল ধেনুদলকে গোষ্ঠগৃহে এতক্ষণে ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর, শঙ্খমুখরিত দেবালয়ে যে পূজার্থী আগত হইয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর, অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নমাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর···একবার নতশিরে বিশ্বভুবনের কাছে প্রার্থনা কর—বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,···বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন বাংলার মাঠ··বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা, বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা···এক হউক এক হউক এক হউক হে ভগবান।" (কলিকাতা বাগবাজারস্থিত পশুপতি বসুর বাসভবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিজয়া-সম্মিলনে প্রদত্ত ভাষণ, নবপর্যায় বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১৩১২) এই বাঙালীকে আহ্বান করে অন্য এক কবি বলেছেন—"জুড়ে দে ঘরের তাঁত, সাজা দোকান; বিদেশে না যায় ভাই গোলারি ধান। আমরা মোটা খাব ভাইরে পরবো মোটা—তবু মাখবোনা ল্যাভেণ্ডার চাইনে 'অটো',···থাকলে গরীব হয়ে ভাইরে গরীব চালে—তাতে হবো নাকো মনে খাটো" (রজনীকান্ত সেন)। স্মরণ রাখতে হবে যে বিজাতীয় অত্যাচারে আমরা সর্বহারা হয়েছি। তাই এখানে—"ভূত পিশাচ তালবেতাল, নাচে আর বাজায় গাল, সঙ্গে ধায় ফেরুপাল এটা ধরি ওটা ফেলি। আয় না

হেথা নাচবি শ্যামা, শব হব শিব পা ছুঁয়ে মা, জগৎ জুড়ে বাজবে দামা দেখবে জগৎ নয়ন মেলি।" (অশ্বিনীকুমার দত্ত)

"কেহ নাই দেশে মানুষ তোমরা বই
স্বর্গ রচিয়া মৃত্যুহীন
চল্ ওরে কাঁচা চল নবীন,
দৃপ্তচরণে দোল জাগায়ে মেরুতে রে বেদুইন।
আর নিশি নাই ডাকে শুভ্র দীপ্ত দিন।
নাই ওরে ভয় নাই,
জাগে উর্ধ্বে দেবী জননী শক্তিময়ী ॥"

(নজরুল ইসলাম)

৩৩. অহিন্দু বাঙালী দরাফ খাঁ রচনা করে গঙ্গাস্তোত্র (পৃ. ২৩)

যৎ ত্যক্তং জননীগণৈর্যদপি ন স্পৃষ্টং সুহৃদ্বান্ধবৈঃ
যস্মিন্পান্থদৃগন্ত-সন্নিপতিতে তৈঃ স্মর্য্যতে শ্রীহরি।
স্বাঙ্গে ন্যস্য তদীদৃশং বপুরহো স্বীকুর্বতী পৌরুষং
ত্বং তাবৎ করুণাপরায়ণপরা মাতাসি ভাগীরথি ॥
অচ্যুতচরণ-তরঙ্গিণি, শশি শেখর-মৌলী-মালতীমালে।
ত্বয়ি তনুবিতরণ-সময়ে দেয়া হরতা ন মে হরিতা ॥
শূন্যীভূতা শমননগরী নীরবা রৌরবাদ্যা
যাতায়াতৈঃ প্রতিদিনমহো ভিদ্যমানা বিমানাঃ।
সিদ্ধৈঃ সার্দ্ধং দিবি দিবিষদঃ সার্ঘ্যপাত্রৈকহস্তা
মাতর্গঙ্গে যদবধি তব প্রাদুরাসীৎ প্রবাহঃ ॥
... ...
সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
স তরতি নিজপুণ্যৈস্তত্র কিং তে মহত্ত্বম।
যদি তু গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং
তদিহ তব মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বম।

("স্তবকবচমালা", সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ৪র্থ সং, পৃ: ৪৭২-৭৩)

৩৪. দেশকালধৃত বাঙালীর গতি পরিণতি জানতে সমাজের প্রবহমান ধারাস্রোতের বিবরণ জানতে সকলের সঙ্গে একত্র হয়ে আনন্দরস ধারার আস্বাদন করতে চেষ্টা চলছে (পৃ. ২০)

ইংরাজ রাজের সমাগমে প্রতীচ্যদেশের এক প্রবল হাওয়া আসিয়া

প্রাচ্য জলধি বিচলিত করিল।… এই সময় বাঙ্গালী কেরাণীর সৃষ্টি ইংরাজ বণিক কৃপায় আরম্ভ হইল। ইংরাজ বণিক বাঙ্গালীর সহায়তা ভিন্ন ব্যবসায় চালাইতে পারিতেন না; ক্রয়বিক্রয় আদানপ্রদান প্রায় সমস্তই বাঙ্গালী কেরাণীর হাত দিয়াই হইত। অনেক নিরক্ষর হৌসের মুৎসুদ্দিরা এই সুযোগে ক্রোড়পতি হইয়া পড়িলেন। কিন্তু অশিক্ষিতের হাতে বিপুল ঐশ্বর্যের আগমনে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিতে লাগিল। ইন্দ্রিয়ের প্রবল প্ররোচনায় ও সাচ্ছন্দ্যের বাতাসে বিলাসিতার আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কর্মক্ষম হইয়াও বাঙ্গালী স্বাধীন ব্যবসায় দ্বারা স্বাধীন জীবিকা অর্জন করিতে অক্ষম হইয়া পড়িলেন।…

…আমাদের মৃতকল্প স্বাস্থ্যবিহীন যুবকগণ একজামিন পাশ করিবার নিমিত্ত এমন হাস্যোদ্দীপক উন্মত্ততা দেখান যা পৃথিবীর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। পাশ করিয়া সরস্বতীর নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ—শিক্ষিতের এরূপ জঘন্য প্রবৃত্তিও আর কোন দেশেই নাই।

…মস্তিষ্কের প্রাখর্যে বাঙ্গালীজাতি পৃথিবীর আর কোনও জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, যে পথে এই শক্তি নিয়োজিত করিলে নানা সুফল প্রসব করিত, সে পথে ইহারা নিয়োগ হয় নাই। তাই জগতের সমক্ষে বাঙ্গালীজাতির কীর্তি নিদর্শন দেখাইবার অতি অল্প বিষয়ই আছে। মুসলমান শাসনকালে এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তি ন্যায়ের নিষ্ফল কূটতর্কে ও স্মৃতির জটিল ও স্থানে স্থানে হাস্যোদ্দীপক বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন ও প্রচলনে ব্যয়িত হইয়াছিল, কিন্তু সত্যানুসন্ধানে ব্যবহৃত হয় নাই। আবার ইংরাজ শাসনকালে, কেরাণীর লেখনী চালনে এবং উকিলের অনাবশ্যক বাগবিতণ্ডায় এই দুর্লভ শক্তি নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু আশা করি কুসংস্কারাচ্ছন্ন পথভ্রান্ত বঙ্গদেশে স্বাধীন চিন্তার ও সত্যানুরাগের নির্মল স্রোত আসিয়াছে, এখন বঙ্গীয় যুবক জাগ্রত হইতেছে।" (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, "বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার" "কল্যাণী," আষাঢ় ১৩৬৮, "সুপ্রভাত" শ্রাবণ ১৩১৬ থেকে পুনর্মুদ্রিত) আচার্য রায়ের বাঙালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার নিয়ে একদা বাঙলায় ঝড় উঠেছিল, পক্ষে ও বিপক্ষে চলে সওয়াল, যাই হোক, একথা স্মরণ রাখতেই হবে যে "গৃহের প্রতি যদি আমাদের একটা মনের টান থাকে, পিতামাতার প্রতি যদি আমাদের একটা মনের টান থাকে, তবে তাহাই ভ্রাতৃ-বিরোধের মহৌষধি হইতে পারে।…দেশের হৃদয়ে হৃদয়ে যদি অনৈক্যের সঞ্চার হয় তবে দেশ ধনেপ্রাণে মারা যাইবে। আমাদের দেশীয় জনগণের মধ্যে প্রধান অনৈক্যের

কারণ এক্ষণে যাহা দেখা যায় তাহা এই, উদাসীন জ্ঞানের পরামর্শে আমরা দেশ-বহির্ভূত আচার-ব্যবহার রীতিনীতির অনুশীলনে এমনি বেগে অগ্রসর হইতেছি যে, একেবারে দেশছাড়া না হইয়া এদিকে আর থামিতেছি না। যেমন দেশের টাকা দেশছাড়া হইতেছে, অন্ন দেশছাড়া হইতেছে, দেশের লক্ষ্মী দেশছাড়া হইতেছে, সেইরূপ দেশের জ্ঞানীরাও দেশছাড়া হইতেছেন··· স্বদেশের কুসন্তানেরা বিজ্ঞতার ভান করিয়া এইরূপ বলিতে পারেন যে, 'বঙ্গবাসীগণ বল দেখি, এক্ষণে তোমরা পূর্বাপেক্ষা স্বাধীন কি না? সকল বিষয়ে পূর্বাপেক্ষা তোমরা নির্ভয় কিনা?' ইহার উত্তর এই যে, যে পক্ষী পিঞ্জরে বদ্ধ থাকে সে বরং একদিন পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, কিন্তু যাহাকে পিঞ্জর হইতে মুক্ত করিয়া অহিফেন যুক্ত খাদ্য-ভক্ষণ-শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহার আর কোনকালেই পরিত্রাণ নাই।···পরিপক্ক জ্ঞানই পুরাতনের সহিত নূতনের এবং গৃহের সহিত দেশের প্রকৃত হিতানুষ্ঠানে কৃতকার্য হইতে পারে। ··অবিবেচক ব্যক্তি মনে করেন যে পুরাতনের সহিত কোনপ্রকার যোগ রাখিয়া কাজ নাই, একেবারেই নূতন রীতি-নীতি প্রণালী-পদ্ধতি আচার ব্যবহার ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া একটা হুলস্থুল ব্যাপার বাধাইয়া-দেওয়া যাউক; জগৎসংসার যদি ইঁহাদের পরামর্শ শুনিয়া চলিত, তবে গতকল্য দিনের পর রাত্রি হইয়াছে, অদ্য সেরূপ না হইয়া দিনের স্থানে রাত্রি হইত রাত্রির স্থানে দিন হইত। গতকল্য আমাদের দেশে বট অশ্বত্থ জন্মিয়াছে, অদ্য তাহার স্থানে ওক গাছ উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিত, এইরূপ নিমিষে নিমিষে জগতের মূর্ত্যন্তর এবং অবস্থান্তর ঘটিত।···দেশের প্রতি অনুরাগটি সর্বপ্রথম আবশ্যক। স্বদেশানুরাগে জন্মভূমিকে প্রথমে চোক্ষের জলে সিক্ত কর, পরে সময় বুঝিয়া তাহার উপর শ্রমজল বর্ষণ কর, তাহা হইলে সেই জ্ঞানবীজ যথাসময়ে কার্যরূপ বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া, স্বদেশের হিতজনক কল্যাণে ফল প্রদানে একটুও কার্পণ্য করিবে না।" (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। আষাঢ় ১৭৯৯ শক। ৪০৭ সংখ্যা। সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ২য় খণ্ড, বিনয় ঘোষ সম্পাদিত) স্বদেশী আন্দোলনের গতি যখন দুর্বার, তখনও, স্বীকার করতেই হবে, একদল বাঙালী ছিলেন যাঁরা ইংরেজ রাজের পদাঙ্ক অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা অবাঙালীদের দাসত্ব অপেক্ষা ইংরেজের দাসত্বকে শ্রেয় মনে করতেন। মনে করতেন বলেই তাঁরা ইংরেজ রাজের জয়গান গেয়েছেন, নিন্দা করেছেন তাঁদের যাঁরা ইংরেজ-বিরোধী, যাঁরা বিদেশী শোষকদের বিরোধী।

৩৫. কথনও স্রোতের তরঙ্গ বিক্ষেপে চোরাবালির চড়ায় নিক্ষিপ্ত হয়ে সাময়িক স্বস্তিশ্বাস ফেলি তখন সুখদুঃখকে পরিমাপ করতে সচেষ্ট হই (পৃ ৩৬)

"আমরা এই যে উনবিংশ শতাব্দীর দোহাই দিয়া সভ্যতা তরঙ্গে ভাসিতেছি, 'উন্নতি উন্নতি' বলিয়া দিক বিদীর্ণ করিতেছি, এ সমস্ত কিছুই নহে, জগদীশ্বর না করুন, আজি যদি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারত ত্যাগ করিয়া যান, তাহা হইলে এই উন্নত সভ্য, মানী কৃতবিদ্য বাঙ্গালী জাতি ভারতের অন্যান্য জাতির মধ্যে সর্বাগ্রে পতিত, নিগৃহীত এবং সর্বাপেক্ষা দলিত হইবে। তখন বক্তৃতার তরঙ্গ, সভ্যতার করঙ্গ, উন্নতির সোপান, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি শূন্যে মিলাইবে। বাঙ্গালী জাতি এখন বরং মহাসুখে আছেন, তখন চৌগোপ্পাওয়ালা হিন্দুস্থানীর দাসত্বে নিযুক্ত হইবে, কৃতবিদ্য বাঙ্গালী ইহা ভাবে না। ইহাই দুঃখের বিষয়। এবং বাঙ্গালী জাতি যে প্রকৃতরূপে শিক্ষিত হয় নাই, ইহাও তাহার আর এক জাজ্বল্যমান প্রমাণ।—অধিক দিনের কথা নহে, শতবর্ষের পূর্বের বাঙ্গালীরা যে পরিমাণ আহার করিত পদচারে যতদূর ভ্রমণ করিতে পারিত যেরূপ শ্রমসাধ্য কর্ম অবহেলায় সমাধা করিত এখনকার উন্নত সভ্য কৃতবিদ্য ইয়ং বেঙ্গলগণ তাহার শতাংশের একাংশও পারে না। তোতাপাখির ন্যায় পাঠ মুখস্থ করিতে অঙ্গভঙ্গির সহিত বক্তৃতা করিতে বিজাতীয় ভাষায় পত্রাদি লিখিতে দেশী বিলাতী মিশ্রিত ভাষায় বাক্যালাপ করিতে গুরুজনকে অমান্য করিতে স্বধর্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া না হিন্দু না মুসলমান না খৃষ্টান অদ্ভুতজীব হইতে বিলাতী বেশভূষা পরিধান করিতে এবং আত্মমনে আপনারা বড় হইতে শিখিয়াছেন। যতদিন না বাঙ্গালী জাতি আপনাদিগকে জগতের সর্বাধম জানিয়া আত্মঘৃণায় ব্যথিত হইবে ততদিন বাঙ্গালী জাতির কোন মতেই বলবৃদ্ধি হইতে পারিবে না। পুত্র ইংরেজী শিখিবে উপাধি লইবে কেরাণীগিরী করিয়া অর্থোপার্জন করিবে বলবৃদ্ধির প্রয়োজন কি ? এই বিষময় ভাবটি যতদিন না বঙ্গীয় পিতামাতার হৃদয় হইতে দূরীভূত হইতেছে ততদিন আমাদিগের মঙ্গল নাই" (সংবাদ প্রভাকর ১০. ৯. ১২৮৫/২৪. ১২. ১৮৭৮)

এই মঙ্গলের জন্য, হিতের জন্য যে জাগরণ তা আসবে সমাজের নীচের তলার লোকদের কাছ থেকে। নেতৃত্বও থাকবে তাদের। সুতরাং "ভারতবর্ষের উচ্চবর্ণীয়গণ, তোমরা কি তোমাদের জীবিত মনে কর ? তোমরা দশহাজার বছরের পুরানো মমি ছাড়া কিছু নও।... তোমাদের ঘরবাড়ী, আসবাবপত্র,

সংগ্রহশালায় রক্ষিত বস্তুর মত মনে হয়, সেগুলি এত প্রাণহীন ও পুরাতন মনে হয়। তোমাদের আচার অনুষ্ঠান, চলাফেরা, জীবনযাপনের নিয়ম দেখে কারও মনে হবে, যেন ঠাকুরমার গল্প শুনছে।...তোমরা অতীত কালকে চিহ্নিত করছ, অতীত কালের সমস্ত আকারগুলি তোমাদের মধ্যে জট পাকিয়ে গেছে। এখনও যে তোমাদের দেখতে পাওয়া যায়, তা অজীর্ণের ফলে দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয়।...তোমাদের হাড়ের আঙ্গুলে পূর্ব পুরুষদের সঞ্চিত অমূল্য রত্নের সিন্দুক রয়েছে। এতকাল তোমরা সেগুলিকে অন্যদের হাতে দিতে পার নি।...তোমরা শূন্যে মিলিয়ে যাও, আর তোমাদের জায়গায় নতুন ভারতবর্ষ উঠে আসুক। আসুক সে লাঙল হাতে নিয়ে চাষার কুটির ভেদ করে, জেলেমালো মুচি-মেথরের কুঁড়ের মধ্য হতে। বের হোক মুদীর দোকান হতে, ফলওয়ালীর উনুনের পাশ থেকে। বেরিয়ে আসুক সে কারখানা থেকে, দোকান থেকে, বাজার থেকে। বের হোক বন-জঙ্গল থেকে, পাহাড়পর্বত থেকে। এই সব সাধারণ মানুষেরা হাজার হাজার বছর ধরে নির্যাতন সয়েছে, একটিও কথা না বলে সহ্য করেছে। তারা লাভ করেছে আশ্চর্য সহনশীলতা। অনন্তকাল দুঃখ সহ্য করে তারা পেয়েছে অবিচলিত প্রাণশক্তি। ...এদের মধ্যে রয়েছে রক্তবীজের মত অপর্যাপ্ত প্রাণশক্তি...অবিরাম কাজ করবার শক্তি, এবং কাজের সময় এমন সিংহের মতন বিক্রম—তুমি আর কোথায় পাবে? অতীতের কঙ্কালেরা, তোমাদের সামনে তোমাদের উত্তরাধিকারী, আগামী দিনের ভারতবর্ষ।" (স্বামী বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দ রচনাবলী, শতবার্ষিক সংস্করণ, অদ্বৈত আশ্রম, কলিকাতা)

৩৬. অতীত ও সমকালের মুকুরে ভবিষ্যতের প্রতিবিম্ব দেখতে বোধকরি কোন বাধা কোন দিক থেকেই নেই (পৃ. ৪১)

"বহু শতাব্দী থেকে এ দেশের পল্লীতে হিন্দু ও মুসলমানেরা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করেছেন। সমাজের অন্যান্যক্ষেত্রে তো বটেই, এমন কি, ধর্মীয় চেতনায়ও তাঁরা সমন্বয় সাধন করেছেন। বৈষ্ণব দর্শনের পশ্চাতে সূফী প্রভাব ঠিক কতখানি আছে তা গবেষণার বিষয়। কিন্তু পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে সে প্রভাব যথেষ্ট গভীর। তাছাড়া বৈষ্ণবদের সাম্যবাদী আদর্শও ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রীর দ্বারা প্রভাবিত। সহজিয়াদের সাধনায় অথবা কবীরের ধর্মেও ইসলামের মানবিক আদর্শ অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। কবীরের সদ্‌গুরু ও সত্যপীর এক কি না অথবা সত্যপীরের কল্পনায় কবীরের সমন্বয়ী মনোভাব কাজ করেছে কি না জানিনে; কিন্তু সত্যপীর হিন্দু-মুসলমানের

যুগল আদর্শের সংশ্লেষিত রূপ। হিন্দু ও মুসলমানের এই ভাবের সমন্বয় অত্যুজ্জ্বলভাবে বিধৃত আছে এদেশের সাহিত্য, সঙ্গীত, জ্যোতিষ ও ইতিহাসে। বৈষ্ণব পদাবলী, বাউল গান, সত্যপীরের পাঁচালী, ময়মনসিংহ গীতিকা এবং বিপুল পল্লী সাহিত্য ও সঙ্গীতে হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়ী ভাবাদর্শ অকৃত্রিম-রূপে প্রতিফলিত হয়েছে···ধর্মীয় কারণে যখন একটি সম্প্রদায় অন্য একটি সম্প্রদায়ের তুলনায় বেশী অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা ও সামাজিক প্রতিপত্তি লাভ করে, তখনই সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভেদবুদ্ধি জেগে ওঠে। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে অবিশ্বাসের চোখে দেখতে সুরু করে। আপনার সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির মধ্যে শান্তি খোঁজে। ব্যক্তি হিসেবে নয়, বরং সম্প্রদায় হিসেবে নিজেকে শক্তিশালী ও প্রবল করে তুলতে চায়। সম্মিলিতভাবে স্বার্থের লড়াই-এ লিপ্ত হয়। এই অবস্থাতেই মুসলীম লীগের জন্ম হয়, অথবা বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়, এবং পরিশেষে ভারতবর্ষ পর্যন্ত দ্বিধাবিভক্ত হয়··· পাকিস্তান সৃষ্টির পরে সে দেশের মানুষের মধ্যে কোনো নবমূল্যবোধ গড়ে ওঠে নি। শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং বর্ধিত ও অবাধ অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার ফলস্বরূপ অল্প দিনের মধ্যেই সে দেশে, এ যাবৎ অস্তিত্বহীন, একটি নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণী জন্ম লাভ করে। প্রত্যক্ষ ফললাভ হিসেবে অবশ্য ভূমিহীন কৃষক ও বিত্তহীন পেশাদারদের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। কোনো মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত মূল্যবোধ অর্জনের চেয়ে আপনাপন স্বার্থ ও সৌভাগ্য অর্জনের প্রযত্নই হলো এ সমাজের প্রধান লক্ষ্য। মধ্যবিত্তশ্রেণী অনাস্বাদিত-পূর্ব প্রাচুর্যের সন্ধান পেয়ে হিন্দুদের প্রতি সহজেই ঈর্ষামুক্ত হলেন। আর দেশের অগণ্য সাধারণ মানুষ ইসলামি ধুয়োর অর্থহীনতাও স্বল্পকালে উপলব্ধি করতে পারলেন।···অত্যন্ত ধূর্ত ও ধুরন্ধর মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ও তাঁর চেলাদের ধর্মের চোরাবালির উপর নির্মিত পাকিস্তানের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভালভাবে জানা ছিলো। তাঁরা জানতেন দৃঢ়তর কোনো বন্ধনের অভাবে ধর্মের আপাত সঙ্গতি দিয়ে পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের কেবল একটা তাৎক্ষণিক মিলন ঘটানো সম্ভব। কিন্তু পূর্ববাংলার সঙ্গে গভীরতর যোগ পশ্চিমবাংলার। সে যোগ বহু শতাব্দীর ; সে যোগ ভাষার, সাহিত্যের, পোষাক-পরিচ্ছদের, শিক্ষা-দীক্ষার, রুচি-রুজির—এক কথায় মনের ও সংস্কৃতির।···মুক্তবুদ্ধির আলোকে জনগণ দেখতে পেলেন হিন্দু-জমিদার, হিন্দু ডাক্তার, হিন্দু আমলা, হিন্দু উকিল, হিন্দু শিক্ষক, হিন্দু মোড়ল, হিন্দু চাকুরে শোষণ করছেন না। শোষণ করছেন মুসলমানেরাই, বিশেষত পশ্চিম

পাকিস্তানী ও তাঁদের তল্পিবাহক মুষ্টিমেয় বাঙালী মুসলমান। অর্থাৎ শোচনীয় শোষণের মুখে এ বিষয়টি সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট হলো যে, শোষকের কোন জাত নেই।" (হাসান মুরশিদ, "বাংলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি", সত্যানন্দ প্রকাশন, মুজিবনগর, ভাদ্র ১৩৭৮, পৃ. ৩৩, ৮৭-৯৯)। শোষক যেমন বাঙালীদের মধ্যে আছে তেমন আছে অবাঙালীদের মধ্যে। এই শোষক বাঙালী বাঙালীয়ানার মিত্র নয়, শোষণের জন্য তারা করতে পারে না এমন কাজ নেই। শোষিত বাঙালীই বাঙালীয়ানার প্রতিনিধি। তারা লোকসমাজের অন্তর্ভুক্ত। তাই মনে রাখতে হবে যে, "আধুনিক বিজ্ঞান [অধুনাতম লোকের চোখে যতই বিস্ময়কর হোক যে জ্ঞান এই বিজ্ঞানের লক্ষ্য তা আমাদের নিত্য ঘর-কন্নার জ্ঞানের সমশ্রেণীর জ্ঞান।

ব্যবহারিক জ্ঞানের মত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও জ্ঞান আহরণের কাজে লেগে যায়, জ্ঞানের চরম স্বরূপ কি এবং আছে কিনা এ চিন্তা সে কখনও করে না। ...চার্বাক প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন একমাত্র প্রত্যক্ষ ছাড়া জ্ঞানের আর কোনও উপায় নেই।...সমস্ত রকম জ্ঞান ও অনুভূতিকে এক অখণ্ড করে দেখা বিজ্ঞানের দেখা নয়, যেমন তা ব্যবহারিক জীবনের দেখা নয়। যে জানা এবং 'বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি'—তা যেমন ব্যবহারিক জীবনের জানা নয়, তেমনি বিজ্ঞানেরও জানা নয়।... মানুষের সমস্ত অনুভূতি, তার মন তার দৃষ্টি, তার হৃদয়বৃত্তি যদি কতগুলি বস্তুকণা, যাদের বাস্তবতা ছাড়া আর কোনও ধর্ম নেই, তাদের তাতে উপগ্রহের ফল মাত্র হয়, তবে মানুষের জীবনে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার কোনও স্থান থাকে না। বিশেষ রকমের ধর্মবিশ্বাস সামাজিক শান্তি ও সমাজ-বন্ধন পরিপুষ্টির সহায় হতে পারে। শ্রেণী বিশেষের আধ্যাত্মিকতা মানুষের শোকে-দুঃখে সান্ত্বনা দিতে পারে—কিন্তু এসব অজ্ঞানীর জন্য। কারণ এদের ভিত্তি অসতে প্রতিষ্ঠিত। যে জ্ঞানী সে জানে চঞ্চল বস্তুকণার বাইরে আর কিছু নেই।...আধ্যাত্মিকতার বাধা আধুনিক বিজ্ঞান নয়। সে বাধা হচ্ছে মানুষের চিরন্তন লৌকিক জীবন, এ জীবনের বদ্ধক্রম ভেদ করে যার প্রাণে আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ পৌঁছে নি তাকে দোষ দেওয়া বৃথা, তার সংশয়কে উপহাস করা মূর্খতা"। অতুলচন্দ্র গুপ্ত "ধর্ম ও বিজ্ঞান" প্রবন্ধ পত্রিকা, পুনর্মুদ্রণ, মাঘ ১৩৬৭)

স্মরণীয় "অবসাদের প্রাবল্যে প্রপীড়িত হইলে পুরাতনের উপর কেমন একটা বিদ্বেষ জন্মে, কোন একটা নতুন পন্থার জন্য প্রাণটা কেমন করে। তাই

তেজোহীন আর্য্যরাও বৌদ্ধমত সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন,...বৌদ্ধধর্ম আর্য্যজাতির ঊর্দ্ধ দৃষ্টিকে নীচগামী করিয়া দিয়াছিল। শূন্যবাদের কচকচিতে উপনিষদে গভীর জ্ঞান একপ্রকার অন্তর্হিত হইয়াছিল, হিন্দুদের নিবৃত্তের দিকে আর মন ছিল না। আস্তিক্যবুদ্ধিবিরহিত হইয়া আর্য্যসন্তানেরা প্রবৃত্তির অধীন হইয়া পড়িয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য যখন তাঁহার বেদান্তের ভেরী বাজাইলেন, তখন মৃতকল্প ব্রাহ্মণ্যধর্ম সঞ্জীবিত হইল বটে, কিন্তু তাহাতে পূর্ণশক্তির সঞ্চার হইল না। হিন্দুসমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব অসাড় হইয়াছিল। জীবনপ্রবাহ বহিল, কিন্তু অতি ক্ষীণধারে। বেদান্তের জ্ঞান পুনরুদ্ধৃত হইল, কিন্তু জনসাধারণ তাহা বুঝিল না। বৌদ্ধতন্ত্র হিন্দুর চরিত্রকে এত কলঙ্কিত করিয়াছিল যে, কামনাবিবর্জিত সাধন তাহাদের নিকট অত্যন্ত অরুচিকর হইয়া উঠিয়াছিল। নিবৃত্তিমার্গ আর তাহাদের ভাল লাগিল না। শত শত সাম্প্রদায়িক প্রবৃত্তি দেশকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল।...

যেখানে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা,—যেখানে আত্মস্থিতি, সেখানে কার্য্য তিষ্ঠিতে পারে না। কেহ কেহ বলিতে পারেন—অস্তিত্ব কি তবে স্বার্থেই পূর্ণতা লাভ করে? প্রেমহীনতায় কি অস্তিত্বের চরম বিকাশ? যদি প্রেম ছটফট করাইতে হয়—শান্তিতে না হয়, আকাঙ্ক্ষায় অতৃপ্তিতে হয়,—মিলনের পর্য্যাপ্তিতে না হয়,—তবে প্রেমের অভাবই অস্তিত্বের সার। আর যদি ভিন্নতাকে একতার মধ্যে সমাহিত করিয়া স্থিতির নাম প্রেম হয়, তাহা হইলে অস্তিত্ব প্রেমময়, শিবময়, আনন্দময়। বাসনার বহ্নিকে প্রশমিত করিয়া, চেষ্টাকে পূর্ণ স্থিতিতে পরিণত করিয়া, দ্বৈতকে নিঃশেষ করিয়া, অদ্বৈতানন্দে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আর্য্যদিগের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু সাধনা নহিলে সিদ্ধি হয় না। অদ্বৈত প্রতিষ্ঠালাভ করিতে গেলে কর্মবন্ধন ছিন্ন করা প্রয়োজন। সকাম কর্ম করিলে দ্বৈতচক্রে নিষ্পিষ্ট হইতে হয়,—আর নিষ্কামকর্ম করিলে কর্মবন্ধন শিথিল হয়,—আত্মস্থিতির দ্বার উন্মুক্ত হয়,—অদ্বৈত ব্রহ্মপদ নিকট হয়। তজ্জন্যই গীতা শাস্ত্রে নিষ্কাম কর্মের প্রশংসা কীর্তিত হইয়াছে।" (উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, "সমাজ" ৩৭-৫৫। বর্মণ পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা)

নিষ্কামকর্মের সাধক বাঙালী জন্মভূমিকে মাতারূপে দেখতে চায়, ভালবাসতে চায়, শ্রদ্ধা জানাতে চায়। প্রাসঙ্গিক কারণেই স্মরণীয় যে সম্ভবতঃ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই প্রথম দেশকে ও দেশের মাটিকে মাতৃরূপে ধ্যান করে দেশবন্দনা আরম্ভ করেন। তারপরেই দেশমাতৃকা ও জননী গর্ভধারিণী এক হয়ে দেখা দেন বাঙালী মানসে। তখন কবিগণ একে একে গেয়ে ওঠেন—"বঙ্গ আমার

জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ…দেবী আমার সাধনা আমার স্বর্গ আমার আমার দেশ।" (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)। "বঙ্গভূমি আমাদের মা জগতে নাহি তুলনা,…মায়ের নামে মায়ের প্রেমে মায়ের কোলে নেচে বেড়াই" (রামচন্দ্র দাস)। "নমো নমো বঙ্গভূমি মোদের জননী তুমি তোমার চরণে নমি নরনারী মোরা যত" (স্বর্ণকুমারী দেবী)। "আয়রে আমরা মায়ের নামে এই প্রতিজ্ঞা করবো ভাই, পরের জিনিষ কিনবো না, যদি মায়ের ঘরে জিনিষ পাই" (রজনীকান্ত সেন)। "ওগো মা—তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে; তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে" (রবীন্দ্রনাথ)। "জননী মোর জন্মভূমি তোমার পায়ে নোয়াই মাথা" (নজরুল)। পাশ্চাত্ত্যানুকরণ ও যৌবনের অহমিকায় দেশমাতৃকাকে হেয়জ্ঞানে মধুসূদন দত্তও চরম লজ্জিত হয়ে লিখেছেন—"হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন, তা সবে, অবোধ আমি, অবহেলা করি, পরধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ"। তিনি সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন। তাই বঙ্গবাসী প্রত্যেকটি নরনারীকে তাঁর শবাধারের পাশ দিয়ে যাবার সময় ক্ষণেক দাঁড়িয়ে যেতে আহ্বান জানিয়েছেন —"দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে তিষ্ঠ ক্ষণকাল এ সমাধিস্থলে," এইসব

৩৭. খাঁটি ও নির্ভেজাল বাঙালী এখনও সরব বাঙলার গ্রামে নদনদীর তীরে ও মাঠ বন প্রান্তরে (পৃ. ৪২)

"বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর: অন্ধকারে জেগে ওঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে বসে আছে
ভোরের দোয়েল পাখি—চারিদিক চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম-বট-কাঁঠালের—হিজলের—অশথের ক'রে আছে চুপ;
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে:
মধুকর ডিঙ্গা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ"।

(জীবনানন্দ দাশ, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, ১৯৮৮ পৃ. ৪৬)।

৩৮. শিল্পাগ্রসরতা পেশার পরিবর্তন শিক্ষার বিবর্তনাদির জন্যও মানুষে মানুষে সম্পর্কের হেরফের হচ্ছে (পৃ. ৩৮)

"পৃথিবীতে মানব-হৃদয়ের শিল্পী ও কবির সংখ্যাই সমধিক। তার কারণও একান্ত স্পষ্ট। চারিপাশের ছড়ানো মানব-জীবন থেকেই তাঁরা শিল্পের

উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। তার বাইরে তাকাবার প্রয়োজন বা প্রবৃত্তি কোনোটাই হয় নি তাঁদের।

আর এক শ্রেণীর স্রষ্টা আছেন যাঁরা ধাতুগতভাবে মানব-জীবনের প্রাণ-চঞ্চলতা, মুখরতা, কোলাহল ও জনারণ্যের মধ্যে অবস্থান করেও এই সব কিছুকে ছাড়িয়ে বা আত্মিক সম্পর্কশূন্য হয়ে এই প্রাণচঞ্চলতা, কোলাহল ও মুখরতার বাইরে যে নিঃশব্দ নির্বাক মৌন পৃথিবী তারই সঙ্গী, তারই অধিবাসী। এ যেন হয়েছেন তাঁরা বিচিত্রভাবে—জন্মসূত্রে। তাঁরা আপনার মনের ও প্রাণের স্থায়ী আবাসস্থল আবিষ্কার করেন ওই বিপুল-বিস্তার মৌন নির্বাকের মধ্যে। এ এক ধরনের মানব-প্রবৃত্তির উজানে বয়ে যাওয়া যেন। রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যে এমনি দুজন শিল্পীর রচনা থেকে সামান্য উদ্ধৃতি আপনাদের আস্বাদনের জন্য পরিবেশন করছি :

এক ॥

এতক্ষণে তাদের বনে-ঘেরা বাড়ীটার উঠানটাতে ঘন ছায়া পড়িয়া আসিতেছে, কিচ্ কিচ্ করিয়া পাখী ডাকিতেছে, সেই মিষ্ট নিঃশব্দ, শান্ত বৈকাল—সেই হলদে পাখীটা আজও আসিয়া পাঁচিলের উপরের কঞ্চির ডালটাতে সেই রকমই বসে, মায়ের হাতে পোঁতা লেবুচারাটাতে হয়তো এতদিন লেবু ফলিতেছে।···

আরো কিছুক্ষণ পরে তাহাদের সে ভিটায় অন্ধকার হইয়া যাইবে, কিন্তু সে সন্ধ্যায় সেখানে কেহ সাঁঝ জ্বালিবে না, প্রদীপ দেখাইবে না, রূপকথা বলিবে না। জনহীন ভিটার উঠান-ভরা কালমেঘের জঙ্গলে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকিবে, গভীর রাত্রে পিছনের ঘন বনে জগ্‌ডুমুর গাছে লক্ষ্মীপেঁচার রব শোনা যাইবে।···কেহ কোন দিন সে দিক মাড়াইবে না, গভীর জঙ্গলে চাপা-পড়া, মায়ের সে লেবুগাছটার সন্ধান কেহ কোন দিন জানিবে না, ওড়্‌কলমীর ফুল ফুটিয়া আপনা-আপনি ঝরিয়া পড়িবে, কুল নোনা মিথ্যাই পাকিবে, হল্‌দে ডানা তেড়ো পাখীটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিবে।

[পথের পাঁচালী : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

দুই ॥

সন্ধ্যা হয়—চারিদিকে শান্ত নীরবতা :
খড় মুখে নিয়ে এক শালিক যেতেছে উড়ে চুপে :
গোরুর গাড়ীটি যায় মেঠো পথ বেয়ে ধীরে ধীরে ;
আঙিনা ভরিয়া আছে সোনালি খড়ের ঘন স্তূপে ;

পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে ;
পৃথিবীর সব রূপ লেগে আছে ঘাসে ;
পৃথিবীর সব প্রেম আমাদের দু'জনার মনে ;
আকাশ ছড়ায়ে আছে শান্তি হয়ে আকাশে আকাশে।

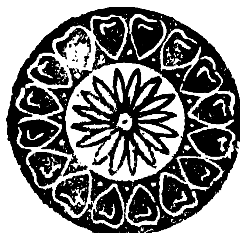
[রূপসী বাংলা : জীবনানন্দ দাশ]

(তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, "রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী", সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, পৃ. ৫৮-৫৯)

৩৯. এ দেশ সেই দেশ যে দেশ সর্বদাই আনন্দমুখর হাস্যলহরী-পূর্ণ ছিল বলে শুনি কিন্তু সে দেশ কোথায় (পৃ. ৪১)

"আমাদের জাতীয় দুর্বলতা নিবন্ধন আমরা ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইংরাজ জাতিকে ও তাহাদের সভ্যতা ও তাহাদের বিলাসকে বরণ করিয়া লইলাম। দুর্বলের যাহা হয় তাহাই হইল।...নিজের ধর্ম-কর্ম সকলই অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া নিজের শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া নিজের সাহিত্যকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ইঙ্গিতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া ইংরাজের সহিত, ইংরাজের ইতিহাস, ইংরাজের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দিকে নিতান্ত অসংযতভাবে ঝুঁকিয়া পড়িলাম...মানুষের যে অন্তর্নিহিত শক্তি, তাহার যে আত্মসম্বিত, তাহার ঘুম ভাঙাইয়া দেওয়া, সিংহকে জাগাইয়া দেওয়া, প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবার ধর্মকে ফুটাইয়া তোলাই শিক্ষাদীক্ষার কার্য।...এই শিক্ষার কার্য পুরাকালে আমাদের দেশে অনেক প্রকারে সাধিত হইত। গুরুর গৃহে, সংসারের সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে, পল্লীতে পল্লীতে যাত্রা গানে, কথা গানে, কথকতার মধ্যে, ভাগবৎ পাঠে, রামায়ণ গানে, চণ্ডীর গানে, ধর্মঠাকুরের কথায়, হরিসভার সঙ্কীর্তনে, মেয়েদের ব্রত উদযাপনে...একটা অলীক শিক্ষা আমাদের দেশে বিস্তারিত হইতেছে ইহার জন্য এত আড়ম্বর কেন। এতরকম আড়ম্বরের মধ্যে যে শিক্ষার প্রাণটুকু মরিয়া যায়।...এতদিন আমরা মহানিদ্রায় মগ্ন ছিলাম। এখন ভগবানের আশীর্বাদে আমাদের সে ঘুম ভাঙিয়াছে...বাঙলার উৎসাহী কর্মীগণকে আমি বলি যে...এখনও সময় আসে নাই,—যখন তোমরা সসম্মানে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বিশ্রামলাভ করিতে পার। যুদ্ধক্ষেত্র এখনও তোমাদের অপেক্ষায় কলকোলাহলে মুখরিত। যাও বীর, যুদ্ধ কর। ইতিহাসের একটা মহাগৌরবান্বিত যুদ্ধের সৈনিক তোমরা—তাহা ভুলিও না। যখন যুদ্ধ শেষ হইবে, যখন সন্ধি লইয়া শান্তি আসিবে—তখন সংযত, শান্ত পদক্ষেপে

সে শান্তিময় মিলন মন্দিরে—সমুন্নত শিরে তোমরা দলে দলে প্রবেশ করিবে …তোমরা তখন সর্বপ্রকার দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করিবে। জয়ী যে, সে দম্ভ করে না। বীর যে, সে জয়ের পর বিনয়ে অবনত হয়। মিলন মন্দিরে যাত্রীরা যেন তোমাদের দেখিয়া বলিতে পারে—এরা সেই সমস্ত যোদ্ধা, যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়কে পরাজিত করিয়াছে, মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়াছে, আবার যুদ্ধাবসানে জয়মাল্য গলে—ইহারা বিনয়ে ও সৌজন্যে শত্রুকে অধিকতর পরাজিত করিয়াছে।" (চিত্তরঞ্জন দাশ, দি ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট, ১৮৭০-১৯৭০)



কৃতজ্ঞতা স্বীকার



গ্রন্থারম্ভে 'বঙ্গমাতা স্তুতি' স্বর্গীয় ডঃ দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী বিরচিত এবং বাঙলা ও বাঙালী প্রসঙ্গে উত্থাপিত প্রশ্নাবলীর রচয়িতার নামোল্লেখ না থাকলেও সতর্ক পাঠক নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে তা সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের □

বর্তমান গ্রন্থপ্রকাশে যাঁর ঋণ বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি তিনি বন্ধুবর শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু, এফ. এন. আই, এবং অধ্যাপক ডঃ মীনেন্দ্রনাথ বসুর ঋণও স্বীকার করি □

বন্ধুবর খালেদ চৌধুরী দীর্ঘদিন থেকে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করে আসছেন। এবারেও তিনি প্রচ্ছদ এঁকেছেন। কামরুল হাসান এঁকেছেন চিত্রাবলী। শুষ্ক ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁদের বন্ধুত্বের অমর্যাদা করব না □

গ্রন্থ সরবরাহ, প্রুফ সংশোধন, গ্রাম-কথা ও লোকক্রীড়া সম্পর্কিত খুঁটিনাটি তথ্য ও কিছু ছড়া সংগ্রহ করে দিয়েছেন শ্রীমতী গীতা সেনগুপ্তা। তাঁর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তাতে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বাহুল্য □

প্রুফ সংশোধন ও তথ্যাদি সংগ্রহে যাঁরা আমাকে নানাভাবে ঋণী করেছেন তাঁরা হলেন শনিবারের চিঠি-সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীরঞ্জনকুমার দাস, ডঃ পীযূষকান্তি মহাপাত্র, কলকাতা জনশিক্ষা লাইব্রেরীর আখতার হোসেন, শ্রীঅবনীরঞ্জন রায়, কুমারী মিনতি সেন, অধ্যাপক দেবজ্যোতি দাশ, শ্রীকনককান্তি বসু প্রভৃতি। দ্বিতীয় বিবাহের গানটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন শ্রীগুরুপ্রসাদ রায়, রক্ত সম্পর্কিত তথ্য দিয়েছেন ডঃ রেবতীমোহন সরকার ও ডঃ কার্তিকচন্দ্র শাসমল, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ইণ্ডিয়ান ফোকলোর সোসাইটি, টেলিগ্রাফ ইনষ্টিটিউট, এঁদের সকলের ঋণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। আরও স্মরণ করি ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশন্স-এর কুমারী পুতুল দাস ও ত্রিভুবন সিং, শনিরঞ্জন প্রেসের কর্মীবৃন্দ, ব্লকম্যান এবং প্রচ্ছদের জন্য নবশক্তি প্রেসের কর্মীদের সাহায্য। সকলের সহযোগিতা না হলে এ বই প্রকাশে বিলম্ব হত। অনেক বই এবং সাময়িকপত্র থেকেও সাহায্য নিয়েছি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের "বাঙালীর ইতিহাস" আদিপর্ব, আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির "পূজা পার্বণ" ও "কোন পথে", পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করেছি। তাছাড়া ডঃ

রমেশচন্দ্র মজুমদারের "বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস" ১ম, ২য় খণ্ড, রাজেন্দ্রলাল আচার্যের "বাঙালীর বল", ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের "ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা", শ্রীচিত্তরঞ্জন দেবের "পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ" এবং "বাংলার পল্লীগীতি", ডঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বাংলার ব্রত", বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরীর "আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ পদ্ধতি", ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীর "কৌলজ্ঞান নির্ণয়", ডঃ নলিনীনাথ দাশগুপ্তের "বাংলায় বৌদ্ধধর্ম", মনীন্দ্রমোহন বসুর "চর্যাপদ", অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর "হিন্দু সমাজের গড়ন" ও "ভারতের গ্রাম জীবন", তারকনাথ সাধুর "উপেক্ষিতার কথা", অশোক মিত্রের "আমাদের দেশ", অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর "হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান", ইব্রাহিম খাঁ ও মৌলবী আহ্ছান উল্লাহের "ইছলাম সোপান", ঢাকা বাঙলা একাডেমী প্রকাশিত লোকসাহিত্য, ২য়, সিরাজুদ্দিন কাসিমপুরীর "লোকসাহিত্যে ছড়া", হাফিজুর রহমান ও আলমগীর জলীলের "উত্তর বঙ্গের মেয়েলী গীত", শিবপ্রসন্ন লাহিড়ীর "যশোর-খুলনার ছড়া", আলমগীর জলীলের "রাজশাহীর ছড়া", ডঃ বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্যের "বাংলা গাথাকাব্য", ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের "বাঙলার পুরনারী", বিনয় ঘোষ সম্পাদিত "সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র", ডঃ প্রবোধকুমার ভৌমিকের "সমাজ ও সম্প্রদায়", মান বর্ধনের "বাঙলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য", শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনের "বাঙলার ইতিহাস", সুনীল চক্রবর্তীর "লোকায়ত বাংলা", গুরুসদয় দত্ত ও নির্মল ভৌমিক সম্পাদিত "শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত", ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়ের কিছু রচনা, দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের "উত্তর রাঢ়ের লোকসঙ্গীত", ডঃ ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের "অপরাধ জগতের ভাষা" প্রভৃতি থেকে সাহায্য নিয়েছি। তাছাড়া, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "অরিজিন এ্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অব্ বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ এ্যাণ্ড লিটারেচার", ডঃ দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীর "অরিজিন এ্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অব্ অ্যানসেস্টর ওয়ারশিপ ইন ইণ্ডিয়া", ননীগোপাল মজুমদারের "ইনস্ক্রিপশন অব্ বেঙ্গল", ডঃ চারুচন্দ্র দাশগুপ্তের "অরিজিন এ্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়ান ক্লে স্কাল্পচার" এবং মৎরচিত "এ সার্ভে অব্ ফোকলোর স্টাডি ইন বেঙ্গল" এবং মৎসম্পাদিত "ট্রি সিম্বল ওয়ারশিপ ইন্ ইণ্ডিয়া" এবং "রেন ইন ইণ্ডিয়ান লাইফ অ্যাণ্ড লোর", ডঃ অ্যালেন ডাণ্ডেসের "দি স্টাডি অফ ফোকলোর" ও অন্যান্য পুস্তক থেকেও সাহায্য নিয়েছি। সকলের সাহায্য, সহানুভূতি ও সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।—শঙ্কর সেনগুপ্ত